

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর
আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ.
শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.

অনুবাদক
অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ
খলীফা, হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হক্কী রহ. ও
হযরত মাওলানা আব্দুল হক দামাত বারাকাতুহুম

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর
আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী





রাহনুমা
প্রকাশনী™



'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর
আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী

১ম খণ্ড

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. (১২৬৮-১৩৩৯ হি.)

[সমস্ত কুরআনের তরজমা এবং সূরা ফাতিহা, বাকারা ও নিসা-এর তাফসীর]

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. (১৩০৫-১৩৬৯ হি.)

[সূরা আলে ইমরান ও মায়েদা থেকে নাস পর্যন্ত সূরাসমূহের তাফসীর]

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর
আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী ১ম খণ্ড

অনুবাদ

অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ

খলীফা, হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হক্কী রহ. ও
হযরত মাওলানা আব্দুল হক দামাত বারাকাতুহুম

সম্পাদনা

হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম দা.বা.

শাইখুল হাদীস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, ঢাকা।

তাকরীয

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা.বা.

বিস্তারিত ভূমিকা

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক দা.বা.

আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা।

বিস্তারিত নিরীক্ষণ, শিরোনাম সংযোজন ও হাদীস-রেওয়ায়েতের তাখরীজ

মাওলানা সাঈদ আহমদ বিন গিয়াসুদ্দীন আহমদ

উস্তায, উলূমুল হাদীস বিভাগ, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা।

প্রকাশনায়



রাহনুমা প্রকাশনী™

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী ১ম খণ্ড

মূল	শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.
অনুবাদ	অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ
সম্পাদনা	মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
তাকরীয্	শাইখুল ইসলাম মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
বিস্তারিত ভূমিকা	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
বিস্তারিত নিরীক্ষণ	মাওলানা সাঈদ আহমদ বিন গিয়াসুদ্দীন আহমদ
দ্বিতীয় সংস্করণ	এপ্রিল ২০২৩
প্রথম প্রকাশ	জুলাই ২০২২
সর্বস্বত্ব	অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ ডিজাইন	মুহারেব মুহাম্মাদ
ইনার বিন্যাস	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০।
বাঁধাই	আয়েশা বুক বাইন্ডিং ২৭ রূপচাঁদ দাস লেন, ঢাকা ১১০০, মোবাইল : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯
একমাত্র পরিবেশক	রাহনুমা প্রকাশনী শোরুম ১ : ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা শোরুম ২ : কওমী মার্কেট, ১ম তলা, ৬৫ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য ঃ ২৪০০.০০ (দুই হাজার চারশ টাকা মাত্র)

TAFSIRE USMANI
by Professor Mawlana Giasuddin Ahmad. Published & Marketed by : Rahnuma Prokashoni.
Price : MRP. 2400.00, US $ 25.00 only. E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com, www.rahnumabd.com

ISBN : 978-984-93859-7-7

সূচিপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূচনা-পর্ব

এতে রয়েছে—

১. শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম এর তাক্‌রীয (এই অনুবাদগ্রন্থ সম্পর্কে)

২. শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রাহ.-এর মূল্যায়ন

৩. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এর বিস্তারিত ভূমিকা।

৪. ভাষাবিজ্ঞানী ড. কাজী দীন মুহম্মদ রাহ.-এর মূল্যায়ন।

৫. মূল (উর্দূ) তাফসীরে উসমানী সম্পর্কে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও মনীষীবৃন্দের কিছু মূল্যায়ন ও অভিমত।

৬. অনুবাদকের মুখবন্ধ।

৭. নিরীক্ষকের দু'টি কথা।

৮. 'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর মূল 'মূযিহুল কুরআন'-এ তরজমাতুল কুরআনের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হযরত শাইখুল হিন্দ রাহ.-এর বক্তব্যের সার-নির্যাস।

৯. তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ ও তাফসীরে উসমানী সম্পর্কে কিছু উপকারী তথ্য।

১০. আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ.-এর স্বহস্তে লিখিত তাফসীরে উসমানীর পাণ্ডুলিপির ছবি।

❖ [তাফসীরে উসমানীর পরিচিতি, বৈশিষ্ট্যাবলি, উপকারী দিকসমূহ ইত্যাদির জন্য বিশেষভাবে দেখুন–

পৃ- ৮, ১৬-১৮, ৩০-৩৪, ৩৭-৩৮, ৪৫-৪৬, ৫২-৫৩]

শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা. বা.-এর

তাক্রীয (মূল্যায়ন)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

শাইখুল ইসলাম হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'তাফসীরী ফাওয়াইদ' যা 'তাফসীরে উসমানী' নামে পরিচিত, উর্দূ ভাষায় কুরআনে কারীমের তাফসীরের মহামূল্যবান সম্পদ। তাফসীরটি উর্দূভাষী পাঠকের কাছে আল্লাহর অনুগ্রহে অনেক প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত এবং জনসাধারণ ও আলেম উভয় শ্রেণির জন্যই সমানভাবে উপকারী।

হযরত মাওলানা প্রফেসর গিয়াসুদ্দীন আহমদ ছাহেব মুদ্দা যিল্লুহুম এই মহান তাফসীরের বাংলা অনুবাদের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, যা এখন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বান্দা বাংলা ভাষা না জানার কারণে অনুবাদটি থেকে উপকৃত হতে পারছে না, কিন্তু মুহতারাম অনুবাদকের ইলমী মাকামের প্রতি দৃষ্টি রেখে আশা করি যে, এটি শুধু নির্ভরযোগ্য অনুবাদই নয়, বরং অতি উত্তম অনুবাদ হবে। আর মুহতারাম অনুবাদক সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে অনুবাদটি যুগের খুবই নির্ভরযোগ্য আলেমগণের খেদমতে পেশ করে তাদের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছেন। অতএব পূর্ণ আশা রাখি, ইনশাআল্লাহ বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য এটি হবে মহা মূল্যবান তোহফা।

মূল উর্দূ তাফসীরটিকে আল্লাহ তাআলা যেমন ব্যাপক উপকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন, তেমনি এই বাংলা অনুবাদটিকেও উপকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা দান করুন এবং হযরত উসমানী রাহ. ও অনুবাদক উভয়ের জন্য একে আখেরাতের পাথেয় বানিয়ে দিন, আমীন। আল্লাহ তাআলাই তাওফীক দেওয়ার মালিক।

বান্দা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী উফিয়া আনহু
দারুল উলূম করাচি

মূল উর্দূ তাক্রীয

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ وکفٰی وسلام علیٰ عبادہ الذین اصطفٰی

اما بعد:

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فوائد تفسیر یہ جو "تفسیر عثمانی" کے نام سے مشہور ہیں، اردو زبان میں تفسیر قرآن کریم کا عظیم سرمایہ ہیں۔ ان کی یہ تفسیر اردو داں حلقوں میں بفضلہ تعالیٰ بہت مشہور اور مقبول ہے اور خاص و عام سب کے لئے یکساں مفید۔

حضرت مولانا پروفیسر غیاث الدین احمد صاحب مدظلہم نے اس عظیم تفسیر کا بنگلہ زبان میں ترجمہ فرمایا ہے جو اب شائع ہونے جا رہا ہے۔ بندہ بنگلہ زبان سے ناواقفیت کی بنا پر اس سے استفادہ تو نہیں کر سکا، لیکن فاضل مترجم مدظلہم کے علمی مقام کی بنا پر امید ہے کہ یہ ترجمہ نہ صرف صحیح، بلکہ بہترین ہوگا۔ فاضل مترجم مدظلہم نے غایت احتیاط کے لئے اپنے اس ترجمے کو اہم علمائے وقت کی خدمت میں پیش کر کے ان کی تائید بھی حاصل کی ہے، اس لئے پوری توقع ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بنگلہ زبان کے قارئین کیلئے یہ ایک اعلیٰ درجے کا تحفہ ہوگا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی طرح نافعیت اور مقبولیت عطا فرمائیں جس طرح اصل اردو تصنیف کو عطا فرمائی ہے، اور اسے حضرت مؤلف و مترجم دونوں کے لئے ذخیرۂ آخرت بنائیں۔ آمین۔ واللہ سبحانہ ولی التوفیق۔

بندہ
محمد تقی عثمانی عفی عنہ
دار العلوم کراچی ۱۴
۸ شوال ۱۴۲۲ھ

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রাহ.-এর মূল্যায়ন

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

অনুবাদক সম্পর্কে

১

উনিশ শতকের হিন্দুস্তানের প্রখ্যাত দুইজন আলেম শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান রাহ. ও শাইখুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ.-এর প্রণীত 'ফাওয়ায়েদে উসমানী' তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ মাঝে মাঝে পড়ে দেখলাম। 'তাফসীরে উসমানী' শীর্ষক এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছেন মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ। সূচনাতেই পাঠকবৃন্দের নিকট তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করে নিতে চাই। কেননা, যাঁরা তাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হিসাবে চিনেন, তাঁরা বলতে পারেন, 'তিনি তো একজন কলেজ-শিক্ষক, কুরআনের তরজমা ও তাফসীর অনুবাদে তার কী অধিকার?' এ সম্বন্ধে বলতে গেলে, তিনি প্রথম জীবনে মাদরাসারই ছাত্র ছিলেন এবং আমাদের লালবাগ জামিয়া কুরআনিয়ায় অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে প্রথমে 'হেদায়াহ' কিতাব পর্যন্ত পড়েছিলেন। তিনি আরবী সাহিত্যে এমন পারদর্শী ছিলেন যে, অল্প বয়সেই তিনি আরবী ভাষায় চমৎকার বক্তৃতা করতে পারতেন। আমার আরবী সাহিত্যের ক্লাসে তিনি ছিলেন অসাধারণ।

আল্লাহ তাআলার কুদরত, তখন অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে তার পিতামাতার ইন্তেকাল হয়ে যায়। দেশের বাড়িতে তাকে ছাড়া তার বোনদের মাহরাম ও মুরব্বী বলতে কেউ ছিল না। তাই তাকে মাদরাসা ছেড়ে বাড়ি চলে যেতে হয়। বাড়ির কাছে কোন বড় মাদরাসা না থাকায় তার শাইখ হযরত হাফেজ্জী হুযুর রাহ. তাকে মাদরাসা ছাত্রের সুরত ও সীরাত ঠিক রেখে হাইস্কুলে পড়ার অনুমতি দেন। সে অনুযায়ী তিনি স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করতে থাকেন। তিন বছর পর ১৯৫৮ সনে তিনি কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। সেই সাথে বড় বোনের বিবাহ ও ছোট বোনদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে তিনি আবার ঢাকায় চলে আসতে সমর্থ হন। তখন তার মধ্যে মাদরাসা ছাত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে আমিই বললাম, 'তুমি তো ভালই আছ, অতএব আধুনিক ধারার লেখাপড়া শেষই করে ফেল। আমাদের আধুনিক ও ইসলামী উভয় ধারারই শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন আছে।' অতএব আমাদের পরামর্শে তিনি ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। একই সঙ্গে তিনি বিকাল বেলায় এসে আমার নিকট কুরআন শরীফের তরজমা পড়তে আরম্ভ করেন।

আই. এ. পাশ করার পর তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে বি. এ. অনার্স ও এম. এ. পাশ করেন। এর পর ঢাকায় মিরপুর বাঙলা কলেজে তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন, সেই সঙ্গে মাদরাসায় তার অসমাপ্ত পড়ার কাজ সমাপ্ত করায় লেগে যান। এই উদ্দেশ্যে তিনি লালবাগ মাদরাসার কাছাকাছি বাসা নেন। এবং সুদীর্ঘ সাত আট বছর ধরে একজন অসাধারণ পড়ুয়া ছাত্রের ন্যায় শিক্ষকতার পাশাপাশি কুরআন ও হাদীসের পাঠ সমাপ্ত করেন। মাদরাসায় তাকে মেশকাত শরীফ পড়ানোর দায়িত্ব পড়ে আমার উস্তাদ মরহুম মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ (মুহাদ্দিছ ছাহেব হুযুর) রাহ. ও আমার উপর। তিনি নিয়মিত ক্লাস করে মেশকাত শরীফের পাঠ কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেন। এর পর তিনি প্রথমে এক বছরে মুহাদ্দিছ ছাহেব হুযুরের নিকট তিরমিযী শরীফ এবং পরবর্তী বছর আমার নিকট বুখারী শরীফ সমাপ্ত করেন।

২

তার কুরআনুল কারীমের অধ্যয়ন ছিল বিস্ময়কর। লালবাগ মাদরাসায় ছাত্র জীবনে তিনি কুরআনের তরজমা প্রথমে ক্লাসে পড়েন। তার পর হযরত হাফেজ্জী হুযুর রাহ. এর নিকট ধারাবাহিকভাবে পড়েন। এর কিছু দিন আগে তিনি লালবাগ মাদরাসার বর্তমান মুহাদ্দিস মাওলানা আবদুল হাই-এর নিকট কুরআন-হাদীস ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও নতুনভাবে পড়েন। উল্লেখ্য যে, তিনি 'রঈসুল মুফাসসিরীন' মরহুম মাওলানা দীন মুহম্মদ খান রাহ.-এর নিকট কুরআনের তরজমা-তাফসীর পাঠ সমাপ্ত করেন। মাওলানা আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তিনি আমাকে একদিন জামাতা গিয়াসুদ্দীন আহমদ সম্পর্কে বললেন, 'ও তো না বুঝে এক আয়াতও এগুতে চায় না। ও-ই একমাত্র ছাত্র, যে সাহস করে ক্লাসে প্রশ্ন করে। অন্য কারো এই হিম্মত হয় না।' মরহুম মাওলানা খান ছাহেব রাহ. এর নিকট তার অধ্যয়ন শেষে আমি জানতে পারলাম, সমগ্র কুরআন অধ্যয়নে তিনি একদিনও গায়র-হাযির ছিলেন না। কিছু দিনের মধ্যে তিনি মরহুম মাওলানার নিকট থেকে কুরআন অধ্যয়নের সনদও লাভ করেন।

আমি কুরআন-হাদীসের অধ্যয়নে এরূপ কঠোর পরিশ্রম ও সাধনায় মনোনিবিষ্ট খুব কম ছাত্রই পেয়েছি। মরহুম মুহাদ্দিছ ছাহেব রাহ. ও আমার নিকট হাদীস অধ্যয়নকালে তিনি ক্লাসে আমাদের প্রদত্ত ভাষণ হুবহু লিখে রেখেছিলেন। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে বলতে দ্বিধা নেই যে, আল্লাহ তাআলা তাকে চারটি ছেলে-সন্তান দান করেছেন। আর তাঁরই অশেষ রহমতে চারটিকেই তিনি হাফেজ ও আলেম বানিয়েছেন। তারা সবাই বিভিন্ন মাদরাসায় কুরআন ও হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পিতার লিখিত আমাদের প্রদত্ত সেই নোটগুলি তাদের হাদীস অধ্যাপনার কাজে প্রয়োগ করছে।

কুরআন-হাদীসের সাধারণ অধ্যয়ন সমাপ্তির পর গিয়াসুদ্দীন আমার নিকট নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে কুরআনের তরজমা ও তাফসীর পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তার সঙ্গে লালবাগ মাদরাসার দুজন দক্ষ উস্তাদও তার সহপাঠি হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাদের সবার ঐকান্তিক বাসনা ও উৎসাহ দেখে আমি তাদের পড়াতে শুরু করি। পড়ানোর শুরু থেকেই আমি লক্ষ করলাম, আয়াতের অর্থ পরিষ্কার বোঝার উদ্দেশ্যে গিয়াসুদ্দীন আহমদ

আয়াতের বাক্যবিন্যাস বা তরকীব না বুঝে সামনে অগ্রসর হতে চাইতেন না। আর এও একটি আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি উস্তাদদের নিকট যাই কিছু পড়তেন, তা সাথে সাথে নোট করে ফেলতেন। কুরআনের বর্তমান অনুবাদ কর্মে সেই নোটগুলি খুব কাজে লেগেছে বলে তিনি আমাকে জানিয়েছেন।

কুরআনের তরজমা ও তাফসীরের বাংলা অনুবাদক গিয়াসুদ্দীন আহমদের 'বিশ্বস্ত' ও 'বিশ্বাসযোগ্য' হওয়ার বিষয়ে দুটি কথা বলে এ আলোচনা শেষ করি। আমার শ্রদ্ধেয় অভিভাবক উস্তাদ মরহুম মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রাহ. এর ভাষায় 'বিশ্বস্ত' বলা হয় তাকে, যার আগে থেকে কুরআন-হাদীসের খেলাফ মতবাদ নেই। আর 'বিশ্বাসযোগ্য' বলা হয় তাকে, যার সবদিক দিয়ে পূর্ণ জ্ঞান ও যোগ্যতা আছে, যেন তিনি চৌদ্দশত বছর আগের আরবী ভাষায় লিখিত মূল বিষয়টি নিজে হৃদয়ঙ্গম করে বর্তমান যুগের মানুষকে অবিকলরূপে যেমনটি তেমন বুঝিয়ে হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দিতে পারেন।' আলহামদুলিল্লাহ! আমার স্নেহের (মাওলানা) গিয়াসুদ্দীন আহমদ উল্লিখিত উভয় গুণে গুণান্বিত।

প্রসঙ্গত, ছাত্রজীবন থেকেই তিনি দীনি বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। হযরত ফরিদপুরী রাহ. তাকে খুব স্নেহ করতেন এবং লেখার প্রতি উৎসাহিত করতেন। একদা একটি বিশেষ বিষয়ে কয়েকজন লেখকের মধ্যে তার লেখাই (আজাদ) পত্রিকায় ছাপা হওয়ায় হযরত খুশি হয়ে তাকে পুরস্কৃত করেন। অতএব তাফসীর গ্রন্থের অনুবাদ কর্মে তার যোগ্যতায় আমাদের আস্থা রয়েছে। আমি তাকে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দোয়ার ফসলই মনে করি।

৩

অধিকন্তু কুরআন-হাদীসের খেদমতের ব্যাপারে লেখকের তাকওয়া ও আল্লাহ-প্রেমের প্রশ্ন আসে। এ বিষয়ে আপন সন্তান সম্পর্কে খুব বেশি বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবু বলতে হয়, তিনি মরহুম হযরত হাফেজ্জী হুযুর রাহ.-এর হাতে বাইআত হন এবং আত্মসংশোধনের সুযোগ পান। তাঁর ইন্তেকালের কিছু দিন পর তাঁর সুযোগ্য খলীফা মাওলানা আবদুল হক ছাহেব গিয়াসুদ্দীন আহমদকে খেলাফত দান করেন। অতঃপর মাওলানা আবদুল হক ছাহেবই তাকে আত্মসংশোধনের পূর্ণতার উদ্দেশ্যে হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ.-এর সর্বশেষ খলীফা হযরত মাওলানা আবরারুল হক রাহ.-এর সাহচর্য অবলম্বনের পরামর্শ দেন। তিনি তাই করেন এবং হযরত রাহ.-এর হাতে তার আত্মসংশোধনের প্রক্রিয়া অল্প সময়ে প্রায় পূর্ণতায় পৌছে। তখন হযরত আবরারুল হক ছাহেব রাহ. গিয়াসুদ্দীন আহমদকে 'খেলাফতে বাইআত' প্রদান করেন।

অতএব, প্রিয় গিয়াসুদ্দীন আহমদ আল্লাহ তাআলার রহমতে সকল দিক দিয়েই উল্লিখিত কাজের যোগ্য প্রমাণিত হন। আল্লাহ তাআলা এই কাজকে কবুলিয়াতের মর্যাদা দান করুন এবং আমাদের সকলকে এর ছওয়াবের ভাগী করুন। আমীন।

অনুবাদগ্রন্থ সম্পর্কে

১

আলোচ্য 'তাফসীরে উসমানী' গ্রন্থ সম্বন্ধে একটু কথা আছে। আমি মাত্র বুখারী শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার কাজ শেষ করেছি, এমন সময় আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত হাফেজ্জী হুযুর রাহ. আমাকে কুরআনের বাংলা তাফসীরের কাজে হাত দেওয়ার কথা বললেন। কিন্তু লালবাগ জামিয়া কুরআনিয়াসহ একাধিক মাদরাসায় বুখারী শরীফের অধ্যাপনা, একই সঙ্গে বিভিন্ন নতুন মাদরাসা প্রতিষ্ঠার কাজ এবং নানাবিধ সাংসারিক ব্যস্ততা থাকায় কুরআনের তাফসীরের কাজে হাত দিতে সাহস পাইনি।

এ সবই গিয়াসুদ্দীন আহমদের জানা। তিনিই একদিন আমাকে বললেন, 'আরবী ভাষার বাগ্‌ধারার অনুসরণে কুরআনের একখানি বিশুদ্ধ বাংলা অনুবাদসহ তাফসীরগ্রন্থ রচনা করা একান্ত প্রয়োজন। আর এ কাজ আপনার হাতেই সঠিক ও যুগোপযোগী হবে। কিন্তু আমরা জানি, একনিষ্ঠভাবে এ কাজ করার সময় আপনার হবে না। তবে আপনি তো শাইখুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ.-এর বিশিষ্ট ছাত্র। তাঁর কাছেই দীর্ঘ দু'বছর বুখারী শরীফের তালীম নিয়েছেন। তাঁরই পাঠ অনুশীলনের আলোকে বুখারী শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। আপনার সেই উস্তাদেরই মকবুল ও প্রাণপ্রিয় তাফসীরগ্রন্থ 'ফাওয়ায়েদে উসমানী' মওজুদ রয়েছে। আলাদা তাফসীর রচনার তুলনায় এর বাংলা অনুবাদে আপনার সময় খুব কম লাগবে।'

কিন্তু আমি জানি, উর্দূ তরজমা দেখে বাংলা অনুবাদ করলেই কুরআনের বিশুদ্ধ অনুবাদ হবে না এবং তাতে কুরআনের হকও আদায় হবে না। বরং কুরআনের বিশুদ্ধ অনুবাদের জন্য কুরআনের কঠিনতম তরকীব (বাক্যবিন্যাস) এবং আরো বহু দিকের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি দিতে হবে। তার জন্য সময় বের করাও আমার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাই আমি তার সামনে এরও অক্ষমতার ইঙ্গিত দিলাম। তখন তিনি নাছোর হয়ে বললেন, 'আমি যদি আপনার সহকারী হিসাবে কাজ করি এবং অভিধান ও ব্যাকরণের নিয়ম মেনে উর্দূ মূলপাঠের বাংলা অনুবাদ আপনার সামনে পেশ করি, তাহলেও কি এই মহৎ কাজে সময় দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভবপর হবে না?'

তার এ কাজের প্রতি আগ্রহ দেখে আমি বললাম, 'তুমি সূরা ফাতেহার তরজমা ও তাফসীরের বাংলা অনুবাদ করে নিয়ে এসো।' আমার নির্দেশ অনুযায়ী কাজটি করে নিয়ে এলে দেখলাম, লেখাটি বিশুদ্ধ ও নিখুঁত হয়েছে। এর পর আমি তাকে কাজ শুরু করার অনুমতি দিলাম।

২

গিয়াসুদ্দীন আহমদ যখন 'ফাওয়ায়েদে উসমানী'-এর অনুবাদ শুরু করেছেন, গ্রন্থের শুরু থেকেই তিনি তরকীব বা বাক্যবিন্যাসের কাজ সমাধা করেছেন।

আয়াতের অনুবাদ করার সময় তিনি ব্যাকরণের জন্য যেসব গ্রন্থের শরণাপন্ন হয়েছেন, তার মধ্যে কাজী ছানাউল্লাহ পানিপত্তী রাহ. রচিত 'তাফসীরে মাজহারী', ব্যাকরণবিদ আবুল বাকা রাহ. রচিত 'ইরাবুল কুরআন' ও অধুনা লিখিত নয় খণ্ডে সমাপ্ত মুহিউদ্দীন দরবেশ রাহ.-এর 'ইরাবুল কুরআন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরো কিছু কিতাব থেকে উল্লিখিত বিষয়ে তিনি সাহায্য নিয়েছেন।

কুরআনুল কারীমের অভিধানের ব্যাপারে প্রখ্যাত হিন্দুস্তানী আলেম মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানীর 'লুগাতুল কুরআন' গ্রন্থখানি থেকে তিনি প্রচুর সাহায্য নিয়েছেন। আর কুরআনের বিখ্যাত আরবী অভিধান 'মুফরাদাতে ইমাম রাগেব' গ্রন্থখানি তিনি তার যৌবন বয়সেই সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করেছিলেন।

৩

মূল তরজমাকারী হযরত শাহ আবদুল কাদের রাহ.-এর তরজমার যত গুণ, সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য তাঁর উত্তরসূরী হযরত শাইখুল হিন্দ রাহ. মূল উর্দূ তরজমা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বাংলা অনুবাদক গিয়াসুদ্দীনও সেসব দিকের প্রতি খেয়াল রেখে অনুবাদ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, কালামে পাকের ক্ষেত্র বা বিষয়ের ভিন্নতায় কোন কোন শব্দের আভিধানিক মূল অর্থ ঠিক রেখে উর্দূ তরজমায় বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। ফলে কুরআনের মর্ম ও উদ্দেশ্য বুঝতে সহজ হয়েছে। বাংলা অনুবাদেও সেদিকে লক্ষ রেখে অনুবাদ করা হয়েছে। মোটকথা, মূল তরজমায় যেসব সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, বাংলা অনুবাদেও সে সবের প্রতি দৃষ্টি রেখে কাজ করা হয়েছে।

অনুবাদকের দুই যুগেরও বেশি সময়ের সাধনায় 'তাফসীরে উসমানী' বাংলা অনুবাদখানি ব্যাকরণগত, অভিধানগত ও বাগধারার দিক থেকে বাংলা ভাষায় একখানি বিশুদ্ধ ও অনুপম অনুবাদ হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন।

৪

অনুবাদখানির ভাষাগত উৎকর্ষ সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, অনুবাদক গিয়াসুদ্দীন আহমদ সর্বদা প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ড. কাজী দীন মুহম্মদ ছাহেবের সাহায্য পেয়েছেন। কয়েক পারা তিনি নিজে সম্পাদনা করে অনুবাদকের সমস্ত পুস্তক সুন্দর, সাবলীল বরং নিখুঁত করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। অনুবাদক সে অনুসারে কাজ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এতে আশা করা যায়, সমগ্র গ্রন্থের প্রকাশভঙ্গি বাংলা বাগধারার মোতাবেক হয়েছে। আমার পরম বন্ধু ড. কাজী দীন মুহম্মদ ছাহেবের আরবী শিক্ষার কথা অনেকেই জানেন না। আমার মনে হয়, এতটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ইসলামী একাডেমী, বর্তমান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের 'আল-কুরআনুল কারীম' বাংলা অনুবাদ গ্রন্থখানিতে তাঁর অবদানই সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। আরবী ভাষার সমার্থক বাংলা শব্দাবলী চয়নে ও নির্বাচনে তাঁর জুড়ি মেলা অসম্ভব। তিনি কুরআনের অনুবাদে পূর্বসূরী বিজ্ঞ আলেমদের তাফসীর ও প্রামাণ্য আরবী

অভিধান অনুসরণ করে বাংলা অনুবাদ করেছেন। এতে কুরআনের সঠিক অর্থ, মর্ম ও তাৎপর্য প্রকাশে তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর তা এজন্য যে, তিনি তো প্রাথমিক জীবনে মাদরাসায়ও অধ্যয়ন করেছেন এবং আরবী ও উর্দূ ভাষায় পারদর্শী হয়েছেন। 'তাফসীরে উসমানী' গ্রন্থখানির কাজে এমন একজন বিরল প্রতিভা ও যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তিত্বের সহায়তা পাওয়া দুর্লভ সৌভাগ্য ছাড়া আর কী হতে পারে! আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ কাজের অফুরন্ত ছওয়াবের দ্বারা পুরস্কৃত করুন! আমীন!

আজিজুল হক
৩০/০৫/০৯
(শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রাহ.)

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

দামাত বারাকাতুহুম এর বিস্তারিত ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين لا نبي بعده، أسأل ربي أن يصلي عليه وعلى آله الطيبين ويسلم تسليماً كثيراً كثيراً، ورضي الله عن صحابته الكرام أجمعين، رضاً لا سخط بعده، أما بعد!

এই অধমকে কখনো কখনো এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যে, তা কি পরীক্ষা না সৌভাগ্য, তা বোঝাই কঠিন হয়ে যায়। হয়তো অন্যদেরও এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে একবার এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। উস্তাযে মুহতারাম তোহফায়ে রব্বানী হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের তাওযীহুল কুরআনের বাংলা তরজমার শুরুতে আমাকে ভূমিকা লেখার জন্য হুকুম করা হয়েছিল। আর আজ তার চেয়ে আরও অনেক মুশকিল পরিস্থিতি সামনে এল, যখন আমাকে শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ. এর তাফসীর 'তাফসীরে উসমানী'র বাংলা তরজমার শুরুতে ভূমিকা লেখার জন্য বলা হয়!!

তাফসীরে উসমানীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কিছু বৈশিষ্ট্য

তাফসীরে উসমানীকে আমরা তালেবে ইলমীর যমানায় 'ফাওয়ায়েদে উসমানী' বলতাম। শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (১২৬৮-১৩৩৯ হি.) রাহ. এর উর্দূ তরজমার টীকায় হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ. (১৩০৫-১৩৬৯ হি.) তাফসীরী ফাওয়ায়েদ লিখেছিলেন। প্রত্যেক টীকার শুরুতে টীকার নাম্বার (ف) হরফের উপরে লেখা হয়েছে। এই (ف) মূলত فائدة এর সংক্ষিপ্তরূপ। আমাদের উস্তায (আমার মুহতারাম মামাজান) হযরত মাওলানা সাইফুল্লাহ ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম আমাদেরকে তরজমায়ে কুরআন (প্রথম পনেরো পারা) পড়ানোর সময় 'ফাওয়ায়েদে উসমানী' সামনে রাখতেন। ঐ সময় আমাদের উস্তায হযরত মাওলানা নূরুযযামান রাহ. (১৪১৫হি.) এর নুসখা থেকে এই অধম ফাওয়ায়েদে উসমানী মুতালা করতাম। তখন এই বুঝটুকুও ছিল না

যে, এর জন্য তার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া উচিত। এই বুঝও ছিল না যে, অন্যের কিতাব মুতালা করার সময় তার মুতালার চিহ্ন সরানো উচিত নয়।

মোটকথা, তালেবে ইলমীর যমানায় আমরা আসাতেযায়ে কেরামকে দেখেছি, তাঁরা এই তাফসীর গুরুত্বের সাথে মুতালা করতেন। আমার আব্বাজানের টেবিলেও এই তাফসীর রাখা থাকত। সেই সময় জানতে পেরেছিলাম, এই তাফসীরে আয়াতের তরজমা পুরোটাই হযরত শাইখুল হিন্দ রাহ. এর। এই তরজমা ছিল মূলত শাহ আবদুল কাদের রাহ. এর উর্দূ তরজমা 'মূযিহে কুরআনের' নতুনতর উপস্থাপন। আর সূরা ফাতেহা, সূরা বাকারা এবং সূরা নিসার তাফসীরী ফাওয়ায়েদও খোদ হযরত শাইখুল হিন্দ রাহ. কর্তৃক লিখিত। অবশিষ্ট সূরাগুলির তাফসীরী ফাওয়ায়েদ হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ. লিখেছেন। আর এ কথা পরবর্তীতে জেনেছি যে, শাইখুল হিন্দ রাহ. তাঁর এই তরজমা ও তাফসীরের কাজের পরিচিতি এবং তরজমা ও তাফসীরের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বিষয় লক্ষ রাখবেন তার আলোচনা করে একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন। এই ভূমিকার সংক্ষিপ্ত একটি খোলাসা উর্দূ তাফসীরে উসমানীর কোনো কোনো এডিশনে ছাপা হয়েছে। পূর্ণ ভূমিকা আলাদাভাবে ছেপেছিল। কিন্তু তা দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল। সাধারণত তা পাওয়া যেত না। হযরত মাওলানা নূরুল হাসান রাশেদ কান্ধলভী ছাহেব আবার তা পুস্তিকা আকারে ছাপার ব্যবস্থা করে সবার সামনে নিয়ে আসেন এবং তার শুরুতে একটি মূল্যবান ভূমিকা লেখেন।

যখন বড় ভাইজান হযরত মাওলানা মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ছাহেবের চেষ্টা ও বিশেষ সহযোগিতায় মুহতারাম আব্বাজান রাহ. এবং আম্মাজান এই অধমকে জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বিন্নুরী টাউনে পাঠান এবং সেখানে হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী রাহ. এর কিতাব ইয়াতীমাতুল বয়ান মুতালা করার তাওফীক হয়, তখন বিন্নুরী রাহ. এর এই কথা পেলাম–

ومن أراد حل نظم القرآن الكريم في لغة أردوية هندوستانية، بأبدع أسلوب وأفصح تعبير في أقصر وقت، فعليه بمطالعة الفوائد التفسيرية على القرآن، لشيخ مشايخنا شيخ العصر العارف مولانا محمود حسن الديوبندي المتوفى سنة ١٣٣٩هالمدعو بشيخ الهند رحمه الله تعالى، ومحقق العصر الحاضر شيخنا ومولانا شبير أحمد العثماني، أطال الله بقاءه وأوفر للأمة رواءه. فإنهما أتيا فيها بالعجب العجاب في حل نظم الكتاب وإفصاح غرض التنزيل بكلمات كلها درر ذات بهاء وغرر ذات سناء، وربما لا تحل عقدة من تصفح هذه المجلدات الكبيرة وتفقد هذه المادة الزاخرة، وتراها قد حلت فيها بأخصر عبارة أو ألطف إشارة، فشكر الله مسعاهما الجميل، وهي مما لا يستغني عنها الفضلاء بحال، فضلا عن طلبة العلم في عهد التحصيل، فإنه ليس في العربية في كتب التفاسير المطبوعة التي بأيدينا ما يخلفها أو ينوب منابها أو يعتاض عنها، لا أقول: إنها غنية عن مراجعة تفاسير القوم، بل أقول: كما أنها ليست غنية عنها، كذلك التفاسير ليست غنية عنها

মর্ম : কেউ যদি উর্দূ ভাষায় স্বল্প সময়ে কুরআন মাজীদ বুঝতে চায়, তাহলে তার উচিত আমাদের মাশাইখদের শাইখ আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রাহ. এবং আমাদের শাইখ মুহাক্কিকুল আসর হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘ হায়াত দান করুন) কর্তৃক রচিত তাফসীরী ফাওয়ায়েদ মুতালা করা। কুরআন মাজীদের অর্থ ও মর্ম উদঘাটনে এই তাফসীর অত্যন্ত উপকারী। এর ভাষার মানও অত্যন্ত উঁচু। সুসংক্ষিপ্ত শব্দ-বাক্যে বিপুল পরিমাণ মর্ম এতে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে। কখনো দেখা যায়, বিশাল বিশাল গ্রন্থ পড়ে এবং বিপুল পরিমাণ ঘাঁটাঘাঁটি করেও যে বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে না, এই তাফসীরে ছোট্ট একটি বাক্যে কিংবা সামান্য একটি ইঙ্গিতে তা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তালেবে ইলমগণ তো বটেই, বড় ও বিশেষ লোকদেরও এই তাফসীর না খুলে থাকার উপায় নেই। কারণ, যত আরবী তাফসীর আমাদের সামনে ছেপে এসেছে তার কোনোটাই এই তাফসীরের পরিপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে না এবং সেসব দ্বারা এর স্থান পূরণ হয় না, আর না সেগুলি এই তাফসীরের বিকল্প হতে পারে। আমি বলব না যে, এই তাফসীর আমাদেরকে অন্য সকল তাফসীর থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। বরং আমি বলব, যেমনিভাবে এই তাফসীর অন্যান্য তাফসীরগ্রন্থ থেকে অমুখাপেক্ষী নয় তেমনি অন্যান্য তাফসীরগ্রন্থও এই তাফসীর থেকে অমুখাপেক্ষী নয়। –ইয়াতীমাতুল বয়ান, মুকাদ্দিমা মুশকিলাতুল কুরআন, পৃষ্ঠা: ৪০-৪১ (মাজমূআতু রসাইলিল কাশ্মীরী, খণ্ড ৪)

বিন্নুরী টাউনে থাকাকালীন সময়েই বেরাদারে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন মাসুম যিদা মাজদুহুমের কাছ থেকে শুনেছিলাম, শাইখুল মাশাইখ হযরত মাওলানা নূর হুসাইন কাসেমী ছাহেব রাহ. ইহতিমামের সঙ্গে এই তাফসীর মুতালা করার প্রতি তাকিদ করতেন এবং বলতেন, এই তাফসীর এত মুতালা করো যে, যদি পুরোটা হিফয নাও হয় তবু অন্তত এর অধিকাংশ বাক্য যেন আত্মস্থ হয়ে যায় এবং যবানে জারি হয়ে যায়।

পরবর্তীতে রাহবারে উম্মত হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ. এর লেখা পড়ারও সুযোগ হয়। হযরত লিখেছেন, "যখন দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় তরজমায়ে কুরআন এবং তাফসীরের খিদমত অর্পিত হয়, তখন হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ. এর তাফসীরের কদর (মূল্য) বুঝে আসে। এতে তিনি মুফাসসিরগণের বক্তব্যসমূহের সারাংশ এবং তাঁদের তাহকীক ও গবেষণার সেই অংশ উল্লেখ করে দিয়েছেন, যা বর্তমান যুগের সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন মানসিকতার লোক অনায়াসে গ্রহণ করে নিতে পারে। এতে মাওলানার চিন্তার সুস্থতা, উত্তম নির্বাচন ও লেখার প্রাঞ্জলতা একদম স্পষ্ট। আমি দেওবন্দের এক সাক্ষাতে মাওলানার নিকট আমার এই অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলাম। মাওলানা অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন এবং তাঁর কোনো কোনো সঙ্গীকে আমার অনুভূতির কথা শুনিয়েছিলেন।" (মেরী ইলমী ওয়া মুতালাআতী যিন্দেগী, পৃষ্ঠা ২৪, প্রকাশক : সাইয়েদ আহমদ শহীদ একাডেমী)।

কিতাবটির অনুবাদ

মোটকথা, বান্দা ছোটকাল থেকে এই তাফসীরের প্রতি অনুরক্ত ছিলাম। আর সেই অনুরাগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে একটি সত্য কথা হল, এই তাফসীরকে আমি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার মত গ্রন্থ মনে করতাম না। আমি এটিকে শুধু আলেম ও তালেবে ইলমের অধ্যয়নযোগ্য কিতাবই মনে করতাম। হ্যাঁ, উর্দূভাষা জানেন– এমন যে সকল লোক নিয়মমাফিক আলেম না হয়েও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় উলামা-মাশাইখের সোহবত গ্রহণ করেছেন, জরুরিয়াতে দীনের নির্ভরযোগ্য ও পরিচ্ছন্ন ইলম তরিকা মত হাসিল করেছেন এবং এতটুকু দীনি সমঝ-বুঝ হাসিল করেছেন যে, ইলমী পরিভাষা ও বাক্রীতির সঙ্গে তাদের মোটামুটি পরিচয় হয়ে গেছে— তারাও এই তাফসীর থেকে একটা পর্যায়ের ফায়দা হাসিল করতে পারবেন। সম্ভবত এই দৃষ্টিকোণ থেকেই (অর্থাৎ বাংলাভাষীদের মধ্যে যারা এই দুই বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন, তারাও যেন এর অনুবাদ থেকে কিছু না কিছু ফায়দা লাভ করতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে) এটিকে বাংলায় অনুবাদ করার কথা চিন্তা করা হয়েছে।

১৪১৮ হি. কিংবা ১৪১৯ হিজরীতে শুনতে পেয়েছিলাম, হযরত মাওলানা প্রফেসর গিয়াসুদ্দীন আহমদ ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এই কিতাবের তরজমা করেছেন। এখন তিনি তা বারবার সম্পাদনা করছেন।[১]

কিছুদিন পর আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে চার খণ্ডে প্রকাশিত বাংলা তাফসীরে উসমানী পাই, যার অনুবাদক হলেন হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম। তিনি শুধু প্রথম পনেরো পারার অনুবাদ করেছেন। দ্বিতীয় পনেরো পারার অনুবাদ অন্য কেউ করেছেন। কিন্তু প্রকাশক পুরো তাফসীরের অনুবাদক হিসেবে মাওলানা আবুল বাশার ছাহেবের নাম লিখে দেন, যা অবাস্তব। এভাবে একজনের কাজ আরেকজনের দিকে সম্পৃক্ত করে দেওয়া ভুল এবং আমানতের খেলাফ। আর এখানে তো কাজটা আরো বেশি আপত্তিকর; কারণ শেষ দুই খণ্ডের তরজমার মান অত উন্নত নয়। প্রথম দুই খণ্ডের সঙ্গে তার কোনো তুলনা চলে না।

যাহোক, ফাউন্ডেশনের এই তরজমার কথা হযরত মাওলানা গিয়াসুদ্দীন ছাহেবের জানা ছিল না। আর তিনি কাজ শুরুও করেছিলেন সবার আগে। তাই তিনি তরজমা ও সম্পাদনার কাজ অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে অব্যাহত রেখেছিলেন, যার বিস্তারিত বিবরণ তিনি তার ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

---

১. খুব সম্ভব বিষয়টি আমি মাওলানা হুসাইন বিন গিয়াসের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম। তাছাড়া এই অনুবাদটির কম্পোজের কাজ সর্বপ্রথম শুরু করেছিলেন বেরাদারে মুহতারাম মাওলানা মুতীউর রহমান ছাহেব। তিনি মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকার প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্বশীল। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তার এই মেহনতকে কবুল করুন। আমীন।

অনুবাদক সম্পর্কে

মুহতারাম অনুবাদক (যীদা মাজদুহুম) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, তিনি একদিকে তো 'মাওলানা', আবার অন্যদিকে প্রফেসরও। দীর্ঘদিন তিনি মিরপুর বাঙলা কলেজে ইংরেজির প্রফেসর ছিলেন। তার জীবনের সূচনা হয়েছিল দীনি শিক্ষার মাধ্যমে। জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগে হেদায়া আউওয়ালাইন পর্যন্ত পড়েন। এরপর কোনো প্রেক্ষাপটে আপন উস্তাযগণের অনুমতিতে সাধারণ শিক্ষার দিকে অগ্রসর হন। তবে নতুন পরিবেশে এসে তিনি 'প্রভাব গ্রহণকারী' না হয়ে সর্বদা 'প্রভাব বিস্তারকারী'ই ছিলেন এবং সফলতার সঙ্গে ইংরেজিতে মাস্টার্স সম্পন্ন করেছিলেন। এরপর দীর্ঘসময় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইংরেজির প্রফেসর ছিলেন। তন্মধ্যে মিরপুর বাঙলা কলেজ উল্লেখযোগ্য।

কোনো কারণে যদিও তিনি মাদরাসা থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার অন্তর ছিল মাদরাসায়। তিনি তার আসাতিযায়ে কেরাম (যারা সে সময়ে ইলমে, আমলে ও দীনের খিদমতে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন)– তাঁদের সঙ্গে যথাযথভাবে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। এই সুসম্পর্কেরই সুফল যে, তিনি তার অবশিষ্ট দীনি শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছিলেন। তিনি তার বন্ধু হযরত মাওলানা আব্দুল হাই বরিশালীর সঙ্গে বিভিন্ন ফনের পঠিত কিতাবগুলো তাকরারও করেন এবং অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ মুযাকারাও করেন। এরপর মেশকাত, তিরমিযী ও বুখারী তিন বছরে দরসে শরিক হয়ে তৎকালীন জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগের বড় বড় শাইখের নিকট সরাসরি অধ্যয়ন করেন।

বড়দের থেকে, বরং বয়সে ছোটদের থেকেও ইলমী ইসতিফাদা করতে থাকা তার সাধারণ অভ্যাস। অথচ তিনি আমাদের কয়েকজন আকাবিরের সোহবত লাভ করেছেন; সেই সঙ্গে তিনি হযরত হাফেজ্জী হুজুর রাহ.-এর খুবই প্রিয় শাগরিদ এবং হযরত হারদুয়ী রাহ.-এর মুজাযও।

দরসে নেযামীর কিতাবাদি পড়ার সুবাদে এবং তৎকালীন জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগের পরিবেশের প্রভাবে উর্দূ ভাষার সঙ্গেও তার ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি 'আশরাফুস সাওয়ানেহ'সহ বিভিন্ন উর্দূ কিতাবের তরজমাও করেছেন। আর তাফসীরে উসমানীর তরজমার পেছনে তো তিনি মাশাআল্লাহ জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উভয় জাহানে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

এই অনুবাদের নিরীক্ষণ ও সম্পাদনা

অনুবাদক ছাহেব সতর্কতাবশত অন্যদের মাধ্যমেও তার অনুবাদের সম্পাদনা করিয়েছেন। প্রথমে কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহের তরজমা সম্পাদনা করেছেন অনুবাদকের ছোট ছাহেবযাদা মুতকিন ও মুতাফান্নিন আলেম বেরাদারে আযীয ও যামীলে মুহতারাম মাওলানা সাঈদ আহমদ। তিনি তার সাধ্য মোতাবেক অত্যন্ত সুচারুরূপে এই কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। তার ইলম, ফাহাম ও বসীরতের প্রতি অধমের আস্থা রয়েছে। আর তার উদ্যম ও কর্মস্পৃহা দেখে অধম অনেক খুশি হই।

এদিকে সংক্ষিপ্ত তাফসীরে উসমানী (যা পূর্ণাঙ্গ তাফসীরে হুবহু অন্তর্ভুক্ত)–এর পুনর্নিরীক্ষণ ও সম্পাদনা করেছেন মাজমাউল মাহাসিন বেরাদারে আযীয মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আব্দুল্লাহ। মাশাআল্লাহ তার কাজে তার বোধ ও বুদ্ধির স্বচ্ছতা এবং চিন্তার পরিপক্বতা ফুটে ওঠে। সাধারণত তার কাজ যবত ও ইতকান এবং সার্বিকতা ও গভীরতার বিচারে অনন্য হয়। তার কাজের প্রতি এবং কারো কাজ তিনি সম্পাদনা করে দিলে সেটির প্রতি অধমের আস্থা হয়। আল্লাহ তাআলা এই দুজনকে এবং আমাদের অন্যান্য শাগরিদকে আপন হেফাজতে রাখুন এবং তাদেরকে ইলমী ও আমলী উন্নতি দান করুন। প্রত্যেককে দীনের মুখলিস, মুতকিন ও নাশীত খাদেম বানিয়ে দিন। বান্দা এই দোয়া ইলমে ওহীর সকল তালেবে সাদেকের জন্যই করি।

সংক্ষিপ্ত তাফসীরে উসমানী প্রকাশের পর যখন পূর্ণ তাফসীরে উসমানী ছাপার নিয়ত করা হল, তখন অধমই অনুবাদক ছাবেহকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, এতে হযরত মাওলানা আবুল বাশার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের নযরে ছানী হয়ে যাওয়া উচিত। সে মত হযরত মাওলানা আবুল বাশার ছাহেব অনুবাদক ছাহেবের অনুরোধে পুরো তাফসীরের বাংলা তরজমা একবার দেখে দিয়েছেন। হযরত মাওলানা আবুল বাশার ছাহেবের মাকাম সম্পর্কে সবাই অবগত। তাঁর কৃত 'তাওযীহুল কুরআনে'র বাংলা অনুবাদ থেকে অন্যান্য পাঠকের সঙ্গে আমরাও সাআদাতমন্দির সঙ্গে উপকৃত হচ্ছি।

মাওলানা সাঈদ আহমদকে আল্লাহ তাআলা জাযায়ে খায়ের দান করুন। তিনি এই প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেছেন যে, একবার বাংলা তরজমার নিরীক্ষণ মূল উর্দূর সঙ্গে মিলিয়েও হওয়া উচিত। সেজন্য তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও একাগ্রতার সঙ্গে এই খেদমতও আঞ্জাম দিয়েছেন। সত্য কথা হল, আমিও অন্তরে এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলাম। আল্লাহ তাআলার শোকর, মাওলানা সাঈদ এই খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। এতে মাশাআল্লাহ কাজ আরো নিখুঁত হয়েছে এবং পাঠকের পক্ষে কিতাবের অর্থ বোঝা আরো সহজ হয়ে গেছে। মাওলানা সাঈদ আহমদ নিরীক্ষণের সময় এটাও খেয়াল রেখেছেন যে, আয়াতের তরজমায় উর্দূ অনুবাদের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের পরিবর্তে বাংলায় আয়াতের অর্থ-মর্ম প্রকাশের প্রতি যেন বেশি জোর থাকে।

এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ করে দেওয়া মুনাসিব মনে হচ্ছে। তা এই যে, এই কিতাবের খিদমতে মাওলানা সাঈদ আহমদের যুক্ত হওয়ার পেছনে একটি পূর্ব যোগসূত্র রয়েছে। তার নানাজান শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আজিজুল হক ছাহেব রাহ. তাফসীরে উসমানীর সংকলক আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানীর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। তাঁর উলূম ও মাআরিফের সংকলন, সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারে শাইখুল হাদীস রাহ. এর বিশেষ অবদান ছিল। 'ফযলুল বারী' তাঁরই মেহনতের ফসল। তালেবে ইলমীর যমানাতেই কুরআন ও কুরআন বোঝার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁর তালেবে ইলমীর যমানায় তরজমাতু মাআনিল কুরআনিল কারীম নেসাবের অন্তভুর্ক্ত ছিল না। কিন্তু তিনি নিজে এর

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। তাই প্রস্তুতি গ্রহণ করে এক সাথীর সঙ্গে তরজমা তাকরার করতেন[২]। এরপর তাঁকে আল্লাহ তাআলা অন্যান্য আসাতেযায়ে কেরামের সোহবতের সঙ্গে হযরত সদর ছাহেব রাহ. ও হযরত শাইখুল ইসলাম আল্লামা উসমানী রাহ.-এর মত আকাবিরের সোহবত লাভের তাওফীক দান করেছেন, যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা ফাহমে কুরআনের বিরাট অংশ দান করেছিলেন।

মাওলানা সাঈদ আহমদকে আল্লাহ তাআলা প্রথমে 'ফযলুল বারী'র খিদমতে যুক্ত করেছেন। আর এখন তাফসীরে উসমানীর সঙ্গেও যুক্ত করেছেন। এটি অনেক বড় সৌভাগ্য এবং অনেক বড় নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা তাকে কবুল করুন এবং তাকে তাঁর খাস নেয়ামতসমূহ দান করুন। আমীন।

সারকথা, এই অনূদিত তাফসীরের পেছনে আলহামদুলিল্লাহ অনেক মেহনত হয়েছে। তবে এতসব সতর্কতা ও মেহনত সত্ত্বেও তলাবায়ে কেরাম ও যাদের উর্দূ ভাষাজ্ঞান আছে তাদের বলব, তারা বাংলা তাফসীরের পাশাপাশি মূল উর্দূ তাফসীরও অবশ্যই মুতালা করবেন। এতে তারা মূল থেকে অধ্যয়নের যে ভালো দিকগুলো আছে তা তো লাভ করবেনই; সেই সাথে আরো অধিক তৃপ্তিও লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ।

কুরআন বোঝা ও তা অনুধাবনের জন্য করণীয় বিষয়ে কয়েকটি কথা

তাফসীরের কিতাবাদি অধ্যয়ন বিষয়ে কিছু মৌলিক কথা মাসিক আলকাউসারের বিশেষ সংখ্যায় (কুরআনুল কারীম সংখ্যায়) আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তলাবায়ে কেরাম যদি আদীব হুযুর দামাত বারাকাতুহুম, মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব ও মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ ছাহেবের প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকার পড়েন, তাহলে ফায়দা হবে। কেউ যদি অধমের 'কুরআনুল কারীম: হেদায়েত গ্রহণ ও দলীল উপস্থাপন– কিছু নিবেদন' লেখাটিও পড়েন, তাহলে তা অধমের সৌভাগ্য। সাধারণ পাঠক এবং জেনারেল শিক্ষিত ভাইদের জন্য কিছু

---

২. আরবী ভাষার সঙ্গে জরুরী সম্পর্ক ও কুরআনী যিন্দেগী (অন্য ভাষায় ঈমানী যিন্দেগী) শিখে নেওয়ার পর অন্যান্য উলূম ও ফুনূনে প্রবেশের আগেই তরজমাতু মাআনিল কুরআনিল কারীমের দরস হাসিল করা উচিত। এ বিষয়ে হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ. গুরুত্বারোপ করেছেন। আল্লাহ তাআলার শোকর, এর প্রচলন হয়ে গেছে। দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা ও দারুল উলূম দেওবন্দে এ বিষয়টি নেসাবের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরপর উপমহাদেশের অন্যান্য মাদরাসাতেও।

কিন্তু এ বিষয়ের জন্য কোনো বিশেষ নেসাবী কিতাব ছিল না। আল্লাহ তাআলা জাযায়ে খায়ের দান করুন হযরত মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ দামাত বারাকাতুহুমকে। তিনি الطريق إلى القرآن الكريم নামে চার খণ্ডের কিতাব রচনা করে আহলে মাদারেস ও মাদারেসের তলাবার প্রতি বড় ইহসান করেছেন। তাঁর الطريق إلى العربية ও এই কিতাবটি পঞ্চদশ (হিযরী) শতাব্দীর তাজদীদী কিতাবসমূহের শীর্ষে। তাঁর কিতাব الطريق إلى تفسير القرآن الكريم ও (৩ খণ্ডে প্রকাশিত) অনেক বড় কীর্তি। বিশেষত এর 'তাওযীহুল মা'না' শিরোনামটি তালিবে ইলমদের জন্য অনেক উপকারী।

(بارك الله تعالى في حياته وجهوده وجميع مشاريعه، وكتب له الستر والسلامة والعفو والعافية.)

জরুরী কথা মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ ছাহেবের 'কুরআন বোঝার চেষ্টা: আমাদের করণীয়' লেখায় এবং মাওলানা যাকারিয়া আবদুল্লাহ ছাহেবের 'কুরআনে কারীমের তরজমা-তাফসীর পাঠ ও তাদাব্বুর প্রসঙ্গ' (মাসিক আলকাউসার, মার্চ-এপ্রিল ২০২২ ঈ.) প্রবন্ধে রয়েছে। আরো কিছু কথা তাওযীহুল কুরআনের শুরুতে বান্দার ভূমিকায় আছে।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ. এর পুস্তিকা 'মুতালাআয়ে কুরআন কে উসূল ওয়া মাবাদী'— بقامت کہتر بقیمت بہتر 'কলেবরে সংক্ষিপ্ত, মূল্যের বিচারে অমূল্য' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে এর শেষে ایک تجربہ ایک مشورہ শিরোনামের অধীনে যে কথা বলা হয়েছে, সেটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। আর এ বিষয়ে মাওলানা আবদুল বারী নদভী রাহ. এর যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, সেটা আরো ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। তালিবে ইলমদের জন্য করণীয় কী, তা হযরত রাহ. এর বিভিন্ন 'ইফাদাত' সংকলন قرآنی افادات ('কুরআনী ইফাদাত') এবং میری علمی و مطالعاتی زندگی ('মেরী ইলমী ওয়া মুতালাআতী যিন্দেগী') কিতাবদ্বয়ে উল্লেখিত হয়েছে। সেখান থেকে দুটি কথা এখানে উল্লেখ করছি:

"... এরপর যখন আমার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত হল, তখন আমার মাঝে কুরআন মাজীদ (স্বতন্ত্রভাবে) মুতালার আগ্রহ তৈরি হয়। এ বিষয়ে মাদরাসার নেসাবে যে সমস্ত কিতাব পড়ানো হত, তারচে বেশি কিতাব নিজে অধ্যয়ন করি। তারপর লাহোরে গিয়ে মাওলানা আহমদ আলী (লাহোরী) রাহ. এর নিকট সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ি। এখানেও যে বিষয়টি আমাকে প্রভাবিত করেছে, সেটি হল তাঁর কুরআনী যিন্দেগী, যাকে বলা হয় 'কুরআনে নাতেক' (জীবন্ত কুরআন)। এর দ্বারা হৃদয়-মনে আলো অনুভূত হত। মাওলানার যুহদপূর্ণ যিন্দেগী, দরবেশসুলভ চাল-চলন ও সুন্নতের উপর আমলের এমন প্রভাব আমার উপর পড়ে, যাকে 'বরকত' শব্দে ব্যক্ত করা যায়।

কিছু দিন আমি দারুল উলূম দেওবন্দেও থাকি। আমি হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহ.-এর কাছে এ মর্মে সময় চাই যে, বিশেষ বিশেষ আয়াত, যেগুলো বুঝার ক্ষেত্রে আমার মনে প্রশ্ন জাগে এবং সাধারণ তাফসীরের কিতাবাদি দেখে যা সমাধান করা যায় না– সেগুলো আমি আপনার সামনে পেশ করব। মাওলানা মাদানী রাহ. অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের আলেম ছিলেন। অন্যান্য উলূম, ফুনূন ও হাদীস ছাড়াও কুরআন মাজীদের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কুরআনের রঙ তার জীবন, মেযাজ ও রুচি-প্রকৃতির উপর ছেয়ে গিয়েছিল। তিনি আমাকে জুমার দিন সময় দিলেন। আমার মনে আছে, সেই আয়াতগুলো নির্বাচন করে নিয়েছিলাম, যেগুলোর সমাধান হচ্ছিল না। হযরতের সফর থাকত অনেক, আর সময়টা ছিল আন্দোলনের। এরপরও আমার উপকৃত হওয়ার কিছু সুযোগ হয়েছিল।" (কুরআনী ইফাদাত, পৃষ্ঠা ৩০)

হযরত মাওলানা আলী মিয়া রাহ. আরও লেখেন :

"কুরআন মাজীদ থেকে নিজের অংশ নেওয়ার জন্য (জরুরী ইলম ও ভাষাজ্ঞান অর্জনের পর) দুইটি জিনিস সবচেয়ে বেশি উপকারী:

প্রথম বিষয় হল, নববী ইলম এবং নববী মেযাজ ও রুচি-প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন– এমন ব্যক্তিদের সোহবত গ্রহণ। অর্থাৎ যাদের চাল-চলন ও জীবনাচার كان خلقه القرآن এর প্রতিচ্ছবি। এ সকল ব্যক্তিদের ইলমের সজীবতা ও পরিচ্ছন্নতা এবং জ্ঞানের প্রশস্ততা ও গভীরতার দ্বারা কুরআন মাজীদের শব্দসমূহের ব্যাপকতা ও গভীরতার বিষয়ে কিছুটা ধারণা লাভ হয়...

দ্বিতীয় বিষয় হল, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম যেসব পথে চলেন, সেসব পথ অবলম্বন করা। (সেসব পথ হল– দাওয়াত, কুরআনের তালীম, দীন ও শরীয়তের তালীম, তাযকিয়া-তরবিয়ত, ওয়াজ-ইরশাদ, (جدال بالتی ہی احسن) জিদাল বিল্লাতি হিয়া আহসান, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং তাবলীগসহ দীনের অন্যান্য খেদমত। এই সবগুলোই আল্লাহর রাস্তা এবং সবগুলোই নবীওয়ালা কাজ)। এর দ্বারা কুরআন মাজীদ বোঝার পথ খুলে যায়। কুরআন মাজীদে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের যে সকল হালত বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো অনুভব করা যায়। বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের নবীগণকে যে জওয়াব দিয়েছে, কানে সেই আওয়াজ শ্রবণ করা যায় এবং চোখে সেই দৃশ্য অবলোকন করা যায়। (মোট কথা, এর দ্বারা কুরআনের বাণীসমূহের বাস্তব প্রয়োগ স্পষ্ট হয়, ঈমান তাজা হয় এবং আলেমের ইলম মজবুত হয়)। কুরআন মাজীদ শেখার এই দুই পন্থা হল স্বভাবজাত পন্থা।" –(মেরী ইলমী ওয়া মুতালাআতী যিন্দেগী, পৃষ্ঠা: ৩১)

আর বুযুর্গগণ এ বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, কুরআন মাজীদের মিষ্টতা এবং তা থেকে ঈমানী সজীবতা লাভের জন্য তারতীল ও তাদাব্বুরের সঙ্গে অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করতে হবে। একেক আয়াত বারবার তিলাওয়াত করতে হবে। কুরআন মাজীদের মাঝে নিজের ব্যক্তিগত দুর্বলতাসমূহের চিকিৎসা ও ঔষধ খুঁজতে হবে। অতঃপর তা গ্রহণ করতে হবে। কুরআন মাজীদে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে খুঁজে পেতে পারে। কুরআন নেককার ও বদকার, আল্লাহমুখী ও আল্লাহবিমুখ, মুত্তাকী ও অপরাধী এবং মুমিন ও কাফের– প্রত্যেকের অবস্থা, মান-মর্যাদা ও পরিণাম বর্ণনা করে দিয়েছে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, সে চিন্তা-ভাবনা করে খুঁজে দেখবে– তার আমল ও জীবন কোন শ্রেণির সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কুরআনে কারীমের মিষ্টতা লাভের তাওফীক দান করুন। কুরআন যেন আমাদের রাহবার হয় এবং আল্লাহ তাআলার রহমত ও কুদরতে তা যেন আমাদেরকে মঞ্জিলে মাকসুদ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আমীন।

আরযগুজার

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

২ রজব ১৪৪২ হিজরী

সোমবার

প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ রাহ.-এর অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১. অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদের দীনি শিক্ষা-দীক্ষা :

অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন আহমদ আমার নিকট একটি প্রিয় নাম। আমার অন্তরে এর প্রধান যে কারণ, তা হচ্ছে, ইংরেজির অধ্যাপক হিসাবে সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি ইংরেজি বিষয়ে কোচিং করে মাসে কমপক্ষে লাখো টাকা কামাই করতে পারতেন। কিন্তু সে পথে না গিয়ে কুরআন-হাদীসের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হওয়ায় ক্রমে তিনি আমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠলেন। আমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় বছর দশেক আগে। কুরআন-হাদীসের অর্থ প্রকাশে সুন্দর, প্রাঞ্জল ও আদর্শ চলিত রীতির অনুশীলন আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি আমার কাছে প্রথমে আসেন।

অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীনের আরবী ও বাংলা ভাষার শিক্ষাগত যোগ্যতা উপলব্ধি করে আমি বুঝেছি যে, তিনি বাংলায় কুরআনের যে বিশুদ্ধ একখানি অনুবাদগ্রন্থ বের করতে যাচ্ছেন, তা তাঁর দ্বারা সম্ভব। তিনি মাদ্রাসার শিক্ষা ধারায় এ দেশের সব চেয়ে বড় শিক্ষাবিদ উস্তাদদের প্রিয় ছাত্র। তাঁর এ ধারার সেই শিক্ষকগণ হচ্ছেন মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রাহ., মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রাহ., তাফসীরকার মাওলানা দীন মুহম্মদ খান রাহ., মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ (মুহাদ্দিছ ছাহেব) রাহ., শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক রাহ., মাওলানা সালাহুদ্দীন রাহ. প্রমুখ। তিনি লালবাগ মাদ্রাসায় তাঁদের নিকট জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময় তালীম ও তরবিয়ত পান এবং হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ.-এর ভাগনে বিশ্ববরেণ্য আলেম মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী রাহ.-এর শিষ্যত্বও লাভ করেন। প্রাচ্যের গৌরব শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী রাহ.-এর অমর গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' ও প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ মরমী কবি হযরত মাওলানা রুমী রাহ.-এর অমরগ্রন্থ 'মছনবী শরীফ' পড়ানোর সময় তাঁর ক্লাসে বসারও সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন।

এ আলেমদের কাছে ইসলামী শিক্ষা ধারার উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করার সাথে সাথে তাঁদের কাছে রুহানী ফয়েয ও বরকত লাভেও তিনি ধন্য। আজীবন সাধনায় তিনি যে মহান কাজ করেছেন, সেই পথে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাহচর্য, নেক নজর ও শিক্ষা-দীক্ষা তাঁর সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দিয়েছিল। শিক্ষকতার শেষের দিকে দশ বছর তিনি তাঁর আরবী বিদ্যাও কাজে লাগিয়েছেন। ঢাকা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ায় তিনি তাঁর মূল বিষয় ইংরেজি ছাড়াও

হাদীস ও আরবী ব্যাকরণ পড়ানোর ভার নিয়েছিলেন এবং সার্থকতার সাথেই তাঁর কর্তব্য সম্পাদনা করেছেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর শ্বশুর শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক ছাহেবের পরিবারের সবাই হাফেজ ও আলেম। কোন এক রমযান মাসে শাইখুল হাদীস ছাহেবের পরামর্শে তিনি হুযুরের সন্তান ও নাতীদের নিয়ে কুরআনুল কারীমের গবেষণামূলক অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। কলেজ থেকে অবসর গ্রহণের পর তাঁকে জামিয়া রাহমানিয়ায় কুরআন শরীফের তাফসীর বিষয়ে 'জালালাইন শরীফ' পড়ানোর অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে এ কাজের দায়িত্ব নিতে পারেননি।

২. চলিত ভাষায় লেখকের যোগ্যতা :

বাংলায় কুরআন পাকের বিশুদ্ধ তরজমা লেখার যোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এখানে চলিত বাংলা ভাষায় তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর দখল থাকায় বাংলায় লেখার সময় অধীত ইংরেজি ব্যাকরণের সাথে বাংলা ব্যাকরণের তুলনা করার সুযোগ তাঁর হয়। বাংলা চলিত রীতির ব্যাকরণ বিষয়ক নানা প্রশ্নের সমাধান সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ছিল অনেক।

(১) তিনি লক্ষ করলেন, এদেশে যারা চলিত রীতিতে প্রথিতযশা লেখক ও সাহিত্যিক, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের লেখাও চলিত রীতির স্থপতি ও খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের ব্যাকরণের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। যেমন : চলিত ভাষায় পথিকৃত যাঁরা, তাঁরা তাঁদের লেখায় বহুবচন (সর্বনাম) কর্মবাচকের শেষে 'কে' লেখেন না। উদাহরণস্বরূপ : 'আমি তাদের অনেক টাকা-পয়সা দিয়েছি', 'এ বিষয়ে ছাত্রদের আমি কোন কথাই বলব না'।

তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'স্যার! আমি কাদের অনুসরণ করব?' আমি সরাসরি জওয়াব দিয়েছি, 'চলিত রীতির ব্যাকরণ অনুসরণ করবেন।' এর পর সমগ্র কুরআনের তরজমা ও তাফসীরে তিনি কর্মকারকের বহুবচনে 'কে' বিভক্তি ব্যবহার করেননি– কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া। আসলে এ-ই হচ্ছে চলিত রীতির ব্যাকরণ বৈশিষ্ট্য।

(২) অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন আহমদ আমারই নির্দেশে কাফের, মুশরিক, ইহুদী, খ্রিস্টান ও দুষ্কর্মপরায়ণ লোকদের সর্বনামে (সাধারণত) 'ওরা', 'ওদের' ইত্যাদি তাচ্ছিল্যের শব্দ ব্যবহার করেছেন। অন্যদের জন্য, এমন কি ভাল কাজ করার কালে আহলে কিতাব বা বনী ইসরাঈলের জন্যও 'তারা' ও 'তাদের' ব্যবহার করেছেন। কিন্তু দুষ্কৃতি করার কারণে দুষ্কর্মপরায়ণ হিসাবে 'তারা' 'ওরা' হয়েছে।

(৩) চলিত রীতির ব্যাকরণ অনুযায়ী From মানে 'হতে' নয়, 'থেকে'। সমস্ত তাফসীর জুড়ে তিনি এ নিয়ম অবলম্বন করেছেন। তদ্রূপ, 'ব্যতীত' অব্যয়ের স্থলে 'ছাড়া', 'বিনা', 'ভিন্ন', 'বাদে' ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য আয়াতের মূল তরজমায় কালামের গাম্ভীর্যের খাতিরে অনেক সময় 'ব্যতীত' রেখেছেন। 'অপেক্ষা' এর স্থলে 'চেয়ে' ও 'থেকে' বেশি ব্যবহার করেছেন। 'সহিত' শব্দটি সাধু রীতির। এর বদলে 'সঙ্গে' বা 'সাথে' ব্যবহার করেছেন। 'দ্বারা' শব্দটির ব্যবহারও কম করেছেন এবং এর বদলে 'সাহায্যে',

'দিয়ে', 'মাধ্যমে' ও 'মারফত' ব্যবহার করেছেন। মোট কথা, লেখক চলিত রীতিকে সম্পূর্ণ সাধু রীতিমুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য যেসব শব্দ সাধু ও চলিত উভয় রীতিতে ব্যবহৃত হয়, তার কথা ভিন্ন। সে ক্ষেত্রে যে শব্দ যেখানে মানায় সেখানে তা-ই লিখেছেন।

(৪) কোন কোন শব্দ পশ্চিম বাংলায় চলিতরূপে স্বীকৃত, কিন্তু আমাদের বাংলায় নয়। যেমন : 'পুরোপুরি', 'উলটনো', 'টুকরো' ইত্যাদি। অতএব এসব শব্দের ব্যাপারে আমাদের এখানকার চলিত রীতির বানানরূপই তিনি অবলম্বন করেছেন, যথা : 'পুরাপুরি', 'উলটানো'. 'টুকরা' ইত্যাদি।

(৫) বাংলা ও আরবী ভাষার বাগধারায় একটি বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণ দিয়েই বিষয়টি বলি। যেমন : فِي قلوبهم এর আক্ষরিক অনুবাদ তো হচ্ছে 'তাদের অন্তরসমূহে'। আরবীর মত উর্দূর বাগধারাতেও এ অনুবাদ চলে, কিন্তু বাংলা বাগধারা অনুযায়ী এ সম্পূর্ণ ভুল। এখানে লিখতে হবে, 'তাদের অন্তরে'। কেননা, এ 'অন্তরে'-ই রয়েছে অন্তরসমূহ। অর্থাৎ অধিকারসূচক (Possessive) শব্দটি বহুবচন হলে পরবর্তী অধিকারভুক্ত শব্দটি অবশ্যই একবচন হবে। এ ক্ষেত্রে এ-ই বাংলা বাগধারার বৈশিষ্ট্য। খালেছ বাংলাতেও আমাদের এরূপ ব্যবহার করতে হয়, যেমন : 'তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে'। এমন বাক্য থেকে আমরা সহজেই বুঝি যে, এখানে 'কথা' শব্দটি বহুবচন। অর্থাৎ বাংলা বাগধারায় বিশেষণ শব্দটির মাঝে বহুত্বের অর্থ থাকলে বিশেষ্য শব্দটি একবচন হবে, যদিও অর্থগত দিক থেকে তা বহুবচন। তবে আরবী শিক্ষার্থীর সামনে স্পষ্ট করে লিখে না দিলে তিনি এ পার্থক্য কী করে বুঝবেন– এ নিয়ে অনুবাদক আমার সঙ্গে কথা বললে, আমি বলেছি, 'বাক্যের গঠন বা (Context) থেকে অথবা তার আরবীর জ্ঞান থেকে শিক্ষার্থী বা পাঠক বুঝে নিতে পারবেন। বাংলায় একবচনই লিখতে হবে, অর্থ কিন্তু বহুবচনের।

উল্লেখ্য যে, বাংলায় ব্যাকরণসম্মত/বাগধারাজনিত কারণেই অনেক বাক্যে বহুবচনের স্থলে একবচন ব্যবহৃত হয়। যেমন : 'পাখি আকাশে ওড়ে' এখানে 'পাখি' লেখায় একবচন হলেও অর্থে বহুবচন। তাই ইংরেজিতে বলা হয়, 'Birds fly in the sky' অনুবাদক অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন আহমদ অনেক ক্ষেত্রে آيات، بينات، سماوات، أحكام প্রভৃতি বহুবচন শব্দের অনুবাদ একবচনে করেছেন। কেননা, এসব ক্ষেত্রে অনূদিত একবচনের অর্থে যে বহুবচন রয়েছে, তা সহজেই বুঝে আসে। আর বাংলা বাগধারায় বহুবচন বুঝাতে সবখানে 'সমূহ', 'গুলো' ইত্যাদি ব্যবহারে ভাষার শ্রুতিমধুরতাও ব্যাহত হয়। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে তিনি বহুবচনের অর্থ প্রকাশে 'সমূহ', 'গুলো' ব্যবহার না করে বিশেষ্য শব্দটির আগে 'বহু' বা 'অনেক' শব্দ যোগ করে বহুত্বের অর্থ প্রকাশ করেছেন।

(৬) তিনি চলিত রীতির লেখ্য ও কথ্য রীতির পার্থক্য সম্বন্ধেও সচেতন দৃষ্টি রেখেছেন। যথা : দেয়া, নেয়া, জন্যে, চাইতে, জিজ্ঞেস, ইত্যাদি কথ্য চলিত রূপের স্থলে যথাক্রমে দেওয়া, নেওয়া, জন্য, চেয়ে, জিজ্ঞাসা, ইত্যাদি লেখ্য চলিত রূপ ব্যবহার করেছেন।

(৭) তিনি চলিত রীতির শব্দের মধ্যে ও অন্তে বিসর্গের (ঃ) প্রয়োগ সম্পর্কেও সচেতন। 'জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের' নুসখা অনুসরণে তিনি তৎসম শব্দের অন্ত্য বিসর্গ বর্জন করে বস্তুত, কার্যত, অন্তত, সাধারণত ইত্যাদি লিখেছেন।

(৮) আর একটি বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, সমাপিকা ক্রিয়ার অন্তে অনেক স্থলে আজকাল 'ও' কার (ো) এর প্রয়োগ প্রবণতা অত্যন্ত প্রকট। যেমন : হলো, (এমন কি হোলো), গেলো ইত্যাদি। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, উল্লিখিত প্রবণতার তোড়ে বড় বড় লেখকের মধ্যে কেউ কেউ এসো, করো ইত্যাদিও বর্তমান অনুজ্ঞা হিসেবে লেখেন। এতে যে বাক্যটি ভবিষ্যত অনুজ্ঞাসূচক হয়ে যায়, এ কথা তাঁরা কী করে বিস্মৃত হলেন! লেখক সযত্নে ব্যাকরণের নিয়মবহির্ভূত এ 'ও' কার দেননি। তিনি বলেন, 'এসব ক্ষেত্রে শব্দের শেষের বর্ণটির উচ্চারণে তো 'ও' কার এসেই যায়। তাই লেখায় তা রাখার দরকার নেই।

(৯) আবার কেউ কেউ চলিত লেখ্য রীতিতে করবার, যাবার, হবার ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করে থাকেন। এসব স্থলে যুক্তিসঙ্গত কারণেই তিনি করার, যাওয়ার, হওয়ার ইত্যাদি প্রয়োগ করেছেন।

(১০) এর পর ক্রিয়ার স্বরসংগতি ও ব্যঞ্জনসংগতি (Vowel Harmony ও Consonant Harmony) এর কথায় আসি। চলিত রীতিতে উল্লিখিত বিষয়টি কিছুটা হলেও জটিল। বিষয়টিতে লেখক এখনো পূর্ণ পারদর্শিতা অর্জন করতে না পারলেও তার কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থে যে ক্ষেত্রেই এ বিষয়টি তার বুঝতে অসুবিধা হয়েছে, সেখানেই আমাকে জিজ্ঞাসা করে নিয়েছেন। তাতে আশা করি, পূর্ণ গ্রন্থে এ বিষয়েও ব্যাকরণগত কোন ভুল থাকার কথা নয়।

(১১) বিদেশি শব্দের বানানে পুস্তকের প্রায় সর্বত্র ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত আমার সম্পাদিত 'প্রতি বর্ণায়ন নির্দেশিকা' অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ্যে অধিক প্রচলিত বেশ কিছু শব্দের বানানে প্রচলিত বানানই রাখা হয়েছে। যেমন : আলেম, মোকাবেলা ইত্যাদি।

(১২) বাংলা ভাষায় যে শব্দের একাধিক বানান রয়েছে, সে ক্ষেত্রে সাধারণত তিনি অভিধান অনুসারে প্রথম বানানটি গ্রহণ করেছেন। যেমন : দীন ও দ্বীন; ঝরনা, ঝর্না ও ঝর্ণা প্রভৃতি। অবশ্য বিদেশি শব্দের বানান সংশ্লিষ্ট ভাষার উচ্চারণ অনুযায়ীই লিখেছেন। যেমন : তিনি 'আরবি' না লিখে 'আরবী' লিখেছেন।

লেখক বলেন যে, বাংলা হোক ইংরেজি হোক, যে কোন ভাষার ব্যাপারে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, তিনি সর্বদা নির্ভুল বানান লিখবেন। সে জন্য নতুন শব্দের বানান সম্পর্কে তাঁকে কিছু দিন অভিধান নিয়ে খুব পরিশ্রম করতে হত। আর কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর সে ভাষায় জানা শব্দগুলির বানান ঠিক হয়ে যেত এবং যেসব নতুন শব্দ তিনি শিখতেন, তার বানান খুব সর্তকতার সাথে দেখতেন এবং কিছু দিন বার বার

লিখে Practice করতেন। তার পর আর সে ভাষার জানা কোন শব্দের বানানেই তিনি ভুল করতেন না।

মোটকথা, বাংলা বানান-রীতি, প্রতিবর্ণায়ন, ব্যাকরণ-সিদ্ধতা, প্রয়োগ-যোগ্যতা ও প্রয়োগ-বাহুল্য– এসবের প্রতি এমন সূক্ষ্ম-দৃষ্টি সাধারণত লেখকদের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য। অনুবাদক অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন আহমদ এ কাজটি একাগ্রতার সাথে করতে পেরেছেন দেখে আমি খুশি হয়েছি। এ কর্মে তাঁর মেধা, নিষ্ঠা, পরিশ্রম, আন্তরিকতা ও একাগ্রতা আমাকে অভিভূত করেছে।

তাফসীরে উসমানী সরল ও সাবলীল ভাষায় লিখিত পবিত্র কুরআনের একখানি বিশুদ্ধ তরজমা ও তাফসীরগ্রন্থ। এ গ্রন্থখানি পাঠে বাংলা ভাষাভাষী পাঠক, বিশেষত মাদ্রাসায় কুরআনের তরজমা পাঠকারী ছাত্র-শিক্ষক নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন এবং কালামে পাকের বিশুদ্ধতম তরজমা ও তাফসীর শিক্ষালাভের সুযোগ পাবেন।

প্রসঙ্গত পাঠকের উদ্দেশ্যে আরো একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। ইসলামী সাহিত্য ও দীন সম্পর্কিত রচনায় ব্রতী লেখক সমাজ এ গ্রন্থখানির ভাষার অনুশীলনী করলে বিশুদ্ধ চলিত লেখ্য রীতি (Bengali Standard Written Colloquial Style) সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তার যথাযথ প্রয়োগে সমর্থ হবেন আশা করি। এ দিক থেকে এ পুস্তকখানি তাদের জন্য একটি অনুকরণীয় গ্রন্থ হিসাবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

লেখক আমাকে তাঁর গ্রন্থখানি সম্পাদনা করে দিতে অনুরোধ করেন। আমি কয়েক পারা সম্পাদন করে দিয়েছি এবং অবশিষ্ট গ্রন্থের প্রতিটি বাক্যের প্রকাশভঙ্গি, স্বরসংগতি ও বাগধারাজনিত তাঁর যে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে, তাও সমাধা করে দিয়েছি। সেদিক থেকে বলা চলে যে, সমগ্র পুস্তকখানি আমি সম্পাদন করে দিয়েছি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদের দীর্ঘকালের শ্রম ও সাধনা কবুল করুন এবং আমাদের সকলের নাজাতের ওসীলা করুন। লেখক দীর্ঘজীবী হোন এবং দীনের খিদমতে নিয়োজিত থাকুন। অন্তরের অন্তস্তল থেকে পরম করুণাময়ের দরবারে এ দো'য়া করি। আমীন।

কাজী দীন মুহম্মদ

(কাজী দীন মুহম্মদ)
১২৯, কলাবাগান, ঢাকা-১২০
(মৃত্যুর ৩ মাস পূর্বে)

মূল (উর্দূ) 'তাফসীরে উসমানী' :

যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম ও প্রাজ্ঞ মনীষীবৃন্দের মূল্যায়ন ও অভিমত—

(এখানে সংক্ষিপ্ততার উদ্দেশ্যে তাঁদের বক্তব্যের সারনির্যাস এবং অলোচনার শুধু মূল কথাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। যারা পূর্ণ আলোচনা দেখতে চান, তাদের জন্য হযরত মাওলানা নূরুল হাসান রাশেদ কান্ধলভী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত মূল্যবান ও দুর্লভ কিতাব شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ کا اصل مقدمۂ ترجمۂ قرآن مجید পৃ. ২৩১–২৫০ দ্রষ্টব্য)

১. হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ.

হযরতের দৃষ্টিতে 'তাফসীরে উসমানী'-এর যে মূল্য ছিল, তার আন্দাজ এ থেকে হতে পারে যে, যখন থানাভবনে হাকীমুল উম্মত রাহ.-এর মৃত্যুশয্যায় তাঁর সঙ্গে তাফসীরকার আল্লামা উসমানী রাহ.-এর সাক্ষাৎ হয়, তখন হযরত থানভী রাহ. বললেন–

"আমি আমার সমস্ত কুতুবখানা (লাইব্রেরী) ওয়াক্ফ করে দিয়েছি। তবে আমার প্রিয় দু'টি জিনিস আমার নিকট রেখে দিয়েছি, যে দু'টি জিনিসের মধ্যে একটি আপনার তাফসীরগ্রন্থ।" –(কামালাতে উসমানী, পৃ. ১০২)

এ ঘটনা থেকে হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ.-এর দৃষ্টিতে 'তাফসীরে উসমানী'-এর কদর ও কীমত (মূল্য) উপলব্ধি করা যায়।

২. হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী রাহ.-এর অভিমত

"কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার অনাদি কালের যে ওয়াদা রয়েছে– إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ ('আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর হেফাজতকারী') এবং ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ('অতঃপর এর ব্যাখ্যার দায়িত্বও আমারই উপর')– সেই ওয়াদা মোতাবেক তিনি স্বীয় কুদরতে এই শেষ যুগে ইমামদের সরদার হযরত শাইখুল হিন্দ রাহ.-কে উর্দূ ভাষার বাগধারা অনুসরণে কুরআনের তরজমার দিকে মনোযোগী করেছেন এবং বান্দাদের সংশোধনের জন্য হেদায়েতের সুমহান ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর পর মাওলানা শাব্বীর আহমদ ছাহেবকে তাফসীর পূর্ণ করা ও কুরআন সম্পর্কিত গভীর ও গুপ্ত বিষয়াদি বয়ান করার দিকে মনোযোগী করে সমগ্র ইসলামী জগত– বিশেষ করে হিন্দুস্তানবাসীদের জন্য অদ্বিতীয় ও পরিপূর্ণ নূর ও আলো কায়েম করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা নিজ মহিমা ও দয়া গুণে যমানার বিজ্ঞ ও যুগশ্রেষ্ঠ এই আলেমকে (আল্লামা উসমানী) ইসলামী জগতের উজ্জ্বল সূর্য বানিয়েছেন। প্রখ্যাত এ আলেম তাঁর অতুলনীয় প্রজ্ঞা ও মেধা, বেনজীর বাগ্মিতা ও লিখনশক্তি, অতুলনীয় জ্ঞান-গরিমা, বিস্ময়কর স্মরণশক্তি ও জ্ঞানের গভীরতা প্রভৃতি ইলমী গুণের পরিপূর্ণতার কারণে অবিস্মরণীয় হয়ে

থাকবেন। তাঁর তাফসীরী টীকা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাসমূহের বদৌলতে উল্লিখিত তরজমা তো সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছেই, তদুপরী সেসব অসংখ্য সন্দেহ-সংশয়েরও ভিত ভেঙ্গে পড়েছে, যা নির্বোধ পাঠকদের অন্তরে আল্লাহর এই মহান কিতাব ও তাঁর খাঁটি দীন সম্পর্কে সৃষ্টি হত।

মাওলানার তাফসীর সম্পর্কে এ কথা নিশ্চিত যে, তিনি এক মহাসমুদ্রকে যেন ছোট পাত্রে ভরে দিয়েছেন। এর সকল সৌন্দর্য শুধু বলা ও লেখার মাধ্যমে পরিপূর্ণ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়; বরং স্বচক্ষে দেখার মাধ্যমেই তা উপলব্ধি করা যাবে।

আমি আশা করি, সত্যিকার ইলম-পিপাসুগণ অনতিবিলম্বে এই বিস্ময়কর তরজমা ও তাফসীরগ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হয়ে নিজ দিল ও দেমাগকে (অন্তর ও মননকে) আলোকিত করবেন।" –('হযরত শাইখুল হিন্দ কা আসল মুকাদ্দামায়ে তরজমায়ে কুরআন', পৃ. ২৪১-২৪২)

৩. ইমামুল আসর হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ.

"মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী ছাহেব রাহ. কুরআন হাকীমের তাফসীর লিখে ইসলামী জগতের উপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন।" – (কামালাতে উসমানী পৃ. ১০২)

'তাফসীরে উসমানী' সম্বন্ধে শাহ ছাহেবের এ উক্তি এমন একটি অভিমত যে, এক বাক্যে এর চেয়ে অর্থপূর্ণ অভিমত আর হতে পারে না।

৪. হযরত মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী রাহ.

"সত্য এই যে, উর্দূ ভাষায় তাঁর এ তাফসীরে কুরআন (বা "তাফসীরে উসমানী") হচ্ছে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও রচনাশক্তির পূর্ণতার নিদর্শন। এ তাফসীরের দ্বারা পরিষ্কার হয় যে– মাওলানার কুরআনী প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য, তাফসীরের কিতাবজগতের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক এবং পাঠকদের সামনে সহজবোধ্য করে আয়াতের ব্যাখ্যা উপস্থাপনে তাঁর ব্যুৎপত্তি বর্ণনাতীত। আমার আশা, তাফসীরখানি দ্বারা মুসলমানরা বড় উপকৃত হয়েছে। আমি দরসে ছাত্রদের সর্বদা এ তাফসীরের উপকারিতার কথা বলে থাকি এবং এটি পড়ার তাগিদ দিই।

তাফসীরটির উপকারিতা এ থেকেও অনুমান করা যায় যে, আফগান সরকার দেশের মুসলমানদের ফায়দার জন্য তাফসীরখানি সরকারি প্রেস থেকে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করে কুরআনের সঙ্গে ছাপে" –('মাআরিফ' পত্রিকার 'ওফায়াত' (وفيات) শীর্ষক বিশেষ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৫০ ঈ., পৃ. ১৭৯)

৫. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলভী রাহ.

"উর্দূ ভাষায় কুরআনের জ্ঞানভাণ্ডারকে এমন চমৎকার, মাধুর্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহীরূপে এত সাবলীল, অলংকারপূর্ণ ও মজবুত গাঁথুনির মাধ্যমে উপস্থাপন একান্তই হযরত মাওলানা উসমানী রাহ.-এর কৃতিত্ব। হিন্দুস্তানবাসীর জন্য এ তাফসীর কুরআনী জ্ঞানরহস্যের এক অমূল্য উপহার।" –('হযরত শাইখুল হিন্দ কা আসল মুকাদ্দামায়ে তরজমায়ে কুরআন', পৃ. ২৩৯-২৪০)

৬. হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী রাহ.

"শাইখুল হিন্দ রাহ.-এর তরজমাসহ হযরত উসমানী রাহ.-এর তাফসীর দেখলাম। মনে হল, আমার জীবনে দেখা কুরআনে কারীম নিয়ে রচিত সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কীর্তি চোখের সামনে। বিশিষ্ট ফকীহ, মুহাদ্দিছ ও মুফাসসির হযরাতুল উস্তায মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ.-এর লেখা টীকাগুলো এক এক করে দেখছিলাম। দীর্ঘসময় ধরে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে, আত্মসমাহিত হয়ে টীকাগুলো পড়ে তৃপ্ত হচ্ছিলাম।

আমি কে? আমার ইলমী যোগ্যতাই বা কী? নিজ শাইখ ও নিজ উস্তাযের ইলমী কীর্তি সম্পর্কে এত স্বল্পপুঁজি নিয়ে কী অভিমত পেশ করব? আসলে শাইখুল হিন্দ রাহ. এবং মাওলানা উসমানী রাহ. উভয়েই সালাফে সালেহীনের তাফসীরের বিশাল ভাণ্ডার থেকে বিক্ষিপ্ত মণিমুক্তা এক মলাটে একত্র করেছেন, যাতে প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সব আলোচনা এসেছে, তবে তা বাহুল্যবর্জিত এবং অতিশয়োক্তি মুক্ত। আর দুর্বোধ্য ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা মোটেই করা হয়নি।" – (প্রাগুক্ত পৃ. ২৪৫)

৭. শাইখুত তাফসীর হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রাহ.

"শাইখুল হিন্দ রাহ. প্রায় চার পারার টীকা লিখতে পেরেছিলেন। বাকি ২৬ পারায় মাওলানা উসমানী রাহ. অনেক মূল্যবান টীকা সংযোজন করেছেন। এটি একটি সংক্ষিপ্ত তবে পূর্ণাঙ্গ তাফসীর, যা কলেবরে ছোট হলেও বহু বড় বড় তাফসীরগ্রন্থের প্রয়োজন পূরণ করে দেয়। হযরত রাহ. বহু পরিশ্রম করে এতে কুরআনে মাজীদের মর্মসাগরের উত্তম সারনির্যাস তুলে ধরেছেন। দোয়া করি, এটি হযরতের আখেরাতে মুক্তির উপায় হোক। সকল মুসলিমের হেদায়েতের পাথেয় হোক।" –(প্রাগুক্ত পৃ. ২৪৪)

৮. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়াঁ রাহ.

"আমি যদি আমার ইলমপ্রিয় কোন শ্রদ্ধাভাজন বা বন্ধুকে পবিত্র একটি উপহার দিতে চাই, তবে সর্বপ্রথম শাইখুল হিন্দ রাহ. এর তরজমাসহ হযরত উসমানী রাহ. এর তাফসীরটিই বেছে নিব। এ তাফসীরটি এমন এক জাঁদরেল আলেমের রচনা, যার সম্পর্কে ভারতবর্ষের মুসলমানগণ জানেন যে, কুরআন অনুধাবন, কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা, তদুপরি সাবলীল ভাষা, আকর্ষণীয় লেখনী, হৃদয়স্পর্শী ভাষণ –এর ক্ষেত্রে তাঁর নজির খুঁজে পাওয়া কঠিন। তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সির, মুসলিম শরীফের সম্মানিত ব্যাখ্যাতা, উপমহাদেশের দ্বিতীয় কাসিম নানুতবী আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ.। তাঁর লিখিত এই তাফসীর বেশ উৎকৃষ্ট ও মানসম্পন্ন।" –(প্রাগুক্ত পৃ. ২৪৭-২৪৮)

৯. মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী রাহ.

"মদীনা প্রেস থেকে জামেয়া ইসলামিয়া ডাভেলের বর্তমান শাইখুল হাদীস মাওলানা উসমানীর টীকাসহ শাইখুল হিন্দ কৃত কুরআন মাজীদের তরজমা প্রকাশিত হয়েছে। উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে অপূর্ব ও চিরন্তন এক উপহার। ভ্রান্ত

ধ্যান-ধারণা ও নানা সংশয়-সন্দেহপোষণকারী নব্যচিন্তার বাহকদের জন্য এই তাফসীর মহৌষধের কাজ দেবে। তাফসীরটি এক অনুপম ঢংয়ে রচিত। নিজ গুণে তা যেন দ্যুতিমান তেজোদীপ্ত আলো। ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ (আসলে এ আল্লাহর অনুগ্রহ। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহে বাধিত করেন।)

বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখন নেই। সংক্ষেপে বলছি, সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার হযরত মাওলানা উসমানীর টীকাগুলো একদিকে যেমন সারগর্ভ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা-আমলসম্মত এবং তাহকীকসমৃদ্ধ, তেমনি যুগচাহিদার অনুকূল, বিজ্ঞোচিত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। পাঠক পড়তে পড়তে খেয়াল করবেন, ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপোষণকারীদের তৈরি করা সংশয়ের ভিতগুলো কীভাবে আপনা-আপনি ভেঙ্গে পড়ছে এবং বাতিলের গোমরাহিগুলো কর্পূরের মতো উবে যাচ্ছে। তবে ব্যক্তিবিদ্বেষ বা কারো ব্যক্তিত্বে আঘাত করে– এমন কোন কিছুর নামগন্ধও এতে নেই। ভাষা এবং উপস্থাপন শুষ্ক বা দুর্বোধ্য নয়। বরং সাধারণত প্রাঞ্জল, প্রাণবন্ত, মনকাড়া এবং বিভিন্ন স্থানে সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ।

দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা এই মহান কাজটি মুসলিম উম্মাহর সফলতার সোপান হিসেবে কবুল করে নিন। আমীন।" –(প্রাগুক্ত পৃ. ২৪৫-২৪৭)

১০. মুজাহিদে আজম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (সদর ছাহেব) রাহ.

"কেউ যদি 'তাফসীরে উসমানী' এর মর্ম বুঝতে ও সঠিক মূল্যায়ন করতে চায়, তবে সে যেন প্রথমে তাফসীরের সমস্ত কিতাব পড়ে নেয়। তখন সে বুঝতে পারবে, এ তাফসীর কত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু কত ব্যাপক অর্থপূর্ণ– এ যেন সকল তাফসীর গ্রন্থের সারসংক্ষেপ, সমস্ত তাফসীরের কিতাবকে বুকে ধারণ করে নিয়েছে।" (হযরত থেকে অনুবাদক নিজে শুনেছেন)

১১. হযরত মাওলানা আহমদ সাঈদ রাহ. (নাযেম, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ)

"কুরআন তরজমার পাশাপাশি যুগোপযোগী একটি সংক্ষিপ্ত, তবে শাহ আব্দুল কাদের রাহ.কৃত 'মূযেহুল কুরআনের' চেয়ে আরো প্রশস্ত তাফসীর রচনার প্রয়োজন ছিল। সে আঙ্গিকেই কাজটি শাইখুল হিন্দ রাহ. শুরু করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা সমাপ্ত হয়নি। كل أمر مرهون بأوقاته (আসলে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রতিটি কাজের সময়সীমা নির্ধারিত আছে।) অবশেষে কাজটি উত্তমরূপে হযরত উসমানী রাহ.-এর হাতেই পূর্ণতা পায়। আর হযরত উসমানী রাহ. ছিলেন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও এর শাখা-প্রশাখায় অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। লেখনী ও বক্তৃতায় তাঁর ছিল খোদাপ্রদত্ত অসাধারণ যোগ্যতা।

বক্ষ্যমাণ তাফসীরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন জায়গা আমি দেখেছি। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, কুরআনের উলূম-মাআরেফ ও গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ আলোচনাগুলোকে হযরত মাওলানা যতটা স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল ভাষায় এবং সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন, তা একমাত্র তাঁরই কৃতিত্ব। উর্দূ ভাষায় কুরআনের আয়াতের মর্মার্থসম্বলিত এমন সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কাজ আর দ্বিতীয়টি আমার চোখে পড়েনি। আল্লাহ তাআলা এর উপযুক্ত

প্রতিদান দান করুন। দোয়া করি, মাওলানার কালামে পাকের তাফসীরসংশ্লিষ্ট এই ইলমী খেদমতটি ব্যাপক কবুলিয়ত অর্জন করুক।" -('হযরত শাইখুল হিন্দ কা আসল মুকাদ্দামায়ে তরজমায়ে কুরআন', পৃ. ২৪২-২৪৩)

১২. মাওলানা খাজা আব্দুল হাই ছাহেব (শাইখুত তাফসীর ও নাযেমে দীনিয়াত, জামেয়া মিল্লিয়া দিল্লী)

"মরহুম হযরত শাইখুল হিন্দ রাহ. কুরআন পাকের যে তরজমা উর্দূতে করেছিলেন, তা প্রথমে প্রায় তাফসীরবিহীন প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়বার পূর্ণ তাফসীরসহ প্রকাশিত হয়। আর এই অবশিষ্ট তাফসীর এমন এক বুযুর্গের ফয়েয ও বরকতের ফসল, যিনি নিঃসন্দেহে হিন্দুস্তানে তাফসীরবিদদের শিরোমণি ও কুরআনের শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান ও তত্ত্বজ্ঞানীরূপে বিবেচিত। তিনি হলেন শাইখুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ.। তাঁর বরকতময় কলম যেমন কুরআনের অলংকার ও সাহিত্য-সৌন্দর্যের দরিয়া বইয়ে দিয়েছে, অন্য দিকে কুরআনের জ্ঞানরাজির মূল্যবান মোতি পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দিয়েছে।" -(প্রাগুক্ত পৃ. ২৪০)

১৩. বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ মাওলানা আকবর খান নজীবাবাদী রাহ.

"কুরআনী ইলম এবং তাদাব্বুরে কুরআনের ক্ষেত্রে উলামায়ে দেওবন্দের মাঝে হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানীর অবস্থান হল এক অনন্য উচ্চতায়। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে মাওলানার প্রতি হৃদয়ে অন্যরকম টান অনুভব করি। কুরআন মাজীদের হেদায়েত ও নির্দেশনা জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে হযরত মাওলানা টীকা আকারে সংক্ষিপ্ত তবে পূর্ণাঙ্গ তাফসীর লিখেছেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কথা বলা হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ সব স্থানেই উপযুক্ত আলোচনা এসেছে। সকল মুসলমানের ঘরে ঘরে এই তরজমা এবং তাফসীরের একটি কপি থাকা উচিত।" -(প্রাগুক্ত পৃ. ২৪৯)

১৪. হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রাহ.

"যখন দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় তরজমায়ে কুরআন এবং তাফসীরের খেদমত অর্পিত হয়, তখন হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ. এর তাফসীরের কদর বুঝে আসে। এতে তিনি মুফাসসিরগণের বক্তব্যসমূহের সারাংশ এবং তাঁদের তাহকীক ও গবেষণার সেই অংশ উল্লেখ করে দিয়েছেন, যা বর্তমান যুগের সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন মানসিকতার লোক অনায়াসে গ্রহণ করে নিতে পারে। এতে মাওলানার চিন্তার সুস্থতা, উত্তম নির্বাচন ও লেখার প্রাঞ্জলতা একদম স্পষ্ট।

আমি দেওবন্দরে এক সাক্ষাতে মাওলানার নিকট আমার এই অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলাম। মাওলানা অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন এবং তাঁর কোন কোন সঙ্গীকে আমার অনুভূতির কথা শুনিয়েছিলেন।" -(মেরী ইলমী ওয়া মুতালাআতী যিন্দেগী, পৃ. ২৪, প্রকাশক : সাইয়েদ আহমাদ শহীদ একাডেমী)।

অধম অনুবাদকের
জীবন-সাধনার ফসল ও প্রাণের উচ্ছ্বাস

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

১

আজ ১৪৩০ হিজরী সনের ৮ই রবিউল আউয়াল তারিখের বাদ তাহাজ্জুদ, এক মুবারক মুহূর্ত! ইয়া আল্লাহ! ইয়া রাহমান! তোমার শুকরিয়া আদায় করার ভাষা এই নরাধমের নেই–

اللّٰهُمَّ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

–আমার পক্ষে বলার এতটুকুই যে, 'তোমার গুণকীর্তন করার সামর্থ্য আমার নেই। তুমি তেমনি, যেমন স্বয়ং তুমি তোমার গুণকীর্তন করেছ।'

ইয়া আল্লাহ! আজ তোমার এই নাচিজ কিঙ্কর তার আজীবন সাধনার ফসল তোমার হুজুরে পেশ করতে পেরেছে বলে তোমার সামনে সে সেজদাবনত : কবুল কর হে মা'বুদ! তাফসীরকারের ভাষায় বলছি, 'এলাহী! আমি স্বীকার করি, এই খেদমত সম্পাদনে যথার্থ ইখলাস আমার দ্বারা আদায় হয়নি, কিন্তু তোমার রহমত ও মেহেরবানী যখন সাইয়েআতকে হাসানাত (মন্দকে ভাল) দ্বারা পরিবর্তন করে দিতে পারে, সে ক্ষেত্রে বাহ্যত একটি হাসানাকে প্রকৃত হাসানায় পরিবর্তিত করে দেওয়া তোমার পক্ষে কঠিন নয়। তোমার প্রতি আমার ধারণা এ-ই যে, অতি ক্ষুদ্র বস্তুরও যেখানে তোমার কাছে মূল্যায়ন রয়েছে, সেখানে তোমার এই গুণের দ্বারা তুমি এই সামান্য আমলকে চিরস্থায়ী বানিয়ে দেবে এবং এর পুণ্য ফলাফল দিয়ে আমাকে উভয় জাহানে উপকৃত করবে।'

আল্লাহ তা'আলার যে প্রিয় বান্দার তরজমা ও তাফসীরই এ খেদমতের মূল উৎস, তিনি ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কনিষ্ঠ তনয় শাহ আবদুল কাদের রাহ.। তিনি এমনই এক ওয়ালীআল্লাহ ছিলেন যে, মৃত্যুর পর তাঁর শবদেহ কবরে পৌঁছলে তাঁর সম্মানে সেদিন পার্শ্ববর্তী বার মাইল এলাকার (কবরস্থানের) কবর-আযাব বন্ধ রাখা হয়েছিল বলে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাহ আবদুল আযীয রাহ. এলহামপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই শাহ আবদুল কাদের রাহ. দীর্ঘ আঠারো বছরকাল একাধারে মসজিদে এ'তেকাফে থেকে কুরআন শরীফের উর্দূ তরজমা ও তাফসীর ('মুযেহুল কুরআন') লিখেছিলেন। এই উপমহাদেশের আলেমকূল শিরোমণি শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান রাহ. পরবর্তী কালের পরিবর্তিত উর্দূ ভাষায় উক্ত তরজমার সম্পাদনা করেছেন। শাইখুল হিন্দ রাহ. তাঁর ভূমিকায় একটি তথ্য পরিবেশন করেছেন– তারই উল্লেখ এ স্থানে উদ্দেশ্য। আল্লাহ-প্রেমের উচ্ছ্বাসে আল্লাহর এক ওলীর

নিবেদিত প্রাণ থেকে যে বয়েত বা কাব্যপঙ্ক্তি নিঃসৃত হয়েছিল, তারই অনুকরণে শাহ আবদুল কাদের রাহ. (তাঁর কুরআনের তরজমা ও তাফসীরগ্রন্থ সম্পর্কে) বলতেন,

روز قیامت ہر کسے باخویش دارد نامۂ ☆ من نیز حاضر میشوم تفسیر قرآں در بغل

'হাশর-মাঠে থাকবে সবার আমলনামা হাতে * আমিও থাকব, থাকবে আমার কুরআন-তাফসীর সাথে।'

আমি (নরাধম গিয়াসুদ্দীন আহমদও) রূহানী সিলসিলার পূর্বপুরুষদের পিছু পিছু চলার দুঃসাহস বুকে নিয়ে মনে মনে বলছি এবং আল্লাহ তাআলার রহমত লাভের আশায় মেতে উঠে উচ্চারণ করছি :

روز قیامت ہر کسے باخویش دارد نامۂ ☆ من نیز حاضر میشوم بنگلہ تفسیر عثمانی در بغل

'হাশর-মাঠে থাকবে সবার আমলনামা হাতে * আমিও থাকব, থাকবে আমার বাংলা তাফসীরে উসমানী সাথে।'

বলা বাহুল্য, 'এ-ই হচ্ছে, অধমের প্রাণের আবেগ-উচ্ছ্বাস।'

২

শিরোনামে এ খেদমতকে আমি জীবন সাধনার ফসল বলেছি। আজ থেকে প্রায় তিন যুগ আগে, মনে হয় বাংলাদেশে সবার আগে আমি এই তাফসীরে উসমানী শীর্ষক তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদে হাত দিই এবং প্রায় সবার শেষে সমাপ্ত করি। এই দীর্ঘসূত্রিতার প্রধানত দুটি কারণ। একটি, বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের একখানি বিশুদ্ধ তরজমা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সকল আয়াতেরই তরকীব (ব্যাকরণগত বাক্য বিন্যাস) حل বা সমাধা / সম্পন্ন করে আয়াতটির বাংলা অনুবাদ করার প্রয়োজন মনে করেছি। সে উদ্দেশ্যে আমি সমস্ত কুরআনের প্রত্যেক আয়াতের ব্যাকরণ বুঝে ও আয়াতের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেব রাহ. বলতেন, 'আরবীতে কুরআন শরীফের তারকীবই সব চেয়ে কঠিন।' আর হযরত শাইখুল ইসলাম মাওলানা তাকী উসমানী দা. বা. বলেন, দীনি বিষয়াদির মধ্যে কুরআনের অনুবাদই সব চেয়ে কঠিন।

এত দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার দ্বিতীয় কারণ, তাফসীরকার হযরত শাইখুল ইসলাম রাহ.-এর মাতৃভাষা উর্দূর গাম্ভীর্য, বলিষ্ঠতা ও পাণ্ডিত্বের উপলদ্ধি করার পর বাংলা অনুবাদ করা। তাঁর পাণ্ডিত্বপূর্ণ প্রকাশভঙ্গি পাঠককে যেমন মোহিত করে, তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে জটিলতায়ও ফেলে। অতএব তাঁর পাণ্ডিত্বপূর্ণ প্রকাশভঙ্গি যেখানে পরিষ্কারভাবে বুঝতে কঠিন মনে হত, তা ধারাবাহিকভাবে খাতায় লিখে যেতাম। পরবর্তী সময়ে উর্দূ বাকপ্রণালী বা বাগ্‌ধারায় পারদর্শী ও তাফসীরে বিজ্ঞ আলেমদের নিকট গিয়ে সেসব স্থানের অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝে তরজমা পূর্ণ করেছি। 'বয়ানুল কুরআন' অধ্যয়ন করেও অনেক স্থানের জটিলতা নিরসন

করেছি। মোটকথা, পবিত্র কুরআনের আয়াতের তরজমা বলুন, আর তাফসীরই বলুন, তার সকল স্থানের ব্যাকরণ ও অভিধান এবং উর্দূর বাগধারা ও প্রকাশভঙ্গি সংক্রান্ত সব কিছু আল্লাহর রহমতে حل বা সমাধা করে করেই সমস্ত কুরআনুল কারীমের তরজমা ও তাফসীরের অনুবাদ করার তাওফীক হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ!

ইয়া আল্লাহ! তোমার এই নাচিজ অধম বান্দার এ যৎকিঞ্চিত সাধনা কবুল কর এবং তোমার কালামের বাংলা অনুবাদ ও তাফসীরকে তোমার দয়াগুণে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ হওয়ার মর্যাদা দান কর। তোমার জন্য কোনো কিছুই কঠিন নয়।

৩

পবিত্র কুরআনে বহু আয়াতের একাধিক তরকীব বা ব্যাকরণগত সমাধান হতে পারে। কুরআন পাকের এ একটি বৈশিষ্ট্য। অতএব যে তরকীবটি ভিত্তি করে 'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এ তরজমা করা হয়েছে, আমরা সে তরকীবটিরই আলোকে বাংলা অনুবাদ করেছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'ফাওয়ায়েদে উসমানী'তে স্থানবিশেষে কুরআনের মর্ম ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য আরবী বাগ্‌ধারা থেকে কিছুটা সরে গিয়ে উর্দূ বাগ্‌ধারার অনুকরণে তরজমা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে আয়াতের অর্থের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি।

প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে ভবিষ্যতকালে ঘটিতব্য বহু বিষয় অতীতকালে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলার ভবিষ্যত উক্তি সুনিশ্চিত বলে তা যেন ঘটেই গেছে। উর্দূ তরজমাতেও বহু ক্ষেত্রে অতীতকালই ব্যবহার করা হয়েছে, তবে কোন কোন স্থানে ব্যতিক্রমও হয়েছে। অর্থাৎ সেসব ক্ষেত্রে অতীতের পরিবর্তে ভবিষ্যৎ বা বর্তমানকাল ব্যবহার করা হয়েছে।

অনুবাদে এসব বিষয়ের প্রতি যথাসম্ভব লক্ষ রাখা হয়েছে।

৪

সংক্ষেপে "তাফসীরে উসমানী"-এর গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য ও ফায়দা

আমি নিজ থেকে এ ব্যাপারে কিছু বলার সাহস করি না। তবে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মূল্যায়ন ও অভিমত সামনে রেখে সার-সংক্ষেপস্বরূপ নিম্নের কথাগুলি আরজ করতে পারি–

১. এই তাফসীর সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অত্যন্ত অর্থ-মর্মসমৃদ্ধ। সংক্ষিপ্ততার স্থানে সংক্ষিপ্ত এবং বিশদ ব্যাখ্যার স্থানে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা এতে রয়েছে।

২. এ তাফসীর বড় বড় অনেক তাফসীর থেকে সাধারণ পাঠককে একটা পর্যায় পর্যন্ত বে-নিয়ায করে দেয়, এবং এটি কুরআনী বিষয়াবলী সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল করার জন্য যথেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ। বরং মাওলানা আহমদ সাঈদ রাহ.-এর ভাষায়, তাফসীরের এ রকম সংক্ষিপ্ত, ব্যাপক মর্মসমৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ খাজানা (ভাণ্ডার) আর চোখে পড়েনি।

৩. কঠিন থেকে কঠিনতর আলোচনাসমূহ প্রাঞ্জল ও আকর্ষণীয় ভাষায় পেশ করা হয়েছে, ফলে পাঠকের মস্তিষ্ক তা গ্রহণ করতে কষ্ট অনুভব করে না। যেমন : সাইয়েদ সুলাইমান নদভীর ভাষায়– তাঁর (আল্লামা উসমানীর) বোঝানোর ক্ষমতা বর্ণনাতীত। এ তাফসীর সঠিক স্বভাব ও সুস্থ রুচির কাছে বিশেষ আবেদন রাখে এবং তাকে আকৃষ্ট করে।

৪. এ তাফসীরে কুরআনী হেকমত ও মাআরেফ (প্রজ্ঞা ও জ্ঞানমালার) বহু অমূল্য বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে।

৫. মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর ভাষায়– শাইখুল হিন্দ রাহ.-এর (কুরআনের) তরজমা যদি নূর হয়, তবে মাওলানা উসমানীর তাফসীর 'নূরুন-আলা-নূর' অর্থাৎ 'জ্যোতির উপর জ্যোতি'। কতক আলেমের ভাষায়, 'শাইখুল হিন্দ রাহ. কর্তৃক অনূদিত কুরআন কারীমের অনুবাদ একটি ইলমী মশাল। তাই সমস্ত ইসলামী জগতকে এ থেকে আলো হাসিল করা উচিত। আর এই মূল্যবান তরজমার দীপ্তি ও শোভা আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানীর তাফসীর বহুগণ বাড়িয়ে দিয়েছে'

৬. এ তাফসীর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতাদর্শ অনুযায়ী লিখিত। আবার এতে বর্তমান কালের জরুরী বিষয়াদিরও দিক-নির্দেশনা রয়েছে, অর্থাৎ নতুন ও পুরাতন উভয় ধেয়ান-ধারণাবিশিষ্ট শিক্ষিত লোকদের চিন্তাধারার খোরাক এতে পরিবেশন করা হয়েছে।

৭. এ তাফসীর অত্যন্ত তাত্ত্বিক, জ্ঞানগর্ভ ও পরম জ্ঞানসমৃদ্ধ আন্দাজে লেখা হয়েছে। এজন্যই মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী বলেন, "যখন থেকে এ তাফসীর ছাপা হয়েছে, সর্বদা তা সাথে রাখি। যখন কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি কোনো বিশেষ বিষয় জিজ্ঞাসা করে, তখন এ তাফসীর খুলে (তার সামনে) পড়ে দেই, তাতে তার উত্তর হয়ে যায়।" – (কামালাতে উসমানী, পৃষ্ঠা : ১০৭)

৮. এ তাফসীর অত্যন্ত উন্নত ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা হয়েছে। এর ভাষা কোথাও দুর্বোধ্য ও নিরস নয়।

৫

পরিশেষে এ তাফসীরের অনুবাদ রচনায় কয়েকজন প্রাজ্ঞ আলেম ও মনীষীর অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁদের একজন এ উপমহাদেশের সবার শ্রদ্ধাভাজন আলেমে দীন শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রাহ. এবং দ্বিতীয়জন উপমহাদেশের বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ড. কাজী দীন মুহম্মদ রাহ.। আলোচ্য অনুবাদগ্রন্থে উভয় মনীষীর সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা অফুরন্ত ও অতুলনীয়। তাঁদের দোয়া, পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদানে আমার মত অধমের পক্ষে এ মহান খেদমত আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

আর হযরত মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এর শুকরিয়া আদায় করার ভাষা আমার নেই। অধমের অনূদিত তাফসীরে প্রিয় মাওলানার অবদান অবিস্মরণীয়। এই কিতাবের পরিমার্জনের প্রতি তাঁর তাহকীকী নজর ও যত্ন এবং এ বিষয়ে তাঁর তত্ত্বাবধান তাফসীরখানিকে অপরিসীম মর্যাদায় উন্নীত করেছে।

আমি আমার তাফসীরে উসমানী সম্পর্কিত সকল বিষয়ের অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ও অধমের একান্ত প্রিয়ভাজন মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব দা. বা. কে নির্বাচন করে যাচ্ছি এবং তা করে যেতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য ও সৌভাগ্যবান মনে করছি। আশা করি, আল্লাহর কালাম ও আখেরাতের আজ্‌র ও ছওয়াবের দিক লক্ষ করে মাওলানা আমার এ দাবিটুকু গ্রহণ করবেন।

বান্দাযাদা সাঈদ আহমদ সাল্লামাহুল্লাহ এই তাফসীরের নিরীক্ষণ ও সম্পাদনার কাজে তার উস্তাযজী মাওলানারই তত্ত্বাবধানে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে নিয়োজিত আছে। মাওলানা থেকে দিকনির্দেশনা নিয়ে নিয়ে সে এ কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও মাওলানার অধীনে থেকে সে এ কাজ করে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমি তার উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করলাম। আমার অনূদিত তাফসীরে উসমানীর জন্য এই ব্যবস্থা করতে পেরে আমি স্বস্তি বোধ করছি। আল্লাহ তাআলা সহায় হোন।

فالله خير حافظًا و هو أرحم الراحمين

এই তাফসীরখানির সঙ্গে প্রখ্যাত আলেমে দীন মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমও বিশেষভাবে জড়িত। মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেবের অনুরোধে তিনি তাফসীরখানির সম্পাদনা করে দিয়েছেন। হাদীসের ন্যায় তাফসীর জগতেও তিনি বাংলার বুকে স্বনামধন্য হয়ে আছেন। উল্লেখ্য যে, তিনি মাওলানা মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের 'তাওযীহুল কুরআন'সহ আরো তাফসীরের বাংলা অনুবাদক। আল্লাহ তাআলা তাঁকে হায়াতে তায়্যেবা এবং আজর ও ছওয়াব দানে ধন্য করুন।

৬

ইয়া আল্লাহ! তুমি তোমার পবিত্র কুরআনের বরকতে আমাকে, আমার পিতামাতাকে, আমার শাইখ ও উস্তাদদের, আমার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে এবং যারা এ মহান কাজের উৎসাহ যুগিয়েছেন বা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে ক্ষমা কর এবং দুনিয়া ও আখেরাতের বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা কর ও নিরাপদ রাখ। আর আমাদের সকলকে হযরত মুতারজিম ও তাফসীরকারের সঙ্গে জান্নাতুল ফেরদাওসে মিলিত করো। আমীন!

অনুবাদক
অধম গিয়াসুদ্দীন আহমদ
৩০, শেখ সাহেব বাজার, আজিমপুর, ঢাকা।
ফোন : ০২২২৩৩৬০৫৩৫

নিরীক্ষকের দু'টি কথা

{اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۝}

{اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۝ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۝}

{اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا۝ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا۝}

اللّٰهُمَّ ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك : فمنك وحدك لاشريك لك، فلك الحمد ولك الشكر؛ اللّٰهُمَّ ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك : فمنك وحدك لاشريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

اللّٰهُمَّ لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

اللّٰهُمَّ صل على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

আলহামদুলিল্লাহ্! ছুম্মা আলাহামদুলিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!! শোকর মাওলায়ে কারীমের। হাম্‌দ রাব্বে আজীমের। প্রশংসা সেই রাহমান-রাহীমের, যাঁর তাওফীক ও ইহসানের বদৌলতে তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ ও তাফসীরে উসমানীর এই বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এই মহৎ কাজে আব্বাজান ব্যয় করেছেন তাঁর জীবনের এক বড় অংশ। আল্লাহ পাকের দরবারে মুনাজাত করি, মুবারক হোক কালামে পাকের এই (অনূদিত) তাফসীর গ্রন্থ! করুণাময় আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে বরকতরাশি নাযিল করুন এর অনুবাদকের প্রতি! দয়াময় খোদা তাআলা বরকতময় করুন তাঁর কীর্তিময় এই খেদমতকে! এবং কবুল ও মাকবুল করুন।

আমার কাছে এর শোকর আদায় করার কোন ভাষা নেই যে, দয়াময় আল্লাহ তাআলা এই অধমের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন এবং শুধুই তাঁর মেহেরবানীতে অধমকে দান করেছেন কুরআন কারীমের এই খেদমতের সাথে একটু সম্পৃক্ততা! অধম সন্তানকে তাওফীক দিয়েছেন কুরআনী খেদমতের এক বরকতময় দীর্ঘ সফরে আপন পিতার পেছনে পেছনে

চলার, পথের কাঁটা-কন্টক পরিষ্কার করার কাজে তাঁর সামান্য খাদেম হওয়ার! অতএব শোকর তোমার হে মাওলা! হাম্‌দ ও সানা তোমার হে রব্!!

اللَّهُمَّ لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

আনন্দে আমার দিল ভরে যায় এবং রাহমান-রাহীমের রহমতের সামনে আমার মস্তক অবনত হয়ে যায়, যখন লক্ষ করি যে, আল্লাহ পাক আপন মেহেরবানীতে তাঁরই এক অধম বান্দার জন্য ব্যবস্থা করেছেন দুই 'হাসানাহ'র (বা কল্যাণের)। অতএব আশা করি, এর অসিলায় আল্লাহ দান করবেন দুই 'হুস্‌না' (বা নেকী)! একদিকে আল্লাহ তাআলা অধমকে তাওফীক দিয়েছেন কুরআন কারীমের একটি বরকতময় খেদমতে, তার তরজমা-তাফসীরের একটি উপকারী কাজে জীবনের কিছু সময় ও মুহূর্ত ব্যয় করার। আল্লাহুম্মা লাকাল হাম্‌দ! অধম গোলামের জীবনের কিছু অংশ ব্যয় হবে রাব্বে কারীমের কুরআন মাজীদের কোন খিদমতে –এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে?! অপরদিকে মাওলায়ে কারীম এই বান্দাকে সুযোগ দিয়েছেন আপন পিতার একটু সহযোগিতা করার– তাঁর জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইলমী কাজে, বরকতময় দীনি খিদমতে। বিশেষত পিতাও যখন পৌঁছে গিয়েছেন অতি বার্ধক্যে, উপনীত হয়েছেন জীবন-সায়াহ্নে। তবে এ বয়সেও কমেনি তাঁর কর্মচাঞ্চল্য, হারাননি তিনি উদ্যম-উৎসাহ! এমন সুন্দর দৃশ্য দেখেও সন্তান কি আন্দোলিত না হয়ে পারে! — رَبِّ ارحمهما كما ربياني صغيرا

আর শুধু কি এতটুকুই? না। তাফসীরে উসমানীর অনুবাদের এই কাজে আমাকে শরীক করে মুহতারাম আব্বাজান অধমের জন্য খায়র ও কল্যাণের এবং ইলমী ইস্তেফাদার একাধিক দ্বার অবারিত হওয়ার সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন আলহাম্‌দুলিল্লাহ। জাযাহুল্লাহু তাআলা আহসানাল জাযা! এই কাজে সামান্য অংশগ্রহণের বদৌলতেই আমি অধমের সুযোগ হয়েছে যুগের দুই মহা মনীষীর ইলমী ও কুরআনী দরবারে কিছু সময় কাটানোর অর্থাৎ ইমামুল হিন্দ, শাইখুল মাশাইখ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রাহ.) ও তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত একান্ত শিষ্য শাইখুল ইসলাম হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রাহ.)। মাওলার ইচ্ছায় আমার তাওফীক হয়েছে তাঁদের কুরআন-ফাহ্‌মী ও তাদাব্বুরে কুরআন (কুরআনের অর্থ-মর্ম অনুধাবনে অসাধারণ দক্ষতা এবং কুরআনে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে এর গুপ্ত উলূম ও নিগূঢ় বিষয়াবলি আহরণে, অনন্তর তা প্রকাশে খোদাপ্রদত্ত অস্বাভাবিক ব্যুৎপত্তি)– থেকে যৎসামান্য হলেও ইস্তেফাদা করার এবং উপকৃত-আলোড়িত হওয়ার! যদিও অধমের পাত্র খুবই ছোট আর ঝুলি ছেঁড়া-ফাটা।

উপরন্তু রাব্বে কারীম আমায় সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন তাঁর মহামহিম কুরআন কারীমের বরকতময় বাগানে কিছু মুহূর্ত অতিক্রান্ত করার। ফাহ্‌মুল কুরআনের (তথা কুরআন বোঝার ও কুরআন অনুধাবনের) উভয় শাখা অর্থাৎ 'তরজমাতু মাআ'নিল কুরআন' ও 'তাফসীরুল কুরআন'-এর সাথে তালিবুল ইলমসুলভ কিছু মুনাসাবাত ও সম্পর্ক কায়েম করার এবং এই

মোবারক জগতের তারকারাজি থেকে কিছু আলো গ্রহণ করার সাআদাতও হাসিল হয়েছে আব্বাজানের নির্দেশে তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ ও তাফসীরে উসমানীর এই খেদমতে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়েই। فالحمد لله تعالى على ذلك حمداً كثيراً

২

জীবনের দীর্ঘ সময় ব্যয় করে আব্বাজান যখন কিতাবের অনুবাদ থেকে ফারেগ হলেন, তা আমাকে দিলেন নজরে সানী করে দেওয়ার জন্য। আমি অধম স্বীয় অযোগ্যতা-অক্ষমতা সত্ত্বেও পিতার আদেশ পালনে এর জন্য প্রস্তুত হই। অতঃপর বেশ দীর্ঘ সময় ব্যয় করে নিজ সাধ্য অনুযায়ী কিতাবটির খেদমত করার চেষ্টা করি। সেই খেদমতের কিছু দিক এখানে উল্লেখ করছি—

(ক) পুরো কিতাব (বড় সাইজের প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠা) চার বার, বরং ততোধিকবার পড়া হয়েছে। আর আয়াতসমূহের তরজমা পাঁচ-ছয় বার নিবিষ্ট মনে অধ্যয়ন করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। এবং যথাসাধ্য সম্পাদনা ও পরিমার্জন করেছি। অনুবাদে কোন ত্রুটি থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করেছি এবং বহু স্থানে অনুবাদকে অধিকতর স্পষ্ট, বোধগম্য ও সহজ করার প্রতি নজর দিয়েছি। আয়াতসমূহের অনুবাদ ও তাফসীরের অনুবাদ উভয় ক্ষেত্রেই।

(খ) এই কিতাবে কালামে পাকের যে তরজমা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা 'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর হুবহু আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ নয়। বরং এক্ষেত্রে চেষ্টা করা হয়েছে উক্ত তরজমার সাথে النظم القرآني (কুরআনের আরবী মূলপাঠ)-কেও সামনে রাখার ও তাতে গভীর দৃষ্টি দেওয়ার। সংক্ষেপে বলতে গেলে- মূল উর্দূ তরজমার সাথে النظم القرآني -কে সামনে রেখে, ইরাব ও লুগাতুল কুরআন প্রভৃতি বিষয়াদি তাহকীক করে করে এবং প্রয়োজনে তাফসীরের আরো কিতাবাদির উপর নজর বুলিয়ে, قواعد ترجمة القرآن তথা তরজমাতুল কুরআনের নীতিমালার অনুসরণে বাংলায় তরজমা করার চেষ্টা আমরা করেছি। আল্লাহ কবুল করুন। ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করুন। ভবিষ্যতে একে আরো উন্নত করার তাওফীক দান করুন।

وذلك على الله يسير غير عسير

উক্ত কারণেই কিতাবের প্রচ্ছদে (ও অন্যান্য স্থানে) 'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ ও তাফসীরে উসমানী' না লিখে এভাবে লেখা হয়েছে- 'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ...'।

(গ) আয়াতের তরজমায় বহু স্থানে একাধিক তরজমা দিয়েছি। বিভিন্ন শাস্ত্রীয় কারণে কুরআনের বহু আয়াত বা আয়াতাংশের একাধিক তরজমা হতে পারে। বক্ষ্যমাণ কিতাবে এর প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে।

(ঘ) আয়াতসমূহের তরজমায় মূলানুগতার প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। এর সাথে সাবলীলতা রক্ষারও যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। আর তাফসীরের তরজমায় অধিক নজর দেওয়া হয়েছে সাবলীলভাবে মূল অর্থ-মর্ম প্রকাশের প্রতি, আক্ষরিক অনুবাদের প্রতি নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে আয়াতের তরজমা ও তাফসীরের অনুবাদ উভয় ক্ষেত্রে আমি পরিবর্তন-পরিমার্জনের কাজ করেছি।

(ঙ) তাফসীরে উসমানীতে অল্প শব্দে-বাক্যে বিপুল অর্থ-মর্ম প্রকাশ করা হয়েছে এবং বহু বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্যই কিতাবটি সুসংক্ষিপ্ত। এবং এতে আলোচনার ঢং খুব সহজ-সরল নয়। কোন কোন স্থানে বেশ জটিল। এমন কতক ক্ষেত্রে সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থে আমরা (আব্বাজান ও এই অধম) কিছু কথা যুক্ত করে দিয়েছি, যাতে আলোচনা স্পষ্ট হয়ে যায়। এ কথাগুলো বন্ধনীতে রাখা হয়েছে এবং সাধারণত শেষে 'অনুবাদক' লিখে দেওয়া হয়েছে, যাতে মূল কিতাবের বন্ধনীযুক্ত আলোচনা থেকে আলাদা করা যায়।

(চ) তাফসীরী টীকাগুলিতে যেসব হাদীস-রেওয়ায়াত এসেছে, তার তাখরীজ করা হয়েছে এবং হাদীস ও তাফসীরের কিতাবাদি থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, তাখরীজের এই কাজটি সংক্ষিপ্তাকারে করা হয়েছে। মূল চেষ্টা এ-ই ছিল যে, রেওয়ায়াতগুলো যেন সম্পূর্ণ হাওয়ালাবিহীন অবস্থায় না থাকে। অবশ্য অল্প কিছু রেওয়ায়াত এমনও আছে, বিবিধ কারণে আপাততঃ যার তাখরীজ করা সম্ভব হয়নি।

রইল এই তাফসীরে বিদ্যমান সমস্ত হাদীস-রেওয়ায়াত প্রভৃতির বিস্তারিত তাখরীজ এবং সেসবের শাস্ত্রীয় তাহকীকপূর্ণ পর্যালোচনা, তো এর উপর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচিত হতে পারে। আর ভবিষ্যতে আমরাও তাখরীজের কাজটিকে আরো সমৃদ্ধ করার এরাদা রাখি। আল্লাহই উত্তম তাওফীকদাতা।

(স্মর্তব্য যে, এটি [তাখরীজ] বক্ষ্যমাণ সংস্করণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য; যে সংস্করণটি আব্বাজানের তত্ত্বধানে ও অধমের সর্বশেষ নিরীক্ষণ, পরিমার্জন, তাহকীক ইত্যাদির মাধ্যমে প্রস্তুত হয়েছে এবং রাহনুমা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।)

এ ছাড়া আরো কিছু কাজ আল্লাহর তাওফীকে করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ততার উদ্দেশ্যে তার আলোচনা এড়িয়ে গেলাম।

কাজের কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছেন আমার কয়েকজন তালিবুল ইলম ভাই। আল্লাহ তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন– দুনিয়া ও আখেরাতে। এবং তাদের দান করুন সর্বপ্রকার সালাহ্ ও ফালাহ এবং কামিয়াবী ও সফলতা। তাদের মধ্যে মৌলভী আবদুল্লাহ সালেহ, মৌলভী মুহাম্মাদ হুযাইফা, মৌলভী মাহমুদ বিন সাইফুদ্দীন ও মৌলভী আফজাল হুসাইন বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য।

আর উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এর ইহসান ও অবদানের কথা বর্ণনার ভাষা আমার নেই। উস্তাযে মুহতারাম

থেকে যে কত কতভাবে এই কাজে উপকৃত হয়েছি, তা বর্ণনারও অতীত। এ আমার সৌভাগ্য যে, কাজগুলো হুজুরের সাথে মাশওয়ারা করে এবং তাঁর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ তাআলা হযরাতুল উস্তাযকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম জাযা দান করুন। তাঁর ছায়াকে আমাদের সকলের উপর দীর্ঘায়িত করুন।

মানবের কোন কাজ ত্রুটিমুক্ত হয় না। আর কাজ যদি সম্পাদিত হয় আমার মত দুর্বল হাতে, তবে তো তার সম্ভাবনা আরো বেশি। অতএব হতে পারে, এই কাজে দুর্বলতা রয়ে গেছে। আমরা একে আরো উন্নত থেকে উন্নততর করার চেষ্টা অব্যাহত রাখব ইনশাআল্লাহ। পাঠকগণেরও কেউ ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হলে তা আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল। আমরা আন্তরিকতার সাথে সেগুলো গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ।

৩

কিতাবটির প্রকাশনা প্রসঙ্গে—

আব্বাজানের অনূদিত তাফসীরে উসমানী আরেকটি লাইব্রেরী থেকেও প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে আমার নামও দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে দুটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়——

● কিতাবের প্রকাশনা বিষয়ে ওই লাইব্রেরীর সাথে একটি জটিলতা তৈরি হলে আমরা উভয় পক্ষ দুইজন প্রাজ্ঞ আলেমকে শরয়ী ফয়সাল মানি এবং আমাদের মাঝে মীমাংসা ও ফয়সালা করে দেওয়ার অনুরোধ করি। আলহামদুলিল্লাহ! তাঁরা আমাদের অনুরোধের ভিত্তিতে ফয়সালা করে দেন।

এই ফয়সালা অনুসারে ওই লাইব্রেরীও পূর্ণাঙ্গ তাফসীরে উসমানী ছাপতে পারবে। তবে জটিলতা সৃষ্টির পূর্বে যতটুকু কাজ হয়েছিল, তারই ভিত্তিতে। আর আমরা ছাপব অধিকতর সম্পাদনা ও পরিমার্জন করে। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কিতাবের স্বত্ব আব্বার থাকবে। ওই লাইব্রেরী প্রকাশক হিসাবে কিতাব ছাপবে। এজন্যই ফয়সালায় লেখা হয়েছে– ওই লাইব্রেরী এ কথা লিখবে না যে, 'স্বত্ব : প্রকাশকের'। বরং লিখবে : 'সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত'। অপরদিকে আব্বাজানের তত্ত্বাবধানে ছাপা কিতাবে লেখা হবে : 'সর্বস্বত্ব অনুবাদকের'।

● ফয়সালা অনুসারে, আমাদের অধীনে প্রকাশিতব্য সংস্করণের জন্য আমি পুরো কিতাব আরেকবার পড়েছি এবং সমস্ত কিতাবে সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজ করেছি। এ ছাড়া আরো কাজ করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। (এটি আমাদের সংস্করণেরই বৈশিষ্ট্য)

ওই লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত কিতাবের অনুবাদক আব্বাই এবং একটা পর্যায় পর্যন্ত তাতে আমারও কাজ আছে। তা হচ্ছে, তৃতীয় প্রুফের কারেকশন তোলার আগ পর্যন্ত। এরপর থেকে ওই সংস্কণের সাথে আমার সম্পর্ক নেই। আর তারপর আমরা যত কাজ করেছি (এবং ভবিষ্যতে করব ইনশাআল্লাহ), ফয়সালা অনুসারে তা আমাদের সংস্করণেরই একক বৈশিষ্ট্য।

কিতাবের নিরীক্ষণ ও পরিমার্জন একটি চলমান কাজ, যা কিতাবের পুনর্মুদ্রণ ও সংস্করণের সাথে সাথে অব্যাহত থাকে। তা কোন পর্বে গিয়ে সম্পূর্ণ থেমে যায় না। অতএব বর্তমানে আমার সংশ্লিষ্টতা না থাকা সত্ত্বেও যখন ওই সংস্করণে অধমের নাম দেওয়া হয়েছে, তখন এও উল্লেখ করা দরকার ছিল যে, এই নিরীক্ষকের সংশ্লিষ্টতা অমুক তারীখ বা কাজের অমুক পর্যায় পর্যন্ত; তার পরে নয়।

৪

তাফসীরে উসমানীর বৈশিষ্ট্যাবলি কী কী এবং তাতে তাফসীরের কোন্ কোন্ দিকের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু আলোচনা ইতিপূর্বে পাঠকের সামনে চলে এসেছে। যেমন, হযরাতুল উস্তায মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেবের ভূমিকা, উলামায়ে কেরামের তাকরীযাত অর্থাৎ মূল্যায়নসমূহ, আব্বাজানের ভূমিকা প্রভৃতি লেখাতে। এই কিতাবের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পুরো কিতাব কুরআনী ও তাফসীরী উলূম-মাআরেফে (জ্ঞানরাজি ও প্রজ্ঞামালায়) একদম ঠাসা। এর প্রায় প্রতিটি টীকাতে কুরআনী মনি-মুক্তা এমনভাবে পরিবেশন করা হয়েছে যে, অভিভূত হতে হয়।

আরেকটি দিক হল– 'তাদাব্বুরে কুরআন' কাকে বলে? এর স্বরূপ ও তাৎপর্যই বা কী? কুরআনের একজন মুদাব্বির তাদাব্বুরে কুরআনের বদৌলতে কুরআনরূপ সাগর থেকে কেমন গভীর ও কত সূক্ষ্ম বিষয়াদি তুলে নিয়ে আসেন? এসব কিছুর অতি উত্তম নমুনা হল বক্ষ্যমাণ তাফসীরে উসমানী!

কুরআন হচ্ছে উত্তম নসীহতের কিতাব। এতে মানবের রবের পক্ষ থেকে সর্বশ্রেণির মানবের জন্য রয়েছে উপদেশমালা এবং উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর ওয়াজ ও নসীহাহ্। এসব কুরআনী মাওয়ায়েজ ও নসীহতমালার উৎকৃষ্ট ও অতি উপকারী ব্যাখ্যাগ্রন্থ হচ্ছে এই তাফসীরে উসমানী। আল্লামা উসমানী রাহ. এমন বিস্ময়কর ও ঈমান জাগানিয়া তরীকায় উক্ত মাওয়ায়েজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন যে, তাতে কুরআন-পাঠকের হৃদয় ও মন খুব প্রভাবিত হয় এবং তার অন্তর্জগত বিপুলভাবে আন্দোলিত হয়। অসম্ভব নয় যে, কোন পাষাণ হৃদয়ে এসব আলোচনা পড়ে এমন হালত হবে যা ঝড়ের গতি ও শক্তি নিয়ে তাকে বিনয়াবনত করে ফেলবে এবং কুরআন নাযিলকারী মহান রবের শাহী দরবারে এক নাফরমান মানব পরিণত হবে ফরমাবরদার বান্দায়!

তলাবায়ে কেরাম যদি এই তাফসীরের ওই স্থানগুলো মনোযোগ সহকারে পড়েন, যেখানে আল্লামা উসমানী রাহ. কোন রেওয়ায়েত বিশেষত ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বা ইশারা-ইঙ্গিতে আলোচনা করেছেন এবং কখনো কখনো কোন তাফসীর লেখকের অবহেলা-অসর্তকতার কথা তুলে ধরেছেন— তাহলে এসব স্থান থেকে অনেক উপকৃত হতে পারবেন এবং তাফসীরী রেওয়ায়াত বিষয়ে নিজের মধ্যে সুস্থ রুচিবোধ তৈরি করতে পারবেন। এর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ পয়দা হবে তাহকীক ও সর্তকতার মানসিকতা। আল্লাহ তাআলা উত্তম তাওফীকদাতা।

পরিশেষে বর্তমান কিতাবের কিছু মোটা মোটা বিষয় ও সহজ-সরল উপকারী দিকও উল্লেখ করছি, যার উপর নজর রাখলে প্রাথমিক তলাবা ও সাধারণ পাঠকদের উপকার হবে বলে আশা করা যায়—

- ❒ লুগাতুল কুরআন, ই'রাবুল কুরআন ও তরজমাতুল কুরআনের নীতিমালার প্রতি লক্ষ রেখে কুরআনুল কারীমের মূলানুগ ও শাস্ত্রীয় সাবলীল তরজমা।
- ❒ বহু স্থানে আয়াতের/আয়াতাংশের একাধিক তরজমা।
- ❒ পূর্বাপর সম্পর্ক, শানে নুযূল, সংশ্লিষ্ট ঘটনা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা।
- ❒ পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণের তাফসীর ও অভিমতসমূহের সারনির্যাস।
- ❒ বিভিন্ন আয়াত সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক আপত্তিসমূহের প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব।
- ❒ 'মুশকিলাতুল কুরআন'-এর ইলমী সমাধান।
- ❒ তাফসীরের বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে বিশুদ্ধতম মত গ্রহণ।

আল্লাহ তাআলা কিতাবটিকে কবুল করুন। দুনিয়া-আখেরাতে এর দ্বারা আমাদের উপকৃত করুন। একে আমাদের পরকালীন নাজাতের অসিলা বানান। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

সাঈদ আহমদ
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া
২৯ যিলকদ ১৪৪৩ হি.
৩০ জুন ২০২২ ঈ.

"তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ" এর মূল "মূযেহুল কুরআন"-এ কুরআনের উর্দূ তরজমার সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান রাহ. এর লিখিত বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সার :

বিশ্ববিখ্যাত আলেম, যুগশ্রেষ্ঠ ওলীআল্লাহ, দেওবন্দ মাদরাসার শাইখুল হাদীস, শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান রাহ. তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত সম্পর্কধারী ও বন্ধুবান্ধব একখানি তরজমায়ে কুরআন রচনার অনুরোধ করতে থাকলে এই বলে এড়িয়ে যেতে থাকেন যে, 'আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীগণ যথা: শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবীর ফারসী তরজমা এবং তাঁর সুযোগ্য দুই ছেলে শাহ আব্দুল কাদের রাহ. ও শাহ রফীউদ্দীন রাহ. এর বিশুদ্ধ উর্দূ তরজমা রয়েছে। এ ছাড়াও মাওলানা আশেক এলাহী মিরাঠী এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভী-এর কুরআনে পাকের বিশুদ্ধ তরজমাই সুধি পাঠকদের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট। এমতাবস্থায় কুরআনের আরেকখানা তরজমা রচনা করার অর্থ তরজমাকারীদের তালিকায় একজন নতুন অনুবাদকের নাম সংযোজন করা ছাড়া আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না'।

তারপরও হযরতের বন্ধুবান্ধব ও সুধি মহলের অনুরোধ-উপরোধ চলতে থাকলে তিনি তাঁদের সান্ত্বনা বাণী শুনিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, দেখি।' এরপর তিনি প্রাচীন ও আধুনিক কালের তরজমায়ে কুরআন গভীরভাবে পাঠ করতে শুরু করেন। প্রথমেই শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী রাহ. ও তাঁর দুই পুত্র শাহ রফীউদ্দীন রাহ. ও শাহ আব্দুল কাদের রাহ. এর তরজমা মনোনিবেশসহ পাঠ করে পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে, তাঁরাই বস্তুত এ পথের পথিকৃত। এই পবিত্রাত্মাগণ পবিত্র কুরআনের এই খেদমত না করে গেলে পরবর্তীকালে কুরআনের তরজমার কাজ আঞ্জাম দেওয়া দুরূহ হত। এমনকি, জাঁদরেল আলেমদের পক্ষেও বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য তরজমা প্রকাশ করার জন্য বহু তাফসীরগ্রন্থ পাঠ করতে হত এবং গভীর চিন্তা ও গবেষণা করতে হত। কিন্তু এত কষ্ট ও সাধনার পরও এঁরা এমন তরজমা করতে পারতেন না, যা তাঁরা করতে পেরেছেন।

শাহ আব্দুল কাদের রাহ.-এর তরজমায়ে কুরআন এবং এর সৌন্দর্য

বিজ্ঞ ও পবিত্রাত্মা আলেমগণের মতে শাহ আব্দুল কাদের ছাহেবের তরজমা যেমন ছিল সর্বপ্রথম উর্দূ তরজমা, তেমনই ছিল বিশুদ্ধতম তরজমা। হযরত শাইখুল হিন্দ রাহ. বলেন, 'আমি অধম নিজ মুরুব্বীদের কাছে শুনেছি, যখন শাহ ছাহেব 'মূযেহুল কুরআন' লিখে সমাপ্ত করলেন, তখন তিনি ফারসী ভাষার একটি কাব্যাংশকে ঈষৎ পরিবর্তন করে এভাবে পড়তেন:

روز قیامت ہر کسے باخویش دارد نامہ ☆ من نیز حاضر میشوم تفسیر قرآں در بغل

'কিয়ামতের দিন সবার হাতে যার যার আমলনামা থাকবে। আমিও সেদিন আমার তাফসীরখানি হাতে নিয়ে উপস্থিত থাকব।'

বলা বাহুল্য, আল্লাহ-প্রেমের আবেগ ও উচ্ছ্বাসভরা এক নিবেদিতপ্রাণের ভাষায় শাহ ছাহেব রাহ. উক্ত ছন্দটি পড়তেন।

হযরত শাহ ছাহেব রাহ. এর তরজমার বিভিন্ন সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত শাইখুল হিন্দ রাহ. বলেন, 'শাহ ছাহেব রাহ. হচ্ছেন, উর্দূ ভাষার বাগধারায় কুরআনের তরজমার স্থপতি ও পথিকৃত। আর কুরআনের তরজমার আসল ফায়দা ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুরআন শরীফ বুঝতে যেন সহজ হয়। বলা বাহুল্য, এ উদ্দেশ্য বাগধারা অনুসারে তরজমা করলে যেমনটি হাসিল হয়, তা আক্ষরিক অনুবাদ দিয়ে হতে পারে না। শাহ রফীউদ্দীন রাহ. এর কৃতিত্ব এই যে, তিনি আক্ষরিক অনুবাদের মাধ্যমে এক বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত সহজ-সরল অর্থ বোঝানোর কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। আর শাহ আব্দুল কাদের রাহ. এর কৃতিত্ব এই যে, তিনি বাগধারার পূর্ণ অনুসারী হয়ে কুরআনের শব্দমালার বিন্যাস ও ক্রমিকতার সাথে তরজমার এমনই সুসামঞ্জস্য/সুসম্পাদন করেছেন যে, বেশি বলতে তো ভয় হয়, তবে এতটুকু অবশ্যই বলব যে, আমাদের মত মানুষের দ্বারা এ কাজ কখনই হতে পারত না। আমরা যদি তাঁর সাদামাটা সংক্ষিপ্ত শব্দাবলীতে আল্লাহর কালামের সৌন্দর্য এবং এর লক্ষ ও উদ্দেশ্য বুঝে নিতে পারি, তবুও তা আমাদের মত মানুষের জন্য গৌরবের বিষয় বলে সাব্যস্ত ও যথেষ্ট হবে।

উক্ত তরজমায়ে কুরআনের সংস্কারমূলক খেদমতের প্রয়োজনীয়তা

'তবে এখন দেখার বিষয় হচ্ছে যে, হযরত শাহ ছাহেব রাহ. এর এই সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম উর্দূ তরজমা থাকতে এর মধ্যে এমন কী কী অসুবিধা আছে, যে কারণে আমাদের জন্য অন্য কোন তরজমার প্রয়োজন হতে পারে? এ সম্পর্কে বড় বড় বিজ্ঞজনের মতামত অনুযায়ী মোট দুটি অসুবিধাই এমন পাওয়া যায়, যে কারণে সাধারণত পাঠকবৃন্দ শাহ ছাহেবের তরজমা দ্বারা উপকৃত হতে অক্ষম হচ্ছেন। প্রথমত, উক্ত তরজমায় ব্যবহৃত কিছু শব্দ ও বাকপ্রণালী বর্তমানকালে অপ্রচলিত বা প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, শাহ ছাহেব রাহ. যেহেতু তরজমায় কুরআনী শব্দাবলীর সামঞ্জস্য ও অনুগামিতার প্রতি অতিমাত্রায় দৃষ্টি রেখেছেন এবং তরজমার শর্তাবলী দৃঢ়তার সাথে মেনে চলেছেন, সেজন্য কোন কোন স্থানে বর্তমানকালের পাঠকদের মধ্যে যারা পাঠে সহজ-সরলতা পছন্দ করেন, তাদের জন্য শাহ ছাহেব রাহ. এর এবারত (text) এর অর্থ বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'যা হোক, পবিত্র কুরআনের তরজমা দেখা-শুনা ও পাঠ করতে করতে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী একটি কথা অন্তরে বসে গেল যে, হযরত শাহ ছাহেব রাহ. এর বিশুদ্ধতম, মকবুল

ও উপকারী তরজমাখানি না জানি ক্রমান্বয়ে ব্যবহারযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে কিনা! এমনটা হলে হযরত শাহ ছাহেবের প্রতি বড় অকৃতজ্ঞতা, অবমূল্যায়ন ও আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। আর তাও সামান্য আপত্তির কারণে। তাই এই অধমের ধারণা হল যে, উল্লিখিত তরজমায় দুটিমাত্র অসুবিধা আছে, যথা: কিছু শব্দাবলী ও বাগধারা পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়া এবং কোন কোন স্থানে তরজমার শব্দাবলী সংক্ষিপ্ত হওয়া।

সংস্কারমূলক খেদমতের স্বরূপ

অতএব যদি গভীর চিন্তা ও যত্নের সাথে সেই পরিত্যক্ত শব্দগুলির স্থানে বর্তমানকালের ব্যবহৃত শব্দাবলী পরিবেশন করা হয় এবং সংক্ষিপ্ততার স্থানগুলিতে কিছু (সংক্ষিপ্ত) শব্দ বাড়িয়ে দিয়ে দুর্বোধ্যতা দূর করা যায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ হযরত শাহ ছাহেবের এই অতুলনীয় অবদানখানি জারি থাকবে এবং ভারত উপমহাদেশের মুসলমানগণ এর বিশেষ ফায়দা দ্বারা উপকৃত হতে থাকবেন। এ বিষয় চিন্তা করে আমার মুখলিস ভাইদের নিকট তা পেশ করলে তাঁরাও এই অধমের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেন। অতএব নতুন কোন তরজমা-গ্রন্থ রচনা করার তুলনায় শাহ ছাহেব রাহ. এর তরজমায় সৃষ্ট অসুবিধাগুলো দূর করে দেওয়াই সাব্যস্ত হল। অতঃপর আল্লাহর নাম নিয়ে অধম এ খেদমতে লেগে গেল এবং মাঝ পথে কিছু বাধা-বিপত্তি আসার পরও আল্লাহপ্রদত্ত শক্তি ও সামর্থের ফলে হযরত শাহ ছাহেব রাহ. এর তরজমার উল্লিখিত দুটি সংস্কারের খিদমত ১৩৩৬ হিজরীতে পূর্ণ হল।

{ إن ربي لطيف لما يشاء } - والحمد لله

উক্ত তরজমার কিছু বৈশিষ্ট্য

এখন হযরত শাহ ছাহেব রাহ. এর তরজমার কিছু সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখা হচ্ছে। তিনি সূচনাতেই নিজ তরজমা সম্পর্কে এইটুকু কথা বলেছেন– 'উর্দূ আর আরবীর বাগধারা কখনো একটি অপরটির অনুকূল নয়। এজন্য পবিত্র কুরআনের আক্ষরিক তরজমা করলে হিন্দুস্তানের লোকদের পক্ষে বোঝা কঠিন হবে। তাই আমি প্রত্যেক শব্দের প্রতি লক্ষ রেখে নয়, বরং সামগ্রিক আয়াতের প্রতি লক্ষ রেখে তরজমা করেছি। অর্থাৎ উর্দূ ভাষার বাগধারার অনুকূল তরজমা করেছি, আক্ষরিক তরজমা করিনি।' এই হচ্ছে হযরত শাহ ছাহেবের কথার সারাসার।

❖ শাহ ছাহেব রাহ. এর উপরোক্ত কথা কিছুটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। বলতে গেলে, হযরত শাহ ছাহেব রাহ. কুরআনের তরকীব বা ক্রমিকতার প্রতি খুবই খেয়াল রেখেছেন এবং আয়াত ও তরজমার মধ্যে মিল বা সামঞ্জস্য বিধানে খুব বেশি চেষ্টা করেছেন। তবে বাগধারায় অনুবাদ করায় অর্থ বোঝানোর ও সহজিকরণের প্রয়োজনে কোনো কোনো স্থানে শব্দাবলীর আগ-পিছ করতে হয়েছে। তবে তরজমার শব্দ কুরআনের শব্দ থেকে খুব দূরবর্তী হয়নি। ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনের সময় দুই তিন শব্দের দূরত্ব হয়েছে। তবে এ যেন না

হওয়ার মতই। যেমন, আরবীতে বলা হয় 'غلام زيد', কিন্তু উর্দূ বাগধারায় বলা হয়- 'زيد كا غلام' এখানে শব্দের ক্রমিকতা পরিবর্তিত হলেও শব্দ দুটি নিকটবর্তীই রয়েছে। আর এরূপ স্থলে এ-ই জরুরী। তবে শাহ ছাহেব রাহ. এর সতর্কতা প্রশংসার যোগ্য। কারণ, একটু অবকাশ থাকলেই এমন স্থলেও তরজমার শব্দাবলী আগে-পিছে করেননি। যেমন : {اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ}(সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি প্রতিপালক সমগ্র বিশ্বের।) এবং {مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ} (যিনি মালিক প্রতিফল দিবসের।)

❖ কিন্তু কোন কোন স্থান এমনো আছে, যেখানে উর্দূর বাগধারার সাথে কুরআনের (শব্দাবলীর) ক্রমিকতা রক্ষা করা সুকঠিন। এমন স্থলেও শাহ ছাহেব রাহ. নিজের গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এমন পন্থা অবলম্বন করেছেন, যাতে উর্দূ বাগধারার সাথে আরবী শব্দাবলীর ক্রমিকতাও রক্ষা পায়, আর পার্থক্য যদি বা হয়ই, তা অতি সামান্যই।

❖ শাহ ছাহেব রাহ. তরজমায় আরো কিছু ছোট-খাট পরিবর্তন করেছেন। যেমন, তরজমায় কোন একটি সংক্ষিপ্ত শব্দ বাড়িয়ে দিলেন, যাতে সংশ্লিষ্ট অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথবা বক্তার উদ্দেশ্যটি নির্ধারিত হয়ে যায়।

অনুরূপ ক্ষেত্রবিশেষে কোন কোন শব্দের অর্থ ছেড়েও দিয়েছেন- যেমন, বহু স্থানে 'إِنَّ' এর তরজমা করেননি; 'يا أبت' এর তরজমা 'হে আমার পিতা' না করে 'হে পিতা' করেছেন; 'يا بني' এর তরজমা 'হে আমার ছোট ছেলে' না বলে 'হে বৎস' বা 'হে ছেলে' লিখেছেন। তদ্রূপ 'يا رب' এর তরজমা 'হে আমার রব' না করে বহু স্থানে 'হে রব' করেছেন। মোদ্দাকথা, এ ধরণের পরিবর্তনে কোন ক্ষতি নেই। এমনকি, আক্ষরিক অনুবাদেও এর অবকাশ আছে।

❖ হযরত শাহ ছাহেব রাহ. নিজ তরজমায় আরো যেসব বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখেছেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে, তরজমার মধ্যে তিনি সংক্ষিপ্ততা ও সহজিকরণ এবং কুরআনের শব্দাবলীর শাব্দিক ও আর্থিক সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। আর তিনি শুধু আভিধানিক অর্থের উপরই ক্ষান্ত হননি, বরং কালামের ভাবার্থ ও আসল উদ্দেশ্যের প্রতি অসামান্য যত্ন ও মনোযোগ দিয়েছেন। সে জন্য তরজমাতে কখনো এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে সংক্ষিপ্ততার কারণে দুর্বোধ্যতা ও কোন প্রশ্ন দেখা দিয়ে থাকলে তা দূরিভূত হয়ে যায়।

❖ অনেক সময় একই শব্দের তরজমা এক স্থানে এক রকম, অন্য স্থানে ভিন্ন রকম করেছেন। অথচ শব্দটির আভিধানিক অর্থ একই। কিন্তু (প্রত্যেক স্থানের প্রেক্ষাপট ভিন্ন থাকায়- অনু.) প্রত্যেক স্থানের মুনাসিব পৃথক পৃথক শব্দে তা প্রকাশ করেছেন। এর ফলে কুরআনের উদ্দেশ্য ও মর্ম বুঝতে খুবই সুবিধা হয়েছে। এই সহজিকরণ ও স্পষ্টতার দিক লক্ষ করে কখনো 'হ্যাঁ' সূচক বিষয় 'না' সূচক উক্তিতে প্রকাশ করেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'না' সূচক বাক্য ও ব্যতিক্রমধর্মী বাক্যের পৃথক পৃথক তরজমা করেননি, বরং বাক্যের যে উদ্দেশ্য, তা সংক্ষিপ্ত শব্দাবলীতে বাগ্ধারার সাথে সঙ্গতি রেখে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

❖ بدل، تمییز، حال প্রভৃতি এবং مفعول مطلق এর মূল মর্ম ও উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রেখেছেন। একই সাথে উর্দূ বাগধারা অনুযায়ী শব্দ ও মর্ম উভয় দিকের প্রতি লক্ষ রেখে অত্যন্ত যত্নশীলতা ও গবেষণার সাথে কাজ করা হয়েছে এবং মর্ম ও উদ্দেশ্য সহজ করতে ও ব্যাখ্যা দিতে পূর্ণ চিন্তা-ফিকির ও সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে।

মোটকথা, এসব কারণে হযরত শাহ ছাহেব রাহ. এর তরজমা সমস্ত তরজমার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং উপকারের দিক থেকে সবচেয়ে উপকারী মনে হয়। কবির কথায়–

ایں سعادت بزور بازو نیست ☆ تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

'এ সৌভাগ্য বাহুবলে হাসিল হয় না। মহান আল্লাহ যাকে দান করেন, কেবল তিনিই তা লাভ করেন।'

তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ ও তাফসীরে উসমানী সম্পর্কে কিছু উপকারী তথ্য–

● এই তাফসীরে আয়াতসমূহের তরজমা পুরোটা হযরত শাইখুল হিন্দ রাহ.-এর করা। তবে এ তরজমায়ে কুরআন স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ নতুন তরজমা নয়। বরং এর মূল হচ্ছে হযরত শাহ আব্দুল কাদের রাহ.-এর তরজমা, যার মধ্যে শাইখুল হিন্দ তাসহীল-তাইসীর (সহজিকরণ) ও কিছু সম্পাদনার কাজ করেছেন। শাইখুল হিন্দ রাহ.-এর অনুভূতি হল, তিনি শাহ ছাহেবের তরজমারই খেদমত করেছেনমাত্র।

● শাহ আব্দুল কাদের রাহ.-এর সেই আসল তরজমা আমাদের যুগেও আপন ঔজ্জ্বল্যসহ বিদ্যমান। দিল্লির বহুত বড় আলেম হযরত মাওলানা আখলাক হুসাইন কাসেমী রাহ. অনেকগুলো (দশের অধিক) মাখতূতা তথা পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে এর বিশুদ্ধ নুসখা (কপি) তৈরি করেন। যা 'مستند موضح قرآن' নামে প্রকাশিত হয়। (মাশাআল্লাহ বাংলা ভাষাতেও এর অনুবাদ মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে ছেপেছে)।

● রইল তাফসীরে উসমানীর তাফসীর অংশ, তো সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারাহ ও সূরা নিসা– এই তিন সূরার তাফসীর হযরত শাইখুল হিন্দ কৃত। বাকি সূরাগুলো অর্থাৎ সূরা আলে ইমরান এবং সূরা মায়েদা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাসমূহের তাফসীর লিখেছেন শাইখুল হিন্দেরই প্রিয়ভাজন ও অতি মু'তামাদ ছাত্র শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ.। (মনে করা হয়, শাইখুল হিন্দ রাহ. সূরা আলে ইমরানেরও তাফসীর লিখে থাকবেন। কিন্তু মাল্টা থেকে ফিরে আসার পর হযরতের কাগজপত্রে সূরাটির তাফসীর খুঁজে পাওয়া যায়নি।)

তাফসীরে উসমানীতে তাফসীরের কতটুকু শাইখুল হিন্দের আর কতখানি আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানীর- এ বিষয়ে খুব অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি ছিল। বরং কারো কারো যেহেনে এখনো আছে। বিষয়টি নিয়ে হযরত ইউসুফ বিন্নুরী ও শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ.ও আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাতে পুরো সুরাহা হয়নি।

(আমার যতদূর জানা), এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দলীল-দস্তাবেজের আলোকে পূর্ণ তাহকীক পেশ করেছেন মুহাক্কিকে যমান, হযরত মাওলানা নূরুল হাসান রাশেদ কান্ধলভী দা. বা. এই কিতাবে—

"شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کا اصل مقدمۂ ترجمۂ قرآن"

তাফসীরে উসমানী অনেক মাকতাবা থেকে প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রায় সকল মাকতাবার (إلا ماشاء الله) এডিশনের শুরুতে উক্ত বিষয়ে ভুল বা অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট তথ্য উল্লেখ করা থাকে।

● হযরত শাহ আব্দুল কাদের রাহ.-এর তরজমা-তাফসীরের নাম موضح قرآن (মূযিহে কুরআন)। এর সাথে মিল রেখে শাইখুল হিন্দ রাহ. তাঁর কিতাবের নাম রেখেছেন موضح فرقان (মূযিহে ফুরকান)। শুধু قرآن ও فرقان এর পার্থক্য। পার্থক্যও শুধুই শব্দে, মর্মগত দিক থেকে নয়। فرقان তো قرآن-এরই অন্যতম সিফাত, পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু এই নামটি এখন আর তেমন প্রসিদ্ধ নয়। তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ ও তাফসীরে উসমানী এ নামদ্বয়ই বেশি প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

● হযরত শাইখুল হিন্দ রাহ. স্বীয় তরজমা-তাফসীরের জন্য একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন। এতে তিনটি বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন : ১- তাঁর এই কাজের ধরন ও প্রকৃতি ২- তাঁর কাজের কারণ ও তাৎপর্য ৩- শাহ আব্দুল কাদের রাহ.-এর তরজমার পরিচিতি, বৈশিষ্ট্যাবলি, রূপ-সৌন্দর্য, ফাওয়াইদ ও উপকারিতা এবং সমকালীন অন্যান্য তরজমা থেকে তার অগ্রগণ্যতা, ইত্যাদি।

তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ ছাপার আগেই এ ভূমিকাটি ছাপা হয়। পরবর্তীতে তরজমা-তাফসীর ছাপলে (কোন কোন এডিশনের) শুরুতে ভূমিকাটির খোলাসা ছাপা হয়। তরজমায়ে শাইখুল হিন্দের শুরুতে থাকায় এই সংক্ষেপিত ভূমিকাটিই মানুষের মাঝে প্রচলিত হয়ে যায়। আর মূল লেখাটি দূর্লভ হয়ে যায়।

এখন কয়েক বছর পূর্বে (২০১৬-তে) হযরত মাওলানা নূরুল হাসান রাশেদ কান্ধলভী দা. বা-এর হাতে মূল পূর্ণাঙ্গ ভূমিকাটি ছেপে এসেছে, যার নাম হল,

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کا اصل مقدمۂ ترجمۂ قرآن مجید

আল্লাহ তাআলা হযরতকে জাযায়ে খায়র দান করুন। কিতাবটিতে আরো অনেক فوائد و عوائد রয়েছে। আমার এ লেখার অনেক কিছু এই কিতাব থেকেই নেওয়া।

● মাওলানা দা. বা. এই কিতাবে যে তথ্য দিয়েছেন তা অনুযায়ী একটি অতি আনন্দকর খবর হল, হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ.-এর স্বহস্তে লেখা তাফসীরে উসমানীর মাখতূতা (পাণ্ডুলিপি) সংরক্ষিত রয়েছে। ভারতের উত্তর প্রদেশের প্রসিদ্ধ এলাকা বিজনূরে। মদিনা প্রেস বিজনূর ভবনে। মাওলানা সেখানে গিয়ে মাখতূতাটি দেখেছেন এবং এর কয়েক পৃষ্ঠার ছবি উক্ত কিতাবের শেষে যুক্ত করে দিয়ে আমাদের জন্যও তা দেখার ব্যবস্থা করেছেন।

(সংকলনে- সাঈদ আহমদ)

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ.-এর

স্বহস্তে লিখিত তাফসীরে উসমানীর পাণ্ডুলিপির চিত্র

(হযরত মাওলানা নূরুল হাসান রাশেদ কান্ধলভী দা. বা.-এর
সম্পাদিত ও প্রকাশিত কিতাব 'হযরত শাইখুল হিন্দ কা আসল মুকাদ্দামায়ে তরজমায়ে
কুরআন' এর সৌজন্যে)

علامہ شبیر احمد عثمانی کے لکھے ہوئے حواشی ترجمۂ شیخ الہند کے مسودہ کے صفحات

فوائد متعلقہ ۔۔۔ (سورۃ آل عمران)

ف۱ نجران کے ساٹھ عیسائیوں کا ایک معزز وفد نبی کریم صلعم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جس میں
تین شخص عبد المسیح عاقب بحیثیت امارت و سیادت کے، ایہم السید بحیثیت رائے و تدبیر کے، اور ابوحارثہ بن علقمہ
باعتبار سب سے بڑے مذہبی عالم اور لاٹ پادری کے عام شہرت و امتیاز رکھتے تھے۔ یہ تیسرا شخص اصل میں
عرب کے مشہور قبیلہ بنی بکر بن وائل سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر پکا نصرانی بن گیا۔ سلاطین روم نے اسکی مذہبی صلابت
اور مجد و شرف کو دیکھتے ہوئے بڑی تعظیم و تکریم کی۔ علاوہ بیش قرار مالی امداد کے اسکے لیے گرجے
تعمیر کیے اور امور مذہبیہ کے اعلیٰ منصب پر مامور کیا۔ یہ وفد بارگاہ رسالت میں بڑی آن بان سے حاضر ہوا
اور متنازع فیہ مسائل میں حضور سے گفتگو کی جسکی پوری تفصیل محمد بن اسحاق کی سیرۃ میں منقول ہے۔
سورۃ آل عمران کا ابتدائی حصہ تقریباً اسی اوپر آیات تک اسی واقعہ میں نازل ہوا۔ عیسائیوں کا
پہلا اور بنیادی عقیدہ الوہیت تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام بعینہ خدا یا خدا کے بیٹے یا تین خداؤں میں سے ایک ہیں۔
سورۃ ہذا کی پہلی آیت میں توحید خالص کا دعویٰ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی جو صفات حی قیوم بیان کی گئیں
وہ عیسائیوں کے اس دعویٰ کو صاف طور پر باطل ٹھہراتی ہیں۔ چنانچہ حضور نے دوران مناظرہ میں ان سے
فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ حی (زندہ) ہے جس پر کبھی موت طاری نہیں ہو سکتی اور اسی نے
تمام مخلوقات کو وجود عطا کیا اور سامان بقا بہم پہنچا کر اپنی قدرت کاملہ سے تھام رکھا ہے۔ برخلاف
اس کے عیسیٰ علیہ السلام پر یقیناً موت و فنا آکر رہے گی۔ اور ظاہر ہے جو شخص خود اپنی ہستی کو برقرار نہ رکھ سکے
وہ دوسری مخلوقات کی ہستی کیا برقرار رکھ سکتا ہے۔ نصاریٰ نے سنکر اقرار کیا (کہ بیشک ...)
انھوں نے غنیمت سمجھا ہوگا کہ آپ نے ان کے اعتقاد کے موافق بصیغہ یاتی علیہ الفناء ... [illegible]
... اگر جواب فی الجملہ ... عقیدہ کے موافق ... [illegible]

[illegible]

علامہ شبیر احمد عثمانی کے لکھے ہوئے حواشی ترجمہ شیخ الہند کے مسودہ کے صفحات

[illegible] في التعوذ بهما فاشتبه عليه الحال بين القرآن او ليستا منه فلم يكتبهما في مصحفه
قاضی ابوبکر باقلانی لکھتے ہیں لم ینکر ابن مسعود کونهما من القرآن وانما انکر
اثباتهما في المصحف فانه كان يرى ان لا يكتب في المصحف شيئا الا ان كان
النبي صلى الله عليه وسلم اذن في كتابته فيه وكانه لم يبلغه الاذن (فتح الباري ج ۸ ص ۵۷۱)
حافظ نے ایک اور عالم کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں لم یکن اختلاف ابن مسعود
مع غيره في قرآنيتهما وانما كان في صفة من صفاتهما (فتح الباري ج ۸ ص ۵۷۲)
بہرحال انکی یہ رائے بھی شخصی اور انفرادی تھی اور جیسا کہ بزار نے تصریح کی ہے
کسی ایک صحابی نے انکی اس سے اتفاق نہیں کیا۔ اور یہ بہت ممکن ہے کہ جب تواتر سے انکو
ثابت ہو گیا ہو کہ یہ بھی قرآن متلو ہے تو اپنی رائے پر قائم نہ رہے ہوں۔
[illegible] خبر واحد سے معلوم ہوتی ہے جو تواتر قرآنی
کے مقابلہ میں قابل سماعت نہیں ہو سکتی۔ شرح مواقف میں ہے۔ ان اختلاف الصحابة
في بعض سور القرآن مروي بالآحاد المفيدة للظن ومجموع القرآن منقول
بالتواتر المفيد لليقين الذي يضمحل الظن في مقابلته فتلك الآحاد مما لا يلتفت اليه
ثم ان سلمنا اختلافهم فيما ذكرنا قلنا انهم لم يختلفوا في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم
ولا في بلوغه في البلاغة حد الاعجاز بل في مجرد كونه من القرآن وذلك لا يضر
فيما نحن بصدده۔ اھ۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں واجيب باحتمال انه كان متواترا
في عصر ابن مسعود لكن لم يتواتر عند ابن مسعود فانحلت العقدة بعون الله تعالى
صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ولعل ابن مسعود رجع عن ذلك۔ اھ

الحمد للہ رب کریم کا شکر کس زبان سے ادا کروں جسکی خالص توفیق وتیسیر سے
آج یہ عظیم بالشان کام انجام کو پہنچا۔ الہی! آج عرفہ کے مبارک دن اور وقوف عرفات

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী





সূরা ফাতেহা

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ১ । ৭ আয়াত । ১ রুকূ । মাক্কি

آیاتها ۷، رکوعها ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু[১]।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ①

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য[২], যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক[৩],

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ②

২. সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু,

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ③

৩. কর্মফল-দিবসের মালিক[৪]।

---

১. رَحْمٰن ও رَحِيْم উভয়ই আধিক্যের অর্থপ্রকাশক শব্দ, তবে رَحْمٰن এর মধ্যে رَحِيْم-এর চেয়ে বেশি আধিক্য রয়েছে। অনুবাদে এসব বিষয় লক্ষ রাখা হয়েছে।

২. অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা—উত্তম থেকে উত্তম এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, যা হয়েছে ও যা হবে—তা সব আল্লাহরই উপযুক্ত (অর্থাৎ তাঁরই প্রাপ্য)। কেননা, সব ধরনের নে'য়ামত ও সকল বস্তুর স্রষ্টা ও দাতা মূলত তিনিই, চাই তিনি তা সরাসরি দান করুন বা কোন কিছুর মাধ্যমে। যেমন, রোদের কারণে কেউ যদি তাপ বা আলো পায়, তবে আসলে তা সূর্যেরই অবদান। কবির ভাষায় :

حمد را با تو نسبتے ست درست — بر در ہر کہ رفت بر در تست

'(ইয়া আল্লাহ!) প্রশংসার সম্পর্ক তোমারই সঙ্গে সঠিক; যার দ্বারেই তা যাক না কেন, আসলে তা তোমারই দ্বারে।'

অতএব 'সব ধরনের প্রশংসা আল্লাহরই জন্য শোভনীয়'–এরূপ অনুবাদ করা খুবই ত্রুটিপূর্ণ; বুদ্ধিমান লোকেরা তা ভালই বোঝেন।

৩. সৃষ্টিজগতের সমষ্টিকে (عالَم) 'আলম' বলে। এ কারণে সাধারণত এর বহুবচন ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু এ আয়াতে 'আলম' বলে সৃষ্টি জগতের এক একটি জাতি ও শ্রেণী বোঝানো হয়েছে, (যেমন: জিন জাতি, ফেরেশতা জাতি, মানব জাতি ইত্যাদি)। এজন্য এস্থলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে নিখিল বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই যে মহান রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টি, তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

৪. (সকল দিবসেরই প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা, তবে) এই দিনকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রথম কারণ এই যে, সেদিন অনেক বড় বড় বিষয় সংঘটিত হবে। এমন ভীতিকর দিন ইতিপূর্বে কখনো আসেনি, ভবিষ্যতেও আসবে না। দ্বিতীয়ত, সেদিন কোনো কিছুর বাহ্যিক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণও আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো হাতে থাকবে না। যেমন, অন্যত্র (সূরা মুমিন : ১৬) এরশাদ হয়েছে:

৪. আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি[১]।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

৫. আমাদের সরল পথ বাতলিয়ে দিন—

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

৬. তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন[২];

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝

৭. যাদের উপর আপনার ক্রোধ পতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও হয়নি[৩]।

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

(আজ রাজত্ব কার? পরাক্রমশালী এক আল্লাহর।)

১. এ আয়াত থেকে বোঝা গেল, আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তা ছাড়া আর কারো নিকট প্রকৃত অর্থে সাহায্য চাওয়া সম্পূর্ণরূপে না-জায়েয। তবে স্বতন্ত্র সাহায্যকারী না ভেবে শুধু আল্লাহ তাআলার রহমতের মাধ্যম মনে করে তাঁর কোনো মকবূল বান্দার নিকট বাহ্যিকভাবে সাহায্য চাওয়া জায়েয। এ ধরনের সাহায্য প্রার্থনা মূলত আল্লাহ তাআলারই নিকট সাহায্য প্রার্থনার শামিল।

২. (আল্লাহ তা'আলার) অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাগণ চার শ্রেণীর—নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহগণ। পবিত্র কুরআনে অন্যত্র এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আর الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم 'ক্রোধানলে পতিত' দ্বারা ইহুদী এবং الضَّالِّينَ 'পথভ্রষ্ট' দ্বারা খ্রিস্টানরা উদ্দেশ্য। অন্য বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীছ এর সাক্ষ্য বহন করে।

আর صراط مستقيم (সরল পথ) থেকে বঞ্চিতি ও মাহরুমী দুই উপায়ে হয়—এক, না জেনে; দুই, জেনেশুনে। পূর্বা-পর কোন পথহারা ফেরকা এ দুয়ের বহির্ভূত হতে পারে না। সে মত খ্রিস্টানরা অজ্ঞতাহেতু আর ইহুদীরা জ্ঞাতসারে পথচ্যুত হয়েছে।

৩. আল্লাহ তা'আলা এই সূরাটি বান্দার জবানীতে এরশাদ করে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন আমার দরবারে হাযির হবে তখন আমার নিকট এভাবে প্রার্থনা করবে। এ কারণেই এ সূরার শেষে 'আমীন' বলা সুন্নত। তবে তা কুরআন শরীফের শব্দ নয়। তার অর্থ : আল্লাহ! এমনি হোক, অর্থাৎ তোমার মকবূল বান্দাদের অনুসরণ করা এবং নাফরমানদের থেকে দূরে থাকা সহজ করে দাও।—এ সূরার প্রথমাংশে আল্লাহ তা'আলার গুণকীর্তন এবং শেষাংশে বান্দার জন্য প্রার্থনা রয়েছে।

বি. দ্র. ব্যাকরণের দিক থেকে غَيْرِ الْمَغْضُوبِ الخ পূর্ববর্তী الَّذِينَ এর بدل বা তার صفت; তাই এ অনুসারেই তরজমা করা হয়েছে। দিল্লীর কোন কোন কুরআন-তরজমায় যে অনুবাদ করা হয়েছে, তা ব্যাকরণ ও আয়াতের মর্মপরিপন্থী হয়েছে।

সূরা বাকারা

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ২ । ২৮৬ আয়াত । ৪০ রুকূ । মাদানী

آياتها ۲۸٦، رکوعاتها ٤٠

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-মীম[১]।

الٓمّٓ ۚ①

২. এই কিতাবে কোন সন্দেহ নেই[২]। এ পথ-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ

---

১. এই হরফগুলিকে مقطعات (বিচ্ছিন্ন হরফ) বলে। এগুলির আসল অর্থ অন্য কারো বোধগম্য নয়; বরং এগুলি আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে এক গোপন রহস্য, যা বিশেষ হেকমত ও মঙ্গলার্থেই প্রকাশ করা হয়নি।

পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষীর তরফ থেকে এগুলির যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে, তার উদ্দেশ্য শুধু উপমা পেশ করা, সতর্ক করা ও সহজবোধ্য করা— আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য উদ্ঘাটন করা নয়। অতএব এগুলিকে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিমত আখ্যায়িত করে ভুল বলা আরেক ব্যক্তিগত রায়মাত্র, যা উলামায়ে কেরামের তাহকীকের (বা সিদ্ধান্তের) সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

২. অর্থাৎ এ যে আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং এর সমস্ত বিষয়বস্তু যে সম্পূর্ণ সত্য, এতে কোন সন্দেহ নেই।

জানা দরকার যে, কোন কথায় সন্দেহ হওয়ার দু'টি কারণ থাকতে পারে— এক. সে কথাতেই কোন ভুল বা ত্রুটি থাকা; দুই. শ্রোতার অনুধাবনে ত্রুটি থাকা। প্রথম অবস্থায় উক্ত কালাম বা কথাই হচ্ছে সন্দেহের উৎস, আর দ্বিতীয় অবস্থায় সন্দেহের উৎস শ্রোতার অনুধাবনের ত্রুটি, যদিও কথাটি সম্পূর্ণই সত্য। কিন্তু তা অনুধাবনে অক্ষম বা ব্যর্থ হওয়ার কারণে কথাটি সন্দেহযুক্ত মনে হয়। এ আয়াতে (আল্লাহ তা'আলা) প্রথম প্রকারের সন্দেহের সম্ভাবনা দূর করেছেন।

আর দ্বিতীয় প্রকারের সন্দেহ সম্পর্কে সামনে ২৩ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব কাফেররা কুরআনে কারিম সম্পর্কে যা কিছু সন্দেহ পোষণ করত, তা সম্পূর্ণরূপে রদ হয়ে গেল।

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢

প্রদর্শনকারী[১] খোদাভীরুদের জন্য[২]

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣

৩. যারা অদৃশ্য বিষয়াদিতে ঈমান রাখে[৩], নামায কায়েম করে[৪] এবং আমি তাদের যে রিযিক দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে[৫]।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤

৪. এবং যারা তার প্রতি ঈমান রাখে যা আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে এবং তার প্রতিও, যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে। আর তারা আখেরাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে[৬]।

---

১. সূরা ফাতেহার মধ্যে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ('আমাদের সরলপথ বাতলিয়ে দিন') বলে বান্দাদের পক্ষ থেকে যে প্রার্থনা করা হয়েছিল, এখান থেকে কুরআন কারীমের শেষ পর্যন্ত সেই প্রার্থনারই জওয়াব রয়েছে। (অর্থাৎ, কুরআনের বাতলানো পথই সরলপথ। অতএব, তা পেতে চাইলে কুরআনেরই অনুসরণ কর।)

২. অর্থাৎ যে বান্দাগণ আল্লাহকে ভয় করে, এই কিতাব তাদেরকে পথ প্রদর্শন করে। কারণ, যে ব্যক্তি স্বীয় রব সম্বন্ধে ভীত হবে, সে-ই তো তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির বিষয় অর্থাৎ আনুগত্য ও অবাধ্যতার খোঁজ-খবর রাখবে। আর যে নাফরমানের অন্তরে ভয়ই নেই, ওর মধ্যে কি আনুগত্যের চিন্তা এবং অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কোন আশঙ্কা থাকতে পারে?

৩. অর্থাৎ যেসব বিষয় তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বহির্ভূত (যেমন- বেহেশত, দোযখ, ফেরেশতা প্রভৃতি), সেসব কিছুকে আল্লাহ তাআলা ও রাসূলের বর্ণনাহেতু সত্য ও নিশ্চিত জ্ঞান করে। এতে বোঝা গেল, এসব গায়বী (অদৃশ্য) বিষয়াদিকে অবিশ্বাসকারী হেদায়েত থেকে বঞ্চিত।

৪. নামায কায়েম করার অর্থ এই যে, তারা সর্বদা যথানিয়মে সময় মত তা আদায় করে।

৫. সমস্ত নেক আমল তিনটি মৌলিক জিনিসের সঙ্গে সম্পর্কিত— অন্তর, দেহ ও ধন-সম্পদ। এই আয়াতে তিন প্রকারের নেক আমলের দিকেই যথাক্রমে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৬. পূর্বের আয়াতে মক্কার মুশরিকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদের আলোচনা ছিল। এ আয়াতে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিল, তাদের বর্ণনা রয়েছে।

৫. এরাই রয়েছে স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আগত) হেদায়াতের উপর এবং এরাই সফলকাম[১]।

أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

৬. যারা কাফের হয়েছে, আপনি তাদের সতর্ক করেন বা না করেন—ওদের পক্ষে (উভয়ই) সমান, ওরা ঈমান আনবে না[২]।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

৭. আল্লাহ ওদের অন্তরে ও ওদের কানে মোহর করে দিয়েছেন এবং ওদের চোখের উপর রয়েছে পর্দা[৩]। আর ওদের জন্য আছে মহাশাস্তি।

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰٓ أَبْصَٰرِهِمْ غِشَٰوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

[রুকূ - ২]

৮. আর মানুষের মধ্যে কতক এমনও আছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ

---

১. অর্থাৎ ঈমানদারদের উল্লিখিত উভয় দলই দুনিয়াতে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আখেরাতে তারা সর্বতোভাবে সফলকাম হবে। এতে বোঝা গেল, যারা ঈমানের সৌভাগ্য ও নেক আমলাদি থেকে বঞ্চিত থাকবে, তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই বরবাদ হবে।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

মুমিনদের আলোচনার পর সামনে কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে।

২. এস্থলে কাফেরদের দ্বারা বিশেষ করে ঐ লোকেরা উদ্দেশ্য, যাদের জন্য (তাদেরই অব্যাহত দুষ্কৃতির কারণে –অনুবাদক) কুফরী নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল এবং যাদেরকে সর্বদার জন্য ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছিল। (যেমন : আবু জাহল, আবু লাহাব ও অন্যরা।) নতুবা এ কথা স্পষ্ট যে, পূর্বে কাফের ছিল এমন অনেক মানুষ পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল ও করছে।

৩. আল্লাহ ওদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন (অর্থাৎ ওরা সত্য কথা বোঝে না) এবং কানের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন (অর্থাৎ মনোযোগী হয়ে সত্য কথা শোনে না।) আর চোখের উপর পর্দা রয়েছে (অর্থাৎ ওরা সত্য পথ দেখে না)।

পূর্বাপর-সম্পর্ক

কাফেরদের আলোচনা শেষ হল। এখন পরবর্তী তেরটি আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে।

وَبِالْيَوْمِ الْأٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝٨

প্রতি ঈমান এনেছি', অথচ ওরা মোটেই মুমিন নয়[১]।

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩

৯. ওরা আল্লাহ ও ঈমানদারদের সঙ্গে প্রতারণা করে। বস্তুত ওরা নিজেদের ছাড়া আর কাউকেই প্রতারিত করে না। কিন্তু ওরা চিন্তা করে না[২]।

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝١٠

১০. ওদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি, অতঃপর আল্লাহ ওদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন[৩]। আর ওদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি। কারণ, ওরা মিথ্যাচার করত[৪]।

---

১. অর্থাৎ অন্তর দিয়ে ঈমান আনেনি, আর অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করাকেই ঈমান বলে। ওরা ধোঁকা দেওয়ার জন্য শুধু মুখে ঈমান প্রকাশ করে থাকে।

২. অর্থাৎ ওদের ধোঁকাবাজি না আল্লাহ তাআলার সঙ্গে চলতে পারে। কারণ, তিনি গায়বের খবর জানেন। আর না মুমিনদের সঙ্গে, কেননা আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরের মাধ্যমে এবং অন্যান্য প্রমাণ ও নিদর্শন দ্বারা মুনাফিকদের ধোঁকা সম্পর্কে মুমিনদের অবহিত করে দিয়েছেন। বরং ওদের ধোঁকাবাজির প্রতিফল ও তার খারাবী প্রকৃতপক্ষে ওরাই পেয়ে থাকে। কিন্তু নিজেদের উদাসীনতা, অজ্ঞতা ও দুষ্কৃতির কারণে ওরা তা চিন্তা করে না এবং বোঝে না। গভীরভাবে চিন্তা করলে ওরা বুঝতে পারত, এই ধোঁকাবাজির দ্বারা মুসলমানদের ক্ষতি হয় না, বরং এর কুফল ওদের নিজেদের উপরই আপতিত হয়।

হযরত শাহ আবদুল কাদের (র) এর জ্ঞানবত্তার কী সূক্ষ্মতা! তিনি এস্থলে يَشْعُرُوْنَ এর বাহ্যিক তরজমা না করে এর অর্থ করেছেন—চিন্তা করা।

৩. অর্থাৎ ওদের অন্তরে নেফাক ও ইসলাম-বিদ্বেষের ব্যাধি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। এখন কুরআনের অবতরণ ও ইসলামের বিজয় দেখে ওদের ঐ ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. মিথ্যাচার করার দ্বারা ওদের ইসলাম গ্রহণের মিথ্যা দাবি (اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) বোঝানো হয়েছে, যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। অতএব (عَذَابٌ اَلِيْمٌ) প্রকৃতপক্ষে ওদের নেফাকের শাস্তি, সাধারণ মিথ্যা বলার শাস্তি নয়। আর এই সূক্ষ্ম পার্থক্য বোঝানোর জন্যই হযরত শাহ সাহেব (র) (يَكْذِبُوْنَ) এর অনুবাদে 'মিথ্যা বলার' স্থলে 'মিথ্যাচার করা' লিখেছেন। (আল্লাহ তাঁকে পুরস্কৃত করুন– তাঁর দৃষ্টি কত সূক্ষ্ম!)

১১. আর ওদের যখন বলা হয়, 'তোমরা যমীনের বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না', তখন বলে, 'আমরা তো সংশোধনকারী[১]।'	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝
১২. জেনে রাখ! ওরাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, কিন্তু ওরা বোঝে না[২]।	أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝
১৩. আর যখন ওদের বলা হয়, 'তোমরা সেরূপ ঈমান আন যেরূপ ঈমান এনেছে (অন্য) লোকেরা'— তখন ওরা বলে[৩], 'আমরা কি	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَآ ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوٓا أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ السُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ

১. মুনাফিকরা বিভিন্নভাবে ফেতনা-ফাসাদ ছড়াত। প্রথমত, ওরা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনায় লিপ্ত ছিল এবং শরী'য়তের হুকুম-আহকাম পালনে ছিল অলস ও বিমুখ। দ্বিতীয়ত, ওরা মুসলমান ও কাফের উভয় প্রকার লোকদের নিকট আসা-যাওয়া করত এবং স্বীয় মান-মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একের কথা অপরের নিকট পৌঁছাত। তৃতীয়ত, ওরা কাফেরদের সঙ্গে অত্যন্ত নম্রতা ও হৃদ্যতার সাথে মিশত এবং ধর্মীয় বিষয়ে বিরোধিতার জন্য কাফেরদের মোটেই বাধা দিত না। আর দীনী বিষয়ে কাফেরদের প্রশ্ন ও সন্দেহাদি মুসলমানদের সামনে পেশ করে দুর্বল-ঈমান ও কমবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের শরী'য়তের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলার চেষ্টা করত।

এসব ফেতনা-ফাসাদের কাজে ওদের কেউ বারণ করলে উত্তরে বলত, আমরা তো সংশোধনকারী (শান্তি স্থাপনকারী)। এবং আমরা চাই, সারা দেশ ও জাতির সকল মানুষ পূর্ব কালের মত মিলে-মিশে থাকুক এবং নতুন ধর্মের কারণে যে দ্বন্দ্ব-কলহ বৃদ্ধি পেয়েছে তা একেবারে দূরীভূত হয়ে যাক। বস্তুত প্রত্যেক যমানায় স্বার্থান্বেষী ও প্রবৃত্তির দাসেরা এমনই বলে থাকে।

২. অর্থাৎ প্রকৃত সংশোধন (সংস্কার) এই যে, সত্য ধর্ম সব ধর্মের উপর বিজয়ী থাকবে। পার্থিব সব উদ্দেশ্য ও স্বার্থের উর্ধ্বে শরী'য়তের হুকুম-আহকামকে স্থান দেওয়া হবে এবং দীনের ব্যাপারে কারো শত্রুতা বা মিত্রতার পরোয়া করা হবে না। যেমন কবি বলেন :

خاک بر دلداری اغیار پاش

'পরের মনসন্তুষ্টির উপর মাটি নিক্ষেপ কর।'

অতএব সংহতি ও কল্যাণের অজুহাতে মুনাফিকরা যা কিছু করে, তা নিছক ফাসাদ ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু ওদের এই উপলব্ধি নেই।

৩. ওরা মনে মনে, বা নিজেদের মধ্যে, কিংবা সেই দুর্বল মুসলমানদের নিকট, যারা কোনো কারণে ওদের বিশ্বস্ত বনেছিল, এ কথা বলত।

সেরূপ ঈমান আনব যেরূপ ঈমান এনেছে নির্বোধ লোকেরা[১]?' জেনে রাখ! ওরাই নির্বোধ, কিন্তু ওরা জানে না[২]।

هُمُ السُّفَهَاۤءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾

১৪. যখন মুমিনদের সঙ্গে ওদের সাক্ষাৎ হয় তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'; আর যখন ওদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়[৩], তখন বলে, 'আমরা নিশ্চয় তোমাদের সাথে আছি[৪], আমরা তো (মুসলমানদের সঙ্গে) উপহাস করি'[৫]।

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٤﴾

---

১. ওরা খাঁটি মুসলমানদের নির্বোধ বলেছে, যারা আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকামের প্রতি এমনই নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন যে, মানুষের বিরোধিতা, এর কঠিন পরিণাম এবং কালচক্রের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক থেকে মোটেই আত্মরক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করতেন না। পক্ষান্তরে মুনাফিকরা মুসলমান ও কাফের সকলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলত এবং নফসানী লাভালাভ ও স্বার্থের কারণে পরকালের কোনই চিন্তা-ফিকির করত না। পার্থিব স্বার্থ-চিন্তা এতই প্রবল ছিল যে, ঈমানের ও শরী'য়তের হুকুম-আহকাম পালনের গুরুত্ব অনুভব করত না। শুধু মৌখিক দাবি ও ঠেকায় পড়ে জরুরী আমল করেই ক্ষান্ত থাকত।

২. প্রকৃতপ্রস্তাবে মুনাফিকরাই হচ্ছে নির্বোধ। কেননা, ক্ষণস্থায়ী পার্থিব লাভ ও স্বার্থের মোহে আখেরাতের কোন ফিকির ওদের নেই। যা অস্থায়ী তা অবলম্বন করা এবং যা চিরস্থায়ী তা বর্জন করা কতই না বোকামী! আর যে সৃষ্টিজীব থেকে আত্মরক্ষার হাজারো উপায় উদ্ভাবন করা যায়, তাকে ভয় করা এবং যে আলেমুল গায়ব থেকে আত্মরক্ষার কোনই উপায় নেই তাঁকে ভয় না করা কতই না মূর্খতা! দ্বিতীয়ত: সকলের সাথে মিলে মিশে থাকার নামে (কাফেরদের সাথে) এমন আপোষ-মীমাংসা কী করে সম্ভব, যার দ্বারা আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ ও তাঁর মকবূল বান্দাদের বিরোধিতা করা হয়? কিন্তু মুনাফিকরা এতই বেকুব যে, এমন মোটা কথাটাও বোঝে না।

৩. শয়তানেরা (অর্থাৎ দুষ্ট লোকেরা) বলতে সেই সব কাফের উদ্দেশ্য, যারা স্বীয় কুফরী সবার সামনে প্রকাশ করত। অথবা সেই সব মুনাফিক উদ্দেশ্য, যাদেরকে ওদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় মনে করা হত।

৪. অর্থাৎ কুফরী ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমাদের সাথে আছি– কোন অবস্থাতেই (তোমাদের থেকে) পৃথক হব না।

৫. অর্থাৎ মুসলমানদের সঙ্গে আমরা যে বাহ্যিক মিত্রতা প্রকাশ করি তাতে মনে করো না যে, আমরা প্রকৃতই তাদের মিত্র। আমরা তো (বরং) তাদের সঙ্গে উপহাস করি মাত্র এবং তাদের বোকামী সকলের সামনে প্রকাশ করার চেষ্টা করে থাকি। কেননা, আমাদের কর্ম ও কথা পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তারা স্বীয় বোকামীর কারণে শুধু আমাদের মৌখিক কথায় আমাদেরকে মুসলমান মনে করে। তাই তারা আমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততির

১৫. আল্লাহ ওদের সাথে উপহাস করেন[১] এবং ওদের আরো বেশি অবাধ্যতার সুযোগ দিতে থাকেন, (আর) ওরা থাকে, উদভ্রান্ত[২]।

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ۝

১৬. এরাই তারা, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করেছে। সুতরাং ওদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি[৩] এবং ওরা পথপ্রাপ্তও হয়নি[৪]।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۪ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ۝

উপর হস্তক্ষেপ করে না এবং গনীমতের মালে আমাদের অংশীদার করে নেয়, তাদের সন্তানদের আমাদের সঙ্গে বিবাহ দেয়, আর আমরা তাদের ভিতরের কথা কৌশলে জেনে নেই; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আমাদের প্রতারণা বুঝতে পারছে না।

১. যেহেতু আল্লাহ তাআলা মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছেন— মুনাফিকদের সাথে মুসলমানদের মত ব্যবহার করতে, ওদের জান-মালের উপর কিছুতেই হস্তক্ষেপ না করতে, সেহেতু মুনাফিকরা স্বীয় বোকামীর কারণে বুঝে নিয়েছে যে, ঈমান আনায় মুসলমানদের যে ফায়দা হয়েছে, সে সব ফায়দা শুধু মৌখিক ঈমান প্রকাশের দ্বারা আমাদেরও হাসিল হয়ে গেল। এ কারণে ওরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। অথচ পরিণামে এ বিষয় মুনাফিকদের কঠিন বিপদে ফেলবে– এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। সুতরাং এখন ফয়সালা করুন, বাস্তবে ঠাট্টা মুসলমানদের সঙ্গে হল, না মুনাফিকদের সাথে? আল্লাহর উপহাস করার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা ওদেরকে উপহাসের শাস্তি প্রদান করবেন।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার দিক থেকে ওদের ঢিল দেওয়া হয়েছে। এমনকি, ওরা অবাধ্যতায় খুব উন্নতি করেছে এবং এমনই বিভ্রান্ত হয়েছে যে, পরিণাম মোটেই চিন্তা করেনি। বরং এই ভেবে খুশী হয়েছে যে, আমরা মুসলমানদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করা সত্ত্বেও উন্নতি করছি। অথচ ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

বি. দ্র. এ আয়াতে فِيْ طُغْيَانِهِمْ-এর সম্পর্ক يَمُدُّهُمْ ক্রিয়াপদের সাথে, কিন্তু 'তারাজেমে দেহলভী'তে একে يَعْمَهُوْنَ ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। (ফলে, আয়াতের অর্থ বিকৃত হয়ে মু'তাযিলা ফেরকার অনুকূল ও আহলে সুন্নতের পরিপন্থী এবং আরবদের ভাষারীতিরও খেলাফ হয়েছে।) বলা বাহুল্য, এটা ভুল, যা জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট সুস্পষ্ট।

৩. পূর্বে উল্লেখিত হেদায়েতের বদলে গোমরাহী গ্রহণ করাকেই এখানে 'ব্যবসা' বলা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ মুনাফিকরা বাহ্যত ঈমান এনেছে, কিন্তু অন্তরে কুফরী পোষণ করে আছে; ফলে পরকালে ধ্বংস ও ইহকালে অপদস্থ হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা স্বীয় কালামে পাকের মধ্যে ওদের অবস্থা সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন। ওরা যদি ঈমান আনত, তবে উভয় জাহানে সফলকাম হত। সুতরাং এখন ওদের ব্যবসায় পার্থিব বা পরকালীন কোন লাভই হল না। আর তারা এ কথাও বুঝল না যে, শুধু মৌখিক ঈমানকে যথেষ্ট ও লাভজনক মনে করার

১৭. ওদের অবস্থা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালাল। অতঃপর আগুন যখন তার আশপাশ আলোকিত করল, তখন আল্লাহ ওদের আলো অপসারিত করে দিলেন এবং ওদের অন্ধকারপুঞ্জের মধ্যে এভাবে ছেড়ে দিলেন যে, ওরা (কিছুই) দেখতে পায় না[১]।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮. (ওরা) বধির, বোবা, অন্ধ; সুতরাং ওরা ফিরে আসবে না[২]।

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯. অথবা ওদের অবস্থা এরূপ, যেমন আকাশ থেকে সজোরে পড়ছে বৃষ্টি, যাতে রয়েছে অন্ধকার, মেঘ-গর্জন ও বিদ্যুৎ-চমক। ওরা বজ্রধ্বনির কারণে মৃত্যুভয়ে নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢোকায়। আর আল্লাহ কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রেখেছেন[৩]।

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾

কারণেই ওরা উক্ত ধ্বংস ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে। ('পথপ্রাপ্ত না হওয়া'র দ্বারা এই কথা বোঝানোই উদ্দেশ্য)।

মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত

এখন এই মুনাফিকদের অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ দুটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হবে :

১. অর্থাৎ মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত এ রকম : যেমন, কোন ব্যক্তি অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন রাতে কোন প্রান্তরে পথ দেখার জন্য আগুন জ্বালাল। যখন রাস্তা আলোকিত হল, তখন আল্লাহ তাআলা তার আগুন নিভিয়ে দিলেন। ফলে লোকটি (ও তার সঙ্গী-সাথী) রাতের আঁধারে নিমজ্জিত হল। তদ্রূপ মুনাফিকরা মুসলমানদের ভয়ে কলেমা শাহাদাতের আলোর দ্বারা সুবিধা নিতে চেয়েছিল, কিন্তু তা দিয়ে জানমাল রক্ষার মত সামান্য ক্ষণস্থায়ী কিছু সুবিধা যেই না পেল, অমনি কলেমা শাহাদাতের আলো ও তার সুবিধা সবই বিলীন হয়ে গেল এবং মৃত্যুর সাথে সাথে ওরা কঠিন আযাবে পতিত হল।

২. অর্থাৎ ওরা বধির– সত্য কথা শুনে না; বোবা– সত্য কথা বলে না, অন্ধ– স্বীয় প্রকৃত লাভ-লোকসান দেখে না। অতএব যে ব্যক্তি একই সঙ্গে বধির ও বোবা, সে কী করে পথে আসবে? সে শুধু অন্ধ হলে কাউকে ডাকতে বা কারো কথা শুনতে পারত। এখন ওদের থেকে কিছুতেই এ আশা করা যায় না যে, ওরা গোমরাহী থেকে সত্যের দিকে ফিরে আসবে।

৩. উক্ত মুনাফিকদের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত সেই লোকদের ন্যায়, যাদের উপর আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তিমিরাচ্ছন্ন রাত, ঘন কালো মেঘে আকাশ ছাওয়া, মুষলধারে বৃষ্টি– অন্ধকার যেন দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে। এরই মাঝে বিদ্যুতের চমক ও মেঘের গর্জন এমন ভয়ঙ্কর যে, সেই লোকেরা মৃত্যুর ভয়ে কানে আঙ্গুল দেয়, না জানি শব্দের প্রচণ্ডতায় প্রাণবায়ু বের হয়ে

২০. মনে হয় যেন বিদ্যুৎ-চমক ওদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেবে। যখনই ওদের সামনে বিদ্যুৎ চমকায়, ওরা তার আলোতে চলতে শুরু করে; আর যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন থমকে দাঁড়ায়। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে ওদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অবশ্যই ছিনিয়ে নিতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে শক্তিমান[১]।

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ۝

[রুকূ - ৩]

২১. হে মানুষ! তোমাদের রবের ইবাদত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের, যাতে তোমরা পরহেযগার হয়ে যাও—

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

২২. যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা ও আসমানকে ছাদ বানিয়েছেন এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর এর দ্বারা ফলমূল উৎপন্ন করেছেন তোমাদের

الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۪ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ

যায়। তদ্রূপ, মুনাফিকরা শরী'য়তের বিধি-নিষেধ ও সতর্কবাণী শুনে, স্বীয় অপমান ও লাঞ্ছনা দেখে এবং পার্থিব স্বার্থ ও লাভালাভ চিন্তা করে আশ্চর্য রকমের দ্বিধাগ্রস্ততা, ভয়ভীতি ও পেরেশানীর শিকার। এরই মাঝে নিজেদের ব্যর্থ চেষ্টা-তদবীর দ্বারা আত্মরক্ষায় সচেষ্ট, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা সব দিক থেকে কাফেরদের ঘিরে রেখেছে। তাঁর পাকড়াও ও শাস্তি থেকে ওরা কোনক্রমেই বাঁচতে পারে না।

১. সারকথা এই যে, মুনাফিকরা নিজেদের গোমরাহী ও অন্ধকার ধেয়ান-ধারণায় নিমজ্জিত। কিন্তু যখন ইসলামের বিজয় ও শক্তিশালী মুজেযা প্রত্যক্ষ করে এবং শরী'য়তের হুমকি-ধমকি শোনে, তখন সতর্ক হয়ে বাহ্যত সিরাতে মুসতাকীমের প্রতি ধাবিত হয়। আর যখন কোন পার্থিব কষ্ট-যাতনার মুখোমুখী হয়, তখন কুফরীর আশ্রয় নেয়। যেমন, প্রবল বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাল– অমনি সম্মুখে পা বাড়িয়ে পরক্ষণেই আবার থমকে দাঁড়াল। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তাআলা সব কিছু জানেন এবং কোন কিছুই তাঁর শক্তি-বহির্ভূত নয়, তাই এ সকল কলা-কৌশল কোনই কাজে আসবে না।

বি. দ্র. সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত তিন ধরনের মানুষের উল্লেখ হয়েছে— প্রথমে মুমিনদের, তার পর কাফেরদের, (যাদের অন্তর মোহরমারা; তারা কখনো ঈমান আনবে না); তৃতীয়ত মুনাফিকদের, (যারা বাহ্যত মুসলমান, কিন্তু ওদের অন্তর একমুখী নয়)।

রিযিক-স্বরূপ। অতএব তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না, অথচ তোমরা জান (যে, তিনি অদ্বিতীয়)[১]।

رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩. আর তোমরা যদি সেই বাণী সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে থাক, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি—তবে তার মত একটি সূরা (রচনা করে) নিয়ে আস[২] এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও[৩]।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۪ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾

১. এখন মুমিন, কাফের ও মুনাফিক সকল বান্দাকে সম্বোধন করে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ বা একত্ববাদের কথা বোঝানো হচ্ছে। ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলির মধ্যে এ-ই প্রধান। (আয়াত দুটির) সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সকলকেই সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য সব জরুরী ও উপকারী সামগ্রী তৈরি করেছেন।

এর পরও আল্লাহ তাআলাকে ছেড়ে অন্য কাউকে মা'বূদ বানানো, যে তোমাদের মঙ্গলও করতে পারে না, ক্ষতিও না, (যেমন মূর্তি)— তা কতই না বোকামী ও মূর্খতা! অথচ তোমরা এও জান যে, তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই।

২. পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ পবিত্র বাণীতে সন্দেহের এক কারণ এটা হতে পারত যে, এতে কোন সন্দেহের বিষয় আছে। এর নিরসন কল্পে لَا رَيْبَ فِيْهِ এরশাদ করা হয়েছে। আরেক কারণ এটা হতে পারে যে, নিজের অনুধাবনের ত্রুটি বা অতিমাত্রায় হঠকারিতার কারণে কারো দিলে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এই কারণ যেহেতু বর্তমান ছিল, তাই তা দূর করণার্থে উত্তম ও সহজতম উপায় এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের নিকট এই বাণী মানবরচিত বলে মনে হলে তোমরাও এমনি সাহিত্যমানে উন্নত তিন আয়াতের সমান একটি সূরা রচনা করে দেখাও। কিন্তু সাহিত্য-প্রতিভায় তোমাদের চরম উৎকর্ষ ও উন্নতি সত্ত্বেও যখন তোমরা একটি ক্ষুদ্রতম সূরা রচনায় অপারগ হয়ে যাবে, তখন বুঝে নিয়ো যে, এ আল্লাহ তাআলার কালাম, কোন বান্দার নয়। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে দিলেন।

৩. অর্থাৎ তোমরা যদি নিজেদের এই দাবিতে সত্য হও যে, কুরআন মানবরচিত, তবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের যত পারদর্শী কবি ও সাহিত্যিক বর্তমান আছে, আল্লাহ তাআলাকে ছেড়ে তাদের সবার সাহায্য নিয়ে কুরআনের ন্যায় একটি ছোট সূরা রচনা করে আন।
অথবা (وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ এর) অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া তোমাদের যত মা'বূদ আছে, সবার নিকট কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা কর, যেন তারা এই কঠিন বিষয়ে তোমাদের কিছু সহায়তা করে।

২৪. কিন্তু তোমরা যদি (এমন) করতে না পার এবং কখনই করতে পারবে না– তা হলে সেই আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য[১]।

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝

২৫. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানরাজি, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে সেখানকার কোনো ফল খাওয়ার জন্য দেওয়া হবে, তারা বলবে, 'এ তো তা-ই, যা আমাদের ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছিল'। বস্তুত তাদের দেওয়া হবে একই রকমের ফল[২]। আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ[৩] এবং তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে।

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

১. অর্থাৎ তোমরা যদি এমন একটি সূরাও রচনা করতে না পার, আর এ নিশ্চিত যে, কস্মিনকালেও তা পারবে না— তবে ভয় কর ও আত্মরক্ষা কর দোযখের আগুন থেকে, যা সব আগুন থেকে উত্তপ্ত এবং এর ইন্ধন হচ্ছে কাফের ও পাথর, যে পাথরের পূজা তোমরা করে থাক। আর আত্মরক্ষা করার উপায় এই যে, আল্লাহ তাআলার কালামের প্রতি ঈমান আন। আর সেই আগুন কাফেরদের জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে, যারা কুরআন শরীফ ও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা বলে।

২. জান্নাতের ফলমূল রূপে ও আকারে দুনিয়ার ফলমূলের মত হবে, কিন্তু স্বাদে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য হবে। অথবা (অর্থ এই যে,) জান্নাতের ফল-ফলাদি পরস্পর দেখতে একই রূপ ও আকৃতির হবে, কিন্তু স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন হবে। সুতরাং যখন কোন ফল দেখতে পাবে তখন বলবে, এ তো ঐ রকমই যা দুনিয়াতে বা জান্নাতে ভোগ করেছি, কিন্তু মুখে নিলে বুঝবে, স্বাদে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

৩. জান্নাতের স্ত্রীলোকেরা ভিতর-বাইর সব দিক দিয়ে পাক-সাফ হবে, দৈহিক অপবিত্রতা ও আত্মিক পঙ্কিলতা থেকে পরিচ্ছন্ন হবে।

বি. দ্র. এ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এমন তিনটি জিনিস বর্ণনা করলেন, যা জানা জরুরী ছিল— প্রথম, জীবনের উৎসস্থল (অর্থাৎ আমরা কোথা থেকে আসলাম এবং কী ছিলাম); দ্বিতীয়, জীবিকা (অর্থাৎ কী খাব ও কোথায় থাকব); তৃতীয়, প্রত্যাবর্তন-স্থল (অর্থাৎ আমাদের পরিণাম কী।)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِۦ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ মশা বা তার চেয়ে বড় কোন বস্তুর* উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না[১]। তো যারা মুমিন, তারা নিশ্চিতরূপে জানে, এ উদাহরণ সম্পূর্ণ ঠিক, তাদের রবের পক্ষ থেকে। আর যারা কাফের তারা বলে, 'এ উদাহরণ দ্বারা আল্লাহর কী উদ্দেশ্য ছিল?' আল্লাহ এ উদাহরণ দ্বারা অনেককে গোমরাহ করেন এবং এ দ্বারা অনেককে হেদায়েত করেন । আর তিনি এর দ্বারা কেবল পাপিষ্ঠদেরই গোমরাহ করেন—

---

* দ্বিতীয় তরজমা– 'মশা বা তার চেয়েও তুচ্ছ বস্তুর...।

১. এ আয়াতে সেই অভিযোগের উত্তর দেওয়া হয়েছে, যা ২৪নং আয়াত সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়েছিল। সার কথা এই যে, যখন কাফেররা কুরআন শরীফের সমমানের একটি ক্ষুদ্র সূরাও রচনা করতে ব্যর্থ হল এবং প্রমাণিত হয়ে গেল যে, কুরআন কারীম আল্লাহ তাআলারই বাণী, তখন কাফেররা বলল, যদিও আমরা এই কালামের মোকাবেলা করতে অক্ষম, কিন্তু অন্য দলীল দ্বারা আমরা প্রমাণ করব যে, এ আল্লাহর কালাম নয়, বরং মানব-রচনা। তা এই যে, মহান ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ স্বীয় বক্তব্যে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট জিনিসের উল্লেখ থেকে বিরত থাকেন। আল্লাহ তাআলা তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি স্বীয় কালামে কী করে মাছি ও মাকড়সার উল্লেখ করলেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষে মশা বা এর চেয়ে বড় জিনিস যথা, মাছি ও মাকড়সার উপমা ব্যবহার করা কোন লজ্জা বা অপমানের বিষয় নয়। কেননা, উপমার দ্বারা উপমেয় বিষয়টির ব্যাখ্যা অধিকতর স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য হয়। এতে তুচ্ছতা বা শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচ্য নয়। আর এই উদ্দেশ্য তখনই হাসিল হবে, যখন উপমা ও উপমেয়র মাঝে পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকবে। উপমেয় তুচ্ছ হলে উপমাটিও তুচ্ছ হওয়া চাই, নতুবা উপমা ব্যবহার করাই নিরর্থক হয়ে যায়। হ্যাঁ, উপমা ব্যবহারে উপমা ও উপমাদাতার মর্যাদার মধ্যে সামঞ্জস্য জরুরী হলে তবেই বেকুবদের উপরোক্ত প্রশ্ন চলতে পারত, কিন্তু কোন নির্বোধই এ কথা বলে না। তদুপরি তাওরাত ও ইনজীলে এবং জ্ঞানী-গুণী ও রাজা-বাদশাহদের কথায় এমন উদাহরণ প্রচুর রয়েছে। এর বিরোধিতা করা কাফেরদের বোকামী ও হঠকারিতারই পরিচায়ক।

আর فَوْقَهَا ما এর অর্থ এও হতে পারে যে, তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতার দিক থেকে মশা থেকে অধিক। যেমন, মশার ডানা, যা কোন কোন হাদীছে দুনিয়ার (নিকৃষ্টতার) উদাহরণে উল্লেখিত হয়েছে। (তিরমিযী, হাদীস ২৩২০)

২. অর্থাৎ ঈমানদাররা তো এসব দৃষ্টান্তকে সত্য ও উপকারী মনে করে। পক্ষান্তরে কাফেররা তাচ্ছিল্যস্বরূপ বলে, এমন তুচ্ছ দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? উত্তরে বলা হচ্ছে, আগাগোড়া হেদায়েতবিশিষ্ট এই কালামের উদ্দেশ্য—অনেককে গোমরাহীতে পতিত

২৭. যারা আল্লাহর (সঙ্গে কৃত) অঙ্গীকার দৃঢ় করার পর ভঙ্গ করে এবং সেই জিনিস ছিন্ন করে, যা জুড়ে রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন[১] এবং যমীনের বুকে 'ফাসাদ' করে[২]। এমন লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত[৩]।

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۲۷﴾

২৮. তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার কর কিভাবে, অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন[৪]! অতঃপর তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন[৫], এর পর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন[৬], তারপর তোমাদের জীবন্ত করবেন[৭], অতঃপর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে[৮]।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۸﴾

করা এবং অনেককে সঠিক পথ দেখানো। অর্থাৎ হকপন্থী ও বাতেলপন্থীদের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্য করা কাম্য, যা খুবই জরুরী ও কল্যাণকর।

(উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তাআলা কাউকেই বিনা দোষে গোমরাহীতে পতিত করেন না। বান্দা নিজের দোষে নিজেই গোমরাহীতে পতিত হয়। –অনুবাদক)

১. যেমন, রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা; এবং নবী-রাসূল, আলেম-উলামা, ওয়াজ-নসীহতকারী, মুমিন-মুসলমান, নামায-রোযা ও অপরাপর সৎ কাজ থেকে বিরত থাকা।

২. ফাসাদের অর্থ এই যে, ওরা ঈমানের প্রতি লোকদের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করত, ইসলাম-বিরোধীদের উস্কানী দিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধাত এবং সাহাবা ও উম্মতের সৎপরায়ণ ব্যক্তিদের দোষ প্রচার করত, যাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলাম সম্বন্ধে মানুষের অন্তরে অমর্যাদার ভাব সৃষ্টি হয়। আর মুসলমানদের গোপন কথা শত্রুদের কানে পৌছাত এবং ইসলামী তরীকার পরিপন্থী নানা রকম রসম ও বেদআত প্রসারে সচেষ্ট থাকত।

৩. অর্থাৎ এসব অসভ্য ক্রিয়া-কাণ্ড দ্বারা ওরা নিজেদেরই ক্ষতি ও সর্বনাশ করছে, ইসলামের অমর্যাদা ও উম্মতের সৎপরায়ণ লোকদের অবমাননা কিছুই করতে পারবে না।

৪. অর্থাৎ তোমরা প্রাণহীন দেহ ছিলে, তাতে অনুভূতি ও স্পন্দন কিছুই ছিল না। তোমরা প্রথমে ছিলে মৌল উপাদান, অতঃপর পিতা-মাতার খাদ্য-বস্তুতে পরিণত হলে। তারপর বীর্য এবং (পর্যায়ক্রমে) রক্তপিণ্ড ও মাংশপিণ্ডে পরিণত হলে।

৫. অর্থাৎ পূর্ববর্তী ধাপসমূহের পর 'রূহ' ফুঁকে দেওয়া হল। ফলে তোমরা জীবন লাভ করলে মাতৃ-গর্ভে, আর পরে জীবিত রইলে দুনিয়াতে।

৬. অর্থাৎ যখন দুনিয়ার হায়াত শেষে মৃত্যুর সময় আসবে।

৭. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্য পুনর্জীবিত করবেন।

৮. অর্থাৎ কবর থেকে বের হওয়ার পর আল্লাহ তাআলার সামনে হিসাব-নিকাশের নিমিত্ত দাঁড় করানোর জন্য তোমাদের সেদিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সুতরাং এখন তোমরা বিচার কর,

২৯. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আকাশ সৃষ্টির দিকে অভিনিবেশ করলেন, আর নিখুঁতভাবে সাত আকাশ বানিয়ে দিলেন। আর আল্লাহ সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত[১]।

هُوَالَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۹﴾

[রুকূ - ৪]

৩০. (স্মরণ করুন), যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি[২]। তারা বলল, 'আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করছেন, যে সেখানে ফাসাদ করবে ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরা আপনার সপ্রশংস তাস্‌বীহ পাঠ করি এবং বর্ণনা করি আপনার মহিমা[৩]'।

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

যখন তোমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার অসংখ্য অনুগ্রহে ডুবে আছ এবং প্রত্যেক অবস্থায় ও প্রয়োজনে তাঁরই মুখাপেক্ষী, তখন কুফরী ও তাঁর নাফরমানী করা কতই না আশ্চর্যের বিষয়!

১. এ আয়াতে আরেকটি নে'য়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জীবন ধারণের জন্য ভূপৃষ্ঠে সব ধরনের জীবনোপকরণ বিপুল পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন (যথা: খাদ্য, পানীয়, পরিধেয় সামগ্রী এবং এগুলির প্রত্যেকটির জন্য উপায়-উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি)। এর পর আকাশসমূহ সৃষ্টি করা হয়েছে, যার মধ্যে তোমাদের জন্য নানা কল্যাণ ও উপকার রয়েছে।

২. এখানে গোটা বনী আদমের প্রতি একটি বিরাট অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হচ্ছে হযরত আদম আ.-এর সৃষ্টি। তাঁকে আল্লাহ তাআলা স্বীয় খলীফা হিসাবে মনোনীত করেন। এস্থলে বিস্তারিতভাবে সেই কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল- خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا। এ সম্পর্কে যদি ওদের কারো মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তবে সে হযরত আদম আ.-এর কাহিনীতে উত্তমরূপে তার উত্তর পেয়ে যাবে।

৩. ফেরেশতাগণ যখন বুঝলেন, এই নতুন সৃষ্টির মধ্যে ফাসাদকারী ও হত্যাকারী পর্যন্ত হবে, তখন তাদের মনে প্রশ্ন জাগল, আমরা এত অনুগত ও আজ্ঞাবহ হওয়া সত্ত্বেও তাকে প্রতিনিধি বানানোর কারণ কী হতে পারে? (তাই এ কথা বললেন।) এ ফেরেশতাদের প্রতিবাদ নয়, বরং জানার আগ্রহ।

قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۝

তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি তা জানি যা তোমরা জান না[১]।'

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ۝

৩১. আর আল্লাহ আদম আ.-কে সকল (বস্তুর) নাম শিখিয়ে দিলেন। অতঃপর সেসব বস্তু ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন, তার পর বললেন, 'আমাকে এগুলির নাম বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ۝

৩২. তারা বলল, 'আপনি পবিত্র! আমাদের কিছুই জানা নেই, কেবল তা ব্যতীত, যা আপনি আমাদের শিখিয়েছেন। নিশ্চয় আপনিই প্রকৃত জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়[২]।'

একটি প্রশ্নের উত্তর

বনী আদমের হাল ফেরেশতাগণ অবগত হলেন কেমন করে? এর নানা সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁরা হয়ত মানবজাতিকে জিন জাতির সাথে তুলনা করেছিলেন; অথবা আল্লাহ তাআলা ইতিপূর্বে তাঁদের বলে দিয়েছিলেন; অথবা তাঁরা লওহে মাহফুজে লেখা দেখেছিলেন; না হয় বুঝেছিলেন যে, অনাচার-অত্যাচার না হলে শাসক ও খলীফার প্রয়োজন কী? অথবা তাঁরা হযরত আদম আ. এর দৈহিক কাঠামো দেখে তা আন্দাজ করে থাকবেন। যেমন, হযরত আদম আ. কে দেখে ইবলীস বলেছিল, بهكول (যে সহজেই ধোঁকায় পড়ে যায়) হবে, এবং তা-ই হল।

১. ফেরেশতাদের তখনকার মত সংক্ষিপ্তভাবে এই উত্তর দেওয়া হল যে, 'তাঁকে সৃষ্টি করার পিছনে যেসব হেকমত রয়েছে তা আমি বিলক্ষণ জানি। তোমরা এখনো সেই হেকমতগুলি জানতে পারনি, জানলে তাঁর খেলাফত ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সন্দেহ করতে না।'

২. সার কথা এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.কে প্রত্যেক বস্তুর নাম, তার গুণাগুণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, উপকারিতা ও অপকারিতা শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং এই জ্ঞান কথার মাধ্যম ছাড়া (সরাসরি) তাঁর অন্তরে ঢেলে দিয়েছিলেন। কেননা, জ্ঞানের এই পূর্ণতা ছাড়া খেলাফত ও দুনিয়ার উপর হুকুমত সম্ভব নয়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের উল্লিখিত বিষয়াবলী সম্পর্কে এভাবে প্রশ্ন করলেন, 'যদি তোমরা এই কথায় সত্য হও যে, তোমরা খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারবে, তবে এসব দ্রব্যের নাম ও গুণাগুণ বর্ণনা কর।'

কিন্তু তাঁরা নিজেদের দুর্বলতা ও অপূর্ণতার কথা স্বীকার করলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, এই সার্বিক জ্ঞান ছাড়া দুনিয়ার বুকে কেউই খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। আর এই সার্বিক জ্ঞানের কিছুটা আমাদের দেওয়া হয়ে থাকলেও এতটুকুতে আমরা খেলাফতের যোগ্য হতে পারি না। এই উপলব্ধির পর ফেরেশতাগণ বলে উঠলেন, 'আপনার জ্ঞান ও হেকমতের নাগাল পাওয়া কারো দ্বারা সম্ভব নয়।'

৩৩. আল্লাহ বললেন, 'হে আদম, তুমি তাদের এ বস্তুগুলির নাম বলে দাও।' অতঃপর যখন তিনি তাদের সেগুলির নাম বলে দিলেন, আল্লাহ বললেন, 'আমি কি তোমাদের বলিনি, আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সকল) গুপ্ত বিষয় উত্তমরূপে জানি এবং আমি জানি যা তোমরা প্রকাশ কর ও যা গোপন কর?[১]

قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنۡۢبِئۡهُمۡ بِاَسۡمَآئِهِمۡ ۚ فَلَمَّاۤ اَنۡۢبَاَهُمۡ بِاَسۡمَآئِهِمۡ ۙ قَالَ اَلَمۡ اَقُلۡ لَّكُمۡ اِنِّیۡۤ اَعۡلَمُ غَیۡبَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ۙ وَاَعۡلَمُ مَا تُبۡدُوۡنَ وَمَا كُنۡتُمۡ تَكۡتُمُوۡنَ ﴿۳۳﴾

৩৪. (এবং স্মরণ করুন), যখন আমি ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলাম, 'তোমরা আদমকে সেজদা কর'। অতএব সকলেই সেজদায় পড়ে গেল—শয়তান ছাড়া[২]। সে

وَاِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلٰٓئِكَةِ اسۡجُدُوۡا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوۡۤا اِلَّاۤ اِبۡلِیۡسَ ؕ اَبٰی وَاسۡتَكۡبَرَ ٭

---

১. হযরত আদম আ.-কে বিশ্বের বস্তু-নিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করামাত্র তিনি অতি ক্ষিপ্রতার সাথে ফেরেশতাদের সকল কিছু বাতলিয়ে দিলেন। ফলে সকলে বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং আদম আ.এর জ্ঞানের পরিধি দেখে 'বাহবাহ' দিয়ে উঠলেন। তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি কি বলতাম না যে, আকাশরাজ্য ও পৃথিবীর সমগ্র গুপ্ত বিষয় আমি জানি এবং আমি জানি তোমাদের দিলের অভ্যন্তরে যেসব কথা রয়েছে তাও!

বি. দ্র. এ দ্বারা ইবাদতের উপর ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল। লক্ষ করুন, ইবাদতের মধ্যে ফেরেশতাগণ এতই অগ্রসর যে, তাঁরা নিষ্পাপ। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের চেয়ে পিছনে বলে খেলাফতের মর্যাদা তাকেই দান করা হল এবং ফেরেশতারাও স্বীকার করে নিলেন। আর এ-ই সমীচীন। কারণ, ইবাদত হচ্ছে সৃষ্টিজীবের বৈশিষ্ট্য, আল্লাহর গুণ নয়। আর ইলম হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। তাই মানুষ খেলাফতের যোগ্য প্রমাণিত হল। কারণ, প্রত্যেক প্রতিনিধির মধ্যে সে যার প্রতিনিধি, তার গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়।

২. হযরত আদম আ.এর খলীফা হওয়া সাব্যস্ত হলে ফেরেশতাদের ও তাঁদের সঙ্গে জিনদের আদেশ করা হল- হযরত আদম আ.এর প্রতি সেজদা করতে এবং তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে—যেরূপে রাজা-বাদশারা স্বীয় উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে রাষ্ট্রের গণ্যমান্য লোকদের (তার সামনে) নযরানা পেশ করতে হুকুম দিয়ে থাকে, যাতে কারো পক্ষে তাকে অমান্য করার অবকাশ না থাকে। সে মত ইবলীস ছাড়া সকলেই উক্ত সেজদা করল।

ইবলীসের পরিচয়

সে আসলে ছিল জিন জাতিভুক্ত এবং ফেরেশতাদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করত। তার উক্ত অবাধ্যতার কারণ এই ছিল যে, জিন জাতি আদম আ. এর সৃষ্টির কয়েক হাজার বছর পূর্ব থেকে পৃথিবীর দখলদার ছিল এবং আকাশেও ওদের যাতায়াত ছিল। ওদের ফেতনা-ফাসাদ ও হানাহানি বৃদ্ধি পেলে আল্লাহ তাআলার হুকুমে ফেরেশতাগণ ওদের অনেককে হত্যা করলেন এবং অনেককে বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে ও দ্বীপ-দ্বীপান্তরে নির্বাসিত করে

وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ﴿۳۴﴾

অমান্য করল ও অহংকার করল। বস্তুত সে ছিলই কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত[১]।

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ﴿۳۵﴾

৩৫. আর আমি বললাম, 'হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তাতে যেখান থেকে ইচ্ছা যত ইচ্ছা খাও। আর এ গাছটির কাছেও যেয়ো না[২], তা হলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।'

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ

৩৬. অতঃপর শয়তান তাঁদের সেখান থেকে পদস্খলিত করল এবং তাঁরা যার ভিতর (অর্থাৎ যে সম্মান-মর্যাদা ও আরাম-আয়েশে) ছিলেন, তা থেকে তাঁদের বের করে ছাড়ল[৩]। আমি

দিলেন। ওদের মধ্যে ইবলীস বড় আলেম ও আবেদ ছিল, সে নিজেকে জিনদের ফেতনা-ফাসাদে জড়িত নয় বলে প্রকাশ করল এবং ফেরেশতাদের সুপারিশে সে বেঁচে গেল এবং তাঁদেরই দলভুক্ত হয়ে রইল।

এখন সমস্ত জিন সম্প্রদায়ের স্থলে একা তাকেই পৃথিবীর কর্তৃত্ব দেওয়া হবে, এই আশায় ইবাদত-বন্দেগীতে সে খুব সচেষ্ট হল এবং পৃথিবীর বুকে খেলাফতের স্বপ্ন দেখতে থাকল। আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-কে খেলাফত দানের কথা ঘোষণা করলে ইবলীস নিরাশ হল, লোক দেখানো ইবাদতের অকার্যকারিতা উপলব্ধি করে ঈর্ষার আগুনে জ্বলে উঠল এবং আদমের আনুগত্য অস্বীকার করে অভিশপ্ত হল।

১. আল্লাহ তাআলার ইলমে সে পূর্বেই কাফের ছিল, যদিও অন্যদের কাছে তা এখন প্রকাশ পেল। অথবা আয়াতের অর্থ হচ্ছে, সে এখন কাফের হল। কারণ, অহংকারহেতু সে আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করতে অস্বীকার করল। তাছাড়া সে সেজদা না করেই ক্ষান্ত রইল না, বরং আল্লাহ তাআলার হুকুমকে হেকমত ও মঙ্গলের পরিপন্থী এবং লজ্জাকর মনে করল।

২. তা গমের গাছ ছিল বলে প্রসিদ্ধ। কেউ আঙ্গুর বা আঞ্জীর (ফল বিশেষ) অথবা কমলা-লেবু ইত্যাদির গাছ বলেছেন। (আল্লাহই ভাল জানেন, কিসের গাছ ছিল)।

৩. কথিত আছে, হযরত আদম আ. ও বিবি হাওয়া বেহেশতে বাস করতে লাগলেন আর শয়তান স্বীয় মর্যাদার স্থান থেকে বহিষ্কৃত হল। ফলে ওর হিংসা আরো বেড়ে গেল। অবশেষে সে ময়ূর ও সাপের সাথে মিলে বেহেশতে প্রবেশ করল এবং বিবি হাওয়াকে নানাভাবে এমনই প্ররোচিত ও ফুসলাতে লাগল যে, এক পর্যায়ে তিনি সেই বৃক্ষের ফল খেয়ে ফেললেন এবং আদম আ.কেও খাওয়ালেন। শয়তান তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেছিল যে, এ ফল খেলে তাঁরা সর্বদা আল্লাহ তাআলার নৈকট্যপ্রাপ্ত থাকবেন। আর আল্লাহ তাআলা কেন তা খেতে নিষেধ করেছিলেন, এ বিষয়ে মনগড়া ব্যাখ্যাও দিল। সম্মুখে এ ঘটনা বিস্তারিত আসবে।

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝

বললাম, 'তোমরা (এখান থেকে) নেমে যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু হবে[১]। আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে আবাস ও উপভোগ— একটা সময় পর্যন্ত[২]।'

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

৩৭. অতঃপর আদম তাঁর রবের কাছ থেকে (তওবার) কিছু শব্দ শিখে নিলেন, ফলে আল্লাহ তাঁর প্রতি সদয় হলেন*। নিশ্চয় তিনিই তওবা কবুলকারী, পরম মেহেরবান[৩]।

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم

৩৮. আমি বললাম, 'তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও[৪]। অতঃপর তোমাদের নিকট যদি

---

১. উক্ত ভুলের কারণে হযরত আদম আ., বিবি হাওয়া ও তাঁদের ভবিষ্যত বংশধর— সকলের জন্য আদেশ জারী হল, বেহেশ্‌ত থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে গিয়ে বাস কর। তোমরা পরস্পর একে অন্যের দুশমন হবে, ফলে সমূহ কষ্টের সম্মুখীন হবে। বেহেশ্‌ত গোনাহ ও শত্রুতার স্থান নয়, এসবের উপযুক্ত স্থান হচ্ছে দুনিয়া, যা তোমাদের পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমরা চিরকাল থাকবে না, বরং এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সেখানে থাকবে, সেখানকার দ্রব্যসামগ্রী উপভোগ করবে এবং পরিশেষে আমারই নিকট ফিরে আসবে। আর সেই নির্ধারিত সময়টি হচ্ছে—প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তার মৃত্যুর সময়, আর সমগ্র জগতের জন্য কিয়ামত-দিবস।

* দ্বিতীয় তরজমা– 'তাঁর তওবা কবুল করলেন'।

৩. হযরত আদম আ. যখন আল্লাহ তাআলার ভর্ৎসনামিশ্রিত আদেশ শুনলেন এবং বেহেশ্‌ত থেকে বাইরে চলে এলেন, তখন অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয়ে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দয়াগুণে কিছু শব্দ এলহামসূত্রে তাঁর অন্তরে ঢেলে দিলেন, আর তাঁর তওবা কবুল হল। শব্দগুলি এই:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

'হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের জানের উপর জুলুম করেছি। এখন আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।' (সূরা আ'রাফ : ২৩)

৪. উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.এর তওবা তো কবুল করলেন, কিন্তু তখনি বেহেশতে ফিরে যেতে আদেশ দেননি, বরং দুনিয়াতে থাকার যে আদেশ করেছিলেন তা বলবৎ রাখলেন। কেননা, এতেই হেকমত ও মঙ্গল নিহিত ছিল। বলা বাহুল্য, বেহেশতের জন্য নয়; বরং দুনিয়ার জন্যই তাঁকে খলীফা বানানো হয়েছিল।

مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۝

আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত আসে, তবে যারা আমার হেদায়েত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয়ও নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না[১]।

আর আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন, যারা আমার অনুগত হবে, তাদের জন্য দুনিয়ায় বসবাস ক্ষতিকর নয় বরং লাভজনক হবে। অবশ্য যারা নাফরমান, তাদের জন্য জাহান্নাম রয়েছে। আর এই পার্থক্য ও পরীক্ষার জন্যও দুনিয়াই উপযুক্ত স্থান।

১. حزن ও خوف -এর মধ্যে পার্থক্য

কোন মুসীবত আসার পূর্বে তার কারণে যে আশঙ্কা হয়, তাকে خوف বলে। আর তা সংঘটিত হওয়ার পর যে দুঃখ হয়, তাকে حزن বলে। যেমনঃ কোন রুগী মারা যাওয়ার আশঙ্কায় যে কষ্ট হয়, তা হচ্ছে خوف আর মরে যাওয়ার পর যে কষ্ট হয় তা حزن

আয়াতের ব্যাখ্যা

আলোচ্য আয়াতে যে خوف ও حزن (ভয় ও দুঃখ) না থাকার কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা যদি দুনিয়ার 'খওফ ও হুয্ন' উদ্দেশ্য হয় তবে এই অর্থ হবে যে, যারা আমার (আল্লাহর) হেদায়েত অনুযায়ী চলবে তাদের এই আশঙ্কা থাকবে না যে, সম্ভবত এটি সত্যিকারের হেদায়েত নয়, বরং শয়তানের পক্ষ থেকে ধোঁকা ও বিভ্রান্তি। আর তাদের আদি পিতা বেহেশতচ্যুত হয়ে গেছেন বলে তারা দুঃখিতও হবে না। কেননা, হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকেরা শীঘ্রই জান্নাত লাভ করবে।

আর যদি আখেরাতের 'খওফ ও হুয্ন' উদ্দেশ্য হয়, তবে অর্থ এই হবে যে, কিয়ামতের দিন হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের 'খওফ্'ও হবে না, 'হুয্ন'ও না। 'হুয্ন' না হওয়া তো স্পষ্ট বিষয়। কিন্তু 'খওফ্' না হওয়ার ব্যাপারে খটকার সৃষ্টি হয়। কারণ, সেদিন সাধারণ-বিশিষ্ট, এমনকি নবীগণ আ. পর্যন্ত খওফ্মুক্ত হবেন না।

এ সংশয়ের উত্তর এই যে, খওফ (ভয়) দু'রকম– এক, কখনো ভয়ের কারণ ভীত ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। যেমনঃ রাজদ্রোহী বা সরকারবিরোধী ব্যক্তি রাজা বা সরকারকে ভয় করে। এ ক্ষেত্রে ভয়ের কারণ হচ্ছে তার কৃত অপরাধ। আর কখনো ভয়ের কারণ থাকে যাকে ভয় করা হয় তার মধ্যে। যেমন, কোন ব্যক্তি রাজা বা সরকার-প্রধানের সম্মুখীন হলে তার প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ভয় করে থাকে, অথবা বাঘের সম্মুখীন হয়ে পড়লেও সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে ভীত ব্যক্তির ভয়ের কারণ তার অন্যায়-অপরাধ নয়, বরং রাজা-বাদশার প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং বাঘের ক্রোধ ও হিংস্রতা।

আলোচ্য আয়াতে প্রথম রকমের ভয় সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, তাদের এ ভয় নেই। (কারণ, তারা অপরাধী নয়, আল্লাহর অনুগত)। দ্বিতীয় প্রকারের ভয়কে নাকচ করা হয়নি। তদুপরি সন্দেহ তো তখন হতে পারত, যদি لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ এর স্থলে لاخوف فيهم বা لا يخافون বলা হত।

৩৯. 'আর যারা কুফরী করবে এবং আমার আয়াতগুলি অস্বীকার করবে, তারা হবে দোযখী, তারা তাতে চিরকাল থাকবে।'

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

[রুকূ - ৫]

৪০. হে বনী ইসরাঈল[১]! তোমরা আমার সেসব অনুগ্রহ স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের প্রতি করেছিলাম[২]। আর আমার (সঙ্গে কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ কর, তাহলে আমিও পূর্ণ করব

يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْۤ اُوْفِ

---

১. পূর্বা-পর সম্পর্ক

২১ নং আয়াতে يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا এর দ্বারা সকল মানুষের প্রতি সম্বোধন ছিল এবং সেই সব নেয়ামতের উল্লেখ ছিল, যেগুলি সমগ্র বনী আদমকে ব্যাপ্ত– যেমন পৃথিবী, আকাশ ও অন্যান্য বস্তুর সৃষ্টি, তার পর হযরত আদম আ.কে সৃষ্টি করত তাঁকে খলীফা বানানো এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো ইত্যাদি। এখন বনী আদমের মধ্য থেকে বনী ইসরাঈলকে (ইসরাঈল-সন্তানদের) সম্বোধন করা হচ্ছে এবং তাদেরকে বংশানুক্রমে যেসব বিশেষ নে'য়ামত সময়ে সময়ে দান করা হয়েছিল এবং তারা যেভাবে নে'য়ামতের না-শোকরী করেছিল, এসব বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।

কেননা, বনী আদমের মধ্যে অন্য সব সম্প্রদায়ের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল—তারা আহলে ইলম, আহলে কিতাব ও নবুওয়াতধারী ছিল এবং তাদেরকে নবীদের পরিচয় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত বলে মনে করা হত। কারণ, হযরত ইয়াকুব আ. থেকে হযরত ঈসা আ. পর্যন্ত চার হাজার নবী তাদের মধ্যে আগমন করেছিলেন। সমগ্র আরববাসীর দৃষ্টি তাদের প্রতি নিবদ্ধ ছিল যে, তারা নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াতের সত্যতা সমর্থন করে কিনা। তাই আল্লাহ তাআলা এসব নে'য়ামত এবং সেই সাথে তাদের দোষাবলি বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন, যাতে তারা লজ্জায় পড়ে ঈমান গ্রহণ করে কিংবা অন্য লোকেরা তাদের কর্ম-কাণ্ড সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাদের কথায় আস্থা স্থাপন না করে।

ইসরাঈল হচ্ছে হযরত ইয়াকুব আ. এর নাম। এর অর্থ– আবদুল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা।)

২. আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে হাজারো নবী পাঠিয়েছিলেন, তাওরাত প্রভৃতি কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, ফেরাওনের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে শাম দেশে তাদের আধিপত্য দান করেছিলেন, মান্না ও সাল্ওয়া খাদ্য অবতীর্ণ করেছিলেন, একটি পাথর থেকে বারটি ঝরনা প্রবাহিত করেছিলেন। এসব নেয়ামত ও অলৌকিক ঘটনা আর কোনো মানব সম্প্রদায়ের ভাগ্যে জোটেনি।

তোমাদের (সঙ্গে কৃত) অঙ্গীকার[১]। এবং শুধু আমাকেই ভয় কর[২]।

بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۝

৪১. আর তোমরা আমার অবতীর্ণকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান আন, যা তোমাদের নিকট যে কিতাব আছে তার সত্যায়নকারী[৩]। তোমরা এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না[৪] এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করে চল।

وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۝

৪২. আর সত্যের মধ্যে মিথ্যা মিশ্রিত করো না এবং সত্য গোপন করো না জেনেশুনে।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۝

---

১. তাওরাতের মধ্যে এ মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছিল যে, তোমরা তাওরাতের হুকুম-আহকামের উপর কায়েম থাকলে এবং আমার প্রেরিত পয়গম্বরের প্রতি ঈমান এনে তার সহযোগিতা করলে শাম দেশ তোমাদের দখলে থাকবে। বনী ইসরাঈল এই কথা কবুল করেছিল বটে, কিন্তু পরে এর উপর স্থির থাকেনি। ওরা নিয়ত খারাপ করল, ঘুষ নিয়ে ভুল মাসআলা বলল, সত্য গোপন করল, নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপন করল, পয়গম্বরের অবাধ্য হল। এমনকি, কোন কোন নবীকে হত্যা করল, তাওরাতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর যে বর্ণনা ছিল তা পরিবর্তন করল, ফলে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।

২. অর্থাৎ পার্থিব স্বার্থ বিনষ্ট হওয়ার ভয় করো না।

৩. তাওরাতে বলে দেওয়া হয়েছিল, কোন নবী এসে তাওরাতের সমর্থন করলে বুঝবে, তিনি সত্য, অন্যথায় সে মিথ্যাবাদী।

তাওরাতের সমর্থনের অর্থ

জেনে রাখা দরকার, আকীদা-বিশ্বাস, নবীদের বিবরণ, পরকালের অবস্থা ও মৌলিক বিধি-নিষেধের ব্যাপারে কুরআন মাজীদের বিধান তাওরাত ও পূর্ববর্তী অন্যান্য আসমানী কিতাবের মতই। অবশ্য (পূর্ববর্তী কিতাবাদির) কোন কোন বিধি-নিষেধ মনসূখ বা রহিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এটি 'তাসদীক' বা সমর্থনের পরিপন্থী নয়। 'তাসদীক' এর পরিপন্থী হচ্ছে 'তাকযীব' বা অস্বীকার করা। আর যে কোনো আসমানী কিতাবের তাকযীব (বা অস্বীকৃতি) একেবারে কুফরী। কুরআনেরও কোন কোন আয়াত মনসূখ হয়েছে, কিন্তু নাউযুবিল্লাহ্ এটাকে কেউ 'তাকযীব' বলতে পারে না।

৪. অর্থাৎ জেনেশুনে তোমরা কুরআনের অস্বীকারকারীদের মধ্যে প্রথম হয়ো না। তা হলে কিয়ামত পর্যন্ত সব অস্বীকারকারীর পাপের বোঝা তোমাদের ঘাড়ে চাপবে। আর মক্কার মুশরিকদের অস্বীকৃতির কারণ অজ্ঞতা ও মূর্খতা। ওরা জেনেশুনে অস্বীকার করেনি; জেনেশুনে অমান্য ও অস্বীকারের ক্ষেত্রে তোমরাই পয়লা নম্বরের হবে। আর এই কুফরী প্রথমোক্ত কুফরী থেকে গুরুতর।

৪৩. আর নামায কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর এবং রুকু কর রুকুকারীদের সঙ্গে[১]।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

৪৪. তোমরা কি লোকদের সৎকাজের আদেশ কর, আর নিজেদের ভুলে যাও? অথচ তোমরা তো কিতাব পাঠ কর। তাহলে তোমরা কি বোঝ না?[২]

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

৪৫. আর সবর ও সালাতের সাহায্য গ্রহণ কর[৩]। নিশ্চয়ই নামায বড় কঠিন; তবে বিনয়ীদের নিকট (কঠিন) নয়—

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝

৪৬. যারা বিশ্বাস করে যে, তাদেরকে আপন রবের সম্মুখীন হতে হবে এবং তাদেরকে তাঁরই

اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ

---

১. অর্থাৎ জামাতের সাথে নামায পড়তে থাক। পূর্বে কোন দীনের মধ্যে জামাতসহ নামাযের বিধান ছিল না, আর ইহুদীদের নামাযে রুকু ছিল না। আয়াতের মর্ম এই যে, শুধু পূর্বোল্লিখিত বিষয়াদি তোমাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়, বরং সকল মৌলিক বিষয়ে শেষ যমানার নবীর অনুসরণ কর। নামাযও তাঁর ন্যায় পড়, যার মধ্যে জামাতও থাকবে, রুকু'ও হবে।

২. ইহুদী আলেমদের কেউ কেউ এমনও ছিল যে, নিজ লোকদের বলত, ইসলামধর্ম ভাল, কিন্তু নিজেরা মুসলমান হত না। বস্তুত শুধু ইহুদী আলেমদের নয়, বরং অধিকাংশ স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদেরও মনে এ ধারণার উদয় হয় যে, আমরা যেহেতু শরী'য়তের আহকাম শিক্ষা দানের ব্যাপারে ত্রুটি করি না এবং সত্যকে গোপনও করি না, সেহেতু ওই আহকাম অনুসারে আমাদের নিজেদের আমল করার প্রয়োজন নেই। আমাদের হেদায়েত অনুসারে যেহেতু অনেক মানুষ শরী'য়তের আমলাদি করছে, অতএব, اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ (সৎকর্মের পথনির্দেশকারী সৎকর্মের কর্তাতুল্য) -এ নিয়মানুসারে তাদের আমল আমাদেরই আমল বটে।

বর্তমান আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই ধারণার ভ্রান্তি ও অসারতা স্পষ্ট করে দিলেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বক্তাকে নিজ বক্তব্য অনুসারে অবশ্যই আমল করতে হবে; উদ্দেশ্য এই নয় যে, ফাসেক (দুষ্টজন) কাউকে নসীহতই করবে না।

৩. সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও পূর্ববর্তী কিতাবধারী আলেমদের পক্ষে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান না আনার কারণ ছিল 'হুব্বে জাহ' ও 'হুব্বে মাল' অর্থাৎ সম্মানের মোহ ও সম্পদের লোভ। আল্লাহ তা'আলা এখানে উভয় রোগের চিকিৎসা বলে দিলেন— সবরের দ্বারা ধনের লালসা দূর হবে এবং নামাযের দ্বারা দাসত্ব ও বিনয়ের মনোভাব সৃষ্টি হবে এবং সম্মানের মোহ কমে যাবে।

وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ۟

নিকট ফিরে যেতে হবে[১]।

[রুকূ - ৬]

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ۝

৪৭. হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের প্রতি করেছিলাম এবং এও (স্মরণ কর) যে, আমি তোমাদের সকল বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম[২]।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ

৪৮. আর সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, কারো পক্ষ থেকে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, কারো থেকে কোন বিনিময় নেওয়া হবে না

১. অর্থাৎ সবর ও খুশূ'-খুযূসহ নামায পড়া খুবই কঠিন কাজ, তবে তাদের জন্য সহজ, যারা (অন্তরে) বিনয় ও ভয় পোষণ করে, যাদের ধেয়ান-খেয়াল থাকে যে, আমাদেরকে (নামাযে) আল্লাহর সম্মুখীন হতে হবে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (অর্থাৎ নামাযের মধ্যেই আল্লাহর নৈকট্য এবং তাঁর সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ লাভ হয়)। অথবা অর্থ এই যে, কিয়ামত দিবসে হিসাব-কিতাবের জন্য আল্লাহর সম্মুখীন হতে হবে।

২. যেহেতু সবর ও কায়মনোবাক্যে ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে পরহেজগারী ও ঈমানের পূর্ণতা হাসিল করা কঠিন কাজ, তাই এ আয়াতে তার সহজ পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার শোকর। এ জন্য সময় সময় যেসব অনুগ্রহ ও নে'য়ামত ওদের দান করা হয়েছিল, তা আল্লাহ তাআলা ওদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং সেই সাথে ওদের অপকর্মও প্রকাশ করেছেন। মানুষ, এমনকি জীব-জন্তুর মধ্যেও এ স্বভাব রয়েছে যে, স্বীয় উপকারী জনের প্রতি অন্তরে মহব্বত ও আনুগত্য বসে যায়। কয়েকটি রুকুতে এ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বি. দ্র. বিশ্ববাসীর উপর বনী ইসরাঈলের শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ এই যে, ওদের আবির্ভাবের সময় থেকে কুরআনের অবতরণকাল পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ওরাই শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু যখনই ওরা শেষ নবী ও কুরআনের বিরোধিতা করল, তখন থেকে ওদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেল এবং ওরা 'অভিশপ্ত' ও 'পথভ্রষ্ট' খেতাবে আখ্যায়িত হল। পক্ষান্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীগণ 'শ্রেষ্ঠ উম্মত' হিসাবে অভিহিত হলেন।

مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না[১]।

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۭ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاۗءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

৪৯. আর (স্মরণ কর), যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাওনের লোকজন থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা তোমাদের কঠিন শাস্তি দিত যে, তোমাদের পুত্রদের যবেহ করে ফেলত, তবে তোমাদের নারীদের জীবিত রাখত[২]। আর এতে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ছিল মহা পরীক্ষা[৩]।

وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ

৫০. এবং (স্মরণ কর), যখন আমি তোমাদের কারণে সাগরকে বিভক্ত করেছিলাম, তার পর আমি তোমাদের বাঁচিয়ে নিলাম এবং ফেরাওনের লোকজনকে ডুবিয়ে দিলাম, আর

---

১. কেউ কোন বিপদে পড়লে সাধারণত তার আপনজনেরা প্রথমে তার জরুরী পাওনা আদায় (করে তাকে মুক্ত) করতে চেষ্টা করে। তা না পারলে তদবীর ও সুপারিশ দ্বারা তাকে বাঁচাতে চায়। এতেও ব্যর্থ হলে ফিদ্য়া বা মুক্তিপণ দিয়ে তাকে ছাড়াতে চায়। এও না হলে পরিশেষে সকল সাহায্যকারীর সমন্বয়ে জোরপূর্বক সংগ্রাম করত তাকে মুক্ত করে আনার চিন্তা-ভাবনা করে।

আল্লাহ তাআলা এই ক্রমিকতা অনুসারেই এরশাদ করেছেন যে, কেউ আল্লাহর যতই নৈকট্যপ্রাপ্ত হোক না কেন, আল্লাহর শত্রু-নাফরমান কাফেরকে উল্লিখিত চার উপায়ের কোন উপায়েই উপকার করতে পারবে না। বনী ইসরাঈল বলত, আমরা যতই গোনাহ করি না কেন, আমাদের শাস্তি হবে না, আমাদের বাপ-দাদারা নবী ছিলেন, তাঁরা আমাদের উদ্ধার করে নেবেন। তাই আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন, তোমাদের এ ধারণা ভ্রান্ত।

তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত যে শাফাআতের কথা বলেন, যার উল্লেখ অপরাপর আয়াতে রয়েছে, বর্তমান আয়াত দ্বারা ঐ শাফাআত নাকচ হয় না।

২. ফেরাওন একটি স্বপ্ন দেখেছিল, যার ব্যাখ্যা জ্যোতিষীরা এভাবে করেছিল যে, বনী ইসরাঈলে এমন এক ব্যক্তির জন্ম হবে, যে আপনার ধর্ম ও রাজত্ব ধ্বংস করে দেবে। এতে ফেরাওন তার সৈন্যদের আদেশ দিল, বনী ইসরাঈলের মধ্যে ছেলে পয়দা হলেই যেন হত্যা করা হয় এবং মেয়ে হলে কাজের জন্য জীবিত রাখা হয় । আল্লাহ তা'আলা মূসা আ.কে পয়দা করলেন এবং জীবিত রাখলেন।

৩. بلاء শব্দের একাধিক অর্থ আছে। এখানে ذلكم দ্বারা যবেহ্র প্রতি ইঙ্গিত হলে এর অর্থ হবে মুসিবত, আর নাজাত বা রেহাইয়ের দিকে ইশারা হলে অর্থ হবে নেয়ামত এবং সামগ্রিক ঘটনার দিকে ইশারা হলে এর অর্থ হবে পরীক্ষা।

তোমরা (তা) দেখছিলে[১]।

وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ۝

৫১. এবং (স্মরণ কর), যখন আমি মূসার সঙ্গে চল্লিশ রাতের ওয়াদা করেছিলাম। অনন্তর তোমরা তাঁর (প্রস্থানের) পর গো-বৎস বানিয়ে নিলে- আর তোমরা ছিলে জালেম[২]।

وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ۝

৫২. অনন্তর- তার পরও আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম, যাতে তোমরা শোকর কর[৩]।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۝

৫৩. এবং (স্মরণ কর), যখন আমি মূসাকে কিতাব ও পার্থক্যকারী (বিধান) দান করেছিলাম, যাতে তোমরা সরল পথ পাও[৪]।

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ۝

৫৪. এবং (স্মরণ কর), যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে[৫] বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় তোমরা বাছুরকে (উপাস্য) বানিয়ে

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ

১. অর্থাৎ ওহে বনী ইসরাঈল! তোমরা সেই বিরাট নে'য়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ফেরাওনের ভয়ে পলায়ন করছিল। সম্মুখে ছিল সমুদ্র ও পিছনে ফেরাওনের লোক-লস্কর। এমতাবস্থায় আমি তোমাদের তরিয়ে নিলাম এবং ফেরাওন ও ওর লোক-লস্করকে ডুবিয়ে মারলাম। এ কাহিনী সামনে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হবে।

২. অর্থাৎ এ ঘটনা ও অনুগ্রহও স্মরণযোগ্য যে, আমি তাওরাত কিতাব দান করার জন্য মূসার সঙ্গে চল্লিশ দিন-রাতের ওয়াদা করেছিলাম। কিন্তু 'তূর' পাহাড়ে তাঁর গমনের পর তোমরা (বনী ইসরাঈল) বাছুর পূজা শুরু করলে। তোমরা কত বড় জালেম যে, বাছুরকে খোদা বানিয়ে নিলে! (বিস্তারিত কাহিনী সামনে বর্ণিত হবে।)

৩. অর্থাৎ এই প্রকাশ্য শিরক সত্ত্বেও আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমাদের তওবা কবুল করলাম। তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিনি (যেমন ফেরাওন-গোষ্ঠীকে এর চেয়েও কম অপরাধের জন্য ধ্বংস করে দিয়েছিলাম), যাতে তোমরা আমার শোকর আদায় কর এবং অনুগ্রহ স্বীকার কর।

৪. 'কিতাব' বলতে তো তাওরাত উদ্দেশ্য, আর 'ফুরকান' বলতে শরী'য়তের সেই আহকাম বোঝানো হয়েছে, যেগুলির দ্বারা জায়েয-নাজায়েয জানা যায়। অথবা হযরত মূসা আ.এর মুজেযাগুলিকে ফুরকান বলা হয়েছে, যা দিয়ে সত্য-মিথ্যা ও মুমিন-কাফেরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। কিংবা তাওরাতকেই বোঝানো হয়েছে। কারণ, তা কিতাবও বটে এবং তা দিয়ে হক-বাতিলের পার্থক্যও হয়।

৫. এস্থলে সম্প্রদায় বলতে শুধু সেই লোকেরা উদ্দেশ্য, যারা বাছুরকে সেজদা করেছিল।

নিজেদের ক্ষতি করেছ। অতএব এখন তোমরা আপন সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা কর এবং নিজেদের হত্যা কর[১]। তোমাদের স্রষ্টার নিকট তোমাদের জন্য এ-ই উত্তম। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হলেন।[২] নিশ্চয় তিনিই তওবা কবুলকারী, অতি মেহেরবান।'

فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِىِٕكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِىِٕكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

৫৫. এবং (স্মরণ কর), যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা তোমার (বলার) কারণে মোটেই ঈমান আনব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখছি।' ফলে তোমাদের পাকড়াও করল বজ্র, আর তোমরা (তা) দেখছিলে।

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝

৫৬. অতঃপর আমি তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদের পুনর্জীবিত করলাম, যাতে তোমরা শোকর কর[৩]।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ যারা বাছুরকে সেজদা করনি তারা সেজদাকারীদের কতল কর।

কারো কারো মতে বনী ইসরাঈলে তিন দল ছিল: এক দল নিজেরাও বাছুর-পূজা হতে বিরত থাকে, অন্যদেরও বাধা দেয়। দ্বিতীয় দল বাছুরকে সেজদা করেছিল। তৃতীয় দল নিজেরা তো সেজদা করেনি, কিন্তু অন্যদের নিষেধও করেনি। দ্বিতীয় দলের প্রতি আদেশ হল, তোমরা নিহত হয়ে যাও। তৃতীয় দলের প্রতি আদেশ হল, ওদের (অর্থাৎ দ্বিতীয় দলের লোকদের) হত্যা কর, যাতে নিষেধ না করার গোনাহর তওবা হয়ে যায়। আর প্রথম দল এই তওবায় শরীক হয়নি, কারণ তাদের তওবার প্রয়োজন ছিল না।

২. এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, নিহত হয়ে যাওয়াই (সম্পূর্ণ) তওবা ছিল, না তওবার পরিশিষ্ট ছিল। যেমন, আমাদের শরী'য়তের বিধান রয়েছে, স্বেচ্ছায় হত্যাকারীর তওবা কবুল হওয়ার জন্য এও জরুরী যে, হত্যাকারী নিজেকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের কাছে সোপর্দ করে দেবে। অতঃপর বদলা (প্রতিশোধ) নেওয়া অথবা ক্ষমা করে দেওয়া নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের এখতিয়ার।

৩. অর্থাৎ ঐ সময়ের কথাও স্মরণ কর, যখন এত এত অনুগ্রহের পরও তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা কখনো তোমার কথায় বিশ্বাস করব না যে, এ আল্লাহ তাআলার কালাম—যাবৎ না আমরা আল্লাহ তাআলাকে চোখে স্পষ্টরূপে দেখব। এই ধৃষ্টতার কারণে তোমরা বজ্রাঘাতে ধ্বংস হলে। অতঃপর মূসার দোয়ার ফলে আমি তোমাদের জীবিত করি।

এটা সেই সময়ের কথা, যখন মূসা আ. সত্তর ব্যক্তিকে বাছাই করে আল্লাহ তাআলার কালাম শোনার উদ্দেশ্যে তূর পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলার কালাম শোনার পর সেই

৫৭. আর আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া বিস্তার করেছিলাম এবং তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম মান্ ও সাল্ওয়া[১]। (আমি বলেছিলাম,) 'তোমরা পবিত্র দ্রব্যাদি খাও[২], যা আমি তোমাদের দান করেছি।' বস্তুত ওরা আমার কোন ক্ষতি করেনি, বরং ওরা নিজেদেরই প্রতি জুলুম করছিল[৩]।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

৫৮. এবং (স্মরণ কর), যখন আমি বলেছিলাম, 'তোমরা এই শহরে প্রবেশ কর[৪] এবং তাতে যেখান থেকে ইচ্ছা যত ইচ্ছা খেতে থাক। আর (তার) দ্বারে প্রবেশ কর সেজদা করে

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا

সত্তর ব্যক্তি বলল, 'হে মূসা! পর্দার আড়াল থেকে শুনে আমরা বিশ্বাস করি না, চর্ম চোখে খোদাকে দেখাও।' এই ধৃষ্টতার জন্য সেই সত্তর ব্যক্তি বজ্রাঘাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

১. যখন ফেরাওন ডুবে মরল এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমে বনী ইসরাঈল মিসর থেকে শাম এলাকার দিকে রওনা হল, তখন পথিমধ্যে মরুভূমিতে ওদের তাঁবুগুলো ছিঁড়ে গেল, মাথার উপর ছিল সূর্যের খর তাপ। এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা এই অনুগ্রহ করলেন যে, সারাদিন ওদের উপর মেঘের ছায়া থাকত, আর যখন খাদ্য-শস্য ফুরিয়ে গেল, তখন ওদের জন্য মান্ ও সাল্ওয়া অবতীর্ণ হত।

'মান্' একরকম মিষ্টি খাদ্য– যা শিশিরবিন্দু আকারে সেখানে বর্ষিত হয়ে লোক-লস্করের আশপাশে স্তূপীকৃত হত। প্রত্যুষে সকলে নিজ নিজ প্রয়োজন মত উঠিয়ে নিত। আর 'সাল্ওয়া' একপ্রকার পাখী, যাকে বটের বলা হয়। সন্ধ্যায় লস্করের আশে-পাশে হাজার হাজার সংখ্যায় জমা হত। অন্ধকার হলে তারা সেগুলি ধরে এনে কাবাব করে খেত। দীর্ঘদিন যাবৎ ওরা এ খাদ্যই খেতে থাকে।

২. অর্থাৎ এই উপাদেয় ও সুস্বাদু খাদ্য খাও এবং এতেই সন্তুষ্ট থাক। ভবিষ্যতের জন্য জমা করে রেখো না এবং এর পরিবর্তে অন্য খাদ্যও চেয়ো না।

৩. প্রথম জুলুম এই করেছিল যে, লোভে পড়ে উক্ত খাদ্য দ্রব্যাদি জমা করে রেখেছিল। তাতে গোশত পচতে শুরু করল। দ্বিতীয়ত তারা অন্য খাদ্য চেয়েছিল, যথা– গম, মুশুড়ি, কাঁকড় ও পেঁয়াজ ইত্যাদি। ফলে ওরা নানা রকম কষ্ট ও যাতনার মধ্যে পতিত হল।

৪. উল্লিখিত ময়দানে ঘুরেফিরে ক্লান্ত-শ্রান্ত হলে এবং মান্ ও সাল্ওয়া খেতে খেতে বিরক্ত বোধ করার পর বনী ইসরাঈলের প্রতি আদেশ হল একটি শহরে প্রবেশ করতে। শহরটির নাম ছিল 'আরীহা'। তাতে 'আদ' জাতির শাখা 'আমালিকা' সম্প্রদায় বসবাস করত। কারো মতে শহরটি ছিল 'বাইতুল মুকাদ্দাস'।

করে[১] এবং বলতে থাক, 'ক্ষমা করে দিন' —তা হলে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেব এবং সৎকর্মশীলদের আরো বেশি দান করব[২]।

الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৫৯. কিন্তু জালেমরা, তাদের যা (বলতে) বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। ফলে আমি জালেমদের উপর আসমান থেকে শাস্তি অবতীর্ণ করলাম ওদের নাফরমানীর কারণে[৩]।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝

[রুকূ - ৭]

৬০. এবং (স্মরণ কর), যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করেছিলেন। আমি বললাম, 'তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর'। ফলে তা থেকে বারটি ঝরনা প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনে নিল[৪]। (আমি বললাম,) 'আল্লাহর

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۗ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ

---

১. অর্থাৎ এই শহরের দ্বার দিয়ে প্রবেশ করার সময় শুকরিয়ার সেজ্‌দা করতে করতে যাও। (এ হল দৈহিক শুকরিয়া)। আর কারো মতে অর্থ হচ্ছে, বিনয়বশে কোমর বাঁকা করে যাও।

২. আর মুখে নিজেদের গোনাহর জন্য ক্ষমা চাইতে চাইতে যাও। (এ হল মৌখিক শুকরিয়া)। যে ব্যক্তি এই উভয় কাজ করবে, আমি তার গোনাহ মাফ করে দেব এবং নেক বান্দাদের জন্য ছওয়াব বর্ধিত করে দেব।

৩. অন্য কথা এই যে, حِطَّة এর স্থলে ব্যঙ্গ করে حِنْطَة (অর্থাৎ গম) বলতে থাকে এবং সেজদা না করে পাছার উপর ভর করে পিছলিয়ে চলতে থাকে। শহরে পৌঁছার পর ওরা প্লেগে (মহামারীতে) আক্রান্ত হল এবং দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সত্তর হাজার ইহুদীর মৃত্যু হল।

৪. এ ঘটনাও সেই ময়দানেই ঘটেছিল। পানির অভাব হলে আল্লাহ তাআলার হুকুমে মূসা আ. একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন, ফলে প্রস্তরখণ্ডটি থেকে বারটি ঝরনা প্রবাহিত হল। বনী ইসরাঈলের গোত্রও ছিল বারটি। কোন গোত্রে বেশি আর কোনটিতে লোক কম ছিল। প্রত্যেক দলের সংখ্যানুপাতে একটি করে (নির্দিষ্ট) ঝরনা ছিল এবং এ হিসাবেই তা চেনা যেত। অথবা এভাবে নির্ধারিত করা হয়েছিল যে, পাথরের অমুক দিকের অমুক অংশ থেকে যে ঝরনা-ধারা প্রবাহিত হবে, তা অমুক দলের।

রিযিক খাও ও পান কর, আর যমীনে ফেতনা-ফাসাদ করে বেড়িয়ো না[১]।'

৬১. এবং (স্মরণ কর), যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা একই ধরনের খাদ্যে আদৌ সবর করব না। অতএব আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য তা বের করে আনেন যা ভূমিতে উৎপন্ন হয়– (অর্থাৎ) শাক-সবজি, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পিয়াজ[২]।' মূসা বললেন, 'তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তুর বদলে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করতে চাও?[৩] তোমরা কোন নগরে অবতরণ কর, (সেখানে) তোমরা যা চাচ্ছ তা পাবে[৪]।' আর ওদের উপর আরোপ করে দেওয়া হল লাঞ্ছনা ও মুখাপেক্ষিতা এবং ওরা আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরল[৫]। এটা এজন্য হল যে, ওরা

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْأَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ؕ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ أَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۚ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

আর সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন যেসব লোক মুজেযা অস্বীকার করে, তাদের সম্পর্কে বলা হয়– نیستند آدم غلاف آدم اند (তারা মানুষ নয়, মানুষের খোলসমাত্র)। লক্ষ কর, চুম্বক লোহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে থাকে। এই পাথরখণ্ডটি যদি পানিকে আকর্ষণ করল, তবে অস্বীকার করার কী আছে?

১. অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ তাআলা এরশাদ করলেন, মান্ ও সালওয়া খেতে থাক এবং এই ঝরনাগুলির পানি পান করতে থাক, কিন্তু দুনিয়াতে ফেতনা-ফাসাদের প্রসার ঘটিয়ো না।

২. এ সেই ময়দানেরই ঘটনা। বনী ইসরাঈল আসমানী খাদ্য মান্ ও সালওয়া খেতে খেতে বিরক্ত হয়ে গিয়ে বলতে লাগল, আমরা এক ধরনের খাদ্যে ধৈর্য ধারণ করতে পারব না, আমাদের প্রয়োজন মাটিতে উৎপন্ন ফসল— তরি-তরকারি ও শাক-সবজি।

৩. অর্থাৎ সব দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট আসমানী খাদ্য মান্ ও সালওয়াকে দুনিয়ার পিয়াজ, রশুন ইত্যাদির সাথে বদলাতে চাও?

৪. যদি তা-ই মনে চায়, তবে কোন শহরে যাও; তথায় তোমাদের কাম্য বস্তু সবই মিলবে। অতঃপর তাই হল।

৫. লাঞ্ছনা এই যে, তারা সর্বদা মুসলমান ও খ্রিস্টানদের অধীন ও আজ্ঞাবহ হয়ে রয়েছে। কারো নিকট ধন থাকলেই বা কি, ইজ্জতের মূলধন স্বাধীনতা থেকে তারা একেবারে বঞ্চিত হয়ে গেল। আর মুখাপেক্ষিতা এই যে, ইহুদীদের মধ্যে ধনের স্বল্পতা ছিল। আর ওদের

وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝٦١

আল্লাহর বিধি-বিধান অস্বীকার করত এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করত। এটা এজন্য যে, ওরা নাফরমানী করেছিল এবং ওরা সীমালঙ্ঘন করত[১]।

[রুকূ - ৮]

৬২. إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝٦٢

যারা মুসলমান, যারা ইহুদী এবং খ্রিস্টান ও সাবীগণ—(এদের মধ্যে) যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, নিশ্চয় তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয়ও নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না[২]।

৬৩. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

এবং (স্মরণ কর), যখন আমি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং 'তূর'

মধ্যে যাদের নিকট ধন ছিল, ওরাও শাসক ও অন্যদের ভয়ে নিজেদের গরীব ও অভাবী বলে প্রকাশ করত। তা ছাড়া চরম লালসা ও কৃপণতার কারণে ওদেরকে অভাবীদের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট দেখা যেত। কথায় বলে, 'ধন থাকলেই ধনী হয় না'। তাই সম্পদশালী হয়েও ওরা অভাবীই রয়ে গেল। আর আল্লাহ তাআলার দেওয়া শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান বিকিয়ে দিয়ে ওরা গজব ও ক্রোধের পাত্র হল।

১. অর্থাৎ এই লাঞ্ছনা, মুখাপেক্ষিতা ও আল্লাহ তাআলার গযবের কারণ ছিল ওদের কুফরী এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে হত্যা করা। আর এই কুফরী ও হত্যার কারণ ছিল আল্লাহর হুকুম-আহকামের নাফরমানী এবং শরী'য়তের সীমাসমূহের লঙ্ঘন।

২. অর্থাৎ নাজাত ও প্রতিদান কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর জন্য ঈমান আনা ও নেক কাজ করা শর্ত। সুতরাং যার ভাগ্যেই এই জিনিস লাভ হবে, সে-ই প্রতিদান পাবে।

এ কথা বলার কারণ এই যে— বনী ইসরাঈল এই বলে গৌরব করত যে, আমরা পয়গম্বরদের সন্তানসন্ততি, আমরা সকল দিক দিয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট উত্তম।

বি. দ্র. হযরত মূসা আ.-এর উম্মতকে ইহুদী বলে এবং হযরত ঈসা আ.-এর উম্মতকে নাসারা বা খ্রিস্টান বলে। আর 'সাবী' হচ্ছে এমন এক দল, যারা প্রত্যেক ধর্ম থেকে ভাল মনে করে কিছু কিছু বিষয় অবলম্বন করে নিয়েছে। এরা হযরত ইবরাহীম আ.-কে মানে, আবার ফেরেশতাদেরও পূজা করে, আসমানী কিতাব 'যবূর' পড়ে এবং কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়ে।

পর্বতকে তোমাদের উপর তুলে ধরেছিলাম (এবং বলেছিলাম), আমি তোমাদের যা (যে কিতাব) দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধর এবং তাতে যা কিছু রয়েছে তা স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা (নাফরমানী থেকে) বেঁচে থাক[১]।'

الطُّوْرَ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۝

৬৪. এর পরও তোমরা ফিরে গেলে। অতএব যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর মেহেরবানী না হত, তবে নিশ্চয় তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে[২]।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ۝

৬৫. নিশ্চয় তোমরা তাদের ভাল করেই জান, তোমাদের মধ্যে যারা শনিবার সম্পর্কে সীমালঙ্ঘন করেছিল। অতএব আমি

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا

১. তাওরাত নাযিল হওয়ার পর বনী ইসরাঈল অবাধ্য হয়ে বলতে লাগল, 'তাওরাতের হুকুম-আহকাম বড় কঠিন ও ভারী, তা পালন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' ফলে, আল্লাহ তাআলা এক পাহাড়কে আদেশ দিলেন, যা এসে ওদের সকলের মাথার উপর পড়ার উপক্রম করল এবং সামনে আগুন দেখা দিল। ফলে ওদের জন্য অবাধ্যতার কোন অবকাশ রইল না, বাধ্য হয়ে তাওরাতের আহকাম কবুল করল।

একটি সংশয়ের উত্তর

তবে প্রশ্ন হতে পারে, এভাবে মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরে তাওরাত কবুল করানো সুস্পষ্ট জবরদস্তি ও বলপ্রেয়োগ মনে হয়, যা لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ('দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।' বাকারা, ২৫৬) আয়াতের এবং বিধান আরোপের নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেননা, বিধান আরোপের ভিত্তি হচ্ছে এখতিয়ার (বা স্বাধীন ইচ্ছার) উপর, অথচ বলপ্রয়োগে স্বাধীনতা ব্যাহত হয়।

এর উত্তর এই যে, উক্ত বলপ্রয়োগ দীন গ্রহণের ব্যাপারে ছিল না। দীন তো ওরা পূর্ব থেকেই কবুল করেছিল এবং বারবার হযরত মূসা আ.কে তাগিদ দিচ্ছিল যে, আহকামসম্বলিত কোন কিতাব আমাদের এনে দিন, আমরা সেই মত আমল করব। আর ওরা এ বিষয়ে অঙ্গীকারও করেছিল। কিন্তু তাওরাত দান করার পর ওরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদ্যত হল। এ অবস্থায় পাহাড়কে মাথার উপর তুলে ধরার উদ্দেশ্য ছিল অঙ্গীকার ভঙ্গ করা থেকে ওদের বিরত রাখা, দীন কবুল করানো নয়।

২. অর্থাৎ ওয়াদা-অঙ্গীকার করে ওরা আবার ফিরে গেল। সুতরাং আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত না হলে ওরা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেত, অর্থাৎ তখনই ওদের ধ্বংস করে দেওয়া হত। অথবা অর্থ এই যে, তওবা-এস্তেগফার করেও এবং আখেরী যমানার নবীর অনুসরণ করেও ওরা নিজেদের অপরাধের ক্ষমা পেত না।

قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ۝

ওদের বলেছিলাম, 'তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও[১]।'

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

৬৬. অতঃপর আমি সে ঘটনাকে শিক্ষার বিষয় বানিয়েছি— যারা সেখানে ছিল তাদের জন্য এবং পরবর্তীদের জন্য*[২], এবং বানিয়েছি উপদেশ আল্লাহভীরুদের জন্য।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ

৬৭. এবং (স্মরণ কর), যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী যবেহ করতে আদেশ করেছেন[৩]।' তারা বলল, 'আপনি কি আমাদের ঠাট্টার পাত্র বানাচ্ছেন?[৪]' তিনি

---

১. তাওরাতে বনী ইসরাঈলের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, শনিবার দিনটি শুধু ইবাদত-বন্দেগীর জন্য নির্ধারিত, এই দিনে মাছ শিকার করবে না। কিন্তু ওরা চাতুরী ও অপকৌশল করে শনিবার দিনও শিকার করতে লাগল। ফলে আল্লাহ তাআলা ওদের আকৃতি বিকৃত করে বানরের মত করে দিলেন। চিন্তা-বুদ্ধি মানুষের মতই ছিল, একে অপরকে দেখত ও কাঁদত, কিন্তু কথা বলতে পারত না। তিন দিন পর সকলেই মরে গেল। এ ঘটনা হযরত দাউদ আ. এর যুগে ঘটেছিল। সূরা 'আরাফে এর তফসীল বর্ণিত হবে।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আর আমি সেই জনপদকে শিক্ষার বিষয় বানিয়েছি— যেসব জনপদ তার সামনে (অর্থাৎ তার আশপাশে) ছিল সেগুলোর জন্য এবং যেগুলো তার পিছনে (অর্থাৎ তা থেকে দূরে) ছিল সেগুলোর জন্যও'।

অথবা : 'আমি সে ঘটনাকে শিক্ষার বিষয় বানিয়েছি— যারা তার সমসাময়িক তাদের জন্য এবং যারা তার পরে আগমনকারী তাদেরও জন্য'।

২. অর্থাৎ সমকালীন ও পরবর্তী কালের লোকদের জন্য, অর্থাৎ যারা উক্ত শাস্তির প্রত্যক্ষদর্শী তাদের জন্য এবং যারা ভবিষ্যতে পয়দা হওয়ার ছিল তাদেরও জন্য; অথবা শহরের পার্শ্ববর্তী ও দূরবর্তী যেসব লোকালয় ছিল, তাদের জন্য আমি এই ঘটনা ও পরিণতিকে ভয়ের কারণ ও শিক্ষার বিষয় বানিয়েছিলাম।

৩. অর্থাৎ সেই সময়ের (কথা) স্মরণ কর, যখন বনী ইসরাঈলের মধ্যে 'আমীল' নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছিল এবং তার হত্যাকারী কে, তা জানা যাচ্ছিল না। তখন মূসা আ. বললেন, 'আল্লাহ তাআলার হুকুম এই যে, একটি গাভী যবেহ করে তার একটি টুকরা মৃতের গায়ে লাগাও, তাতে সে জীবিত হয়ে উঠবে এবং হত্যাকারীর নাম বলে দেবে।'

আল্লাহ তাআলা এই উপায়ে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দিলেন এবং সে হত্যাকারীর নাম জানিয়ে দিয়ে বলল, তার ওয়ারিসরাই সম্পদের লোভে তাকে কতল করেছিল।

৪. কারণ, গাভীর টুকরা লাগালে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যাবে, এমনটি দেখিওনি, শুনিওনি।

اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

বললেন, 'আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে[১]।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ

৬৮. তারা বলল, 'আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের বলে দেন, সেই গাভীটি কেমন[২]?' মূসা বললেন, 'তিনি বলছেন, তা এমন একটি গাভী, যা বৃদ্ধাও নয়, অল্প বয়স্কাও নয়, (বরং) এর (অর্থাৎ বার্ধক্য ও যৌবনের) মধ্যবর্তী। এখন তোমাদের যা আদেশ করা হয়েছে তা করে ফেল[৩]।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ

৬৯. তারা বলল, 'আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের বলে দেন, তার রং কী?' মূসা বললেন, 'তিনি বলছেন, 'তা একটি হলুদ গাভী, যার রং খুব গাঢ়, যা দর্শকদের আনন্দিত করে।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ

৭০. তারা বলল, 'আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের বলে দেন, সেটি কী প্রকারের[৪]? কেননা, গাভীটি আমাদের কাছে সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে এবং আমরা –যদি আল্লাহ চান– অবশ্যই পথ পেয়ে যাব।'

قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ

৭১. মূসা বললেন, 'তিনি বলছেন, তা এমন গাভী, যা (কারো) বশীভূত নয় যে, জমি চাষ করে এবং তা ক্ষেতে পানিও দেয় না–

১. অর্থাৎ ঠাট্টা করা আহমক-জাহেলের কাজ, বিশেষত যদি তা হয় শরী'য়তের আহকাম সম্বন্ধে। পয়গম্বরের দ্বারা এ কখনো সম্ভব নয়।

২. অর্থাৎ আপনার প্রভু যেন গাভীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য আমাদের বলে দেন যে, তার বয়স কত– স্বল্প বয়স্কা, না বৃদ্ধা।

৩. অর্থাৎ এ গাভী যবেহ করে ফেল।

৪. অর্থাৎ পরিষ্কার করে বলে দিন, সেই গাভীটি কী প্রকারের ও কী কাজের।

مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ۝

নিখুঁত, যাতে কোন দাগ নেই[১]।' তারা বলল, 'এখন আপনি সঠিক কথা নিয়ে এসেছেন।' অতঃপর তারা তা যবেহ করল, আর তারা (এ কাজ) করবে বলে মনে হচ্ছিল না[২]।

[রুকূ - ৯]

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَءْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

৭২. এবং (স্মরণ কর), যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। অতঃপর তোমরা তার বিষয়ে একে অন্যের উপর দোষ চাপাতে লাগলে। আর আল্লাহ তা প্রকাশ করার ছিলেন যা তোমরা গোপন করছিলে[৩]।

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

৭৩. অতঃপর আমি বললাম, 'মৃতকে গাভীর একটি অংশ দিয়ে আঘাত কর[৪]।' এভাবেই আল্লাহ মৃতদের জীবিত করবেন। আর তিনি তোমাদের তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনাবলি দেখান, যাতে তোমরা অনুধাবন কর[৫]।

---

১. অর্থাৎ তার শরীরে কোন খুঁত নেই এবং তার রঙের মধ্যে অন্য রঙের কোন চিহ্ন নেই, বরং সমস্তটাই হলুদ।

২. সেই গাভীটি ছিল এমন এক ব্যক্তির, যে মায়ের খুব খেদমত করত এবং খুব ভাল মানুষ ছিল। গাভীটির চামড়ার ভিতর যে পরিমাণ সোনা ধরে, তত মূল্যে সেই লোকের কাছ থেকে ওরা গাভীটি ক্রয় করল এবং যবেহ করল। তবে ওরা এত বেশি মূল্যে তা কিনে যবেহ করবে বলে মনে হচ্ছিল না।

৩. (নবীজির যুগের ইহুদীদের বলা হয়েছে)— তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আমীলকে হত্যা করেছিল। অতঃপর একে অন্যের উপর দোষ চাপাতে শুরু করল। আর তোমরা যে জিনিস গোপন করছিলে (অর্থাৎ নিজেদের ঈমানী দুর্বলতা বা হত্যাকারীর নামধাম), আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল তা প্রকাশ করে দেওয়া।

৪. ঐ গাভীটির দেহের এক টুকরা দিয়ে তাকে আঘাত করলে সে আল্লাহ তাআলার হুকুমে জীবিত হয়ে উঠল আর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বইতে লাগল এবং স্বীয় হত্যাকারীদের নাম বলে দিল। ওরা ছিল নিহত ব্যক্তিরই ভাতিজা। ধনের লোভে (আপন) চাচাকে জঙ্গলে নিয়ে হত্যা করেছিল। ওদের নাম বলেই সে মাটিতে পড়ে গেল, আবার মরে গেল।

৫. অর্থাৎ এভাবেই আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন নিজ পরিপূর্ণ কুদরতের বলে মৃতদের জীবিত করবেন। আর তিনি তোমাদের তাঁর কুদরতের নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন, যাতে তোমরা চিন্তা করে বুঝতে পার যে, আল্লাহ তাআলা মৃতদের জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন।

৭৪. অনন্তর- ওই সবের পরও তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে থাকল[১]। তা তো পাথরের ন্যায়, বা তার চেয়েও কঠিন। আর নিশ্চয়ই পাথরের মধ্যে কতক এমনো আছে, যা থেকে ঝরনামালা প্রবাহিত হয় এবং তার মধ্যে কতক এমনো আছে, যা ফেটে যায় এবং তা থেকে পানি বের হয়; আর তার মধ্যে কতক এমনো আছে, যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে। আর আল্লাহ তোমরা যা কিছু কর সে সম্বন্ধে বে-খবর নন[২]।

ثُمَّ قَسَتۡ قُلُوۡبُكُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالۡحِجَارَةِ اَوۡ اَشَدُّ قَسۡوَةً ؕ وَاِنَّ مِنَ الۡحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنۡهُ الۡاَنۡهٰرُ ؕ وَاِنَّ مِنۡهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخۡرُجُ مِنۡهُ الۡمَآءُ ؕ وَاِنَّ مِنۡهَا لَمَا يَهۡبِطُ مِنۡ خَشۡيَةِ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ۝

৭৫. তবুও কি তোমরা (হে মুসলমানগণ!) আশা কর যে, ওরা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ ওদের মধ্যে একটা দল ছিল, যারা আল্লাহর বাণী শুনত, অতঃপর তা বিকৃত করে ফেলত তা বোঝার পরও; অথচ ওরা জানত[৩]।

اَفَتَطۡمَعُوۡنَ اَنۡ يُّؤۡمِنُوۡا لَكُمۡ وَقَدۡ كَانَ فَرِيۡقٌ مِّنۡهُمۡ يَسۡمَعُوۡنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوۡنَهٗ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا عَقَلُوۡهُ وَهُمۡ يَعۡلَمُوۡنَ ۝

---

১. অর্থাৎ 'আমীলের জীবিত হয়ে ওঠার পরও কঠিন থাকল'। উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার কুদরতের এমন নিদর্শন দেখেও তোমাদের অন্তর নরম হল না।

২. অর্থাৎ কোন কোন পাথর দিয়ে বড় উপকার হয়। কারণ, তা থেকে প্রস্রবণ ও প্রচুর পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয়ে থাকে। আর কোন কোন পাথর থেকে পানি কম নির্গত হয় এবং প্রথমগুলির তুলনায় উপকার কম হয়। আর কোন কোন পাথর এমনো রয়েছে, যা দিয়ে কারো উপকার না হলেও স্বয়ং তার মধ্যে এক রকম ফায়দা ও বৈশিষ্ট্য তো বর্তমান থাকে। কিন্তু ওদের অন্তর এই তিন শ্রেণীর পাথরের চেয়েও শক্ত। সেসব দিয়ে কারো কোনো উপকারও হয় না এবং ওদের মধ্যে কোনো কল্যাণের বিষয়ও বর্তমান নেই।

আর ওহে ইহুদীরা! তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা কখনো অনবহিত নন।

৩. فریق বলতে সেই সব লোক উদ্দেশ্য, যারা মূসা আ.এর সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কালাম শোনার জন্য তূর পাহাড়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে ওরা এই বিকৃতি সাধন করেছিল যে, বনী ইসরাঈলের নিকট গিয়ে বলল, আল্লাহ তাআলার কালামের শেষ দিকে আমরা বলতে শুনেছি, 'যদি পার, তবে এই আহকাম পালন করো, নতুবা তা না করারও এখতিয়ার তোমাদের আছে।'

আর কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলার কালাম' বলতে এখানে তাওরাত বোঝানো হয়েছে। আর বিকৃতির অর্থ এই যে, ওরা তার আয়াতের মধ্যে শাব্দিক ও অর্থগত বিকৃতি সাধন করত। কখনো আখেরী যমানার নবীর বিবরণ বদলে দিয়েছে, কখনো ব্যভিচারের শাস্তি প্রস্তরাঘাতকে মওকূফ করে দিয়েছে, ইত্যাদি।

৭৬. যখন মুমিনদের সঙ্গে ওদের সাক্ষাৎ হয় তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। আর যখন ওরা একে অন্যের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, 'তোমরা কি তাদের সেসব কথা বলে দাও যা আল্লাহ তোমাদেরই কাছে প্রকাশ করেছেন', যাতে তারা তার দ্বারা তোমাদের সাথে হুজ্জত করতে পারে তোমাদের রবের সামনে? তোমরা কি বোঝ না[১]?'

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭. ওরা কি এও জানে না যে, আল্লাহ জানেন যা কিছু ওরা গোপন করে এবং যা কিছু প্রকাশ করে[২]?

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

৭৮. ওদের মধ্যে কতক হচ্ছে নিরক্ষর, যারা কিছু মিথ্যা আশা ছাড়া কিতাবের কোন জ্ঞান রাখে না। আর ওরা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে[৩]।

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

---

১. ইহুদীদের মধ্যে যারা মুনাফিক ছিল, তারা মুসলমানদের তোষামোদের জন্য তাদের নিকট নিজেদের কিতাব থেকে আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয়সম্পর্কিত কথা বর্ণনা করত। তখন অন্যরা ওদের তিরস্কার করে বলত, 'নিজেদের কিতাবের সনদ তাদের হাতে দাও কেন? তোমরা কি জান না, মুসলমানরা তোমাদের প্রভুর দরবারে তোমাদেরই বর্ণিত কথা দ্বারা তোমাদের এই বলে অভিযুক্ত করবে যে, আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য জেনেও ওরা ঈমান আনেনি। ফলে তোমাদের লা-জওয়াব হতে হবে।'

২. অর্থাৎ ওদের প্রকাশ্য ও গোপন সকল বিষয়ই আল্লাহ তাআলার জানা আছে এবং ওদের কিতাবের সব বিষয়ের খবর তিনি মুসলমানদের দিতে পারেন, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে জানিয়েও দিয়েছেন। যেমন, (ব্যভিচারের শাস্তি) প্রস্তরাঘাতের আয়াতকে ওরা গোপন করেছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তা প্রকাশ করে দিয়ে ওদের অপদস্থ করেছেন।

এই হল ওদের আলেমদের অবস্থা, যারা বুদ্ধিমত্তা ও কিতাবী জ্ঞানের দাবিদার ছিল।

৩. আর যারা জাহেল, তাদের তো তাওরাতে কী লেখা আছে তার কোন খবরই নেই। তবে নিজেদের আলেমদের থেকে শোনা কিছু মিথ্যা আশ্বাসই ওদের সম্বল। যেমন: ইহুদীদের ছাড়া কেউই বেহেশ্তে যাবে না এবং ওদের বাপ-দাদারা ওদের অবশ্যই ক্ষমা করিয়ে নেবে। বলা বাহুল্য, এসব ওদের অবাস্তব ধারণা, অলীক কল্পনামাত্র! ওদের নিকট এর কোন প্রমাণ নেই।

৭৯. অতএব দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে, অতঃপর বলে দেয়, 'এ আল্লাহর পক্ষ থেকে'– যাতে তার বিনিময়ে সামান্য মূল্য লাভ করতে পারে। সুতরাং ওদের জন্য দুর্ভোগ স্বীয় হাতের এ লেখার কারণে এবং ওদের জন্য দুর্ভোগ নিজেদের এই উপার্জনের কারণে[১]।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ۚ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ۝

৮০. আর ওরা বলে, 'আমাদের কখনই আগুন স্পর্শ করবে না, তবে গণা কয়েক দিন।[২]' আপনি বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহর নিকট থেকে কোন অঙ্গীকার নিয়েছ, ফলে আল্লাহ কখনো তাঁর অঙ্গীকারের খেলাফ করবেন না, নাকি তোমরা আল্লাহর উপর এমন কথা আরোপ করছ যা তোমরা জান না?'

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ۚ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৮১. কেন নয়[৩]! যারা গোনাহ করেছে এবং তাদের গোনাহ তাদের বেষ্টন করে নিয়েছে[৪],

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ

---

১. এরা হল সেই সব লোক, যারা উপরোক্ত সাধারণ মূর্খদের অনুকূলে নিজেদের পক্ষ থেকে কথাবার্তা বানিয়ে লিখে দিত এবং আল্লাহ তাআলার কালাম বলে প্রকাশ করত। যেমন, তাওরাতে লেখা ছিল, 'আখেরী যমানার পয়গম্বর সুন্দর কোকড়ানো চুল, কালো চোখ, মধ্যমাকৃতি ও গৌরবর্ণবিশিষ্ট হবেন।' ওরা একে বিকৃত করে লিখল, 'দীর্ঘাকৃতি, নীল চোখ, সোজা চুল'; যাতে সাধারণ লোকেরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকৃত রাসূল হিসাবে চিনতে না পারে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে এবং ওদের পার্থিব হীন স্বার্থে আঘাত না আসে।

২. (ওদের) কেউ বলেছে, সাত দিন; কেউ বলেছে, চল্লিশ দিন (অর্থাৎ যে কয়েকদিন বাছুর পূজা করেছিল)। আর কারো মতে চল্লিশ বছর (অর্থাৎ যে কয় বছর তীহ প্রান্তরে পেরেশান অবস্থায় কাটিয়েছিল)। আর কেউ বলেছে, প্রত্যেকে পৃথিবীতে যতদিন বেঁচেছিল ততদিন।

৩. অর্থাৎ ইহুদীরা চিরকাল দোযখে থাকবে না— এ কথা মিথ্যা। কারণ, চিরকাল দোযখে বা বেহেশতে থাকার যে মৌলিক নীতি সামনে বর্ণিত হয়েছে, সে অনুযায়ীই সকলের পরিণতি হবে। ইহুদীরা এই নীতির বহির্ভূত হতে পারে না।

৪. গোনাহ কাউকে বেষ্টন করে নেওয়ার অর্থ হল ওর মধ্যে গোনাহর প্রাবল্য এমনই যে, ওর কোন দিকই গোনাহর প্রাবল্য থেকে খালি নয়। কাজেই অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস থাকলে এ কথা বলা যাবে না যে, গোনাহ তাকে বেষ্টন করে নিয়েছে। অতএব শুধু কাফেরের উপরই এই কথা প্রযোজ্য হতে পারে।

খَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۝٨١

তারা দোযখের অধিবাসী, ওরা তাতে চিরকাল থাকবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۝٨٢

৮২. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারা জান্নাতের অধিবাসী, তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

[রুকূ - ১০]

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ۝٨٣

৮৩. (স্মরণ কর), যখন আমি বনী ইসরাঈল থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না। আর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও অভাবীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে, (সকল) মানুষকে সুন্দর কথা বলবে এবং নামায কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে। অতঃপর তোমরা– তোমাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ছাড়া– (সে অঙ্গীকার থেকে) ফিরে গেলে। আর তোমরা তো মুখ ফিরিয়ে নিতেই অভ্যস্ত[১]।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ۝٨٤

৮৪. এবং (স্মরণ কর), যখন আমি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরে রক্তপাত করবে না এবং আপন লোকদের তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করবে না[২]। অতঃপর তোমরা স্বীকার করে নিয়েছিলে; আর (এ বিষয়ে) তোমরা নিজেরাই সাক্ষী।

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ

৮৫. অতঃপর তোমরাই এমন লোক যে, তোমরা পরস্পরকে হত্যা করছ এবং তোমাদেরই এক

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকাম থেকে ফিরে যাওয়া তোমাদের অভ্যাস, বরং এটা তোমাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে।

২. অর্থাৎ স্বজাতিকে হত্যাও করবে না এবং তাদের দেশান্তরিতও করবে না।

وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاِنْ يَّأْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۸۵﴾

দলকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করছ। তোমরা তাদের উপর চড়াও হচ্ছ পাপ ও জুলুম করে[১]। আর যদি তারাই বন্দীরূপে তোমাদের নিকট আসে, তবে মুক্তিপণ দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে নাও, অথচ তাদের উচ্ছেদ করাও তোমাদের জন্য হারাম। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ মান এবং কিছু অংশ অমান্য কর[২]? অতএব তোমাদের মধ্যে যে এ কাজ করে, ওর একমাত্র শাস্তি দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিনে এমন লোকদের নিয়ে যাওয়া হবে কঠিনতর আযাবের দিকে। আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম-কাণ্ড সম্বন্ধে বেখবর নন[৩]।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۫ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ

৮৬. ওরাই তারা, যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন ক্রয় করেছে। অতএব ওদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং ওদের

---

১. মদীনায় ইহুদীদের দুইটি গোত্র ছিল– বনী কুরায়জা ও বনী নযীর। এরা পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহ করত। অপর দিকে মুশরিকদেরও সেখানে দুটি দল ছিল– 'আওস' ও 'খাযরাজ'। এরাও পরস্পর শত্রু ছিল। বনী কুরায়জা মিত্রতা করেছিল আওসের সাথে, আর বনী নযীর ভ্রাতৃত্ব করেছিল খাযরাজ এর সাথে। যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রত্যেকেই স্ব স্ব মিত্রপক্ষকে সহায়তা করত, একের উপর অন্যের বিজয় হলে দুর্বলদের দেশান্তরিত করত এবং ওদের ঘর-বাড়ী ধসিয়ে দিত। আর কেউ কয়েদীরূপে ধৃত হয়ে আসলে সকলে মিলে টাকা-পয়সা সংগ্রহ করে মুক্তিপন দিয়ে ওকে ছাড়িয়ে নিত। যেমন, পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

২. অর্থাৎ স্বজাতি অন্যের হাতে ধৃত হলে ওদের মুক্ত করতে সচেষ্ট বটে, কিন্তু স্বয়ং নিজেরা ওদের অত্যাচার করতে ও ওদের গলা কাটতে পর্যন্ত প্রস্তুত। যদি আল্লাহর বিধান মত চল, তবে উভয় ক্ষেত্রে তাঁর বিধান মেনে চল।

৩. 'এ কাজ করে' অর্থাৎ (কিতাবে বর্ণিত) আহকামের কিছু মানে, কিছু অস্বীকার করে।

বস্তুত ঈমান হচ্ছে অবিভাজ্য, তাতে বিভাজন (বা বিভক্তকরণ) সম্ভব নয়। অতএব কতক হুকুমের অস্বীকারকারীও সম্পূর্ণ কাফেরই হবে, কতক হুকুমে ঈমান আনলেও ঈমানের কিছু মিলবে না। এ আয়াত দ্বারা পরিষ্কার বোঝা গেল, যদি কোন মানুষ শরী'য়তের কোন কোন হুকুমের অনুসরণ করে, কিন্তু কোন হুকুম স্বভাব বা স্বার্থের পরিপন্থী বলে তা গ্রহণ না করে, তবে এই কতক হুকুমের অনুসরণ তার কোনই উপকারে আসবে না।

وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

সাহায্যও করা হবে না[১]।

[রুকূ - ১১]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ

৮৭. নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তাঁর পরে রাসূলদের পাঠাতে থেকেছি। আর ঈসা ইবনে মারয়ামকে সুস্পষ্ট মু'জেযাসমূহ দিয়েছি এবং তাঁকে শক্তিশালী করেছি পবিত্র রূহের দ্বারা[২]। কিন্তু যখনই তোমাদের নিকট কোন রাসূল এমন বিধান নিয়ে এসেছেন, যা তোমাদের মনঃপুত হয়নি, তখনই তোমরা অহংকার করলে। ফলে এক দলকে অস্বীকার করেছ[৩] এবং এক দলকে হত্যা করে ফেলেছ[৪]।

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ

৮৮. ওরা বলে, 'আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত'। (তা নয়,) বরং আল্লাহ ওদের কুফরের কারণে ওদের লা'নত করেছেন। সুতরাং ওরা অল্প ঈমানই আনে[৫]।

---

১. অর্থাৎ আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার স্বার্থ গ্রহণ করেছে। কেননা, মানুষের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছে, দুনিয়ার স্বার্থ-চিন্তায় তা রক্ষা করেছে, আর আল্লাহ তাআলার যে হুকুম-আহকাম রয়েছে সেগুলির পরোয়া করে নাই। অতএব এমনতর লোকদের সুপারিশ বা সাহায্য কে করতে পারে?

২. মৃতদের জীবিত করা, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগগ্রস্তদের আরোগ্য করা, গায়বের খবর বলে দেওয়া– এ সব হযরত ঈসা আ.-এর সুস্পষ্ট মুজেযা। আর 'রূহুল কুদুস' বলা হয় হযরত জিবরাঈল আ.-কে, যিনি সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকতেন। অথবা যে ইসমে আজমের বরকতে মৃতদের জীবিত করতেন, (তাকে রূহুল কুদুস বলা হয়েছে)।

৩. যেমন, হযরত ঈসা আ. ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করেছে।

৪. যেমন, হযরত যাকারিয়া আ. ও হযরত ইয়াহ্ইয়া আ.-কে কতল করেছিল।

৫. ইহুদীরা আত্মপ্রশংসায় বলত, 'আমাদের অন্তর আবরণের ভিতরে সংরক্ষিত, আমাদের দীন ছাড়া অন্য কারো কথা আমাদের প্রভাবিত করে না। আমরা কারো তোষামোদ, বাগ্মিতা, চমৎকারিত্ব বা প্রতারণার কারণে কখনো তার অনুসরণ করতে পারি না।'

৮৯. যখন ওদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিতাব আসল, যা ওদের নিকট যে কিতাব রয়েছে তার সত্যায়নকারী, আর ওরা পূর্ব থেকেই (তার ওসীলায়) কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত; মোটকথা, যখন ওদের নিকট সেই বস্তু আসল যাকে ওরা চিনেছিল— তখন তা অস্বীকার করে বসল। অতএব আল্লাহর লা'নত (এমন) অস্বীকারকারীদের উপর[১]।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝٨٩

৯০. কত নিকৃষ্ট সে বস্তু, যার বিনিময়ে ওরা নিজেদের বিক্রয় করেছে; (তা এই) যে, ওরা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অস্বীকার করেছে- এই জিদের কারণে যে, কেন আল্লাহ নিজ বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ অবতীর্ণ করেন[২]। ফলে ওরা ক্রোধের উপর ক্রোধ নিয়ে ফিরল[৩]। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি[৪]।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝٩٠

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ওরা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যাবাদী, বরং ওদের কুফরীর কারণে আল্লাহ ওদের অভিশপ্ত করেছেন এবং স্বীয় রহমত থেকে দূর করে দিয়েছেন। এ জন্য ওরা কোন মতেই সত্য দীন মানে না এবং খুব কম লোকই ঈমানের দৌলত লাভে ধন্য হয়।'

১. ওদের নিকট যে কিতাব এসেছে, তা কুরআন। আর পূর্ব থেকে যে কিতাব ওদের নিকট ছিল, তা তাওরাত। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইহুদীরা যখন কাফেরদের দ্বারা পরাজিত হত, তখন খোদা তাআলার নিকট এই বলে দোয়া করত, 'আখেরী যমানার নবী এবং তাঁর প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ হবে– উভয়ের ওসীলায় কাফেরদের উপর আমাদের বিজয় দান করুন।' কিন্তু যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হলেন এবং (তাঁর নবুওয়াতের) সকল নিদর্শনও ওরা দেখে নিল, তখন ওরা অস্বীকারকারী হয়ে অভিশপ্ত হল।

২. অর্থাৎ যে জিনিসের বিনিময়ে ওরা নিজেদের বিক্রয় করেছে, তা হচ্ছে কুরআনের প্রতি কুফরী ও অস্বীকৃতি। আর অস্বীকৃতিও নিছক জিদ ও হিংসার কারণে।

৩. এক গযব (বা ক্রোধের কারণ) তো এই যে, ওরা কুরআন কারীম, বরং সেই সাথে নিজেদের কিতাবেরও অস্বীকারকারী হয়ে কাফের হল। দ্বিতীয় (গযবের কারণ) এই যে, ওরা শুধু হিংসা ও জিদের বশবর্তী হয়ে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্য হয়েছে এবং তাঁর বিরোধিতা করেছে।

৪. এ থেকে বোঝা যায়, প্রত্যেক শাস্তি অপমানের উদ্দেশ্যে হয় না, বরং মুসলমানদেরকে গোনাহর জন্য যে শাস্তি দেওয়া হবে, তা হবে গোনাহ থেকে তাদের পাক-সাফ করার জন্য,

৯১. যখন ওদের বলা হয়, 'আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি ঈমান আন', তখন ওরা বলে, 'আমরা আমাদের প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান রাখি[১]।' আর তা ছাড়া যা রয়েছে তা ওরা অস্বীকার করে, অথচ তা (সম্পূর্ণ) সত্য, তাদের নিকট যে কিতাব আছে তার সমর্থনকারী। আপনি বলুন, 'যদি তোমরা ঈমানদার ছিলে, তবে কেন ইতিপূর্বে আল্লাহর নবীগণকে হত্যা করেছ[২]?'

وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ اٰمِنُوۡا بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ قَالُوۡا نُؤۡمِنُ بِمَاۤ اُنۡزِلَ عَلَيۡنَا وَيَكۡفُرُوۡنَ بِمَا وَرَآءَهٗ وَهُوَ الۡحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمۡ قُلۡ فَلِمَ تَقۡتُلُوۡنَ اَنۡۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنۡ قَبۡلُ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿۹۱﴾

৯২. আর মূসা আ. তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট মু'জেযাসমূহ নিয়ে এসেছিলেন। তবুও তোমরা তাঁর (প্রস্থানের) পর বাছুর বানিয়ে নিলে। বস্তুত তোমরা হচ্ছ জালেম[৩]।

وَلَقَدۡ جَآءَكُمۡ مُّوۡسٰى بِالۡبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذۡتُمُ الۡعِجۡلَ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ وَاَنۡتُمۡ ظٰلِمُوۡنَ ﴿۹۲﴾

তাদের অপমানিত করার জন্য নয়। আর কাফেরদের যে শাস্তি দেওয়া হবে তা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার উদ্দেশ্যে।

১. 'আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন'—অর্থাৎ ইনজীল ও কুরআন। আর 'আমাদের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে', অর্থাৎ তাওরাত। ফল কথা এই যে, তাওরাত ছাড়া আর সব কিতাব ওরা পরিষ্কার অস্বীকার করে এবং ইনজীল ও কুরআনকে অমান্য করে। অথচ এসব কিতাবও সত্য ও তাওরাতের সমর্থনকারী।

২. ওদের জিজ্ঞাসা করুন, যদি তোমরা তাওরাতে ঈমান রেখে থাক, তবে নবীদের কতল করলে কেন? অথচ তাওরাতের মধ্যে এই নির্দেশ রয়েছে– 'যে নবী এসে তাওরাতকে সত্য বলবেন, তোমরা তাঁর সাহায্য করবে এবং তাঁর উপর অবশ্যই ঈমান আনবে।'

আর ওরা সেই নবীদের কতল করেছে, যাঁরা পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছেন। (এ কথা قَبۡل শব্দ দ্বারা বোঝা গেল।) যেমন, হযরত যাকারিয়া আ. ও হযরত ইয়াহয়া আ., যাঁরা তাওরাতের আহকাম অনুযায়ী আমল করতেন এবং তারই প্রচার-প্রসারের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। আর তাঁরা যে তাওরাতের সমর্থনকারী ছিলেন, এতে কোন বেকুবেরও সংশয় থাকতে পারে না।

৩. অর্থাৎ যে মূসা আ.এর শরী'য়তের তোমরা অনুসারী এবং যাঁর শরী'য়তের কারণে অপরাপর সত্য শরী'য়তকে অস্বীকার করছ, স্বয়ং তিনিই তোমাদের সুস্পষ্ট মুজেযাসমূহ দেখিয়েছিলেন, যথা: লাঠি, শুভ্র হস্ত, সমুদ্র বিদীর্ণকরণ ইত্যাদি। এ সত্ত্বেও যখন তিনি মাত্র কয়েক দিনের জন্য তূর পাহাড়ে গমন করলেন, এতটুকু সময়ের মধ্যেই তোমরা বাছুরকে মাবূদ বানিয়ে

৯৩. (স্মরণ কর), যখন আমি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তোমাদের উপর 'তূর' পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম—(এবং বলেছিলাম)– 'আমি তোমাদের যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধর ও শোন।' তারা বলল, 'আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম।' আর ওদের হৃদয়ে ওদেরই কুফরীর কারণে বাছুর–(প্রীতি) প্রবিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল[১]। আপনি বলুন, 'তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে তো তোমাদের ঈমান তোমাদের অতি নিকৃষ্ট বিষয়াদি শিক্ষা দেয়!'

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ۭ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ۭ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۤ وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۭ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٩٣

৯৪. আপনি বলে দিন, 'যদি আখেরাতের ঘর আল্লাহর নিকট অন্যান্য মানুষ ছাড়া এককভাবে তোমাদেরই জন্য হয়ে থাকে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর– যদি তোমরা সত্যবাদী হও[২]।'

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٩٤

নিলে, অথচ মূসা আ. জীবিত ও স্বীয় নবুওয়াতের পদমর্যাদায় বহাল ছিলেন। তো তখন মূসা আ. ও তাঁর শরী'য়তের উপর তোমাদের ঈমান কোথায় গিয়েছিল? আর আখেরী যমানার নবীর প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষের বশীভূত হয়ে আজ তোমরা মূসা আ.-এর শরী'য়তকে এমনভাবে ধরে আছ যে, আল্লাহর হুকুমও শুনছ না। নিঃসন্দেহে তোমরা (অতি বড়) জালেম, তোমাদের বাপ-দাদারাও জালেম।

বনী ইসরাঈলের এ অবস্থা তো ছিল হযরত মূসা আ. এর সঙ্গে। বাকী তাওরাত সম্পর্কে ওদের ঈমানের অবস্থা কী ছিল, তা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

১. خذوا.. —অর্থাৎ তাওরাতের যেসব নির্দেশ তোমাদের উপর আরোপ করা হল, তা হিম্মত ও দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধর। যেহেতু মাথার উপর পাহাড় পতনোন্মুখ ছিল, সেহেতু প্রাণের ভয়ে মুখে (অথবা তখনকার মত) سَمِعْنَا বলে ফেলল অর্থাৎ 'তাওরাতের আহকাম আমরা শুনলাম'; আর মনে মনে (বা পরে) বলল- 'عَصَيْنَا' অর্থাৎ আমরা তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলাম।' আর এর কারণ এই ছিল যে, মূর্তি-পূজার আসক্তি ওদের অন্তরের মধ্যে পোক্ত হয়ে গিয়েছিল কুফরীর কারণে। সেই মরিচা ওদের অন্তর থেকে দূরীভূত হয়নি, বরং পর্যায়ক্রমে ঘনীভূত হয়েছিল।

২. ইহুদীরা বলত, 'বেহেশতে আমরা ছাড়া আর কেউ যাবে না এবং আমাদের শাস্তি হবে না।' আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যদি তোমরা সত্যিই বেহেশতী হয়ে থাক, তবে মরতে ভয় পাও কেন?'

৯৫. ওরা কখনো কিছুতেই মৃত্যু কামনা করবে না, সেসব পাপের কারণে, যা ওরা নিজ হাতে অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর আল্লাহ পাপীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

৯৬. আর আপনি জীবনের প্রতি ওদেরকে সকল মানুষ থেকে বেশি লোভী পাবেন, এমনকি মুশরিকদের থেকেও বেশি[১]। ওদের এক একজন কামনা করে, যদি ওকে হাজার বছরের আয়ু দেওয়া হত! অথচ এ দীর্ঘায়ু ওকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আর আল্লাহ ভাল করেই দেখেন ওরা যা কিছু করে।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝

[রুকূ - ১২]

৯৭. আপনি বলে দিন, 'যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু (সে নিজ আক্রোশ নিয়েই মরুক), কেননা তিনি তো এই বাণী আল্লাহর হুকুমে আপনার অন্তরে অবতীর্ণ করেছেন, যা এর পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়নকারী এবং যা পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদ মুমিনদের জন্য।'

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৯৮. যে কেউ আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু, তো আল্লাহ (এমন) কাফেরদের শত্রু[২]।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰىلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝

১. অর্থাৎ ইহুদীরা এমন মন্দ কাজ-কর্ম করেছে, যদ্দরুণ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে থাকতে খুব সচেষ্ট থাকে এবং ওদের সদাসর্বদার ভয় এই যে, মরলে আর রক্ষা নেই। এমনকি বেঁচে থাকার প্রতি মুশরিকদের চেয়েও বেশি লোভী ওরা। এতে ওদের দাবিসমূহের অসারতা উত্তমরূপে প্রমাণিত হয়ে যায়।

২. ইহুদীরা বলত, 'এই নবীর নিকট ওহী নিয়ে আসেন জিবরাঈল ফেরেশতা। তিনি তো আমাদের শত্রু। তাঁর দ্বারা আমাদের পূর্ববর্তী মুরুব্বীদের অনেক কষ্ট হয়েছে। জিবরাঈলের বদলে অন্য ফেরেশতা ওহী আনলে আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনব।'

৯৯. নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। আর তা কেবল নাফরমানরা ছাড়া কেউই অস্বীকার করবে না।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿٩٩﴾

১০০. যখনই ওরা কোন অঙ্গীকার করল, তখন ওদেরই এক দল কি তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি?! বরং ওদের অধিকাংশ ঈমানই রাখে না[১]।

اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১. আর যখন ওদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল আসলেন, যিনি ওদের নিকট যে কিতাব আছে তার সত্যায়নকারী, তখন কিতাবীদের এক দল আল্লাহর কিতাবকে নিজেদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল, যেন ওরা জানেই না[২]।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০২. আর ওরা সেই বস্তুর (যাদু-বিদ্যার) অনুসরণ করল, যা শয়তানেরা চর্চা করত সুলায়মান আ.এর রাজত্বকালে[৩]—আর সুলায়মান কুফরী

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ

এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, ফেরেশতারা যা কিছু করেন, আল্লাহর হুকুমেই করেন, নিজ পক্ষ থেকে কিছুই করেন না। যারা তাঁদের শত্রু, আল্লাহ নিঃসন্দেহে ওদের শত্রু।

১. অর্থাৎ ওদের চিরন্তন অভ্যাস এই যে, যখন ওরা আল্লাহ, রাসূল বা কোন ব্যক্তির সঙ্গে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তখন ওদেরই একটি দল ঐ অঙ্গীকারকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে দেয় এবং অনেক ইহুদী এমনো রয়েছে, যারা তাওরাতে ঈমানই রাখে না! এমন লোকদের আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে কিসের ভয়!

২. رسول দ্বারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য এবং مامعهم (তাদের নিকট যে কিতাব) বলতে তাওরাত এবং كتاب الله (আল্লাহর কিতাব) বলতেও তাওরাত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনলেন এবং তিনি তাওরাত ও অপরাপর আসমানী কিতাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলেন, তখনও ইহুদীদের একটি দল স্বয়ং তাওরাতকে এমনভাবে পশ্চাতে ফেলে দিল, যেন ওরা জানেই না যে, এ কোন্ কিতাব এবং এতে কী কী হুকুম রয়েছে। অতএব নিজেদের কিতাবেই যখন ঈমান নেই, তখন ওদের থেকে ভবিষ্যতে কী আর আশা করা যায়?

৩. অর্থাৎ এই আহমকেরা আল্লাহ তাআলার কিতাবকে তো পশ্চাতে ফেলল, আর শয়তানদের কাছে যাদু-বিদ্যা শিখে তার অনুসরণ করতে লাগল।

الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۭ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۭ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۭ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۭ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۫ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۭ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

করেননি বরং শয়তানেরা কুফরী করেছিল যে, ওরা লোকদের যাদু শিক্ষা দিত—এবং (অনুসরণ করল) সেই বস্তুর (যাদু-বিদ্যার), যা বাবেল শহরে দুজন ফেরেশতার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাদের নাম হারূত ও মারূত। আর ফেরশতাদ্বয় কাউকে (যাদু) শেখাতেন না যে পর্যন্ত না বলে দিতেন যে, 'আমরা তো হচ্ছি পরীক্ষার জন্য, সুতরাং তুমি কাফের হয়ো না।' তারপরও ওরা তাঁদের নিকট এমন যাদু শিখত, যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। আর ওরা তার দ্বারা আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো ক্ষতি করতে পারত না। ওরা এমন জিনিস শিখত যা ওদের ক্ষতি করত, ওদের উপকার করত না। আর ওরা নিশ্চিতরূপে জানত, যে ব্যক্তি যাদু অবলম্বন করল, তার জন্য পরকালে কোনই অংশ নেই। নিশ্চয় অতি নিকৃষ্ট সেই জিনিস, যার বিনিময়ে ওরা নিজেদের বিক্রয় করেছিল। হায় যদি ওরা বুঝত!

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۭ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

১০৩. আর যদি ওরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে তো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্তব্য প্রতিদান অনেক উত্তম। হায় যদি ওরা বুঝত[১]!

---

১. সারকথা এই যে, ইহুদীরা স্বীয় ধর্ম ও ধর্ম-গ্রন্থের ইলম পরিত্যাগ করে যাদু-বিদ্যার অনুসরণ করল।

আর যাদু মানুষের মধ্যে দুই দিক দিয়ে বিস্তার লাভ করেছিল। এক. হযরত সুলায়মান আ.-এর আমলে যেহেতু মানুষ ও জিন মিলেমিশে থাকত, সুতরাং লোকেরা শয়তানদের নিকট থেকে যাদু শিখল এবং একে হযরত সুলায়মান আ.-এর সঙ্গে সম্পর্কিত করে বলল, (যাদু) আমরা তাঁরই কাছ থেকে পেয়েছি এবং এরই বলে তিনি মানুষ ও জিন জাতির উপর রাজত্ব করতেন। উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন, 'যাদু হচ্ছে কুফরী কাজ, সুলায়মান আ.-এর কাজ নয়।'

দুই. এই যাদু হারূত ও মারূতের পক্ষ থেকে বিস্তার লাভ করেছিল। এই দুই ফেরেশতা 'বাবেল' শহরে মানুষবেশে বাস করতেন। তাঁদের যাদু-বিদ্যা জানা ছিল। কেউ তাঁদের

[রুকূ - ১৩]

১০৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা رَاعِنَا বলো না বরং اُنْظُرْنَا বল এবং শুনতে থাক। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি[১]।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۰۴﴾

১০৫. কাফেররা— চাই কিতাবীদের অন্তর্ভুক্ত হোক বা মুশরিকদের— এটা পছন্দ করে না যে, তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। তবে আল্লাহ যাকে চান স্বীয় রহমতের জন্য মনোনীত করে নেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল[২]।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۰۵﴾

কাছে শিখতে গেলে তাঁরা প্রথমেই এই বলে বারণ করতেন যে, এতে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও বিরত না হলে তাকে শিখাতেন। আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য ছিল ফেরেশতাদ্বয়ের মাধ্যমে মানুষের পরীক্ষা করা। সুতরাং আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এসব বিদ্যা দ্বারা আখেরাতের ক্ষতি ছাড়া কোনই লাভ নেই এবং এতে দুনিয়ারও ক্ষতি। তবে তা আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই করতে পারে না। যাদুর পরিবর্তে ওরা যদি ধর্ম-বিদ্যা ও ধর্মগ্রন্থের বিদ্যা শিখত, তবে আল্লাহর নিকট ছওয়াব পেত।'

১. ইহুদীরা এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসত এবং তাঁর কথা শুনত। কোন কথা ভালভাবে না শুনলে বুঝতে চেয়ে বলত, راعنا অর্থাৎ আমাদের প্রতি মনোযোগী হোন এবং আমাদের বিবেচনা করুন। তাদের নিকট শুনে মুসলমানরাও কোন সময় উক্ত শব্দ বলে বসত। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের নিষেধ করে বললেন, 'তোমরা এই শব্দ ব্যবহার করো না। যদি বলতে হয়, তবে انظرنا বল (এর অর্থও তাই) এবং প্রথম থেকেই মনোযোগের সাথে শুনতে থাক, যাতে পুনরায় জিজ্ঞাসাই করতে না হয়।'

ইহুদীরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বসে অসদুদ্দেশ্যে এই শব্দটি ব্যবহার করত। ওরা শব্দটি মুখ চেপে উচ্চারণ করত। তাতে راعينا হয়ে যেত (যার অর্থ 'আমাদের রাখাল')। আর ইহুদীদের ভাষায় راعنا আহমককেও বলে।

২. অর্থাৎ কাফেররা– চাই ইহুদী হোক বা মক্কার মুশরিক হোক– তোমাদের উপর কুরআন নাযিল হোক তা কখনই পছন্দ করে না। বরং ইহুদীদের কামনা, শেষ যমানার নবী বনী ইসরাঈলের ভিতর থেকে পয়দা হোন। আর মক্কার মুশরিকরা চাইত, ওদের কওমের মধ্যে হোন। কিন্তু এ তো আল্লাহ তাআলার দয়ার বিষয় যে, তিনি উম্মী (তথা নিরক্ষর) লোকদের মধ্যে আখেরী যমানার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পয়দা করেছেন।

১০৬. আমি যে আয়াতই রহিত করি বা ভুলিয়ে দেই, তার চেয়ে উত্তম বা তার সমতুল্য অন্য আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সকল বিষয়ে শক্তিমান[1]?

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۰۶﴾

১০৭. তুমি কি জান না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই? এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো বন্ধু নেই এবং সাহায্যকারীও নেই[2]।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۰۷﴾

১০৮. তোমরা (মুসলমানরাও) কি তোমাদের রাসূলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও, যেরূপ মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ইতিপূর্বে? আর যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ করবে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে[3]।

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰی مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿۱۰۸﴾

১০৯. কিতাবীদের অনেকে মনে-প্রাণে চায় যে, তোমরা ঈমান আনার পরও তারা তোমাদের

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚۖ حَسَدًا مِّنْ

১. মুসলমানদের প্রতি ইহুদীদের এ অভিযোগও ছিল যে, তোমাদের কিতাবে কোন কোন আয়াত মনসূখ বা রহিত হয়ে থাকে। যদি এ কিতাব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হত, তবে যে ত্রুটির কারণে এখন মনসূখ হল, তা কি আল্লাহ তা'আলার প্রথম থেকে জানা ছিল না? আল্লাহ তাআলা বলেন, আগের বিষয়েও ত্রুটি ছিল না, পরের বিষয়েও নেই, কিন্তু বাদশাহ সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী যা ইচ্ছা আদেশ করতে পারেন। তখনকার জন্য প্রথম বিধান সংগত ছিল, এখনকার জন্য দ্বিতীয় বিধান সংগত।

২. অর্থাৎ একদিকে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও পরাক্রম সব কিছু বেষ্টন করে রয়েছে, অন্যদিকে নিজ বান্দাদের উপর তাঁর পরম অনুগ্রহ। এ অবস্থায় বান্দাদের মঙ্গলামঙ্গল ও লাভালাভ কীসে, তার জ্ঞান তিনি ছাড়া আর কার থাকতে পারে এবং এসবের ক্ষমতা আর কার হতে পারে? এবং বান্দাদের হিতাকাঙ্ক্ষা তাঁর ন্যায় আর কে করতে পারে?

৩. অর্থাৎ ইহুদীদের কথায় কিছুতেই বিশ্বাস করতে নেই। ইহুদীরা সন্দেহ সৃষ্টি করলে যে কেউ এই সন্দেহে পতিত হবে, সে কাফের হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে খুবই সতর্ক থেকো। আর ইহুদীদের কথায় তোমরা নিজেদের নবীর নিকট সন্দেহ উত্থাপন করো না, যেরূপ ওরা নিজেদের নবীর নিকট করত।

عِنۡدِ اَنۡفُسِهِمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمُ الۡحَقُّ ۚ فَاعۡفُوۡا وَاصۡفَحُوۡا حَتّٰی یَاۡتِیَ اللّٰهُ بِاَمۡرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ ﴿۱۰۹﴾

পুনরায় কাফের বানিয়ে ফেলবে– (ওরা এটা চায়) ওদের অন্তরের হিংসার কারণে, ওদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও[১]। অতএব তোমরা ক্ষমা ও উপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাঁর আদেশ পাঠান[২]। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে শক্তিমান[৩]।

وَاَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتُوا الزَّكٰوۃَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوۡا لِاَنۡفُسِكُمۡ مِّنۡ خَیۡرٍ تَجِدُوۡهُ عِنۡدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِیۡرٌ ﴿۱۱۰﴾

১১০. এবং নামায কায়েম কর ও যাকাত দিতে থাক। আর নিজেদের জন্য যা কিছু সৎকর্ম অগ্রিম পাঠাবে, আল্লাহর নিকট তা পাবে। নিশ্চয় আল্লাহ ভাল করেই দেখেন তোমরা যা কিছু কর[৪]।

وَقَالُوۡا لَنۡ یَّدۡخُلَ الۡجَنَّۃَ اِلَّا مَنۡ كَانَ هُوۡدًا اَوۡ نَصٰرٰی ؕ تِلۡكَ اَمَانِیُّهُمۡ ؕ قُلۡ هَاتُوۡا بُرۡهَانَكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ ﴿۱۱۱﴾

১১১. ওরা বলে, 'ইহুদী বা খ্রিস্টান ছাড়া অন্য কেউ মোটেই জান্নাতে প্রবেশ করবে না[৫]।' এগুলো ওদের (মনগড়া) আকাঙ্ক্ষামাত্র। আপনি বলে দিন, 'তোমরা নিজেদের প্রমাণ নিয়ে আস যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

---

১. অর্থাৎ বহু ইহুদীর আকাঙ্ক্ষা এই যে, তোমাদের হে মুসলমানগণ! কোন রকমে পুনরায় কাফের বানিয়ে দেবে। অথচ ওদের নিকট এই সত্য প্রকাশিত হয়ে গেছে যে, মুসলমানদের ধর্ম, তাদের ধর্মগ্রন্থ ও তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম— সবই সত্য।

২. অর্থাৎ আমার হুকুম না আসা পর্যন্ত ইহুদীদের কথায় ধৈর্যধারণ কর। পরিশেষে হুকুম এল যে, ইহুদীদের মদীনার আশপাশ থেকে বের করে দাও।

৩. অর্থাৎ নিজেদের দুর্বলতাহেতু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ো না। আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরতে তোমাদেরকে শক্তিশালী ও ইহুদীদের অপদস্থ করবেন। অথবা অর্থ এই যে, হুকুম পাঠাতে দেরি করার কারণ তাঁর অক্ষমতা নয়।

৪. অর্থাৎ ওদের কষ্ট প্রদানে ধৈর্য ধর এবং ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাক। আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের আমল সম্পর্কে কখনো গাফেল নন, তোমাদের কোন নেক কাজই নষ্ট হতে পারে না।

৫. অর্থাৎ ইহুদীরা তো বলে, 'আমরা ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না।' তদ্রূপ নাসারারা বলে, 'আমরা ছাড়া কেউ বেহেশতে যাবে না।'

১১২. কেন নয়? যে কেউ স্বীয় সত্তাকে আল্লাহর অনুগত করে দিয়েছে আর সে সৎকর্মশীল, তার জন্য রয়েছে স্বীয় রবের কাছে তার প্রতিদান। আর এমন লোকদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না[১]।

بَلٰی ٭ مَنۡ اَسۡلَمَ وَجۡهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحۡسِنٌ فَلَهٗۤ اَجۡرُهٗ عِنۡدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوۡفٌ عَلَیۡهِمۡ وَلَا هُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ ﴿۱۱۲﴾

[রুকূ - ১৪]

১১৩. ইহুদীরা তো বলে, 'খ্রিস্টানরা কোনো পথের উপর নেই', আর খ্রিস্টানরা বলে, 'ইহুদীরা কোন পথের উপর নেই।' আর* ওরা সকলে কিতাব পড়ে[২]। এমনিভাবে যারা (কিছুই) জানে না, তারাও এদেরই মত কথা বলেছে। সুতরাং আল্লাহ কিয়ামতের দিন ওদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসা করে দেবেন, যাতে ওরা মতবিরোধ করত[৩]।

وَقَالَتِ الۡیَهُوۡدُ لَیۡسَتِ النَّصٰرٰی عَلٰی شَیۡءٍ ۪ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰی لَیۡسَتِ الۡیَهُوۡدُ عَلٰی شَیۡءٍ ۙ وَّهُمۡ یَتۡلُوۡنَ الۡکِتٰبَ ؕ کَذٰلِکَ قَالَ الَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ مِثۡلَ قَوۡلِهِمۡ ۚ فَاللّٰهُ یَحۡکُمُ بَیۡنَهُمۡ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ فِیۡمَا کَانُوۡا فِیۡهِ یَخۡتَلِفُوۡنَ ﴿۱۱۳﴾

---

১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আহকাম মেনে নিয়েছে এবং তাঁর আনুগত্য করেছে, সেই আহকাম যে কোন নবীর মারফত জানা হোক, এবং ইহুদীদের ন্যায় গোঁড়ামি করেনি এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উপর জিদ ধরে থাকেনি— এমন লোকদের জন্য নেক কাজের পুরস্কার রয়েছে। আর তাদের মধ্যে এমন কোন বিষয় নেই, যার কারণে তারা ভীত হবে এবং তারা কোন বিষয়েই দুঃখিত হবে না।

★ দ্বিতীয় তরজমা– 'অথচ'

২. অর্থাৎ, ইহুদীরা তাওরাত পড়ে বুঝে নিয়েছে যে, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা আ.কে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলার কারণে নিশ্চয় কাফের হয়ে গিয়েছে। আর খ্রিস্টানরা ইনজীলে পরিষ্কার দেখে যে, ইহুদীরা হযরত ঈসা আ.-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করার কারণে কাফের হয়ে গিয়েছে।

৩. "যারা জানে না" এর দ্বারা আরবের মুশরিক ও মূর্তিপূজকরা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টানরা যেমন একে অন্যকে গোমরাহ জানে, তেমনি মূর্তিপূজকরাও নিজেদের ছাড়া সকল সম্প্রদায়কে গোমরাহ ও বে-দীন বলে থাকে। সুতরাং দুনিয়াতে এরা এসব বলে যাক, কিয়ামতের দিন এর মীমাংসা হয়ে যাবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

এস্থলে সন্দেহ হয়, كذلك বলার পর مِثْلَ قَوْلِهِمْ বলার কী প্রয়োজন?

এর উত্তরে কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, مِثْلَ قَوْلِهِمْ হচ্ছে كذلك এর ব্যাখ্যা ও তাকীদ। আর কেউ কেউ বলেন যে, এখানে كذلك ও مِثْلَ قَوْلِهِمْ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য।

১১৪. ওর চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম নিতে বাধা প্রদান করে এবং সেগুলির ধ্বংসসাধনে প্রয়াসী হয়[১]? (অথচ) ওই লোকদের এ অধিকারই নেই যে, ওরা তাতে প্রবেশ করবে ভীত-বিহবল না হয়ে[২]। ওদের জন্য দুনিয়াতে রয়েছে লাঞ্ছনা[৩] এবং ওদের জন্য আখেরাতে রয়েছে মহাশাস্তি।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا ۭ أُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَّدْخُلُوْهَآ إِلَّا خَآئِفِيْنَ ۬ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾

১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাবে, সেখানেই আছে আল্লাহর (সদয়) দৃষ্টি*[৪]। নিশ্চয় আল্লাহ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۭ إِنَّ اللّٰهَ

একটির দ্বারা তো উদ্দেশ্য এই যে, এদের ও ওদের উক্তি পরস্পর সদৃশ। (অর্থাৎ ওরা যেরূপ অন্যকে গোমরাহ বলে, তদ্রূপ এরাও)। আর অপরটির দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, আহলে কিতাব যেমন প্রমাণ ছাড়া নিজেদের প্রবৃত্তি ও শত্রুতাবশে এ দাবি করে থাকে, তেমনি মূর্তিপূজকরাও প্রমাণ ছাড়া শুধু প্রবৃত্তির কারণে অনুরূপ দাবি করে।

১. এ আয়াত হয় খ্রিস্টানদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে তাওরাত পুড়িয়েছিল এবং বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করেছিল। অথবা মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা হুদায়বিয়ায় শুধু গোঁড়ামি ও শত্রুতাবশে মুসলমানদেরকে মসজিদে হারাম তথা (বাইতুল্লাহ শরীফ)-এ আসতে বাধা প্রদান করেছিল। এ ছাড়া যে কেউ যে কোন মসজিদ বিরান বা ধ্বংস করবে, সেও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. অর্থাৎ এই কাফেরদের কর্তব্য ছিল, তারা যেন আল্লাহ তাআলার মসজিদে ভয়, ভক্তি, বিনয় ও আদবের সাথে প্রবেশ করে। এর পরিবর্তে কাফেররা যে মসজিদসমূহের মর্যাদাহানি করেছিল, এ সুস্পষ্ট জুলুম।

অথবা অর্থ এই যে, ওরা সে দেশে রাজত্ব ও মর্যাদাসহ থাকার যোগ্য নয়। ফলে তাই হল। আল্লাহ তাআলা শামদেশ ও মক্কা মুসলমানদের দিয়ে দিলেন।

৩. সে মত ওরা দুনিয়াতে পরাজিত হল, বন্দী হল ও মুসলমানদের প্রজা হল।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'সেখানেই আছেন আল্লাহ'।

৪. এও ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বিতর্কের বিষয় ছিল, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজেদের কেবলাকে শ্রেষ্ঠ বলত। আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন, 'তিনি বিশেষ কোন দিকের নন; বরং তিনি সব স্থান ও দিক থেকে পবিত্র। অবশ্য তাঁর হুকুমে তোমরা যেদিকেই মুখ করবে, তাঁর রহমতের দৃষ্টি সেদিকেই বিরাজিত পাবে– তিনি তোমাদের ইবাদত কবুল করবেন।'

وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ⑮

প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ[১]।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ⑯

১১৬. ওরা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন!' তিনি তো (এ থেকে) পবিত্র। বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব তাঁরই মালিকানাধীন। সবাই তাঁরই অনুগত।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ⑰

১১৭. (তিনি) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং তিনি যখন কোনো বিষয় সম্পাদন (করার ইচ্ছা) করেন, তখন তাকে শুধু বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়[২]।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا

১১৮. যারা (কিছুই) জানে না তারা বলে, 'আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন অথবা আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে না কেন[৩]?' এমনিভাবে ওদের পূর্ববর্তীরাও ওদেরই মতো কথা বলেছিল। ওদের (সবার) অন্তর একই ধরনের। নিশ্চয় আমি নিদর্শনাদি বর্ণনা করে দিয়েছি সেই

কেউ কেউ বলেছেন, সফরে যানবাহনের উপর নফল পড়ার ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল; অথবা সফরে কেবলার বিষয়ে সন্দেহ হয়েছিল বলে তা নাযিল হয়।

১. অর্থাৎ তাঁর রহমত সর্বব্যাপী, এক স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আর তিনি বান্দাদের কল্যাণ, নিয়ত, আমল সব কিছুই উত্তমরূপে জানেন। বান্দাদের জন্য কোন্ জিনিস উপকারী ও কোন্ জিনিস ক্ষতিকর তা তিনি উত্তমরূপে জানেন, সে হিসাবেই তিনি বিধান দান করেন। আর যে তাঁর অনুসরণ করবে, তাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন এবং যে বিরোধিতা করবে তাকে শাস্তি দেবেন।

২. ইহুদীরা হযরত উযাইর আ.-কে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা আ.-কে খোদার পুত্র বলত। আল্লাহ তাআলা বলেন, তাঁর সত্তা এই সকল বিষয় থেকে পবিত্র। বরং সব কিছুই তাঁর সৃষ্ট, অনুগত ও মালিকানাধীন।

৩. অর্থাৎ কিতাবী ও মূর্তিপূজকদের মধ্যে যারা অশিক্ষিত, তারা সকলে বলে, 'আল্লাহ আমাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন না কেন? অথবা কোন নিদর্শন আমাদের নিকট পাঠান না কেন, যাতে আমরা রেসালাতের সত্যতা স্বীকার করে নিতে পারি?'

الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿١١٨﴾

লোকদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে[১]।

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿١١٩﴾

১১৯. নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর জাহান্নামীদের সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না[২]।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٢٠﴾

১২০. ইহুদী ও খ্রিস্টানরা আপনার প্রতি কখনই সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি ওদের ধর্মের অনুসারী হয়ে যান[৩]। আপনি বলে দিন, 'নিশ্চয় আল্লাহর বাতলে দেওয়া পথই সরল পথ[৪]।' আর যদি আপনি ওদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন, সেই জ্ঞানের পরও যা আপনার নিকট এসেছে– তবে আল্লাহর মোকাবেলায় আপনার কোন বন্ধু থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না[৫]।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ

১২১. আমি যাদের কিতাব দিয়েছি, তারা তা যথাযথভাবে পাঠ করে। (আর) তারাই তার

---

১. আল্লাহ তাআলা বলেন, 'পূর্ববর্তী লোকেরা অনুরূপ মূর্খতার কথা বলেছিল, এ কোন নতুন কথা নয়। আর যারা পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপনকারী, তাদের জন্য আমি নবীর সত্যতার নিদর্শন পরিষ্কার বর্ণনা করে দিয়েছি। যারা জিদ ও শত্রুতার বশীভূত হয়ে তা অস্বীকার করে, এ ওদের হঠকারিতামাত্র।'

২. অর্থাৎ আপনার প্রতি অভিযোগ আনা হবে না যে, ওদের মুসলমান করলেন না কেন?

৩. অর্থাৎ সত্যের সাথে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কোন সম্পর্ক নেই, ওরা স্বীয় জিদের বশীভূত হয়ে কথা বলে। সুতরাং ওরা কখনই তোমাদের ধর্ম কবুল করবে না। ধরে নেওয়া যাক, তোমরাই যদি ওদের অনুসারী হয়ে যাও, তবে ওরা খুশি হয়ে যাবে। কিন্তু এ সম্ভব নয়। অতএব ওদের সহযোগিতার আশা করা উচিত নয়।

৪. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে সেই হেদায়েতই নির্ভরযোগ্য, যা সেই যুগের নবী আনয়ন করেন। বলা বাহুল্য, বর্তমান যুগে সেই তরীকা হচ্ছে ইসলাম। ইহুদী ও খ্রিস্টানদের তরীকা নয়।

৫. এ কেবল ধরে নেওয়ার বিষয়। অর্থাৎ অসম্ভব হলেও ধরুন, যদি আপনি এমনটা করেন তবে আল্লাহ তাআলার গযব থেকে কেউই আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না।

অথবা এ দ্বারা উম্মতকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, কেউ যদি মুসলমান হয়েও, কুরআন বুঝেও দীন থেকে ফিরে যায়, তবে আযাব থেকে তাকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না।

تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ یَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

(অর্থাৎ কুরআনের) প্রতি ঈমান আনে। আর যারা তা অস্বীকার করবে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত[১]।

[রুকূ - ১৫]

يٰبَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْٓ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَنِّیْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ

১২২. হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার সেসব অনুগ্রহ স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের প্রতি করেছিলাম এবং এও (স্মরণ কর) যে, আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

وَاتَّقُوْا یَوْمًا لَّا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَیْـًٔا وَّلَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ یُنْصَرُوْنَ

১২৩. এবং সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে না, কারো পক্ষ থেকে কোন বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না, কারো জন্য কোন সুপারিশও লাভজনক হবে না এবং ওদের কোন সাহায্যও করা হবে না[২]।

وَاِذِ ابْتَلٰۤی اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ

১২৪. (স্মরণ কর), যখন ইবরাহীম আ.কে তাঁর রব কয়েকটি বিষয় দ্বারা পরীক্ষা করলেন[৩], আর তিনি সেগুলি পূরণ করলেন। (তখন)

---

১. ইহুদীদের মধ্যে কিছু ন্যায়নিষ্ঠ মানুষও ছিল। তারা তাদের কিতাব তাওরাত বুঝে পড়ত বলে তারা কুরআনের উপর ঈমান এনেছিল। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সাথীগণ। বর্তমান আয়াতে তাঁদেরই কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা তাওরাত মনোযোগের সাথে পড়তেন বলে তাঁদের ঈমান নসীব হল। পক্ষান্তরে যারা কিতাবকে অস্বীকার করল অর্থাৎ তাতে বিকৃতি সাধন করল, তারা অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হল।

২. বনী ইসরাঈলকে ইতিপূর্বে আল্লাহ তাআলার বহু নে'য়ামতের কথা স্মরণ করানো হয়েছিল। অতঃপর ওদের সকল হালত উল্লেখ করা হয়েছে। এখন ওদের তাকীদ ও সতর্ক করে পুনরায় পূর্বোক্ত সকল বিষয় স্মরণ করানো হচ্ছে, যাতে ওরা তা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করে এবং হেদায়েত কবুল করে এবং বুঝতে পারে যে, এটিই এখানে আসল উদ্দেশ্য।

৩. যেমন, হজের কার্যাবলী, খত্না, মেসওয়াক করা ইত্যাদি। বস্তুত হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহ তাআলার এরশাদ অনুসারে এখলাসের সাথে এসব হুকুম পালন করেন এবং সকল পরীক্ষায় সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হন। ফলে তাঁকে সমস্ত মানবজাতির নেতা হওয়ার মর্যাদা দান করা হয়।

فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّیۡ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ ؕ قَالَ لَا یَنَالُ عَهۡدِی الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۱۲۴﴾

আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমাকে (সকল) মানুষের 'ইমাম' বানাব[১]।' তিনি বললেন, 'এবং আমার সন্তানসন্ততির মধ্য থেকেও।' আল্লাহ বললেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি জালেমদের পর্যন্ত পৌঁছবে না[২]।'

وَاِذۡ جَعَلۡنَا الۡبَیۡتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ

১২৫. এবং (স্মরণ কর), যখন আমি কাবাগৃহকে মানবজাতির সমাবেশস্থল ও নিরাপত্তাস্থল

---

১. অর্থাৎ সকল নবী-রাসূল আপনার (প্রদর্শিত পথ) অনুসরণ করে চলবেন।

২. বনী ইসরাঈল গর্বভরে বলত, আমরা ইবরাহীম আ. এর বংশধর। আর আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম আ. এর সঙ্গে ওয়াদা করেছেন যে, নবুওয়াত ও সম্মান তাঁর বংশধরের মধ্যে থাকবে। আর আমরা হযরত ইবরাহীমের ধর্মে আছি এবং তাঁর ধর্মকে সকলেই মানে। উত্তরে আল্লাহ তাআলা ওদের বলছেন যে, আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি সেসব লোকদের জন্য ছিল, যারা সুপথে চলবে।

হযরত ইবরাহীম আ.-এর দুই পুত্র ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত ইসহাক আ.-এর বংশে অনেক দিন পর্যন্ত নবুওয়াত ও আভিজাত্য চলে আসছিল। এখন তা হযরত ইসমাঈল আ.-এর বংশধরের মধ্যে চলে এসেছে। (আর তিনি উভয় ছেলের জন্যই দো'য়া করেছিলেন।)

আল্লাহ আরো বলছেন, দীন ইসলাম সর্বদা এক। সকল নবী ও সকল উম্মত এই দীনের উপরই অতিবাহিত হয়েছেন। আর (তা এই যে, পয়গম্বর মারফত আল্লাহ তাআলা যে হুকুম পাঠাবেন, তা কবুল করা।) বর্তমানে এ পথ হচ্ছে মুসলমানদের পথ, তোমরা (ইহুদীরা) এ থেকে মুখ ফিরিয়ে আছ।

এ রুকুর প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলের প্রতি স্বীয় নে'য়ামতরাশির কথা উল্লেখ করেছিলেন। বর্তমান আয়াতে ওদের একটি অমূলক ধারণার খণ্ডন করলেন। তা এই যে, বনী ইসরাঈল নিজেদেরকে বিশ্বমানবের নেতা ও অনুসরণীয় এবং সমগ্র মানব গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করে কারো অনুসরণ করত না। বর্তমান আয়াতে এ অমূলক ধারণা খণ্ডন করে দেওয়া হল।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত ইবরাহীম আ.-এর উল্লেখ ও তাঁর প্রশংসার কথা এসে গেল। এ প্রসঙ্গে কাবা শরীফের হালত ও ফযীলতও সামনের আয়াতসমূহে বর্ণিত হচ্ছে। আর মুফাসসিরগণ যেরূপ বলেছেন, এই আলোচনার ভেতর ইহুদী ও নাসারাদের প্রতি বহু অভিযোগের ইঙ্গিতও রয়েছে।

وَاَمۡنًا ؕ وَاتَّخِذُوۡا مِنۡ مَّقَامِ اِبۡرٰهٖمَ مُصَلًّی ؕ وَعَهِدۡنَاۤ اِلٰۤی اِبۡرٰهٖمَ وَاِسۡمٰعِیۡلَ اَنۡ طَهِّرَا بَیۡتِیَ لِلطَّآئِفِیۡنَ وَالۡعٰکِفِیۡنَ وَالرُّکَّعِ السُّجُوۡدِ ﴿۱۲۵﴾

বানালাম[১] এবং (আদেশ করলাম,) 'তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানাও[২]।' এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, আমার ঘরকে পবিত্র রাখ তওয়াফকারী, এতেকাফকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য[৩]।

وَاِذۡ قَالَ اِبۡرٰهٖمُ رَبِّ اجۡعَلۡ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارۡزُقۡ اَهۡلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنۡ اٰمَنَ مِنۡهُمۡ بِاللّٰهِ وَالۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنۡ کَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِیۡلًا ثُمَّ اَضۡطَرُّهٗۤ اِلٰی عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئۡسَ الۡمَصِیۡرُ ﴿۱۲۶﴾

১২৬. এবং (স্মরণ কর), যখন ইবরাহীম বললেন, 'হে আমার রব! একে নিরাপদ শহর বানান[৪] এবং এর অধিবাসীদের ফলমূল দ্বারা জীবিকা দান করুন।' (অর্থাৎ) তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনবে, তাদের[৫]। আল্লাহ বললেন, 'এবং যে কুফরী করবে, তাকেও আমি জীবনোপভোগ করতে দেব কিছুকাল। অতঃপর আমি তাকে বল-প্রয়োগে নিয়ে যাব জাহান্নামের আযাবে। আর তা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল[৬]!'

---

১. অর্থাৎ প্রতি বছর হজের উদ্দেশ্যে লোকেরা সেখানে সমবেত হয়, আর যারা সেখানে গিয়ে হজের অনুষ্ঠান পালন করে, তারা দোযখের আযাব থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। অথবা (নিরাপত্তাস্থল বলে উদ্দেশ্য এই যে,) সেখানে কেউ কারো উপর জুলুম করে না।

২. মাকামে ইবরাহীম হচ্ছে সেই পাথর, যার উপর দাঁড়িয়ে তিনি কাবাঘর নির্মাণ করেছিলেন। তাতে হযরত ইবরাহীম আ.-এর পদচিহ্ন রয়েছে। 'হাজরে আসওয়াদের' ন্যায় এই পাথরও বেহেশত থেকে আনা হয়েছিল। (তওয়াফের পর) এই পাথরের নিকট দাঁড়িয়ে নামায পড়ার হুকুম রয়েছে, তবে এ হুকুম মানা মুস্তাহাব।

৩. অর্থাৎ সেখানে মন্দ কাজ করতে নেই, নাপাক লোকদের কাবাঘর তওয়াফ করতে নেই এবং সকল প্রকার মলিনতা-অপবিত্রতা থেকে এই ঘর পরিষ্কার রাখা চাই।

৪. কাবাঘর নির্মাণকালে হযরত ইবরাহীম আ. দোয়া করেছিলেন যে, এই মরুপ্রান্তর যেন একটি মানব বসতিপূর্ণ ও নিরাপত্তার শহরে পরিণত হয়। বস্তুত তা-ই হয়েছে।

৫. অর্থাৎ এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা ঈমানদার হবে, তাদের ফলমূলের রুযী দান করুন। হযরত ইবরাহীম আ. কাফেরদের জন্য দো'য়া করলেন না, যাতে কুফুরীর অপবিত্রতা থেকে সেই স্থান পাক থাকে।

৬. আল্লাহ তাআলা বললেন, দুনিয়াতে কাফেরদেরও রিযিক দেওয়া হবে। রিযিকের ব্যাপারটি দীনী নেতৃত্বের মত নয় যে, ঈমানদারদের ছাড়া আর কেউ পেতেই পারবে না।

وَاِذۡ یَرۡفَعُ اِبۡرٰهٖمُ الۡقَوَاعِدَ مِنَ الۡبَیۡتِ وَاِسۡمٰعِیۡلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنۡتَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ ﴿۱۲۷﴾

১২৭. আরো (স্মরণ কর), যখন ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ. কাবাগৃহের ভিত তুলছিলেন, আর (এ দোয়া করছিলেন), 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে (এ খেদমত) কবুল করুন, নিশ্চয় আপনিই সর্বশ্রোতা, পরিজ্ঞাতা[১]।

رَبَّنَا وَاجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَیۡنِ لَكَ وَمِنۡ ذُرِّیَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسۡلِمَةً لَّكَ ۪ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبۡ عَلَیۡنَا ۚ اِنَّكَ اَنۡتَ التَّوَّابُ الرَّحِیۡمُ ﴿۱۲۸﴾

১২৮. 'হে আমাদের প্রতিপালক! আর আমাদের আপনার পূর্ণ অনুগত বানান এবং আমাদের সন্তানসন্ততির মধ্যেও আপনার অনুগত একটি জামাত বানান এবং আমাদের হজের নিয়মাবলী বাতলে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনিই তওবা কবুলকারী, অতি মেহেরবান।

رَبَّنَا وَابۡعَثۡ فِیۡهِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِكَ وَیُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ وَیُزَكِّیۡهِمۡ ؕ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَكِیۡمُ ﴿۱۲۹﴾

১২৯. 'হে আমাদের প্রতিপালক! আর তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠান, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করবেন, তাদের কিতাব ও গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়াদি শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয় আপনিই পরাক্রমশালী, বড় প্রজ্ঞাবান[২]।'

---

১. অর্থাৎ আমাদের পক্ষ থেকে (কাবাগৃহ নির্মাণের) এই কাজটি কবুল করুন। আপনি সকলের দো'য়া শোনেন এবং তাদের নিয়ত জানেন।

২. এই দো'য়া করেছিলেন হযরত ইবরাহীম আ. ও তাঁর ছেলে হযরত ইসমাঈল আ.। তাঁরা উভয়ে দো'য়া করেছিলেন, "আমাদের বংশের মধ্যে আপনার ফরমাবরদার একটি জামাত পয়দা করুন এবং তাদের মধ্যে এমন একজন রাসূল আবির্ভূত করুন, যিনি তাদের (আল্লাহর) কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দেবেন।" বলা বাহুল্য, তাঁদের উভয়ের সন্তানসন্ততির মধ্য থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কোন নবী আসেননি। এ কারণে ইহুদীদের পূর্ববর্ণিত ধারণার পূর্ণ খণ্ডন হয়ে গেল।

وَیُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ 'কিতাবের ইলম' বলতে এমনসব জরুরী অর্থ ও মর্ম উদ্দেশ্য, যা আয়াতের শব্দাবলি থেকে বুঝে আসে, আর 'হেকমত' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গুপ্ত ভেদ ও সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা।

[রুকূ - ১৬]

১৩০. এমন কে আছে, যে ইবরাহীম আ.-এর ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- কেবল ও ছাড়া, যে নিজেকে আহমক সাব্যস্ত করেছে?! আর নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে তাঁকে মনোনীত করেছি এবং নিশ্চয়ই তিনি আখেরাতে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

১৩১. (স্মরণ কর), যখন তাঁর রব তাঁকে বললেন, 'অনুগত হও'। তিনি বললেন, 'আমি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকের (পূর্ণ) আনুগত্য গ্রহণ করলাম।'

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৩২. আর ইবরাহীম আ. এরই ওসিয়ত করে গিয়েছেন আপন পুত্রদের এবং ইয়াকূব আ.ও। (তাঁদের প্রত্যেকে বলেছেন), 'হে আমার পুত্রগণ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দীন মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা এ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করো যে, তোমরা মুসলিম[১]।'

وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

১৩৩. তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুব আ. এর কাছে মৃত্যু হাযির হল? যখন তিনি নিজ পুত্রদের বললেন, 'তোমরা আমার পর কিসের ইবাদত করবে?' তাঁরা বললেন, 'আমরা ইবাদত করব আপনার মাবূদের ও আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের মাবূদের- (তথা) একমাত্র মাবূদের। আর আমরা (সকলে)

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِىْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا

১. পূর্বে যে মিল্লাত ও ধর্মের গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা আলোচনা হল, হযরত ইবরাহীম আ. ও হযরত ইয়াকূব আ. নিজেদের সন্তানসন্ততিকে সেই মিল্লাতের উপর থাকার জন্যই ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা মেনে চলবে না, সে তাঁদেরও বিরোধী হল। ইহুদীরা বলত, হযরত ইয়াকূব আ. স্বীয় সন্তানদের ইহুদী ধর্ম পালন করার ওসিয়ত করে গিয়েছেন। অতএব ওরা মিথ্যাবাদী, যেমন পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

তাঁরই অনুগত[১]।'

وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ۝

১৩৪. তাঁরা একটি জামাত, যা অতীত হয়েছে। তাঁরা যা করেছেন তা তাঁদের জন্য এবং তোমাদের জন্য তোমরা যা করেছ তা। আর তাঁদের কাজকর্ম সম্বন্ধে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না[২]।

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۝

১৩৫. ওরা বলে, 'তোমরা ইহুদী বা খ্রিস্টান হয়ে যাও, তাহলে তোমরা সঠিক পথ পাবে[৩]।' আপনি বলে দিন, ('কখনো না), বরং (আমরা তো অবলম্বন করেছি) ইবরাহীমের পথ, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না[৪]।'

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۝

---

১. অর্থাৎ হযরত ইয়াকূব আ.এর ওসিয়তের সময় তো তোমরা উপস্থিত ছিলে না। তিনি তো উল্লিখিত ধর্মের কথা এরশাদ করে গিয়েছেন। অথচ তোমরা এ কাণ্ড করলে যে, ইহুদীরা নিজেদের ছাড়া আর সকলকে এবং খ্রিস্টানরা নিজেদের ছাড়া আর সবাইকে বে-দীন বলতে লাগল, ফলে তোমরা উভয়ে সত্য ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের বিরোধী হয়ে গেলে। এ তোমাদের মিথ্যা কথা বৈ কিছু নয়।

২. ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বিশ্বাস ছিল, পিতামাতার গোনাহর কারণে সন্তানাদি ধৃত হবে। তদ্রূপ মাতাপিতার ছওয়াবে তারা অংশীদার থাকবে। এ ছিল ওদের ভ্রান্ত ধারণা। মানুষের কৃত-কর্ম ভাল হোক বা মন্দ হোক, তার ফলাফল নিজেকেই ভোগ করতে হবে।

৩. অর্থাৎ ইহুদীরা মুসলমানদের বলে, তোমরা ইহুদী হয়ে যাও। আর খ্রিস্টানরা বলে যে, তোমরা খ্রিস্টান হয়ে যাও। তবেই তোমাদের ভাগ্যে হেদায়েত জুটবে।

৪. অর্থাৎ আপনি, হে মুহাম্মদ! বলে দিন, তোমাদের কথা কখনই মানি না, বরং আমরা হযরত ইবরাহীম আ.-এর মিল্লাতের অনুসারী, যিনি হচ্ছেন সকল ভেজাল ধর্ম থেকে পবিত্র। আর 'তিনি মুশরকেরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না'– এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা উভয় দল শিরকের মধ্যে লিপ্ত। বরং আরবের মুশরিকরা পর্যন্ত মিল্লাতে ইবরাহীমের দাবিদার ছিল, কিন্তু ওরাও মুশরিক ছিল। সুতরাং এতে ওদের দাবিরও খণ্ডন হয়ে গেল। এখন ইনসাফের দৃষ্টিতে এই সম্প্রদায়সমূহের কেউই মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী রয়নি; শুধু মুসলমানরাই মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী।

১৩৬. তোমরা বলে দাও, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং তার প্রতি, যা আমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তার প্রতি, যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও (তাঁর) সন্তান-সন্ততির উপর এবং তার প্রতি, যা দেওয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং তার প্রতিও, যা দেওয়া হয়েছে অন্য নবীদের– তাঁদের রবের পক্ষ থেকে। আমরা তাঁদের মধ্যে কারো ক্ষেত্রে পার্থক্য করি না। আর আমরা ওই আল্লাহরই অনুগত[১]।'

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

১৩৭. অতএব ওরা যদি সেরূপ ঈমান আনে যেরূপ ঈমান এনেছ তোমরা, তবে ওরাও হেদায়েত পেয়ে যাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তো ওরা জিদের মধ্যে আছে। সুতরাং আল্লাহই আপনার পক্ষ

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ

বি. দ্র.

প্রত্যেক শরী'য়তে তিনটি বিষয় থাকে। প্রথম– আকীদা-বিশ্বাস, (যেমন, তাওহীদ, নবুওয়াত ইত্যাদি)। এতে সকল সত্যধর্মাবলম্বীরাই শরীক ও একমত, মতবিরোধ সম্ভবই নয়। দ্বিতীয়– শরী'য়তের মৌলিক বা সামগ্রিক নীতিমালা, যেসব থেকে শাখা মাসলা-মাসায়েল বের হয়; এই মৌলিক নীতিসমূহ সব শাখাতেই বিবেচ্য থাকে। বস্তুত এসব মৌলিক নীতি ও মৌল বিষয়েরই নাম 'মিল্লাত'। মিল্লাতে মুহাম্মদী ও মিল্লাতে ইবরাহীমীর ঐক্য ও সমন্বয় এসব মৌলিক বিষয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। তৃতীয়– সব মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ের সমষ্টি (যাকে শরী'য়ত বলা হয়)।

সার কথা এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইবরাহীম আ.-এর মিল্লাত এক, আর তাঁদের শরী'য়ত ভিন্ন ভিন্ন। (কারণ, উভয়ের মাঝে শাখাগত কিছু কিছু বিষয়ে ভিন্নতা রয়েছে।)

১. অর্থাৎ আমরা সকল রাসূল ও সকল কিতাবের উপর ঈমান আনয়ন করি এবং সকলকে সত্য জ্ঞান করি। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ যমানায় অবশ্য অনুসরণীয়। আর আমরা খোদার ফরমাবরদার বান্দা। যে সময় যিনি নবী হবেন, তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর যে আহকাম পৌছবে, তার অনুসরণ জরুরী। পক্ষান্তরে কিতাবীরা নিজেদের দীন ছাড়া সকল দীনকে মিথ্যা বলে, ওদের দীন মনসূখ (রহিত) হওয়া সত্ত্বেও অন্য নবীদের আনীত বিধানকে মিথ্যা বলে, যা খোদারই বিধান বটে।

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

থেকে ওদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট। আর তিনিই সর্বশ্রোতা, পরিজ্ঞাতা[১]।

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ۝

১৩৮. '(আমরা গ্রহণ করেছি) আল্লাহর রং। আর আল্লাহর (রংয়ের) চেয়ে কার রং উত্তম? এবং আমরা তাঁরই ইবাদত করি[২]।'

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ۝

১৩৯. আপনি বলুন, 'তোমরা কি আমাদের সঙ্গে আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করছ? অথচ তিনিই আমাদের রব ও তোমাদের রব। আর আমাদের জন্য আমাদের আমল এবং তোমাদের জন্য তোমাদের আমল। আর আমরা একমাত্র তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ[৩]।'

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا

১৪০. তোমরা কি বল যে, 'ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও (তাঁর) সন্তানসন্ততি ইহুদী বা খ্রিস্টান ছিলেন?' আপনি বলুন, 'তোমরা বেশি জান, না আল্লাহ?' আর তার

১. অর্থাৎ ওদের জিদ ও দুশমনীর কারণে আপনি ভয় করবেন না। আল্লাহ তাআলা ওদের দুষ্কৃতি ও ক্ষতি থেকে আপনাকে রক্ষা করবেন। ওরা আপনার কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না। আর আল্লাহ তাআলা সকলের কথা শোনেন এবং সকলের অবস্থা ও নিয়ত জানেন।

২. ইহুদীরা উল্লিখিত আয়াতগুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, ইসলাম গ্রহণ করল না। খ্রিস্টানরাও অস্বীকার করল এবং অহংকার করে বলতে লাগল, 'আমাদের এখানে এমন একটি রং রয়েছে যা মুসলমানদের কাছে নেই।' খ্রিস্টানরা একটি হলুদ রং তৈরি করে রেখেছিল এবং নিয়ম ছিল, তাদের কোন শিশু জন্ম নিলে অথবা কেউ ওদের দীন গ্রহণ করতে এলে তাকে উক্ত রংয়ের মধ্যে ডোবাত এবং বলত, বেশ পাক-পবিত্র খ্রিস্টান হয়ে গেল। অতএব আল্লাহ তাআলা বলছেন, 'হে মুসলমানগণ! তোমরা বল, আমরা আল্লাহর রং অর্থাৎ সত্য ধর্ম কবুল করেছি।' কেননা, এ ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমেই সব রকমের অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা লাভ হয়।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে তোমাদের ঝগড়া করা এবং এ ধারণা রাখা যে, তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের ভাগী তোমাদের ছাড়া কেউই নেই– এ নিতান্ত বেহুদা কথা। তিনি যেমন তোমাদের রব, তেমনি আমাদেরও রব। আর আমরা যা কিছু আমল করি একমাত্র তাঁরই জন্য করি, তোমাদের মত বাপ-দাদার বড়াই, গোঁড়ামি ও প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে করি না। এর পরও তিনি আমাদের আমল কবুল না করে তোমাদের আমল কবুল করবেন– এ কেমন কথা?

اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে এমন সাক্ষ্য গোপন করে যা তার নিকট আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে? আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে বে-খবর নন[১]।'

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৪১. তাঁরা একটি জামাত, যা অতীত হয়েছে। তাঁরা যা করেছেন তা তাঁদের জন্য এবং তোমাদের জন্য তোমরা যা করেছ তা । আর তাঁদের কাজকর্ম সম্বন্ধে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না[২]।

পারা ২ [রুকূ -১৭]

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا

১৪২. এখন নির্বোধ লোকেরা বলবে, 'কোন্ জিনিস মুসলমানদেরকে তাদের সেই কেবলা থেকে ফিরিয়ে দিল, যার উপর

---

১. হযরত ইবরাহীম আ., হযরত ইসমাঈল আ. ও অন্য নবীদের সম্বন্ধে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের এই দাবি যে, তাঁরা ইহুদী বা খ্রিস্টান ছিলেন— তাহা মিথ্যা। তদুপরি আল্লাহ তাআলা বলেছেন- مَاكَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَانَصْرَانِيًّا (ইবরাহীম ইহুদীও ছিলেন না, খ্রিস্টানও না।) এখন বল দেখি, তোমরা বেশি জান, না আল্লাহ তাআলা?

২. **একই আয়াতের পুনরাবৃত্তির কারণ**
এই আয়াতই একটু পূর্বে গত হয়েছে। যেহেতু আহলে কিতাবের অন্তরে নবী-বংশ হওয়ার কারণে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, আমাদের আমল যতই খারাপ হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত আমাদের বাপ-দাদারা আমাদের অবশ্যই ক্ষমা করিয়ে নেবেন— তাই এ বেহুদা ধারণা খণ্ডন করার জন্য তাকীদস্বরূপ এ আয়াত পূণর্বার বয়ান করা হয়েছে।

অথবা এমনও বলা যায় যে, প্রথম আয়াতে আহলে কিতাবের প্রতি সম্বোধন ছিল। আর বর্তমান আয়াতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, এ রকম নিরর্থক ধারণায় আহলে কিতাবের অনুসরণ করতে নেই। কারণ, নিজ পূর্বপুরুষদের কারণে এমন আশা কারো অন্তরে এসে পড়তেই পারে, তবে এ নিরেট বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়।

অতঃপর সামনের আয়াতগুলিতে ইহুদী ও অন্যদের বোকামীর আগাম সংবাদ দেওয়া হচ্ছে, যা কেবলা পরিবর্তনের বিধানের ক্ষেত্রে শীঘ্রই প্রকাশিতব্য ছিল।

قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝١٤٢

তারা (এত দিন) ছিল[১]?' আপনি বলুন, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখিয়ে দেন[২]।'

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا

১৪৩. এমনিভাবে আমি তোমাদের ভারসাম্যপূর্ণ উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা (অন্যান্য)

---

১. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় গমন করে ষোল সতের মাস বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে (মুখ করে) নামায পড়তে থাকেন। অতঃপর কাবা শরীফের দিকে মুখ করার হুকুম এলে ইহুদী, মুশরিক ও মুনাফিকরা এবং এদেরই প্রভাবে কতক অপরিপক্ক মুসলমানও এ কথা বলে সন্দেহ সৃষ্টি করতে লাগল যে, 'ইনি তো পূর্ববর্তী নবীদের কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায পড়তেন। এখন কী কারণে তা পরিত্যাগ করে কাবার দিকে মুখ করতে শুরু করলেন? ওদের কেউ বলল, ইহুদীদের সঙ্গে শত্রুতা ও হিংসাবশে এমন করেছেন। কেউ বলল, ইনি স্বধর্মে দ্বিধাগ্রস্ত ও পেরেশান। সুতরাং তিনি যে আল্লাহর নবী তা প্রমাণিত হয় না।'

বিরোধীদের এই আপত্তি ও এর উত্তর –যা সম্মুখে আসছে– আগেই আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন, যাতে তখন কারো দ্বিধা-সন্দেহ না হয় এবং উত্তর দিতে দেরি না হয়।

২. অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি বলে দিন, আমরা যে কেবলা পরিবর্তন করেছি, তা ইহুদী-বিদ্বেষেও নয়, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ও নিজেদের মতের অনুসরণেও নয়, বরং আমরা শুধু আল্লাহর নির্দেশেই এমন করেছি। আল্লাহর নির্দেশ পালন করাই তো আমাদের দীন। পূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করার আদেশ ছিল। তখন আমরা তাই মেনে নিয়েছি। এখন কাবার দিকে মুখ করার নির্দেশ এসেছে, আমরা তা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছি। আমাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা এবং আমাদের এ কাজের প্রতিবাদ করা চরম নির্বুদ্ধিতা। আজ্ঞাবহ দাসকে এমন প্রশ্ন করা যে, তুমি পূর্বে ওই কাজ করতে, এখন এই কাজ করতে শুরু করলে কেন? —এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

আর যদি এসব বিপরীতমুখী হুকুমের রহস্য জানতে চাও তবে প্রশ্ন এই যে, আল্লাহ তাআলার আহকামের সকল রহস্য ও তাৎপর্য কে বুঝতে পারে এবং তোমাদের মত বেকুবদের কে বোঝাবে? অবশ্য এতটুকু কথা যে কেউ বুঝতে পারে এবং প্রত্যেককে বোঝাতেও পারে যে, কেবলা নির্ধারণ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য তো ইবাদতের তরীকা বলে দেওয়া, আসল ইবাদত কখনো নয়। আর কেবলার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার রীতি পৃথক পৃথক। তাঁর হেকমত ও রহমত মোতাবেক কাউকে এক বিশেষ পথ (তথা কেবলা) বলে দেওয়া হয়, কাউকে অন্য পথ বাতানো হয়। বস্তুত সকল স্থান ও সর্বদিকের মালিক আল্লাহই। যখন যাকে ইচ্ছা এমন পথ বলে দেন, যা নিতান্তই সরল ও সঠিক এবং অন্য সকল পথের চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও নিকটবর্তী। যেমন, তিনি আমাদেরকে এখন এমন কেবলা নির্দেশ করেছেন, যা সকল কেবলা থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম।

شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۭ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۭ

মানুষের ব্যাপারে সাক্ষী হতে পার এবং রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের জন্য[১]। আর আমি সে কেবলা যার উপর আপনি (এতদিন) ছিলেন, কেবল এ জন্য নির্ধারণ করেছিলাম যাতে আমি জানতে পারি যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে, আর কে পিছনের দিকে ফিরে যায়[২]।

---

১. অর্থাৎ সকল কেবলার মধ্যে তোমাদের কেবলা 'কাবা' যেমন সর্বোত্তম, যা হযরত ইবরাহীম আ.-এরও কেবলা ছিল, তেমনি সকল উম্মতের মধ্যে তোমাদের আমি সর্বোত্তম উম্মত এবং তোমাদের পয়গম্বরকে শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর করেছি, যাতে তোমরা এই শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণে সকল উম্মতের মোকাবেলায় গ্রহণযোগ্য সাক্ষী সাব্যস্ত হও এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষ্য দান করেন। যেমন, হাদীছে বর্ণিত আছে: যখন পূর্ববর্তী উম্মতদের কাফেররা ওদের পয়গম্বরদের দাবিকে অস্বীকার করবে এবং বলবে যে, দুনিয়াতে আমাদের কেউই হেদায়েত করেনি, তখন নবীজির উম্মত সেই নবীদের দাবির সত্যতার সাক্ষ্য দেবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত থাকায় তাদের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষী হবেন। তখন সেই উম্মতরা বলবে, তারা (আখেরী উম্মত) তো আমাদের যুগে ছিলও না, আমাদের দেখেওনি, অতএব তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তখন হুজুরের উম্মত উত্তর দেবে, আল্লাহ তাআলার কিতাব ও তাঁর রাসূলের হাদীছের মাধ্যমে এ বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞান আমাদের লাভ হয়েছিল, তাই আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৩৩৯; আয্‌যুহ্‌দ ইবনুল মুবারক, হাদীস ১২০২ —ইবনুল মুবারকের রেওয়ায়েতটি বিস্তারিত। তবে এর সনদ দুর্বল।)

বি. দ্র. وَسَطٌ অর্থাৎ ভারসাম্যপূর্ণ হওয়ার অর্থ এই যে, এ উম্মত সঠিক-সরল পথের উপর রয়েছে, যার মধ্যে বক্রতার লেশমাত্র নেই এবং যা 'এফরাত' ও 'তাফরীত' অর্থাৎ বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

২. অর্থাৎ তোমাদের আসল কেবলা তো কাবাই নির্ধারিত ছিল, যা হযরত ইবরাহীম আ.-এর সময় থেকে চলে এসেছে। তবে সাময়িকভাবে যে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কেবলা নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা শুধু এই পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ছিল যে, কে রাসূলের অনুসরণের উপর কায়েম থাকে আর কে দীন থেকে ফিরে যায়। সুতরাং এ পরীক্ষায় যারা ঈমানের উপর অবিচল থেকেছে, তাদের জন্য অতি বড় মর্তবা রয়েছে।

একটি সংশয় ও তার উত্তর

আলোচ্য আয়াতে لِنَعْلَم ভবিষ্যৎ কালের যে ক্রিয়াটি আছে এবং অন্যান্য আয়াতে إِلَّا لِنَعْلَم , لَنَبْلُوَنَّكُم , لَمَّا يعلم الله , فليعلمن , حتى نعلم প্রভৃতি ভবিষ্যৎ কালের শব্দাবলি

রয়েছে, এসব থেকে বাহ্যত বুঝে আসে যে, আল্লাহ তা'আলা (নাউযুবিল্লাহ) এসব বিষয়ের জ্ঞান পরে লাভ করেছেন, এ জিনিসগুলো অস্তিত্বে আসার পূর্বে এসবের জ্ঞান তাঁর ছিল না। অথচ প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে আল্লাহর ইলম (জ্ঞান) অনাদি (قديم)—كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (আল্লাহর ইলম সব কিছুতে ব্যাপ্ত রয়েছে।)

উলামায়ে কেরাম কয়েকভাবে এর জওয়াব দিয়েছেন। কেউ কেউ উক্ত শব্দগুলির মূল ধাতু علم এর অর্থ (জানা বা জ্ঞান লাভ করা নয়, বরং পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থাকে) পৃথক ও আলাদা করে দেওয়ার অর্থ নিয়েছেন। কেউ কেউ 'পরীক্ষা করা'-র অর্থ নিয়েছেন। কেউ 'ইলম'-কে رؤية (দেখা)-র অর্থে ধরেছেন। কেউ ভবিষ্যৎ কালকে অতীতের অর্থে নিয়েছেন। কেউ কেউ حدوث علم (অর্থাৎ জ্ঞান অর্জিত হওয়া –অনুবাদক)-কে নবী ও মুমিনদের সঙ্গে, (অথবা সম্বোধিত ব্যক্তিদের সঙ্গে) সম্পর্কিত করেছেন (আল্লাহর সাথে নয়)। কোন কোন বিজ্ঞ মনীষীর মতে এস্থলে علم حالي উদ্দেশ্য, যা জ্ঞাত বিষয়টি অস্তিত্বে আসার পর অর্জিত হয় এবং যার উপর পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান এবং প্রশংসা বা দোষারোপ করা নির্ভরশীল।

অধিকতর শক্তিশালী উত্তর

কিন্তু কোন কোন পরিপক্ক জ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞ মনীষী এ সম্পর্কে দু'টি অতি সূক্ষ্ম ও চমৎকার বিষয় বর্ণনা করেছেন। প্রথমটির সারসংক্ষেপ এই যে, إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (আল্লাহর জ্ঞান সকল বিষয়ে ব্যাপ্ত রয়েছে। তালাক-১২) —এ আয়াত অনুযায়ী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল বিষয়– ছোট ও বড়, কম ও বেশি, খোদার সামনে রয়েছে এবং সব কিছুর ইলম (জ্ঞান) একই সঙ্গে তাঁর আছে। তাঁর জ্ঞানে আগপাছ বলতে কিছু নেই। তবে বিষয়গুলোর পরস্পর সম্পর্ক হিসাবে তাদের অবশ্যই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধরা হয়। অতএব আল্লাহ তা'আলার ইলম হিসাবে তো সব কিছুই একক বিষয়রূপে বর্তমান। এ জন্য (আল্লাহ তা'আলার) ক্ষেত্রে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে আলাদা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। তবে বিষয়াদির পরস্পরের আগপাছের কারণে এই তিনটি কালই স্বাভাবিকভাবে পৃথক পৃথক হবে। অতএব আল্লাহ তা'আলা কখনো বিশেষ হেকমত ও ক্ষেত্র হিসাবে নিজের জানার প্রেক্ষিতে কথা বলেন, আর কখনো সেই বিষয়াদির অগ্র-পশ্চাতের প্রেক্ষিতেও আলোচনা করেন।

প্রথমাবস্থায় তো সর্বদা একটি সূক্ষ্ম পার্থক্যের বিবেচনায় অতীত বা বর্তমান কালের ক্রিয়া/শব্দ ব্যবহৃত হয়, ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া ব্যবহার হতেই পারে না। আর দ্বিতীয় অবস্থায় অতীতের ক্ষেত্রে অতীত, বর্তমানের ক্ষেত্রে বর্তমান ও ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কালের শব্দ/ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।

অতএব যেখানেই তিনি ভবিষ্যৎ ঘটনাবলিকে অতীতের শব্দাবলিতে বর্ণনা করেছেন, যেমন وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ('জান্নাতবাসীরা জাহান্নামীদের ডেকে বলবে'–আরাফ : ৪৪) প্রভৃতি আয়াত, সেখানে এই বিবেচনা রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার সামনে সবই উপস্থিত ও তাঁর দৃষ্টিতে বর্তমান রয়েছে। আর যেখানে অতীত বিষয়াবলিকে ভবিষ্যৎ কালের শব্দ বা ক্রিয়া দিয়ে বর্ণনা করেছেন, যেমন আলোচ্য আয়াতেই إِلَّا لِنَعْلَمَ রয়েছে, অথবা এরূপ অন্যান্য

স্থানে —সেখানে এই বিবেচনা থাকে যে, বিষয়টি তার পূর্ববর্তী বিষয়ের তুলনায় ভবিষ্যৎ কালের; আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের দিক থেকে নয়। অন্যথায় তাঁর জ্ঞানে অনিত্যতা এর সন্দেহ হবে।

দ্বিতীয় তাত্ত্বিক বিষয়টির সারমর্ম এই যে, কোনো বিষয়ের জ্ঞান দুটি উপায়ে লাভ হয়। এক. সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে; দুই. কোনো কিছুর মাধ্যমে বা পরোক্ষভাবে। উদাহরণস্বরূপ : আমরা কোনো সময় আগুন চোখে দেখি। আর কখনো আগুন তো আমাদের আড়ালে থাকে, কিন্তু ধোঁয়া দেখে সেখানে আগুন রয়েছে বলে বিশ্বাস জন্মে। আর অনেক সময় এই উভয় ইলম (জ্ঞান) একই সঙ্গে হাসিল হয়। যেমন, আগুন নিকট থেকে দেখলে ধোঁয়াও তার সাথে দেখা যাবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আগুনের জ্ঞান উভয় উপায়েই হাসিল হবে– প্রত্যক্ষভাবেও; কারণ আগুন চোখে দেখা যাচ্ছে এবং পরোক্ষভাবেও, অর্থাৎ আগুনের জ্ঞান ধোঁয়ার মাধ্যমেও লাভ হচ্ছে। আর এই উভয় জ্ঞান যদিও একই সঙ্গে লাভ হচ্ছে, আগে পরে নয়; কিন্তু পরোক্ষ বা মাধ্যম সূত্রের জ্ঞান (ধোঁয়ার মাধ্যমে আগুনের জ্ঞান) প্রত্যক্ষ জ্ঞানের (আগুনের সরাসরি জ্ঞানের) মধ্যে এমন আচ্ছন্ন থাকে যে, পরোক্ষ জ্ঞানের খেয়ানও হয় না।

ঠিক এভাবে, কখনো দু'টি জিনিসের জ্ঞান সরাসরি অর্থাৎ মাধ্যম ছাড়াও এক সঙ্গে হাসিল হয়, যেমন আগুন ও ধোঁয়া এক সঙ্গে দেখা যায়। অনুরূপ, কখনো একটি জিনিসের জ্ঞান সরাসরি এবং অপর জিনিসের জ্ঞান প্রথম জিনিসটির মাধ্যমে একই সঙ্গে হাসিল হয়। যেমন, ধোঁয়ার জ্ঞান সরাসরি এবং আগুনের জ্ঞান ধোঁয়ার মাধ্যমে, অথবা আগুনের জ্ঞান সরাসরি এবং ধোঁয়ার জ্ঞান আগুনের মাধ্যমে, উভয়টি একই সাথে অর্জিত হয়। তবে হাতে কলম নিয়ে লিখলে, হাত ও কলম একই সঙ্গে নড়তে দেখা যাওয়া সত্ত্বেও যেমন বলা হয়, হাত প্রথমে নড়েছে বলেই কলম নড়েছে— ঠিক সেইভাবে সুস্থ বুদ্ধি এ রকম ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় একই সঙ্গে হওয়া সত্ত্বেও সরাসরি সূত্রের জ্ঞানকে মাধ্যম সূত্রের জ্ঞান থেকে, যা প্রথম জিনিসের মাধ্যমে হাসিল হয়েছে, পূর্ববর্তী মনে করে।

পূর্বোক্ত বিষয়গুলো জানা হয়ে যাওয়ার পর এখন বুঝতে হবে যে, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার সব জিনিসের জ্ঞান উভয়ভাবে (বর্তমান) রয়েছে, সরাসরি সূত্রে ও মাধ্যম সূত্রে, অর্থাৎ কার্য দ্বারা কারণ এবং কারণ দ্বারা কার্য সম্পর্কে জ্ঞান তাঁর রয়েছে। আর তাঁর এই উভয়বিধ জ্ঞান অনাদি কাল থেকে সর্বদাই রয়েছে, যদিও কোনো জিনিসের মাধ্যম সূত্রের জ্ঞান সেই জিনিসেরই সরাসরি সূত্রের জ্ঞানের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকুক। এক জিনিসের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও দ্বিতীয় জিনিসের পরোক্ষ জ্ঞান একই সঙ্গে তাঁর আছে এবং উভয় জ্ঞানই অনাদি; যদিও উল্লিখিত ক্ষেত্রে সরাসরি জ্ঞানকে পূর্ববর্তী এবং মাধ্যম সূত্রের জ্ঞানকে পরবর্তী বলা হবে। তো, যেখানেই খোদার জ্ঞানের আলোচনায় ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বা ভবিষ্যৎ কালের অর্থ পাওয়া যাবে, তা মাধ্যম সূত্রের জ্ঞান হিসাবে হবে, কালের হিসাবে কোন পার্থক্য হয় না। আর যেখানে অতীত বা বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়, সেখানে সরাসরি জ্ঞান উদ্দেশ্য থাকে।

وَاِنۡ كَانَتۡ لَكَبِيۡرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيۡنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيۡعَ

নিঃসন্দেহে তা (অর্থাৎ কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি) বড় কঠিন ছিল– তবে তাদের জন্য নয়, যাদেরকে আল্লাহ পথ দেখিয়ে দিয়েছেন[১]। আর আল্লাহ এমন নন যে,

আর মাধ্যম সূত্রের জ্ঞান হিসাবে কথা বলার হেকমত এই যে, আল্লাহর কালামের শ্রোতা হচ্ছে মানুষ, আর তারা অধিকাংশ জিনিসের জ্ঞান লাভ করে মাধ্যম সূত্রে। আর যেখানে আল্লাহ তা'আলা নিজের জ্ঞানের বিষয়ে ভবিষ্যৎ কালের শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেখানে বিষয়গুলো এমন, যেগুলো মানুষের জন্য সরাসরি সূত্রে হাসিল হতে পারে না। যদি এমন ক্ষেত্রসমূহে মানুষের সঙ্গে সরাসরি সূত্রের জ্ঞানের হিসাবে কথা বলা হত, তবে তাদের পূর্ণরূপে অভিযুক্ত করা যেত না। আর যেখানে এই বিবেচনা নেই, সেখানে অতীত বা বর্তমান কালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মানুষের জন্য যেহেতু এই বিষয়গুলোর জ্ঞান সরাসরি লাভ হতেই পারে না (বরং বিভিন্ন মাধ্যমে লাভ হয়), আর মাধ্যমগুলোর জ্ঞান তা অস্তিত্বে আসার পূর্বে মানুষের জন্য সম্ভবই নয়, এই কারণে সেসবের পরিপূর্ণ জ্ঞান তাদের সর্বদা হাসিল হয় না— তাই তারা খোদাকে নিজেদের উপর কিয়াস করে এবং ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হতে দেখে আল্লাহর জ্ঞানের ব্যাপারে অনিত্যতার সন্দেহে পড়ে যায় এবং এই কারণে পেরেশান হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ, যারা উল্লিখিত সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত, তারা উল্লিখিত পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হন।

১. পূর্ব থেকেই হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কাবাগৃহ কেবলা হিসাবে নির্ধারিত ছিল। মাঝখানে সাময়িকভাবে পরীক্ষার নিমিত্ত আল্লাহ তাআলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে কেবলা নির্ধারিত করেন।

জানা কথা, পরীক্ষা এমন বিষয়েই হয়ে থাকে যা নফসের জন্য কঠিন। তাই আল্লাহ তাআলা এখানে বলেন যে, কাবার স্থলে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কেবলা বানানো লোকদের কাছে ভারী মনে হল। সাধারণ মুসলমানদের নিকট ভারী এজন্য মনে হল, যেহেতু তারা সাধারণত আরব ও কুরায়শ বংশীয় ছিলেন এবং কাবার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাদেরকে স্বীয় মানসিকতা, সংস্কৃতি ও অভ্যাসের খেলাফ করতে হল। আর বিশিষ্ট লোকদের ঘাবড়ানোর কারণ এই ছিল যে, এটা মিল্লাতে ইবরাহীমের খেলাফ ছিল, অথচ তাদের প্রতি এই মিল্লাতেরই অনুসরণের নির্দেশ ছিল। আর যারা সবিশেষ লোক ছিলেন, যাঁদেরকে সুস্থ্য মানসিকতা ও সৎকর্মের স্তরসমূহের মধ্যে পার্থক্যকরণের যোগ্যতা দান করা হয়েছিল—তাঁরা কাবার পরে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করাকে এমন ভেবেছিলেন, যেন 'তরক্কির গতি উল্টো দিকে বইছে!'

পক্ষান্তরে, যাঁরা হেকমত ও গুপ্তভেদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং অন্তর্দৃষ্টির আলোকে কাবা ও বাইতুল মুকাদ্দাসের তাৎপর্যের ভিন্নতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তাঁরা জানতেন যে, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে যেহেতু সকল নবীর সর্বগুণের সমন্বয় ঘটেছে এবং তাঁর রেসালত যেহেতু সকল জাতি ও গোটা পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত, তাই বাইতুল মুকাদ্দাসও সাময়িকভাবে কেবলারূপে গৃহীত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এ কারণেই

إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম দয়ালু, অতি মেহেরবান[১]।

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

১৪৪. নিশ্চয় আমি আপনার মুখ বার বার আকাশের দিকে উঠতে দেখছি। সুতরাং আমি অবশ্যই আপনাকে সেই কেবলার দিকে ফিরিয়ে দেব, যা আপনি পছন্দ করেন[২]। এখন আপনি আপনার মুখ

শবে মেরাজে পূর্ববর্তী সকল নবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তারপর বাইতুল মুকাদ্দাসকে কেবলারূপে গ্রহণ করারও হুকুম হয়। (الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ এর দ্বারা এই শেষোক্ত লোকেরাই উদ্দেশ্য)।

১. **শানে নুযূল**

ইহুদীরা বলল, 'কাবা আসল কেবলা হলে এতদিন বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে যত নামায পড়া হয়েছে, তা বিনষ্ট হয়েছে।' কতক মুসলমানেরও সন্দেহ হল, বাইতুল মুকাদ্দাস আসল কেবলা না হওয়ায় যে সকল মুসলমান ঐ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন তারা তো পূর্ণ ছওয়াব পাননি, বাকী যারা জীবিত রয়েছেন তাঁরা তো ভবিষ্যতে এর প্রতিকার করে নিতে পারবেন। এ সন্দেহ নিরসনের জন্য বর্তমান আয়াত নাযিল হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৪০) যাতে বলা হয়েছে যে, তোমরা যেহেতু শুধুমাত্র ঈমানী দাবি ও খোদায়ী হুকুমের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের কারণে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েছ, তাই তোমাদের বিনিময় ও ছওয়াবের মধ্যে কোন রকমের ক্ষতি হবে না।

২. **শানে নুযূল**

যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসল কেবলা ও তাঁর মহান গুণাবলির উপযোগী কেবলা কাবাগৃহ ছিল এবং এই কাবাগৃহই সকল কেবলা থেকে উত্তম এবং হযরত ইবরাহীম আ.-এরও কেবলা ছিল, তাছাড়া ইহুদীরা দোষারোপ করে বলত যে, এই নবী শরী'য়তের দিক থেকে আমাদের বিরোধী এবং মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কেবলা অবলম্বন করলেন কেন? এসব কারণে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায পড়াকালেও তাঁর আন্তরিক কামনা ছিল, কাবার দিকে মুখ করার নির্দেশ আসুক। আর অন্তরের এরূপ কামনার আতিশয্যে তিনি আসমানের দিকে বার বার মুখ তুলতেন, হয়ত বা ফেরেশতা আদেশ নিয়ে আসছেন। এই প্রেক্ষাপটেই বর্তমান আয়াত নাযিল হয় এবং কাবার প্রতি মুখ করার নির্দেশ আসে। (তাফসীরে তবারী ২/৬৫৭-৬৫৮)

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝

মসজিদুল হারামের দিকে ফেরান[১]। আর তোমরা যেখানেই থাক, তারই দিকে তোমাদের মুখ ফেরাও[২]। আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা অবশ্যই জানে যে, এ বিধানই সত্য, তাদের রবের পক্ষ থেকে। আর তারা যা কিছু করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন[৩]।

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَاۤ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ

১৪৫. আপনি যদি কিতাবীদের কাছে সকল নিদর্শনও উপস্থিত করেন, তবুও ওরা আপনার কেবলার অনুসরণ করবে না এবং আপনিও ওদের কেবলার অনুসরণ করতে পারেন না। আর ওরা একে অপরের

---

১. অর্থাৎ কাবার দিকে মুখ করুন। আর একে 'মসজিদুল হারাম' এজন্য বলা হয় যে, সেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা, পশু শিকার করা, ঘাস-বৃক্ষ কাটা প্রভৃতি হারাম। মসজিদুল হারামের যে পরিমাণ মর্যাদা ও সম্মান, তা আর কোন মসজিদের নেই।

কেবলা পরিবর্তনের এ হুকুম নাযিল হওয়ার সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী সালিমার মসজিদে জামাতসহ জোহরের নামায পড়ছিলেন। প্রথম দু'রাকাত বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে পড়েছেন। এ অবস্থায় (হুকুম এসে যাওয়ায়) নামাযের মধ্যেই তিনি ও সকল মুক্তাদী কাবার দিকে মুখ করে নিলেন এবং বাকী দু'রাকাত পুরা করলেন। এতে বনী সালিমার এই মসজিদের নাম 'মসজিদুল কেবলাতাইন' বা 'যূ-কেবলাতাইন' অর্থাৎ দুই কেবলাবিশিষ্ট মসজিদ হয়ে গেল।

২. অর্থাৎ সফরে বা ঘরে, মদীনায় বা অন্য শহরে, স্থলে বা জলে, এমন কি স্বয়ং বাইতুল মুকাদ্দাসে- যেখানেই তোমরা থাক না কেন, কাবার প্রতি মুখ করে নামায পড়বে।

৩. অর্থাৎ কেবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে কিতাবীদের সমালোচনার মোটেই পরোয়া করবেন না। কেননা (ওদের) কিতাবের মাধ্যমে ওরা জানে যে, আখেরী যমানার নবী কিছু দিনের জন্য বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায পড়বেন এবং পরিশেষে কাবার দিকেই মুখ করে নামায পড়বেন। আর এও ওদের জানা আছে যে, তাঁর আসল ও চিরস্থায়ী কেবলা মিল্লাতে ইবরাহীমের মত কাবাই হবে। এ জন্য কেবলার এই পরিবর্তনকে ওরাও সত্য জানে। শুধু হিংসার বশবর্তী হয়ে যা বলতে চায় বলুক।

আর আল্লাহ তাআলা ওদের খুব ভাল করে জানেন, যার ফলাফল একদিন ওদের জানা হয়ে যাবে।

قِبۡلَةَ بَعۡضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعۡتَ اَهۡوَآءَهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الۡعِلۡمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيۡنَ ۘ

কেবলারও অনুসরণ করে না[১]। আর যদি আপনি ওদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন আপনার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পরও, তবে তখন অবশ্যই আপনিও অন্যায়কারীদের মধ্যে গণ্য হবেন[২]।

اَلَّذِيۡنَ اٰتَيۡنٰهُمُ الۡكِتٰبَ يَعۡرِفُوۡنَهٗ كَمَا يَعۡرِفُوۡنَ اَبۡنَآءَهُمۡ ؕ وَاِنَّ فَرِيۡقًا مِّنۡهُمۡ لَيَكۡتُمُوۡنَ الۡحَقَّ وَهُمۡ يَعۡلَمُوۡنَ ۘ

১৪৬. আমি যাদের কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে তদ্রূপ চেনে, যেরূপ আপন পুত্রদের চেনে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি দল জেনেশুনে সত্য গোপন করে।

---

১. অর্থাৎ কাবার প্রকৃতই কেবলা হওয়াকে সত্য জেনেও কিতাবধারীরা হিংসা ও শত্রুতাবশত সত্য গোপন করছে। এ অবস্থায় ওরা আপনার কেবলা গ্রহণ করবে—এ আশা আপনি কিছুতেই করতে পারেন না। ওরা তো এমন গোঁড়া ও হিংসাপরায়ণ যে, আপনি যদি সম্ভাব্য সকল নিদর্শনও দেখিয়ে দেন, তবু আপনার কেবলাকে ওরা গ্রহণ করবে না। ওরা বরং এই দূরাশায় আছে যে, কোন রকমে আপনাকে ওদের অনুসারী বানাতে পারে কি না। সে জন্যই ওরা বলত, 'আমাদের কেবলার উপর যদি আপনি অটল থাকতেন তবে বুঝতাম যে, আপনি সত্যিই প্রতিশ্রুত নবী।' ওরা আশা করত, হয়ত আপনি ওদের কেবলার প্রতি প্রত্যাবর্তন করবেন। এ ওদের অবাস্তব ধারণা ও অর্থহীন লালসা। আপনি কস্মিনকালেও ওদের কেবলার অনুসরণ করতে পারেন না। কেননা, কিয়ামত পর্যন্ত কালের জন্য কাবাই কেবলা নির্ধারিত হয়েছে। এ নির্দেশ আর বাতিল হওয়ার নয়।

আর ওরা অন্যদেরকে আপন কেবলার অনুসারী বানানোর ইচ্ছা না হয় পরেই করুক, প্রথমে কিতাবধারীরা নিজেরাই কেবলার ব্যাপারে একমত হোক না দেখি। ইহুদীদের কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসের 'সাখরা' (অর্থাৎ বিশেষ পাথর), আর খ্রিস্টানদের কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসের পূর্বদিক, যেখানে হযরত ঈসা আ. এর রূহ (মাতৃগর্ভে) ফুঁকে দেওয়া হয়েছিল। ওরাই যেখানে পরস্পর একমত হতে পারছে না, সেখানে মুসলিমগণ তাদের পরস্পর বিরোধী কেবলার অনুসারী হয়ে যাবে—এই আশা করা নিতান্তই বোকামি।

২. অর্থাৎ ধরে নেওয়া যাক যে, আপনি, নাউযুবিল্লাহ, ওহীর নির্দেশনা ও সুনিশ্চিত জ্ঞানের বিপরীতে কিছুক্ষণের জন্য কিতাবধারীদের কেবলার অনুসরণ করে নিলেন, তবে আপনিও অবশ্যই অপরাধীদের মধ্যে পরিগণিত হবেন। বস্তুত এ নিন্দনীয় কর্ম কোন নবীর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। অতএব বোঝা গেল, আপনার দ্বারা আহলে-কিতাবের কেবলার অনুসরণ কখনো সম্ভব নয়। কারণ, এটা ইলমের সম্পূর্ণ পরিপন্থী অর্থাৎ মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা।

১৪৭. (এ-ই) সত্য, আপনার রবের পক্ষ থেকে। অতএব আপনি কিছুতেই সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না[১]।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ۝

১৪৮. প্রত্যেকেরই একটি দিক (অর্থাৎ কেবলা) রয়েছে, যেদিকে সে মুখ করে। অতএব তোমরা নেককাজে অগ্রগামী হও। তোমরা যেখানেই থাক, আল্লাহ তোমাদের সবাইকে (তাঁর নিকট) উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে শক্তিমান[২]।

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَمُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۚ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيْعًا ۚ اِنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۝

১৪৯. আপনি যেখান থেকেই বের হন, আপনার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফেরান। নিশ্চয় এ-ই সত্য, আপনার রবের পক্ষ থেকে। আর তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ۝

---

১. অর্থাৎ আপনার এ ধারণা হতে পারে যে, কাবার মুসলমানদের কেবলা হওয়াকে যদি আহলে কিতাবও স্বীকার করে নিত এবং ওরা অন্য লোকদের সন্দেহের মধ্যে ফেলতে সচেষ্ট না হত, তবে আপনিই যে প্রতিশ্রুত নবী তাতে কারো দ্বিধা-সন্দেহ হত না। কিন্তু আপনি জেনে রাখুন, আপনার সম্পর্কে আহলে কিতাবের পুরাপুরি ইলম রয়েছে। আপনার বংশ, গোত্র, জন্মস্থান, বাসস্থান, আকার-আকৃতি, গুণাবলি ও হাল-অবস্থা সবই ওরা জানে, যে কারণে আপনার প্রতিশ্রুত নবী হওয়ার বিষয়ে ওদের এমন স্থির বিশ্বাস রয়েছে, যেমন ওরা হাজার ছেলের মধ্যে নিজ পুত্রদের বিনাদ্বিধায় চেনে। কিন্তু ওদের কিছু লোক এ কথা স্বীকার করে বটে, বাদ-বাকীরা জেনেশুনে সত্যকে গোপন করে। গোপন করলে কী হবে, সত্য তা-ই যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসে। আহলে কিতাব মানুক আর নাই মানুক, ওদের বিরোধিতার কারণে কোন রকমের দ্বিধা করবেন না।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উম্মতের জন্য এক একটি কেবলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যার দিকে তারা ইবাদতের সময় স্বীয় মুখ ফেরাত।

অথবা অর্থ এই যে, মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায় কাবার বিভিন্ন দিকে রয়েছে, কেউ পূর্বে, কেউ পশ্চিমে। তো এ নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করা নিরর্থক এবং স্বীয় কেবলা বা নিজ দিকের উপর জেদ ধরা অর্থহীন। যেসব নেককর্ম উদ্দেশ্য ও কাম্য, সেগুলির প্রতি বরং অগ্রসর হও এবং এই বিতর্ক পরিত্যাগ কর। যে স্থান ও যে কেবলা এবং কাবার যে দিকেই তোমরা থাক না কেন, তোমাদের সকলকে আল্লাহ তাআলা হাশরের ময়দানে এনে উপস্থিত করবেন এবং তোমাদের নামায একই কেবলার দিকে হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। সুতরাং এমন বিষয়ে ঝগড়া করছ কেন?

১৫০. আপনি যেখান থেকেই বের হন, আপনার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফেরান। আর তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের মুখ তারই দিকে ফেরাও[১], যাতে তোমাদের সঙ্গে লোকদের বিতর্ক করার সুযোগ না থাকে*; তবে ওদের মধ্যে যারা বেইনসাফ, (ওরা ক্ষান্ত হবে না)। অতএব ওদের ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর[২]। আর

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۤ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۤ فَلَا تَخْشَوْهُمْ

---

১. **একই হুকুম বারবার দেওয়ার কারণ**

কেবলা পরিবর্তনের হুকুম দু'তিন বার সম্ভবত এ জন্য বয়ান করা হয়েছে যে, তার কারণ একাধিক ছিল এবং প্রত্যেকটি কারণ বাতানোর জন্য এ হুকুমের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যেমন, قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ الخ আয়াত থেকে জানা যায় যে, স্বীয় রাসূলের সন্তুষ্টিসাধন ও মর্যাদা প্রকাশার্থে আল্লাহ তাআলা কেবলা পরিবর্তনের হুকুম দিয়েছেন। আর وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا দ্বারা জানা যায়, আল্লাহ তাআলার নিয়মই এই যে, প্রত্যেক মিল্লাত ও স্বতন্ত্র শরী'য়তধারী রাসূলের জন্য তাঁর উপযুক্ত কেবলা নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ আয়াত থেকে জানা যায় যে, উল্লিখিত হুকুম এ জন্য দিয়েছেন, যাতে বিরোধীদের অভিযোগ করার সুযোগ না থাকে।

অথবা বারবার উক্ত হুকুমের পুনরাবৃত্তির কারণ, প্রথমত কেবলার বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তাআলার আহকামে 'নসখের' যে বিষয় আছে তা বেকুবদের বুদ্ধিবহির্ভূত ছিল। তদুপরি কেবলা পরিবর্তনের হুকুমই শরী'য়তে মুহাম্মাদীতে সর্বপ্রথম নসখের বিষয়। এ জন্য বারবার হুকুমটি বর্ণনা করা যথার্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

অথবা এ পুনরাবৃত্তির কারণ এই যে, উক্ত হুকুমসম্বলিত প্রথম আয়াতে অবস্থার ব্যাপকতা, দ্বিতীয় আয়াতে স্থানের ব্যাপকতা এবং তৃতীয়টিতে সময়ের ব্যাপকতা বোঝানো উদ্দেশ্য।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যাতে (বিরোধী) লোকদের তোমাদের বিপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ না থাকে'।

২. অর্থাৎ কাবার দিকে মুখ করতে এজন্য হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, তাওরাতে আছে— হযরত ইবরাহীম আ.-এর কেবলা ছিল কাবাগৃহ এবং আখেরী যমানার নবীকেও তারই দিকে মুখ করতে হুকুম দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় কাবার দিকে মুখ করার হুকুম না হলে ইহুদীরা অবশ্যই অভিযোগ করত। অন্যদিকে মক্কার মুশরিকরাও বলত, হযরত ইবরাহীমের কেবলা ছিল কাবা, আর এই নবী মিল্লাতে-ইবরাহীমের অনুসারী হওয়ার দাবি করেও কেবলার বিষয়ে অন্যথা করেন কেন? সুতরাং কাবাকে কেবলা বানানোর হুকুমের পর কোনো দলেরই আর বিতর্ক করার সুযোগ থাকল না।

وَاخْشَوْنِيْ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

(কাবা শরীফকে কেবলা নির্ধারণ করেছি) এ জন্যও, যাতে আমি তোমাদের প্রতি আমার নে'য়ামত পূর্ণ করি এবং যাতে তোমরা সরল পথ পাও[১]।

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ

১৫১. যেমন, আমি তোমাদের মাঝে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তোমাদের পরিশুদ্ধ করেন, তোমাদেরকে কিতাব ও গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেন এবং তোমাদের এমনসব বিষয় শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না[২]।

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

১৫২. অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ রাখ, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব। আর আমার শোকর কর এবং আমার না-শোকরী করো না[৩]।

اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ

কিন্তু যারা বেইনসাফ, ওরা এর পরও কিছু না কিছু অভিযোগ করতেই থাকবে। যেমন কুরায়শরা বলবে, আমাদের কেবলা যে সত্য, এ কথা তিনি এখন জেনেছেন ও গ্রহণ করেছেন। এমনিভাবে ক্রমান্বয়ে আমাদের অপরাপর বিষয়ও মঞ্জুর করে নিবেন। আর ইহুদীরা বলবে, আমাদের কেবলার সত্যতা প্রকাশ পাওয়া ও গ্রহণ করে নেওয়ার পর শুধুমাত্র হিংসা ও স্বার্থপরতার কারণে নিজ মতে তা বর্জন করলেন।

(আল্লাহ বলেন,) তো, এমন অপরাধী চক্রের প্রতিবাদের কোনই পরোয়া তোমরা করো না, বরং আমার হুকুমের অনুসারী থাক।

১. অর্থাৎ উক্ত কেবলা আমি তোমাদের জন্য এই কারণে নির্ধারণ করেছি, যাতে তোমরা দুশমনদের দোষারোপ থেকে রক্ষা পাও এবং তার ফলে তোমরা আমার নে'য়ামত, বরকতরাশি, নূরসমূহ ও হেদায়াতের অধিকারী হও।

২. অর্থাৎ ইতিপূর্বে যেমন তোমাদের থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়ে তোমাদের প্রতি নে'য়ামত ও হেদায়াতের পূর্ণতা সাধন করেছি, যিনি আল্লাহ তাআলার আহকাম তোমাদের বোঝাবেন এবং তোমাদেরকে মন্দ বিষয়াদি থেকে পবিত্র করবেন, মোট কথা, ইলম ও আমল উভয় দিক থেকে তোমাদের কামেল বানিয়ে দিবেন— তেমনি এখন কাবাকে কিবলা নির্ধারণের মাধ্যমেও তোমাদের প্রতি আমার দান ও নির্দেশনা পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে।

৩. অতএব এখন তোমাদের অবশ্য কর্তব্য এই যে, তোমরা মুখে, অন্তরে, জল্পনায়, কল্পনায়– সব রকমে আমাকে স্মরণ কর এবং মান্য কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব অর্থাৎ নিত্য নতুন রহমত ও অনুগ্রহ তোমাদের উপর বর্ষণ করতে থাকব। আর আমার

[রুকূ - ১৯]

১৫৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের সাহায্য গ্রহণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন[১]।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اسۡتَعِيۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيۡنَ ۝

১৫৪. যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তোমরা তাদের সম্বন্ধে বলো না যে, '(তারা) মৃত', বরং (তারা) জীবিত, কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না[২]।

وَلَا تَقُوۡلُوۡا لِمَنۡ يُّقۡتَلُ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اَمۡوَاتٌ ؕ بَلۡ اَحۡيَآءٌ وَّلٰـكِنۡ لَّا تَشۡعُرُوۡنَ ۝

১৫৫. আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং ধন-সম্পদ, জান-প্রাণ ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা[৩]। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের—

وَلَنَبۡلُوَنَّكُمۡ بِشَىۡءٍ مِّنَ الۡخَـوۡفِ وَالۡجُـوۡعِ وَنَقۡصٍ مِّنَ الۡاَمۡوَالِ وَالۡاَنۡفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيۡنَ ۝

নে'য়ামতের শোকর খুব করে আদায় করতে থাক এবং আমার নাশোকরী ও নাফরমানী থেকে বাঁচতে থাক।

১. পূর্ববর্তী আয়াতে আদেশ করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার যিক্র ও শোকর কর এবং তাঁর নাশোকরী ও নাফরমানী থেকে বেঁচে থাক। বস্তুত এই হুকুমের মধ্যে সকল সৎকর্মসমূহ পালন করা ও শরীয়ত-গর্হিত কাজসমূহ থেকে বেঁচে থাকা অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয় এটা এক কঠিন ব্যাপার। তাই উপরোক্ত হুকুম সহজে পালন করা যায় কীভাবে, তার জন্য বলা হয়েছে, সবর ও নামায দ্বারা আল্লাহর সাহায্য হাসিল কর। কারণ, অবিরাম এই দুই বস্তুর অনুশীলন দ্বারা তোমাদের জন্য সকল বিষয় সহজ করে দেওয়া হবে।

আয়াতে এই ইঙ্গিতও রয়েছে যে, জেহাদে কষ্ট সহ্য করতে হবে। কেননা, জেহাদের মধ্যে ধৈর্য ধারণের বড় ফজীলত রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তার উল্লেখ রয়েছে।

২. যারা আল্লাহর জন্য প্রাণ দিয়েছে তারা পরজগতে জীবিত রয়েছে, কিন্তু তাদের জীবন ও এর অবস্থা সম্পর্কে তোমাদের জানা নেই। আর এ সবই সবরের সুফল।

৩. যারা ধৈর্যের সর্বোচ্চ মর্তবা হাসিল করেছে, প্রথমে তাদের অর্থাৎ শহীদদের কথা বলা হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে যে, তোমাদের সকলেরই অল্প-স্বল্প কষ্ট-মুসিবত দ্বারা সময় সময় পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং তোমাদের ধৈর্য কেমন তা দেখা হবে। ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া কোন সহজ কথা নয়, তাই পূর্বেই সতর্ক করে দেওয়া হল।

১৫৬. যারা, তাদের উপর কোন বিপদ আসলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহর এবং আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব।'

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝

১৫৭. এমন লোকদেরই উপর বর্ষিত হয় তাদের রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহরাজি ও মেহেরবানী এবং তারাই সরল পথপ্রাপ্ত[১]।

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ۝

১৫৮. নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত[২]। অতএব যে কেউ বাইতুল্লাহর হজ করবে বা উমরা করবে, তার কোন গোনাহ নেই এ দুয়ের তওয়াফ করায়[৩]। আর যে কেউ নিজ খুশীতে

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا

১. অর্থাৎ যারা বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করল এবং নে'য়ামতরাজির নাশোকরী করল না, বরং বিপদাপদকে যিক্‌র ও শোকরের ওসীলা হিসাবে গ্রহণ করল, তাদেরকে– হে আমার প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!)– আমার পক্ষ থেকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

২. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

ইতিপূর্বে কাবার দিকে মুখ করার এবং তা যে সর্বোত্তম কেবলা, সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন, কাবা যে হজ ও উমরার স্থান, সে কথা বলা হচ্ছে, যাতে وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ এর সত্যতা ও পূর্ণতা খুব করে প্রকাশ পায়।

অথবা এরূপ বলা যায়, ইতিপূর্বে ধৈর্যের ফযীলতের উল্লেখ হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে যে, 'সাফা' ও 'মারওয়া' যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং হজ ও উমরা করতে এই পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সায়ী' করা যে জরুরী— এর একমাত্র কারণ, এ কাজটি ধৈর্যশীলদের অর্থাৎ হযরত হাজেরা ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈলের স্মৃতিচিহ্নসমূহের অন্যতম। হাদীস, তাফসীর ও ইতিহাসে এই বিখ্যাত ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, যা দেখে اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ এর সত্যতা স্বীকার করতে হয়।

৩. **শানে নুযূল**

সাফা ও মারওয়া মক্কায় (কাবা শরীফের নিকটে) অবস্থিত দুটি ছোট পাহাড়। হযরত ইবরাহীম আ.-এর সময় থেকে আরববাসীরা হজ করে এবং সেই উপলক্ষে তারা উক্ত পাহাড় দুটির তওয়াফ করত। ইসলাম-পূর্বকালে কাফেররা এ দুটি পাহাড়ের উপর দুটি মূর্তি রেখে তার ভক্তি করত এবং এ তওয়াফকে মূর্তিদুটির সম্মানার্থে মনে করত। যখন লোকেরা মুসলমান হয়ে মূর্তিপূজা থেকে তওবা করল তখন খেয়াল হল, সাফা-মারওয়ার তওয়াফ ছিল উক্ত মূর্তিদ্বয়ের সম্মানার্থে, আর মূর্তিপূজাই যখন হারাম হয়ে গেল তখন সাফা-মারওয়ার তওয়াফও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। তাদের জানা ছিল না যে, সাফা-মারওয়ার তওয়াফ বস্তুত হজের উদ্দেশ্যেই ছিল। কাফেররা অজ্ঞতাবশত সেখানে মূর্তি স্থাপন

فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

নেককাজ করবে, তো আল্লাহ অবশ্যই গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. যারা আমার নাযিলকৃত স্পষ্ট বিধানাবলি ও পথনির্দেশক বিষয়াদি গোপন করে, আমি মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়ার পরও[১]– তাদের আল্লাহ লা'নত করেন এবং তাদের লা'নত করে অন্যান্য লা'নতকারীও[২]।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

১৬০. তবে যারা তওবা করে, (নিজেদের) সংশোধন করে এবং (সত্য বিষয়) প্রকাশ করে দেয়, আমি তাদের তওবা কবুল করি[৩]। আর আমিই অত্যধিক তওবা কবুলকারী, অতি মেহেরবান।

করেছিল, যা এখন অপসারিত হয়ে গেছে। আর মদীনার আনসারগণ যেহেতু কুফরীর যমানাতেও সাফা-মারওয়ার তওয়াফকে মন্দ জানত, তাই মুসলমান হওয়ার পরও এই তওয়াফে তাদের দ্বিধাবোধ হল এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলেন, আমরা পূর্ব থেকে একে মন্দ বলে জানি।

এসব কারণে বর্তমান আয়াত নাযিল হল এবং উক্ত উভয় দলকেই বলে দেওয়া হল, সাফা-মারওয়ার তওয়াফে কোনই গোনাহ ও খারাবী নেই। এগুলি মূলত আল্লাহর নিদর্শন, এদের তওয়াফ করা উচিত। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৭৯০; তাফসীরে তবারী ২/৭১৭)

১. এ দ্বারা ইহুদীরা উদ্দেশ্য। তাওরাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা ও পরিচয়ের যেসব কথা ছিল, তা এবং কেবলা পরিবর্তনের বিষয় ইত্যাদি ওরা গোপন করত। দুনিয়ার স্বার্থে যারা যারা আল্লাহ তাআলার হুকুম গোপন করে, তাদের সকলের প্রতিও এই আয়াত প্রযোজ্য।

২. লা'নতকারী দ্বারা মানুষ, জিন, ফেরেশতা বরং সকল জীবজন্তু বোঝানো হয়েছে। কারণ, সত্য গোপনের শাস্তিস্বরূপ যখন জগতের বুকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও নানা রকমের বিপদ আপতিত হয়, তখন পশু-পক্ষী বরং জড়পদার্থের পর্যন্ত কষ্ট হয়। ফলে তারা সকলে সত্য গোপনকারীদের অভিশাপ করে।

৩. অর্থাৎ যদিও সত্য গোপনের ফলে কতক মানুষ গোমরাহীতে পতিত হল, কিন্তু যখন তারা সত্য গোপনের অপরাধ থেকে তওবা করে সত্যকে পুরাপুরি প্রকাশ করে দিল, তখন আমি অভিশাপের স্থলে তাদের উপর রহমত নাযিল করি। কেননা, আমি বড়ই তওবা কবুলকারী ও দয়ালু।

১৬১. যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষ– সকলের লা'নত[১]—

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾

১৬২. যার মধ্যে ওরা চিরকাল থাকবে। ওদের উপর থেকে আযাব লাঘব করা হবে না এবং ওদের অবকাশও দেওয়া হবে না[২]।

خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

১৬৩. তোমাদের (সকলের) মা'বূদ এক মা'বূদ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। (তিনি) সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু[৩]।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

---

১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজে সত্য গোপন করল অথবা অন্যে সত্য গোপন করায় পথভ্রষ্ট হল এবং শেষ পর্যন্ত কাফেরই রইল, তওবা নসীব হল না—সে সর্বদার জন্য অভিশপ্ত ও জাহান্নামী হল। কেননা, মৃত্যুর পর তওবা কবুল হয় না। পক্ষান্তরে, প্রথমোক্ত দল দুনিয়ায় থাকতেই তওবা করার ফলে অভিশাপমুক্ত হয়ে গেল।

২. অর্থাৎ ওদের উপর শাস্তি সর্বদা একই রকম ও অবিরাম থাকবে, আযাবের কোন রকম হ্রাস ও ঘাটতিও হবে না, আর তা থেকে কিছু সময়ের জন্য নিষ্কৃতিও পাবে না।

৩. অর্থাৎ তোমাদের সকলের প্রকৃত মা'বূদ একজন, এখানে একাধিক্যের অবকাশই নেই। অতএব যে ব্যক্তি এই মাবূদের অবাধ্য হল, সে একেবারে অভিশপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। যদি দ্বিতীয় কোন মা'বূদ থাকত, তবে তার দ্বারা লাভের আশা করা যেত। এ তো আর প্রভু-দাস, রাজা-প্রজা, উস্তাদ-শাগরেদ, পীর-মুরীদের সম্পর্ক নয় যে, এক স্থানে সুবিধা না হলে অন্যত্র চলে গেলাম। এ হল রুবূবিয়ত ও খোদায়ী। সেই এক মা'বূদ ছাড়া আর কাউকে মা'বূদ বানাতে পার না এবং তাঁকে ছাড়া আর কারো নিকট থেকে ভালর আশাও করতে পার না।

শানে নুযূল

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর মক্কার কাফেররা এ কথা ভেবে আশ্চর্য হল যে, সমগ্র বিশ্বজগতের মা'বূদ ও সকলের কার্যসম্পাদনকারী একজন কী করে হতে পারে, এর প্রমাণ কী? তাতে পরবর্তী আয়াত إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ الخ নাযিল হয়। এতে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরতের বর্ণনা দিয়েছেন। (তাফসীরে তবারী ৩/৫-৬)

[রুকূ - ২০]

১৬৪. নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের আবর্তনে, জলযানসমূহে যা মানুষের জন্য উপকারী দ্রব্যাদি নিয়ে সাগরে চলাচল করে, সেই পানিতে যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেন, অতঃপর তার দ্বারা ভূমিকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন এবং পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দেন সকল প্রকার প্রাণী, বায়ুর (দিক) পরিবর্তন করাতে এবং মেঘমালাতে, যা আসমান ও যমীনের মাঝখানে (আল্লাহ কর্তৃক) নিয়ন্ত্রিত— নিঃসন্দেহে (এসবের মধ্যে) বহু নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য[১]।

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾

১৬৫. মানুষের মধ্যে কতক এমন, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে (তাঁর) এমন সমকক্ষ সাব্যস্ত করে[২] যে, আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায়

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ

১. অর্থাৎ এ রকম বিশাল, সুউচ্চ ও স্তম্ভহীন আকাশ সৃষ্টি করার মধ্যে, এ রকম বিস্তীর্ণ ও মজবুত পৃথিবী সৃষ্টি করে একে পানিবেষ্টিত সাগর-মহাসাগরের মধ্যে বিস্তৃত করার মধ্যে, রাত-দিনের পরিবর্তন ও ছোট-বড় হওয়ার মধ্যে, সমুদ্রবক্ষে জাহাজসমূহের চলাফেরার মধ্যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষণে এবং এর দ্বারা মৃত পৃথিবীকে শ্যামল ও সজীব করণে এবং এর দ্বারা সকল জীবজন্তুর বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধির মধ্যে, বিভিন্ন দিক থেকে বায়ুর গতি পরিবর্তনের মধ্যে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে মেঘমালা ঝুলিয়ে রাখার মধ্যে— বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোকদের জন্য আল্লাহ তাআলার একত্ব, তাঁর কুদরত, হেকমত ও রহমতের বিপুল ও বিস্তর প্রমাণ রয়েছে।

বি. দ্র. لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ এর মধ্যে আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তার একত্ব এবং الرحمن الرحيم এর মধ্যে তাঁর গুণাবলির একত্বের প্রমাণ ছিল। আর বর্তমান আয়াত দ্বারা কার্যাদিতে তাঁর একত্ব প্রমাণিত হল। ফলে মুশরিকদের সন্দেহাদি সম্পূর্ণ নিরসন হয়ে গেল।

২. অর্থাৎ, জ্ঞান-বুদ্ধির দিক দিয়ে সৃষ্টির সেরা হওয়া সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা উল্লিখিত প্রকাশ্য প্রমাণাদির পরও আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে তাঁর শরীক ও সমতুল্য বানায়।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ۭ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ۝

তাদের ভালবাসে[১]। আর যারা ঈমানদার, তারা আল্লাহকে অনেক বেশি ভালবাসে[২]। এই জালেমরা যদি সেই সময়টি দেখত, যখন এরা আযাব প্রত্যক্ষ করবে (এবং বুঝে নেবে) যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহরই এবং আল্লাহর আযাব অতি কঠিন- (তবে এরা কিছুতেই আল্লাহর সাথে শিরক করত না)*[৩]।

---

১. অর্থাৎ শুধু কথায় ও শাখাগত কাজেই ওদেরকে আল্লাহ তাআলার সমকক্ষ মানে তা নয়, বরং সকল আমলের উৎসস্থল যেই অন্তর, সেই অন্তরের ভালবাসার মধ্যে পর্যন্ত সেই শিরক ও সমতাকে স্থান দিয়ে রেখেছে। বলা বাহুল্য, এ হচ্ছে শিরকের সর্বোচ্চ স্তর। আর আমলী শিরক তো এর অধীন ও অনুগত মাত্র।

২. অর্থাৎ স্বীয় উপাস্যদের প্রতি মুশরিকদের যে ভালবাসা রয়েছে, আল্লাহ তাআলার প্রতি মুমিনদের ভালবাসা তার চেয়ে অনেক বেশি ও মজবুত। কেননা, পার্থিব বিপদাপদে অনেক সময় মুশরিকদের ভালবাসায় ভাটা পড়ে, আর পরকালীন আযাব দেখে তো ওরা উপাস্যদের থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। যেমন পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে মুমিনদের ভালবাসা আল্লাহ তাআলার জন্য সর্বাবস্থায়— কষ্টে ও আরামে, অসুস্থতায় ও সুস্থতায় এবং ইহ ও পরকালে অটুট ও চিরস্থায়ী থাকবে। তদুপরি, আল্লাহ ছাড়া আর যারা রয়েছে যথা: নবী, ওলী, ফেরেশতা, আলেম, স্বীয় বাপ-দাদা, সন্তানসন্ততি, ধন-সম্পত্তি ইত্যাদি, তাদের প্রতি ভালবাসার চেয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমানদারদের ভালবাসা শতগুণ বেশি। কারণ, তারা আল্লাহ তাআলার প্রতি তাঁর মহান মর্যাদা অনুসারে খাঁটি ও দৃঢ় ভালবাসা রাখে আর অন্যদের প্রতি পরোক্ষ ও আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুসারে প্রত্যেকের মর্যাদানুপাতিক মহব্বত রাখে। যেমন, কবি বলেন–

گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی

অর্থাৎ 'পাত্র ভেদে পার্থক্য না করা যিন্দীক বা নাস্তিকের কাজ।'

ভালবাসার মধ্যে আল্লাহ ও গাইরুল্লাহকে সমতুল্য সাব্যস্ত করা– সে গাইরুল্লাহ যে-ই হোক, এ মুশরিকদেরই কাজ।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'কতই না ভাল হত যদি জালেমরা— যখন (এই দুনিয়াতেই) আযাব প্রত্যক্ষ করে তখন— এ কথা উপলব্ধি করে নিত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহরই এবং আল্লাহর আযাব অতি কঠিন!'

৩. অর্থাৎ যে সকল জালেম খোদার অংশীদার সাব্যস্ত করেছে, ওরা যদি ঐ আসন্ন সময়টি দেখত যখন ওরা আল্লাহ তাআলার আযাব প্রত্যক্ষ করবে (এবং বুঝবে) যে, সমস্ত শক্তিই আল্লাহ তাআলার, তাঁর আযাব থেকে কেউই (ওদের) রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ

১৬৬. (স্মরণ কর), যখন অনুসারীদের থেকে যাদের অনুসরণ করা হত তারা সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করবে এবং তারা (সকলে) আযাব দেখতে পাবে এবং তাদের পরস্পরের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে[১]।

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝١٦٦

১৬৭. আর অনুসারীরা বলবে, 'কত ভাল হত যদি আমাদের (দুনিয়াতে) প্রত্যাবর্তনের সুযোগ হত; তখন আমরাও ওদের থেকে আলাদা হয়ে যেতাম যেমন ওরা আমাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে[২]।' এভাবেই আল্লাহ ওদেরকে ওদের আমলগুলো দেখাবেন ওদের জন্য অনুতাপরূপে, আর ওরা কখনো আগুন থেকে বের হতে পারবে না[৩]।

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝١٦٧

[রুকূ - ২১]

১৬৮. হে মানুষ! পৃথিবীর বস্তুরাজি থেকে হালাল, পরিচ্ছন্ন বস্তু খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا

তাআলার আযাব অতি কঠিন—তা হলে কিছুতেই ওরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত ছেড়ে অন্যদের অভিমুখী হত না এবং তাদের থেকে উপকার লাভের আশাও করত না।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আযাব দেখে, যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা স্বীয় ভক্ত অনুসারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং মূর্তিপূজারী ও মূর্তি-প্রতিমার মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকবে না। একে অন্যের শত্রু হয়ে যাবে।

২. মুশরিকরা তখন বলবে, 'আমাদের যদি কোনভাবে দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ হত, তবে আমরাও ওদের থেকে প্রতিশোধ নিতাম এবং ওরা আজ যেভাবে আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে, আমরাও ওদের (সমুচিত) জওয়াব দিয়ে পৃথক হয়ে যেতাম'। কিন্তু এই অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার দ্বারা আফসোস ছাড়া আর কোনো লাভ হবে না।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আযাব ও স্বীয় মা'বূদদের অসন্তুষ্টি দেখে মুশরিকদের যেমন ভীষণ আফসোস হবে, তেমনি আল্লাহ তাআলা ওদের সব আমলকেও ওদের জন্য পরিতাপের বিষয় বানিয়ে দেবেন। কেননা, হজ, উমরা ও দান-খয়রাত যা কিছু সৎকর্ম ওরা করে থাকবে, সবই শিরকের কারণে নিষ্ফল হয়ে যাবে। আর যত শিরক ও গোনাহ করে থাকবে, তার প্রতিফলস্বরূপ শাস্তি পাবে। অতএব ওদের ভাল ও মন্দ কাজ সবই আফসোসের কারণ হবে এবং ওরা চিরকাল দোযখেই থাকবে। পক্ষান্তরে, কতক তাওহীদপন্থী ও ঈমানদাররা গোনাহর কারণে দোযখে গেলেও শেষ পর্যন্ত মুক্তি লাভ করবে।

طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۶۸﴾

অনুসরণ করো না;[১] নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۶۹﴾

১৬৯. সে তো তোমাদের কেবল কুকর্ম ও অশ্লীলতা এবং আল্লাহর প্রতি এমনসব বিষয় আরোপ করার আদেশ করে, যা তোমরা জান না[২]।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۷۰﴾

১৭০. যখন ওদের বলা হয়, 'তোমরা সেই বিধানের অনুসরণ কর যা আল্লাহ নাযিল করেছেন', তখন বলে, '(কখনই না), বরং আমরা তো তার অনুসরণ করব যার উপরে আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি।' আচ্ছা, যদি ওদের বাপ-দাদারা কিছু না বুঝে থাকে এবং সরল পথও না জেনে থাকে, (তবুও বাপ-দাদার অনুসরণ করবে!)[৩]?

---

১. আরববাসীরা মূর্তিপূজা করত এবং দেব-দেবীর নামে ষাঁড় (স্বাধীনভাবে) ছেড়ে দিত, অতঃপর এই প্রাণীগুলোর দ্বারা কোনো উপকার লাভ করাকে হারাম মনে করত।

এও এক ধরনের শিরক। কেননা, হালাল ও হারাম করার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। এই অধিকার অন্য কারো হাতে অর্পণ করার অর্থ—তাকে আল্লাহ তাআলার শরীক বানানো। তাই পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে শিরকের খারাবী বর্ণনা করার পর বর্তমান আয়াতে হালালকে হারাম করতে নিষেধ করা হচ্ছে।

আয়াতের সারার্থ এই যে, যমীনে যা কিছু উৎপন্ন হয় সেসব থেকে খাও। তবে শর্ত এই যে, তা শরী'য়ত অনুযায়ী হালাল ও পাক-পবিত্র হতে হবে। সত্ত্বাগতভাবেই বস্তুটি যেন হারাম না হয়, যেমন: মৃতপ্রাণী, শূকর এবং مَا أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ الله ('যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নিয়ে যবেহ করা হয়')। আর অন্য কোন সাময়িক কারণেও যেন হারাম না হয়ে থাকে– যেমন: ছিনতাই, চুরি, ঘুষ, সুদ ইত্যাদির মাল। এসব খাওয়া যাবে না। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না। উদাহরণস্বরূপ ওর অনুসরণে যা খুশী হারাম করে নিলে, যেমন দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেওয়া ষাঁড় ইত্যাদি; এবং যা ইচ্ছা হালাল করে নিলে, যেমন مَا أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ الله, প্রভৃতি।

২. অর্থাৎ শরী'য়তের মাসলা-মাসায়েল ও হুকুম-আহকাম নিজেদের পক্ষ থেকে তৈরি করে নিতে নির্দেশ দেয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিছু মানুষ শাখা বিষয়াদি অতিক্রম করে আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদিতেও শরী'য়তের স্পষ্ট বিধান বর্জন করে নিজেদের মনগড়া আহকাম তৈরি করে নেয় এবং কুরআন-হাদীসে ও সালাফের বক্তব্যে বিকৃতি সাধন করে।

৩. অর্থাৎ ওরা আল্লাহ তাআলার বিধানের মোকাবেলায় স্বীয় বাপ-দাদার অনুসরণ করে। আর এও শিরক। আফসোস! কোন কোন অজ্ঞ মুসলমানও বিধবা-বিবাহ বর্জনের মত (ইসলামবিরুদ্ধ)

১৭১. কাফেরদের অবস্থা ওই ব্যক্তির ন্যায়, যে এমন কিছুকে ডাকে যা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনে না[১]। (ওরা) বধির, বোবা, অন্ধ। সুতরাং ওরা কিছুই বোঝে না[২]।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ۚ صُمٌّ ۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

১৭২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ আহার কর, যা আমি তোমাদের দান করেছি এবং আল্লাহর শোকর কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদতকারী (তথা তাঁরই বান্দা) হয়ে থাক[৩]।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝

প্রথার ব্যাপারে অনুরূপ কথা বলে বসে। আর কতক লোক মুখে না বললেও কাজ-কর্ম দ্বারা এমনি মনোভাব প্রকাশ করে থাকে। এ সম্পূর্ণ ইসলামের পরিপন্থী।

১. অর্থাৎ এই কাফেরদের হেদায়াতের পথে ডাকা এরূপ, যেমন কেউ মাঠে পশুদের ডাকছে, যেগুলো শব্দ শোনা ছাড়া কিছুই বোঝে না। ঠিক এরূপ অবস্থা ওই লোকদের, যারা নিজেরা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না এবং জ্ঞানীদের কথা গ্রহণও করে না।

২. অর্থাৎ এই কাফেররা যেন বধির– হক কথা একেবারেই শোনে না; বোবা– হক কথা বলে না; এবং অন্ধ– সরল-সঠিক পথ দেখে না। সুতরাং ওরা কিছুই বোঝে না। কেননা, উল্লিখিত তিনটি শক্তিই যাদের নষ্ট হয়ে গেছে, ওরা বুঝবে কী করে?

৩. পবিত্র দ্রব্যাদি খাওয়ার হুকুম ইতিপূর্বে (আয়াত ১৬৮) বর্ণিত হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু মুশরিকরা শয়তানের অনুসরণ থেকে বিরত হত না, নিজেদের পক্ষ থেকে আহকাম তৈরি করে আল্লাহ তাআলার নামে চালিয়ে দিত, নিজ বাপদাদাদের বাতিল আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করত না এবং হক কথা বোঝার অবকাশই ওদের মধ্যে ছিল না— সেহেতু (আল্লাহ) বর্তমান আয়াতে ওদের কথা বাদ দিয়ে মুসলমানদের পবিত্র দ্রব্য-সামগ্রী খাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং স্বীয় নে'য়ামতের কথা প্রকাশ করে শোকর আদায় করার হুকুম করেছেন। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হয়ে গেল যে, ঈমানদারগণ আল্লাহ তাআলার বাধ্য ও প্রিয় এবং মুশরিকরা তাঁর অবাধ্য ও বিতাড়িত ।

১৭৩. আল্লাহ তো তোমাদের জন্য হারাম করেছেন কেবল মৃত জন্তু,[১] রক্ত,[২] শূকরের গোশ্‌ত[৩] এবং ওই জন্তু, যার উপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয়েছে[৪]।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

১. 'মৃত জন্তু' বলতে বোঝায় যা নিজে নিজে মরে গেছে এবং যবেহ করা হয়নি; অথবা শরী'য়ত-বিরোধী পন্থায় যবেহ বা শিকার করা হয়েছে, যেমন গলা টিপে মারা হয়েছে অথবা জীবিত জন্তুর অঙ্গ বিশেষ কেটে নেওয়া হয়েছে, অথবা পাথর, ধনুক ও বন্দুক দিয়ে মারা হয়েছে, অথবা উপর থেকে পড়ে বা কোন জন্তুর শিংয়ের আঘাতে মারা গেছে, অথবা হিংস্র জন্তুর আক্রমণে মরেছে, অথবা যবেহ করার সময় যবেহকারী স্বেচ্ছায় 'আল্লাহু আকবার' বলেনি। এ সবই মৃত ও হারাম জন্তু সাব্যস্ত হবে । অবশ্য হাদীস শরীফের হুকুম অনুযায়ী দুটি মৃত প্রাণী এ হারামের আওতাভুক্ত নয়– একটি মাছ, দ্বিতীয়টি পঙ্গপাল। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৫৭২৩)

২. রক্ত দ্বারা সেই রক্ত উদ্দেশ্য, যা রগ থেকে প্রবাহিত হয় এবং যবেহ করার সময় নির্গত হয়। আর যে রক্ত গোশতের সাথে জড়িয়ে থাকে, তা হালাল ও পাক। গোশ্‌ত না ধুয়ে রান্না করলে খাওয়া দুরস্ত, কিন্তু পরিচ্ছন্নতার পরিপন্থী। আর কলিজা ও প্লীহা জমাট রক্ত হলেও হাদীস শরীফের নির্দেশানুসারে এ দুটি হালাল। (সুনানে ইবনে মাজাহ্‌, হাদীস ৩৩১৪)

৩. শূকর চাই জীবিত হোক বা মৃত, অথবা শরী'য়তের নিয়মানুসারে যবেহকৃত হোক– সর্বাবস্থায় হারাম। এর সকল অংশ– মাংস, চামড়া, চর্বি, নখ, লোম, হাড়, লেজের সন্ধিস্থল সবই নাপাক। এ সবের দ্বারা কোন উপকার নেওয়া এবং কোন কাজে ব্যবহার করা হারাম। এস্থলে যেহেতু খাদ্যদ্রব্যাদির আলোচনা, তাই আয়াতে (শূকরের) শুধু মাংসের বিধান বর্ণিত হয়েছে।

শূকরের অপবিত্রতা

ফেকাহ-শাস্ত্রবিদদের সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী এই শূকর জন্তুটি– যা নির্লজ্জতা, লোভ-লালসা ও অপবিত্রতার প্রতি আসক্তিতে সকল জন্তু থেকে অগ্রসর, যে কারণে আল্লাহ তাআলা তার সম্পর্কে فَإِنَّهُ رِجْسٌ ('আগাগোড়া নাপাক') বলেছেন— নিঃসন্দেহে সত্তাগতভাবেই অপবিত্র। তাই এর কোন অঙ্গই যেমন পাক নয়, তেমনি এর দ্বারা কোন উপকার নেওয়াও জায়েয নয়। যে সকল লোক শূকর খেয়ে থাকে এবং এর বিভিন্ন অংশ দ্বারা উপকার নেয়, তাদের চরিত্রে পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়।

৪. مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ এর অর্থ—যে জন্তুসমূহের উপর আল্লাহ ছাড়া দেব-দেবীর নাম নেওয়া হয়, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন দেবতা বা জিন, কিংবা কোন খবীছ রূহ অথবা পীর বা পয়গম্বরের নাম নির্ধারণ করে ওই জন্তুর প্রাণ তাদের জন্য নযর (উৎসর্গ) করা হয় এবং তাদের নৈকট্য বা সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে তা যবেহ করা হয়। এসব জন্তু খাওয়া হারাম– তা 'আল্লাহু আকবার' বলে ও আল্লাহর নাম নিয়েই যবেহ করুক না কেন। কেননা, প্রাণকে

প্রাণের স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারো জন্য উৎসর্গ করা ও নৈবেদ্য করা কিছুতেই দুরুস্ত নয়। তাই যে জন্তুর প্রাণ গাইরুল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা হয়, তার অপবিত্রতা মৃত জন্তুর অপবিত্রতাকেও ছাড়িয়ে যায়। কারণ, মৃত প্রাণীতে খারাবী এতটুকু যে, তার প্রাণ আল্লাহর নামের সাথে বের হয়নি, আর مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ এর প্রাণ তো গাইরুল্লাহর জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে– যা একেবারে শিরক। অতএব শূকর, কুকুর তকবীর বলে যবেহ করলেও যেমন হালাল হতে পারে না এবং মৃত জন্তুর উপর আল্লাহ তাআলার নাম নিলেও যেমন কোন লাভ হতে পারে না, তেমনি যে জন্তুর প্রাণ গাইরুল্লাহর জন্য নির্ধারিত ও উৎসর্গ করা হয়েছে, তা যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নিলেও তাতে কস্মিনকালেও কোন লাভ বা তা হালাল হতে পারে না। অবশ্য গাইরুল্লাহর জন্য নির্ধারিত করার পর যদি স্বীয় নিয়ত দুরুস্ত করে তওবা করে নেয়, অতঃপর যবেহ করে, তবে নিঃসন্দেহে হালাল হয়ে যাবে।

এ ক্ষেত্রগুলিও 'গাইরুল্লাহর নামে যবেহ'-এর অন্তর্ভুক্ত

বিজ্ঞ আলেমগণ স্পষ্ট করে বলেছেন, কোন বাদশাহর আগমনে যদি তাকে সম্মান জ্ঞাপনের নিয়তে জন্তু যবেহ করা হয়, অথবা কোন জিনের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এর নামে জন্তু যবেহ করা হয়, অথবা কামান চলার জন্য বা ইটের পাঁজা যাতে পোড়ে সে জন্য নযরানাস্বরূপ জন্তু যবেহ করা হয়, তবে এসব জন্তু একেবারে মৃতবৎ ও হারাম। আর উক্ত আচরণকারী ব্যক্তি মুশরিক– যদিও যবেহ করার সময় আল্লাহ তাআলার নাম নেওয়া হোক। হাদীস শরীফে আছে لَعَنَ اللهُ مَن ذَبَحَ لِغَيرِ اللهِ (সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৯৭৮) অর্থাৎ গাইরুল্লাহর নৈকট্য লাভ ও সম্মান জ্ঞাপনের নিয়তে যে ব্যক্তি জন্তু যবেহ করবে, তার উপর আল্লাহ তাআলার অভিশাপ, যবেহ করার সময় আল্লাহ তাআলার পবিত্র নাম নেওয়া হোক বা না হোক। অবশ্য আল্লাহ তাআলার নামে যবেহ করে সেই জন্তুর গোশত ফকীর-মিসকীনকে খাওয়ালে এবং তার ছওয়াব কোন আত্মীয় অথবা পীর ও বুযুর্গকে পৌছালে, অথবা কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষে কুরবানী করে এর ছওয়াব তাকে দান করতে চাইলে তাতে কোন দোষ নেই। কেননা, এই যবেহ গাইরুল্লাহর নামে কিছুতেই নয়।

এমন ক্ষেত্রে কোন কোন বক্র চিন্তাধারী হিলা (বা অপকৌশল) করে এবং বলে যে, পীরদের নযর-মানতের মধ্যে আমাদের উদ্দেশ্য থাকে, খানা পাক করে মৃতের নামে সদকা করে দেওয়া। তো, প্রথমত তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাআলার সামনে মিথ্যা হিলা করায় ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। দ্বিতীয়ত, তাদের জিজ্ঞাসা করা হোক, তোমরা যে জন্তুটি আল্লাহ ছাড়া পীর-বুযুর্গের জন্য নযর করেছ, সেই জন্তুর পরিবর্তে সমপরিমাণ গোশত কিনে ও রান্না করে ফকীর-মিসকীনদের যদি খাইয়ে দাও, তবে তোমাদের নিকট নির্দ্বিধায় ওই নযর আদায় হবে কি না? যদি বিনা দ্বিধায় তোমরা তা করতে পার এবং তোমাদের অন্তরে তোমাদের নযরের ব্যাপারে কোন সন্দেহ না থাকে, তবে তোমাদের কথায় তোমরা সত্য প্রমাণিত হবে, নতুবা তোমরা মিথ্যাবাদী এবং তোমাদের উক্ত কর্ম শিরক এবং ওই জন্তু মৃত ও হারাম হবে।

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

তবে যদি কেউ নিরূপায় হয়ে পড়ে, আর সে নাফরমান ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তবে তার কোন গোনাহ নেই[১]। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

একটি প্রশ্নের উত্তর

এস্থলে প্রশ্ন হতে পারে, আলোচ্য আয়াতে হারাম হওয়ার হুকুমকে উল্লিখিত বস্তুগুলোর সাথে সীমিত করায় বুঝে আসে যে, এই বস্তুগুলো ছাড়া আর কিছুই হারাম নয়। অথচ সকল হিংস্র প্রাণী, গাধা, কুকুর ইত্যাদি খাওয়াও হারাম।

এর এক উত্তর এই যে, আয়াতে নিষেধাজ্ঞাকে উল্লিখিত বস্তুগুলিতে সীমিত করা মোটেই উদ্দেশ্য নয়, যাতে কারো অভিযোগের সুযোগ হয়। বরং হারাম হওয়ার বিধানকে সত্যতা ও বিশুদ্ধতার সাথে বিশেষিত করে এই বিধানের বিপরীত দিককে নাকচ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সত্য এ-ই যে, উক্ত বস্তুগুলো আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। এগুলি হালাল হওয়ার কোনো অবকাশই নেই।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, হারাম হওয়ার বিধানকে উল্লিখিত বস্তুসমূহে সীমিত ধরলেও এ সীমাবদ্ধতা আপেক্ষিক। অর্থাৎ মুশরিকরা যেসব বস্তুকে নিজেদের পক্ষ থেকে হারাম করেছিল, যেমন 'বাহিরা' 'সায়েবা' প্রভৃতি, সীমাবদ্ধতা শুধু সেসব বস্তুর হিসাবে। অতএব অর্থ এই যে, আমি (আল্লাহ) তো তোমাদের জন্য কেবল মৃত জন্তু, শূকর ইত্যাদি হারাম করেছি; তোমরা যে ষাঁড় ইত্যাদির সম্মানার্থে সেসবকে হারাম বল, তা নিতান্তই তোমাদের মনগড়া, আমি হারাম করিনি। বাকী হিংস্র প্রাণী ও অপরাপর ইতর প্রাণী হারাম হওয়ার ব্যাপারে মুশরিকদেরও দ্বিমত ছিল না। বোঝা গেল, হুকুমের এই সীমাবদ্ধতা ওইসব জীবজন্তুর হিসাবে, যা আল্লাহ তাআলার নির্দেশের বিপক্ষে মুশরিকরা হারাম করে রেখেছিল। সারা দুনিয়ার জীবজন্তুর হিসাবে এই সীমাবদ্ধতা নয় যে, উক্ত প্রশ্নের অবকাশ হতে পারে।

১. অর্থাৎ উল্লিখিত দ্রব্যাদি হারাম, কিন্তু কেউ ক্ষুধায় মরে যাওয়ার উপক্রম হলে নিরুপায় অবস্থায় তার জন্য খাওয়ার অনুমতি আছে। তবে শর্ত এই যে, নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘন করবে না। 'নাফরমানী' বলতে বোঝানো হয়েছে, নিরুপায় না হওয়া সত্ত্বেও খাওয়া। আর সীমালঙ্ঘন' এই যে, আবশ্যক পরিমাণের অধিক পেট ভরে খেল। শুধু এই পরিমাণ খাবে, যাতে মরে না যায়।

২. অর্থাৎ আল্লাহ পাক তো বড়ই ক্ষমাশীল, বান্দার সব রকমের গোনাহ মাফ করে থাকেন। সুতরাং এমন অসহায় ও নিরুপায় ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না কেন । আর তিনি নিজ বান্দাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান, তাই অপারগতার অবস্থায় পরিষ্কার অনুমতি দিয়ে দিলেন, যেভাবে হোক নিজ প্রাণ রক্ষা কর। এমন অপরাগতার অবস্থায় নিষেধাজ্ঞা থেকে তোমাদের অব্যাহতি দিলেন। নতুবা সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারীর এ কথা বলার অধিকার ছিল যে, জান যাক বা থাকুক, কোন অবস্থাতেই আমার নির্দেশের অবাধ্যতা করতে পারবে না।

১৭৪. যারা আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন তা গোপন করে[১] এবং তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে,[২] তারা নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ভরে না[৩]। আর আল্লাহ ওদের সাথে কিয়ামতের দিন কথাও বলবেন না[৪] এবং ওদের পবিত্রও করবেন

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ

এস্থলে একটি সন্দেহ হতে পারত যে, ক্ষুধার কারণে মরণাপন্ন ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য নিরুপায় মানুষের পক্ষে এই আন্দাজ করা খুবই কঠিন যে, এ পরিমাণ খেলে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচা যাবে আর এর বেশি এক গ্রাসও খাওয়া যাবে না। তাই وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ বলে আসানী করে দিলেন।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আসমানী কিতাবে হালাল-হারামের যে হুকুম পাঠিয়েছেন, ইহুদীরা তা গোপন করেছে। তদ্রূপ ওই কিতাবে বর্ণিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলি ওরা গোপন করত এবং রদ-বদল করত। এই উভয় কাজ অতি কঠিন গোনাহ। কারণ, এহেন আচরণের উদ্দেশ্য এই যে, হেদায়েত ও সত্য পথের সন্ধান যেন কেউ না পায়, সকলে যেন গোমরাহ থাকে। অথচ আল্লাহ তাআলা তো কিতাব ও রাসূল মানব ও জিন জাতির হেদায়েতের জন্য পাঠিয়েছেন। সুতরাং ওরা স্রষ্টার বিরোধিতা করেছে এবং তাঁর সৃষ্টজীবকেও জাহেল ও গোমরাহ বানাতে চেয়েছে।

২. অর্থাৎ ওরা আল্লাহ তাআলার নাফরমানী ও তাঁর সৃষ্টজীবকে গোমরাহ করে ক্ষান্ত ছিল না। বরং এ সত্য গোপনের বিনিময়ে যাদের গোমরাহ করত তাদের নিকট থেকে উলটা উৎকোচও গ্রহণ করত, যা তারা হাদিয়া, নযরানা এবং শুকরানা নামে আখ্যায়িত করত। অথচ এই হারাম খাওয়া, মৃত প্রাণী ও শূকর খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক।

বলা বাহুল্য, এমন জঘন্য আচরণের শাস্তিও কঠিন হবে। সামনে এর বর্ণনা রয়েছে।

৩. অর্থাৎ যদিও ওদের নিকট উক্ত হারাম-খাদ্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুস্বাদু ও উত্তম মনে হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আগুন ছাড়া আর কিছু নয়। ওরা খুশিমনে স্বীয় পেটে তা ভরছে। যেমন, সুস্বাদু খাদ্য মারাত্মক বিষমিশ্রিত অবস্থায় খাওয়ার সময় স্বাদই লাগে, কিন্তু পেটে গিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়।

৪. কারো সন্দেহ হতে পারে যে, অপরাপর আয়াতদৃষ্টে জানা যায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ওদের সাথে কথা বলবেন। সুতরাং কথা না বলার অর্থ এই যে, আদর-সোহাগের সাথে ওদের সাথে কথা বলা হবে না, বরং ওদের ভীত-সন্ত্রস্ত, হীন-অপদস্থ করণার্থে এবং শাস্তির বাণী শোনাতে আল্লাহ তাআলা ওদের সাথে কথা বলবেন। যার ফলে ওরা অত্যধিক মনোকষ্ট ও দুঃখে পতিত হবে।

এও বলা যায়, মাধ্যম ছাড়া ওদের সাথে কথা বলা হবে না। আর কথা বলার উল্লেখ যে আছে, তা ফেরেশতাদের মাধ্যমে হবে।

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

না[১]। আর ওদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি[২]।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝

১৭৫. ওরাই তারা, যারা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী ও ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে[৩]। অতএব ওরা আগুন (সহ্য করার) বিষয়ে কতই না ধৈর্যশীল![৪]

বি. দ্র. لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ 'আল্লাহ ওদের সাথে কথা বলবেন না' এ ধমকের বাণী থেকে পরিস্কার জানা যায়, প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রভু-প্রেম মজ্জাগত। বর্তমানে অনুভব না হলেও তা 'ছাইচাপা আগুনতুল্য' (হৃদয়ের গভীর তলদেশে সুপ্ত রয়েছে) বলে বুঝতে হবে। কিয়ামতের দিন যখন সব বাধাই দূরীভূত হয়ে যাবে, তখন তা জাগ্রত হয়ে উঠবে। যদি এমন না হত, তবে কাফেরদের এহেন ধমকের অর্থ এরূপ হবে, যেমন কেউ স্বীয় শত্রুদেরকে নিজ অসন্তুষ্টি ও বিরাগের ভয় দেখাচ্ছে– যা নিতান্তই অর্থহীন। প্রিয়জনের অসন্তোষ মরণতুল্য মনে হয় নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিকের কাছে, শত্রুর নিকট নয়। অতএব বোঝা গেল, কিয়ামত-দিবসে প্রত্যেক হৃদয় প্রভু-প্রেমে এমনি ভরপুর হবে যে, প্রভুর এতটুকু উপেক্ষাই কাফেরদের নিকট দোযখের শাস্তির চেয়েও বহুগুণ বেশি মর্মান্তিক মনে হবে।

১. অর্থাৎ ঈমানদারগণ যতই পাপী হোক না কেন, তারা দোযখে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত থেকে এবং গোনাহ থেকে পাক-ছাফ হয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে কাফেররা চিরকাল দোযখে থাকবে এবং কখনও পবিত্র হয়ে বেহেশত লাভের যোগ্য হবে না। শিরকের বিষয়াবলি ওদের نَجِسُ الْعَيْنِ অর্থাৎ এমন অপবিত্র বস্তুতে পরিণত করে দিয়েছে, যা সত্তাগতভাবেই নাপাক, যার অপবিত্রতা দূর হওয়ার নয়। কিন্তু গোনাহগার মুসলমানের অবস্থা এরূপ মনে করুন, যেমন কোন পবিত্র জিনিসের উপর মল লেগে গিয়েছিল, মল দূরীভূত হওয়ায় তা আবার পবিত্র হয়ে গেল।

২. বস্তুত এর চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আর কী হতে পারে যে, বাহ্যিক শরীর অতিক্রম করে শরীরের অভ্যন্তরেও অগ্নিদাহ হবে এবং প্রকৃত প্রিয়জন (আল্লাহ) ওদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন; অতঃপর এই ধ্বংসাত্মক মুসিবত থেকে আর কখনো রেহাই মিলবে না। (আল্লাহর পানাহ!)

৩. অর্থাৎ ওই লোকেরা নিঃসন্দেহে এই শাস্তিরই যোগ্য। কেননা, ওরা মুক্তির মূলধনকেই বিনাশ করে ফেলেছে। হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী পছন্দ করে তা অবলম্বন করেছে এবং ক্ষমার পথ পরিহার করে শাস্তির পথ গ্রহণ করেছে।

৪. অর্থাৎ নিজ খুশীতে দোযখে প্রবেশের কারণাদি অবলম্বন করছে, যেন আগুন ওদের কাছে খুব প্রিয় ও আকর্ষণীয়। সে জন্যই স্বীয় জান ও মালের বদলে তা ক্রয় করেছে। নতুবা সকলেই জানে, দোযখের আগুনে ধৈর্য ধারণ করা কেমন কঠিন।

১৭৬. তা (শাস্তি) এ কারণে যে, আল্লাহ সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর যারা এই কিতাবে মতবিরোধ করেছে, নিশ্চয় তারা চরম বিরোধিতায় লিপ্ত[১]।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ۝

[রুকূ - ২২]

১৭৭. পুণ্য কেবল এ-ই নয় যে, তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরাবে[২]। বরং প্রকৃত পুণ্য-(বান) তো সে, যে ঈমান রাখে আল্লাহ, কিয়ামত দিবস, সকল ফেরেশতা, (সমস্ত) কিতাব ও নবীদের প্রতি এবং যে অর্থ-সম্পদ দান করে এর মহব্বত থাকা সত্ত্বেও– আত্মীয়-স্বজন, এতীম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির ও ভিক্ষুকদের আর দাসমুক্তিতে এবং যে নামায কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং যারা স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ

---

১. ذلك بأن... –অর্থাৎ হেদায়াতের বদলে গোমরাহী ও ক্ষমার বদলে শাস্তি ক্রয় করার প্রমাণ অথবা ওদের উপরোক্ত শাস্তি হওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহ যে সত্য কিতাব নাযিল করেছেন ওরা তারই বিরোধিতা করেছে এবং তাতে নানা রকম মতভেদ সৃষ্টি করেছে। বরং বিরোধিতা ও শত্রুতায় ওরা বহুদূর এগিয়ে গেছে, অর্থাৎ প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছে অথবা সত্য পথ থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

আরেক ব্যাখ্যা এই যে, দোযখের আগুনে ওদের ধৈর্যশীল হওয়াটা যেহেতু স্পষ্টতই অবাস্তব ছিল, তাই প্রশ্ন হয়– আগুনে ধৈর্যশীল হওয়ার কী অর্থ? তো, ذلك থেকে শেষ পর্যন্ত এর উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সমালোচনায় পূর্ববর্তী আয়াতগুলি নাযিল হলে ওরা বলতে লাগল, হেদায়েত ও মাগফেরাতের অনেক কারণ ও নিদর্শন আমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছে। একটি স্পষ্ট বিষয় এই যে, আমরা যে কেবলার দিকে মুখ করতে আদিষ্ট হয়েছি, তার দিকে মুখ করে আমরা সর্বোত্তম ইবাদত অর্থাৎ নামায আল্লাহর নির্দেশ মতই আদায় করে থাকি। এ সত্ত্বেও আমরা এসব দোষ ও শাস্তির যোগ্য কীভাবে হতে পারি? ওদের এই ধারণা খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, বড় নেক আমল, যা মাগফেরাত ও হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট হতে পারে– তা এই নয় যে, শুধু স্বীয় মুখ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে করবে আর আকীদা ও জরুরী আমলসমূহের ব্যাপারে বেপরোয়া থাকবে।

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

করে যখন তারা অঙ্গীকার করে এবং যারা ধৈর্যধারণ করে অভাব-অনটনে, রোগ-যাতনায় ও যুদ্ধের সময়ে[১]। এঁরাই সত্যবাদী এবং এঁরাই পরহেজগার[২]।

১. অর্থাৎ যে নেকী ও পুণ্য হেদায়েতের নিদর্শন এবং যা আখেরাতে মুক্তির উপায়, তা হল—আল্লাহ, কিয়ামত-দিবস, ফেরেশতাকুল, আসমানী কিতাবসমূহ ও নবীদের উপর দিল থেকে ঈমান আনা ও এসবকে বিশ্বাস করা; এবং মহব্বত ও আকর্ষণ সত্ত্বেও যাকাত বাদেও স্বীয় ধন-সম্পদ আত্মীয়, এতীম, গরীব, মুসাফির ও অভাবী ভিক্ষুকদের দান করা; তাছাড়া فى الرقاب-গর্দান মুক্তির জন্য, অর্থাৎ যে মুসলমানকে কাফেররা জবরদস্তি বন্দী করে নিয়ে গেছে তাকে মুক্ত করতে, ঋণীকে ঋণমুক্ত করতে, গোলামকে আযাদ করতে অথবা সেই দাসকে মুক্ত করতে, যার প্রভু তাকে তার ক্রয়মূল্য উপার্জন করে দেওয়ার শর্তে মুক্তির কথা দিয়েছে– এসব মুক্তির কাজে অর্থ দান করা; নামায যথাযথরূপে আদায় করা, এবং সোনারূপা ও কায়কারবারের সম্পদ থেকে যাকাত দান করা; স্বীয় ওয়াদা ও চুক্তি পূর্ণ করা আর অভাব-অনটন, রোগ-শোক ও কায়-ক্লেশে ও ভয়-ভীতির অবস্থায় ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে থাকা।

ইহুদী ও নাসারারা যেহেতু এসব আকীদা, আমল ও চরিত্রে পিছপা ও ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং ওরা নানা রকম বাধা–বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করত, যেমন কুরআনের আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে, অতএব ইহুদী বা নাসারাদের শুধু স্ব স্ব কেবলামুখী হওয়ার উপর গৌরব করা এবং নিজেদেরকে হেদায়েতের রাস্তার উপর অটল মনে করা এবং মাগফেরাতের অধিকারী দাবি করা— অবান্তর ধারণা মাত্র। বর্তমান আয়াতে বর্ণিত আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাকের উপর কায়েম না হওয়া পর্যন্ত শুধু কেবলামুখী হওয়ার দ্বারা ওদের ভাগ্যে হেদায়েত জুটতে পারে না এবং আল্লাহর আযাব থেকেও ওরা মুক্তি পেতে পারে না।

২. অর্থাৎ যারা উল্লিখিত আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাকের গুণাবলিতে গুণান্বিত, তারাই ঈমান ও দীনে অথবা স্বীয় কথা ও ওয়াদায় খাঁটি এবং তারাই স্বীয় আমল ও চরিত্রে মুত্তাকী ও পরহেজগার। অথবা অর্থ হল, তারাই গোনাহ ও অসৎকর্ম থেকে বেঁচে থাকে এবং আল্লাহর আযাব থেকে আত্মরক্ষা করে চলে। আর এই গুণাবলির মধ্য থেকে একটিও যাদের মধ্যে বর্তমান নেই, সেই কিতাবধারীরা নিজেদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা কী করে পোষণ করতে পারে?

১৭৮. হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর 'কেসাস' ফরয করা হয়েছে[১] (অর্থাৎ সমতা রক্ষা করা)—স্বাধীন ব্যক্তির

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ

১. ইসলামপূর্ব যুগে ইহুদী ও আরববাসীদের নিয়ম ছিল, ওরা অভিজাত বংশীয় লোকদের (নিহত) দাসের পরিবর্তে নিম্ন বংশের স্বাধীন ব্যক্তিকে এবং নারীর পরিবর্তে পুরুষকে এবং এক স্বাধীন বক্তির পরিবর্তে দুই স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করত। বর্তমান আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের নির্দেশ দিচ্ছেন, আমি নিহতদের ব্যাপারে সমদর্শিতা ও সাম্যনীতি ফরয করে দিলাম। কেসাসের আভিধানিক অর্থ সমতা ও সাযুজ্য (অভেদ)। তোমরা যে বড় বংশ ও ছোট বংশের মধ্যে পার্থক্য ও অসাম্যের নীতি প্রতিষ্ঠা করে রেখেছ, এটা অর্থহীন। প্রাণ সকলেরই সমান- বড়-ছোট, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-মূর্খ, বৃদ্ধ-যুবক-শিশু, সুস্থ্য-রুগ্ন-মরণাপন্ন অথবা সুস্থাঙ্গ-বিকলাঙ্গ যাই হোক না কেন।

আয়াতে শুধু মুমিনদের সম্বোধন করার তাৎপর্য

পূর্ববর্তী আয়াতে হেদায়েত ও মাগফেরাতের ভিত্তিস্বরূপ পুণ্য ও সৎকর্মের মৌলিক বিষয়াদির উল্লেখ ছিল। সেখানে এই ইঙ্গিতও ছিল যে, কিতাবধারীরা উক্ত গুণাবলি থেকে বঞ্চিত। সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছিল যে, এসব গুণ ছাড়া কেউ দীনে খাঁটি ও মুত্তাকী হতে পারে না। অতএব বোঝা গেল, এর যোগ্য পাত্র মুসলমানদের ছাড়া কেউই হতে পারে না— আহলে কিতাবও না, আরববাসী জাহেলও না। সেজন্য এখন অন্যান্য সব সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ঈমানদারদের সম্বোধন করা হচ্ছে এবং নেকীর বিভিন্ন শাখা অর্থাৎ দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত এবং বিভিন্ন আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত বিধান তাদের দেওয়া হচ্ছে। কারণ, এসব শাখার উপর আমল তারাই করতে পারে, যারা পূর্বোক্ত মৌলিক বিষয়াদিতে মজবুত। অন্যদের যেন এ সম্বোধনের যোগ্যই মনে করা হয়নি! এটা ওদের লজ্জার কারণ হওয়া উচিত ছিল।

এখন যেসব শাখা-শ্রেণীর আমল তফসীলের সাথে আলোচিত হচ্ছে, তার দ্বারা বস্তুত ঈমানদারদের হেদায়েত ও তালীমই উদ্দেশ্য। তবে প্রসঙ্গত কোথাও সুস্পষ্টভাবে, কোথাওবা ইশারায় অন্যদের খারাবী সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। যেমন, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى এই আয়াতে ইশারা রয়েছে যে, ইহুদী প্রভৃতি সম্প্রদায় কেসাসের মধ্যে যে নীতি প্রবর্তন করে রেখেছে, তা মনগড়া, ভিত্তিহীন ও খোদায়ী বিধানের পরিপন্থী। এতেই প্রকাশ পায় যে, পূর্বোক্ত মৌলিক বিষয়াদির মধ্যে না কিতাবের উপর ওদের ঈমান আছে, না নবীদের প্রতি এবং না ওরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, আর না অভাব-অনটন ও বিপদাপদের অবস্থায় ধৈর্যধারণ করেছে। নতুবা কোন প্রিয়জন ও আত্মীয় নিহত হয়ে গেলে এমন অধৈর্য ও স্বার্থপর হত না যে, খোদায়ী বিধান, পয়গম্বরদের বাণী ও কিতাবের নির্দেশ—সব কিছু বর্জন করে ওরা নিরপরাধ লোকদের হত্যা করার নির্দেশ দিত।

وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثٰى بِالْأُنْثٰى ۭ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۗءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۭ

বদলে স্বাধীন ব্যক্তি[১], গোলামের বদলে গোলাম[২] ও নারীর বদলে নারী[৩] (-কে হত্যা করা হবে)। তবে কোন ব্যক্তিকে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা মাফ করে দেওয়া হলে (কর্তব্য হচ্ছে, গৃহীত চুক্তির) যথানিয়মে

১. আয়াতের প্রথমাংশে যে সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ রয়েছে, তারই ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে যে, প্রত্যেক স্বাধীন পুরুষের কেসাসে শুধু ওই এক স্বাধীন পুরুষকেই হত্যা করা যেতে পারে, যে হত্যাকারী। এই একজনের পরিবর্তে হত্যাকারীর বংশের দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে ইচ্ছামত হত্যা করা চলবে না।

২. অর্থাৎ প্রত্যেক দাসের পরিবর্তে কেবল ওই দাসকেই হত্যা করা হবে, যে নিহত দাসের হত্যাকারী। কোন অভিজাত ব্যক্তির দাসের কেসাসে— যে দাস তাকে হত্যা করেছে, ছোট বংশীয় লোকদের দাস হওয়ায় তাকে বাদ দিয়ে তাদের কোন স্বাধীন মানুষকে হত্যা করা চলবে না।

৩. অর্থাৎ প্রত্যেক নারীর কেসাসে কেবল ওই নারীকেই হত্যা করা যাবে, যে নিহত নারীকে হত্যা করেছে। এ হতে পারবে না যে, অভিজাত বংশীয় নারীর কেসাসে নীচ বংশীয় হত্যাকারী নারীকে ছেড়ে সেই বংশের কোন পুরুষকে হত্যা করবে।

সারকথা এই যে, প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তি অন্য স্বাধীন ব্যক্তির এবং প্রত্যেক দাস অন্য দাসের সমান। সুতরাং কেসাসের বিধানে সাম্যনীতি অপরিহার্য এবং এক্ষেত্রে আহলে কিতাব ও আরবের জাহেলদের সীমালঙ্ঘন (বা অসাম্যনীতি) নিষিদ্ধ।

বি. দ্র.

বাকী রইল, স্বাধীন ব্যক্তি কোন দাসকে অথবা পুরুষ কোন নারীকে কতল করে ফেললে কেসাস নেওয়া হবে কি না, এ বিষয়ে বর্তমান আয়াতে কোন নির্দেশ নেই, আর এতে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) অন্য আয়াত অর্থাৎ- أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (সূরা মায়েদা : ৪৫) ও হাদীস- اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاءُهُمْ (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৭৫১) দৃষ্টে বলেন, উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রের প্রত্যেকটিতেই কেসাস জারী হবে। সবল ও দুর্বল, সুস্থ ও অসুস্থ, সক্ষম ও অক্ষম প্রমুখ কেসাসের মধ্যে যেমন সমান, তেমনি ইমাম আবু হানীফার মতে স্বাধীন ব্যক্তি ও দাস এবং পুরুষ ও নারীও সমান। তবে শর্ত হচ্ছে, নিহত দাস হত্যাকারীর দাস না হওয়া চাই। কারণ, তাঁর নিকট এ ক্ষেত্রটি কেসাসের হুকুমবহির্ভূত। আর যদি কোন মুসলমান কোন কাফের যিম্মি (মুসলিম রাষ্ট্রের কাফের নাগরিক)-কে হত্যা করে ফেলে, তবে ইমাম আবু হানীফার মতে তার থেকেও কেসাস নেওয়া হবে। অবশ্য হরবী (অর্থাৎ দারুল হরব-এর) কাফেরকে কোন মুসলমান হত্যা করলে কোন ইমামেরই মতে কেসাস প্রযোজ্য নয়।

ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অনুসরণ করা এবং তার (অর্থাৎ নিহতের ওলির) কাছে উত্তমরূপে আদায় করে দেওয়া*[১]। এ তোমাদের রবের পক্ষ থেকে আসানী ও মেহেরবানী[২]। অতএব এ বিধানের পরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে, তার জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি[৩]।

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى

১৭৯. হে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা! তোমাদের জন্য কেসাসের মধ্যে রয়েছে জীবন[৪]। আশা

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তবে কোন ব্যক্তিকে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা মাফ করে দেওয়া হলে– (নিহতের ওলির কর্তব্য হচ্ছে, রক্তপণ) দাবী করা ন্যায়সঙ্গতভাবে, আর (হত্যাকারীর কর্তব্য হল,) তাকে আদায় করে দেওয়া উত্তমরূপে'।

১. অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের কয়েকজন কেসাস মাফ করে দিলে হত্যাকারীকে হত্যা করা যাবে না বটে, কিন্তু দেখতে হবে–সেই ওয়ারিসরা কীভাবে মাফ করেছে। যদি আর্থিক বিনিময় ছাড়া শুধু ছওয়াবের উদ্দেশ্যে মাফ করে থাকে, তবে হত্যাকারী ওয়ারিসদের দাবি থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি শরী'য়তসম্মত দিয়ত (অর্থাৎ রক্তপণ), অথবা আপোষ-মীমাংসারূপে কিছু পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে কেসাস মাফ করে থাকে, তবে হত্যাকারীর উচিত– কৃতজ্ঞচিত্তে ও খুশীমনে সেই বিনিময় ভদ্রভাবে পরিশোধ করে দেওয়া।

২. ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কেসাস নাও, বা দিয়ত (রক্তপণ) গ্রহণ কর, কিংবা ক্ষমা করে দাও—এভাবে তিনটির যে কোনটি গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান আল্লাহর তরফ থেকে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস উভয় পক্ষের জন্য আসানী ও মেহেরবানীর বিষয়। পূর্বের লোকদের জন্য এমনটি ছিল না। কারণ, ওদের মধ্যে ইহুদীদের জন্য একমাত্র কেসাস এবং নাসারাদের জন্য দিয়ত বা ক্ষমা নির্ধারিত ছিল।

৩. অর্থাৎ এই আসানী ও মেহেরবানীর পরও যদি কেউ অন্যথা করে এবং জাহেলী যুগের প্রথার অনুসরণ করে, অথবা ক্ষমা করা ও দিয়ত গ্রহণ করার পর হত্যাকারীকে কতল করে, তবে ওর জন্য আখেরাতে কঠোর শাস্তি রয়েছে। কিংবা অর্থ এই যে, এখনই ওকে কতল করা হবে।

৪. অর্থাৎ বাহ্যিক দৃষ্টিতে কেসাসের হুকুম খুব কঠোর মনে হলেও বুদ্ধিমান লোকেরা বুঝতে পারে যে, এ হুকুমের মধ্যে বহু জীবনের কারণ নিহিত। কেননা, কেসাসের ভয়ে কেউ কাউকে হত্যা করবে না। এতে উভয়ের প্রাণ নিরাপদ থাকবে। আর কেসাসের কারণে হত্যাকারী ও নিহতের লোকেরাও খুনাখুনি থেকে নিরাপদ ও শান্ত থাকবে। আরব দেশে এমন হত যে, কে হত্যা করল আর কে করেনি– এর কোন বাছবিচার ছিল না। যাকে বাগে

الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

করা যায়, তোমরা বেঁচে থাকবে[১]।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

১৮০. যখন তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন— সে যদি কোন ধন-সম্পত্তি রেখে যায়— ন্যায়সঙ্গতভাবে মাতাপিতা ও আত্মীয়স্বজনের জন্য ওসিয়ত করা তোমাদের উপর ফরয করা হল। (এ বিধান) অবধারিত পরহেজগারদের জন্য[২]।

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ

১৮১. অতঃপর যে কেউ ওসিয়ত পরিবর্তন করে ফেলবে তা শোনার পর, তো পরিবর্তন করার গোনাহ তাদেরই উপর বর্তাবে যারা তা পরিবর্তন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ

পেত, নিহত ব্যক্তির লোকেরা তাকেই হত্যা করে ফেলত এবং এর জন্য উভয় পক্ষে এক খুনের কারণে হাজারো প্রাণ বিনষ্ট হওয়ার পথ খুলত। যখন একমাত্র হত্যাকারী থেকেই কেসাস নেওয়া হবে, তখন এ সকল জান বেঁচে যাবে।

আর আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, কেসাস হত্যাকারীর জন্য পরকালীন (সুখী) জীবনের কারণ।

১. অর্থাৎ কেসাসের ভয়ে কাউকে হত্যা করা থেকে বেঁচে থাকবে। অথবা অর্থ এই যে, কেসাসের কারণে পরকালীন শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। অথবা, কেসাসের হুকুমের হেকমত তোমাদের জানা হয়ে গেছে বলে এর বিরুদ্ধাচরণ অর্থাৎ কেসাসের বিধান পরিত্যাগ করা থেকে বেঁচে থাকবে।

২. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

পূর্বের হুকুম ছিল কেসাস অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির জান সম্পর্কে। বর্তমান আয়াতের হুকুমটি হচ্ছে তার ধনসম্পত্তি সম্পর্কে। পূর্বে বর্ণিত মৌলিক নেকীসমূহের মধ্যে যে وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى ইরশাদ হয়েছে, এ বিধান তারই অন্তর্ভুক্ত।

আরবদের রীতি ছিল, মৃত ব্যক্তির সমস্ত ধনসম্পদ তার বিবি ও সন্তান বরং সন্তানদের মধ্যে কেবল ছেলেরা পেত, মাতাপিতাসহ অন্যান্য আত্মীয় বঞ্চিত থাকত। বর্তমান আয়াতে আদেশ দেওয়া হয়েছে, মৃতের সম্পদ তার মাতাপিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে ইনসাফের সাথে দেওয়া উচিত। মুমূর্ষ ব্যক্তির উপর এই ওসিয়তের বিধান মীরাছের আয়াত নাযিল না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ ছিল। সূরা নিসায় (আয়াত ১১) মীরাছের আহকাম অবতীর্ণ হলে সকলের অংশ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে গেল। তখন আর মৃতের সম্পত্তিতে ওসিয়ত ফরয থাকেনি, এর প্রয়োজনই থাকেনি, তবে তা মুসতাহাব বটে। কিন্তু ওয়ারিসের জন্য ওসিয়ত করা জায়েয নয়।

سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝١٨١

সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা[১]।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١٨٢

১৮২. আর যদি কেউ ওসিয়তকারীর পক্ষ থেকে পক্ষপাতিত্ব বা গোনাহর আশঙ্কা করে এবং সে তাদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করিয়ে দেয়, তবে তার কোন গোনাহ নেই[২]। নিশ্চয় আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৩]।

[রুকূ - ২৩]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ

১৮৩. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে[৪], যাতে

---

১. অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি তো ইনসাফের সঙ্গে ওসিয়ত করে মারা গেল, কিন্তু দাতারা তা পালন করেনি। এমতাবস্থায় মৃতের কোন গোনাহ নেই, সে নিজ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে যারা তার ওসিয়ত পালন করেনি তারাই পাপী হবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সকলের কথা শোনেন এবং সকলের নিয়ত জানেন।

২. অর্থাৎ কারো যদি মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে আশঙ্কা হয় বা জানতে পারে যে, সে কোন কারণে ভুল করে কারো অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করেছে অথবা জেনেশুনে আল্লাহর হুকুমের খেলাফ সম্পদ দিয়ে গেছে, তারপর সে যদি ওয়ারিস ও যাদের জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে শরী'য়তের বিধানুযায়ী আপোষ-মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন গোনাহ হবে না। ওসিয়তের মধ্যে এ রকম রদ-বদল জায়েয ও উত্তম।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তো গোনাহগারদেরও ক্ষমা করেন; অতএব যে ব্যক্তি সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি অন্যায় থেকে (সংশ্লিষ্ট) সকলকে হটাল, তাকে ক্ষমা তো অবশ্যই করবেন। অথবা এরূপ বলা যায়, তিনি ক্ষমা করবেন সেই ওসিয়তকারীকে, যে না-জায়েয ওসিয়ত করেছিল, কিন্তু পরে (ভুল) বুঝে স্বীয় জীবদ্দশাতেই ওই ওসিয়ত প্রত্যাহার করে নিল।

৪. এ বিধান রোযা সম্পর্কে। রোযা ইসলামের অন্যতম রুকন। রোযা নফসের দাস ও প্রবৃত্তিপূজারীদের নিকট অত্যন্ত কষ্টকর বলে জোরদার ও গুরুত্বের ভাষায় এর বিধান বিবৃত হয়েছে। হযরত আদম আ. এর সময় থেকে অদ্যাবধি এই বিধান বরাবর জারী রয়েছে, যদিও রোযার সময় ও সংখ্যা নির্ধারণের ব্যাপারে ভিন্নতা রয়েছে। উপরে (আয়াত ১৭৭) বর্ণিত মৌল নীতিসমূহের মধ্যে সবর বা ধৈর্যধারণের যে হুকুম ছিল, রোযা তার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। হাদীস শরীফে রোযাকে সবরের অর্ধেক বলা হয়েছে। (জামে তিরমিযী, হাদীস-৩৮২৮)

قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ ۝

তোমরা পরহেজগার হতে পার[১]।

১৮৪. أَيَّامًا مَّعۡدُوۡدٰتٍ ؕ فَمَنۡ كَانَ مِنۡكُمۡ مَّرِيۡضًا أَوۡ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيۡنَ يُطِيۡقُوۡنَهٗ فِدۡيَةٌ طَعَامُ مِسۡكِيۡنٍ ؕ فَمَنۡ تَطَوَّعَ خَيۡرًا

(রোযা ফরয) নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে[২]। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ বা মুসাফির হবে, (তার জন্য জরুরী– যতদিন রোযা ভেঙ্গেছে) ততদিনের রোযা রাখা অন্যান্য দিনে[৩]। আর যারা রোযার সামর্থ্য রাখে তাদের কর্তব্য হচ্ছে, ফিদ্‌য়া দেওয়া— এক মিসকিনের খোরাক[৪]। অতএব যে কেউ নিজ খুশীতে

---

১. অর্থাৎ রোযা নফসকে তার আকর্ষণীয় বিষয়াদি থেকে সংযত থাকায় অভ্যস্ত করে তুলবে, ফলে তোমরা নফ্‌সকে সেসব বিষয় থেকে বিরত রাখতে পারবে, যেগুলো শরী'য়তের দৃষ্টিতে হারাম। তাছাড়া রোযার দ্বারা নফসের শক্তি ও কামভাব দুর্বল হবে। অতএব এতে তোমরা মুত্তাকী-পরহেজগার হয়ে যাবে। রোযার মধ্যে বড় হেকমত এ-ই যে, তার দ্বারা অবাধ্য নফসের সংশোধন হয় এবং শরী'য়তের যেসব হুকুম পালন করা নফসের জন্য খুব কঠিন তা সহজ হয়ে যায় এবং রোযাদার মুত্তাকী হয়ে যায়।

জেনে রাখা দরকার, ইহুদী ও নাসারাদের উপরও রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছিল। কিন্তু ওরা প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজ খুশিমত তাতে রদ-বদল করে। তাই لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ এর মধ্যে ওদের নাফরমানীর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ হে মুসলিমগণ! তোমরা অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাক, অর্থাৎ ইহুদী ও নাসারাদের মত এ বিধান লঙ্ঘন করো না।

২. অর্থাৎ বেশি নয়, হাতে গনা কয়েকটি দিনমাত্র রোযা রাখ। এ দ্বারা রমযান মাস উদ্দেশ্য, যেমন পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

৩. অর্থাৎ এ স্বল্প সময়ের মধ্যেও এই আসানী করা হয়েছে যে, এমন রোগী হলে যার পক্ষে রোযা রাখা কঠিন অথবা মুসাফির হলে, রোযা না রাখার ইখতিয়ার আছে এবং যতটি রোযা ভাঙ্গবে তা রমযান ছাড়া অন্যান্য দিনে রেখে নেবে—চাই একসাথে বা বিচ্ছিন্নভাবে।

৪. অর্থাৎ, রোযা রাখতে সমর্থ বটে, কিন্তু শুরুতে রোযার অভ্যাস একেবারে ছিল না বলে একাধারে পূর্ণ একমাস রোযা রাখা ছিল অতি কষ্টকর। তাই এই সহজ উপায় করে দেওয়া হয়েছিল যে, অসুস্থতা বা সফরের মত কোন ওজরের সম্মুখীন না হলেও এই ইখতিয়ার ছিল যে, ইচ্ছা হলে রোযা রাখ, ইচ্ছা হলে রোযার বিনিময় দাও– এক রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে দুবেলা পেট ভরে খাওয়াবে। কারণ, সে যখন একদিনের খাদ্য অন্যকে দিয়ে দিল, তখন কেমন যেন স্বীয় নফসকে একদিনের খাদ্য থেকে বিরত রাখল। মোট কথা, এ রোযার মত হল।

পরে মানুষ রোযা রাখায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে এই অনুমতি বলবৎ থাকেনি। পরবর্তী আয়াতে এর বর্ণনা আসছে।

فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ۚ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

নেককাজ করবে, তা তার জন্যই ভাল[১]। আর তোমাদের রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জান (ও বোঝ)[২]।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ

১৮৫. (সেই দিনগুলি হচ্ছে) রমযান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য পথপ্রদর্শক এবং যাতে রয়েছে সৎপথ পাওয়ার ও (সত্যকে মিথ্যা থেকে) পৃথক করার উজ্জ্বল প্রমাণাদি*[৩]। অতএব

কোন কোন মনীষীর মতে طعام مسكين দ্বারা সদকাতুল ফিতরও উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যাদের ফিদ্‌য়া প্রদানের সামর্থ্য আছে, তারা তাকে এক মিসকীনের খোরাক পরিমাণ (অর্থাৎ আধা সা গম বা এক সা যব) দিয়ে দেবে। এ অর্থ হিসাবে আয়াতটি মনসূখ নয়। (কারণ, সদকাতুল ফিতরের বিধান বলবৎ আছে)

যারা এখনো বলে, যার খুশী রমযানে রোযা রাখবে, যার খুশী ফিদ্‌য়া দেবে, রোযা বাদ দেবে, রোযাই রাখতে হবে এটা জরুরী নয়—ওরা হয় জাহেল নতুবা বেদীন।

১. সুতরাং এক মিসকীনকে এক দিনের খোরাকীর বেশি দিলে অথবা কয়েক মিসকীনকে পেট ভরে খাওয়ালে তা খুবই উত্তম।

২. অর্থাৎ তোমাদের যদি রোযার ফযীলত, হেকমত ও উপকার জানা থাকে তবে বোঝা উচিত, ফিদ্‌য়া দেওয়ার চেয়ে রোযা রাখাই উত্তম। তাই রোযা রাখতে তোমরা অবহেলা করো না।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যা মানব জাতির জন্য হেদায়েত এবং এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসম্বলিত, যা পথনির্দেশক ও (সত্যকে মিথ্যা থেকে) পার্থক্যকারী'।

৩. হাদীস শরীফে আছে, হযরত ইবরাহীম আ.এর সহীফা, তাওরাত ও ইন্‌জীল সবই রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর কুরআন শরীফও রমযানের ২৪তম রাতে লওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আকাশে সবটুকু একত্রে পাঠানো হয়। অতঃপর অল্প অল্প করে অবস্থার প্রেক্ষিতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল হতে থাকে। প্রতি রমযানে হযরত জিবরাঈল আ. অবতীর্ণ অংশটুকু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনিয়ে যেতেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস- ১৬৮৪; সহীহ বুখারী, হাদীস-৬; তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম, রেওয়ায়েত-১৬৫০)

এ সকল ঘটনা থেকে রমযান মাসের ফযীলত এবং কুরআন মজীদের সঙ্গে এ মাসের সম্পর্ক ও বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ জন্য এ মাসে তারাবীর নামায নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং রমযান মাসে কুরআনের খেদমত (তেলাওয়াত ইত্যাদি) খুবই যত্ন ও গুরুত্ব সহকারে করা উচিত। কেননা, এর জন্যই এ মাস নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট।

مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۝

তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই এর রোযা রাখে[১]। আর যে অসুস্থ বা মুসাফির হবে, (তার জন্য জরুরী যতদিন রোযা ভেঙ্গেছে) ততদিনের রোযা রাখা অন্যান্য দিনে[২]। আল্লাহ তোমাদের জন্য আসানী চান এবং তোমাদের জন্য কঠোরতা চান না। আর (তিনি এসব বিধান দিয়েছেন) এ জন্য, যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ করতে পার এবং যাতে আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর যেহেতু তিনি তোমাদের হেদায়েত দান করেছেন এবং যাতে তোমরা শোকর কর[৩]।

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ۖ

১৮৬. আর আমার বান্দারা যদি আপনাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তবে (বলুন,) 'আমি

---

১. অর্থাৎ তোমরা এই মুবারক মাসের বড় বড় ফযীলতের কথা জানতে পারলে। এখন যে কেউ এ মাস পাবে, তার অবশ্যই রোযা রাখা উচিত। আর আসানীর নিমিত্ত প্রথমদিকে সাময়িকভাবে ফিদ্‌য়ার যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তা মওকুফ হয়ে গেল।

২. فَمَنْ شَهِدَ .. فَلْيَصُمْهُ দ্বারা বোঝা যাচ্ছিল, সম্ভবত রোগী ও মুসাফিরের জন্যও রোযা না রেখে পরে কাযা করার অনুমতি রইল না এবং রোযা রাখায় সমর্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যেমন রোযা ছেড়ে দেওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল, তেমনি মুসাফির ও রোগীর জন্যও তা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। তাই রোগী ও মুসাফির সম্পর্কে আবার স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হল, তাদের জন্য রমযানে রোযা না রাখার এবং তার কাযা আদায় করার অনুমতি এখনো আছে, যেমন পূর্বে ছিল।

৩. অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রথমে রমযানে রোযার হুকুম দিলেন আর ওযরের কারণে রোগী ও মুসাফিরকে রোযা না রাখার অনুমতি দিলেন এবং অন্য সময়ে এই দিনগুলির রোযা কাযা করা ওয়াজিব করলেন– ধারাবাহিকভাবে হোক বা বিচ্ছিন্নভাবে। তো, এসব বিধানে এই বিবেচনা আছে যে, তোমাদের যেন কষ্ট না হয় বরং আসানী হয়। এবং এ বিবেচনাও রয়েছে যে, তোমরা যেন রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে নিতে পার, ছওয়াব যেন কম না হয়। আর এও উদ্দেশ্য যে, অবিমিশ্র কল্যাণ ও মুক্তির এত সুন্দর পথপ্রদর্শনের জন্য তোমরা যেন আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা কর এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ কর। এবং এও উদ্দেশ্য যে, তোমরা এ সকল নে'য়ামতের শোকরগোযারী করবে এবং শোকর আদায়কারী দলের অন্তর্ভুক্ত হবে।

সুবহানাল্লাহ, রোযার মত মঙ্গলকর ইবাদত আমাদের উপর তিনি অবধারিত করেছেন। আর পরিশ্রম ও কষ্টের হালতে আসানীরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং অবসর সময়ে এর ক্ষতিপূরণের উপায়ও বলে দিয়েছেন।

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

তো (তাদের) কাছেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি, যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে; অতএব তারাও যেন আমার হুকুম মানে★ এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা সৎপথে এসে যায়[১]।'

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ

১৮৭. তোমাদের জন্য রোযার রাতে আপন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা হালাল করে দেওয়া হল[২]। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা

★ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিই, যখন সে আমাকে ডাকে। অতএব তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়'।

১. শুরুতে বিধান ছিল, রমযান মাসে রাতের প্রথমভাগে পানাহার ও স্ত্রীগমনের অনুমতি আছে, তবে ঘুমিয়ে পড়ার পর এসব নিষিদ্ধ। কেউ কেউ এই হুকুমের খেলাফ করে ঘুমানোর পর স্ত্রী সহবাস করলেন। পরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিজ অপরাধ স্বীকার করত অনুশোচনা প্রকাশ করলেন এবং তওবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। এতে আয়াত অবতীর্ণ হল যে, তোমাদের তওবা কবুল করা হয়েছে। (মুসনাদে আহমদ, ১৫৭৯৫) অধিকন্তু আয়াতে আল্লাহর আহকামের আনুগত্য করার তাকীদ করা হল এবং পূর্বের হুকুম রহিত করে দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য অনুমতি দেওয়া হল যে, রমযানের সারা রাত সোবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত খাওয়া ইত্যাদি তোমাদের জন্য হালাল। এর উল্লেখ পরবর্তী আয়াতে রয়েছে।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে বান্দাদের প্রতি যে আসানী ও অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছিল, (বর্তমান আয়াতে) নৈকট্য ও সাড়া দানের সুসংবাদ দ্বারা সে বিষয়টি বেশ জোরালোভাবে প্রমাণিত হল। আর এই উভয় আয়াতের মধ্যে সম্পর্কের একটি দিক এও যে, প্রথম আয়াতে তাকবীর ও আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনার হুকুম ছিল বলে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের রব কি দূরে যে জোরে ডাকব, না কাছে যে আস্তে ডাকব? এ প্রসঙ্গে আয়াতে বলা হচ্ছে, তিনি কাছে আছেন– আস্তে বা জোরে সকল কথাই তিনি শোনেন। অবশ্য যেসব স্থানে জোরে তাকবীর বলার হুকুম রয়েছে তার কারণ ভিন্ন। তার অর্থ এটা নয় যে, তিনি আস্তে কথা শোনেন না।

২. রমযানের রাতে যে ঘুমের পর পানাহার করা, বিবির কাছে যাওয়া হারাম ছিল, এতেও আসানী করে দেওয়া হল– এখন সারা রাত যখন ইচ্ছা বিবিদের সঙ্গে সহবাস করতে পার।

لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِي الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٨٧﴾

তাদের পরিচ্ছদ[১]। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা নিজেদের সাথে খেয়ানত করছিলে[২]। তবে তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব এখন তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, আর তোমাদের জন্য আল্লাহ যা লিখে দিয়েছেন তা অন্বেষণ কর[৩]। এবং তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না তোমাদের নিকট ভোরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্টরূপে আলাদা হয়[৪]। তারপর তোমরা রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত[৫]। আর স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না যখন তোমরা মসজিদে এ'তেকাফরত থাক[৬]। এগুলি আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, অতএব এগুলির কাছে যেয়ো না। এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁর বিধানাবলি বর্ণনা করেন, যাতে তারা

---

১. 'পরিচ্ছদ' বলে পরস্পরের পূর্ণ মিলন ও সহাবস্থান বোঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যেভাবে শরীরের সাথে কাপড় লেগে ও মিশে থাকে, তেমনি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে মিলিত হয়ে থাকে।

২. নিজের নফসের সাথে খেয়ানত করার অর্থ এই যে, ঘুমানোর পর স্ত্রীর কাছে গিয়ে শরী'য়তের নির্দেশ অমান্য করার কারণে তোমরা নিজেরা নিজেদের পাপী বানাতে। ফলে তোমাদের নফস শাস্তিযোগ্য হচ্ছিল। এখন আল্লাহ তাআলা স্বীয় মেহেরবানীতে তোমাদের ক্ষমা করলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য তার অনুমতি দিলেন।

৩. অর্থাৎ লওহে মাহফূজে যে সন্তান তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত করে দিয়েছেন, স্ত্রী সহবাসের দ্বারা তা উদ্দেশ্য হওয়া চাই, শুধু কামক্রিয়া যেন উদ্দেশ্য না হয়। আর এস্থলে 'আযল' (তথা জরায়ুর বাইরে বীর্যপাত) ও পায়ুপথে রতিক্রিয়া না করার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে।

৪. রাতের যে কোনো সময় স্ত্রীসহবাসের যেমন অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তেমনি সোবহে সাদেক পর্যন্ত পানাহারেরও অনুমতি রয়েছে।

৫. অর্থাৎ সোবহে সাদেকের উদয় থেকে রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। এ থেকে এও জানা গেল যে, রাতে কিছু না খেয়ে পরপর কয়েক দিন একত্রে রোযা রাখা মাকরূহ।

৬. অর্থাৎ রোযার মধ্যে রাতে স্ত্রীসহবাসের অনুমতি রয়েছে, কিন্তু এতেকাফের সময় রাতে বা দিনে কোন সময়ই স্ত্রীগমনের অনুমতি নেই।

(অবাধ্যতা থেকে) বেঁচে থাকে[১]।

১৮৮. তোমরা পরস্পরের মধ্যে একে অন্যের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না[২] এবং তা এই উদ্দেশ্যে বিচারকগণের কাছে পৌছিয়ো না যে, মানুষের ধন-সম্পদের এক অংশ অন্যায় করে গ্রাস করে নেবে, অথচ তোমরা জান[৩]।

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

[রুকূ - ২৪]

১৮৯. তারা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে[৪]। আপনি বলুন, 'তা মানুষের (ইবাদত

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ

---

১. রোযা ও এতেকাফ সংক্রান্ত হালাল-হারামের যেসব হুকুম উল্লেখ করা হল, তা আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত বিধান, এর সীমারেখার বাইরে যাওয়া তো দূরের কথা, তার কাছেও যেয়ো না। অথবা অর্থ এই যে, স্বীয় বিবেক-বুদ্ধি বা অন্য কোন যুক্তিতে তার মধ্যে আদৌ কোন পার্থক্য করো না।

২. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**
রোযা দ্বারা নফসের পবিত্রতা উদ্দেশ্য ছিল। এখন ধন-সম্পত্তির পবিত্রকরণ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে। এ দ্বারা জানা গেল যে, হালাল মাল খাওয়া তো শুধু রোযা অবস্থায় নিষিদ্ধ, কিন্তু হারাম মাল থেকে রোযা (অর্থাৎ বিরত থাকা) চিরজীবনের জন্য। এর জন্য কোন সময়সীমা নির্ধারিত নেই। হারাম তরীকা যেমন : চুরি, খেয়ানত, প্রতারণা, সুদ, ঘুষ, জুলুম, জুয়া, অবৈধ বেচাকেনা ইত্যাদি দ্বারা ধন-সম্পদ অর্জন করা সম্পূর্ণ হারাম ও না-জায়েয।

৩. বিচারকদের পর্যন্ত পৌছিয়ো না, অর্থাৎ জালেম বিচারকদের কাছে কারো ধন-সম্পদের খবর দিয়ো না, অথবা নিজের সম্পদ বিচারককে উৎকোচরূপে দিয়ো না— এই উদ্দেশ্যে যে, তাকে নিজের পক্ষে এনে কারো ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করবে। তদ্রূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে বা মিথ্যা কসম খেয়ে বা মিথ্যা দাবি করে কারো মাল ভক্ষণ করো না, যখন তোমাদের জানাও আছে যে, তোমরা অন্যায় পথে আছ।

৪. **শানে নুযূল**
সূর্য সর্বদা এক আকৃতি, এক অবস্থায় থাকে। চাঁদের আকৃতিতে পরিবর্তন এবং তার পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে থাকে। তাই লোকেরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ জিজ্ঞাসা করল, এতে এই আয়াত নাযিল হল।

لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

ইত্যাদির) জন্য ও হজের জন্য সময়-নির্ধারক[১]। এ কোন পুণ্য নয় যে, তোমরা ঘরে তার পিছন দিক দিয়ে আসবে। বরং পুণ্য (-বান) তো সে, যে আল্লাহকে ভয় করে। অতএব তোমরা ঘরে আস তার দরজা দিয়ে এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হও[২]।

পূর্বাপর সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে রমযান মাস ও রোযার উল্লেখ ছিল, এই আয়াতে নতুন চাঁদের উল্লেখ রয়েছে। আর রোযা ও নতুন চাঁদের মধ্যে যে সম্পর্ক, তা সকলের জানা আছে। কারণ, এদের একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। সামনে হজ ও হজের আহকাম উল্লেখ করা হবে– এ প্রেক্ষিতেও নতুন চাঁদের উল্লেখ খুবই সংগত।

১. অর্থাৎ আপনি তাদের বলে দিন, চাঁদের এভাবে হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা মানুষের পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়াদির সময় জানা সহজ হয়েছে। অর্থাৎ মুআমালাত ও ইবাদাতের সময় ও তারিখ জানার সহজ উপায় হয়েছে, যেমন: লেন-দেন, গর্ভধারণ, শিশুকে দুগ্ধদানের মেয়াদ, রোযা, যাকাত ইত্যাদির সময়। বিশেষ করে হজের ব্যাপারে চাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, রোযা প্রভৃতি (যথাসময়ে আদায় না করা হলে) অন্য সময়ে কাযা হতে পারে, কিন্তু হজের কাযা তো নির্ধারিত সময়ের বাইরে হতে পারে না।

আর হজের উল্লেখ বিশেষভাবে করার কারণ এটাও যে, যিলকদ, যিলহজ, মুহররম ও রজব– এই চারটি সম্মানিত মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হানাহানি সকলের জন্য হারাম ছিল। কিন্তু ইসলাম-পূর্ব যুগের আরববাসীরা এই মাসগুলির ভিতর যুদ্ধ করার প্রয়োজন বোধ করলে মাসগুলিকে আগে-পাছে নিয়ে যুদ্ধ করত। যেমন, যিলহজ বা মুহররম মাসে যুদ্ধ করতে হলে একে সফর মাস বানিয়ে নিত এবং সফর এলে তাকে যিলহজ বা মুহররম নির্ধারিত করত। ওদের এহেন রীতি বাতিল করার উদ্দেশ্যে এস্থলে হজের বিষয়ে পরিষ্কার বলে দেওয়া হল যে, হজের জন্য আল্লাহ তাআলা যে দিন-তারিখ নির্ধারণ করেছেন, তাতে আগপাছ করা মোটেই জায়েয নয়।

সম্মুখে হজের আহকাম ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির দীর্ঘ বর্ণনা আসছে।

২. অন্ধকার যুগের একটি রীতি এও ছিল যে, ঘর থেকে বের হয়ে হজের এহরাম বাঁধার পর পুনরায় ঘরে আসার প্রয়োজন হলে দরজা দিয়ে না এসে ছাদে উঠে ঘরের ভিতর নামত অথবা ঘরের পিছন দিক ফাঁক করে প্রবেশ করত এবং একে নেকীর কাজ মনে করত। আল্লাহ তাআলা এই রীতিকে ভ্রান্ত আখ্যায়িত করলেন।

বি. দ্র. আয়াতের প্রথমাংশে হজের কথা রয়েছে, আর এ হুকুমও হজের সাথে সম্পর্কিত। তাই এখানে বর্ণনা করা হল।

১৯০. তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে[১]। | وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ

আর কোন কোন মুফাসসির বলেন, বাহ্যত আয়াতে أَهِلَّة দ্বারা হজের মাসসমূহ অর্থাৎ শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজের দশ দিন উদ্দেশ্য। হজের এহরাম এরই ভিতর করতে হয়। তো লোকেরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, এই দিনগুলিই কি হজের জন্য নির্ধারিত, না অন্য সময়েও হজ সম্পাদন করা যায়? আল্লাহ তাআলা উত্তরে বলে দিলেন, হজের জন্য হজের মাসসমূহই নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট। আর এ প্রসঙ্গেই এহরাম অবস্থায় ঘরে যাওয়ার বিধানও উল্লেখ করে দিলেন।

এ আয়াত থেকে এ সত্যও জানা গেল যে, নিজের পক্ষ থেকে কোন জায়েয ও মোবাহ বিষয়কে নেকী বানিয়ে নেওয়া এবং দীনের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া নিষিদ্ধ। অতএব এ দ্বারা অনেক বিষয়ের বেদআত ও দূষণীয় হওয়া প্রমাণিত হল (কেননা, কোন শরয়ী দলিল ছাড়া সেগুলোকে নেকী বানিয়ে নেওয়া হয়েছে- অনুবাদক)।

১. **শানে নুযূল**

হযরত ইবরাহীম আ. এর সময় থেকে মক্কা শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান ছিল। মক্কায় কেউ নিজ শত্রুকে পেলেও কিছু বলত না। এবং সম্মানিত মাসসমূহ অর্থাৎ যিলকদ, যিলহজ, মুহররম ও রজব - এই চারটি মাসও নিরাপত্তার সময় ছিল। এই মাসগুলিতে সমগ্র আরবে যুদ্ধ বন্ধ থাকত, কেউ কাউকে কিছু বলত না।

হিজরী ৬ সনের যিলকদ মাসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কার অভিমুখে রওনা হলেন। মক্কার নিকটবর্তী (হুদায়বিয়া নামক স্থানে) পৌছলে মক্কার মুশরিকরা দলবদ্ধভাবে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেল ও মুসলমানদের বাধা দিল। শেষ পর্যন্ত এই শর্তে সন্ধি হয় যে, এখন তাঁরা উমরা না করে ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর এসে উমরা করবেন এবং তিন দিন নিরাপদে মক্কায় অবস্থান করবেন। সে মত পরবর্তী বছর হিজরী ৭ সনে যিলকদ মাসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলে সাহাবীদের আশঙ্কা হল, এবারও যদি মক্কাবাসীরা ওয়াদা ভঙ্গ করে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, তবে তাঁরা সম্মানিত মাসে ও হরম শরীফে কী করে লড়বেন? আর না লড়লে উমরা কেমন করে করবেন? এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ নাযিল হল যে, ওরা যদি এই সম্মানিত মাসে ওয়াদা ভঙ্গ করে তোমাদের সঙ্গে লড়াই করে, তবে তোমরাও বিনা দ্বিধায় ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। হাঁ, তোমাদের পক্ষ থেকে শুরুতে বাড়াবাড়ি না হওয়া উচিত।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

হজের আলোচনার অধীনে হুদায়বিয়ার ঘটনা ও উমরার প্রসঙ্গে কাফেরদের সাথে যুদ্ধের আলোচনা এসে গেল। তাই জেহাদের কিছু হুকুম ও আদব সঙ্গতভাবেই এস্থলে বর্ণিত হচ্ছে। অতঃপর পুনরায় হজের আহকাম বয়ান করা হবে।

يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾

কিন্তু বাড়াবাড়ি করো না[১]। নিশ্চয় আল্লাহ বাড়াবাড়িকারীদের পছন্দ করেন না।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۗ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩١﴾

১৯১. আর ওদের হত্যা কর যেখানেই ওদের পাও এবং ওদের সেখান থেকে বের করে দাও যেখান থেকে ওরা তোমাদের বের করে দিয়েছে[২]। বস্তুত ফেত্না (অর্থাৎ দীন থেকে বিচ্যুত করা) হত্যা করার চেয়েও গুরুতর[৩]। তবে ওদের সাথে মসজিদুল হারামের নিকট যুদ্ধ করো না যতক্ষণ না ওরা সেখানে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তো যদি ওরা (নিজেরাই) তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তবে তোমরা ওদের হত্যা কর। কাফেরদের শাস্তি এমনই[৪]।

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٢﴾

১৯২. আর যদি ওরা বিরত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৫]।

---

১. 'বাড়াবাড়ি করো না'– এর অর্থ এই যে, যুদ্ধের মধ্যে স্বেচ্ছায় বালক, নারী ও বৃদ্ধদের হত্যা করবে না এবং হরম শরীফের ভিতর তোমরা প্রথমে যুদ্ধ শুরু করবে না।

২. 'যেখানেই পাও' অর্থাৎ হরমে বা হরমের বাইরে। আর 'যেখান থেকে তোমাদের বের করেছে' অর্থাৎ মক্কা থেকে।

৩. অর্থাৎ দীন থেকে নিজে ফিরে যাওয়া অথবা অন্যকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্মানিত মাসে হত্যাকাণ্ডের চেয়েও অনেক বড় অপরাধ। উদ্দেশ্য এই যে, মক্কার হরমের মধ্যে কাফেরদের শিরক করা এবং করানো, সেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার চেয়েও বেশি জঘন্য। অতএব হে মুসলমানেরা! তোমরা কোন রকম ভয় না করে ওদের দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দাও।

৪. অর্থাৎ মক্কা অবশ্যই নিরাপত্তার স্থান। কিন্তু ওরাই যখন শুরু করল এবং তোমাদের উপর জুলুম করল এবং ঈমান আনার কারণে দুশমনি করতে লাগল, যা হত্যাকাণ্ডের চেয়েও জঘন্য, সুতরাং এখন আর ওদের নিরাপত্তা রইল না, ওদের যেখানে পাও হত্যা কর।

পরিশেষে যখন মক্কা বিজয় হল, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নির্দেশই দিলেন যে, যে-ই হাতিয়ার ধারণ করে তাকেই হত্যা কর; অবশিষ্ট সকলকে নিরাপত্তা দান করলেন।

৫. অর্থাৎ এসব কিছু সত্ত্বেও এখনো যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং শিরক থেকে ফিরে আসে তবে ওদের তওবা গ্রহণযোগ্য।

১৯৩. তোমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত ফেত্না শেষ না হয় এবং আল্লাহরই জন্য হয়ে যায় আনুগত্য। আর যদি ওরা বিরত হয়, তবে জালেমরা ছাড়া কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করার অবকাশ নেই[১]।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۭ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝

১৯৪. সম্মানিত মাস সম্মানিত মাসের বদলে এবং সম্মানিত বিষয়াদির সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রে সমতার বিধান প্রযোজ্য। অতএব যে তোমাদের প্রতি বাড়াবাড়ি করবে, তোমরাও তার প্রতি বাড়াবাড়ি কর, যেরূপ বাড়াবাড়ি সে তোমাদের প্রতি করেছে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং জেনে রাখ, আল্লাহ পরহেজগারদের সঙ্গে আছেন[২]।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۭ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, জুলুম যেন মওকুফ হয়ে যায়, কাউকে দীন-ধর্ম থেকে বিচ্যুত না করা হয় এবং একমাত্র আল্লাহরই হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং শিরক থেকে ওরা ফিরে এলে জালেমদের ছাড়া আর কারো উপর বাড়াবাড়ি করা যাবে না। অর্থাৎ যারা দুষ্কর্ম থেকে ফিরে এল, তারা আর জালেম রইল না। অতএব তাদের উপর বাড়াবাড়িও করা যাবে না। হাঁ, যারা ফেতনা-ফাসাদ থেকে বিরত না হয়, তাদেরকে সাধ মিটিয়ে কতল করে যাও।

২. সম্মানিত মাস অর্থাৎ যিলকদ, যে মাসে তোমরা ওমরার কাযা করতে যাচ্ছ- তা স্থলবর্তী সেই সম্মানিত মাসের, অর্থাৎ গত বছরের যিলকদের, যে মাসে মক্কার কাফেররা তোমাদের ওমরা করতে ও মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল। অর্থাৎ এখন তোমরা সোৎসাহে ওদের থেকে বদলা গ্রহণ কর। কেননা, আদব ও মর্যাদা রক্ষায় সমতা প্রযোজ্য, অর্থাৎ কোন কাফের যদি সম্মানিত মাসের মর্যাদা রক্ষা করে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে, তবে তোমরাও তাই কর। (আর যে সম্মানের তোয়াক্কা না করে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়, তোমরাও তাকে যুদ্ধের স্বাদ আস্বাদন করাও)!

গত বছর (তোমরা ওমরা করতে গেলে) মক্কাবাসীরা তো সম্মানিত মাসের সম্মান রক্ষা করল না। মক্কার হরমের সম্মানও রক্ষা করল না এবং তোমাদের এহরামের মর্যাদাও দিল না, অথচ তোমরা এর উপরও ধৈর্য ধারণ করলে। এবারও যদি ওরা সকল মর্যাদা উপেক্ষা করে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়, তবে তোমরাও কোন মর্যাদার খেয়াল করো না, বরং আগে-পিছের সকল হিসাব মিটিয়ে নাও। তবে যাই কর, আল্লাহর ভয় রেখে করো, তাঁর অনুমতির খেলাফ কখনো (কিছু) যেন না হয়। আর আল্লাহ তাআলা পরহেজগারদের অবশ্যই সাহায্য-সহায়তাকারী।

১৯৫. তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর এবং নিজ হাতে (নিজেদের জীবনকে) ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না[১]। এবং সৎকর্ম কর, নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

وَاَنۡفِقُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَلَا تُلۡقُوۡا بِاَیۡدِیۡکُمۡ اِلَی التَّهۡلُکَۃِ ۚۖۛ وَاَحۡسِنُوۡا ۚۛ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الۡمُحۡسِنِیۡنَ ﴿۱۹۵﴾

১৯৬. এবং আল্লাহর জন্য হজ ও ওমরা পূর্ণ কর[২]। আর যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে কুরবানীর যে পশু সহজলভ্য হয় তা (কুরবানী করা তোমাদের উপর জরুরী)। এবং তোমাদের মাথা মুণ্ডন করো না যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু তার স্থানে না পৌঁছে[৩]। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হয়ে পড়বে অথবা তার মাথায় কোন কষ্ট দেখা দেবে, (তাকে) ফিদয়া (দিতে হবে)— রোযা, সদকা বা কুরবানীর দ্বারা[৪]। অতঃপর যখন তোমরা

وَاَتِمُّوا الۡحَجَّ وَالۡعُمۡرَۃَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنۡ اُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا اسۡتَیۡسَرَ مِنَ الۡهَدۡیِ ۚ وَلَا تَحۡلِقُوۡا رُءُوۡسَکُمۡ حَتّٰی یَبۡلُغَ الۡهَدۡیُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنۡ کَانَ مِنۡکُمۡ مَّرِیۡضًا اَوۡ بِهٖۤ اَذًی مِّنۡ رَّاۡسِهٖ فَفِدۡیَۃٌ مِّنۡ صِیَامٍ اَوۡ صَدَقَۃٍ اَوۡ نُسُکٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنۡتُمۡ فَمَنۡ تَمَتَّعَ بِالۡعُمۡرَۃِ اِلَی الۡحَجِّ فَمَا

---

১. উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর আনুগত্যের পথে অর্থাৎ জেহাদ ইত্যাদিতে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় কর এবং জেহাদ ছেড়ে দিয়ে বা জেহাদে স্বীয় ধন খরচ না করে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে ফেলো না। কেননা, জেহাদ থেকে বিমুখ হলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং দুশমন শক্তিশালী হবে।

২. হজের আলোচনায় জেহাদের প্রসঙ্গ এসে গিয়েছিল। এখন আবার হজ ও ওমরার আহকাম বর্ণিত হচ্ছে।

৩. অর্থাৎ যখন কেউ হজ বা ওমরা শুরু করল অর্থাৎ তার এহরাম বাঁধল, তখন তা পুরা করা তার উপর অবশ্য কর্তব্য, মধ্যভাগে ছেড়ে দিয়ে এহরাম খুলে ফেলা চলবে না। কিন্তু যদি অসুস্থতার কারণে বা শত্রু কর্তৃক মাঝ পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কেউ হজ বা ওমরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, তবে সহজে পাওয়া যায় এমন কোনো প্রাণী, কমপক্ষে এমন একটি ছাগল কুরবানী করতে হবে। কারো সঙ্গে তা মক্কায় পাঠাবে এবং হরম শরীফে যবেহ করার জন্য দিন-তারিখ ঠিক করে দেবে। সেখানে পৌছে যবেহ হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়ার পর মাথা মুণ্ডাবে অর্থাৎ এহরাম খুলবে।

৪. অর্থাৎ এহরাম অবস্থায় কেউ যদি অসুস্থ হয় অথবা তার মাথায় ব্যথা বা যখম হয়, তাহলে প্রয়োজনবশত এহরামের অবস্থায়ও মাথা মুণ্ডানো জায়েয আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ফিদ্য়া (তথা বিনিময়) দিতে হবে অর্থাৎ তার পরিবর্তে তিনটি রোযা রাখতে হবে অথবা ছয়জন অভাবীকে খানা খাওয়াতে হবে অথবা একটি মেষ বা বকরি কুরবানী করতে হবে। এহরাম অবস্থায় অসুস্থতার ফলে অপারগ হওয়ায় তাকে এহরামের পরিপন্থী কাজ করতে হল, এ কারণে একে 'দমে-জেনায়াত' (এহরাম পরিপন্থী কাজ করার বদলা বা জরিমানা) বলে।

নিরাপদ হবে, তখন যে ব্যক্তি হজের সাথে ওমরাকে মেলানোর দ্বারা লাভবান হবে, (তার জন্য জরুরী) কুরবানীর যে পশু সহজলভ্য হয় তা (কুরবানী করা)[১]। তবে যে না পাবে, সে হজের (সময়ে) তিন দিন রোযা রাখবে এবং যখন তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে তখন আরো সাত দিন (রোযা রাখবে)। এই হল পূর্ণ দশটি (রোযা)[২]। এ বিধান তার জন্য, যার পরিবার-পরিজন মসজিদুল হারামের কাছে থাকে না[৩]। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর শাস্তি বড় কঠিন।	اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

[রুকূ - ২৫]

১৯৭. হজের (সময়) হচ্ছে নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস[৪]। অতএব যে ব্যক্তি তাতে (নিজের	اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ

---

১. অর্থাৎ যে এহরামধারী রোগ ও শত্রু থেকে নিরাপদ রয়েছে— চাই প্রথম থেকেই নিরাপদ থাকুক অথবা শত্রু বা অসুস্থতার কারণে বিপদগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু সত্বর আপদ দূর হয়ে যাওয়ায় হজ ও ওমরার এহরামে বাধা থাকেনি— তার বিধান হল, সে যদি হজ ও ওমরা উভয়ই সম্পাদন করে অর্থাৎ হজ্জে-কেরান বা হজ্জে-তামাত্তু করে, এফরাদ হজ না, তবে তাকে একটি ছাগল অথবা উট বা গরুর এক সপ্তমাংশ কুরবানী করতে হবে। একে 'দমে কেরান' ও 'দমে তামাত্তু' বলে।

ইমাম আবু হানীফা একে 'দমে শোকর' বলেন এবং তাকে উক্ত কুরবানী থেকে খাওয়ার অনুমতি দেন। আর ইমাম শাফেয়ী 'দমে জবর' বলেন এবং কুরবানীকারীকে তা থেকে খাওয়ার অনুমতি দেন না।

২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি কেরান বা তামাত্তু হজ করল, কিন্তু তার কোরবানীর সামর্থ্য হল না, তাকে রোযা রাখতে হবে– হজের দিনগুলিতে ৩টি, যা আরাফার দিন অর্থাৎ ৯ই যিলহজের দিন শেষ হয়ে যায়, আর হজ থেকে সম্পূর্ণ অবসর হয়ে ৭টি। এই মোট ১০টি রোযা হল।

৩. অর্থাৎ হজ্জে-কেরান ও হজ্জে-তামাত্তু সেই ব্যক্তির জন্য, যে মসজিদুল হারাম অর্থাৎ মক্কার হরমের ভিতর বা তার নিকটে থাকে না, মিকাতের বাইরে বাস করে। আর যারা হরম শরীফের ভিতরের বাসিন্দা, তারা শুধু হজ্জে-এফরাদ করবে।

৪. শাওয়ালের প্রথম তারিখ থেকে শুরু করে কুরবানীর ঈদের ভোর অর্থাৎ যিলহজের দশম রাত পর্যন্ত সময় হচ্ছে 'আশহুরে-হজ' অর্থাৎ হজের মাসসমূহ। কেননা, হজের এহরাম উক্ত

فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿۱۹۷﴾

উপর) হজ ফরয করে নিল[১], (তার জন্য) হজের সময়ে না স্ত্রীসহবাস জায়েয, না গোনাহ করা, আর না ঝগড়া করা। আর তোমরা যা কিছু নেককাজ কর, আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা পাথেয় নিয়ে নিয়ো। কেননা, নিঃসন্দেহে পাথেয়ের উত্তম উপকার হচ্ছে (সওয়াল থেকে) বাঁচতে পারা*[২]। আর আমাকে ভয় করতে থাক হে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা!

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَاۤ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ

১৯৮. তোমাদের কোন গোনাহ নেই তোমাদের রবের অনুগ্রহ অন্বেষণ করায়[৩]। আর তোমরা যখন (তওয়াফের জন্য) আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন কর, তখন মাশআরুল

সময়ের ভিতর বাঁধতে হয়। এর পূর্বে বাঁধা জায়েয নয়, মাকরূহ। অর্থাৎ হজের জন্য এই কয়েকটি মাস নির্ধারিত ও সর্বজনবিদিত। আরবের মুশরিকরা নিজ প্রয়োজনে এগুলির মধ্যে পরিবর্তন করত, যাকে অন্য আয়াতে (তওবা-৩৭) বলা হয়েছে إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ–ওদের এ কর্ম সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন।

১. 'হজ ফরয করল' অর্থাৎ এভাবে হজের এহরাম বাঁধল যে, অন্তরে নিয়ত করল এবং মুখে তালবিয়া পড়ল।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'বস্তুত উৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া'।

২. জাহেলী যুগে একটি ভ্রান্ত রীতি এও ছিল যে, ওরা পাথেয় ছাড়া শূন্য হাতে হজে যাওয়াকে ছওয়াব মনে করত এবং একে তাওয়াক্কুল বলত। অতঃপর সেখানে গিয়ে সকলের কাছে সওয়াল করে বেড়াত। আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন, যাদের সামর্থ্য আছে তারা সঙ্গে পাথেয় নিয়ে যাবে, ফলে নিজেরা সওয়াল থেকে বাঁচবে এবং লোকদের পেরেশান করবে না।

৩. হজের সফরে যদি ব্যবসাও কর, তবে গোনাহ হবে না, বরং এটা মুবাহ। ব্যবসা সম্পর্কে লোকদের সন্দেহ হয়েছিল যে, হয়ত এর দ্বারা হজের ক্ষতি হবে। আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, হজই যার আসল উদ্দেশ্য হবে, আর এর অধীনে সে ব্যবসাও করে নেবে, তার ছওয়াবে ক্ষতি হবে না।

الْحَرَامِ ۪ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿١٩٨﴾

হারামের কাছে আল্লাহকে স্মরণ কর[১] এবং তাঁকে সেভাবে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন[২]। নিশ্চয়ই তোমরা ইতিপূর্বে ছিলে অজ্ঞ।

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٩﴾

১৯৯. অতঃপর তোমরাও (তওয়াফের জন্য) সে স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন কর, যে স্থান থেকে সকল মানুষ প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৩]।

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا

২০০. অতঃপর যখন তোমরা তোমাদের হজের কাজসমূহ সম্পাদন করে ফেল, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর যেরূপ তোমরা নিজেদের বাপদাদাকে স্মরণ করতে, বরং তার চেয়েও বেশি স্মরণ কর[৪]। মানুষের

---

১. 'মাশআরুল হারাম' একটি পাহাড়ের নাম, যা মুযদালিফায় অবস্থিত। সেই পাহাড়ের উপর হজের ইমাম অবস্থান করেন, তার উপর অবস্থান করাই উত্তম। তবে মুহাস্সার উপত্যকা বাদে সমগ্র মুযদালিফার যে কোন স্থানে অবস্থান করা জায়েয আছে।

২. কাফেররাও আল্লাহকে স্মরণ করত, কিন্তু শিরকসহ। অতএব সে রকম স্মরণ নয়, বরং তাওহীদের যে শিক্ষা তোমাদের দেওয়া হয়েছে, সেই তাওহীদসহ আল্লাহকে স্মরণ কর।

৩. জাহেলী যুগের আরেকটি ভুল রীতি এই ছিল যে, আরাফা হরম শরীফের বাইরে ছিল বলে মক্কার লোকেরা সেখানে যেত না, বরং হরমের সীমা অর্থাৎ মুযদালিফায় থেকে যেত। কুরায়শ ছাড়া আর সকল লোক আরাফায় যেত এবং সেখান থেকে তওয়াফের জন্য পুনরায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করত। এই ভুল রীতি খণ্ডনার্থে ইরশাদ হচ্ছে, যেখান থেকে সকল লোক তওয়াফ করতে আসে, তোমরাও সেখান থেকে অর্থাৎ আরাফায় গিয়ে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন কর এবং পূর্ব গোনাহর জন্য অনুতপ্ত হও।

৪. অর্থাৎ ১০ যিলহজে যখন হজের কাজকর্ম যথা: রমি বা কঙ্কর মারা, কুরবানী করা, মাথা মুণ্ডানো, বাইতুল্লাহর তওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঈ করে তোমরা অবসর হলে, তখন মিনায় অবস্থানকালে আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে কুফরীর যমানায় তোমাদের বাপ-দাদাদের স্মরণ করতে, বরং তার চেয়েও বেশি আল্লাহর যিক্র করা উচিত।

ওদের পুরাতন প্রথা ছিল, হজ থেকে অবসর হয়ে মিনাতে ৩ দিন অবস্থান করে বাজার বসাত এবং স্বীয় বাপ-দাদার গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করত। আল্লাহ তাআলা এই প্রথা নিষেধ করলেন এবং এরশাদ করলেন, এই দিনগুলিতে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব বয়ান কর।

মধ্যে কতক এমন, যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে দান কর,' আর তাদের জন্য আখেরাতে কোনই অংশ নেই।	وَمَا لَهٗ فِی الۡاٰخِرَۃِ مِنۡ خَلَاقٍ ﴿۲۰۰﴾
২০১. আর তাদের মধ্যে কতক এমন, যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদের বাঁচাও জাহান্নামের আযাব থেকে।'	وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ یَّقُوۡلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَۃً وَّفِی الۡاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾
২০২. এমন লোকদেরই জন্য রয়েছে তাদের উপার্জনের অংশ*[১]। আর আল্লাহ দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী[২]।	اُولٰٓئِکَ لَهُمۡ نَصِیۡبٌ مِّمَّا کَسَبُوۡا ؕ وَاللّٰهُ سَرِیۡعُ الۡحِسَابِ ﴿۲۰۲﴾
২০৩. তোমরা নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে আল্লাহকে স্মরণ কর[৩]। অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি চলে যাবে দুই দিনের মধ্যেই, তার কোনো	وَاذۡکُرُوا اللّٰهَ فِیۡۤ اَیَّامٍ مَّعۡدُوۡدٰتٍ ؕ فَمَنۡ تَعَجَّلَ فِیۡ یَوۡمَیۡنِ فَلَاۤ اِثۡمَ عَلَیۡهِ ۚ وَمَنۡ

✯ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'তাদেরই জন্য রয়েছে (প্রতিদানের) অংশ—তারা যা করেছে তার কারণে'।

১. পূর্বে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ কর, অন্যের স্মরণ করো না। এখন বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলাকে যারা স্মরণ করে এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করে, তারাও দুই শ্রেণির। প্রথম শ্রেণীর কাম্য একমাত্র দুনিয়া। ওদের প্রার্থনা এই যে, যা কিছু ধন-দৌলত, মান-মর্যাদা, ইত্যাদি দেওয়ার আছে দুনিয়াতেই দেওয়া হোক। সুতরাং এ ধরনের লোকেরা পরকালের নে'য়ামতরাশি থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর কাম্য আখেরাত। তারা দুনিয়ার কল্যাণ অর্থাৎ ইবাদত বন্দেগী ইত্যাদির তাওফীক ও আখেরাতের কল্যাণ অর্থাৎ ছওয়াব, রহমত ও বেহেশত উভয় কল্যাণই কামনা করে। অতএব এ রকম লোকেরা পরকালে তাদের হজ, দো'য়া প্রভৃতি নেককাজের সুফল পূর্ণ মাত্রায় লাভ করবে।

২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সকলেরই হিসাব সত্বর নিয়ে নেবেন। অথবা অর্থ এই যে, কিয়ামতকে দূরবর্তী মনে করো না, তা সত্বর সংঘটিত হবে। তা থেকে কোন উপায়েই আত্মরক্ষা সম্ভব নয়। সুতরাং তার চিন্তা-ফিকির থেকে গাফেল হয়ো না।

৩. 'নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন' বলতে যিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ উদ্দেশ্য। হজ সেরে এ তিন দিন মিনায় অবস্থান করার হুকুম। এই কয়েকটি দিনে জামরাসমূহের রমি অর্থাৎ কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময় ও প্রত্যেক নামাযের পর তাকবীর বলার নির্দেশ রয়েছে। এ দিনগুলির অন্যান্য সময়েও তাকবীর ও আল্লাহর যিক্র বেশি বেশি করা উচিত।

تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

গোনাহ নেই এবং যে দেরিতে যাবে, তারও কোনো গোনাহ নেই। (এ বিধান) তার জন্য, যে (আল্লাহকে) ভয় করে[১]। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমাদের সকলকে তাঁরই নিকট সমবেত করা হবে[২]।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

২০৪. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, পার্থিব জীবনের (বিষয়াদি) সম্পর্কে যার কথা আপনাকে চমৎকৃত করে এবং সে নিজ অন্তরে যা আছে তা সম্বন্ধে আল্লাহকে সাক্ষী বানায়, অথচ সে অত্যন্ত ঝগড়াটে।

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

২০৫. আর যখন (আপনার নিকট থেকে) চলে যায়, তখন যমীনের বুকে এজন্য দৌড়-ঝাঁপ করে যে, তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং ফসল ও জীবজন্তু বিনাশ করবে। অথচ আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টি পছন্দ করেন না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ

২০৬. আর যখন ওকে বলা হয়, 'তুমি আল্লাহকে ভয় কর', তখন অহমিকা ওকে গোনাহর প্রতি আরো প্ররোচিত করে। অতএব

---

১. অর্থাৎ গোনাহ হচ্ছে শরী'য়তের নিষেধসমূহ থেকে বেঁচে না থাকা। অতএব যদি কেউ আল্লাহকে ভয় করে এবং হজের সময় পরহেজগারীর খেলাফ না করে, তবে সে মিনাতে দুদিন অবস্থান করুক, বা তিন দিন, এ বিষয়ে কোন গোনাহ নেই। আল্লাহ তাআলা উভয়টিই জায়েয রেখেছেন, তবে তিন দিন অবস্থান করাই উত্তম।

২. অর্থাৎ আল্লাহ-ভীতি শুধু হজের বৈশিষ্ট্য নয়, বরং সকল কাজে ও সকল সময়ে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে থাক। কেননা, হিসাব-কিতাবের জন্য তোমাদের সকলকে কবর থেকে উঠে তাঁর কাছে সমবেত হতে হবে।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

এখানে হজের বর্ণনা শেষ হল। তবে হজের আলোচনাতে একটু পূর্বে فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ এবং وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ আয়াতদ্বয়ে (২০০-২০১) যে দুই শ্রেণীর লোক অর্থাৎ কাফের ও মুমিনের উল্লেখ হয়েছিল, তার সঙ্গে সংগতি রেখে সামনে তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ মুনাফেকের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে।

وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

জাহান্নামই ওর জন্য যথেষ্ট। আর নিশ্চয় তা অতি নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল[১]।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ ۗ وَاللهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ۝

২০৭. আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে স্বীয় প্রাণ বিক্রি করে দেয়[২]। আর আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি অতি মেহেরবান[৩]।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ

২০৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে প্রবেশ কর পরিপূর্ণরূপে[৪] এবং শয়তানের পদাঙ্ক

১. এ হচ্ছে মুনাফেকের অবস্থা। বাহ্যত সে (মুসলমানদের) তোষামোদ করে এবং আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলে, আমি সত্যবাদী এবং আমার অন্তরে ইসলামের মহব্বত রয়েছে। কিন্তু ঝগড়া-বিবাদে কোন ত্রুটি করে না, আর সুযোগ পেলে ছিনতাই ও হানাহানি শুরু করে। বাধা দিলে ওর জিদ বেড়ে যায়, ফলে আরো বেশি পাপে লিপ্ত হয়।

কথিত আছে, আখনাস বিন শারীক নামে এক মুনাফিক উক্ত চরিত্রের ছিল। সে অত্যন্ত বাকপটু ছিল। যখন সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসত, তখন পরম আন্তরিকতা ও ইসলামের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করত। আর যখন দরবার মুবারক থেকে চলে যেত তখন কারো ফসল নষ্ট করত, কারো জন্তুর পা কেটে দিত। এ প্রেক্ষাপটে মুনাফিকদের দুষ্কর্ম বর্ণনা করে এই আয়াতের অবতরণ হয়। (তাফসীরে তবারী ৩/৫৭২)

২. পূর্ব আয়াতগুলিতে সেই মুনাফেকের উল্লেখ ছিল, যে দীনের বদলে দুনিয়া গ্রহণ করত। পক্ষান্তরে বর্তমান আয়াতে সেই খাঁটি মুমিনের উল্লেখ হয়েছে, যে দুনিয়া ও জান-মাল সবই দীনের জন্য ব্যয় করে।

কথিত আছে, হযরত সোহাইব রুমী (রা) হিযরতের উদ্দেশ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসছিলেন। পথিমধ্যে মুশরিকরা তাঁকে ঘিরে ধরলে তিনি বললেন, আমি এই শর্তে আমার বাড়ীঘর ও সব ধনসম্পত্তি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি যে, তোমরা আমাকে মদীনায় যেতে দেবে এবং হিজরত থেকে নিবৃত্ত করবে না। এতে ওরা রাযী হল এবং তিনি খেদমতে নববীতে হাযির হয়ে গেলেন। এর প্রেক্ষিতে মুখলেস মমিনদের প্রশংসায় বর্তমান আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে ইবনে আবি হাতিম, বর্ণনা ১৯৩৯)

৩. আল্লাহ তাআলার কত বড় রহমত যে, তিনি নিজ বান্দাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জান ও মাল ব্যয় করার তাওফীক দান করেন। তদুপরি প্রত্যেকের জান-মাল আল্লাহর স্বত্ব হওয়া সত্ত্বেও বেহেশতের বিনিময়ে তিনি তা ক্রয় করেছেন! এ তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়।

৪. পূর্ববর্তী আয়াতে খাঁটি মুমিনের প্রশংসা ছিল, উদ্দেশ্য ছিল মুনাফিকীর খণ্ডন। বর্তমান আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, ইসলামকে পুরাপুরি গ্রহণ কর অর্থাৎ বাইরে-ভিতরে, কর্মে ও বিশ্বাসে একমাত্র ইসলামের হুকুম-আহকামেরই অনুসরণ কর। নিজ বুদ্ধিতে বা আর কারো

كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

অনুসরণ করো না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন[১]।

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

২০৯. আর যদি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট বিধানাবলি আসার পরও তোমরা পদস্খলিত হও, তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[২]।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى

২১০. ওরা কি এরই অপেক্ষায় আছে যে, আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ মেঘের চাঁদোয়ায় ওদের নিকট আসবেন এবং সব কিছুর মীমাংসা করে দেওয়া হবে? আর সমস্ত বিষয়

কথায় কোনো বিধান মেনে নিয়ো না, অথবা আমল করো না। এ দ্বারা বেদআতের উচ্ছেদ সাধন উদ্দেশ্য। কারণ, কোন আকীদা বা আমলকে কোন কারণে ভাল মনে করে নিজের পক্ষ থেকে দীনের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়াই বেদআতের মূলকথা। উদাহরণস্বরূপ: নামায ও রোযার মত উত্তম ইবাদতকে কেউ শরীয়তের নির্দেশ ছাড়া নিজ পক্ষ থেকে নির্ধারণ করল– যেমন, ঈদের দিনে ঈদের মাঠে নফল নামায পড়া অথবা রজব মাসের সাতাশ তারিখ নফল রোযা রাখা, এ বেদআত। এই আয়াতগুলির মর্মকথা এই যে, এখলাসের সাথে ঈমান গ্রহণ কর এবং বেদআত থেকে বেঁচে থাক।

ইহুদী সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইসলামের আহকাম পালন করার সাথে সাথে তাওরাতের আহকামের প্রতিও তাদের অনুরাগ প্রকাশ পাচ্ছিল। যেমন: শনিবারের দিনকে মর্যাদার দিন মনে করা, উটের গোশত ও দুধকে হারাম জ্ঞান করা এবং তাওরাত তেলাওয়াত করা। এতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, যার দ্বারা বেদআতের দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দেওয়া হল।

১. শয়তান ওয়াসওয়াসা দিয়ে ভিত্তিহীন জিনিসকে তোমাদের অন্তরে গেঁথে দেয় এবং বেদআতকে দীনের অন্তর্ভুক্ত করিয়ে তোমাদের দীন নষ্ট করে।

২. অর্থাৎ শরীয়তে মুহাম্মদীর পরিষ্কার আহকাম জানার পরও যদি কেউ তার উপর স্থির না থাকে বরং অন্য দিকেও দৃষ্টি দেয়, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ সকলের উপর শক্তিশালী। যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন, কেউই তাঁর শাস্তি রোধ করতে পারবে না। সেই সঙ্গে তিনি বড়ই হেকমতওয়ালা, যা করেন ন্যায় ও মঙ্গল উদ্দেশ্যেই করেন– চাই শাস্তি দেন বা অবকাশ দেন। অর্থাৎ তিনি তাড়াহুড়াও করেন না, ভুলেও যান না, বা ইনসাফবিরোধী ও অসংগত কাজও করেন না।

আল্লাহরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে[১]।

اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ

[রুকূ - ২৬]

২১১. আপনি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি তাদের কত কত সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছিলাম[২]! আর যে আল্লাহর নে'য়ামত পরিবর্তন করে ফেলবে তা তার নিকট আসার পর, তো আল্লাহর শাস্তি বড় কঠিন[৩]।

سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

২১২. কাফেরদের জন্য দুনিয়ার জীবনকে সুশোভিত করা হয়েছে এবং ওরা ঈমানদারদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে[৪]। আর

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পরিষ্কার আহকাম জানার পরও যারা নিজেদের বক্রতা থেকে নিবৃত্ত না হয়, তাদের তো আল্লাহর রাসূল ও কুরআনে স্থির বিশ্বাস ও আস্থা হল না। এখন শুধু এটাই বাকী যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ ওদের সামনে উপস্থিত হন এবং যে শাস্তি ও পুরস্কার পরকালে হওয়ার, তার মীমাংসা আজই হয়ে যাক। তো, শেষ পর্যন্ত হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি প্রভৃতি– সকল বিষয় আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে এবং সমস্ত ফয়সালা তাঁরই নিকট থেকে জারী হবে। এতে দ্বিধা-সন্দেহের কোন কারণ নেই।

২. ইতিপূর্বে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার পরিষ্কার হুকুমের পর তার বিরোধিতা করা শাস্তির কারণ। এখন তারই সমর্থনে আল্লাহ বলছেন, স্বয়ং বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করুন, ওদের প্রতি আমি কত সুস্পষ্ট আয়াত ও প্রকাশ্য হুকুম পাঠিয়েছিলাম। যখন ওরা সেসব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, তখন আযাবে পতিত হল। আমি প্রথমেই ওদের শাস্তি দিয়েছি, তা নয়।

৩. অর্থাৎ এটি একটি নিশ্চিত বিষয় যে, যে ব্যক্তি হেদায়াতের আলোসম্বলিত খোদায়ী হুকুম-আহকামের পরিবর্তন করবে এবং তাঁর নে'য়ামত ও অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে, আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধানের এ রকম পরিবর্তনকারীদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কেননা, ওরা দুনিয়াতে নিহত হবে ও লুণ্ঠিত হবে, কিংবা জিযিয়া দিয়ে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে থাকবে এবং কিয়ামতে চিরকালের জন্য দোযখে যাবে।

৪. অর্থাৎ কাফেররা যে আল্লাহর সুস্পষ্ট আহকামের এবং তাঁর পয়গম্বরদের বিরোধিতা করে, তার কারণ এই যে, কাফেরদের মন-মস্তিষ্কে দুনিয়ার আকর্ষণ এমনই প্রভাব বিস্তার করেছে যে, এর মোকাবেলায় আখেরাতের কষ্ট ও আরামের কথা চিন্তাই করে না, বরং যারা আখেরাতের চিন্তায় সদাব্যস্ত এবং আল্লাহর আহকাম পালনে রত, সেই মুসলমানদের ওরা

اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

যারা পরহেজগার, তারা কিয়ামতের দিন ওদের চেয়ে উচ্চস্তরে থাকবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন[১]।

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۫ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ

২১৩. সকল মানুষ একই দীনের উপর ছিল*। অতঃপর আল্লাহ নবীদের প্রেরণ করেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাঁদের সঙ্গে সত্য কিতাব নাযিল করেন, যাতে তা মানুষের মাঝে সেই বিষয়ে ফয়সালা করে দেয় যাতে তারা মতবিরোধ করেছিল। আর সেই কিতাবে তারাই মতবিরোধ করেছে যাদের তা দেওয়া হয়েছিল– তাদের নিকট সুস্পষ্ট বিধানাবলি আসার পরও, পরস্পরের জেদের কারণে। অতঃপর আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় ঈমানদারগণকে সেই সত্য বিষয়ের পথপ্রদর্শন করলেন, যে বিষয়ে লোকেরা মতবিরোধ করেছিল। আর আল্লাহ যাকে

উলটা উপহাস করে এবং হেয় জ্ঞান করে। সুতরাং এমন আহমক, প্রবৃত্তির দাসদের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান পালনের আশা কী করে করা যায়?

মুশরিক সর্দাররা বেলাল রা., আম্মার রা., সোহাইব রা. ও দরিদ্র মুহাজেরদের দেখে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলত, এই নাদানরা আখেরাতের চিন্তায় দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদকে মাথা পেতে নিয়েছে! এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখ, তিনি এই ফকীর মিসকীনদের সাহায্যে আরব সর্দারদের উপর বিজয় লাভ এবং সারা দুনিয়ার সংস্কার সাধনের স্বপ্ন দেখেন!

১. আল্লাহ তাআলা তার উত্তরে ইরশাদ করেন যে, এ ওদের অজ্ঞতা ও খামখেয়ালীর পরিচায়ক। কেননা, ওরা দুনিয়ার যিন্দেগীর প্রতি এতই আসক্ত যে, ওরা জানে না, এই নিঃস্ব দরিদ্র (ঈমানদারদের) মর্যাদা কিয়ামতের দিন ওদের অনেক উর্ধ্বে হবে। আর আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতে যাকে ইচ্ছা অফুরন্ত রিযিক দান করেন। উদাহরণস্বরূপ, কাফেররা যে গরীবদের বিদ্রূপ করত, তাদেরই আল্লাহ তাআলা দুই ইহুদী সম্প্রদায় বনী কুরায়জা ও বনী নযীরের ধন-সম্পত্তির উপর এবং পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য প্রভৃতির উপর বিজয় ও আধিপত্য দান করেন।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'সকল মানুষ এক ও অভিন্ন উম্মত ছিল।

ইচ্ছা সরলপথ প্রদর্শন করেন[১]। | يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾

১. হযরত আদম আ. এর সময় থেকে এক বিশেষ কাল পর্যন্ত একই সঠিক-সত্য দীন প্রচলিত ছিল। পরবর্তী সময়ে লোকেরা দীনের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করলে আল্লাহ তাআলা নবীদের পাঠালেন। তাঁরা ঈমান ও আমলওয়ালা লোকদের ছওয়াবের সুসংবাদ দিতেন এবং কাফের ও পাপীদের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করতেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁদের সঙ্গে সঠিক-সত্য কিতাবও পাঠালেন, যাতে মানুষের মতবিরোধ ও কলহ দূরীভূত হয় এবং তাদের মতবিরোধ থেকে সত্য ধর্ম রক্ষা পায় ও তা কায়েম থাকে। আর আল্লাহ তাআলার আহকামের মধ্যে সেই লোকেরাই মতবিরোধ সৃষ্টি করল, যারা সেই কিতাব লাভ করেছিল। যেমন, ইহুদী ও নাসারারা তাওরাত ও ইন্জীলের মধ্যে মতবিরোধ ও তাহরীফ (বিকৃতি সাধন) করত। আর ওদের এ মতবিরোধ অজ্ঞতাপ্রসূত ছিল না, বরং ওরা জেনেশুনে শুধু দুনিয়ার মহব্বতে পড়ে এবং পরস্পরে জিদ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে এরূপ করত। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা স্বীয় মেহেরবাণীতে ঈমানদারদের সঠিক-সত্য পথের হেদায়েত দান করলেন এবং পথভ্রষ্টদের মতবিরোধ থেকে তাদের রক্ষা করলেন। যেমন উম্মতে মুহাম্মদীকে প্রতিটি আকীদা ও প্রত্যেকটি আমলের ক্ষেত্রে সত্য বিষয়ের তা'লীম দিয়েছেন এবং ইহুদী ও নাসারাদের মতবিরোধ, বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা থেকে হেফাজত করেছেন।

বি. দ্র.

এ আয়াত থেকে দুটি বিষয় জানা গেল। একটি হল, আল্লাহ তাআলা যে বিভিন্ন কিতাব ও নবী পাঠালেন, এর উদ্দেশ্য প্রত্যেক ফেরকার জন্য পৃথক তরীকা বাতলানো নয়; বরং সকলের জন্য আল্লাহ তাআলা মৌলিকভাবে একই পথ নির্ধারণ করেছিলেন। যখন মানুষ এই পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তখন তিনি নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে তারা নবী ও কিতাবের অনুসরণ করে। পরে যখন তারা আবার পথচ্যুত হয়েছে, তখন সেই একই পথকে কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ অন্য নবী ও কিতাব পাঠিয়েছেন। এর দৃষ্টান্ত : স্বাস্থ্য একক জিনিস, কিন্তু রোগ অসংখ্য। যখন এক রোগ হল তখন তার উপযুক্ত ঔষধ-পথ্য দিলেন, আবার যখন অন্য রোগ দেখা দিল তখন সেই মতো অন্য ওষুধ ও পথ্য দেওয়া হল। সর্বশেষে এমন তরীকা ও নিয়ম (অর্থাৎ ব্যবস্থা) দিয়ে দিলেন, যা সর্বরোগের মহৌষধ– সকল ওষুধের পরিবর্তে যথেষ্ট। সেই তরীকাটি হল ইসলাম। এরই জন্য সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরআন শরীফ প্রেরিত হয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি এই, আল্লাহর চিরন্তন রীতি হচ্ছে, মন্দ লোকেরা প্রত্যেক নবীর বিরোধিতা এবং প্রত্যেক আসমানী কিতাবে মতভেদ করতে পছন্দ করেছে এবং তাতে সচেষ্ট রয়েছে। অতএব কাফেরদের অনাচার-দুরাচার ও ফেতনা-ফাসাদের কারণে মুমিন-মুসলমানদের ভারাক্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا
يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ
مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا
حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ
مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ
قَرِيْبٌ ﴿٢١٤﴾

২১৪. তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের অনুরূপ অবস্থা আসেনি? তাদের স্পর্শ করেছিল অভাব-অনটন ও রোগ-যাতনা এবং তারা প্রকম্পিত হয়েছিল। এমন কি রাসূল ও তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিলেন তাঁরা বলতে শুরু করলেন, 'কখন আসবে আল্লাহর সাহয্য?' শুনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটেই[১]।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ۖ قُلْ مَآ
أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ

২১৫. তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তারা কী ব্যয় করবে[২]?' আপনি বলে দিন, 'যে ধন-

---

১. ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, শত্রুদের হাতে নবীগণ ও তাঁদের উম্মতগণ সকল যুগে কষ্ট-নির্যাতন ভোগ করেছেন। এখন মুসলমানদের বলা হচ্ছে, তোমরা এই আশা করছ যে, বেহেশতে প্রবেশ করবে, অথচ পূর্ববর্তী উম্মতগণ যে সকল দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিল, তোমরা (এখনও) সেই সবের সম্মুখীন হওনি। তারা এমন কঠিন দারিদ্র্য ও অন্নকষ্ট, রোগ-শোক ও শত্রুর ভয়-ভীতির সম্মুখীন হয়েছিল যে, বাধ্য-অক্ষম হয়ে স্বয়ং নবী ও তাঁর সঙ্গী উম্মতগণ বলে উঠেছেন, 'আল্লাহই জানেন, যে সাহায্য-সহায়তার ওয়াদা তিনি করেছিলেন তা কখন আসবে?' অর্থাৎ মানবীয় দুর্বলতার কারণে এহেন পেরেশান অবস্থায় তাদের মুখ থেকে নিরাশার শব্দাবলি বের হতে লাগল।

নবীদের ও মুমিনদের এরূপ উক্তি কোন সন্দেহের কারণে ছিল না। এ সম্পর্কে মাওলানা রুমী (র) মছনবী শরীফে বলেন-

در گمان افتاد جان انبیاء — ز اتفاق منکری اشقیاء

'হতভাগা অবিশ্বাসীদের ঐক্যে নবীগণের মনেও উকি-ঝুকি দেয় নানা ধারণা।'

বরং এ ছিল অস্থির অবস্থায় মানব-স্বভাবের সাধারণ অভিব্যক্তি; এতে তাঁদের মোটেই দোষারোপ করা যায় না।

যখন পরিস্থিতি ও অবস্থা এ পর্যন্ত পৌঁছল, তখন আল্লাহর রহমত ধাবিত হল এবং ইরশাদ হল, শুনে নাও! আল্লাহর মদদ এসে পড়েছে, ভয় পেয়ো না। কাজেই মুসলমানগণ! পার্থিব দুঃখ-কষ্টে ও শত্রুদের প্রাবল্যে ঘাবড়িয়ো না, বরং ধৈর্য ধারণ কর এবং স্থির ও অবিচল থাক।

২. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে অত্যন্ত তাগিদের সাথে বলা হয়েছে যে, কুফরী ও মুনাফিকী পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর, আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কারো কথা

وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝

সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে, তা (ব্যয় করবে) পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য[১]। আর তোমরা যা কিছু নেককাজ কর, সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ সবিশেষ অবগত।'

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

২১৬. তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হল[২], যদিও তা তোমাদের নিকট অপ্রিয়[৩]। আর

শুনবে না, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জান-মাল ব্যয় কর এবং সব রকম দুঃখকষ্ট সহ্য কর। এখন বর্তমান আয়াত থেকে উল্লিখিত মৌল বিধানের শাখা-প্রশাখা তথাঃ জান-মাল ও বিবাহ-তালাক, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধানাবলি সবিস্তারে আলোচনা করা হচ্ছে, যাতে সেই মৌল বিধানের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

১. কোন কোন ধনী সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ধন-সম্পদ থেকে কী খরচ করব এবং কার জন্য খরচ করব? এ প্রসঙ্গে নির্দেশ এল যে, কমবেশি যাই আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য খরচ করবে—তা মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজন, এতীম, অভাবী ও মুসাফিরদের জন্য। অর্থাৎ ছওয়াব লাভের জন্য যদি খরচ করতে চাও, তবে যত পার কর, পরিমাণ নির্দিষ্ট ও সীমিত নয়। হাঁ, আমি যে সকল পাত্রের কথা বললাম তাতে অবশ্যই খরচ করবে।

২. অর্থাৎ দীনের দুশমনদের সঙ্গে লড়াই করা ফরয হল।

বি. দ্র. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফে থাকাকালে মুসলমানদের জন্য যুদ্ধের অনুমতি হয়নি। মদীনা শরীফে হিজরত করার পর অনুমতি হল বটে, কিন্তু শুধু সেই কাফেরদের সাথে, যারা নিজেরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। আরও পরে ব্যাপকভাবে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয় এবং জেহাদ ফরয হয়।

যদি দীনের শত্রুরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে, তবে মুসলমানদের উপর জেহাদ ফরযে আইন, নতুবা ফরযে কেফায়া। তবে শর্ত এই যে, ফেকাহর কিতাবে উল্লেখিত জেহাদের শর্তাবলী বর্তমান থাকা চাই। অবশ্য যে কাফেরদের সাথে মুসলমানরা সন্ধি ও চুক্তিবদ্ধ হবে, অথবা যারা মুসলমানদের নিরাপত্তা ও হেফাজতে এসে পড়বে, তাদের সাথে যুদ্ধ করা অথবা তাদের বিরুদ্ধে তাদের কোন শত্রুকে সাহায্য করা মুসলমানদের জন্য কিছুতেই জায়েয নয়।

৩. অপ্রিয় হওয়ার অর্থ এই যে, নফসের কাছে কঠিন ও কষ্টকর মনে হয়। এ অর্থ নয় যে, প্রতিবাদযোগ্য বা অস্বীকারযোগ্য এবং হেকমত ও মঙ্গলের খেলাফ মনে হয় এবং অসন্তুষ্টি ও ঘৃণার উদ্রেক করে। অতএব এতটুকুতে কোন দোষ নেই। যেহেতু স্বভাবতই মানুষের কাছে জীবনের চেয়ে আর কোন কিছু প্রিয় নয়, সেহেতু যুদ্ধের চেয়ে কঠিন কোন কিছু মনে হবে না।

وَعَسٰۤى اَنۡ تَكۡرَهُوۡا شَيۡـًٔا وَّهُوَ خَيۡرٌ لَّـكُمۡ‌ۚ وَعَسٰۤى اَنۡ تُحِبُّوۡا شَيۡـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّـكُمۡ‌ؕ وَاللّٰهُ يَعۡلَمُ وَاَنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ۝

হতে পারে যে, তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ কর, অথচ তা তোমাদের জন্য উত্তম; এবং এও সম্ভব যে, তোমরা একটি জিনিস পছন্দ কর, অথচ তা তোমাদের জন্য মন্দ। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না[১]।

[রুকূ - ২৭]

يَسۡـَٔلُوۡنَكَ عَنِ الشَّهۡرِ الۡحَـرَامِ قِتَالٍ فِيۡهِ‌ؕ قُلۡ قِتَالٌ فِيۡهِ كَبِيۡرٌ‌ؕ وَصَدٌّ عَنۡ

২১৭. তারা আপনাকে সম্মানিত মাস সম্পর্কে (অর্থাৎ) তাতে যুদ্ধ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করে[২]। আপনি বলে দিন, 'তাতে যুদ্ধ করা

---

১. অর্থাৎ কোন জিনিস তোমরা নিজেদের পক্ষে উপকারী বা ক্ষতিকর মনে করলে তা যে বাস্তবেই তোমাদের জন্য তেমনই হবে, এ জরুরী নয়। বরং হতে পারে, একটা জিনিস তোমরা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর মনে কর অথচ তা পরিণামে তোমাদের জন্য উপকারী; আবার কোন জিনিসকে উপকারী মনে কর অথচ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর।

তোমরা মনে করে নিয়েছ যে, জেহাদে জান ও মাল সব কিছুর ক্ষতি আর জেহাদ বর্জন করার মধ্যে উভয়ের নিরাপত্তা, অথচ জেহাদের মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কী কী উপকার রয়েছে এবং জেহাদ বর্জন করার মধ্যে কী কী ক্ষতি রয়েছে— তা জানলে না! বস্তুত তোমাদের লাভ-লোকসান কীসে, তা আল্লাহ-ই ভাল জানেন, তোমরা জান না। অতএব তিনি যে হুকুম দেন, তাকে সত্য-সঠিক মনে কর এবং নিজেদের এই ধারণা পরিত্যাগ কর।

২. **শানে নুযূল**

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য মুসলমানদের একটি জামাত পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা কাফেরদের হত্যা করে ধনসম্পদ ছিনিয়ে আনলেন। মুসলমানদের জানা মতে তা জুমাদাছ ছানীর শেষ দিন ছিল। আসলে তা ছিল রজবের পহেলা তারিখ। আর রজব মাস সম্মানিত মাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই কাফেররা দোষারোপ করে বলতে লাগল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হারাম মাসকেও হালাল করে দিলেন এবং স্বীয় অনুসারীদের হারাম মাসে লুটতরাজের অনুমতি দিয়ে দিলেন। মুসলমানরা খেদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, অজানা অবস্থায় আমাদের দ্বারা এ কাজ হয়ে গেছে, এখন কী করনীয়? এতে বর্তমান আয়াত নাযিল হল। (তাফসীরে তবারী ৩/৬৫০-৬৫৩)

বড় পাপ[১]।' কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দেওয়া, তাঁকে অমান্য করা, মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেওয়া এবং তার বাসিন্দাদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া আল্লাহর নিকট তার চেয়েও অনেক বড় পাপ[২]। আর (মানুষকে) দীন থেকে বিচ্যুত করা হত্যা থেকেও গুরুতর[৩]। কাফেররা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যে পর্যন্ত না তোমাদের ফিরিয়ে দিচ্ছে তোমাদের ধর্ম থেকে, যদি ওরা সক্ষম হয়[৪]। আর তোমাদের

سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ

১. অর্থাৎ হারাম মাসে লড়াই করা অবশ্যই গোনাহ, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম তো নিজেদের জানা মতে জুমাদাছ ছানীতে জেহাদ করেছিলেন। অতএব তারা ক্ষমার যোগ্য, তাদের দোষারোপ করা অন্যায়।

২. অর্থাৎ লোকদের ইসলাম গ্রহণে বাধা দেওয়া এবং নিজেরা ইসলাম গ্রহণ না করা, বাইতুল্লাহ শরীফের যিয়ারতে লোকদের বাধা দেওয়া, মক্কাবাসীদের সেখান থেকে বহিষ্কার করা— এসব বিষয় হারাম মাসে লড়াই করার চেয়েও কঠিন গোনাহ। আর কাফেররা অহরহ এসব কিছু করত। সারকথা, হারাম মাসে অযথা ও অন্যায়ভাবে লড়াই করা অবশ্যই কঠিন গোনাহ, কিন্তু যারা হরম শরীফেও কুফরীর বিস্তার ঘটায়, বড় বড় অন্যায়-অপকর্ম করে, হারাম মাসসমূহেও মুসলমানদের নির্যাতন করতে ত্রুটি করে না, ওদের সঙ্গে লড়াই করতে নিষেধ নেই। অধিকন্তু যেখানে মুশরিকরা এসব গর্হিত কাজে তৎপর রয়েছে, সেখানে মুসলমানদের একটুখানি ত্রুটির জন্য, তাও অজ্ঞতাহেতু, দোষ-ত্রুটি বের করে তাদের দোষারোপ করা মুশরিকদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাকর কথা।

৩. অর্থাৎ মানুষ যাতে সত্য ধর্ম গ্রহণ না করে, এই উদ্দেশ্যে ধর্মের বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা সেই হত্যার চেয়েও বহুগুণ বেশি নিন্দনীয়, যে হত্যা হারাম মাসে মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে গেছে। মুশরিকদের অভ্যাস ছিল, ওরা দীন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করত, যাতে লোকেরা দ্বিধায় পড়ে ইসলাম গ্রহণ না করে। যেমন: ঘটনাক্রমে মুসলমানদের দ্বারা হারাম মাসে অজ্ঞতাহেতু হত্যা হয়েছিল বলে মুশরিকরা গলাবাজি করল। উদ্দেশ্য এ-ই ছিল যে, মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ুক।

সার কথা, মুসলমানদের দ্বারা যে হত্যা সংঘটিত হয়েছে, লোকদের সত্য ধর্ম থেকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের দোষারোপ করা এই হত্যা অপেক্ষাও অনেক বেশি গর্হিত ও নিন্দনীয়।

৪. অর্থাৎ যাবৎ তোমরা সত্য ধর্মের উপর কায়েম থাকবে, তাবৎ মুশরিকরা যে কোন অবস্থায় এবং যে কোন সুযোগে তোমাদের বিরোধিতা ও তোমাদের সঙ্গে লড়াই করতে ত্রুটি করবে

মধ্যে যে কেউ স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, তারপর কাফের অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করবে, এমন লোকদের আমল দুনিয়া ও আখেরাতে বিনষ্ট হবে। আর ওরা দোযখী, ওরা তাতে চিরকাল থাকবে[১]।

أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

২১৮. যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করেছে, নিশ্চয় তারা আল্লাহর রহমতের আশা করে। আর আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ أُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

২১৯. লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে[৩]। আপনি বলে দিন, 'এ

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ قُلْ

না। হরম শরীফ ও হারাম মাস– কোন কিছুরই পরোয়া ওদের নেই। যেমন হুদায়বিয়ার ঘটনায় ওরা এই উভয়কেই উপেক্ষা করে বিনা কারণে শুধু শত্রুতাবশে খুনাখুনি করতে সচেষ্ট হল এবং মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশ করতে ও ওমরা করতে দিল না। অতএব এহেন শত্রুদের অভিযোগ ও দোষারোপের পরোয়া কীসের এবং ওদের সঙ্গে লড়াই করা থেকে বিরত থাকার দরকার কী?

১. অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম থেকে ফিরে যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত ওই অবস্থার উপরই কায়েম থাকা এমন ভয়াবহ বিষয় যে, এমন লোকদের আজীবনের নেক কাজ বিফল হয়ে যায়, ওরা কোন কল্যাণ লাভের উপযুক্ত থাকে না। দুনিয়াতে ওদের জান-মাল সংরক্ষিত থাকে না, বিবাহ-সম্পর্ক টিকে থাকে না এবং উত্তরাধিকার পায় না। আর আখেরাতেও ছওয়াব পাবে না, জাহান্নাম থেকে কখনো মুক্তি পাবে না। অবশ্য যদি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তবে ইসলামের পরবর্তী নেক আমলাদির বিনিময় পুরাপুরি পাবে।

২. পূর্বের আয়াত দ্বারা উল্লিখিত সাহাবী-দল (যারা হারাম মাসে যুদ্ধ করে ফেলেছিলেন) এ মর্মে আশ্বস্ত হলেন বটে যে, ওই ঘটনায় তাঁরা আল্লাহর বিচারে দোষী ও দণ্ডিত হবেন না, কিন্তু তাঁদের সন্দেহ ছিল, ওই জেহাদে তাঁদের ছওয়াব হবে কি না। এই সন্দেহের নিরসনে আয়াত নাযিল হল যে, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে তাঁর দুশমনদের সঙ্গে লড়াই করেছে এবং সেই লড়াইয়ে নিজেদের কোনই স্বার্থ ছিল না– তাঁরা নিশ্চয় আল্লাহর রহমতের আশাবাদী ও তার অধিকারী। আর আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের গোনাহ-খাতা মার্জনাকারী ও তাঁদের প্রতি অনুগ্রহশীল। তিনি এ রকম আজ্ঞাবহ বান্দাদের মাহরূম করবেন না। (তাফসীরে তাবারীত ৩/৬৬৮)

৩. মদ ও জুয়ার ব্যাপারে কতিপয় আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেকটিতেই এগুলোর অপকারিতার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। অবশেষে সূরা মায়েদার আয়াতে (৯০) স্পষ্টভাবে

فِيۡهِمَاۤ اِثۡمٌ كَبِيۡرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثۡمُهُمَاۤ اَكۡبَرُ مِنۡ نَّفۡعِهِمَا ؕ وَيَسۡـَٔلُوۡنَكَ مَاذَا يُنۡفِقُوۡنَ ؕ قُلِ الۡعَفۡوَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الۡاٰيٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُوۡنَ ۙ

দুয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ, আবার মানুষের জন্য বিবিধ উপকারও[১]। তবে এগুলোর গোনাহ এগুলোর উপকার থেকে অনেক গুরুতর।' তারা আপনাকে আরো জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন, '(প্রয়োজনীয় খরচের পর) যা উদ্বৃত্ত থাকে[২]।' এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য বিধানাবলি বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর–

فِى الدُّنۡيَا وَالۡاٰخِرَةِ ؕ وَيَسۡـَٔلُوۡنَكَ عَنِ

২২০. দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়াদি সম্বন্ধে[৩]। আর তারা আপনাকে এতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

(এ দু'টি) নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর থেকে নেশাকর সকল দ্রব্য হারাম হয়ে যায়। তদ্রুপ হার-জিতের কোন কাজে উভয় পক্ষে বাজি ধরা সম্পূর্ণ হারাম। অবশ্য এক দিকের শর্ত হারাম নয়।

১. মদ্যপানে বুদ্ধি লোপ পায়, যে বুদ্ধি মানুষকে সকল গর্হিত কাজ থেকে রক্ষা করে। তাছাড়া মদ্য পানের ফলে সমূহ অনিষ্ট তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুনাখুনি প্রভৃতি ঘটনা ঘটে এবং নানা ধরনের দৈহিক ও আত্মিক রোগ জন্ম নেয়, যা অনেক সময় ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। আর জুয়া খেলা— হারামখোরী, চুরি, অর্থের অপচয়, পরিবারের ক্ষতি, পরস্পর শত্রুতা ইত্যাদি নানাবিধ জাহেরী ও বাতেনী বিপর্যয়ের সূত্রপাত করে।

অবশ্য এই উভয়টিতে বাহ্যত কিছুটা উপকার আছে, যেমন মদ্যপানে স্বাদ ও আনন্দ লাভ হয় আর জুয়া খেলায় অনায়াসে অর্থ হাতে আসে।

২. লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছিল, আল্লাহর জন্য তারা কী পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে। হুকুম হল, নিজ প্রয়োজনীয় বিষয়াদিতে খরচ করার পর যা অতিরিক্ত (উদ্বৃত্ত) থাকে, তা ব্যয় কর। কারণ আখেরাতের ফিকির যেমন জরুরী, দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনাও জরুরী। সুতরাং সমস্ত সম্পদ দান করে ফেললে নিজ প্রয়োজন কীভাবে পূরণ হবে? এবং তোমাদের নিকট যেসব পাওনা রয়েছে তা কী করে আদায় করবে? বলা যায় না, সব দিয়ে দিলে দীন ও দুনিয়ার কত কী অনিষ্টে তোমরা পতিত হও।

৩. অর্থাৎ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু বহু প্রয়োজনের স্থান। আর পরকাল চিরস্থায়ী এবং ছওয়াব ও পুরস্কার লাভের ঘর। সুতরাং চিন্তা-ভাবনা করে প্রত্যেক বিষয়ে যথাবিহিত খরচ করা উচিত, এবং দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাত উভয়কেই দৃষ্টির সম্মুখে রাখা সংগত। আর হুকুম-আহকাম পরিষ্কারভাবে বয়ান করার উদ্দেশ্য এ-ই যে, তোমরা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাবে।

الْيَتٰمٰى ؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ؕ

করে[১]। আপনি বলে দিন, 'তাদের (বিষয়গুলোর) সুব্যবস্থা করা (তাদের ব্যয় সম্পূর্ণ আলাদা করার চেয়ে) উত্তম।' আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলেমিশে থাক (অর্থাৎ তাদের খরচা একত্র করে নাও), তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আর আল্লাহ জানেন অনিষ্টকারী ও সংশোধনকারীকে[২]। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের কষ্টে ফেলতেন[৩]।

---

১. **শানে নুযূল**

কেউ কেউ এতীমদের ধন-সম্পদে সতর্কতা অবম্বন করত না। এতে হুকুম নাযিল হল– وَلَاتَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ الخ ('এতীমের ধন-সম্পত্তির কাছেও যেয়ো না, তবে এমন পন্থায় যা উত্তম' –বনী ইসরাঈল : ৩৪)– এবং اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا الخ ('নিশ্চয় যারা এতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, ...'–নিসা : ১০)। এতে যারা এতীমদের লালন-পালন করত, তারা ভীত হয়ে পড়ল এবং এতীমদের আহার ও ব্যয় সম্পূর্ণ পৃথক করে দিল। কেননা, একত্রে থাকাবস্থায় এতীমদের মাল খাওয়া পড়ত। কিন্তু পৃথক করাতে এই অসুবিধা হল যে, এতীমদের জন্য খাদ্য আলাদা তৈরি হল, এখন যা বেঁচে গেল তা নষ্ট হত এবং ফেলে দেওয়া হত। অতএব এতীমদের ক্ষতি হতে লাগল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে এ আয়াত অবতীর্ণ হল। (আবু দাউদ, বর্ণনা ২৮৭১)

২. অর্থাৎ আসল উদ্দশ্য হচ্ছে এতীমদের মালের সংরক্ষণ ও সুব্যবস্থা। সুতরাং যে ক্ষেত্রে পৃথক রাখলে এতীমদের লাভ হয়, সে ক্ষেত্রে পৃথক রাখা উচিত। আর যেখানে একত্রে থাকা কল্যাণকর, সেখানে তাদের খরচা একত্র করে নিলে কোন ক্ষতি নেই। এক সময় তাদের জিনিস খাওয়া হলে আরেক সময় নিজের জিনিস খাইয়ে দেবে। কেননা, এ এতীম বাচ্চারা তোমাদের দীনী বা বংশীয় ভাই। আর ভাইদের মধ্যে একান্নবর্তিতা এবং খাওয়া ও খাওয়ানো দূষণীয় নয়। তবে যা জরুরী তা এই যে, এতীমদের সুব্যবস্থার খেয়াল পুরাপুরি রাখতে হবে।

আর আল্লাহ বেশ জানেন, এই একান্নবর্তিতার দ্বারা কার উদ্দেশ্য এতীমদের মালে খেয়ানত ও তা নষ্ট করা, আর কার উদ্দেশ্য তাদের মঙ্গল ও উপকার করা।

৩. 'কষ্টে ফেলতেন' অর্থাৎ এতীমদের সুব্যবস্থা ও কল্যাণার্থে তাদের সঙ্গে একান্নভুক্তিকে মুবাহ করতেন না। অথবা অর্থ এই যে, অনিচ্ছাকৃত কিছু বেশকম হয়ে গেলে তার জন্যও ধর-পাকড় করতেন।

إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾

নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[১]।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ
وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ
اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ
حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۚ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ
اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ

২২১. তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না যতক্ষণ না ওরা ঈমান আনে। নিশ্চয় মুসলমান দাসী মুশরিক (স্বাধীন) নারী থেকে উত্তম, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে। আর (নিজেদের নারীদের) মুশরিক পুরুষদের কাছে বিয়ে দিয়ো না যতক্ষণ না ওরা ঈমান আনে। নিশ্চয় মুসলমান দাস মুশরিক (স্বাধীন) পুরুষ থেকে উত্তম, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে[২]। ওরা জাহান্নামের

---

১. অর্থাৎ তিনি কঠিন থেকে কঠিনতর হুকুম দিতে পারেন। কেননা, তিনি ক্ষমতাশালী। কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং সহজ হুকুম দিয়েছেন। কারণ, তিনি হেকমত ও কল্যাণ নজরে রেখে হুকুম দিয়ে থাকেন।

২. (ইসলামের) প্রথম যুগে মুসলমান পুরুষ ও কাফের নারী এবং এর বিপরীত উভয় অবস্থায় বিয়ের অনুমতি ছিল। বর্তমান আয়াতে উক্ত অনুমতি রহিত করে দেওয়া হল। মুসলমানের সঙ্গে মুশরিক নারী বা পুরুষ কারো বিয়ে জায়েয নয়, আর বিয়ের পর একজন মুশরিক হয়ে গেলে পূর্বের বিবাহ-সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে।

আর শিরক বলতে বোঝায়– আল্লাহর গুণাবলিতে, যথা জ্ঞান, শক্তি বা অন্য যে কোনো গুণের মধ্যে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা; অথবা কাউকে আল্লাহর ন্যায় সম্মান করতে শুরু করা, যেমন কাউকে সেজদা করা বা কাউকে সর্বশক্তিমান মনে করে তার কাছে নিজ প্রয়োজন প্রার্থনা করা।

অবশ্য অন্যান্য আয়াত থেকে জানা গেছে যে, ইহুদী বা খ্রিস্টান নারীর সাথে মুসলমান পুরুষের বিয়ে দুরুস্ত আছে,তারা উল্লিখিত মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে শর্ত এই যে, তাদেরকে স্বীয় ধর্মের উপর কায়েম থাকতে হবে, নাস্তিক বা ধর্মদ্রোহী হতে পারবে না, যেমনটি বর্তমান কালের অধিকাংশ খ্রিস্টানদের অবস্থা।

পূর্ণ আয়াতের সারার্থ এই যে, মুসলমান পুরুষের পক্ষে মুশরিক নারীর সাথে বিয়ে দুরুস্ত নয় যতক্ষণ না সে মুসলমান হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে মুসলমান দাসীও কাফের নারীর চেয়ে উত্তম, যদিও সেই কাফের নারী আযাদ হয় এবং যদিও ধন, সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের কারণে সে তোমাদের পছন্দ হয়। তদ্রূপ, মুসলমান নারীর বিয়ে মুশরিক পুরুষের সাথে দিয়ো না। মুসলমান দাসও মুশরিক থেকে হাজার গুণে উত্তম, হোক না সে আযাদ এবং ধন-দৌলত ও সৌন্দর্যের কারণে তোমাদের পছন্দনীয়। অর্থাৎ একজন মুসলমান পুরুষ যত নিম্নস্তরেরই হোক না কেন, সে একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে বহুগুণে উত্তম, হোক না সে সর্বোচ্চস্তরের মানুষ।

وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

দিকে আহবান করে[১], আর আল্লাহ তাঁর বিধানের মাধ্যমে* জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। এবং তিনি মানুষের জন্য তাঁর বিধানাবলি বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

[রুকূ - ২৮]

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۭ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى

২২২. লোকেরা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, 'তা অপবিত্রতা।' অতএব তোমরা হায়েযের সময় স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাক[২] এবং তাদের নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়[৩]। অতঃপর যখন

---

১. অর্থাৎ মুশরিক পুরুষ ও নারীদের কথাবার্তা, কাজকর্ম, ওদের প্রতি ভালবাসা, ওদের সাথে মেলামেশা ইত্যাদি কারণে দিল থেকে শিরকের খারাবী ও ঘৃণাবোধ কমে যায় এবং শিরকের প্রতি আকর্ষণ পয়দা হয়, যার পরিণতি দোযখ বৈ কিছু নয়। সুতরাং ওদের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে পরিপূর্ণরূপে বিরত থাকা কর্তব্য।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তাঁর ইচ্ছায়'।

২. 'হায়েয' বলে মেয়েদের স্বাভাবিক রক্তস্রাবকে। এ অবস্থায় সহবাস করা ও নামায-রোযা সবই হারাম। আর অস্বাভাবিকভাবে যে রক্তস্রাব হয় (ইস্তেহাযা), তা রোগ বিশেষ– তাতে সহবাস এবং নামায-রোযা সবই দুরুস্ত আছে। ক্ষত বা রগ থেকে রক্ত বের হওয়া বা বের করার মতই এর অবস্থা।

শানে নুযূল

ইহুদী ও অগ্নিপূজকরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে পানাহার এবং এক ঘরে থাকাও জায়েয মনে করত না। আর নাসারারা ঋতুকালে সহবাস থেকেও বিরত থাকত না। এ সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে বর্তমান আয়াত নাযিল হল এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার বলে দিলেন, হায়েয অবস্থায় সহবাস হারাম, কিন্তু তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, থাকা, শোয়া সবই জায়েয। (সহীহ মুসলিম, ৩০২)

৩. পবিত্র হওয়ার বিষয়ে মাসআলা হল, যদি হায়েয পূর্ণ সময়কাল অর্থাৎ দশ দিনের পর বন্ধ হয়, তবে তখন থেকেই স্ত্রীসহবাস জায়েয। আর যদি দশ দিনের পূর্বে বন্ধ হয়, যেমন প্রতি মাসে স্ত্রীর ছয় দিনেই স্রাব বন্ধ হয়, এ মাসেও ছয় দিন পর বন্ধ হল- তবে স্রাব বন্ধ হওয়ার পরই সহবাস জায়েয নয়, বরং সে গোসল করার পর, অথবা (এক) নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে গেলে পরে সহবাস দুরুস্ত হবে। আর যদি তার অভ্যাস সাত বা আট দিনের থেকে থাকে, আর তার আগেই স্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে সাত/আট দিন পূর্ণ করা (এবং গোসল করার) পর সহবাস দুরুস্ত হবে।

يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝

তারা খুব পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাদের নিকট যেয়ো, যেখান দিয়ে আল্লাহ তোমাদের (যেতে) আদেশ করেছেন[১]। নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের পছন্দ করেন এবং পছন্দ করেন অপবিত্রতা থেকে আত্মরক্ষাকারীদের।*[২]

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۪ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۫ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

২২৩. তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা নিজেদের শস্যক্ষেত্রে যাও যেদিক দিয়ে ইচ্ছা[৩], এবং নিজেদের জন্য ভবিষ্যতের ব্যবস্থা কর**[৪]। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং জেনে রাখ, তোমাদের তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। আর আপনি ঈমানদারদের সুসংবাদ দিন।

---

১. 'যেখান দিয়ে যেতে আল্লাহ আদেশ করেছেন' অর্থাৎ সম্মুখের পথ দিয়ে, যে পথে বাচ্চা পয়দা হয়। দ্বিতীয় পথ অর্থাৎ পায়ুপথে সংগম হারাম।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারীদের

২. اَلتَّوَّابِيْنَ –অর্থাৎ যারা গোনাহ থেকে তওবা করে, যা তাদের দ্বারা হঠাৎ হয়ে গিয়েছিল। যেমন হায়েয অবস্থায় আকস্মিকভাবে বা অসর্তকতাবশত সহবাস করে ফেলেছিল। اَلْمُتَطَهِّرِيْنَ –অর্থাৎ যারা অপবিত্রতা তথা গোনাহসমূহ যেমন হায়েয অবস্থায় ইচ্ছাকৃত সহবাস ও মলদ্বারে মৈথুন ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকে।

৩. **শানে নুযূল**
ইহুদীরা স্ত্রীর পিছন দিক থেকে সহবাস করা (যদিও তা সম্মুখের পথে, পায়ুপথে নয়) নিষিদ্ধ মনে করত এবং বলত যে, এতে বাচ্চা টেরা চোখবিশিষ্ট হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে এ আয়াত নাযিল হল। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৫২৮) অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্রস্বরূপ, তাতে বীর্য বীজস্বরূপ এবং সন্তান ফসলস্বরূপ। অর্থাৎ এর আসল উদ্দেশ্য শুধু বংশ রক্ষা করা এবং সন্তান পয়দা হওয়া। অতএব তোমাদের ইখতিয়ার রয়েছে– সম্মুখ থেকে, পার্শ্ব থেকে (কাত হয়ে), পিছন থেকে (পিঠে বুক লাগিয়ে), বসে বা শায়িত অবস্থায় যেভাবে চাও সহবাস কর। কিন্তু সর্বাবস্থায় লক্ষণীয় যে, বীজ বপন একমাত্র ওই স্থানেই হতে হবে যেথায় ফসলের আশা করা যায়। অর্থাৎ সহবাস শুধু জননেন্দ্রিয়ের মধ্যেই হবে, 'পায়ুপথে' কস্মিণকালেও নয়। ইহুদীদের এই ধারণা ভ্রান্ত যে, পিছন দিক থেকে সহবাস করলে (যদিও তা জননেন্দ্রিয়ের মধ্যেই) সন্তান টেরা চক্ষুবিশিষ্ট হয়।

** **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আর নিজেদের জন্য অগ্রিম প্রেরণ কর নেক আমল'।

৪. অর্থাৎ তোমরা নিজেদের জন্য নেক আমলাদি করতে থাক। অথবা অর্থ এই যে, স্ত্রীসহবাসের দ্বারা সন্তান কাম্য হওয়া চাই, শুধু ইন্দ্রিয়-সুখ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲۴﴾

২২৪. তোমরা আল্লাহর (নামকে) নিজেদের কসমের নিশানা বানিয়ো না যে, (তার মাধ্যমে) পুণ্য করা থেকে, তাকওয়ার কাজ করা থেকে এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করা থেকে বিরত থাকবে[১]। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[২]।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۲۵﴾

২২৫. আল্লাহ তোমাদের নিরর্থক কসমের জন্য তোমাদের পাকড়াও করবেন না[৩], কিন্তু তোমাদের পাকড়াও করবেন সেই কসমের কারণে, তোমাদের অন্তর যার ইচ্ছা করেছে[৪]। আর আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত ধৈর্যশীল[৫]।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۲۶﴾

২২৬. যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'ঈলা' করে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। অতঃপর তারা যদি (কসম থেকে) ফিরে আসে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

১. অর্থাৎ কোন সৎকাজ করবে না বলে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বসল। যেমন মাতাপিতার সঙ্গে কথা বলব না, ফকীরকে কিছু দেব না, অথবা কারো মধ্যে পরস্পর মিলমিশ করিয়ে দেব না। এমন ধরনের কসমের অর্থ, খোদার নামকে মন্দ কাজের মাধ্যম বানানো হল। সুতরাং এমনটি কিছুতেই করবে না। যদি কেউ এমন কসম খায়, তবে তা ভঙ্গ করা ও কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব।

২. অর্থাৎ কেউ কসম খেলে আল্লাহ তা শোনেন। আর যদি কেউ খোদায়ী মর্যাদা ও মহিমার কারণে (ভীত হয়ে) কসম খাওয়া থেকে বিরত থাকে, তবে আল্লাহ তার নিয়তও খুব ভাল জানেন। তোমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কোন বিষয় তাঁর নিকট গুপ্ত নয়। এ জন্য অন্তরের নিয়ত ও মুখের কথা উভয় বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক।

৩. 'নিরর্থক ও বেহুদা কসম বলে' যা অভ্যাস ও প্রচলনবশত মনের অজান্তে অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে বের হয়ে যায়। এমন কসমের কাফফারা নেই, তাতে গোনাহও নেই। অবশ্য যদি কেউ স্বেচ্ছায় والله ও بالله (আল্লাহর কসম) ইত্যাদি কসমের শব্দ বলে, যদিও তার উদ্দেশ্য কসম নয়, শুধু বক্তব্যকে জোরদার করা—তবে তাকেও কাফফারা অবশ্যই দিতে হবে। কাফফারার বয়ান সম্মুখে আসছে।

৪. অর্থাৎ যে কসম বুঝেশুনে খেয়েছ অর্থাৎ মুখের সাথে অন্তরেও কসমের সংকল্প ছিল। এই কসম ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হবে।

৫. আল্লাহ ক্ষমাশীল- তাই 'লগ্‌ব' অর্থাৎ নিরর্থক কসমের জন্য ধরপাকড় করেননি। তিনি ধৈর্যশীল- সে জন্য ধরপাকড় করতে তাড়াতাড়ি করেন না, হয়ত বান্দা তওবা করে নেবে।

২২৭. আর যদি তারা তালাকেরই সংকল্প করে থাকে, তবে আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[১]।

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾

২২৮. তালাকপ্রাপ্ত নারীরা নিজেদের তিন হায়েয পর্যন্ত প্রতীক্ষায় রাখবে। এবং তাদের জন্য বৈধ নয় আল্লাহ তাদের গর্ভাশয়ে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা, যদি তারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে[২]। আর

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ

১. অর্থাৎ যদি কেউ কসম খায় যে, আমি স্বীয় স্ত্রীর কাছে যাব না, তবে তার জন্য চার মাসের সময় থাকে। যদি সে চার মাসের ভিতর স্ত্রীর কাছে গেল, তবে কসমের কাফফারা দেবে এবং স্ত্রী তার বিবাহে বহাল থাকবে। আর যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল এবং সে তার কাছে গেল না, তবে স্ত্রীর উপর 'বায়েন তালাক' পতিত হবে।

বি. দ্র.

শরীয়তে 'ঈলা' বলে– চার মাস বা ততোধিক সময়ের জন্য কিংবা সময়ের উল্লেখ ছাড়া কসম খাওয়া যে, স্ত্রীর নিকট থেকে দূরে থাকবে, কাছে যাবে না। আর চার মাস থেকে কম সময়ের জন্য হলে তা 'ঈলা' হবে না।

ঈলার উক্ত তিন অবস্থাতেই যদি চার মাস সময়ের ভিতর স্ত্রীর কাছে যায়, তবে কসমের কাফফারা দিতে হবে, নতুবা চার মাস পূর্ণ হয়ে গেলে তালাক দেওয়া ছাড়াই স্ত্রী 'বাইন' তালাক হয়ে যাবে। আর যদি চার মাসের কম সময়ের জন্য কসম খায়, যেমন কসম খেল যে, তিন মাস স্ত্রীর কাছে যাব না, তবে একে শরীয়তে 'ঈলা' বলা হবে না। এর হুকুম এই যে, যদি কসম ভঙ্গ করে, যেমন তিন মাসের ভিতর স্ত্রীর কাছে গেল, তবে কসমের কাফফারা দিতে হবে। আর যদি কসম পূর্ণ করল, অর্থাৎ এই তিন মাস তার কাছে গেল না, তবে স্ত্রী তালাকও হবে না, কাফফারাও দিতে হবে না।

২. স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর পরই স্ত্রীর পক্ষে অন্য কারো সাথে বিবাহ জায়েয নয়, যাবৎ না তার তিন হায়েয পূর্ণ হয়, যাতে গর্ভ হয়ে থাকলে জানা যায় এবং একের সন্তান অন্যের না হয়ে যায়। এজন্য পেটে যা আছে তা প্রকাশ করে দেওয়া স্ত্রীর উপর ফরয, চাই গর্ভ হোক বা হায়েয হোক। আর এই সময়কালকে ইদ্দত বলে।

বি. দ্র. জানা উচিত যে, এখানে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীরা বলতে তারা উদ্দেশ্য, বিবাহের পর যাদের সঙ্গে স্বামীদের সহবাস বা শরী'য়তসম্মত নির্জনবাসের সুযোগ হয়েছে। তদুপরি তাদের হায়েযও হয়, তারা স্বাধীনও বটে– কারো দাসী নয়। আর যে স্ত্রীর সাথে সহবাস ও নির্জন সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি, তাকে তালাকের পর ইদ্দত মোটেই পালন করতে হবে না। আর যে স্ত্রীর হায়েয হয় না, যেমন কম বয়স্কা বা বৃদ্ধা, কিংবা গর্ভবতী– তন্মধ্যে প্রথম দুজনের ইদ্দত হল তিন মাস, আর গর্ভধারিনীর ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আর যে স্ত্রী স্বাধীন নয়; বরং

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِیْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْۤا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ﴿۲۲۸﴾

তাদের স্বামীরা এই সময়ের মধ্যে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে, যদি তারা (স্ত্রীদের সাথে) আপোষ-মীমাংসা করার ইচ্ছা করে থাকে[১]। আর স্ত্রীদেরও (স্বামীদের উপর) ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের উপর (স্বামীদের) অধিকার আছে। তবে স্ত্রীদের উপর স্বামীদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে[২]। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

[রুকূ - ২৯]

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِیْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا یَحِلُّ لَكُمْ اَنْ

২২৯. (রজঈ) তালাক দু'বার। অতঃপর (স্ত্রীকে) ন্যায়সংগতভাবে রেখে দিতে হবে অথবা উত্তমরূপে ছেড়ে দিতে হবে[৩]। আর

শরী'য়তসম্মত দাসী, তার যদি হায়েয হয় তবে তার ইদ্দত দুই হায়েয। আর কম বয়স্কা বা বৃদ্ধা হওয়ায় হায়েয না হলে তার ইদ্দত দেড় মাস এবং গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসবই তার ইদ্দত। অপরাপর আয়াত ও হাদীছে এই বিবরণ বিদ্যমান।

১. অর্থাৎ ইদ্দতের ভিতর স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়ে নিতে পারে যদিও স্ত্রী সন্তুষ্ট না থাকে। তবে এই ফিরিয়ে নেওয়ার পিছনে স্বামীর উদ্দেশ্যে হতে হবে সদ্ব্যবহার ও সংশোধন । স্ত্রীকে নির্যাতন করা বা চাপে ফেলে দেনমোহর মাফ করিয়ে নেওয়া উদ্দেশ্য হতে পারবে না। এ জুলুম করলে স্বামী পাপী হবে, যদিও স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া সহীহ-শুদ্ধ হয়ে যাবে।

২. অর্থাৎ স্ত্রীর উপর স্বামীর যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি স্বামীর উপরও স্ত্রীর অধিকার রয়েছে– এসব অধিকার যথানিয়মে আদায় করা উভয়ের জন্য জরুরী। সুতরাং স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করা এবং যে কোন রকম অধিকার ক্ষুণ্ণ করা নিষিদ্ধ । এ কথা সত্য, কিন্তু সেই সাথে এও মনে রাখতে হবে যে, স্ত্রীর উপর স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য রয়েছে, তাই ফিরিয়ে নেওয়ার ইখতিয়ার স্বামীকেই প্রদান করা হয়েছে।

৩. ইসলামপূর্ব যুগে রীতি ছিল, স্বামী স্ত্রীকে দশ বিশ যতবার খুশী তালাক দিত। কিন্তু ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে ফিরিয়ে নিত। আবার যখন ইচ্ছা তালাক দিত ও ফেরত নিত। এই উপায়ে কোন কোন পুরুষ স্ত্রীদের খুবই নির্যাতন করত। তাই বর্তমান আয়াত অবতীর্ণ হল।

এতে বলা হচ্ছে, যে তালাকের পর স্বামী স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে, তা মাত্র দুবার। এক বা দু'তালাক পর্যন্ত এই ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে যে, স্বামী ইচ্ছা করলে ইদ্দতের ভিতর স্ত্রীকে হয় রীতি অনুসারে রেখে দেবে, না হয় ভদ্রভাবে মুক্ত করে দেবে। ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে আর ফেরত নেওয়ার অবকাশ থাকে না। হাঁ, উভয়ে রাযী হলে দ্বিতীয়বার বিবাহ

تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ

তোমাদের জন্য বৈধ নয় তোমরা স্ত্রীদের যা দিয়েছিলে তা থেকে কিছু ফেরত নেওয়া, কিন্তু যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এই আশঙ্কা করে যে, তারা আল্লাহর বিধি-বিধান কায়েম রাখতে পারবে না[১]। অতএব তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা (স্বামী-স্ত্রী) আল্লাহর বিধি-বিধান কায়েম রাখতে পারবে না, তবে তাদের কোন গোনাহ নেই সেই সম্পদের আদান-প্রদানে, যা দিয়ে স্ত্রী নিজেকে মুক্ত করে[২]। এগুলি আল্লাহর

করতে পারে। আর যদি তৃতীয়বার তালাক দেয়, তবে আর তাদের মধ্যে (দ্বিতীয়) বিবাহও দুরুস্ত হবে না, যাবৎ না অন্য স্বামী তাকে বিবাহ করে সহবাস করে নেয়।

বি. দ্র. 'রেখে দিতে হবে ন্যায়সংগতভাবে' এবং 'ছেড়ে দিতে হবে উত্তমরূপে' বলা দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, ফেরত নিলে সম্প্রীতি ও সদ্ব্যবহারের সাথে থাকবে, স্ত্রীকে আটকে রেখে নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে রাখবে না, যেমন অন্ধকার যুগের রীতি ছিল। আর না হয় সহজে ও সুন্দরভাবে বন্ধন মুক্ত করে তাকে বিদায় দেবে।

১. অর্থাৎ যে মহর স্ত্রীদের দেওয়া হয়েছে, তালাকের বিনিময়ে তা ফেরত নেওয়া স্বামীদের জন্য জায়েয নয়। অবশ্য তখন জায়েয, যখন নিরুপায় অবস্থা হয় এবং উভয়ের মধ্যে কোনক্রমেই মনের মিল না হয় এবং পরস্পর চরম বিবাদের কারণে এই আশঙ্কা হয় যে, তারা দাম্পত্য জীবনে আল্লাহর বিধানাবলি পালনে ব্যর্থ হবে। সেই সাথে স্ত্রীর অধিকার আদায়ে স্বামীর পক্ষে ত্রুটিও না হয়। নতুবা (অর্থাৎ স্বামীর পক্ষ থেকে যদি স্ত্রীর অধিকার আদায়ে কোনো ত্রুটি হয়, তবে) স্বামীর জন্য তা ফেরত নেওয়া হারাম।

২. অর্থাৎ হে মুসলমান সমাজ! যদি তোমাদের এই ভয় হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর বিবাদের কারণে তাদের দাম্পত্য জীবন সম্প্রীতির হবে না, তবে যদি স্ত্রী অর্থ-সম্পদ দিয়ে বিবাহ-বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে এবং স্বামী তা গ্রহণ করে তাকে মুক্ত করে দেয়, তাহলে উভয়ের কোন পাপ হবে না।

এই ব্যবস্থাকে خلع তথা 'বন্ধন-মুক্তি' বলে। প্রয়োজনের অবস্থায় যখন স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে 'খুলা' করা বৈধ, তখন মুসলমান সমাজের এতে সহযোগিতা করাও বৈধ।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে আরয করল, 'আমি আমার স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট, তার কাছে থাকতে চাই না।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃত ব্যাপার জানতে চাইলে সে বলল, তিনি আমার হক আদায়ে ত্রুটি করেন

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

নির্ধারিত সীমা, অতএব তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ লঙ্ঘন করে, তারাই জালেম[১]।

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾

২৩০. অতঃপর যদি স্বামী স্ত্রীকে (তৃতীয়) তালাক দিয়ে দেয়, তবে এর পর স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না সেই স্ত্রী অন্য কোন স্বামীকে বিবাহ করে। তার পর যদি দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তাদের (প্রথম স্বামী ও স্ত্রীর) কোন গোনাহ নেই পরস্পর পুনর্মিলনে, যদি তারা মনে করে যে, তারা আল্লাহর বিধি-বিধান কায়েম রাখতে পারবে। আর এগুলি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। তিনি তা বর্ণনা করেন জ্ঞানী লোকদের জন্য[২]।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ

২৩১. যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও, অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতের সীমায় পৌঁছে[৩], তখন

না। তার আখলাক ও দীনদারীতেও আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তার সঙ্গে আমার মনের মিল হয় না। এতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকটির কাছ থেকে মহর ফেরত দেওয়ালেন এবং স্বামী থেকে তালাক নেওয়ালেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতের অবতরণ হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫২৭৩-৫২৭৭; ফাতহুল বারী ৯/৩০৯)

১. উল্লিখিত হুকুমসমূহ যথা: তালাক, তালাকের পর ফিরিয়ে নেওয়া এবং খুলা বা স্বামী থেকে বন্ধন-মুক্তি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা ও বিধান। এগুলি পূর্ণভাবে পালন করা জরুরী– এতে কোন প্রকার ত্রুটি, রদ-বদল ও অন্যথা করবে না।

২. অর্থাৎ স্বামী যদি স্ত্রীকে তৃতীয়বার তালাক দেয়, তবে সেই স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ না স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং দ্বিতীয় স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করে নিজ খুশীতে তালাক দেবে এবং তার ইদ্দত সমাপ্ত হবে। তালাকের পর ইদ্দত পূর্ণ করে পুনরায় প্রথম স্বামীর সঙ্গে নতুনভাবে বিয়ে হতে পারে। একে 'হালালা' বলে এবং হালালার পর প্রথম স্বামীর সাথে বিয়ে তখনই হতে পারে, যখন তারা আল্লাহর বিধান কায়েম রাখার অর্থাৎ পরস্পর একে অন্যের হক আদায় করার ব্যাপারে আস্থা পোষণ করবে। তা না হলে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ ও একের দ্বারা অন্যের হক নষ্ট হবে এবং উভয়ে পাপে লিপ্ত হবে।

৩. অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হওয়ার উপক্রম হয়।

فَاَمۡسِكُوۡهُنَّ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ سَرِّحُوۡهُنَّ بِمَعۡرُوۡفٍ ۪ وَلَا تُمۡسِكُوۡهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعۡتَدُوۡا ۚ وَمَنۡ یَّفۡعَلۡ ذٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوۡۤا اٰیٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّاذۡكُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ عَلَیۡكُمۡ وَمَاۤ اَنۡزَلَ عَلَیۡكُمۡ مِّنَ الۡكِتٰبِ وَالۡحِكۡمَةِ یَعِظُكُمۡ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ ﴿۲۳۱﴾

ন্যায়সংগতভাবে তাদের রেখে দিয়ো অথবা তাদের উত্তমরূপে ছেড়ে দিয়ো। আর কষ্ট দেওয়ার জন্য তাদের আটকিয়ে রেখো না, যাতে তাদের উপর বাড়াবাড়ি করতে পার[১]। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে অবশ্যই নিজেরই ক্ষতি করবে। আর তোমরা আল্লাহর বিধানসমূহকে ঠাট্টার বস্তু বানিয়ো না। এবং তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে এবং তোমাদের উপর তাঁর নাযিল করা সেই কিতাব ও হেকমত (প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়াদি)-কে, যার মাধ্যমে তিনি তোমাদের উপদেশ দান করেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং জেনে রাখ, আল্লাহ সব বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত[২]।

[রুকূ - ৩০]

وَاِذَا طَلَّقۡتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوۡهُنَّ اَنۡ یَّنۡكِحۡنَ اَزۡوَاجَهُنَّ

২৩২. তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও, অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতের শেষ সীমায় পৌঁছে যায় (অর্থাৎ ইদ্দত পূর্ণ করে ফেলে), তখন

---

১. অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত স্বামীর ইখতিয়ার রয়েছে, হয় সে স্ত্রীকে সম্প্রীতি ও হৃদ্যতার সাথে রেখে দেবে, না হয় ভদ্রতা ও প্রসন্নতার সাথে একেবারে মুক্ত করে দেবে। আটকে রেখে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে ফেরত নেওয়া কিছুতেই জায়েয নয়। কোন কোন মানুষ এমন করত।

বি. দ্র. পূর্ববর্তী আয়াত اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ الخ এর মধ্যে ইরশাদ হয়েছিল যে, দুই তালাক পর্যন্ত স্বামীর ইখতিয়ার আছে, হয় স্ত্রীকে সুন্দরভাবে রেখে দেবে অথবা একেবারে ছেড়ে দেবে। বর্তমান আয়াতে বলা হচ্ছে যে, এই ইখতিয়ার শুধু ইদ্দত পর্যন্তই থাকবে। ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্বামীর এই অধিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে। সুতরাং আয়াত দু'টিতে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নয়, বরং বিষয়ের ভিন্নতা রয়েছে।

২. বিবাহ, তালাক, 'ঈলা', 'খুলা', 'রাজআত', 'হালালা' প্রভৃতি হুকুমের মধ্যে বড় বড় হেকমত ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ সবের কোন কিছুতে হিলা করা বা মতলব হাসিলের চেষ্টা করা, যেমন স্ত্রীকে জ্বালাতন করার উদ্দেশ্যে ফেরত নেওয়া ইত্যাদি– আল্লাহর আহকামের সঙ্গে ঠাট্টা করার নামান্তর نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ আল্লাহর নিকটে সব কিছুই সুস্পষ্ট। এমন অবস্থায় এসব হিলাবাজিতে নিজের ক্ষতি ছাড়া কোনই লাভ নেই।

اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٢﴾

তোমরা (হে অভিভাবকেরা!) তাদেরকে বাধা দিয়ো না তাদের (প্রথম) স্বামীদের বিয়ে করতে, যদি তারা নিয়মানুসারে পরস্পর সম্মত হয়ে যায়[১]। এর দ্বারা তাকে নসীহত করা হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে ঈমান রাখে[২]। এটাই তোমাদের জন্য বেশি পরিচ্ছন্ন ও অধিক পবিত্র পথ। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না[৩]।

---

১. **শানে নুযূল**

এক মহিলাকে তার স্বামী এক বা দুই তালাক দিয়েছিল, তারপর ইদ্দতের মধ্যে ফেরতও নেয়নি। ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তার পূর্ব স্বামীও বিয়ের প্রস্তাব দেয়, স্ত্রীও এতে রাজী ছিল। কিন্তু মহিলার ভাই রাগান্বিত হয়ে বিবাহে বাধা প্রদান করে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৩৩১) এতে এই হুকুম অবতীর্ণ হয় যে, নারীর সন্তুষ্টি ও কল্যাণ বিবেচনায় রেখে সেই অনুযায়ী তাদের বিয়ে দাও, এখানে ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি ও বিরাগ-বিরূপতাকে স্থান দিয়ো না। যে কেউ বিবাহে বাধা দেবে, সকলের প্রতিই এই নির্দেশ– চাই বাধাদানকারী প্রথম স্বামী হোক, যদি সে তালাক দেওয়ার পর অন্যত্র বিবাহে স্ত্রীকে বাধা দেয়, অথবা স্ত্রী লোকটির ওলী (অভিভাবক) ও ওয়ারিস হোক, যদি সে তাকে পূর্ব স্বামী বা অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দেয়। মোট কথা, বাধাপ্রদানকারী সকলের প্রতিই এই নির্দেশ।

অবশ্য রীতিবিরুদ্ধ কোন কাজ হলে, যেমন কুফু ছাড়া অন্যত্র অর্থাৎ অসম পাত্রে যদি বিয়ে বসতে উদ্যত হয়, অথবা পূর্ব স্বামীর ইদ্দতের ভিতর অন্য কাউকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করে, তবে এমন বিবাহে নিঃসন্দেহে বাধা প্রদানের অধিকার রয়েছে। بالمعروف অর্থাৎ 'নিয়মানুসারে' বলার উদ্দেশ্য এ-ই।

২. অর্থাৎ উল্লিখিত নির্দেশ দ্বারা ঈমানদারদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। কেননা, এ উপদেশ দ্বারা তারাই উপকৃত হয়ে থাকে। বস্তুত উপদেশ সকলের জন্যই, বিশেষ কারো জন্য নয়। তবে মুমিনদের বিশেষিত করায় অন্যদের প্রতি ভীতি ও অবজ্ঞা প্রদর্শন বুঝে আসে, অর্থাৎ যারা এসব নির্দেশ অনুযায়ী আমল করে না, তারা কেমন যেন আল্লাহ ও পরকালে ঈমানই রাখে না।

৩. অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের বিবাহে বাধা না দিয়ে বরং তাদের বিবাহ হতে দেওয়ার মাঝেই রয়েছে পবিত্রতা, বিবাহে বাধা প্রদানের মধ্যে তা অবশ্যই নেই। আর পূর্ব স্বামীর প্রতি আকর্ষণ থাকায় তারই সঙ্গে বিবাহ হওয়ার মধ্যে এমন পবিত্রতা রয়েছে, যা অন্য স্বামী গ্রহণের মধ্যে নেই। আল্লাহ তাআলা তাদের দিলের কথা ও তাদের ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দ উত্তমরূপে জানেন, তোমরা জান না।

২৩৩. মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে। (এ বিধান) তার জন্য, যে দুধ পানের (মেয়াদ) পূর্ণ করতে চায়[১]। আর যার সন্তান (অর্থাৎ পিতা), তার দায়িত্বে মায়েদের ন্যায়সংগত খোরপোষ। কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার দেওয়া হয় না। কোন মাকে তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং যার সন্তান (অর্থাৎ পিতা), তাকেও তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া যাবে না[২]। আর ওয়ারিসের উপরেও অনুরূপ দায়িত্ব রয়েছে[৩]। এখন যদি পিতা-মাতা আপন সম্মতি ও পরামর্শে (দু'বছরের আগেই) দুধ ছাড়িয়ে নিতে চায়, তবে

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ

---

১. অর্থাৎ মায়ের প্রতি এ হুকুম রয়েছে যে, স্বীয় শিশু সন্তানকে দুই বছর দুধ পান করাবে। আর এই মেয়াদ সেই মা-বাপের জন্য, যারা বাচ্চার দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। নতুবা আয়াতের শেষাংশের বর্ণনা মতে এই মেয়াদ থেকে কম সময়ও জায়েয আছ।

আর এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত সেই মায়েরাও, যাদের বিবাহ বর্তমান আছে এবং তারাও, যাদের তালাক দেওয়া হয়েছে (তবে ইদ্দত সীমার ভিতরে আছে), অথবা তালাকের পর ইদ্দতও অতিবাহিত হয়ে গেছে। তবে পার্থক্য এই যে, বিবাহধীন ও ইদ্দত পালনরত স্ত্রী দুধ পান করাক বা না করাক, তাকে সর্বাবস্থায় অন্ন-বস্ত্র দিতেই হবে। আর তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ যাদের ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে, তারা দুধ পান করালে অন্ন-বস্ত্র দিতে হবে। (নতুবা দিতে হবে না।)

আয়াত থেকে জানা গেল– যে ক্ষেত্রে মায়ের দ্বারা দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করানোর ইচ্ছা হয় অথবা যে ক্ষেত্রে মাকে দুধ পান করানোর পারিশ্রমিক দিতে হবে, এই দুই ক্ষেত্রে তার সর্বোচ্চ মেয়াদ দু' বছর। সর্বাবস্থায় তার মেয়াদ দু' বছর, বেশি নয়– এটা আয়াত দ্বারা প্রমণিত হয় না।

২. অর্থাৎ পিতাকে সর্বাবস্থায় বাচ্চার মায়ের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে। (উল্লিখিত তিন অবস্থার) প্রথম অবস্থায় এজন্য যে, বাচ্চার মা তার বিবাহ বন্ধনে রয়েছে, দ্বিতীয় অবস্থায় সে ইদ্দতের মধ্যে আছে, আর তৃতীয় অবস্থায় সে বাচ্চাকে দুধ পান করানোর পারিশ্রমিক পাবে। আর শিশুর কারণে শিশুর মাতাপিতা একে অন্যকে কষ্ট দেবে না, যেমন মা অকারণে শিশুকে দুগ্ধদানে অস্বীকার করল, অথবা পিতা অযথা শিশুকে মা থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য কারো দুধ পান করতে দিল, কিংবা মায়ের ভরণ-পোষণে সংকীর্ণতা করল।

৩. অর্থাৎ যদি পিতা মরে যায়, তবে বাচ্চার ওয়ারিসদের উপরও তা-ই জরুরী, অর্থাৎ দুগ্ধদানের মেয়াদ বা সময়কালে তার মায়ের খাওয়া-পরার ব্যয় বহন করবে এবং কষ্ট দেবে না। আর ওয়ারিস বলতে সেই ওয়ারিস উদ্দেশ্য, যে বাচ্চার মাহরামও বটে।

وَاِنۡ اَرَدۡتُّمۡ اَنۡ تَسۡتَرۡضِعُوۡۤا اَوۡلَادَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ اِذَا سَلَّمۡتُمۡ مَّاۤ اٰتَيۡتُمۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ ﴿۲۳۳﴾

তাদের কোন গোনাহ নেই[১]। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের (কোন ধাত্রী দিয়ে) দুধ পান করাতে চাও, তবুও তোমাদের কোন গোনাহ নেই, যদি তোমরা ন্যায়সংগতভাবে যা দেওয়া সাব্যস্ত করেছিলে তা (তাদের) দিয়ে দাও[২]। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা ভাল করেই দেখেন।

وَالَّذِيۡنَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنۡكُمۡ وَيَذَرُوۡنَ اَزۡوَاجًا يَّتَرَبَّصۡنَ بِاَنۡفُسِهِنَّ اَرۡبَعَةَ اَشۡهُرٍ وَّعَشۡرًا ۚ فَاِذَا بَلَغۡنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيۡمَا فَعَلۡنَ فِىۡۤ اَنۡفُسِهِنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ ﴿۲۳۴﴾

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যু বরণ করে এবং স্ত্রী রেখে যায়, তাদের স্ত্রীরা নিজেদের চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় রাখবে[৩]। অতঃপর যখন তারা তাদের ইদ্দতের শেষ সীমায় পৌঁছবে (তথা ইদ্দত পূর্ণ করবে), তখন তারা নিজেদের বিষয়ে নিয়মসম্মত কাজ করলে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই[৪]। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

---

১. অর্থাৎ যদি মাতাপিতা শিশুর কল্যাণ বিবেচনা করে পরস্পর পরামর্শ করে ও সম্মতিক্রমে দু'বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই দুধ ছাড়াতে চায় তবে তাতে গোনাহ নেই, যেমন মায়ের দুধ ভাল না হওয়ার কারণে (এমনটি করতে পারে)।

২. অর্থাৎ ওহে পুরুষেরা! তোমরা যদি কোন প্রয়োজন ও কল্যাণহেতু মা ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা দুধ পান করাতে চাও, তবে তাতে গোনাহ নেই। কিন্তু এ কারণে মায়ের কোন পাওনা কেটে রাখবে না এবং রীতি অনুযায়ী মাকে যা দিতে সাব্যস্ত করেছিলে, তা দিয়ে দেবে। আর এ অর্থও হতে পারে যে, দুগ্ধদানকারীর পাওনা কেটে রাখবে না।

৩. পূর্বে বলা হয়েছে, তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকেরা ইদ্দত পালনে তিন হায়েয অপেক্ষা করবে। এখন বলা হচ্ছে, স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দত পালন করতে হবে চার মাস দশ দিন। এই মেয়াদের মধ্যে যখন নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, নারীটি গর্ভবতী নয় তখন উপরোক্ত মেয়াদ শেষে সে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে, আর গর্ভ থাকলে প্রসবের পর অনুমতি হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরায়ে তালাকের মধ্যে আসবে। বস্তুত তিন হায়েয বা চার মাস দশ দিন সাব্যস্ত করা হয়েছে এ কথা জানার জন্য যে, নারীটি গর্ভবতী কি না?

৪. যখন বিধবা স্ত্রীলোকেরা নিজেদের ইদ্দত পূর্ণ করে নিল অর্থাৎ গর্ভবতী না হলে চার মাস দশ দিন এবং গর্ভবতী হলে প্রসবকাল পর্যন্ত (অপেক্ষা করল), তখন শরী'য়তের রীতি অনুসারে বিবাহ করায় তাদের কোন গোনাহ নেই এবং সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার সবই হালাল।

২৩৫. তোমাদের এতেও কোন গোনাহ নেই যে, তোমরা নারীদের ইশারা-ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দেবে বা (বিয়ে করার ইচ্ছা) নিজেদের অন্তরে গোপন রাখবে। আল্লাহ জানেন, তোমরা অবশ্যই ওই নারীদের স্মরণ করবে। কিন্তু গোপনে তাদের সাথে (বিয়ের) অঙ্গীকার করো না, তবে নিয়মসম্মত কোন কথা বললে (ভিন্ন ব্যাপার)। এবং তোমরা বিবাহ বন্ধনের সংকল্প করো না নির্ধারিত ইদ্দত তার শেষ প্রান্তে না পৌঁছা পর্যন্ত[১]। আর জেনে রাখ, তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন। অতএব তাঁকে ভয় করতে থাক। এবং এও জেনে রাখ যে, আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল[২]।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ؕ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

[রুকূ - ৩১]

২৩৬. তোমাদের কোন গোনাহ নেই যদি তোমরা স্ত্রীদের এ অবস্থায় তালাক দাও যে, তোমরা তাদের স্পর্শও করনি এবং তাদের জন্য কোন মহরও ধার্য করনি। আর তাদের কিছু উপহার দিয়ো— সচ্ছল ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং অসচ্ছল ব্যক্তি তার সামর্থ্য

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚۖ وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا

---

১. আয়াতের সারার্থ এই যে, কোনো নারী স্বামীর বিবাহ-বন্ধন থেকে পৃথক হওয়ার পর যে পর্যন্ত ইদ্দতের ভিতরে আছে, কারো জন্য জায়েয নয় তাকে বিয়ে করা অথবা বিয়ের পরিষ্কার ওয়াদা করিয়ে নেওয়া অথবা সুস্পষ্ট প্রস্তাব পাঠানো। তবে যদি মনে মনে ইচ্ছা রাখে যে, ইদ্দতের পর তাকে বিয়ে করবে অথবা ইশারা-ইঙ্গিতে তাকে নিজের ইচ্ছা জানিয়ে দেয়, যাতে অন্য কেউ তার আগে প্রস্তাব না দিয়ে বসে– যেমন তাকে বলল, 'তোমাকে যে কেউ পছন্দ করবে' অথবা বলল, 'আমার ইচ্ছা আছে কোথাও বিয়ে করার', তা হলে গোনাহ হবে না। কিন্তু পরিষ্কার প্রস্তাব অবশ্যই করবে না।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরের কথা জানেন। অতএব নাজায়েয ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থাক। আর নাজায়েয ইচ্ছা করা হয়ে গেলে তা থেকে তওবা কর, আল্লাহ ক্ষমাশীল। আর গোনাহর শাস্তি না হয়ে থাকলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া উচিত নয়। কেননা, তিনি ধৈর্যশীল– শাস্তিদানে তাড়াতাড়ি করেন না।

عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ۝

অনুযায়ী— ন্যায়সংগতভাবে। এ অবধারিত সৎকর্মশীলদের জন্য[১]।

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ۝

২৩৭. আর যদি তোমরা তাদের তালাক দাও তাদের স্পর্শ করার পূর্বে, এ অবস্থায় যে, তাদের জন্য মহর ধার্য করেছ— তবে যা ধার্য করেছ তার অর্ধেক (প্রদান করা জরুরী)। কিন্তু স্ত্রীরা (তা) মাফ করে দিলে অথবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন (অর্থাৎ স্বামী) সে ছাড় দিলে (ভিন্ন কথা)। আর তোমাদের ছাড় দেওয়াটাই পরহেজগারীর বেশি নিকটবর্তী। তোমরা পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ করতে ভুলো না। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা ভাল করেই দেখেন[২]।

---

১. বিবাহের সময় মহরের কথা উল্লেখ না করে থাকলে এবং বিনা মহরে বিবাহ করে ফেললেও বিবাহ দুরস্ত হবে। মহর পরে নির্ধারিত হতে হবে। কিন্তু এমতাবস্থায় স্পর্শ করার আগে অর্থাৎ সহবাস ও নির্জনবাসের আগেই তালাক দিলে মহর কিছুই ওয়াজিব হবে না বটে, তবে স্বামীর উচিত নিজ থেকে স্ত্রীকে কিছু দেওয়া। কমপক্ষে তিনটি কাপড় অর্থাৎ জামা, ওড়না, চাদর (বা পায়জামা) নিজ সামার্থ্য অনুসারে ও খুশী মনে দিয়ে দেবে।

২. বিবাহের সময় দেনমহর ধার্য হয়ে থাকলে এবং স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দিলে অর্ধেক মহর দেওয়া জরুরী। কিন্তু স্ত্রী কিংবা যার হাতে বিবাহ বহাল রাখা না রাখার ক্ষমতা রয়েছে (অর্থাৎ স্বামী) সে যদি নিজের প্রাপ্য থেকে ছাড় দেয়, তবে তা উত্তম। স্ত্রীর ছাড় দেওয়ার অর্থ– অর্ধেকও মাফ করে দেওয়া। আর স্বামীর ছাড় দেওয়া বলতে বোঝায় ধার্যকৃত মহর সম্পূর্ণ দিয়ে দেওয়া। অথবা সম্পূর্ণ মহর আদায় করে থাকলে অর্ধেক ফেরত না নিয়ে সম্পূর্ণ মহরই ছেড়ে দেওয়া।

তারপর আল্লাহ বলছেন, স্বামীর ছাড় দেওয়াটাই তাক্ওয়ার দিক থেকে বেশি সংগত। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং বিবাহ অটুট রাখা ও তালাক দেওয়ার ক্ষমতা দান করেছেন। আর নিছক বিবাহ দ্বারাই সম্পূর্ণ মহর জরুরী হয়ে যায়, এখন স্পর্শ না করে তালাক দিয়ে স্বামী যদি অর্ধেক মহর আদায়ের দায় থেকে মুক্ত হতে চায়, তবে এ তাকওয়ার পক্ষে সমীচীন নয়। আর এক্ষেত্রে স্ত্রীর দিক থেকেও কোন ত্রুটি হয়নি– যা কিছু করেছে স্বামীই করেছে। এসব কারণে স্বামীর জন্য উদারতার পরিচয় দেওয়াই বেশি সঙ্গত।

বি. দ্র. মহর ও স্ত্রীসহবাসের হিসাবে তালাকের চারটি অবস্থা হতে পারে। এক, মহর ও সহবাস উভয়টি ছাড়াই তালাক। দ্বিতীয়, মহর ধার্য হয়েছিল বটে, কিন্তু সহবাসের সুযোগ আসেনি। এই উভয় অবস্থার বিধান আয়াত দু'টি (২৩৬-২৩৭) থেকে জানা গেল। তৃতীয়,

২৩৮. তোমরা সকল নামায এবং (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি যত্নবান থাক এবং আল্লাহর সামনে স্থিরভাবে দাঁড়াও[১]।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۚ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ۝

২৩৯. আর যদি তোমরা ভয় কর, তবে পদচারী বা আরোহী অবস্থায় (নামায পড়ে নেবে)। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর– যেরূপ তিনি তোমাদের তা শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা জানতে না[২]।

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝

মহর ধার্য হয়েছিল এবং সহবাসের সুযোগ হয়েছে। এই ক্ষেত্রে ধার্যকৃত মহর সম্পূর্ণ দিতে হবে। কুরআন শরীফের অন্যত্র এর উল্লেখ রয়েছে। চতুর্থ, মহর ধার্য হয়নি, অথচ স্পর্শ করার পর তালাক দেওয়া হয়েছে। এতে 'মহরে মিছ্‌ল' অর্থাৎ যা এই নারীর বংশে প্রচলিত আছে তা সম্পূর্ণ দিতে হবে।

তালাকের স্থলে স্বামীর মৃত্যুর ক্ষেত্রেও এই চারটি অবস্থা হতে পারে। তবে মৃত্যুর হুকুম তালাকের হুকুম থেকে ভিন্ন। মহর ধার্য করা ও স্পর্শ করার পূর্বেই স্বামী মরে গেলে অথবা স্পর্শ করার পর মারা গেলে এই উভয় ক্ষেত্রে 'মহরে মিছ্‌ল' সম্পূর্ণ দিতে হবে। আর মহর ধার্য করে স্পর্শ করে বা না করে মারা গেলে এ উভয় ক্ষেত্রে ধার্যকৃত মহর পূর্ণ দিতে হবে।

১. মধ্যবর্তী নামায দ্বারা আসরের নামায উদ্দেশ্য, যেহেতু তা দিন ও রাতের মধ্যভাগে রয়েছে। আসরের নামাযের সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার কারণ এই যে, এ সময়ে দুনিয়ার কাজ-কর্মের ব্যস্ততা বেশি থাকে। আর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ—নামাযের মধ্যে এমন কোনো আচরণ করবে না যাতে মনে হয়, নামায পড়ছে না। এমন আচরণে নামায ভেঙ্গে যায়। যেমন: খাওয়া বা পান করা, অথবা কারো সঙ্গে কথা বলা বা হাসা।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

তালাকের আহকামের মাঝে নামাযের হুকুম বয়ান করার কারণ হয়ত এই যে, দুনিয়ার কাজকর্ম ও পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে মানুষ যেন খোদা তাআলার ইবাদত ভুলে না যায়। অথবা কারণ এই যে, যারা কামনা-বাসনার দাস, তাদের পক্ষে লালসা ও কৃপণতার কারণে, বিশেষত তালাক ও কষ্টের হালতে ইনসাফের সঙ্গে কাজ করা দুরূহ ও কঠিন ব্যাপার। অতএব এ অবস্থায় وَاَنْ تَعْفُوْا ও لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ অনুযায়ী আমল করা সুদূর পরাহত বলে মনে হত। তাই এর এলাজ হিসাবে বলে দেওয়া হল যে, নামাযের হেফাজত, তার পাবন্দী ও তার সকল হক রক্ষা কর। এ-ই সর্বোত্তম এলাজ। কেননা, চারিত্রিক দোষাবলি বর্জনে ও গুণাবলি অর্জনে নামাযের বিরাট কার্যকারিতা রয়েছে।

২. অর্থাৎ যুদ্ধ ও শত্রুর ভয়ের সময় অপারগতার কারণে আরোহীরা বাহনের উপর এবং পদচারীরা ইশারায় নামায পড়লে দুরুস্ত হবে, এমন কি কেবলার দিকে মুখ না থাকলেও।

২৪০. তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে ও স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য ওসীয়ত করে যাবে– (তাদেরকে ঘর থেকে) বের না করে এক বছর পর্যন্ত খোর-পোষ দেওয়ার[১]। কিন্তু স্ত্রীরা নিজেরাই যদি বের হয়ে যায়, তবে তারা নিজেদের ব্যাপারে নিয়মসম্মত কাজ করলে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[২]।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا ۖ وَّصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْ أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٤٠﴾

২৪১. আর তালাকপ্রাপ্ত নারীদের জন্য রয়েছে নিয়মানুযায়ী উপহার। এ অবধারিত পরহেজগারদের জন্য[৩]।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ ۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾

২৪২. এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বিধানাবলি বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার[৪]।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤٢﴾

---

১. ইসলামের প্রথম দিকে এই নির্দেশ ছিল। পরবর্তী সময়ে যখন মীরাসের আয়াত নাযিল হল এবং নারীদের অংশও নির্ধারিত হল, এদিকে নারীর ইদ্দতও চার মাস দশ দিন নির্ধারিত হল, তখন এ আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে যায়।

২. অর্থাৎ যদি সেই স্ত্রীরা স্বেচ্ছায় বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে শরী'য়ত মত নিজেদের ব্যাপারে কোন কাজ করে, তবে তাতে তোমাদের ওহে ওয়ারিসগণ! কোন গোনাহ হবে না। নিয়মসম্মত কাজ যেমন– স্বামী গ্রহণ করল অথবা ভাল পোশাক ও সুগন্ধি ব্যবহার করল, তাতে কোন দোষ নেই।

৩. মহরও ধার্য হয়নি এবং স্বামী স্পর্শও করেনি, এমন অবস্থায় তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদেরকে উপহার অর্থাৎ এক সেট কাপড় দেওয়ার হুকুম পূর্বে (আয়াত ২৩৬) বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান আয়াতে সেই হুকুম সকল তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদের জন্যই প্রবর্তিত করা হল। তবে পার্থক্য এই যে, সকল তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদের কাপড় দেওয়া মুস্তাহাব, জরুরী নয়। আর পূর্বের ক্ষেত্রে জরুরী।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এখানে যেমন বিবাহ, তালাক, ইদ্দতের আহকাম বয়ান করলেন, এভাবেই তিনি তাঁর সকল হুকুম-আহকাম ও নিদর্শনাদি প্রকাশ করে থাকেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার এবং আমল করতে পার। এখানে বিবাহ ও তালাকের আহকাম শেষ হল।

[রুকূ - ৩২]

২৪৩. তুমি কি তাদের দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বের হয়ে গিয়েছিল, আর তারা ছিল হাজার হাজার? অতঃপর আল্লাহ তাদের বললেন, 'তোমরা মরে যাও', (তারা মরে গেল)। তারপর তিনি তাদের জীবিত করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর করে না[১]।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

২৪৪. তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

২৪৫. কে আছে এমন, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, অতঃপর তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন? আর আল্লাহই সংকুচিত করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে[২]।

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

---

১. এটি পূর্ববর্তী উম্মতের ঘটনা। কয়েক হাজার মানুষ পরিবার-পরিজনসহ দেশ থেকে পালাচ্ছিল। তাদের ছিল শত্রুর ভয় এবং জেহাদের প্রতি অনীহা, অথবা ভয় ছিল মহামারীর এবং তকদীরের উপর ভরসা ও একীন ছিল না। অতঃপর এক স্থানে পৌঁছে আল্লাহর হুকুমে সকলেই মরে গেল এবং সাত দিন পর নবীর দো'য়ায় পুণর্জীবিত হল, যাতে সতর্ক হয়ে তওবা করে।

এখানে এ ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য, মুসলমানরা যেন জান-মালের মহব্বতের কারণে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে বা আল্লাহর পথে মাল খরচ করতে পিছপা না হয় এবং যেন বুঝে নেয় যে, আল্লাহ মৃত্যু পাঠালে বাঁচার কোন উপায় নেই। আর জীবন দান করতে চাইলে নিমেষের মধ্যে মৃতকে জীবিত করতে পারেন– জীবিতকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করা তো তাঁর জন্য কোন বিষয়ই নয়। অতএব আল্লাহর হুকুম পালন না করে মৃত্যুর ভয়ে জেহাদ থেকে পিছিয়ে থাকা কিংবা দারিদ্র্যের ভয়ে সদকা-খয়রাত না করা এবং অন্যদের প্রতি অনুগ্রহ, ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন না করা অধর্ম তো বটেই, সেই সাথে চরম বোকামীও।

২. অর্থাৎ যখন জানা গেল যে, তোমাদের জান-মাল আল্লাহরই হুকুমাধীন, তখন তোমাদের কর্তব্য আল্লাহর জন্য দীনের খাতিরে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আর জেনে রাখ, আল্লাহ তাআলা বাহানাকারীদের সকল কথা শুনতে পান এবং ওদের কারসাজি ও অভিসন্ধি

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

২৪৬. তুমি কি মূসার পরবর্তী বনী ইসরাঈলের একটি জামাতকে দেখনি[১]? যখন তারা তাদের নবীকে বলল, 'আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করুন, যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি।' নবী বললেন, 'তোমাদের থেকে এই আশঙ্কা আছে কি যে, তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হলে তখন তোমরা যুদ্ধ করবে না?' তারা বলল, 'আমাদের এমন কী কারণ আছে যে, আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না, অথচ আমাদের তো আমাদের ঘর-বাড়ী ও আমাদের সন্তান-সন্ততি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে?' অতঃপর যখন তাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হল, তখন তাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া সকলেই ফিরে গেল। আর আল্লাহ অপরাধীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত[২]।

জানেন। তোমাদের আরো উচিত আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করা। দারিদ্র্যের ভয় করো না, কারণ স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা সবই আল্লাহর ক্ষমতাধীন। আর তাঁরই কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে।

'উত্তম ঋণ' এই যে, কর্জদাতা কর্জের টাকা ফেরত দিতে তাগিদ করে না, স্বীয় অনুগ্রহ প্রকাশ করে না ও বদলা চায় না, এবং ঋণী ব্যক্তিকে হেয় জ্ঞান করে না। আর আল্লাহকে দেওয়ার অর্থ জেহাদে খরচ করা বা অভাবীদের দেওয়া।

১. পূর্বের আয়াতে যা বলা হয়েছে অর্থাৎ স্বচ্ছলতা ও সংকীর্ণতা আল্লাহ তাআলারই ক্ষমতাধীন– বর্তমান আয়াতের ঘটনা দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। বস্তুত ফকীরকে বাদশাহ বানানো এবং বাদশাহ থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়া, দুর্বলকে শক্তিশালী করা এবং সবলকে দুর্বল করে দেওয়া তাঁরই হাতে রয়েছে।

২. হযরত মূসা আ. এর পরে কিছুকাল বনী ইসরাঈলের আমল ও কর্ম ভাল ছিল। অতঃপর ওদের কার্যকলাপ খারাপ হয়ে গেলে ওদের উপর 'জালুত' নামে এক লুণ্ঠনকারী কাফের বাদশাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। সে ওদেরকে শহর থেকে বহিষ্কার করে, সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং ওদের অনেককে দাসে পরিণত করে। বনী ইসরাঈল ভেগে গিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে সমবেত হয়। তখন হযরত শামুয়েল আ. পয়গম্বর ছিলেন। ওরা তাঁর কাছে দরখাস্ত করল ওদের জন্য কোন বাদশাহ নির্ধারণ করে দিতে, যাতে ওরা তার সঙ্গী হয়ে আল্লাহর রাস্তায় (জালুতের বিরুদ্ধে) জেহাদ করতে পারে।

২৪৭. আর তাদের নবী তাদের বললেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন'। তারা বলতে লাগল, 'আমাদের উপর তার রাজত্ব কীভাবে হতে পারে, অথচ আমরা তার চেয়ে রাজত্বের বেশি হকদার এবং তাকে দেওয়া হয়নি সম্পদের প্রাচুর্য?' নবী বললেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাকে তোমাদের উপর মনোনীত করেছেন এবং তাকে অনেক সমৃদ্ধি দিয়েছেন জ্ঞানে ও দেহে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রাজত্ব দান করেন এবং আল্লাহই প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞাতা[১]।'

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْۤا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

২৪৮. তাদের নবী তাদের আরো বললেন, 'তালুতের রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে সেই সিন্দুক আসবে, যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মনের প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূনের সন্তানসন্ততি যা রেখে গেছে তার কিছু অবশেষ– যা বহন করে আনবেন ফেরেশতাগণ। নিশ্চয় এর মধ্যে তোমাদের জন্য (পূর্ণ) নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক[২]।'

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖۤ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

---

১. তালুতের সম্প্রদায় পূর্ব থেকে রাজত্বের অধিকারী ছিল না, তারা ছিল গরীব শ্রমিক মানুষ। বনী ইসরাঈলের দৃষ্টিতে তারা রাজ্য পরিচালনার যোগ্য ছিল না। ধন-দৌলতের কারণে ওরা নিজেদের যোগ্য মনে করল। নবী বললেন, রাজত্ব কারো অধিকার নয়, এর জন্য আসল যোগ্যতা হল জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৈহিক শৌর্য-বীর্য। আর এদিক থেকে তালুত তোমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ।

বি. দ্র. নবীর কথা শুনে বনী ইসরাঈল তাঁকে বলল, এ ছাড়া (অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধি ও শৌর্য-বীর্য) তালুতের রাজত্বের আরো কোন প্রমাণ দেখিয়ে দিন, যাতে আমাদের মনে সন্দেহের অবকাশ না থাকে। নবী আল্লাহর দরবারে দো'য়া করলেন। ফলে (পরবর্তী আয়াতে) তালুতের রাজত্বের দ্বিতীয় নিদর্শন বর্ণিত হল।

২. বনী ইসরাঈলের মধ্যে একটি সিন্দুক বংশানুক্রমে চলে আসছিল। তাতে বরকতের জিনিসপত্র ছিল। হযরত মূসা আ. ও বনী ইসরাঈলের অন্যান্য নবী যুদ্ধের ময়দানে এই

[রুকূ - ৩৩]

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۭ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ۭ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

২৪৯. অতঃপর যখন তালুত (তার) সৈন্য বাহিনীগুলি নিয়ে বের হলেন, তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমদের পরীক্ষা করবেন একটি নদীর দ্বারা। অতএব যে ব্যক্তি তা থেকে পানি পান করবে, সে আমার (দলের) নয়। আর যে তা আস্বাদন করবে না, সে আমার (দলের); তবে যে ব্যক্তি নিজ হাতে এক অঞ্জলি ভরে নেবে (সেও আমার দলের)।' অতঃপর তাদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যক ছাড়া সকলেই সেই নদীর পানি পান করে বসল। অনন্তর যখন তালুত ও তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তারা তা পার হল, তখন তারা বলতে লাগল, 'আজ জালুত ও তার সৈন্যদলগুলোর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করার শক্তি নেই।' তখন যারা (দৃঢ়) বিশ্বাস করত যে, আল্লাহর সঙ্গে তাদের মিলিত হতে হবে, তারা বলতে লাগল- 'কত ক্ষুদ্র দল আল্লাহর হুকুমে বড় দলের উপর জয়ী হয়েছে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন[১]।'

সিন্দুকটি সম্মুখ ভাগে রাখতেন, এর বরকতে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করতেন। ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈল জালুতের হাতে পরাজিত হলে সে এই সিন্দুকও নিয়ে গিয়েছিল।

আল্লাহ তাআলা সিন্দুকটি ফিরিয়ে দিতে চাইলে কুদরতী ব্যবস্থা এই হল যে, সেই কাফের রাজা যেখানেই সিন্দুকটি রাখত, সেখানেই মহামারী ও মুসিবত নাযিল হত। এভাবে পাঁচটি শহর বিরান হয়ে গেলে বাধ্য হয়ে সে দুটি বলদের উপর সিন্দুকটি চড়িয়ে দিয়ে হাঁকিয়ে দিল। ফেরেশতাগণ বলদ দুটি হাঁকিয়ে নিয়ে তালুতের দ্বারে পৌছে দিলেন। বনী ইসরাঈল এই নিদর্শন দেখে তালুতের রাজত্বে বিশ্বাস স্থাপন করল। অতঃপর তালুত জালুতের উপর সৈন্যাভিযান করলেন। সময়টি ছিল প্রখর গ্রীষ্মকাল। (তাফসীরে তবারী ৪/৪৬২-৪৬৪)

১. জোশের চোটে সকলেই তালুতের সহগামী হতে প্রস্তুত হয়ে গেল। তালুত বলে দিল, আশি হাজার শক্তিশালী নির্ভীক যুবক যারা, শুধু তারা আমার সঙ্গে চলবে। এ রকমই আশি হাজারের বাহিনী তালুতের সহযাত্রী হল। অতঃপর তালুত তাদের পরীক্ষা করতে চাইলেন। এক মনযিলে পানির অভাব হল, পরবর্তী মনযিলে নদী পাওয়া গেল। তালুত নির্দেশ জারী করলেন, যে এক অঞ্জলির বেশি পানি পান করবে সে আমার সঙ্গে যাবে না। এতে মাত্র

২৫০. আর যখন তারা জালুত ও তার সৈন্যদলগুলোর সম্মুখীন হল, তখন তারা বলল, 'হে আমাদের রব! আমাদের দিলে ধৈর্য ঢেলে দিন, আমাদের পা স্থির রাখুন এবং (এই) কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।'

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ۝

২৫১. অতঃপর তারা (তালুত ও তার সৈন্যরা) আল্লাহর হুকুমে জালুত ও তার সৈন্যদের পরাজিত করল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করলেন। আর আল্লাহ দাউদকে রাজত্ব ও হেকমত (প্রজ্ঞা) দান করলেন এবং তাঁকে যা চাইলেন শিক্ষা দিলেন। আর যদি আল্লাহ মানুষের এক দলকে অন্য দলের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল[১]।

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ۟ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ۝

তিনশত তেরজন তার সাথে রইল, বাকী সব পৃথক হয়ে গেল। যারা এক অঞ্জলির বেশি পান করেনি তাদের পিপাসা মিটল, যারা বেশি পান করল তাদের অধিকতর পিপাসা হল এবং সম্মুখে অগ্রসর হতে পারল না।

১. তারা জালুতের সম্মুখীন হল, অর্থাৎ সেই তিনশত তেরজন, যাদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং হযরত দাউদ আ. এবং তাঁর পিতা ও ছয় ভাই। পথে দাউদ আ. তিনটি পাথর পেলেন। পাথরগুলি কথা বলল, "আমাদের তুলে নিন, আমরা জালুতকে হত্যা করব।"

দু'দল সম্মুখীন হলে স্বয়ং জালুত বের হয়ে এল এবং বলল, আমি একাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট, আমার সামনে আসতে থাক। হযরত শামুয়েল আ. হযরত দাউদ আ.- এর পিতাকে ডেকে বললেন, তোমার ছেলেদের আমাকে দেখাও। তিনি ছয় ছেলেকে দেখালেন, যারা বড় ও উঁচু আকৃতির ছিল, হযরত দাউদ আ.কে দেখাননি। তিনি ছোট আকৃতির ছিলেন এবং ছাগল চড়াতেন। হযরত শামুয়েল তাঁকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জালুতকে হত্যা করবেন? তিনি উত্তর দিলেন, 'হত্যা করব'। এই বলে তিনি জালুতের প্রতি অগ্রসর হলেন এবং সেই পাথর তিনটি রশির মাধ্যমে নিক্ষেপ করলেন। জালুতের শুধু মাথা খোলা ছিল, আর সারা দেহ লৌহাবৃত ছিল। তিনটি পাথরই জালুতের মাথায় লেগে পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে গেল। জালুতের বাহিনী ভেগে গেল এবং মুসলমানদের বিজয় হল। অতঃপর তালুত স্বীয় কন্যাকে হযরত দাউদ আ.এর নিকট বিয়ে দিলেন এবং তালুতের মৃত্যুর পর দাউদ আ. বাদশাহ হলেন। (তাফসীরে তবারী ৪/৫০০-৫০৬)

২৫২. এগুলি আল্লাহর আয়াত– আমি আপনাকে তা যথাযথভাবে পড়ে শোনাচ্ছি। আর নিশ্চয় আপনি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত[১]।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

পারা - ৩

২৫৩. এই রাসূলগণ– তাঁদের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। তাঁদের মধ্যে কেউ তো এমন, যাঁর সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাঁদের কাউকে তিনি বহু মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। আর আমি ঈসা ইবনে মারয়ামকে সুস্পষ্ট মুজেযাসমূহ দান করেছি এবং তাঁকে 'রূহুল কুদুস' (অর্থাৎ জিবরাঈল) দ্বারা শক্তিশালী করেছি[২]। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে নবীগণের পরবর্তী লোকেরা তাদের নিকট সুস্পষ্ট বিধানাবলি আগমনের পরও পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না। কিন্তু তারা মতভেদ করল— তাদের মধ্যে কেউ তো

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۟

এ থেকে জানা গেল, জেহাদের হুকুম সকল যুগে চালু রয়েছে। বস্তুত এতে আল্লাহর অপার রহমত ও অনুগ্রহ নিহিত আছে। মূর্খরা বলে, যুদ্ধ নবীদের কাজ নয়।

১. বনী ইসরাঈলের উপরোক্ত কাহিনী অর্থাৎ হাজার হাজার লোকের বহির্গত হওয়া, তাদের হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ও পরে জীবিত হওয়া এবং তালুতের বাদশাহ হওয়া— এ সব আল্লাহর নিদর্শন, যা আপনাকে শোনানো হয়েছে। আর আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূলদের একজন। অর্থাৎ পূর্বে যেমন নবী-রাসূল হয়েছেন, তেমনি আপনিও নিশ্চিতরূপে রাসূল। কেননা, পূর্ববর্তী জাতিনিচয়ের এসব কাহিনী আপনি ঠিক ঠিক বয়ান করছেন, অথচ তা আপনি কোন কিতাবেও পড়েননি আর কোন মানুষের কাছেও শুনেননি।

২. আল্লাহ উল্লিখিত পয়গম্বরদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন, যাঁদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন, যেমন আদম আ. ও মূসা আ.। আর কাউকে কাউকে তিনি উচ্চ মর্তবা দান করেছেন। যেমন কেউ একটি জাতির নবী, কেউ একটি গ্রামের নবী, কেউ একটি শহরের নবী আর কেউ সারা বিশ্বের নবীরূপে প্রেরিত হয়েছেন, যেমন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর হযরত ঈসা আ.-কে বহু প্রকাশ্য মুজেযা দান করেছিলেন। যেমন: মৃতকে জীবিত করা, অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করা ইত্যাদি এবং পবিত্রাত্মা জিবরাঈল ফেরেশতাকে তাঁর সাহায্যার্থে পাঠিয়ে তাঁকে শক্তিশালী করেছিলেন।

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ۝

ঈমান আনল এবং কেউ কাফের হল। আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না। কিন্তু আল্লাহ যা চান করেন[১]।

[রুকূ - ৩৪]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ۝

২৫৪. হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদের যে রিযিক দান করেছি তা থেকে ব্যয় কর, সেই দিন আসার পূর্বে, যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় থাকবে না, কোন বন্ধুত্বও না এবং কোনো সুপারিশও না[২]। আর কাফেররাই

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ ইচ্ছা করলে লোকেরা পরস্পর লড়াই করত না ও মতবিরোধ করত না এবং তাদের মধ্যে কেউ মুমিন ও কেউ কাফের– এমন হত না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, যা ইচ্ছা তা-ই করেন। তবে তাঁর কোন কাজই হেকমতশূন্য নয়।

২. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

এই সূরার মধ্যে ইবাদত-বন্দেগী ও মুআমালাত (অর্থাৎ লেন-দেন, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি) সম্পর্কে অনেক হুকুম-আহকাম বর্ণিত হয়েছে। এ সকল হুকুম মেনে চলা নফসের কাছে অপছন্দ ও কঠিন। আর সকল আমলের মধ্যে মানুষের জন্য সবচেয়ে কঠিন হল জান ও মাল ব্যয় করা। আল্লাহ তাআলার আহকামের অধিকাংশই হয় জান সম্পর্কে না হয় মাল সম্পর্কে। অথচ এই জান-মালের চিন্তা ও মহব্বতেই বান্দা গোনাহে লিপ্ত হয়। বলতে গেলে, জান-মালের ভালবাসাই সকল পাপের মূল এবং এই ভালবাসা থেকে মুক্তিই সকল নেককাজ সহজসাধ্য হওয়ার উপায়।

অতএব সেসব হুকুম-আহকাম বর্ণনা করার পর জেহাদ (অর্থাৎ জানের কুরবানী) ও মাল খরচের উল্লেখ খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছে। وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الخ আয়াতের মধ্যে জেহাদের বয়ান ছিল এবং مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ এর মধ্যে অর্থ-ব্যয়ের উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর তালুতের কাহিনী দ্বারা প্রথমটির তাকীদ করা হয়। এখন (বর্তমান আয়াতে) اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ الخ দ্বারা দ্বিতীয়টির তাকীদ উদ্দেশ্য। আর যেহেতু ইবাদত-বন্দেগী ও মুআমালাতের অনেক বিষয় অর্থ-ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু এর বয়ান বিশদভাবে ও গুরুত্বের সঙ্গে করা হচ্ছে। এজন্যই সামনের রুকূগুলির অধিকাংশের মধ্যে দ্বিতীয় বিষয় তথা অর্থ-ব্যয়ের আলোচনা রয়েছে।

সারার্থ এই যে, আমলের সময় এখনই। আখেরাতে আমলাদি বিক্রিও হবে না, কেউ বন্ধুত্বের খাতিরে দেবেও না। কেউ সুপারিশ করে ছাড়াতেও পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না যিনি ধরবেন তিনিই ছাড়বেন।

প্রকৃত জালেম[১]।

২৫৫. আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। (তিনি) চিরঞ্জীব, (সব কিছুর) নিয়ন্ত্রক[২]।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ

১. অর্থাৎ কাফেররা নিজেরাই নিজেদের উপর অবিচার করেছে। ফলে ওদের এই ক্ষতি হয়েছে যে, পরকালে কারো বন্ধুত্ব বা সুপারিশ ওদের কোন উপকারে আসবে না।

২. আগের আয়াত থেকে আল্লাহ তাআলার মহিমা ও গরিমা বুঝে আসে। অতঃপর এই আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তাআলা স্বীয় সত্তার একত্ব, মাহাত্ম ও পবিত্রতা যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। এই আয়াতখানিই 'আয়াতুল কুর্সী' নামে অভিহিত। হাদীছের ভাষায় এটি কুরআন শরীফের শ্রেষ্ঠ আয়াত। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৮১০) তাছাড়া এর আরও অনেক ফযীলত ও ছওয়াবের কথা বর্ণিত রয়েছে।

কুরআনুল কারীমে আলোচিত তিনটি বিষয় ও তাদের পরস্পর সম্পর্ক

আসল কথা এই যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় পবিত্র কালামের মধ্যে তিন ধরনের বিষয় বার বার বয়ান করেছেন। এক– তাওহীদ ও সিফাত (অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব ও গুণাবলি)-এর বিষয়; দুই– হুকুম-আহকামের কথা; তিন– কিচ্ছা-কাহিনী ও ঘটনাবলি। এসব কাহিনী ও ঘটনা দ্বারাও তাওহীদ ও সিফাতের সমর্থন ও প্রমাণ অথবা হুকুম-আহকামের তাকীদ ও আবশ্যকতা উদ্দেশ্য হয়। আর তাওহীদ ও সিফাতের বিষয় এবং আহকামের বিষয় পরস্পর এমনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, একটি অন্যটির জন্য কারণ ও নিদর্শনস্বরূপ। আল্লাহ তাআলার সিফাত হচ্ছে শরী'য়তের আহকামের জন্য মূল ও উৎস। অতএব শরী'য়তের আহকাম সিফাতের পক্ষে ফল বা শাখাস্বরূপ। এখন স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ঘটনাবলি ও আহকামের জ্ঞান দ্বারা তাওহীদ বিষয়ক জ্ঞানের অবশ্যই সাহায্য ও বলবৃদ্ধি হবে। আর ঘটনাবলির জ্ঞান এবং তাওহীদ ও সিফাতের জ্ঞান দ্বারা অবশ্যই হুকুম-আহকামের তাকীদ ও জরুরত বরং তার তাৎপর্য ও মৌলিকতা প্রমাণিত হবে।

বস্তুত উক্ত তিন ধরনের বিষয়াবলি মিশ্রিতভাবে বর্ণনা করার এই যে পদ্ধতি– এটি সুন্দরতম, সহজতম ও অধিক গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। এর কারণ প্রথমত এই যে, কোন এক বিষয়ের মাঝেই আবদ্ধ থাকা বিরক্তির কারণ। পক্ষান্তরে একটি বিষয়ের বর্ণনা থেকে অন্য বিষয়ের প্রতি ধাবিত হওয়ার উদাহরণ এমন, যেমন একটি বাগানে ভ্রমণ করতে করতে অন্য একটি বাগানে গিয়ে প্রবেশ করলাম। দ্বিতীয়ত, এই তিন প্রকার বিষয়ের সমন্বয়ে আসল উদ্দেশ্য, ফলাফল, কারণ ও তাৎপর্য জানা হয়ে যায়। সেই সংগে এর দ্বারা হুকুম-আহকাম মেনে চলার কাজটি আগ্রহ-উদ্দীপনা এবং নিষ্ঠা ও অন্তর্দৃষ্টির সাথে সম্পাদিত হয়। এ কারণেই উক্ত পদ্ধতি অতি উত্তম ও উপাদেয় বলে বিবেচিত এবং কুরআন শরীফে বহুল ব্যবহৃত।

এস্থলেই দেখুন, প্রথমে আহকামের আলোচনা কত ব্যাপক ও বিশদভাবে করা হয়েছে। অতঃপর আবশ্যক পরিমাণ কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করে উক্ত আহকামের লাভালাভ ও ফলাফল যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হল। এ সবের পর এখন তাওহীদ ও সিফাতসম্পর্কীয় বিশিষ্ট আয়াত অর্থাৎ 'আয়াতুল কুর্সী' বয়ান করে সমস্ত হুকুম-আহকামের

لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝

তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না তন্দ্রা ও নিদ্রা। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের (অর্থাৎ সকল সৃষ্টিজীবের) সামনে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি জানেন। আর তারা সকলে তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না– তবে ততটুকু, যা তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর 'কুরসী' (সমগ্র) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে এবং এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য আদৌ কঠিন নয়। আর তিনিই সমুন্নত, মহিমান্বিত[১]।

শিকড় আমাদের অন্তরের মধ্যে এমনভাবে প্রোথিত করে দেওয়া হল যে, কেউ তা উপড়াতে চাইলেও উপড়াতে পারবে না।

১. এই আয়াতে আল্লাহ তাআলার মহান সত্তার একত্ব এবং তাঁর গুণাবলির মহিমা বর্ণিত হয়েছে : অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা অনাদি কাল থেকে আছেন, তিনি লা-শরীক, সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা, সর্বপ্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত, সকল কিছুর মালিক, সকল বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান এবং পরম মহিমা ও গরিমার অধিকারী। কারো এতটুকু অধিকার বা সাধ্য নেই যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে কারো জন্য সুপারিশও করতে পারে। এমন কোন কাজ নেই যা করতে তাঁর শ্রান্তি বা ক্লান্তি হতে পারে। সকল জিনিস বা সকলের জ্ঞান-বুদ্ধির ঊর্ধ্বে তিনি, তাঁর মোকাবেলায় সকলেই হীন ও হেয়।

এতে আরো দু'টি বিষয় হৃদয়ঙ্গম হল। প্রথমত : আল্লাহ তাআলার প্রভুত্ব ও বান্দার দাসত্ব। যার দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলার পূর্বোক্ত হুকুম-আহকামসহ যাবতীয় বিধানকে নির্দ্বিধায় সত্য বলে স্বীকার করা ও বিনা বাক্যে পালন করা অপরিহার্য এবং তাঁর হুকুম-আহকামের মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, উল্লিখিত ইবাদত-বন্দেগী ও মুআমালাত এবং সেই সাথে আল্লাহর পুরস্কার ও শাস্তি-বিধান লক্ষ্য করে কারো অন্তরে সংশয় হতে পারত যে, এক একজন ব্যক্তির এতসব ইবাদত ও মুআমালা! সকলেরটার সমষ্টি কত বিপুল! এ সবের পূর্ণ হিসাব রাখা অসম্ভব মনে হয়। অন্যদিকে এ সবের পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান– এও জ্ঞান-বুদ্ধির ঊর্ধ্বে ও অসম্ভব মনে হয়। তাই এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা নিজের এমন কয়েকটি পবিত্র গুণের উল্লেখ করেছেন, যাতে এসব দ্বিধা, সন্দেহ অনায়াসে দূরীভূত হয়ে গেল। অর্থাৎ তাঁর এলেম ও কুদরত এমনি পূর্ণাঙ্গ যে, একটি জিনিসও তার আওতাবহির্ভূত নয়। যার ইলম ও কুদরত এমন সীমাহীন এবং সর্বদা এক রকম রয়েছে, তাঁর পক্ষে সৃষ্টিজগতের সকল বিষয়ের হিসাব রক্ষা করা এবং ওই সবের প্রতিদান দেওয়া কোনই কঠিন কাজ নয়।

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾

২৫৬. দীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হেদায়েত গোমরাহী থেকে সুস্পষ্টরূপে পৃথক হয়ে গেছে[১]। অতএব যে কেউ 'তাগুত' (তথা সকল গোমরাহকারী)-কে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, নিশ্চয় সে এমন মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙ্গে যাওয়ার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[২]।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾

২৫৭. আল্লাহ ঈমানদারদের সাহায্যকারী*, তিনি তাদের বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কাফের, তাদের বন্ধু 'তাগুত' (তথা শয়তান ও সকল গোমরাহকারী)। এরা ওদের বের করে নিয়ে যায় আলো থেকে অন্ধকারের দিকে। ওরা দোযখী, ওরা তাতে চিরকাল থাকবে।

---

১. তাওহীদের প্রমাণাদি বয়ান করে দেওয়ার পর কাফেরদের জন্য ওযর-আপত্তির পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। অতএব এখন আর জোর-জবরদস্তি করে কাউকে মুসলমান বানানোর প্রয়োজন থাকতে পারে না। বুদ্ধিমান লোকদের কর্তব্য, ইসলামের সত্যতা নিজেরাই বুঝে নেওয়া। আর শরী'য়তেও এই নির্দেশ নেই যে, জবরদস্তি করে কাউকে মুসলমান বানাও। কুরআন শরীফেরই অন্যত্র রয়েছে- أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (তবে কি আপনি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবেন?— ইউনুস : ৯৯).

আর যে কাফের জিযিয়া দিয়ে (মুসলিম রাষ্ট্রের) অধীনতা স্বীকার করবে, তার জান-মাল রক্ষিত থাকবে।

২. অর্থাৎ হেদায়েত ও গোমরাহীর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন যে কেউ গোমরাহী ছেড়ে হেদায়েত গ্রহণ করল, সে এমনি একটি সুদৃঢ় অবলম্বন ধারণ করল যা ছিন্ন হওয়া ও ছুটে যাওয়ার আশঙ্কাই নেই। আর আল্লাহ তাআলা সকলের মৌখিক কথাবার্তা বেশ শোনেন এবং অন্তরের নিয়ত ও হালত খুব জানেন- তাঁর নিকট কারো খেয়ানত ও কুচিন্তা গোপন থাকতে পারে না।

✡ দ্বিতীয় তরজমা- 'অভিভাবক'।

[রুকূ - ৩৫]

২৫৮. তুমি কি ওই ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইবরাহীমের সঙ্গে তাঁর রব সম্বন্ধে বিতর্ক করেছিল, এ কারণে যে, আল্লাহ ওকে রাজত্ব দান করেছিলেন? যখন ইবরাহীম বললেন, 'আমার রব তিনি, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।' সে বলল, 'আমিও জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।' ইবরাহীম বললেন, 'আল্লাহ তো সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও দেখি।' তখন সেই কাফের হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আর আল্লাহ জালেমদের সরল পথ দেখান না[১]।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِیْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّیَ الَّذِیْ یُحْیٖ وَیُمِیْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْیٖ وَاُمِیْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ یَاْتِیْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِیْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ ۚ۝

২৫৯. অথবা (তুমি কি দেখনি) সেই ব্যক্তিকে, যে একটি জনপদ অতিক্রম করছিল আর তা ভেঙ্গে পড়েছিল স্বীয় ছাদের উপর? সে বলল, 'আল্লাহ কীভাবে একে তার মৃত্যুর পর জীবিত করবেন?' তখন আল্লাহ তাকে

اَوْ كَالَّذِیْ مَرَّ عَلٰى قَرْیَةٍ وَّهِیَ خَاوِیَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى یُحْیٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ

---

১. পূর্ববর্তী আয়াতে ঈমানদার ও তাদের হেদায়াতের নূর এবং কাফের ও ওদের কুফরীর অন্ধকারের উল্লেখ ছিল। এখন তার সমর্থনে কতিপয় দৃষ্টান্ত বর্ণিত হচ্ছে।

প্রথম দৃষ্টান্তে বাদশাহ নমরূদের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। সে রাজত্বের অহংকারে নিজেকে প্রজাদের দ্বারা সেজদা করাত। হযরত ইবরাহীম আ. ওর সম্মুখে এসে সেজদা না করায় ও কারণ জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, আমি স্বীয় রব ছাড়া আর কাউকে সেজদা করি না। সে বলল, রব তো আমি। হযরত ইবরাহীম আ. উত্তরে বললেন, আমি শাসককে রব বলি না। রব হচ্ছেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। নমরূদ দুইজন বন্দীকে ডেকে আনিয়ে নিরপরাধকে মেরে ফেলল ও অপরাধীকে ছেড়ে দিল এবং বলল, দেখলে– আমি যাকে ইচ্ছা মৃত্যু দেই, যাকে ইচ্ছা জীবিত রাখি। এতে হযরত ইবরাহীম আ. সূর্যের দলীল পেশ করে এই অহংকারী আহমককে নিরুত্তর করে দিলেন।

কিন্তু ওর হেদায়েত হল না, অর্থাৎ নিরুত্তর হয়েও সে ইবরাহীম আ.এর কথায় ঈমান আনল না– ...وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي। অথবা (وَاللّٰهُ لَا يَهْدِيْ –এর ব্যাখ্যায়) বলা যায় যে, হযরত ইবরাহীম আ.এর দ্বিতীয় কথার কোন উত্তর সে দিতে পারল না, অথচ প্রথম কথার যেমন উত্তর দিয়েছিল এখানেও তেমন উত্তর দেওয়ার অবকাশ ছিল।

بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٥٩﴾

একশ' বছর মৃত রাখলেন[১], অতঃপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ বললেন, 'তুমি কতকাল (এ অবস্থায়) থাকলে?' সে বলল, 'একদিন বা একদিনের কিছু কম (এ অবস্থায়) থেকেছি[২]।' আল্লাহ বললেন, 'না, বরং তুমি একশ' বছর থেকেছ। এখন তুমি তোমার খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি লক্ষ কর, তা পচেনি এবং লক্ষ কর নিজের গাধাটির প্রতি। আর (আমি এরূপ করেছি) এজন্য যে, আমি তোমাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন বানাতে চাই। আরো লক্ষ কর (তার) হাড়গুলির প্রতি, কীভাবে আমি সেগুলি তুলে এনে সংযোজিত করে দিচ্ছি, তারপর তাতে গোশত পরিয়ে দিচ্ছি[৩]।' অতঃপর যখন তার সামনে (এসব বিষয়)

---

১. এই ব্যক্তি ছিলেন পয়গম্বর হযরত উযাইর আ.। সমগ্র তাওরাত তাঁর মুখস্ত ছিল। কাফের রাজা বুখ্‌তে নাসসার বাইতুল মুকাদ্দাসের ধ্বংসসাধন করে বনী ইসরাঈলের অনেককে বন্দী করে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে হযরত উযাইর আ.ও ছিলেন। অতঃপর বন্দীদসা থেকে মুক্ত হয়ে আসার পথে একটি বিধ্বস্ত জনশূন্য শহর তিনি দেখতে পেলেন। তার অট্টালিকাগুলি পতিতাবস্থায় ছিল। তিনি মনে মনে বললেন, এখানকার বাসিন্দারা সব মরে গেছে। আল্লাহ তাআলা কেমন করে তাদের জীবিত করবেন এবং এই শহর পুনরায় আবাদ হবে?

ওই স্থানেই তাঁর রূহ কবজ করা হল এবং তাঁর আরোহণের গাধাটিও মরে গেল। একশ বছর ওই অবস্থাতেই কেটে গেল। কেউ এসে সেখানে তাকে দেখেওনি, তাঁর কোন খবরও হয়নি। ইতিমধ্যে বুখ্‌তে নাসসার মরে যায় এবং অন্য বাদশাহ কর্তৃক বায়তুল মুকাদ্দাস আবাদ হয় এবং এই বিজন শহরও লোকারণ্য হয়ে ওঠে। একশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত উযাইরকে পুনর্জীবিত করা হয়- তাঁর খাদ্য ও পানীয় সেভাবেই (অবিকৃত) কাছে রাখা ছিল এবং তাঁর মৃত গাধাটির অস্থিসমূহও আপন অবস্থায় মজুদ ছিল। সেটি তাঁর সম্মুখেই জীবিত করা হয়। আর এই একশ' বছরের মধ্যে বনী ইসরাঈল বন্ধনমুক্ত হয়ে শহর আবাদও করেছিল, হযরত উযাইর আ. জীবিত হয়ে আবাদই দেখতে পেলেন।

২. হযরত উযাইর আ. মারা গিয়েছিলেন সকাল বেলা এবং পুনর্জীবিত হন বিকালে। তিনি ভাবলেন, আমি এখানে কাল এসে থাকলে একদিন হয়েছে। আর যদি আজই এসে থাকি, তবে একদিনের কম হয়েছে।

৩. হযরত উযাইর আ.-এর সম্মুখে গাধার হাড়সমূহ শরীরে যে রকম সাজানো থাকে সে রকমই একত্রিত করা হল। অতঃপর তা মাংসে আবৃত ও চামড়ায় আচ্ছাদিত করা হল। তারপর আল্লাহর কুদরতে মুহূর্তের মধ্যে ওতে প্রাণ এল এবং উঠে দাঁড়াল ও নিজের ডাক ডাকল।

প্রকাশিত হল, সে বলে উঠল, 'আমি জানি, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান[১]।'

২৬০. (স্মরণ কর), যখন ইবরাহীম বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে দেখিয়ে দিন, কীভাবে আপনি মৃতদের জীবিত করবেন।' আল্লাহ বললেন, 'তুমি কি বিশ্বাস কর না?' তিনি বললেন, 'অবশ্যই, তবে (এ প্রার্থনা এজন্য করছি), যাতে আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে[২]।' আল্লাহ বললেন, 'তবে চারটি পাখী ধরে আন এবং ওদের তোমার পোষ মানিয়ে নাও। অতঃপর প্রত্যেক পাহাড়ের উপর ওদের (দেহের) এক এক অংশ রেখে দাও। তারপর ওদের ডাক দাও, ওরা দৌড়ে তোমার নিকট চলে আসবে[৩]। আর জেনে

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِیْ كَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰی ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰی وَلٰكِنْ لِّیَطْمَىِٕنَّ قَلْبِیْ ؕ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَاْتِیْنَكَ سَعْیًا ؕ

১. হযরত উযাইর আ. সমস্ত ব্যাপারটা উপলব্ধি করার পর বললেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান,অর্থাৎ আমি যে জানতাম, মৃতকে জীবিত করা খোদা তাআলার পক্ষে সহজ, তা এখন স্বচক্ষে দেখে নিলাম।' এই অর্থ নয় যে, প্রথমে বিশ্বাসের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। হাঁ, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ছিল না, (এখন তা হয়েছে)। অতঃপর হযরত উযাইর আ. ওখান থেকে উঠে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌছলেন। কেউ তাঁকে চিনতে পারল না। কেননা, তিনি তো তখনো যুবক আর তাঁর সমকালীন বাচ্চারা এখন বৃদ্ধ। যখন তিনি তাওরাত মুখস্ত শোনালেন, তখন লোকদের বিশ্বাস হল যে, তিনিই উযাইর। বুখ্‌তে নাসসার কর্তৃক বনী ইসরাঈলের সকল কিতাব ভস্মিভূত করা হয়েছিল, তন্মধ্যে তাওরাতও ছিল।

২. সারকথা এই যে, বিশ্বাস তাঁর পূর্ণই ছিল, শুধু চোখের দেখা বাকী ছিল– সেটিরই দরখাস্ত ছিল তাঁর। অর্থাৎ ইলমুল একীন (মৌলিক বিশ্বাস) তাঁর ছিল। এখন আইনুল একীন (চাক্ষুষ বিশ্বাস) হাসিলের কামনা ছিল, যা চোখে দেখার উপর নির্ভরশীল।

৩. আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মত হযরত ইবরাহীম আ. চারটি পাখী ধরে আনলেন। চারটি পাখীর মধ্যে ছিল– একটি ময়ূর, একটি মোরগ, একটি কাক ও একটি কবুতর। আর যাতে ডাকলেই কাছে আসে সেজন্য সেগুলোকে তাঁর আসক্ত করে নিলেন। অতঃপর চারটিকেই যবেহ করলেন এবং একটি পাহাড়ের উপর সেগুলোর মাথা, একটির উপর পাখনা, আর একটির উপর সব ক'টির ধড় এবং একটির উপর পা'সমূহ রাখলেন। তারপর মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রথমে একটিকে ডাকলে তার মাথা এসে শূন্যে দাঁড়াল। অতঃপর ধড় এসে তার সঙ্গে মিলিত হল, তারপর পাখনা এল, পরে পা সংযুক্ত হল এবং তাঁর নিকট দৌড়ে চলে এল। অতঃপর এভাবে এক এক করে চারটিই এল। (তাফসীরে তবারী ৪/৬৪৫)

وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[১]।'

[রুকূ - ৩৬]

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

২৬১. যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তাদের (ব্যয় করা সম্পদের) উদাহরণ এমন : যেমন একটি শস্যদানা, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রত্যেকটি শীষে আছে একশত শস্যদানা। আর আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা আরো বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ অসীম দাতা*, সর্বজ্ঞ[২]।

---

১. এ ঘটনায় দু'টা সন্দেহ উদ্রেক হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমত, নির্জীব খণ্ড-বিখণ্ড দেহের জীবিত হওয়াটা স্বীকার করা মুশকিল। দ্বিতীয়ত, উক্ত পদ্ধতি অর্থাৎ পাখী নেওয়া হবে; অন্য প্রাণী নয়; তা আবার চারটি হবে, চারটি ভিন্ন ভিন্ন হবে এবং সেভাবে ওদের টুকরাগুলি বিচ্ছিন্ন করে ডাকলে জীবিত হয়ে দৌড়ে চলে আসবে– এর কোন ফায়দা এবং উক্ত শর্তাবলির লাভালাভ বুঝে আসে না।

তাই প্রথম সন্দেহের উত্তরে عَزِيْز এবং দ্বিতীয় সন্দেহের জওয়াবে حَكِيْم বলে উভয় সন্দেহের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। অর্থাৎ ভাল করে বুঝে নাও যে, আল্লাহ তাআলা ক্ষমতাশালী, সর্বশক্তির অধিকারী– যা ইচ্ছা করতে পারেন। আর তাঁর প্রত্যেকটি হুকুমে এতই হেকমত নিহিত যে, আমরা তা বুঝতে এবং আয়ত্ত করতে না পারলে এটা আমাদেরই জ্ঞান-বুদ্ধির দীনতা। এর কারণে তাঁর হেকমতের অস্বীকৃতি আদৌ সম্ভব নয়।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

আয়াতুল কুর্সীতে আল্লাহ তাআলার এলেম, কুদরত ইত্যাদি গুণ উল্লেখ করার পর তিনটি ঘটনা বর্ণিত হল। উদ্দেশ্য এটা বোঝানো যে, আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করতে পারেন এবং জীবন-মৃত্যু দান সবই তাঁর ক্ষমতায় রয়েছে।

সম্মুখে জেহাদ ও আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করার ফযীলত ও তার শর্তাবলি বয়ান করা হচ্ছে। কেননা আল্লাহ তাআলার এলেম ও কুদরতে বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর কুদরতের আজীব হাল-হাকীকত জানার পরই জেহাদ ও ধন খরচের মধ্যে যেসব বাধা-বিপত্তি দেখা যায়, তা দূরীভূত হবে। আর সম্পূর্ণ দূরীভূত না হলেও কমা তো অবশ্যই উচিত।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আল্লাহ প্রাচুর্যময়'।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পথে স্বল্প ধন-সম্পদ ব্যয়েরও ছওয়াব প্রচুর, যেমন একটি শস্য থেকে সাত শত শস্য পয়দা হয়। তিনি যাকে ইচ্ছা আরো বাড়িয়ে দেন এবং সাতশ থেকে

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٦٢﴾

২৬২. যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, অতঃপর তারা ব্যয় করার পর অনুগ্রহের কথা বলে বেড়ায় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্য রয়েছে আপন রবের নিকট তাদের ছওয়াব। আর তাদের ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না[১]।

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ۗ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿٢٦٣﴾

২৬৩. উত্তম কথা ও ক্ষমা করে দেওয়া সেই দানের চেয়ে উত্তম, যার পরে থাকে কষ্টপ্রদান। আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, অত্যন্ত ধৈর্যশীল[২]।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ

২৬৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা বলে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের দানকে বিনষ্ট করো না, সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজের সম্পদ মানুষকে দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং সে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে না[৩]। সুতরাং তার উদাহরণ এমন :

সাত হাজার, এমনকি তারো বেশি দান করেন। আর আল্লাহ তাআলা অতি বড় দাতা এবং প্রত্যেক দানকারীর নিয়ত উত্তমরূপে জানেন এবং প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি তার (দানের) অনুরূপ ব্যবহার করেন।

১. যারা আল্লাহ তাআলার পথে খরচ করে মুখে অনুগ্রহও প্রকাশ করে না এবং (অনুগ্রীহিত ব্যক্তিকে) খোঁটা দেওয়া, খেদমত নেওয়া ও হেয় জ্ঞান করা ইত্যাদি কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য রয়েছে পরিপূর্ণ ছওয়াব। আর ছওয়াব কম হওয়ার কোন ভয়ও তাদের নেই এবং ছওয়াবে কোন কমতির দুঃখও তারা পাবে না।

২. অর্থাৎ ভিক্ষুককে নম্রতার সাথে জওয়াব দেওয়া এবং তার পীড়াপীড়ি ও অসমীচীন ব্যবহার ক্ষমা করে দেওয়া সেই দানের চেয়ে উত্তম, যে দানের পর তাকে বার বার লজ্জিত করা হয় বা অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয় বা খোঁটা দেওয়া হয়। আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী– তাঁর কারো ধন-সম্পদের প্রয়োজন নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার পথে দান করে সে নিজের জন্যই করে। এবং আল্লাহ অতি সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল– দানের পাত্রকে (অনুগ্রীহিত ব্যক্তিকে) কষ্ট দিলে শাস্তি পাঠাতে তাড়াতাড়ি করেন না।

৩. অর্থাৎ দান করার পর দানগ্রহীতাকে কষ্ট ও খোঁটা দিলে দানের ছওয়াব নষ্ট হয়ে যায়। তদ্রূপ কেউ অন্যদের দেখিয়ে এজন্য দান করে, যাতে লোকেরা দাতা বলে– এতেও দান-খয়রাতের ছওয়াব কিছুই হয় না।

صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۚ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

যেমন একটি মসৃণ পাথর, তার উপর আছে মাটি, অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হল, ফলে তা তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে রেখে দিল। এমন লোকেরা তাদের কৃতকর্মের কিছুই হস্তগত করতে পারে না (অর্থাৎ তার দ্বারা কোন ছওয়াব লাভ করে না)। আর আল্লাহ কাফেরদের সরল পথ প্রদর্শন করেন না[১]।

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

২৬৫. পক্ষান্তরে, যারা নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল ও নিজেদের অন্তর দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে, তাদের উদাহরণ এমন : যেমন উঁচু ভূমিতে একটি উদ্যান, তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হল, ফলে সেই উদ্যান স্বীয় ফলমূল দ্বিগুণ উৎপন্ন করল। আর যদি তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হালকা বৃষ্টিই (যথেষ্ট)। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা উত্তমরূপে দেখেন[২]।

আর এই যে বলা হল, সে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে না– দানের ছওয়াব বিনষ্ট হওয়ার জন্য এ শর্ত নয়। কেননা, শুধু রিয়া দ্বারাই দান বাতিল হতে পারে, যদিও দানকারী মুমিন হয়। তবু আল্লাহ ও কিয়ামতে বিশ্বাসী না হওয়ার শর্ত যুক্ত করে এ কথা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, রিয়া মুমিনের কাজ নয়, এ তো মুনাফেকেরই বৈশিষ্ট্য।

১. পূর্বে (আয়াত ২৬১) ইরশাদ হয়েছে যে, দান-খয়রাতের উদাহরণ এরূপ, যেমন: একটি শস্যবীজ বপন করা হল এবং তা থেকে সাতশ শস্যকণা পয়দা হয়ে গেল। এখন বলা হচ্ছে যে, নিয়ত ঠিক রাখা শর্ত। রিয়া ও লোক দেখানোর নিয়তে দান করার উদাহরণ এরূপ, যেমন কেউ এমন পাথরের উপর শস্যবীজ বপন করল, যার উপর সামান্য মাটি দেখা যাচ্ছিল। বৃষ্টিপাত হওয়ার পর পাথর একেবারে ছাফ হয়ে গেল। এখন এতে শস্য কীভাবে উৎপন্ন হবে? তদ্রূপ, দান-খয়রাতেও রিয়াকারীদের ছওয়াবের আশা বৃথা।

২. প্রবল বৃষ্টি বলতে বেশি ধন খরচ করা এবং হালকা বৃষ্টি দ্বারা অল্প ধন খরচ করা উদ্দেশ্য। আর অন্তরকে দৃঢ় করার অর্থ ছওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে অন্তরকে দৃঢ় করা, অর্থাৎ বিশ্বাস থাকবে যে, দান-খয়রাতের ছওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে। অতএব নিয়ত ঠিক রেখে বেশি খরচ করলে বেশি ছওয়াব হবে। স্বল্প খরচ করলেও ছওয়াব হবে। যেমন: এই উদাহরণে বোঝানো হয়েছে যে, উর্বর ভূমিতে একটি বাগান, তাতে যত বেশি বৃষ্টি হবে ততই বাগানের ফায়দা হবে। আর যদি নিয়তই ঠিক না থাকে, তবে যত বেশি খরচ করবে সেই

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ
نَّخِيْلٍ وَّأَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهٰرُ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ
وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ
فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

২৬৬. তোমাদের কেউ কি— এমতাবস্থায় যে, তার উপর বার্ধক্য এসে গেছে এবং তার রয়েছে দুর্বল সন্তান-সন্ততি— এটা পছন্দ করবে যে, তার একটি বাগান হবে খেজুর ও আঙ্গুরের, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। তার জন্য সেই বাগানে আরো থাকবে সব রকমের ফলমূল। অতঃপর সেই বাগানের উপর একটি অগ্নিগর্ভ ঘূর্ণিঝড় আপতিত হবে, ফলে তা জ্বলে যাবে? এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পার[১]।

[রুকূ - ৩৭]

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَنْفِقُوْا مِنْ
طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ
بِاٰخِذِيْهِ إِلَّآ أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْٓا

২৬৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ব্যয় কর তোমাদের উপার্জন করা উৎকৃষ্ট বস্তুরাজি থেকে এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে। আর নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে ব্যয় করবে, অথচ তোমরা তা কখনো গ্রহণ করবে না, তবে তার ব্যাপারে চোখ বন্ধ

পরিমাণ ধন নষ্ট হবে ও ক্ষতি বৃদ্ধি হবে। কারণ, বেশি ধন দানে রিয়া ও লোক দেখানো বেশি হবে। যেমন: পাথরের উপর শস্যকণা উৎপন্ন হওয়ার পর যত বেশি বৃষ্টি হবে, ততই তার ক্ষতি বৃদ্ধি পাবে।

১. এটা তাদের দৃষ্টান্ত, যারা লোক দেখানোর জন্য দান-খয়রাত করে অথবা দান করে খোঁটা ও কষ্ট দেয়। অর্থাৎ যেমন কোন এক ব্যক্তি যৌবনকালে দৈহিক শক্তি ব্যয় করে ফলের একটি বাগান করেছে, যাতে বৃদ্ধ বয়সে দুর্বল অবস্থায় তা দিয়ে জীবন ধারণ করতে পারে। অতঃপর যখন বার্ধক্য এসেছে এবং ফলের প্রয়োজন পূর্ণভাবে দেখা দিয়েছে, এ অবস্থায় তা জ্বলে গেল। অর্থাৎ দান-খয়রাত ফলদার বাগানের মতো, যার ফল আখেরাতে কাজে আসবে। দানকারীর নিয়ত খারাপ হলে এর দৃষ্টান্ত এই যে, প্রয়োজনের মুহূর্তে বাগানটি আগুনে ভস্ম হয়ে গেল। তো ভস্মিভূত বাগান থেকে যেমন ফল পাওয়া যায় না, তেমনি এই দান-সদকারও ছওয়াব পাওয়া যাবে না।

আল্লাহ তাআলা এভাবেই আয়াতসমূহ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে থাকেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে ও বুঝতে পার।

اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ۝

করে রেখে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত[১]।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ۝

২৬৮. শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং মন্দকর্মের আদেশ করে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে তাঁর মার্জনা ও অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আর আল্লাহ খুবই প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ[২]।

يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ۝

২৬৯. তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন। এবং যাকে প্রজ্ঞা দান করা হল তাকে বিপুল কল্যাণ দান করা হল। আর উপদেশ তারাই গ্রহণ করে যারা বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন[৩]।

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নিকট দান কবুল হওয়ার জন্য এও শর্ত যে, ধনসম্পদ হালাল উপায়ে অর্জিত হতে হবে, হারাম বা অসদুপায়ে অর্জিত ধন ও সন্দেহযুক্ত সম্পদ হতে পারবে না। আর উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি আল্লাহ তাআলার পথে খরচ করবে। নিকৃষ্ট জিনিস, যা তোমাদের দেওয়া হলে তা গ্রহণ করবে শুধু চক্ষুলজ্জার কারণেই, খুশীমনে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবে না– এমন জিনিস দান করা উচিত নয়।

আর জেনে রাখ, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী— তিনি তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। এবং গুণগ্রাহী– উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর জিনিস আন্তরিক ইচ্ছা ও মহব্বতের সঙ্গে দান করলে তিনি তা পছন্দ করেন।

২. যখন কারো মনে আশঙ্কা জাগে যে, দান করলে গরীব হয়ে যাব, এবং আল্লাহ তাআলার ওয়াদা থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানের ওয়াদার প্রতি মন ধাবিত হয় এবং ওর উপর আস্থা জন্মে— তখন তার বুঝতে হবে যে, এ ধারণা নিশ্চিতরূপে শয়তানের পক্ষ থেকে এসেছে। এ কথা বলবে না যে, শয়তানের চেহারাও তো আমরা কখনো দেখিনি, ওর আবার আদেশ কী?

পক্ষান্তরে যদি এ খেয়াল হয় যে, দান-খয়রাতের ওসীলায় গোনাহ মাফ হবে এবং ধনে উন্নতি ও বরকত হবে, তখন বুঝবে যে, এ ধারণা আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে এসেছে, এবং আল্লাহর শোকর করবে। আর আল্লাহর ভাণ্ডার অফুরন্ত এবং তিনি সকলের ভিতর-বাহির, নিয়ত ও আমল ভাল করে জানেন।

৩. অর্থাৎ যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাআলা দীনের বিষয়ে জ্ঞান ও দান-খয়রাত করার সুবুদ্ধি দান করেন– অর্থাৎ কী নিয়তে, কেমন মাল থেকে এবং কীভাবে অভাবীকে দান করতে হবে। আর যাকে দীনের জ্ঞান দান করা হল, তার অনেক বড় নে'য়ামত ও দৌলত নসীব হল।

২৭০. তোমরা যে কোন দান কর অথবা কোন মানত মান, নিশ্চয় আল্লাহ তা সবই জানেন। আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই[১]।

وَمَآ اَنۡفَقۡتُمۡ مِّنۡ نَّفَقَةٍ اَوۡ نَذَرۡتُمۡ مِّنۡ نَّذۡرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ ۝

২৭১. তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কত ভাল! আর যদি তা গোপন কর ও গরীবদের নিকট পৌঁছে দাও, তবে তাও তোমাদের জন্য উত্তম। আর (এর বিনিময়ে) তিনি তোমাদের থেকে তোমাদের গোনাহসমূহ দূর করবেন। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত[২]।

اِنۡ تُبۡدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۚ وَاِنۡ تُخۡفُوۡهَا وَتُؤۡتُوۡهَا الۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنۡكُمۡ مِّنۡ سَيِّاٰتِكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ ۝

২৭২. ওদের সৎপথে আনা আপনার দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদেরই জন্য। আর একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তোমাদের ব্যয় করা উচিত। আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে, তা (অর্থাৎ তার

لَيۡسَ عَلَيۡكَ هُدٰٮهُمۡ وَلٰـكِنَّ اللّٰهَ يَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ فَلِاَنۡفُسِكُمۡ ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡنَ اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ يُّوَفَّ

---

১. অর্থাৎ যা কিছু দান করা হয়, কম বা বেশি, ভাল নিয়তে বা মন্দ নিয়তে, গোপনে বা প্রকাশ্যে; অথবা যে কোন রকম মানত মানা হয়– নিঃসন্দেহে তার সব কিছুরই পরিপূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ তাআলার রয়েছে। আর যারা দান ও মানতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার হুকুমের খেলাফ করে থাকে, তাদের কোন সাহায্যকারী নেই– আল্লাহ তাআলা চাইলে তাদের শাস্তি প্রদান করবেন।

মানতের কিছু হুকুম

মানত মানলে তা আদায় করা ওয়াজিব, আদায় না করলে গোনাহগার হবে। আর আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা জায়েয নয়। তবে যদি বলে, আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে অমুক ব্যক্তিকে দেব অথবা বলে, এই মানতের ছওয়াব অমুকের হোক, তবে কোন দোষ নেই।

২. লোক দেখানোর নিয়ত না হলে মানুষের সামনেও দান করা উত্তম। তাতে অন্যের মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আর গোপনে দান করাও ভাল, যাতে গ্রহীতা লজ্জা না পায়। মোটকথা, প্রকাশ করা ও গোপন করা উভয়ই উত্তম, তবে ক্ষেত্র ও কল্যাণ বিবেচনা জরুরী।

اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

ছওয়াব) তোমাদের পুরাপুরি দেওয়া হবে এবং তোমাদের হক নষ্ট করা হবে না[১]।

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

২৭৩. (দান-খয়রাত) সেই গরীবদের জন্য, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে আছে যে, তারা যমীনে চলাফেরা করতে পারে না। অনবগত লোকেরা সওয়াল না করার কারণে তাদের ধনী মনে করে। তাদের চেহারা-লক্ষণ দেখে তুমি তাদের চিনতে পারবে। তারা নাছোড় হয়ে লোকদের কাছে সওয়াল করে না[২]। আর যা কিছু সম্পদ তোমরা ব্যয় কর[৩], সে সম্বন্ধে অবশ্যই আল্লাহ সম্যক অবহিত।

---

১. বিশেষ মঙ্গল চিন্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের ছাড়া অন্যদের দান-খয়রাত করতে সাহাবীদের বারণ করেছিলেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, বর্ণনা ১০৪৯৯) এতে মঙ্গল এই ছিল যে, আর্থিক লাভের জন্য হলেও সত্যধর্মের প্রতি অমুসলিমরা আকৃষ্ট হবে। তখন এই আয়াত নাযিল হল এবং এতে সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হল যে, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে যাকেই দান করবে, প্রতিদান অবশ্যই তোমরা পাবে। তবে শর্ত এই যে, দানকার্য অবশ্যই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হতে হবে, অন্য উদ্দেশ্যে নয়।

২. অর্থাৎ যারা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ও তাঁর দীনের কাজে আবদ্ধ থাকার কারণে চলাফেরা ও কামাই-রোজগার থেকে বিরত রয়েছেন এবং কারো কাছে স্বীয় প্রয়োজন ব্যক্ত করেন না, এমন লোকদের দান করার ছওয়াব অনেক বেশি। যেমন ছিলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ। (তাঁদের মধ্যে) 'আহলে সুফফা' ঘরবাড়ী ছেড়ে হযরতের সুহবত অবলম্বন করে পবিত্র খেদমতে পড়ে থাকতেন। এলমে দীন শেখা ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করাই তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল।

তদ্রূপ, এখনো যারা পবিত্র কুরআনের কাজে অথবা এলমে দীনের কাজে মশগুল থাকবে, তাদের সাহায্য করা সমাজের লোকদের পবিত্র দায়িত্ব।

আর চেহারা-লক্ষণ দ্বারা তাদের চেনার অর্থ হচ্ছে তাদের চেহারা ফ্যাকাসে ও শরীর ক্ষীণ এবং তাদের আকৃতিতে মেহনত ও কষ্ট-ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট।

৩. যে কোন ক্ষেত্রে, বিশেষত সেসব লোকদের জন্য যাদের কথা মাত্রই উল্লেখ করা হল।

[রুকূ - ৩৮]

২৭৪. যারা নিজেদের ধনসম্পদ (আল্লাহর পথে) রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে আপন রবের কাছে তাদের প্রতিদান। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না[১]।

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

২৭৫. যারা সুদ খায়, তারা (কিয়ামতের দিন) সেভাবেই দাঁড়াবে, যেভাবে দাঁড়ায় ওই ব্যক্তি যাকে (দুষ্ট) জিন বিকারগ্রস্ততার দ্বারা উদ্ভ্রান্ত করে দিয়েছে। (ওদের) এই দুর্দশা এ কারণে হবে যে, ওরা বলেছে, 'ব্যবসাও তো সুদেরই মত।' অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম[২]। অতএব যার নিকট তার রবের

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن

---

১. এ পর্যন্ত দান-খয়রাতের বয়ান এবং তার ফযীলত ও শর্তাবলির উল্লেখ ছিল। দান-খয়রাতের ফলে এক দিকে লেনদেনে আসানী ও সুবিধাদানের অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং অভদ্রতা ও নির্দয়তার কদর্যতা হৃদয়ঙ্গম হয়, অপর দিকে পরস্পরের লেনদেন ও আমলাদির মধ্যে যেসব গোনাহ হয়ে থাকে দান-খয়রাতের দ্বারা তার কাফফারা হয়ে যায়। তদুপরি দানকার্য দ্বারা মানুষের মধ্যে নৈতিকতা, বদান্যতা, হিতাকাঙ্ক্ষা ও পরোপকার ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলির বৃদ্ধি ঘটে। এসব কারণে পূর্ববর্তী কতিপয় আয়াতের মধ্যে দানের আলোচনা হয়েছে।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

এর পর সামনে দানের সম্পূর্ণ বিপরীত সুদ সম্পর্কে আলোচনা হবে। দানকার্যে ছিল মানবতা ও পরোপকার, পক্ষান্তরে সুদগ্রহণে রয়েছে নিছক অমানুষিকতা, অনিষ্টসাধন ও জুলুম। তাই দানের ফযীলতের পরই সুদের কদর্যতা ও নিষিদ্ধতার বয়ান খুবই সংগত। বলা বাহুল্য, দানের মধ্যে যে পরিমাণ কল্যাণ নিহিত রয়েছে, সুদের মধ্যে সেই পরিমাণ অকল্যাণ থাকাই অবশ্যম্ভাবী।

২. অর্থাৎ সুদখোরেরা কিয়ামতের দিন কবর থেকে উঠবে সেসব লোকের মত, যারা ভূতে ধরা বিকারগ্রস্ত। আর ওদের এই দুর্দশা এজন্য হবে যে, ওরা হালাল ও হারাম উভয়কে সমপর্যায়ের সাব্যস্ত করেছিল। আর ব্যবসা ও সুদ উভয়ের মধ্যে মুনাফা উদ্দেশ্য হওয়ায়

رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۗ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۝

পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে (সুদ থেকে) বিরত হয়ে গিয়েছে, তো অতীতে যা নেওয়া হয়েছে তা তারই। এবং তার (পরকালীন) ব্যাপার আল্লাহর কাছে ন্যস্ত। আর যারা পুনরায় (তা) করবে, তারা জাহান্নামী, তারা তাতে চিরকাল থাকবে[১]।

ওরা উভয়কে বৈধ বলত। অথচ উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে, ব্যবসাকে আল্লাহ তাআলা বৈধ করেছেন, পক্ষান্তরে সুদকে অবৈধ করেছেন।

ব্যবসা ও সুদের পার্থক্য

বেচাকেনার মধ্যে যে লাভ হয়, তা পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে হয়। যেমন কেউ এক টাকা মূল্যের কাপড় দুই টাকা মূল্যে বিক্রি করল। পক্ষান্তরে সুদ হচ্ছে তা, যার মধ্যে বিনিময় ছাড়া লাভ হয়– যেমন, এক টাকার পরিবর্তে দু'টাকা গ্রহণ করা।

প্রথম অবস্থায় যেহেতু কাপড় ও টাকা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জিনিস এবং প্রথমটির উপকার ও উদ্দেশ্য দ্বিতীয়টি থেকে ভিন্ন, সেই কারণে এ দুটোর মধ্যে সত্যিকার তুলনা ও সমতা সম্ভব নয়। বেচাকেনার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে তুলনা করার উপায় স্ব স্ব আগ্রহ ও চাহিদা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আর প্রত্যেকটির প্রয়োজন ও চাহিদা নিতান্ত ভিন্ন ভিন্ন। কারো কাছে একটি টাকার প্রয়োজন এত প্রকট হয় যে, দশ টাকা মূল্যের কাপড়ের তেমন হয় না। পক্ষান্তরে কারো কাছে এক টাকা মূল্যের একটি কাপড়ই এত প্রয়োজনীয় হতে পারে যে, দশ টাকার প্রতিও তেমন আগ্রহ ও প্রয়োজন হয় না। সুতরাং একটি কাপড় এক টাকা দিয়ে কেউ কিনলে তাতে সুদ তথা বিনিময়হীন লাভ নেই। আর সেই কাপড়ই কেউ এক হাজার টাকায় ক্রয় করলেও সুদ হতে পারে না। কারণ, টাকা ও কাপড়ের মধ্যে আসলে কোন তুলনা ও সমতা হতেই পারে না। এর জন্য কোন মানদণ্ড থাকলে তা স্ব স্ব প্রয়োজন ও চাহিদা বৈ আর কিছু নয়। আর মানুষের পরস্পরের চাহিদার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। অতএব এ ক্ষেত্রে সুদের প্রশ্ন নেই। পক্ষান্তরে কেউ এক টাকার বিনিময়ে দু'টাকা গ্রহণ করল, তাহলে যেহেতু টাকা ও টাকার মধ্যে সমতা আছে, ফলে এক টাকা এক টাকার বিনিময়ে হবে এবং দ্বিতীয় টাকাটি বিনিময়শূন্য হয়ে সুদে (পরিগণিত) হবে এবং শরী'য়তানুসারে এ কারবার হারাম হবে।

১. অর্থাৎ সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে তোমরা সুদ গ্রহণ করে থাকলে দুনিয়াতে তা মালিক অর্থাৎ সুদদাতাকে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে না। আর আখেরাতে আল্লাহ তাআলার এখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা হলে স্বীয় রহমতে তাকে মাফ করে দেবেন। কিন্তু নিষিদ্ধ হওয়ার পরও কেউ বিরত না হয়ে বরাবর সুদ নিতে থাকলে সে দোযখী এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমের সম্মুখে স্বীয় যুক্তি-জ্ঞান পেশ করার ফলে তার শাস্তি তা-ই হবে যা বর্ণিত হল।

২৭৬. আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন[১]। আর আল্লাহ কোন চরম অকৃতজ্ঞ পাপীকে পছন্দ করেন না[২]।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ۝

২৭৭. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং নামায কায়েম করেছে ও যাকাত দিয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে আপন রবের কাছে তাদের প্রতিদান। আর তাদের ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না[৩]।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۝

২৭৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং যা কিছু সুদ (কারও কাছে) বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও[৪]।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰۤوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۝

২৭৯. যদি না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা জেনে নাও। আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের জন্য থাকবে তোমাদের মূলধন– তোমরা কারো উপর জুলুম করবে না এবং

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ

---

১. আল্লাহ তাআলা সুদের ধন নিশ্চিহ্ন করেন অর্থাৎ এতে বরকত হয় না, বরং মূলধনও নষ্ট হয়ে যায়। যেমন, হাদীছে আছে : সুদের মাল যতই বর্ধিত হোক, তার পরিণতি দারিদ্র্য। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৩৭৫৪; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ২২৬২) আর দানের দ্বারা মাল বর্ধিত হয়, অর্থাৎ মালে প্রাচুর্য আসে এবং আল্লাহ বরকত দান করেন এবং এর ছওয়াব বৃদ্ধি করা হয়– যেমন বহু হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. সুদগ্রহণকারী ধনবান হয়েও গরীবকে সুদহীন ঋণ পর্যন্ত দিল না, অথচ তার উচিত ছিল, দান হিসাবে গরীবকে দেওয়া। সুতরাং এর চেয়ে বেশি আল্লাহর নাশোকরী (অকৃতজ্ঞতা) আর কী হতে পারে? (এ জন্যই তাকে كفار তথা চরম অকৃতজ্ঞ বলা হচ্ছে।)

৩. এই আয়াতে সুদগ্রহণকারীর মোকাবেলায় ঈমানদারদের গুণাবলি ও তাদের পুরস্কার উল্লেখ করা হল, যা সুদখোরদের চরিত্র ও সুদের অশুভ পরিণামের বিপরীত। এতে সুদখোরের প্রতি ধমক ও ঘৃণা প্রকাশ পেল।

৪. অর্থাৎ সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে যা নিয়েছ তা তো নিয়েছই। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার পর দেনাদারের উপর যে সুদ এসেছে, তা কিছুতেই চাইবে না।

وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

তোমাদেরও উপর জুলুম করা হবে না[১]।

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ؕ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨٠﴾

২৮০. আর যদি (দেনাদার) অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া উচিত। আর মাফ করে দেওয়া তোমাদের জন্য বেশি উত্তম, যদি তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকে[২]।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٨١﴾

২৮১. এবং সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। তারপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে যা কিছু সে কামাই করেছিল, তা(-র বদলা) পুরাপুরি দেওয়া হবে এবং তাদের উপর জুলুম করা হবে না[৩]।

[রুকূ - ৩৯]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ

২৮২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন পরস্পরের মাঝে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের লেনদেন কর, তা লিখে রাখ। আর তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ইনসাফের সাথে লিখে দেয় এবং লেখক যেন লিখে দিতে অস্বীকার না করে, যেমন আল্লাহ তাকে শিখিয়েছেন। অতএব সে যেন লিখে দেয়। আর যার উপর ঋণ, সে লেখাবে এবং সে যেন তার রব

---

১. অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞার পূর্বে যে সুদ তোমরা নিয়েছ, তা হিসাব করে যদি তোমাদের মূলধন থেকে কেটে রাখে তবে তোমাদের উপর জুলুম হবে। আর নিষেধাজ্ঞার পর তোমরা সুদ চাইলে তোমাদের পক্ষ থেকে জুলুম হবে। (এ উভয় জুলুম নিষিদ্ধ)

২. অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা আসার কারণে সুদের লেনদেন বন্ধ হয়ে হয়ে গিয়েছে বলে অভাবগ্রস্ত দেনাদারকে তাগাদা দিতে থাকা মোটেই উচিত নয়। বরং অভাবীকে অবকাশ দাও, আর সামর্থ্য থাকলে মাফ করে দাও।

৩. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সকল আমলের পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়া হবে। সুতরাং সময় থাকতে প্রত্যেকেই নিজের ফিকির করে নিক যে, সে ভাল কাজ করবে না মন্দ করবে এবং সুদ খাবে না দান-খয়রাত করবে।

الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا

আল্লাহকে ভয় করে এবং তা থেকে যেন কিছুমাত্র না কমায়[১]। আর যার উপর ঋণ, সে যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখাতে না পারে, তবে তার কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তি ইনসাফের সাথে লেখাবে[২]। আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনকে সাক্ষী রাখ। তবে যদি দু'জন পুরুষ না থাকে, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী (সাক্ষী হবে)— এমন সাক্ষীদের মধ্য থেকে, যাদের তোমরা পছন্দ কর— যাতে দু'জন নারীর মধ্যে একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে[৩]। আর সাক্ষীরা যেন (সাক্ষ্য দিতে) অস্বীকার না করে যখন তাদের ডাকা হয়। আর

---

১. ইতিপূর্বে দান-খয়রাতের ফযীলত ও তার আহকাম বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর সুদ, এর অবৈধতা ও খারাবীর উল্লেখ হয়েছে। বর্তমান আয়াতে ভবিষ্যতের মেয়াদে ধারে কায়-কারবার করার উল্লেখ হচ্ছে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, এরূপ কারবার জায়েয। তবে যেহেতু ভবিষ্যতের ব্যাপার বলে ভুল-ভ্রান্তি ও ঝগড়া-বিবাদের আশঙ্কা থাকে, তাই তা সুনির্দিষ্টভাবে ও সাবধানতার সাথে করা চাই, যাতে ভবিষ্যতে কোন বিবাদ ও ভুল না হতে পারে।

এর একমাত্র উপায় এই যে, একটি কাগজে লিখতে হবে, যাতে মেয়াদ নির্ধারিত থাকবে এবং উভয় পক্ষের নাম ও কারবারের বিশদ বিবরণ পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে। লেখকের উচিত, লিখতে অস্বীকার না করা এবং শরী'য়তের হুকুমানুসারে ইনসাফের মধ্যে ত্রুটি না করা। উত্তম হল, ঋণী ব্যক্তি স্বহস্তে লিখে দেবে, অথবা লেখককে নিজের মুখে বলে দেবে এবং অন্যের হক বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে লক্ষ রাখবে।

২. অর্থাৎ যদি দেনাদার বা ঋণী ব্যক্তি নির্বোধ, আত্মভোলা বা শক্তিহীন দুর্বল হয়, যেমন শিশু বা এত বৃদ্ধ যে, কারবার বোঝার বুদ্ধি নেই, অথবা বিষয়টা লেখককে বলে দিতে অসমর্থ, এসব অবস্থায় দেনাদারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং ওয়ারিস ও কার্যসম্পাদনকারীর উচিত বিন্দুমাত্র বেশকম না করে ইনসাফের সাথে বিষয়টি লিখিয়ে দেওয়া।

৩. তোমাদের উচিত, এ ব্যাপারে কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী রাখা– পুরুষদের মধ্য থেকে। অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারীকে সাক্ষী বানাবে। আর সাক্ষী তোমাদের পছন্দসই অর্থাৎ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হতে হবে।

اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۭ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۭ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۠ وَلَا يُضَاۗرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ڛ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

তোমরা তা (অর্থাৎ ঋণের লেনদেন) তার মেয়াদ পর্যন্ত লিখতে বিরক্তি বোধ করো না, তা ছোট হোক বা বড়। এ আল্লাহর নিকট অধিক ইনসাফপূর্ণ, সাক্ষ্যের সমধিক সংরক্ষণকারী এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার নিকটতম পন্থা[১]। তবে হাঁ, যদি নগদ কারবার হয় যা তোমরা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান কর, তবে তা না লেখায় তোমাদের কোন গোনাহ নেই। আর তোমরা সাক্ষী রাখ যখন বেচা-কেনা কর। আর লেখক ও সাক্ষী যেন ক্ষতি না করে[২]। তোমরা যদি এরূপ কর, তবে তা তো তোমাদের জন্য পাপ। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দান করেন এবং আল্লাহ সকল বিষয় সম্বন্ধে সম্যক অবগত।

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰي سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِھٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۭ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۭ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ

২৮৩. যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তবে (কোনো জিনিস) বন্ধক রাখবে, যা হস্তান্তর করা হবে। আর যদি তোমাদের একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে সে যেন তার আমানত পুরাপুরি আদায় করে এবং স্বীয় রব আল্লাহকে ভয় করতে থাকে।

১. অর্থাৎ সাক্ষীকে যখন সাক্ষী হতে বা সাক্ষ্য দিতে ডাকা হবে, তখন তা এড়ানো বা অস্বীকার করা যাবে না। আর কারবার ছোট হোক বা বড়, তা লিখতে-লেখাতে অলসতা বা ত্রুটি করো না। কারণ, এতে (লিখে রাখার মধ্যে) পরিপূর্ণ ইনসাফ রয়েছে। আর সাক্ষ্যের বিষয়েও পূর্ণ আস্থা লিখে রাখার দ্বারাই হবে এবং এতে ভুল-ভ্রান্তি ও কারো হক নষ্ট হওয়া থেকেও নিরাপদ থাকা যাবে।

২. অর্থাৎ যদি কারবারের বিষয়টা হাতেহাতে হয়, দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য বা টাকা-পয়সা জাতীয় কোন কারবার হয় কিন্তু ধারে না হয়, তবে তা না লিখলেও গোনাহ হবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সাক্ষী রাখা চাই, যাতে এ বিষয়ে ভবিষ্যতে কোন বিবাদ দেখা দিলে তা কাজে আসে। আর লেখক ও সাক্ষী কোন ক্ষতি করবে না, অর্থাৎ তারা যেন উভয় পক্ষের কারো কোন ক্ষতি না করে বরং যা করা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, শুধু তাই যেন সম্পাদন করে।

وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۳﴾

তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে ব্যক্তি তা গোপন করে, নিশ্চয় তার অন্তর পাপী। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত[১]।

[রুকূ - ৪০]

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۸۴﴾

২৮৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা আল্লাহরই। আর তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর বা তা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে তার হিসাব গ্রহণ করবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে শক্তিমান[২]।

---

১. অর্থাৎ যদি সফরে ঋণ ও ধারের কারবার কর এবং দলীল লেখক কাউকে না পাও, তবে দেনাদারের কর্তব্য, দেনার পরিবর্তে কোন জিনিস পাওনাদারের নিকট বন্ধকরূপে রাখা।

বি. দ্র. বাড়ীর তুলনায় সফরে বন্ধকের আবশ্যকতা বেশি হবে। কারণ, বাড়ীতে লেখা ও সাক্ষ্যের দ্বারাও অনায়াসে পাওনাদার ব্যক্তি নিরাপদ বোধ করতে পারে। সেজন্য সফরে বন্ধকের হুকুম দেওয়া হয়েছে। নতুবা বাসস্থানে এবং লেখকের বর্তমানেও বন্ধক রাখা জায়েয, যেমন হাদীছে রয়েছে।

আর যদি দেনাদার ব্যক্তির উপর পাওনাদারের আস্থা ও বিশ্বাস থাকার কারণে বন্ধকের দাবি না করে তবে দেনাদারের কর্তব্য, পাওনাদারের সম্পূর্ণ হক পুরাপুরি পরিশোধ করে দেওয়া এবং আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে থাকা এবং পাওনাদারের হকের ব্যাপারে আমানতদারী রক্ষা করা।

২. এই সূরাতে দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত-বন্দেগী ও মুআমালাত অর্থাৎ লেন-দেন, বিয়ে-শাদি ইত্যাদি সম্পর্কে বহু হুকুম-আহকাম উল্লেখিত হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই এই সূরা 'সানামুল কুরআন' (বা কুরআনের সেরা সূরা) বলে আখ্যায়িত হয়েছে। সে জন্য এস্থলে বান্দাদেরকে সব রকমে সতর্ক ও সাবধান করে দেওয়া খুবই সংগত, যাতে তারা সেসব হুকুম-আহকাম পালনে ত্রুটি ও অলসতা না করে। এ উদ্দেশ্যেই সূরার শেষাংশে সতর্কতা ও সাবধানতাস্বরূপ এই আয়াতটি ইরশাদ করে সকলকে উপরোক্ত আহকাম পালনে বাধ্য করে দেওয়া হল। অধিকন্তু যারা বিবাহ ও তালাক, কেসাস ও যাকাত, কারবার ও সুদ ইত্যাদি বিষয়ে প্রায়ই হিলা ও মনগড়া কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে, না-জায়েয বিষয়কে জায়েয বানাতে চায়, নিজ মতামত ও জোর খাটায়– বর্তমান আয়াতে তাদের প্রতিও চরম সতর্কতা ও হুঁশিয়ারী রয়েছে।

ءَامَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾

২৮৫. রাসূল তাঁর উপর তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছেন, এবং মুমিনরাও। (তাদের) সকলেই ঈমান এনেছে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূলদের প্রতি। (তাঁরা বলে), 'আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্য থেকে কারো ক্ষেত্রেই পার্থক্য করি না' এবং তাঁরা বলে উঠল– 'আমরা শুনেছি ও মেনেছি। হে আমাদের রব! (আমরা) আপনার ক্ষমা (চাই), আর আপনারই কাছে (আমাদের) ফিরে যেতে হবে[১]।'

লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, আমাদের ইবাদতের উপযুক্ত যিনি হবেন, তাঁকে অবশ্যই আমাদের মালিক হতে হবে। যিনি আমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল বিষয়ের হিসাব-নিকাশ নেবেন, তাঁর সর্ববিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে এবং যিনি আমাদের সকল বিষয়ের হিসাব নিয়ে পুরস্কার ও শাস্তি বিধান করবেন, তাঁর অবশ্যই সর্ববিষয়ের ক্ষমতা থাকতে হবে। সুতরাং এই তিনটি গুণ অর্থাৎ মালিকানা, জ্ঞান ও ক্ষমতার কথাই এস্থলে বর্ণিত হয়েছে। ইতিপূর্বে আয়াতুল কুরসীতেও উক্ত গুণাবলিরই বর্ণনা হয়েছে। সার কথা, আল্লাহ পাকের সত্তা সকল কিছুর খালেক-মালেক, তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী এবং তাঁর ক্ষমতা সর্বোপরি! অতএব, কোন প্রকাশ্য বা গোপনীয় বিষয়ে তাঁর অবাধ্যতা করে বান্দা কেমন করে নাজাত পেতে পারে?

১. **অবতরণের প্রেক্ষাপট :** পূর্ববর্তী আয়াতে যখন জানা গেল যে, অন্তরে যা আছে তারও হিসাব দিতে হবে এবং তার জন্যও পাকড়াও হবে, তখন সাহাবীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হলেন এবং তাদের এত কষ্ট হল, যা আর কোন আয়াতের কারণে হয়নি। তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এ ব্যাপারে আরয করলে তিনি ইরশাদ করলেন : وَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا অর্থাৎ কঠিন বা কষ্টকর যাই মনে হোক, আল্লাহ তাআলার বিধানকে শিরোধার্য করে নিতে এতটুকু দেরি করো না এবং অন্তর খুলে سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا নিবেদন কর। হযরতের ইরশাদ পালন করতে গিয়ে তাদের মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই শব্দগুলি উচ্চারিত হতে লাগল। অর্থ এই যে, আমরা ঈমান আনলাম এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম মান্য করলাম, অর্থাৎ নিজেদের কষ্ট ও দ্বিধা সবকিছু ছেড়ে আদেশ পালনে সন্তুষ্টি ও প্রস্তুতি প্রকাশ করলেন। আল্লাহ তাআলার নিকট এ খুবই পছন্দ হল এবং এই আয়াত দুটি অবতীর্ণ হল— (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১২৫)

প্রথমটি হল اٰمَنَ الرَّسُوْلُ الخ এতে আল্লাহ তাআলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরে সাহাবীদের, যাঁদের নিকট উক্ত বিষয়টি খুবই কঠিন লেগেছিল,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعْفُ عَنَّا ٝ وَ اغْفِرْ لَنَا ٝ وَ ارْحَمْنَا ٝ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

২৮৬. আল্লাহ কাউকেই তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব দেন না। সে যা কামাই করেছে তা তারই জন্য এবং যা (অসৎ কর্ম) করেছে তা তারই উপর বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমাদের পাকড়াও করবেন না যদি আমরা ভুলে যাই বা ত্রুটি করি। হে আমাদের রব! আর আমাদের উপর ভারী বোঝা চাপাবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর চাপিয়েছিলেন। হে আমাদের রব! এবং আমাদের প্রতি এমন দায়িত্বভার অর্পন করবেন না, যা বহনের শক্তি আমাদের নেই। আর আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের মার্জনা করুন ও আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের রব, অতএব কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন[১]।

তাঁদের ঈমানের বিশদভাবে প্রশংসা করলেন, যাতে তাঁদের অন্তরে এতমীনান বৃদ্ধি পায় এবং পূর্বের দ্বিধা দূর হয়ে যায়।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াত لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا الخ -এ বলে দিলেন যে, সাধ্যের বাইরে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয় না। সুতরাং, যদি কেউ অন্তরে গোনাহর খেয়াল ও কুধারণা অনুভব করে, কিন্তু তদনুসারে আমল না করে, তবে কোন গোনাহ হবে না। তদ্রূপ বিস্মৃতিজনিত কাজ মাফ। মোদ্দা কথা, যেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা শক্তি-বহির্ভূত, যেমন মন্দ কাজের খেয়াল ও কুধারণা এসে যাওয়া এবং ভুলে যাওয়া, এসবের জন্য ধরপাকড় হবে না। হাঁ, যেসব বিষয় বান্দার ইচ্ছা ও আয়ত্তের ভিতরে রয়েছে তার জন্য ধর-পাকড় হবে। অতএব, পূর্ববর্তী আয়াত (নং ২৮৪) শ্রবণে যে ভয়- ভীতি হয়েছিল, তার অর্থও এই নীতি অনুসারে গ্রহণ করা চাই। বস্তুত হলও তাই এবং উল্লিখিত পেরেশানীও সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়ে গেল।

বি. দ্র. 'আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।' অর্থাৎ ইহুদী ও নাসারাদের মত নয় যে, কোন পয়গম্বরকে মানল আর কোন পয়গম্বরকে মানল না।

১. পূর্বের (২৮৪) আয়াত দ্বারা সাহাবীদের রা. ভীষণ পেরেশানী হয়েছিল, তাঁদের সান্ত্বনার জন্য اٰمَنَ الرَّسُوْلُ الخ এবং لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا الخ আয়াতদ্বয় (২৮৫-২৮৬) নাযিল হল। অতঃপর رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করে আমরা মুসলমানদের এমনই আশ্বস্ত করা হল যে, কোন কষ্ট, কাঠিন্যর আশঙ্কাও থাকল না। কেননা, আমাদের যে দো'য়াগুলি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার মর্মার্থ এই যে, নিঃসন্দেহে আমাদের উপর যে কোন

রকম শাসনের ও ইবাদতের অধিকার আপনার রয়েছে ইয়া আল্লাহ। 'কিন্তু হে আমাদের রব! তোমার কৃপা ও দয়াগুণে আমাদের জন্য এমন হুকুম-আহকাম পাঠানো হোক, যা পালন করা আমাদের জন্য কঠিন ও কষ্টকর না হয়, আর ভুল-ভ্রান্তির কারণে আমরা যেন ধৃত না হই এবং আমাদের সামর্থ্যের বাইরে যেন কোন হুকুম আমাদের উপর আরোপ করা না হয়। এ রকম সহজ ব্যবস্থাদির পরও আমাদের দ্বারা যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যাবে, তা ক্ষমা ও মার্জনা কর এবং আমাদের উপর দয়া কর।' হাদীসে আছে, এ সব দো'য়া (আল্লাহ তাআলার দরবারে) কবুল হয়েছে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১২৫)

আর সাহাবীগণ যে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন, যখন তা থেকে আমরা নিরাপদ হলাম, অতএব আমাদের আরো দো'য়া এই যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় দান করুন। নতুবা কঠিন অবস্থা থেকে আল্লাহর ফযলে আমাদের জানটা যে রক্ষা পেয়েছিল এবং প্রশান্তি লাভ করেছিল, এটা আর অবশিষ্ট থাকবে না। কারণ, কাফেরদের প্রাবল্য ও তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দীনী ও দুনিয়াবী মুসিবত আসার কারণে আবার আমরা পেরেশানীর মধ্যে পড়ে যাব। অতএব ওদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় দান করুন।

সূরা আলে-ইমরান

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ৩ । ২০০ আয়াত । ২০ রুকূ । মাদানী

آياتها ٢٠٠ ـ ركوعاتها ٢٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

الٓمّٓ ①

১. আলিফ-লাম-মীম।

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ②

২. আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, (তিনি) চিরঞ্জীব, (সকল কিছুর) নিয়ন্ত্রক[১]।

---

১. **শানে নুযূল**

নাজরানবাসী ষাটজন খ্রিস্টানের এক সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাশালী প্রতিনিধি দল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসেছিল। ওদের মধ্যে 'আবদুল মাসীহ আকেব' সর্দার ও নেতা হিসাবে, 'আইহামুস সাইয়েদ' বিচক্ষণ ও কুশলী হিসাবে এবং 'আবু হারেছা বিন আলকামা' শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় আলেম ও প্রধান পাদ্রি হিসাবে বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ ছিল। এই শেষোক্ত ব্যক্তিটি আসলে আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র বনি-বকর বিন ওয়ায়েলের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, পরে সে মক্কায় খ্রিস্টান হয়ে যায়। রোমান শাসকগণ তার ধর্মনিষ্ঠা দেখে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানায়। প্রচুর আর্থিক সাহায্য ছাড়াও তার জন্য গির্জা নির্মাণ করে দেয় এবং ধর্মীয় বিষয়ে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে।

এই প্রতিনিধি দল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অতি শানশৌকতের সাথে হাযির হয় এবং যেসব সত্য বিষয়ে তারা বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল, সেসব নিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আলোচনা করে। সূরা আলে-ইমরানের প্রাথমিক প্রায় আশি নব্বইটি আয়াত এই ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। (তাফসীরে তবারী ৫/১৭১-১৭৪)

খ্রিস্টানদের প্রধান ও মৌলিক আকীদা এই যে, হযরত ঈসা আ. প্রকৃতই খোদা অথবা খোদার পুত্র অথবা তিন খোদার এক খোদা।

আয়াতের মর্ম

এ সূরার প্রথম আয়াত নিরেট তাওহীদের ঘোষণা করে আল্লাহ তাআলার বিশেষ সিফাত حَيّ ও قَيُّوم বয়ানপূর্বক খ্রিস্টানদের উক্ত দাবির অসারতা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করছে। এজন্যই বিতর্কের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কি জান, আল্লাহ তাআলা حَيّ (চিরজীবী), যাঁর মৃত্যু আসতে পারে না, এবং তিনিই সমগ্র সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং অস্তিত্ব রক্ষার উপকরণাদি পয়দা করে স্বীয় অপার কুদরতে তাদের ধারণ করে আছেন? পক্ষান্তরে ঈসা আ. অবশ্যই মৃত্যুর স্বীকার হবেন। বলা বাহুল্য, যিনি স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় অপারগ, তিনি অপরাপর সৃষ্টিকে কীভাবে রক্ষা করবেন?' এ কথা শুনে খ্রিস্টানরা স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, তা একেবারে সত্য।

৩. তিনি আপনার প্রতি সত্য কিতাব নাযিল করেছেন[১], যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থনকারী। এবং অবতীর্ণ করেছেন তাওরাত ও ইনজীল–

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۝

৪. ইতিপূর্বে, মানুষের হেদায়েতের জন্য[২]। এবং তিনি অবতীর্ণ করেছেন মীমাংসা[৩]। যারা

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ

তারা হয়ত একে শ্রেয় জ্ঞান করে থাকবে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো স্বীয় আকীদা عيسى يأتي عليه الفناء ('ঈসার উপর মৃত্যু অবশ্যই আসবে') অনুসারে প্রশ্ন করছেন। এখন উত্তরে 'না' বলা হলে আমাদেরই আকীদা 'ঈসা আ. অনেক দিন পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন' অনুযায়ী তিনি অধিকতর স্পষ্টতার সঙ্গে আমাদের জব্দ করার সুযোগ পাবেন। এ কথা ভেবে তারা শুধু শব্দগত বিতর্কে অবতরণ করাকে শুভ মনে করল না। আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এরা ওই ফেরকাসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যারা ইসলামী বিশ্বাসের মতই ঈসা আ.-এর নিহত ও শূলীবিদ্ধ হওয়াকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে, এবং তিনি স্বশরীরে আকাশে উত্থিত হয়েছেন বলে মানে। যেমন: হাফেজ ইবনে তাইমিয়া (র) স্বীয় রচনা "الجواب الصحيح" গ্রন্থে এবং "الفارق بين المخلوق والخالق" এর লেখক স্পষ্টতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, শাম ও মিসরের খ্রিস্টানরা সধারণত এই আকীদাবলম্বী ছিল। দীর্ঘদিন পর সন্ন্যাসী পৌল শূলে বিদ্ধ হওয়ার আকীদা প্রচার করে দেয়। ফলে এ ধারণা ইউরোপ থেকে মিসর, শাম প্রভৃতি দেশে প্রসার লাভ করে।

যা হোক, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম إن عيسى أتى عليه الفناء এর স্থলে يأتي عليه الفناء বললেন, অর্থাৎ ঈসা আ. এর উপর 'মৃত্যু এসেছে' না বলে 'মৃত্যু আসবে' বললেন। অথচ ঈসা আ. সম্পর্কে 'উলূহিয়্যত' বা আল্লাহ হওয়ার দাবি খণ্ডন করতে প্রথম বাক্যটিই অধিকতর জোরদার ও নিরুত্তরকারী হত। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, বিতর্কের ক্ষেত্রেও ঈসা আ. সম্পর্কে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে 'মৃত্যু' শব্দের ব্যবহার তিনি পছন্দ করেননি।

১. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ, যা সম্পূর্ণ হেকমত অনুসারে একেবারে সঠিক সময়ে সত্য ও ন্যায়কে বুকে ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছে।

২. অর্থাৎ কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থন করে। আর পূর্ববর্তী কিতাব তথা তাওরাত, ইনজীল ইত্যাদি বহু আগে থেকে কুরআন ও তার বাহক সম্পর্কে মানুষদের সঠিক দিকনির্দেশনা দিচ্ছিল এবং নিজ নিজ যুগে উপযোগী আহকাম ও হেদায়েত দান করেছিল।

যেন বলে দেওয়া হল যে, ঈসা আ.-এর 'প্রভুত্ব' বা 'পুত্রত্ব'-এর আকীদা কোন আসমানী কিতাবেই ছিল না। কেননা, দীনের মৌলিক বিষয়াবলির ক্ষেত্রে সকল আসমানী কিতাবে ঐক্য রয়েছে, মুশরিকসুলভ আকীদাসমূহের শিক্ষা কখনই কোন আসমানী কিতাবে দেওয়া হয়নি।

৩. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের উপযোগী এমন বিষয় অবতীর্ণ করেছেন, যা হক ও বাতিল, হালাল ও হারাম এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসাকারী। পবিত্র কুরআন, অন্যান্য আসমানী

আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা[১]।	اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝
৫. নিশ্চয় আল্লাহর নিকট কোনো বস্তু গোপন নয়– না যমীনে, না আসমানে[২]।	إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝
৬. তিনিই সেই সত্তা, যিনি মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি তৈরি করেন। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, (তিনি) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[৩]।	هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

কিতাব ও নবীদের মু'জেযা– সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তদুপরি এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, যেসব বিষয়ে ইহুদী ও নাসারারা মতবিরোধ করে আসছে, সেসব মতভেদের মীমাংসাও কুরআন পাকে রয়েছে।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এমন পাপীদের শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না, আর ওরা তাঁর সর্বশক্তিমান কর্তৃত্ব থেকে ছুটে পালাতেও পারবে না।

এতেও ঈসা আ. এর ঈশ্বরত্ব খণ্ডনের প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, এখানে আল্লাহর জন্য যে একচ্ছত্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা ঈসা আ. এর মধ্যে অবশ্যই নেই। বরং নাসারাদের মতেও হযরত ঈসা আ. কাউকে শাস্তি দেবেন দূরের কথা, তিনি নিজেকেই শত অনুনয়-বিনয় করেও জালেমদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি। এর পরও তিনি কী করে খোদা বা খোদার পুত্র হতে পারেন? পুত্র বলতে পিতার গোত্রীয় বোঝায়, অতএব খোদার পুত্র খোদাই হওয়া উচিত। (অথচ) এক অক্ষম সৃষ্টিকে প্রকৃত সর্বশক্তিমানের পুত্র বলায় পিতা ও পুত্র উভয়কেই ভীষণভাবে কলঙ্কিত করা হয়। আল্লাহর পানাহ!

২. অর্থাৎ তাঁর যেমন পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে সর্বব্যাপী ইলম। বিশ্বজগতের ছোট বড় কোনো জিনিসই এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর থেকে গুপ্ত নয়। সকল পাপী ও তাপী এবং সকল পাপের প্রকৃতি ও পরিমাণ তাঁর ইলমে রয়েছে। পাপী পালিয়ে লুকাতে চাইলে কোথায় তা সম্ভব হবে?

এর দ্বারা সতর্ক করে দেওয়া হল যে, ঈসা মসীহ আ. খোদার পুত্র হতে পারেন না। কেননা, এমন সর্বব্যাপী ইলম তাঁর ছিল না। তিনি জানতেন ততটুকুই, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তাঁকে জানাতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশ্নের জওয়াবে স্বয়ং নাজরানবাসী খ্রিস্টানরাও এ বিষয় স্বীকার করেছিল এবং আজো প্রচলিত বাইবেলসমূহে বিদ্যমান রয়েছে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা স্বীয় ইলম ও হেকমত অনুযায়ী তাঁর অসীম কুদরতে যে রকম ও যেভাবে ইচ্ছা মাতৃগর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন, অর্থাৎ পুরুষ ও মহিলা,

৭. তিনিই সেই সত্তা, যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যার এক অংশ 'মুহকাম' আয়াতসমূহের (অর্থাৎ যেগুলির অর্থ সুস্পষ্ট)। সেগুলিই কিতাবের মূল। আর অন্য আয়াতগুলি 'মুতাশাবিহ' (অর্থাৎ যেগুলির অর্থ বিদিত বা নির্দিষ্ট নয়)। অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা তন্মধ্যে তার পেছনে পড়ে থাকে যা 'মুতাশাবিহ'– গোমরাহী (বিস্তার করা)-র উদ্দেশ্যে এবং তার অর্থ-মর্ম জানার জন্য। অথচ তার অর্থ-মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক তারা বলে, 'আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি, সবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে।' আর উপদেশ তারাই গ্রহণ করে যারা বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন[১]।

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

সুন্দর ও অসুন্দর– যেমনটি পয়দা করার ছিল, করেছেন। একটি পানির ফোঁটাকে কত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের আকার দান করেছেন। যাঁর কুদরত ও সৃষ্টিনৈপুণ্যের অবস্থা এই, তাঁর জ্ঞানের মধ্যে কোন অভাব থাকতে পারে কি? অথবা কোনো মানুষ, যে নিজেও মাতৃগর্ভের অন্ধকারপুঞ্জ থেকে এসেছে এবং সাধারণ শিশুদের মতই পানাহার করে এবং পেশাব-পায়খানা করে, তাকে এই পবিত্র খোদার পুত্র বা পৌত্র বলা যেতে পারে কি? كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ('কী সাংঘাতিক কথা, যা ওদের মুখ থেকে বের হয়! ওরা আর কিছু নয়, কেবল মিথ্যাই বলছে।'–কাহাফ : ৫)

ঈসা (আ.)-কে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করা আল্লাহর অপার কুদরত

খ্রিস্টানদের বিশ্বাস ছিল, যেহেতু বাহ্যিকভাবে মাসীহর কোনো পিতা নেই, সুতরাং খোদা ছাড়া আর কাকে তাঁর পিতা বলা হবে? এই প্রশ্নের জওয়াবও يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ এর মধ্যে দেওয়া হল। অর্থাৎ মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা মানুষের আকৃতি তৈরি করে দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহর আছে, চাই মাতা-পিতা উভয়ের মিলনের মাধ্যমে হোক, অথবা শুধু মায়ের ক্রিয়া-গ্রহণশক্তিতে হোক। সেজন্যই বলা হয়েছে- هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ অর্থাৎ আল্লাহ সর্বশক্তিমান, যাঁর কুদরতকে কেউ সীমিত করতে পারে না। এবং তিনি হাকীমও, যেখানে যেমনটি উপযোগী মনে করেন তাই করেন। বিবি হাওয়াকে মা ছাড়া, মাসীহকে বাপ ছাড়া এবং আদম আ.কে বাপ-মা উভয় ছাড়া পয়দা করেছেন। তাঁর হেকমতের পরিমাপ কে করতে পারে?

১. নাজরানবাসী খ্রিস্টানরা কোন দলীল-প্রমাণের উত্তর না দিতে পেরে বিতর্কস্বরূপ বলেছিল, আর যা হোক আপনি হযরত মাসীহকে كلمة الله 'আল্লাহর কালিমা' এবং روح الله 'আল্লাহর রূহ' বলে স্বীকার করেন। এ শব্দাবলিই আমাদের দাবির সমর্থনে যথেষ্ট। আয়াতে এর যথার্থ

উত্তর একটি সাধারণ মূলনীতি ও নিয়মের ভিত্তিতে দেওয়া হচ্ছে, যা বুঝে নিলে হাজারো বিতর্ক ও বাদানুবাদের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে।

আয়াতে বর্ণিত মূলনীতি

বিষয়টি এভাবে বুঝুন : কুরআন কারীমে, বরং সকল আসমানী গ্রন্থেই দুই শ্রেণীর আয়াত রয়েছে। এক- যেগুলির অর্থ জানা ও নির্ধারিত। আভিধানিক, ব্যাকরণিক বা অন্য কোনো দিক থেকে সেই আয়াতগুলির শব্দাবলিতে কোন অস্পষ্টতা ও জটিলতা নেই। যে অর্থ বোঝা গেছে, তাও সর্বসম্মত নীতিমালার বিপরীত নয়। অথবা শব্দ ও বাক্যে অভিধানের দিক থেকে একাধিক অর্থের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও কুরআন- হাদীস বা এজমা (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) বা দীনের মূলনীতি দ্বারা অকাট্যভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে যে, বক্তার উদ্দেশ্য ওই অর্থ নয় বরং এই অর্থ। এমন আয়াতগুলিকে 'মুহকাম' বলে। বস্তুত এ সকল আয়াতই কিতাবের সমগ্র শিক্ষার মূল ও ভিত্তি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আয়াতসমূহকে 'মুতাশাবিহাত' বলে, অর্থাৎ যেগুলির মর্ম নির্ধারণ করতে কিছুটা অস্পষ্টতা ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। এগুলির অর্থ নির্ধারণে সঠিক পদ্ধতি এই যে, প্রথম প্রকারের আয়াতসমূহের আলোকে এগুলি দেখতে হবে। অতঃপর যে অর্থ 'মুহকাম' আয়াতের বিরোধী হবে, তা একেবারে পরিত্যাজ্য এবং যে অর্থ সেগুলির পরিপন্থী না, তা-ই বক্তার উদ্দেশ্য বলে ধরতে হবে। আর এজতেহাদ ও চূড়ান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও যদি বক্তার উদ্দেশ্য পুরাপুরি নির্ধারিত না করা যায়, তবে সকল কিছু জানার দাবি করে সীমা অতিক্রম করা উচিত হবে না। জ্ঞানের অপ্রতুলতা ও যোগ্যতার অভাবের কারণে প্রায়শই বহু তত্ত্ব ও তথ্য আমাদের অধরা থেকে যায়, তাকেও এর তালিকাভুক্ত রাখতে হবে। কিন্তু এগুলির এমন মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না, যা দীনের সর্বসম্মত মূলনীতি ও 'মুহকাম' আয়াতের পরিপন্থী।

যেমন, কুরআন হাকীমে হযরত মাসীহ আ. সম্পর্কে পরিষ্কার বলা আছে- إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ('তিনি তো কেবল এক বান্দা, যার উপর আমি অনুগ্রহ করেছিলাম-যুখরুফ : ৫৯) অথবা إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ('নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত তেমন, যেমন আদমের দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন-আলে ইমরান : ৫৯) কিংবা مَا كَانَ لِلّٰهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحَانَه ('আল্লাহ এমন নন যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি তো পবিত্র সত্তা-মারয়াম : ৩৫') -এরূপে বিভিন্ন স্থানে তাঁর ঈশ্বরত্ব ও পুত্রত্বের ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। এখন কেউ যদি এ সকল 'মুহকাম' আয়াত থেকে চোখ বন্ধ করে كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ ('আল্লাহর বাণী, যা তিনি নিক্ষেপ করেছিলেন মারয়ামের প্রতি, এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ- নিসা : ১৭১') প্রভৃতি 'মুতাশাবিহাত' নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এর যে অর্থ 'মুহকামাতের' সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল, তা ছেড়ে এমন অগভীর অর্থ গ্রহণ করে, যা কোরআনের সুস্পষ্ট ও মুতাওয়াতির (অসংখ্য-অগণিত) আয়াত ও বর্ণনার পরিপন্থী, তবে এটা বক্রতা ও গোয়ার্তুমী ছাড়া আর কী? কতক শক্ত হৃদয়ধারী ব্যক্তি চায়, এভাবে ধোঁকা দিয়ে লোকদের গোমরাহীতে পতিত করতে। আর কতক দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তি নিজস্ব রায় ও কল্পনা অনুযায়ী এমন মুতাশাবিহাতের ব্যাখ্যা বের করতে চায়। অথচ এগুলির সঠিক ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন।

৮. (তারা আরো বলে), হে আমাদের রব! আপনি আমাদের হেদায়েত দান করার পর আমাদের অন্তরকে (তা থেকে) বিচ্যুত করবেন না। আর আপনার নিকট থেকে আমাদের রহমত দান করুন, নিশ্চয় আপনিই মহান দাতা[১]।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ⑧

৯. হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি মানব জাতিকে এমন এক দিনে সমবেত করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ স্বীয় ওয়াদার বরখেলাফ করেন না[২]।

رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ⑨

আর যারা পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী, তারা মুহকাম ও মুতাশাবিহ উভয় প্রকার আয়াতকে সত্য বলে জানেন। তাঁদের বিশ্বাস রয়েছে যে, উভয় প্রকার আয়াত একই উৎস থেকে সমাগত। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোন রকম দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের অবকাশ নেই। এ জন্যই তারা মুতাশাবিহাতকে মুহকামাতের সামনে রেখে বোঝার প্রয়াস পান। আর যতটুকু তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধির বহির্ভূত থেকে যায়, তা আল্লাহ তাআলার উপর ন্যস্ত করে বলেন যে, তিনিই উত্তম জানেন, আমাদের কাজ ঈমান রাখা।

বি. দ্র. অধম (মুফাসসির)-এর নিকট এই আয়াতের বিষয়বস্তু সূরা হজের আয়াত (৫২) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنّٰى ...الخ-এর বিষয়ের সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যশীল, সেখানে ইনশাআল্লাহ এর আলোচনা হবে।

১. অর্থাৎ পরিপক্ক জ্ঞানী লোকেরা নিজেদের জ্ঞান-গরিমা ও ঈমানী শক্তির ফলে গর্বিত ও নিশ্চিন্ত থাকেন না, বরং সর্বদা আল্লাহ তাআলার নিকট দীনের উপর কায়েম থাকার জন্য এবং অধিকতর দয়া ও অনুগ্রহের জন্য দো'য়া করতে থাকেন, যাতে কষ্টার্জিত পুঁজি বিনষ্ট না হয়ে যায় এবং খোদা না করুন, অন্তর সরল পথে ধাবিত হওয়ার পর তা বক্র হয়ে না যায়। হাদীসে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উম্মতকে শোনানোর জন্য) প্রায়ই দো'য়া করতেন- يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك (হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দীনের উপর অবিচল রাখুন।-জামে তিরমিযী, হাদীস : ২২৭৭)

২. অর্থাৎ, উক্ত দিনটি অবশ্যই অবশ্যই আসবে এবং বিপথগামী লোকেরা যেসব বিষয়ে ঝগড়া করত সেসবের অকাট্য মীমাংসা হয়ে যাবে। ফলে প্রত্যেক পাপীকে স্বীয় কুটিলতা ও বেঈমানীর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই ভয়েই আমরা ওদের অনুসৃত পথকে ঘৃণা করি এবং তোমার রহমত ও সৎপথের উপর দৃঢ়পদ থাকার আকাঙ্ক্ষী। বিপথগামী কুটিলদের পথ পরিহার করে সঠিক পথ অবলম্বন করার মধ্যে আমাদের উদ্দেশ্য কোন কুচিন্তা ও স্বার্থপরতা নয়, বরং একমাত্র পরকালীন মঙ্গলই আমাদের উদ্দেশ্য।

[রুকূ - ২]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝

১০. যারা কাফের, নিশ্চয় ওদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহর মোকাবেলায় ওদের কোন উপকারে আসবে না। আর ওরাই দোযখের ইন্ধন[১]।

১. কিয়ামতের উল্লেখের সঙ্গে কাফেরদের পরিণতির কথাও বলে দেওয়া হল যে, কোন কিছুই দুনিয়া ও আখেরাতে খোদার আযাব থেকে ওদের রক্ষা করতে পারবে না।

আয়াতে তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত

সূরার প্রারম্ভে বলেছি, এই আয়াতগুলিতে মূলত নাজরানের প্রতিনিধি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। বস্তুত এ দল খ্রিস্টান ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিল। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক-এর রচিত সীরাত গ্রন্থ থেকে নকল করেছেন, যে সময় এই প্রতিনিধি দল নাজরান থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল, তখন ওদের বড় পাদ্রি আবু হারেছা ইবনে আলকামা খচ্চরের উপর আরোহী ছিল। খচ্চরটি হোঁচট খেলে তার ভাই কুরয ইবনে আলকামা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বদদো'য়া করে বলে উঠল– تعِس الأبْعد 'দূরবর্তী (অর্থাৎ মুহাম্মদ) ধ্বংস হোন।' নাউযুবিল্লাহ! তদুত্তরে আবু হারেছা বলে উঠল, تعست أمك 'তোমার মা ধ্বংস হোক।' কুরয অবাক হয়ে এ কথার কারণ জিজ্ঞাসা করল। আবু হারেছা বলল, 'খোদার কসম! আমরা ভালভাবে জানি যে, ইনিই সেই প্রতিশ্রুত নবী, যাঁর সুসংবাদ আমাদের কিতাবে দেওয়া হয়েছে।' কুরয বলল, 'তবে মানেন না কেন?' হারেছা বলল, 'তাঁর উপর ঈমান আনলে এ বাদশাহরা আমাদের যে অপরিমিত ধন-দৌলত দান করছেন ও মান-মর্যাদা দিচ্ছেন, তা সবই ফিরিয়ে নেবেন।' কুরয স্বীয় অন্তরে এ কথাটি গেঁথে রাখল এবং এটাই শেষ পর্যন্ত তার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিল। رضي الله عنه وأرضاه (সীরাতে ইবনে হিশাম ২/২১৫-২১৬)

আমার মতে বর্তমান আয়াতগুলিতে আবু হারেছার উক্ত কথাগুলিরই জওয়াব রয়েছে। বলতে গেলে, দার্শনিক ও ধর্মীয় প্রমাণাদির দ্বারা আল্লাহ তাআলা ওদের ভ্রান্ত আকীদার খণ্ডন করে সতর্ক করে দিলেন যে, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর যারা নিছক পার্থিব মোহ, ধনসম্পদ ও দলবলের খাতিরে ঈমান আনে না, তারা জেনে রাখুক যে, এসব কিছু তাদেরকে দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলার শাস্তি থেকে এবং আখেরাতেও ভয়ঙ্কর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। এর জীবন্ত উদাহরণ তোমরা ইতিপূর্বে বদর প্রান্তরে মুসলমান ও মুশরিকদের যুদ্ধে দেখেছ। পার্থিব ভোগ-বিলাস তো ক্ষণস্থায়ী। ভবিষ্যতের কামিয়াবী তাদেরই জন্য, যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং পরহেজগারী অবলম্বন করে।

সম্মুখে অনেক দূর পর্যন্ত এ বিষয়েরই আলোচনা রয়েছে। এস্থলে নাজরানবাসী খ্রিস্টানরা আসল লক্ষ্যস্থল হলেও শব্দাবলির ব্যাপকতা হিসাবে ইহুদী, মুশরিক প্রভৃতি অন্য কাফেররাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

১১. (এদের অবস্থা) ফেরাওন-সম্প্রদায় ও ওদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার মত। ওরা আমার আয়াতগুলিকে অস্বীকার করেছিল, ফলে আল্লাহ ওদের পাকড়াও করেছেন ওদেরই পাপের কারণে। আর আল্লাহর শাস্তি অতি কঠোর[১]।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَھُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

১২. আপনি কাফেরদের বলে দিন, 'তোমরা শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং তোমাদের একত্র করে (হাঁকিয়ে) নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে। আর (তা) কতই না নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!'[২]

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ۭ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

১. অর্থাৎ শত চেষ্টায়ও কেউ তা হটাতে পারবে না এবং ওরা যেমন ধৃত হয়েছে তোমরাও খোদার হাতে ধৃত হতে চলেছ।

২. অর্থাৎ ওই সময় এসে গেছে, যখন তোমরা (হে) ইহুদী, নাসারা ও মুশরিক সকলেই খোদায়ী লস্করের সম্মুখে পরাজিত হয়ে অস্ত্র পরিত্যাগ করবে। এ তো হল দুনিয়ার অপমান। এর সাথে আখেরাতে যে উত্তপ্ত বাসস্থান প্রস্তুত রয়েছে, তা তো আছেই।

শানে নুযূল

কোন কোন হাদীসে আছে, বদরের যুদ্ধ থেকে বিজয়বেশে প্রত্যাবর্তনের পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের বললেন, 'তোমরা সত্যকে গ্রহণ করে নাও, নতুবা তোমাদের পরিণতি তাই হবে যা কুরায়শদের হয়েছে।' তদুত্তরে ওরা বলল, 'হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! কতিপয় অনভিজ্ঞ কুরায়শদের উপর বিজয় লাভের ফলে ধোঁকায় পড়বেন না। আমাদের সঙ্গে মোকাবেলা হলে বুঝবেন, আমরা কী রকম রণকৌশলী ও অপরাজেয় বাহিনী।' তদুত্তরে এই আয়াতগুলির অবতরণ।

কোন কোন মুফাসসির বলেন, বদর যুদ্ধের বিজয় দেখে ইহুদীরা সত্য গ্রহণের প্রতি কিছুটা ধাবিত হয়েছিল, পরক্ষণেই বলল, তাড়াহুড়ার প্রয়োজন কী, দেখা যাক সম্মুখে কী হয়। দ্বিতীয় বছর উহুদে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় দেখে ওদের অন্তর শক্ত হয়ে গেল এবং সাহস বৃদ্ধি পেল। এমনকি ওয়াদা ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করল। ইহুদী সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফ ষাটজন আরোহীসহ মক্কায় গিয়ে আবু সুফিয়ান প্রমুখ কুরায়শ-সর্দারদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বলল, 'আপনারা ও আমরা অভিন্ন, চলুন সম্মিলিতভাবে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মোকাবেলা করি।' এতে এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহই ভাল জানেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৯৯৭; ফাতহুল বারী : ৭/৩৮৬)

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ۗ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ﴿١٣﴾

১৩. নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে সে দুটি বাহিনীর মধ্যে, যারা পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। (তন্মধ্যে) একটি বাহিনী আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল এবং দ্বিতীয় বাহিনী ছিল কাফেরদের। এরা খোলা চোখে তাদের দেখছিল নিজেদের দ্বিগুণ। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন সাহায্যের দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় তাতে চক্ষুষ্মান লোকদের জন্য (বড়) শিক্ষা রয়েছে[১]।

যা হোক, অচিরেই আল্লাহ তাআলা দেখিয়ে দিলেন যে, আরব উপদ্বীপে মুশরিকদের নাম পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকেনি। ইহুদীগোত্র 'বনী কুরায়জা' চুক্তি ভঙ্গ করে তরবারির শিকার (নিহত) হল, 'বনী নযীর' গোত্র দেশান্তরিত হল। এবং নাজরানের খ্রিস্টানরা অপমানিত হয়ে বাৎসরিক জিযিয়া দিতে রাজি হল এবং পরবর্তী এক হাজার বছর পর্যন্ত পৃথিবীর বড় বড় গর্বিত ও অহংকারী জাতিসমূহ মুসলমানদের উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য থাকল। (সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই।)

১. বদরের যুদ্ধে কাফের বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। ওদের নিকট ছিল সাত শত উট ও এক শত ঘোড়া। অপরপক্ষে মুসলমান মুজাহিদগণ ছিলেন মাত্র তিন শতের কিছু বেশি। তাদের সঙ্গে ছিল সর্বমোট সত্তরটি উট, দু'টি ঘোড়া, ছয়টি বর্ম ও আটটি তলোয়ার। তদুপরি মজার ব্যাপার এই ছিল যে, প্রত্যেক দল প্রতিপক্ষ দলকে দেখছিল নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ। ফলে কাফেরদের অন্তর মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য চিন্তা করে ভীত-সন্ত্রস্ত হচ্ছিল, আর মুসলমানগণ নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ শত্রুসংখ্যা দেখে আল্লাহ তাআলার প্রতি অধিকতর ঝুঁকে পড়ছিলেন এবং পূর্ণ ভরসা ও স্থিরতার সাথে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা– اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ('তোমাদের মধ্যে যদি একশ দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে তাদের দু'শ জনের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া উচিত– আনফাল : ৬৬') এর উপর আস্থা রেখে সাহায্য ও বিজয় আশা করছিলেন। কাফেরদের প্রকৃত সংখ্যা, যা ছিল মুসলমানদের তিনগুণ, যদি মুসলমানদের সম্মুখে প্রকাশ পেত, তবে হয়ত ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়তেন।

আর উভয় পক্ষেরই অপর পক্ষকে নিজেদের তুলনায় দ্বিগুণ দেখাটা সর্বাবস্থায় ছিল না। (যুদ্ধের ময়দানে) এমন এমন অবস্থাও হচ্ছিল, যখন প্রত্যেক দলের নিকট প্রতিপক্ষের সংখ্যা কম মনে হচ্ছিল। সূরা 'আনফালে' এর আলোচনা হবে।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً

তো এ ক্ষুদ্র সংখ্যক এবং প্রায় অস্ত্র ও রসদহীন মুসলিম জামাতকে বিপুল অস্ত্রে-শস্ত্রে বলীয়ান ও তিনগুণ সংখ্যাধিক্যসম্পন্ন (কাফের) বাহিনীর মোকাবেলায় এভাবে বিজয়ী করা নিঃসন্দেহে চক্ষুষ্মান লোকদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় ঘটনা।

১৪. মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে আকর্ষণীয় বস্তুসমূহের ভালবাসা, যথা: নারী[১], পুত্র, সোনা ও রূপার সঞ্চিত ভাণ্ডার, চিহ্নিত ঘোড়া[২], গবাদি পশু ও ফসল। এসব পার্থিব জীবনের ভোগ্যসামগ্রী। আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল[৩]।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿۱۴﴾

১৫. আপনি বলে দিন, 'আমি কি তোমাদের সেসবের চেয়ে উত্তম বস্তুর কথা বলব? পরহেজগারদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে উদ্যানরাজি, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে;

قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

---

১. অর্থাৎ নারীদের প্রতি আসক্ত হয়ে মানুষ খোদা থেকে গাফেল হয়ে যায়। এ জন্যই হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء 'আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীর চেয়ে ক্ষতিকর ফেতনা আর কিছু নেই।' (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫০৯৬)

হাঁ, যদি স্ত্রীর দ্বারা পবিত্রতা রক্ষা ও অধিক সন্তান লাভ উদ্দেশ্য হয়, তবে তা মন্দ তো নয়ই, বরং কাম্য ও প্রশংসনীয়। যেমন: হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'দুনিয়ার উত্তম সম্পদ হচ্ছে নেক স্ত্রী, যার প্রতি তাকালে খুশী লাগে, তাকে আদেশ দিলে পালন করে, স্বামীর অবর্তমানে সে তার মাল-সম্পদের ও নিজ সতীত্বের হেফাজত করে।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৪৬৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৮৫৭; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ২৬৮৩) অনুরূপ, দুনিয়ার জীবনের ভোগ্যসামগ্রী হিসাবে সামনে যত কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা সবই প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় হয় নিয়ত ও কর্মপন্থার বিচারে। তবে যেহেতু দুনিয়ার জীবনে অধিকাংশ লোকই এমন যে, তারা ভোগ-বিলাসের উপকরণে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ ও নিজ পরিণাম ভুলে যায়, সেজন্য زُيِّنَ للناس এর মধ্যে বাহ্যত ব্যাপক শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ যেসব ঘোড়ার শরীরে নম্বর বা চিহ্ন লাগানো হয়। অথবা 'পাচ কলিয়া' ঘোড়াসমূহ, যাদের হাত-পায়ে ও কপালে জন্মগত চিহ্ন রয়েছে, অথবা যেসব ঘোড়া মাঠে চড়ে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। এ সমস্ত ঘোড়া "চিহ্নিত ঘোড়া" এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. অর্থাৎ এসব জিনিস দ্বারা চিরস্থায়ী কল্যাণ হাসিল হয় না। শুধু দুনিয়াতে কয়েক দিনের উপকার পাওয়া যেতে পারে। ভবিষ্যৎ কামিয়াবী ও উত্তম ঠিকানা চাইলে তা আল্লাহ তাআলার নিকটই মিলবে। সুতরাং তাঁর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য হাসিল করার চিন্তা-ফিকির কর। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, সেই উত্তম ঠিকানা কী এবং কারা তা লাভ করবে।

وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌۢ بِالْعِبَادِ﴿۱۵﴾

এবং রয়েছে পাক-পবিত্র সঙ্গিনীরা[১] ও আল্লাহর সন্তুষ্টি[২]।' আর আল্লাহ ভাল করেই দেখেন (তাঁর) বান্দাদের[৩]—

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴿۱۶﴾

১৬. যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের রক্ষা করুন জাহান্নামের শাস্তি থেকে[৪],'

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴿۱۷﴾

১৭. যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, আদেশ পালনকারী, ব্যয়কারী ও শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী[৫]।

---

১. অর্থাৎ সব রকমের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা থেকে পাক-সাফ।

২. এর চেয়ে বড় ও উত্তম নে'য়ামত আর কী হতে পারে! বস্তুত বেহেশতও এজন্য কাম্য যে, তা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির স্থান।

৩. বান্দার সকল আমল ও অবস্থা তাঁর সামনে রয়েছে। যে ব্যক্তি যে পুরস্কার ও শাস্তির যোগ্য হবে, তাকে ঠিক ঠিক তাই দেওয়া হবে। যারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত থেকে মৃত্যু বরণ করেছে এবং যারা এর ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশ থেকে বিরত থেকে জীবন কাটিয়েছে, সকলকেই নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে।

অথবা وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ-এর অর্থ এই যে, পরহেজগার বান্দাদের উপর আল্লাহ তাআলার করুণা ও অনুগ্রহের দৃষ্টি রয়েছে, ফলে তারা দুনিয়ার ধোঁকাবাজ মন্ত্রমুগ্ধকারীদের থেকে রক্ষা পায়। যেমন: হাদীসে আছে, যখন আল্লাহ তাআলা কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তাকে দুনিয়া (ও তার মায়া) থেকে সেভাবে রক্ষা করেন, যেভাবে তোমরা তোমাদের রোগীদের ঠাণ্ডা পানি ও অন্যান্য ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা কর। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ২১৫৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৬৬৯)

৪. বোঝা গেল, গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত।

৫. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বড় বড় কষ্ট স্বীকার করেও আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে লেগে থাকে এবং নাফরমানী থেকে বিরত থাকে। তারা যবান, অন্তর, নিয়ত ও কাজে সত্যবাদী; তারা পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের সাথে আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকাম পালন করে, তারা আল্লাহ তাআলার দেওয়া ধন-সম্পদ তাঁর নির্দেশিত স্থানসমূহে খরচ করে, এবং তারা শেষ রাতে (যা প্রশান্তি ও দোয়া কবুলের সময় বটে, কিন্তু তখন ওঠা সহজ নয়) উঠে নিজেদের গোনাহখাতা ক্ষমা করায়। এমন লোকদের সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে, كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ('তারা রাতে স্বল্পই ঘুমাত এবং রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করত –জারিয়াত : ১৭-১৮') অর্থাৎ রাতের বেশির ভাগ তারা ইবাদতে কাটায় এবং এই প্রার্থনা করে– খোদাগো! ইবাদতে যে ত্রুটি রয়ে গেছে, তা স্বীয় মেহেরবানীতে ক্ষমা করে দিন।

১৮. আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই[১] এবং (এ সাক্ষ্য দিয়েছেন) ফেরেশতারা[২] ও জ্ঞানীরাও[৩]–	شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

সূরার শুরুতে নাজরানের খ্রিস্টানদের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে এবং অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মাসীহ আ.কে ঈশ্বর মানার শিরেকী বিশ্বাস খণ্ডন করে এবং নির্ভেজাল তাওহীদের ঘোষণা দিয়ে ঈমান গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। মাঝখানে সেসব বাধা-বিপত্তির উল্লেখ হয়েছে, যা সত্য প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও মানুষকে ঈমানের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রাখে– যথা: ধন-সম্পদ, সন্তানসন্ততি ও ভোগ-বিলাসের উপকরণাদি। পরবর্তী আয়াতগুলিতে মুমিনদের গুণাগুণ বয়ান করার পর এখন পুনরায় আসল বিষয় অর্থাৎ তাওহীদ ইত্যাদির দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে।

বলা হচ্ছে, খাঁটি তাওহীদ মেনে নিতে দ্বিধার কী কারণ থাকতে পারে, অথচ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল কিতাবের মধ্যে এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিয়ে আসছেন? তদুপরি, তাঁর বিশ্বসৃষ্টির পল্লবে পল্লবে বরং প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এ সাক্ষ্য বিদ্যমান যে, বিশ্বপ্রভু ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ হতে পারে না। যেমন: কবি বলেন,

وفي كلّ شيء له آية تدلّ على أنّه واحد

(প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই তাঁর নিদর্শন রয়েছে, যা প্রমাণ করে, তিনি এক।)

সূরা সেজদায় (আয়াত : ৫৩) বলা হয়েছে-

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

(আমি ওদেরকে আমার নিদর্শনাদি দেখাব— দুনিয়ার দিগদিগন্তে ও ওদের নিজেদের মধ্যে, যে পর্যন্ত না ওদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ-ই সত্য। আপনার রব কি প্রত্যেক বিষয়ে সাক্ষী হওয়ার জন্য যথেষ্ট নন?)

২. বলা বাহুল্য, ফেরেশতাদের সাক্ষ্য আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্যের খেলাফ হতে পারে না। ফেরেশতা তো বলেই এমন সৃষ্টজীবকে, যারা সততা ও সত্যপথের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন না। বস্তুত ফেরেশতাদের তাসবীহ ও তামজীদ (বা পবিত্রতা ও মর্যাদা- কীর্তন) আল্লাহ তাআলার তাওহীদ ও একত্ববাদের মহিমাই প্রকাশ করছে।

৩. পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীরা সর্বযুগে তাওহীদেরই সাক্ষ্য দিয়ে এসেছেন। আর বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে তো সাধারণভাবে তাওহীদের খেলাফ এক শব্দও উচ্চারণ করার অর্থ মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। এমনকি মুশরিকরাও অন্তরে স্বীকার করে যে, জ্ঞানের নীতিমালা শিরেকী আকীদা-বিশ্বাসকে কখনো সমর্থন করতে পারে না।

(আর) তিনি ন্যায় বিচারকারী।* তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, (তিনি) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[১]। هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝١٨

১৯. নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে কেবল আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের নাম*[২]। إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন— আর তিনি তো ন্যায়নিষ্ঠ— যে, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং (এ সাক্ষ্য দিয়েছেন) ফেরেশতারা ও জ্ঞানীরাও'।

১. ন্যায়বিচার করার জন্য দুটি বিষয় জরুরী। এক, ইনসাফকারীর পরাক্রমশালী হওয়া, যাতে তার ফয়সালার বিরুদ্ধাচরণ কেউ না করতে পারে। দ্বিতীয়, প্রজ্ঞাময় (হেকমতওয়ালা) হওয়া, যেন হেকমত ও প্রজ্ঞার সঙ্গে পরিপূর্ণরূপে পরখ ও পরিমাপ করে সঠিক ফয়সালা দিতে পারেন, কোন হুকুমই যেন অহেতুক না হয়। যেহেতু আল্লাহ তাআলা এই উভয় গুণের অধিকারী, অতএব তাঁর সুবিচারক হওয়ার মধ্যে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না।

খুব সম্ভব قائما بالقسط শব্দাবলির মাধ্যমে খ্রিস্টানদের তথাকথিত একটি আকীদার খণ্ডন হয়ে গেছে। ওদের বিশ্বাস, ঈসা আ. শূলবিদ্ধ হয়ে প্রাণদানের কারণে সকল মানুষের পাপের কাফফারা হয়ে গেছে!! সারা দুনিয়ার পাপের বোঝা এক ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া এবং তার একার শাস্তি দ্বারা সর্বদার জন্য সকল পাপীদের পাপমুক্ত ও পবিত্র করে দেওয়া– এ আবার কোন ইনসাফের কথা?! এমন সব ধৃষ্টতা থেকে মহাজ্ঞানী সুবিচারক আল্লাহ তাআলার মহান দরবার অতি উচ্চে, অতি উর্ধ্বে।

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দীন হচ্ছে কেবল ইসলাম'।

২. **'ইসলাম'-এর মর্ম ও তাৎপর্য**

ইসলাম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ করা। 'ইসলাম ধর্ম'-কে এই হিসাবেই ইসলাম বলা হয় যে, একজন মুসলিম নিজেকে আপাদমস্তক এক খোদার কাছে সোপর্দ করে দেওয়ার এবং তাঁর বিধানের সম্মুখে মাথা নত করে দেওয়ার স্বীকৃতি জানায়। 'ইসলাম' যেন আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ এবং 'মুসলমানী' যেন ফরমাবরদারীর অপর নাম।

বস্তুত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল পয়গম্বর এই ইসলাম ধর্ম নিয়েই আগমন করেছেন এবং স্ব-স্ব যমানায় নিজ নিজ জাতিকে যুগোপযোগী আহকাম পৌঁছিয়ে দিয়ে আনুগত্য ও ফরমাবরদারি এবং এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহবান করেছেন। তবে এই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র দুনিয়াকে যে পূর্ণতম, ব্যাপকতম, বিশ্বজনীন ও শাশ্বত (অপরিবর্তনীয়) বিধান ও আদর্শ দান করেছেন, তা পূর্ববর্তী সকল সত্য শরী'য়ত ও আরো অতিরিক্ত বিষয়াদি নিজের মধ্যে ধারণ করার কারণে বিশেষভাবে 'দীন ইসলাম' নামে অভিহিত ও আখ্যায়িত হয়েছে।

وَمَا اخۡتَلَفَ الَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡکِتٰبَ اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ الۡعِلۡمُ بَغۡیًۢا

আর কিতাবীরা তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই মতবিরোধ করেছিল, পরস্পরের জেদের কারণে[১]। আর যে কেউ আল্লাহর

যাই হোক, বর্তমান আয়াতের মধ্যে বিশেষভাবে নাজরানের খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যে এবং ব্যাপকভাবে সকল জাতি ও মিল্লাতের সম্মুখে ঘোষণা করা হয়েছে যে, দীন ও ধর্ম একটিমাত্র জিনিসেরই নাম হতে পারে– তা এই যে, বান্দা মনেপ্রাণে নিজেকে আল্লাহ পাকের নিকট সোপর্দ করে দেবে এবং তাঁর পক্ষ থেকে যখন যে নির্দেশ লাভ করবে, বিনা বাক্যব্যয়ে তার সামনে গর্দান অবনত করে দেবে।

এমন লোকেরা কি 'মুসলমান' হতে পারে?

এখন যারা আল্লাহর পুত্র-নাতি নির্ধারণ করে, ঈসা আ. ও মারয়ামের ছবির ও ক্রুশের পূজা করে, শূকর খায়, মানুষকে খোদা বা খোদাকে মানুষ বানায়, নবী ও ওলীদের খুন করাকে মামুলি মনে করে, সত্য ধর্মকে মেটানোর অপচেষ্টায় তৎপর থাকে, মূসা আ. ও ঈসা আ. এর সুসংবাদ অনুযায়ী যে পয়গম্বর তাঁদের উভয়ের চেয়েও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও মুজেযাসহ আগমন করলেন, জেনে-শুনে তাঁকে মিথ্যা বলে এবং তাঁর আনীত আল্লাহ তাআলার কালাম ও বিধানের প্রতি ঠাট্টা করে; অথবা যে বেকুবরা পাথর, বৃক্ষ, সূর্য, চন্দ্র ও তারকার পূজা করে এবং একমাত্র নফস-প্রবৃত্তিকে হালাল-হারামের মাপকাঠি নির্ধারণ করে– এমন লোকদের মধ্যে কেউ কি এই যোগ্যতা রাখে যে, নিজেকে মুসলিম ও মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী বলবে? আল্লাহর পানাহ! (কখনো না)

তাফসীরে কবীরে উল্লেখ আছে, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নাজরানবাসী খ্রিস্টানদের) ইরশাদ করলেন, 'ইসলাম গ্রহণ কর।' উত্তরে ওরা বলল, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মিথ্যা কথা, কিরূপে তোমাদের ইসলাম শুদ্ধ হতে পারে যখন তোমরা আল্লাহ তাআলার জন্য সন্তান নির্ধারণ কর, ক্রুশের পূজা কর এবং শূকর খাও?'

১. অর্থাৎ ইসলাম একটি সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল দীন। যে ধরনের প্রমাণাদির মাধ্যমে মূসা আ. ও ঈসা আ. নবী বলে স্বীকৃত অথবা তাওরাত ও ইনজীল আসমানী কিতাব বলে প্রমাণিত, তারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ, অধিক জোরদার ও জীবন্ত প্রমাণসমূহ দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত এবং কুরআনের আল্লাহ তাআলার কালাম হওয়া প্রমাণিত। বরং স্বয়ং সেসব কিতাবই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর খাঁটি তাওহীদ একটি সুস্পষ্ট বিষয়, যার বিপক্ষে পিতা-পুত্রের (ঈশ্বরত্বের) মতবাদ কেবল একটি নিরর্থক প্রহেলিকা, যার সমর্থনে জ্ঞানগত ভিত্তি বলতে কিছু নেই।

এখন যে সকল কিতাবী ইসলামের বিরোধিতা করে এই সমস্ত উজ্জ্বল প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে অস্বীকার করে, তারা যে শুধু জিদ, হিংসা ও শত্রুতার বশবর্তী হয়ে এবং অর্থ ও পদের মোহে পড়ে এমন করে, এতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। যেমন: ইতিপূর্বে আবু হারেছা ইবনে আলকামার স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

বিধানাবলি অস্বীকার করবে, তো আল্লাহ দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী।[১]

فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ۚ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ

২০. এর পরও যদি ওরা আপনার সঙ্গে বিতর্ক করে তবে আপনি বলে দিন, 'আমি স্বীয় সত্তাকে আল্লাহর অনুগত করে দিয়েছি এবং যারা আমার অনুসারী তারাও।[২]' আর আপনি কিতাবীদের ও নিরক্ষরদের বলে দিন, 'তোমরাও কি অনুগত হলে?' যদি তারা অনুগত হল, তবে সরলপথ পেয়ে গেল। আর

উল্লেখ্য, এটা এই লোকদের পুরাতন অভ্যাস। ইহুদী ও নাসারাদের পরস্পরে যা কিছু মতভেদ হয়েছে অথবা প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে যে বিভিন্ন ফেরকার সৃষ্টি হয়েছে, অতঃপর পরস্পর বিরোধিতা যে ভয়াবহ যুদ্ধ ও খুনাখুনিতে পরিণত হয়েছে– ইতিহাসের সাক্ষ্য, এর কারণ সাধারণত ভুল বোঝাবুঝি বা মূর্খতা ছিল না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু ধন-দৌলতের মায়া-মহব্বত এবং পদ-মর্যাদার মোহের কারণে এই সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল।

১. অর্থাৎ দুনিয়াতেও। নতুবা আখেরাতে তো অবশ্যই।

২. ১৯ নং আয়াতের টীকার শেষাংশে উল্লেখ করা হয়েছে, নাসারারা তর্ক করে বলত– 'আমরাও মুসলমান।' এখানে ওদের বলা হচ্ছে যে, এমন মৌখিক ইসলামের মূল্য কী? প্রকৃত ইসলাম যদি দেখতে চাও তবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর জন্য নিবেদিতপ্রাণ সঙ্গী-সাথীদের দেখ।

একটু পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, ইসলাম হচ্ছে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের নাম। অর্থাৎ বান্দা সর্বতোভাবে নিজেকে আল্লাহর হাতে সমর্পণ করে দেবে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুহাজের ও আনসারদের দেখে নাও– কীভাবে তাঁরা শিরক, মূর্তিপূজা, চরিত্রহীনতা, পাপাচার ও জুলুম-অত্যাচারের মোকাবেলা করতে গিয়ে নিজেদের জান, মাল, দেশ, আত্মীয়, স্ত্রী, সন্তান– মোটকথা, সমস্ত আকর্ষণীয় ও প্রিয় বস্তু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য বিসর্জন দিয়েছেন এবং দেখ- কীভাবে তাঁদের চেহারা ও চোখ সদা আল্লাহ তা'আলার হুকুমের প্রতি নিবদ্ধ রয়েছে যে, সেদিক থেকে হুকুম আসামাত্র তাঁরা তা পালন করবেন। পক্ষান্তরে, তোমরা নিজেদের অবস্থা দেখ, নির্জনে তোমরা পরস্পর স্বীকার করছ যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী, কিন্তু তাঁর প্রতি ঈমান আনলে পার্থিব ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত হবে বলে তাঁর প্রতি ঈমান আনছ না!!

যা হোক, সত্য প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও যদি ইসলামের প্রতি অগ্রসর না হও, তবে তা তোমরা জান, আমরা (মুসলমানরা) নিজেদের এক খোদার নিকট সোপর্দ করে দিয়েছি।

যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার কর্তব্য তো শুধু পৌছিয়ে দেওয়া। আর আল্লাহ ভাল করেই দেখেন বান্দাদের[১]।

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

[রুকূ - ৩]

২১. যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ইনসাফের নির্দেশ দেয় তাদেরও হত্যা করে, আপনি তাদের যাতনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

২২. ওরাই তারা, যাদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখেরাতে বিনষ্ট হয়েছে। আর ওদের কোন সাহায্যকারী নেই[২]।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ ভেবে দেখ, তোমরাও কি আমাদের মত আল্লাহর অনুগত বান্দা হয়েছ, বা এখন হচ্ছ? এমনটি হলে তোমরা সঠিক পথ ধরেছ। তা না হলে, আমাদের কাজ হচ্ছে তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া এবং তা আমরা করেছি। আর সকল বান্দা এবং তাদের প্রকাশ্য ও গোপন আমল আল্লাহ তাআলার গোচরে রয়েছে– তিনি প্রত্যেকেরই শাস্তি বা পুরস্কারের ব্যবস্থা করবেন।

'নিরক্ষর' বলা হত আরবের মুশরিকদের। কারণ, ওদের নিকট আসমানী কিতাবের ইলম ছিল না।

২. হাদীসে আছে, বনী ইসরাঈল একদিনে তেতাল্লিশ জন নবীকে এবং একশ সত্তর বা একশ বারজন নেককার ব্যক্তিকে শহীদ করেছিল। (তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম, হাদীস : ৩৩৩২; তাফসীরে তাবারী ৫/২৯১)

এখানে নাজরানের খ্রিস্টানদের ও অন্য কাফেরদের শোনানো হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলার আহকাম অস্বীকার করে নবীদের ও ন্যায়ের নসীহতকারীদের মোকাবেলা করা এবং চরম নির্দয়তা ও নির্মমতার সাথে তাঁদের রক্তে হাত রঞ্জিত করা মামুলি ব্যাপার নয়। এমন লোকেরা অত্যন্ত কষ্টদায়ক শাস্তির যোগ্য এবং উভয় জগতের কামিয়াবী থেকে বঞ্চিত। ওদের শ্রম ব্যর্থ এবং ওদের সকল চেষ্টা পণ্ড হবে এবং ইহ ও পরকালে যখন শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, তখন কেউ-ই ওদের রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী থাকবে না।

২৩. আপনি কি ওদের দেখেননি যাদের দেওয়া হয়েছিল কিতাবের কিছু অংশ[১]? ওদের আহবান করা হয় আল্লাহর কিতাবের দিকে, যাতে তা ওদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়। তা সত্ত্বেও ওদের এক দল উপেক্ষা প্রদর্শন করে মুখ ফিরিয়ে নেয়[★২]।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

২৪. তা এ কারণে যে, ওরা বলে, 'আগুন কখনই আমাদের স্পর্শ করবে না, তবে গণা কয়েক দিন।' বস্তুত ওদের মনগড়া কথাবার্তাই ওদেরকে ধর্ম-বিষয়ে প্রতারিত করেছে[৩]।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۪ وَغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

১. অর্থাৎ তাওরাত, ইন্‌জীল ইত্যাদির অল্প-বিস্তর অংশ, যা ওদের ভাষাগত ও অর্থগত বিকৃতি থেকে রক্ষা পেয়েছে। অথবা উদ্দেশ্য হল কিতাবের জ্ঞানের কম-বেশী অংশ, যা ওরা লাভ করেছিল।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর ওরা তো উপেক্ষা করতেই অভ্যস্ত'।

২. অর্থাৎ যখন ওদের ডাকা হয় যে, কুরআন কারীমের দিকে আস, যা স্বয়ং তোমাদেরই স্বীকৃত কিতাবসমূহের সুসংবাদ অনুযায়ী এসেছে এবং যা তোমাদের মতবিরোধের সঠিক মীমাংসাকারী—তখন ওদের ধর্মীয় পণ্ডিতদের একদল উপেক্ষা প্রদর্শন করত মুখ ফিরিয়ে নেয়। অথচ কুরআনের প্রতি ডাকা প্রকৃতপ্রস্তাবে তাওরাত ও ইনজীলের দিকেই ডাকা।

বরং হতে পারে, এস্থলে আল্লাহ তাআলার কিতাব বলতে তাওরাত ও ইন্‌জীল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ শোন, আমরা তোমাদের কলহ-বিবাদের মীমাংসার ভার তোমাদেরই কিতাবের উপর ন্যস্ত করেছি। কিন্তু ওদের দুর্ভাগ্য এই যে, ওরা স্বীয় প্রবৃত্তি ও হীন স্বার্থের কারণে নিজেদেরই কিতাবের হেদায়েত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়– না তার সুসংবাদসমূহ শুনছে, না তার আহকামের প্রতি লক্ষ্য করছে। যেমন: সূরা মায়িদার বর্ণনামতে ওরা ব্যভিচারকারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার মাসআলায় তাওরাতের স্পষ্ট বিধান অমান্য করেছিল।

৩. অর্থাৎ অবাধ্যতা, বাড়াবাড়ি ও পাপাচারে ওদের অটল থাকার কারণ, শাস্তি সম্পর্কে নির্ভয় হয়ে যাওয়া। ওদের গুরুরা মিথ্যার বেসাতি করে বলে গেছে, 'আমাদের মধ্যে যত বড় পাপীই হোক, গণা কয়েক দিনের বেশি আযাব ভোগ করবে না।' যেমন, সূরা বাকারায় (আয়াত ৮০) এর বর্ণনা রয়েছে। এমনি ধরনের আরো অনেক মনগড়া কথা ওরা বানিয়ে রেখেছে। যেমন: ওরা বলত, আমরা তো আল্লাহ তাআলার প্রিয় পুত্র, অথবা আমরা নবীগণের সন্তান এবং আল্লাহ তাআলা ইয়াকূব আলাইহিস সালামের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন যে, তাঁর সন্তানদের আযাব দেবেন না, তবে শুধু কসম পূরণের জন্য নামমাত্র শাস্তি দেবেন। আর খ্রিস্টানরা তো প্রায়শ্চিত্তের আকীদা বের করে গোনাহ ও অবাধ্যতার খাতাই বিলীন করে দিয়েছে (যত গোনাহ হোক সব মাফ!)। اللَّهُمَّ أعذنا من شرور أنفسنا

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. অতএব কী অবস্থা হবে যখন আমি ওদের এমন একদিনে সমবেত করব, যাতে কোন সন্দেহ নেই? আর প্রত্যেককেই সে যা করেছে তা(-র বিনিময়) পুরাপুরি দেওয়া হবে[১] এবং ওদের হক নষ্ট করা হবে না[২]।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

২৬. আপনি বলুন, 'হে আল্লাহ! সমস্ত সাম্রাজ্যের মালিক! আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। আর যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। আপনারই হাতে সকল কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান[৩]।

১. অর্থাৎ যখন ওরা হাশরের ময়দানে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ বিশেষত নিজ বড়দের সামনে অপদস্থ হবে এবং প্রতিটি কাজের প্রতিফল পাবে তখন বোঝা যাবে, ওরা কী অন্ধকারেই না পতিত ছিল। তখন প্রায়শ্চিত্তের মাসআলাও মনে পড়বে না এবং বংশীয় সম্পর্ক ও মনগড়া আকীদা-বিশ্বাসও কোন কাজে আসবে না।

২. অর্থাৎ কাল্পনিক গোনাহ নয় বরং প্রকৃত গোনাহরই শাস্তি হবে, অর্থাৎ যেসব কাজকে ওরাও গোনাহ বলে স্বীকার করবে। আর যে পরিমাণ শাস্তির যোগ্য ওরা হবে, তার বেশি শাস্তি ওদের দেওয়া হবে না এবং কারো সামান্যতম নেকীও বিনষ্ট হবে না।

৩. ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নাজরানবাসী প্রতিনিধি দলের প্রধান আবু হারেছা বলেছিল, 'আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনলে রোমের বাদশাহরা আমাদের সাহায্য-সহায়তা বন্ধ করে দেবে।' সম্ভবত এস্থলে মুনাজাতের আকারে ওর কথার জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা তো রাজা-বাদশাহর রাজত্ব এবং ওদের প্রদত্ত মান-সম্মানের প্রতি বিমোহিত হয়ে আছ, কিন্তু তোমাদের নিশ্চিত জানা দরকার যে, সকল সাম্রাজ্য ও সম্মানের একচ্ছত্র অধিপতি হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। তাঁরই কুদরতের মুঠিতে এই সব কিছু- তিনি যাকে ইচ্ছা দান করবেন, যার থেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নেবেন। এ কি সম্ভব নয় যে, তিনি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য এবং উভয়ের মান-সম্মান কেড়ে নিয়ে মুসলমানদের দিয়ে দেবেন? বরং তাঁর ওয়াদা রয়েছে, তিনি অবশ্যই দেবেন।

মুসলিম মুজাহিদগণ লাভ করলেন রোম-পারস্যের রাজত্ব

ইহুদী ও মুনাফিকরা ঠাট্টা করে বলত, কুরায়শদের আক্রমণের ভয়ে যে মুসলমানগণ মদীনার চারদিকে পরিখা খনন করছে, তারাই বুঝি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের অধিপতিদের মুকুট ও সিংহাসন দখলের স্বপ্ন দেখছে! কিন্তু আল্লাহ তাআলা কয়েক বছরের মধ্যেই সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত করে দিলেন। সারা দুনিয়া দেখেছে, তিনি রোম ও

২৭. 'আপনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে[১], আর জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন[২]। আর আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন[৩]।'

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۝

পারস্য সাম্রাজ্যের যে রত্নভাণ্ডারসমূহের চাবি তাঁর পয়গম্বরের হাতে প্রদান করেছিলেন, দ্বিতীয় খলীফা ফারুকে আজমের আমলে কীভাবে সেই রত্নভাণ্ডারগুলো ইসলামী মুজাহিদদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল।

আসল ব্যাপার এই যে, পার্থিব রাজত্ব ও সম্মান কী আর জিনিস! যখন সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলা রূহানী রাজত্ব ও সম্মানের সর্বোচ্চ মকাম (অর্থাৎ নবুওয়াত ও রেসালাতের মর্যাদা) বনী ইসরাঈল থেকে স্থানান্তরিত করে বনী ইসমাঈলে পৌঁছে দিলেন, তখন রোম ও অনারবদের পার্থিব রাজত্ব যাযাবর আরবদের করতলগত করে দেওয়া কঠিন হবে কেন? বলতে গেলে, এ প্রার্থনা যেন এক রকম ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, শীঘ্রই দুনিয়ার অবস্থা ভিন্নরূপ ধারণ করবে– যে জাতি দুনিয়ার তৎকালীন সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তারাই সকল মর্যাদা ও সাম্রাজ্যের অধিপতি হবে। পক্ষান্তরে, যারা রাজত্ব করছিল তারা স্বীয় কর্মদোষে অপমান ও লাঞ্ছনার কূপে পতিত হবে।

বি. দ্র. بيدك الخير অর্থাৎ, আল্লাহরই হাতে সকল প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ। উল্লেখ্য যে, তাঁর হিসাবে মন্দ সৃষ্টি করাও কল্যাণকরই। কেননা, সমগ্র জগতের বিবেচনায় এতে হাজারো হেকমত গুপ্ত রয়েছে। সহীহ হাদীসে আছে الخير كله في يديك والشر ليس إليك (সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে, অকল্যাণ তোমার দিকে নয়) (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৭৭১)

১. অর্থাৎ কখনো রাতকে ছোট করে দিনকে বড় করে দেন, কখনো বা এর উলটা করে থাকেন। যেমন: এক মৌসুমে চৌদ্দ ঘণ্টার রাত হয় এবং দশ ঘণ্টার দিন হয়, কয়েক মাস পর রাতের চার ঘণ্টা কেটে দিনে দাখিল করায় রাত দশ ঘণ্টার থাকে এবং দিন চৌদ্দ ঘণ্টার হয়ে যায়। এসব ওলট-পালট (হে খোদা) তোমারই হাতে। কেননা, সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র তোমার ইচ্ছার বাইরে একটুও নড়তে পারে না। সারকথা, কোন মৌসুমে দিন বড়, কোন মৌসুমে রাত বড়।

২. যেমন মুরগি থেকে ডিম, ডিম থেকে মুরগি; বীর্য হতে মানুষ, মানুষ থেকে বীর্য; আলেম থেকে জাহেল, জাহেল থেকে আলেম; অপূর্ণ থেকে পূর্ণ; পূর্ণ থেকে অপূর্ণ বের করা (অর্থাৎ জন্মানো) তোমারই কুদরতের কাজ।

৩. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, ইহুদীরা মনে করত, ওদের পূর্বমর্যাদা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে। এ আল্লাহ তাআলার কুদরত সম্পর্কে ওদের অজ্ঞতা। কেননা, তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান ও রাজত্ব দেবেন এবং যার থেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে অপমানিত

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۭ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ

২৮. মুসলিমগণ যেন মুসলমানদের ছেড়ে কাফেরদের বন্ধু না বানায়। যে কেউ এ কাজ করবে, আল্লাহর সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই; তবে তোমরা যখন ওদের থেকে কিছুটা আত্মরক্ষা করতে চাও (তখনকার কথা ভিন্ন)[১]। আর আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করছেন এবং আল্লাহরই

করবেন। তদ্রূপ জাহেলদের মধ্যে কামেলদের জন্ম দেবেন (যেমন: আরব নিরক্ষরদের মধ্যে দিয়েছিলেন) এবং কামেলদের মধ্যে জাহেল সৃষ্টি করবেন, যেমন বনী ইসরাঈলের মধ্যে হয়েছিল। এবং যাকে ইচ্ছা (পার্থিব ও আধ্যাত্মিক) রিযিক বেশুমার দান করবেন।

১. অর্থাৎ যখন হুকুমত ও রাজত্ব, মান-সম্মান এবং সর্বপ্রকার ওলট-পালট ও পরিবর্তন-পরিবর্ধনের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতে, তখন সত্যিকারভাবে এর উপর বিশ্বাসী মুসলমানদের জন্য মোটেই শোভনীয় নয় যে, তারা স্বীয় মুসলিম ভাইদের ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বকে যথেষ্ট মনে না করে অযথাই আল্লাহ তাআলার শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপন করার প্রতি অগ্রসর হবে। আল্লাহ-রাসূলের দুশমনরা কখনো মুসলমানদের দোস্ত হতে পারে না। এর পরও যদি কেউ এই বোকামীর শিকার হয়, তাহলে বুঝে নিয়ো, আল্লাহর মহব্বত ও বন্ধুত্বের সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই। একজন মুসলমানের সকল আশা-ভরসা ও ভয়-ভীতি একমাত্র রব্বুল ইজ্জত আল্লাহ তাআলারই সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া উচিত। আর তাঁর আস্থা, ভালবাসা ও সাহায্য-সহানুভূতির অধিকারী একমাত্র তারাই, যারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে ঠিক এই ধরনের সম্পর্ক রাখে।

اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ

হাঁ, কাফেরদের বড় রকমের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ ও শরীয়তসম্মত কৌশল অবলম্বন করাটা ভিন্ন ব্যাপার। এটি কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করার নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, জেহাদের ময়দান থেকে ভেগে যাওয়া নিষিদ্ধ বটে। কিন্তু সূরা আনফালের (আয়াত : ১৬) মধ্যেই এই নিষেধাজ্ঞার বহির্ভূত রাখা হয়েছে বাহ্যিক সেই পশ্চাদপসরণকে, যার ফলে বৃহত্তর আক্রমণ সম্ভব হয়। অর্থাৎ জেহাদ সম্পর্কীয় বিধান— وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗ থেকে مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ কে যেমন ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে, তেমনি এখানেও কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করার বিধান থেকে اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً কে ব্যতিক্রমধর্মী সাব্যস্ত করা হয়েছে। কারণ, এ প্রকৃত বন্ধুত্ব নয় বরং বন্ধুত্বের প্রকাশ মাত্র।

সূরা মায়েদার আয়াত (৫১) يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَآءَ الخ এর তাফসীরে এ বিষয়ে অধিকতর আলোচনা রয়েছে। তা দ্রষ্টব্য। তদুপরি হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান (রহ) এর ইঙ্গিতে অধম (মুফাসসির) কর্তৃক একটি পৃথক কিতাবও উক্ত বিষয়ে লেখা হয়েছে। তা দেখা যেতে পারে।

نَفْسَهٗ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸﴾

কাছে (তোমাদের) ফিরে যেতে হবে[১]।

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِیْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۹﴾

২৯. আপনি বলুন, 'তোমরা তোমাদের মনের কথা গোপন কর বা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা জানেন[২]। বস্তুত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা (সবই) তিনি জানেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান[৩]।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ

৩০. যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃত ভাল কাজগুলি সামনে উপস্থিত পাবে এবং তার কৃত মন্দ কাজগুলিও, সেদিন সে কামনা করবে, 'হায়! তার ও ওই দিনের মধ্যে যদি দুস্তর ব্যবধান থাকত[৪]! আর আল্লাহ তাঁর

---

১. অর্থাৎ মুমিনের দিলে প্রকৃত ভয় একমাত্র আল্লাহ তাআলারই হতে হবে। সুতরাং সে এমন কিছু করবে না যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়। যেমন: ইসলামী দল ছেড়ে অনাবশ্যকভাবে কাফেরদের সাথে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বন্ধুত্ব করা, অথবা প্রয়োজনকালে বাহ্যত বন্ধুত্ব অবলম্বন করতে যেয়ে শরী'য়তনির্দেশিত সীমা অতিক্রম করে যাওয়া, অথবা সন্দেহ বা মামুলি পর্যায়ের আশঙ্কাকে নিশ্চিত ও গুরুতর ভয়ের কারণ মনে করা, কিংবা ব্যতিক্রম ও অবকাশগুলোকে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বাহানা হিসাবে গ্রহণ করা।

যে ব্যক্তি এ রকম করবে তার মনে রাখা উচিত যে, সকলকেই আল্লাহ তাআলার মহান আদালতে হাযির হতে হবে, যেখানে মিথ্যা বাহানা ও চাতুরী চলবে না। পরিপক্ক মুমিনের শান তো বরং এই হওয়া উচিত যে, সে 'রুখসত' বা অবকাশের উপর আমল না করে 'আযীমত' বা মূল বিধানের উপর আমল করবে এবং সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টাকে বেশি ভয় করবে।

২. অর্থাৎ মানুষ অন্য মানুষ থেকে স্বীয় নিয়ত ও অন্তরের কথা গোপন করতে পারে, কিন্তু আল্লাহকে সে কখনো ধোঁকা দিতে পারে না।

৩. যখন আল্লাহ তাআলার জ্ঞান এতই ব্যাপক এবং তাঁর কুদরত এমন সর্বব্যাপী ও পরিপূর্ণ, তখন অন্যায়কারীর জন্য অন্যায় গোপন করে রাখা অথবা শাস্তি থেকে ভেগে যাওয়ার কোন উপায় নেই।

৪. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন প্রত্যেকটি সৎকর্ম ও অসৎকর্ম মানুষের সামনে উপস্থিত থাকবে এবং সারা জীবনের সকল আমলের তালিকা (আমলনামা) হাতে দেওয়া হবে, সেদিন পাপীরা কামনা করবে : হায়, এই দিনটি যদি আমাদের থেকে দূরেই থাকত! অথবা (অর্থ এই যে,) হায় আমাদের মধ্যে এবং এই অসৎ কাজগুলির মধ্যে যদি খুবই দূর ব্যবধান থাকত, যাতে এগুলোর কাছেও আমাদের যেতে না হত!

اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

নিজের সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করছেন এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অতি মেহেরবান[১]।

[রুকূ - ৪]

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৩১. আপনি বলুন, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর; তা হলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।'

---

১. এও তাঁর মেহেরবানী যে, এই ভয়ঙ্কর দিনের আগমনের পূর্বে তোমাদের তিনি সতর্ক ও অবগত করেছেন, যাতে তোমরা অকল্যাণ ও মন্দের রাস্তা বিশেষত কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পরিহার কর এবং কল্যাণের পথ অবলম্বন কর, আর এভাবে নিজেদের আল্লাহ তাআলার গযব থেকে বাঁচানোর পূর্ব-ব্যবস্থা করে রাখ।

পবিত্র কুরআনের এক বিশেষ বর্ণনা-পদ্ধতি এই যে, সাধারণত ভয়ের সাথে আশা এবং আশার সাথে ভয়ের বাণী শোনানো হয়ে থাকে। এস্থলেও সাবধান ও সতর্ককরণের আলোচনাকে ভারসাম্যপূর্ণ করার জন্য সর্বশেষে আল্লাহ তাআলা وَاللّٰهُ رَؤُوْفٌ بِالْعِبَادِ বলে দিলেন। অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে পাপাচার পরিত্যাগ করলে তাঁর মেহেরবানী তোমাদের অভ্যর্থনা করবে, নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। তো আস, তোমাদের এমন প্রবেশ-দ্বারের কথা বলে দেই, যাতে প্রবেশ করে তোমরা ক্ষমা ও দয়ার পূর্ণ অধিকারী এবং আল্লাহ তাআলার প্রিয় হতে পারবে—

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ.

('যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমারই পথ অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসেন এবং তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।')

২. আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার নিষেধাজ্ঞার পর এবার আল্লাহর সঙ্গে ভালবাসার মাপকাঠি বর্ণনা করছেন, অর্থাৎ যদি দুনিয়ার মধ্যে আজ কারো এই দাবি থাকে যে, সে তার প্রকৃত মালিকের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে— তবে দেখতে হবে, তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের কষ্টিপাথরে টেকে কিনা। যে ব্যক্তি যে পরিমাণ আল্লাহর হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং তাঁর আনীত নূরকেই পথের দিশা হিসাবে গ্রহণ করে, বুঝতে হবে তার আল্লাহ-প্রেমের দাবি সেই পরিমাণ খাঁটি। অন্যভাবে বললে, উক্ত দাবিতে সে যতটুকু সত্য হবে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণে তাকে ততটুকুই পরিপক্ক ও সচেষ্ট পাওয়া যাবে।

এই অনুসরণের সুফল এই হবে যে, আল্লাহ তাআলাও তাকে ভালবাসতে শুরু করবেন এবং আল্লাহর মহব্বত ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের বরকতে তার পিছনের

৩২. আপনি বলুন, 'তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মান্য কর।' আর যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তো কাফেরদের ভালবাসেন না[১]।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. নিশ্চয় আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্য হতে আদম, নূহ, ইবরাহীমের পরিবার ও ইমরানের পরিবারকে মনোনীত করেছেন[২]—

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. যাঁরা একে অন্যের বংশধর[৩]। আর আল্লাহ

ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ؕ وَاللّٰهُ

গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে এবং তার উপর ভবিষ্যতের রকমারি জাহেরী ও বাতেনী কৃপা ও অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হবে।

বলতে গেলে, তাওহীদ ইত্যাদির বয়ান শেষে এখান থেকে নবুওয়াতের বয়ান শুরু করা হয়েছে এবং আখেরী যমানার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

১. ইহুদী ও নাসারারা বলত- نَحْنُ أَبْنٰؤُا اللّٰهِ وَأَحِبَّاؤُهُ (আমরা খোদার পুত্র ও প্রিয়জন)। এস্থলে বলা হল, কাফের কখনো আল্লাহর প্রিয় হতে পারে না। যদি সত্যিই প্রিয় হতে চাও তবে তাঁর আদেশ পালন কর, পয়গম্বরের কথা মান এবং আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ কর।
নাজরানের প্রতিনিধি দল এও বলেছিল, আমরা আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার উদ্দেশ্যেই মাসীহ আ.এর ভক্তি ও ইবাদত করে থাকি। এখানে তারও প্রত্যুত্তর হয়ে গেল।

পূর্বা-পর সম্পর্ক
সম্মুখে আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসে এবং আল্লাহও তাদের ভালবাসেন– এমন কয়েকজন বান্দার হাল শোনানো হয়েছে এবং নাজরান-প্রতিনিধিদের বিবেচনা করে হযরত মাসীহ আ.এর ঘটনাবলি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। বস্তুত সামনের আয়াতগুলি সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় আলোচনারই ভূমিকাস্বরূপ।

২. 'ইমরান' দুজন– একজন হযরত মূসা আ. এর পিতা, দ্বিতীয়জন হযরত মারয়ামের পিতা। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে এস্থলে দ্বিতীয় ইমরান উদ্দেশ্য। কারণ, সামনে إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ الخ থেকে এই দ্বিতীয় ইমরানেরই পরিবার-পরিজন অর্থাৎ হযরত মারয়াম ও মাসীহ আ. এর কাহিনী বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এবং সম্ভবত এ কারণেই সূরার নামকরণ হয়েছে 'আলে-ইমরান'।

৩. পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ফেরেশতা, জিন, বৃক্ষ, পাথর ইত্যাদি সবই আল্লাহর সৃষ্টিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তিনি তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও চূড়ান্ত হেকমতের দ্বারা আধ্যাত্মিক নৈপুণ্য ও দৈহিক গুণাবলির যে সমাহার মানব-পিতা আদম আ.এর মধ্যে ঘটিয়েছেন, তা

سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ۚ

সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা[১]।

اِذۡ قَالَتِ امۡرَاَتُ عِمۡرٰنَ رَبِّ اِنِّیۡ نَذَرۡتُ لَكَ مَا فِیۡ بَطۡنِیۡ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلۡ مِنِّیۡ

৩৫. (স্মরণ করুন), যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, 'হে আমার রব! আমার গর্ভে যে সন্তান আছে, আমি আপনার জন্য তার ব্যাপারে মানত করলাম যে, তাকে মুক্ত রাখা হবে। অতএব আপনি আমার পক্ষ থেকে কবূল করুন।

সৃষ্টির আর কেউ পায়নি। হযরত আদম আ.কে ফেরেশতাদের দিয়ে সেজদা করিয়ে এই সত্য প্রকাশ করে দিলেন যে, আল্লাহ তাআলার দরবারে আদমের মান-মর্যাদা সকল সৃষ্টির চেয়ে বেশি। আদম আ. এর জন্য নির্বাচিত ও মনোনীত এই শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য, যাকে আমরা 'নবুওয়াত' বলে থাকি, তাঁর ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা তাঁর আওলাদের মধ্যে নূহ আ.-এর নিকট স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর স্থানান্তরিত হয়ে নূহ আ.-এর আওলাদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত পৌছে।

এখান থেকে এক নতুন ধারার সৃষ্টি হল। হযরত আদম ও নূহ আ.-এর পরে দুনিয়াতে যত লোকই বসবাস করেছে, তারা সকলেই এ দুজনের বংশধর থেকে ছিল– কোন মানবগোষ্ঠী উক্ত দুজনের বংশবহির্ভূত ছিল না। পক্ষান্তরে হযরত ইবরাহীম আ. এর পর তাঁর বংশ ছাড়াও দুনিয়াতে অন্য বংশাবলি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যে আল্লাহ তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির মধ্য থেকে আদমকে মনোনীত করেছিলেন, তিনিই তাঁর সর্বব্যাপী ইলম ও পরিপূর্ণ ক্ষমতার দ্বারা হাজারো বংশের মধ্য থেকে ইবরাহীম আ.-এর বংশকেই সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্থাৎ নবুওয়াতের জন্য বিশেষিত করলেন। ইবরাহীম আ.-এর পরবর্তী নবী-রাসূলগণ সকলেই তাঁর দুই পুত্র হযরত ইসহাক আ. ও ইসমাঈল আ. এর বংশধর থেকে আবির্ভূত হন।

হযরত মাসীহও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশের অন্তর্ভুক্ত

যেহেতু বংশধারা বাপের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, আর হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম বিনা বাপে জন্মলাভ করেছিলেন– এ হিসাবে ধারণা হতে পারত যে, তিনি বুঝি ইবরাহীম আ.-এর বংশভূত নন। এ জন্য আল্লাহ তাআলা এখানে آلَ عِمۡرَانَ ('ইমরানের বংশধর') এবং ذُرِّيَّةً بَعۡضُهَا مِنۡ بَعۡضٍ ('তারা একে অন্যের সন্তানসন্ততি') বলে সতর্ক করে দিলেন যে, হযরত মাসীহ শুধু মায়ের দ্বারা পয়দা হয়েছেন বলে তাঁর বংশধারা মায়ের সঙ্গেই সম্পর্কিত হবে, আল্লাহর সঙ্গে নয় (নাউযুবিল্লাহ)। আর জানা কথা, তাঁর মাতা মারয়াম সিদ্দীকার পিতা ইমরানের বংশধারা হযরত ইবরাহীম আ.এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সুতরাং ইমরানের বংশ হযরত ইবরাহীম আ. এর বংশের শাখাবিশেষ হল এবং ইবরাহীম আ.এর পরবর্তী কোন পয়গম্বরই তাঁর বংশবহির্ভূত হননি।

১. তিনি সকলের দো'য়া ও কথা শোনেন এবং সকলের প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা; যোগ্যতা জানেন। সুতরাং এ ধারণা করা উচিত নয় যে, তিনি খাম-খেয়ালীভাবে নবীদের মনোনীত করে থাকবেন! বস্তুত আল্লাহর প্রত্যেকটি কর্ম পরিপূর্ণ ইলম ও হেকমতভিত্তিক।

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞

নিশ্চয় আপনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[১]।'

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۚ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۞

৩৬. অতঃপর যখন সে কন্যা প্রসব করল, তখন বলল, 'হে আমার রব! আমি তো কন্যাসন্তান প্রসব করেছি[২],' আর আল্লাহ ভাল করেই জানেন, সে কী প্রসব করেছে। আর ছেলে তো সেই মেয়ের মত নয়[৩]। (সে আরো বলল), 'আমি তার নাম রেখেছি মারয়াম এবং তাকে ও তার সন্তানসন্ততিকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয়ে দিচ্ছি[৪]।'

---

১. ইমরানের স্ত্রীর নাম ছিল 'হান্না বিনতে ফাকুযা' (حنّة بنت فاقوذا)। তিনি সে কালের রেওয়াজ অনুযায়ী মানত করতে গিয়ে বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমার পেটে যে বাচ্চা রয়েছে তা আমি আপনার নামে আজাদ করছি। এর অর্থ ছিল, পার্থিব সকল কর্ম-ব্যস্ততা ও বিবাহ-বন্ধন ইত্যাদি থেকে মুক্ত থেকে সে সর্বদা আল্লাহর ইবাদত ও ইবাদতখানার খেদমতে লেগে থাকবে। আয় আল্লাহ! তুমি দয়া করে আমার মানত কবুল কর, তুমি আমার প্রার্থনা শুনছ এবং আমার নিয়ত ও এখলাস জান। এ যেন অতি সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে ছেলে হওয়ার জন্য দো'য়া করলেন। কারণ, উক্ত খেদমতের জন্য মেয়েদের গ্রহণ করা হত না।

২. এ কথা তিনি দুঃখ ও আফসোস করে বললেন। কেননা তার আশা-আকাঙ্ক্ষার খেলাফ ঘটনা ঘটল, আর উক্ত খেদমতে মেয়ে গ্রহণ করার রীতি ছিল না।

৩. এটা (ইমরানের স্ত্রীর কথার) মাঝে পৃথক বাক্য, যা আল্লাহর কথা। অর্থাৎ ইমরানের স্ত্রীর জানা নেই যে, সে কী রত্ন প্রসব করেছে! এ মেয়ের মূল্য ও মর্যাদা একমাত্র আল্লাহই জানেন। তার যে ছেলের আকাঙ্ক্ষা ছিল, সে এই মেয়ের মর্যাদায় কী করে পৌঁছতে পারত। এই মেয়ে নিজেই তো বরকতময়ী ও ভাগ্যবতী, তদুপরি তাঁর অস্তিত্বের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে এক বরকতময় ও ভাগ্যবান মহা মর্যাদাশালী ছেলের অস্তিত্ব।

৪. আল্লাহ তাআলা তার এই দো'য়া কবুল করলেন। হাদীসে আছে, মানবসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শয়তান তাকে স্পর্শ করে, কিন্তু ঈসা আ. ও মারয়াম এর ব্যতিক্রম। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৫৪৮)

হাদীসটির ব্যাখ্যা

অন্যান্য হাদীসের সাথে তুলনা করলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, শিশু মূলত বিশুদ্ধ ফিতরাতের উপর অর্থাৎ সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতার উপর পয়দা হয়, যার প্রকাশ বড় হলে বা বুদ্ধি-বিবেচনা এলে হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক সময় বাইরের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক বেড়াজালে আসল ফিতরত চাপা পড়ে যায়। একেই হাদীসে فأبواه يهوّدانه أوينصّرانه (অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী বা নাসরানী বানায়) বলে প্রকাশ করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৩৫৯) আর যেভাবে ঈমান ও আনুগত্যের বীজ শিশুর ফিতরত-রত্নের মধ্যে

৩৭. অতএব তাঁর রব তাঁকে উত্তমরূপে কবূল করলেন, তাঁকে উত্তমরূপে লালন-পালন করলেন এবং তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করলেন[১]। যখনই যাকারিয়া তাঁর নিকট

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا

অদৃশ্যভাবে রেখে দেওয়া হয়, যদিও তখন ঈমান তো দূরের কথা, মোটা মোটা বিষয়ের উপলব্ধিও তার থাকে না– তদ্রূপ জন্মের পর পরই শয়তানের স্পর্শের মাধ্যমে বাইরের পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাবও অলক্ষ্যে সূচিত হয়ে থাকে। তবে এটা জরুরী নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই এই শয়তানী স্পর্শের ক্রিয়া গ্রহণ করবে বা গ্রহণ করলে ভবিষ্যৎ জীবনেও তা অক্ষুণ্ন থেকে যাবে।

উক্ত হাদীস দ্বারা হযরত মারয়াম ও ঈসা (আ.)-এর সামগ্রিক ফজীলত প্রমাণিত হয় না

নবীগণ সকলেই মাসূম বা নিষ্পাপ। তাঁদের নিষ্পাপ থাকার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন। এখন ধরা যাক, যদি জন্ম-মুহূর্তে তাঁরাও উক্ত বিষয়ের সম্মুখীন হয়ে থাকেন এবং মারয়াম ও ঈসা আ.-এর মত তাঁরা এই নিয়মের ব্যতিক্রম না হয়ে থাকেন, তবুও এই পবিত্র ও নিষ্পাপ বান্দাদের উপর শয়তানের উক্ত স্পর্শের কোনই ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে না। অতএব (ঈসা-মারয়াম ও অন্য নবীগণের মাঝে) পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, মারয়াম ও ঈসা আ. কোন মঙ্গলহেতু আদৌ ওই বিষয়ের সম্মুখীন হননি। অন্য নবীগণ সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু কোনই প্রভাব পড়েনি। আর এ ধরনের শাখাগত বৈশিষ্ট্য সামগ্রিক ফযীলতের কারণ হতে পারে না।

হাদীসে আছে– দুটি ছোট বালিকা কিছু গীত গাচ্ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হযরত আবূ বকর রা. আসলেন, কিন্তু বালিকারা যথারীতি গেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর হযরত উমর আসলে তারা দৌড়ে পালিয়ে গেল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'উমর যে রাস্তায় চলে শয়তান সেই রাস্তা ছেড়ে ভেগে যায়।' এর দ্বারা কি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ কথা বুঝতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমরকে নিজ থেকে শ্রেয় সাব্যস্ত করেছেন? (সহীহ বুখারী, হাদীস : ২৯০৬, ৬০৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৩৯৬; জামে তিরমিযী, হাদীস : ৪০২২)

উল্লেখ্য, আবূ হুরায়রা রা. বর্ণিত শয়তান-স্পর্শের উল্লিখিত হাদীসকে বর্তমান আয়াতের তাফসীর হিসাবে পেশ করা বাহ্যত প্রাসঙ্গিক মনে হয় না। অবশ্য যদি وإني أعيذها بك আয়াতে واو অব্যয়কে ক্রমিকতার জন্য না ধরা হয়, অথবা হাদীসের মধ্যে যে ব্যতিক্রমের কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা শুধু ঈসা আ. এর হযরত মারয়ামের গর্ভে পয়দা হওয়ার ঘটনাকে উদ্দেশ্য করা হয়– মারয়াম ও ঈসা আ.-কে পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য না করা হয়, তবে ভিন্ন কথা। যেমন: বুখারী শরীফের এক হাদীসে শুধু হযরত ঈসা আ. এর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে।

১. মেয়ে হলেও মারয়ামকে আল্লাহ তাআলা ছেলের চেয়ে বেশি সমাদরে কবূল করলেন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের সেবকদের অন্তরে আকর্ষণ সঞ্চার করলেন, যেন তাঁরা সাধারণ রীতির

رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٣٧

কক্ষে আসতেন, তাঁর নিকট কোন খাদ্য পেতেন[১]। তিনি বললেন, 'হে মারয়াম! এ তোমার নিকট কোথা থেকে আসে?' তিনি বললেন, 'এ আল্লাহর নিকট থেকে (আসে), নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন[২]।'

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ۝٣٨

৩৮. সেখানেই* যাকারিয়া স্বীয় রবের নিকট দো'য়া করলেন, বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে আপনার নিকট থেকে পবিত্র বংশধর দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবনকারী[৩]।'

খেলাফ মেয়েকে গ্রহণ করে নেন। তদুপরি তিনি মারয়ামকে আকর্ষণীয় বানালেন এবং স্বীয় মকবূল বান্দা (নবী) যাকারিয়ার দায়িত্বে দিলেন এবং নিজ দরবারে কবূলিয়তের মর্যাদা দান করলেন। মারয়ামকে দৈহিক, নৈতিক, ইলমী, আখলাকী– সর্বদিক দিয়ে অসাধারণ উৎকর্ষতা দান করলেন।

তাঁর লালন-পালন কে করবে– এই নিয়ে খাদেমদের মধ্যে মতভেদ হলে লটারীতে হযরত যাকারিয়া আ.-কে জিতিয়ে দিলেন, যাতে মারয়াম নিজ খালা ও নবী-পত্নীর স্নেহ-মমতায় শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ এবং নবীর ইলম ও দীনদারীর ফায়দা হাসিল করতে পারেন। সে মত যাকারিয়া আ. মারয়ামের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন ও তার যত্ন নেন এবং যখন বড় হলেন তখন তাঁর জন্য মসজিদসংলগ্ন একটি খাস কক্ষের ব্যবস্থা করে দিলেন। তাতে মারয়াম দিনভর ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন এবং রাত খালার ঘরে কাটাতেন।

১. পূর্ববর্তী অধিকাংশ মুফাসসিরের নিকট رِزْقًا বলতে বাহ্যিক খাদ্য উদ্দেশ্য, (রূহানী বস্তু নয়)। মারয়ামের নিকট অমৌসুমী ফলমূল আসত– গ্রীষ্মের ফল শীতে, শীতের ফল গ্রীষ্মে। আর মুজাহিদ (র) এর এক বর্ণনা মত 'রিযক' দ্বারা এস্থলে জ্ঞান-প্রজ্ঞার সহীফাসমূহ উদ্দেশ্য– যাকে আত্মিক খোরাক বলা উচিত।

যা হোক, মারয়ামের বরকত, কারামত ও অলৌকিক নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে প্রকাশ হতে শুরু করল। এসব বার বার দেখার পর যাকারিয়া আ. চুপ থাকতে না পেরে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মারয়াম! এসব জিনিস তোমার নিকট কোত্থেকে আসে?'

২. অর্থাৎ আল্লাহর কুদরতে এ সকল জিনিস আমার নিকট এমনভাবে পৌছে, যা ধারণা-চিন্তার বাইরে।

* **দ্বিতীয় তরজমা– 'তখন'।**

৩. হযরত যাকারিয়া আ. একেবারে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা, সন্তান লাভের বাহ্যিক কোন আশাই ছিল না। মারয়ামের নেকী ও বরকত এবং এই অসাধারণ কারামত

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৩৯. অতএব ফেরেশতাগণ তাঁকে ডেকে বললেন –যখন তিনি (মারয়ামের) কক্ষে নামাযে দণ্ডায়মান ছিলেন- 'আল্লাহ আপনাকে ইয়াহয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন[১], যিনি হবেন আল্লাহর একটি হুকুমের সমর্থনকারী*[২], নেতা, অত্যন্ত সংযমী[৩] এবং হবেন নবী, পুণ্যবানদের একজন[৪]।'

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝

৪০. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! কীভাবে আমার পুত্র হবে, অথচ আমার তো বার্ধক্য এসে গেছে, আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা?' আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'এরূপই (হবে)! আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন[৫]।'

দর্শনে হঠাৎ তাঁর অন্তরে জোশ উঠল এবং তাৎক্ষণিক আগ্রহের উদয় হল যে, আমিও সন্তান লাভের দো'য়া করি না কেন! আশা করি, আমিও বে-মৌসুমী ফল লাভ করব অর্থাৎ বার্ধক্যে সন্তান লাভে ধন্য হব।

১. হযরত যাকারিয়া আ.এর দো'য়া কবুল হল এবং সুসংবাদ পাওয়া গেল যে, ছেলে হবে– যার নাম রাখা হল ইয়াহইয়া।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'কালিমাতুল্লাহ' অর্থাৎ ঈসা (আ.)-এর সমর্থনকারী'।

২. 'একটি হুকুম' বলতে এখানে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম উদ্দেশ্য– যিনি খোদার হুকুমে ('كن'- 'হও', কলেমা দ্বারা) বিনা বাপে পয়দা হন। হযরত ইয়াহইয়া আ. লোকদের পূর্ব থেকেই সংবাদ দিচ্ছিলেন যে, মাসীহ আ. পয়দা হবেন।

৩. অর্থাৎ (ইয়াহয়া) ভোগ-বিলাস ও যৌনচাহিদার বিষয়ে হবেন অত্যন্ত সংযমী। আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগীতে এতই নিমগ্ন থাকবেন যে, নারীর প্রতি মনোযোগ দেওয়ারই অবকাশ হবে না।

এ ছিল ইয়াহয়া আ.-এর বিশেষ হাল (বা অবস্থা)– যার দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কোন নীতি নির্ধারণ করা যায় না। আমাদের পয়গম্বর আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি চরম সামাজিকতার সাথে পরম আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন।

৪. অর্থাৎ পুণ্য ও হেদায়েতের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হবেন, যাকে নবুওয়াত বলা হয়। অথবা صالح এর অর্থ شائستہ নেওয়া যায় অর্থাৎ অত্যন্ত পরিশীলিত হবেন।

৫. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কুদরত ও ইচ্ছা উপায়-উপকরণের অধীন নয়, যদিও সৃষ্টজগতে তাঁর স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, কার্য-কারণের মাধ্যমেই সব কিছু সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবুও ক্ষেত্রবিশেষে উক্ত নিয়মের খেলাফ অস্বাভাবিকভাবে কোন কিছু সৃষ্টি করাও তাঁর বিশেষ নিয়ম।

৪১. যাকারিয়া বললেন, 'হে আমার রব! আমার জন্য কোন নিদর্শন স্থির করে দিন[১]।' তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন লোকজনের সাথে ইশারা ছাড়া কোন কথা বলতে পারবে না[২]। আর তুমি স্বীয় রবকে খুব বেশি স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায় ও সকালে তাসবীহ পড়[৩]।'

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۝

[রুকূ - ৫]

৪২. (স্মরণ কর), যখন ফেরেশতাগণ বললেন,

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ

আসল কথা হল, পুণ্যবতী মারয়ামের নিকট অলৌকিকভাবে রিযিকের আগমন এবং অপরাপর অস্বাভাবিক ঘটনার প্রকাশ আর এসব দেখে মারয়ামের কক্ষে হযরত যাকারিয়া আ. এর প্রার্থনা করা, অতঃপর তাঁর ও তাঁর বন্ধ্যা স্ত্রীর এই বার্ধক্যে অস্বাভাবিকভাবে সন্তান-লাভ– এসব নিদর্শনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর সেই আজীমুশশান নিদর্শনেরই ভূমিকা মনে করতে হবে, যা অদূর ভবিষ্যতে স্বামীর স্পর্শ ছাড়াই মারয়ামের অস্তিত্ব থেকে প্রকাশ পাওয়ার ছিল। বলতে গেলে, হযরত ইয়াহইয়া আ.এর অস্বাভাবিক জন্মপ্রসঙ্গে كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَايَشَاءُ ('এভাবেই আল্লাহ যা চান, তা করেন।') বাক্যটি বলা كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ ('এভাবেই আল্লাহ যা চান, তা সৃষ্টি করেন।') এর ভূমিকাস্বরূপ, যা হযরত ঈসা আ.-এর অস্বাভাবিক জন্মপ্রসঙ্গে একটু পরেই বলা হবে।

১. যার দ্বারা বোঝা যাবে যে, গর্ভসঞ্চার হয়েছে। এতে সন্তান জন্মের নিকটবর্তীতার আলামত দেখে নতুন আনন্দ লাভ করব এবং নে'য়ামতের শুকরিয়া আদায়ে বেশি বেশি মগ্ন হতে পারব।

২. অর্থাৎ যখন তুমি তিন দিন ও রাত ইশারা ছাড়া মানুষের সঙ্গে কোন কথা বলতে না পারবে এবং তোমার জবান একমাত্র আল্লাহর যিকিরের জন্য উৎসর্গিত হয়ে যাবে, তখন বুঝবে, গর্ভসঞ্চার হয়েছে। সুবহানাল্লাহ! এমন নিদর্শনই নির্ধারণ করে দিলেন, যা একদিকে নিদর্শনও বটে, অপর দিকে গর্ভ বুঝতে পারার যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ নে'য়ামতের শোকর– এর দ্বারা তাও পরিপূর্ণরূপে হাসিল হবে। কেননা, কথা বলতে না পারার কারণে পুরো সময় যিকিরে কাটাবে।

৩. অর্থাৎ এই সময়টিতে আল্লাহ তাআলার যিক্র বেশি বেশি করা চাই এবং সকাল-বিকালে তাসবীহ-তাহলীলে রত থাকা উচিত।

মনে হয়, সেই দিনগুলিতে যাকারিয়া আ. এর কথা বলার তো ক্ষমতাই ছিল না, যাতে তিনি একমাত্র যিকির-শুগলের জন্য ফারেগ থাকতে পারেন; তবে খোদ যিকির- ফিকিরের বিষয়টা এমন বাধ্যতামূলক ছিল না যে, তার অন্যথা করার সামর্থ্যই নেই। তাই তাঁকে যিকির-তাস্বীহের এই আদশে দেওয়া হল।

اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ۝

'হে মারয়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন, পাক-পবিত্র করেছেন এবং সমগ্র বিশ্বের নারীদের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন[১]।

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ۝

৪৩. 'হে মারয়াম! আপন রবের ইবাদত কর ও সেজদা কর[২] এবং রুকু'কারীদের সঙ্গে রুকু' কর[৩]।'

---

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

মাঝখানে হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া আ.এর আলোচনা এসে গিয়েছিল, যে আলোচনায় ইমরানের বংশধরের মনোনয়নের বিষয়টি অধিক সুস্পষ্ট হয়েছে এবং যে আলোচনা মূলত হযরত ঈসা আ.এর কাহিনীর ভূমিকাস্বরূপ ছিল। এখন পুনরায় আলোচনার রোখ্ মারয়াম ও ঈসার ঘটনার দিকে ফেরানো হচ্ছে। সে মত ঈসা আ. এর পূর্বে তাঁর মাতা মারয়ামের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্যের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

সারমর্ম

ফেরেশতাগণ মারয়ামকে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আপনাকে প্রথম দিন থেকেই বাছাই করেছেন– মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে তাঁর প্রিয়পাত্রী হিসেবে কবূল করেছেন, নানা রকম উচ্চ হালত ও উন্নত কারামত দান করেছেন এবং নিষ্কলুষ চরিত্র, পাক তবী'য়ত, জাহেরী ও বাতেনী পবিত্রতা দান করে স্বীয় মসজিদের খেদমতের যোগ্য বানিয়েছেন। এবং আপনাকে কোন কোন দিক দিয়ে বিশ্বের নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন'। যেমনঃ তাঁকে এমন যোগ্যতা দিয়েছেন যে, পুরুষের মিলন ছাড়া তাঁর একক অস্তিত্ব থেকে হযরত ঈসা আ.-এর মত উচ্চ মর্যাদার পয়গম্বর পয়দা হয়েছে। এরূপ বৈশিষ্ট্য বিশ্বের আর কোনো নারীই হাসিল করেনি।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেহেতু আপনাকে এমন সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, অতএব আপনার উচিত সর্বদা এখলাস ও বিনয়-ভক্তির সাথে স্বীয় পরওয়ারদেগারের সামনে অবনত হয়ে থাকা এবং দাসত্ব প্রকাশক আমলাদিতে বেশি বেশি লেগে থাকা, যাতে আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে মহাঘটনার মাধ্যম হিসাবে মনোনীত করেছেন, তার বাস্তবায়ন ঘটে।

৩. রুকুকারীগণ যেভাবে আল্লাহর সামনে রুকু করে, আপনিও তেমনি রুকু করতে থাকুন। অথবা অর্থ এই যে, জামাতের সাথে নামায পড়ুন। যেহেতু ইমামের সঙ্গে রুকুতে শরীক হতে পারলেই সেই রাকাত পেয়েছে বলে ধরা হয়, সম্ভবত এ কারণেই রুকু বলে নামায বোঝানো হয়েছে। ইবনে তাইমিয়ার 'ফাতাওয়া' এর আলোচনা থেকে এমনই বোঝা যায়। والله أعلم

আয়াতের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী اقْنُتِيْ এর অর্থ কেয়াম ধরলে নামাযের তিনটি অবস্থা যথা, কেয়াম, রুকু ও সেজদা সবই আয়াতে এসে যায়।

বি. দ্র. সম্ভবত সেই যুগে সাধারণভাবেই মেয়েদের জন্য জামাতে শরীক হওয়া জায়েয ছিল, অথবা ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকার অবস্থায় অনুমতি ছিল। অথবা মারয়ামের বিশেষত্ব

৪৪. এসব অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ, যা আমি আপনার নিকট ওহী করি[১]। আর আপনি তাদের কাছে ছিলেন না যখন তারা তাদের কলম (পানিতে) নিক্ষেপ করছিল (এটা জানার জন্য) যে, তাদের মধ্যে কে মারয়ামকে লালন-পালন করবে? এবং তখনো আপনি তাদের কাছে ছিলেন না যখন তারা বিবাদ করছিল[২]।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۠ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝٤٤

৪৫. (স্মরণ কর), যখন ফেরেশতারা বলল, 'হে মারয়াম! আল্লাহ তোমাকে তাঁর 'কালিমা'-র সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম মাসীহ ঈসা ইবনে মারয়াম, (যিনি হবেন) দুনিয়া ও আখেরাতে মর্যাদাবান এবং (আল্লাহর)

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا

হিসাবে শুধু তাঁর জন্য জামাতে শরীক হওয়া জায়েয ছিল। অথবা মারয়াম স্বীয় কক্ষে থেকেই একাকী বা অন্য মেয়েদেরসহ ইমামের ইকতেদা করে থাকবেন। আয়াতের মধ্যে সকল সম্ভাবনাই রয়েছে।

১. অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখাপড়াও জানতেন না এবং পূর্ব থেকে কিতাবীদের সাথে উল্লেখযোগ্য কোন সংশ্রবও রাখেননি, যাতে অতীত কালের এমন সত্য ও সঠিক ঘটনাবলির বর্ণনা দিতে পারেন। আর সংশ্রব থাকলেই বা কী হত, তারা নিজেরাই তো কল্পনা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। কেউ বা শত্রুতাবশে, কেউ বা ভক্তির আতিশয্যে সত্য ঘটনাবলিকে বিকৃত করে রেখেছিল। সুতরাং অন্ধের চোখ থেকে আলো পাওয়ার কী আশা ছিল? এরূপ অবস্থায় মক্কী ও মাদানী উভয় প্রকার সূরার মধ্যে এমন ঘটনাবলি এত সত্যতা, ব্যাপকতা ও তফসীলের সাথে শোনানো, যা (আসমানী) কিতাবের ইলমের বড় বড় দাবিদারকে বিস্ময়াভিভূত করে দেয় এবং কারো অস্বীকার করার উপায় থাকে না– এটা এই সত্যেরই সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উক্ত ইলম ওহীর মাধ্যমে দান করা হয়েছে। কেননা, তিনি উক্ত ঘটনাবলি নিজ চোখেও দেখেননি এবং ইলম হাসিল করার বাহ্যিক কোন মাধ্যমও তাঁর ছিল না।

২. হযরত মারয়ামকে মানতরূপে গ্রহণ করার পর তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব কে নেবেন– এ নিয়ে মসজিদের খাদেমদের মধ্যে বিবাদ হল। শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে লটারি হল–তারা সকলে যে যে কলম দিয়ে তাওরাত লিখতেন, সেই কলমগুলি প্রবাহিত পানিতে নিক্ষেপ করলেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যার কলম স্রোতের অনুকূলে না গিয়ে প্রতিকূলে যাবে তারই অধিকার সাব্যস্ত হবে। এ লটারিতে হযরত যাকারিয়া আ.-এর নাম উঠল এবং সে মত মারয়াম তাঁরই লালন-পালনের অধীনে আসলেন।

নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন^১।	وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ۝

১. **হযরত ঈসা (আ.)-কে كلمة الله বলার তাৎপর্য**

এস্থলে এবং কুরআন-হাদীসের আরো কয়েক স্থানে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামকে كلمة الله (কালিমাতুল্লাহ) বলা হয়েছে। সূরা নিসার ১৭১নং আয়াতে আছে– إِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقٰهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ('নিশ্চয় মাসীহ ঈসা ইবনে মারয়াম আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বাণী, যা তিনি নিক্ষেপ করেছিলেন মারয়ামের প্রতি, এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ।')

আল্লাহর কালিমা তো অসংখ্য, যেমন সূরা কাহাফে ১০৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে– قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ('আপনি বলুন, 'আমার রবের কথাগুলো (লেখার) জন্য যদি সমুদ্র কালি হয়ে যায়, তবে অবশ্যই আমার রবের 'কালিমাসমূহ' শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, যদিও আমি তার সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র নিয়ে আসি।') কিন্তু বিশেষ করে হযরত মাসীহকে كلمة الله এই হিসাবে বলা হয়েছে যে, পিতার মাধ্যম ছাড়া সাধারণ কার্য-কারণের নিয়মের খেলাফ শুধু খোদার হুকুমে তাঁর জন্ম হয়েছিল। আর যে কাজ সাধারণ নিয়মবহির্ভূত হয়, সাধারণত তাকে সরাসরি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়, যেমন সূরা আনফালের ২য় রুকুতে (আয়াত ১৭) আল্লাহ বলেছেন– وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللهَ رَمٰى ('আপনি মাটির মুষ্টি নিক্ষেপ করেননি, যখন (তা) নিক্ষেপ করেছিলেন, বরং আল্লাহ তা নিক্ষেপ করেছিলেন।')

مسيح– শব্দের অর্থ

আসল হিব্রু ভাষায় مسيح এর রূপ ছিল ماشيح বা مشيحا; যার অর্থ মোবারক (বরকতময়), আরবীতে রূপান্তরিত হয়ে তা مسيح হয়েছে। বাকী দাজ্জালকে যে 'মাসীহ' বলা হয়, তা সর্বসম্মতরূপে আরবী শব্দ, তার এই নামকরণের কারণ সংশ্লিষ্ট স্থানে কয়েকভাবে বলা হয়েছে। মাসীহ আ. এর দ্বিতীয় নাম বা লকব হচ্ছে عيسى যা আসল হিব্রু ভাষায় ছিল ايشوع আরবীতে عيسى রূপ ধারণ করেছে, যার অর্থ হচ্ছে سيّد (সর্দার)।

এ বিষয়টি বিশেষভাবে চিন্তা করার যে, কুরআনুল কারীম এস্থলে ابن مريم (ইবনু মারয়াম)-কে হযরত মাসীহর নামের অংশ হিসাবে উল্লেখ করেছে। এর কারণ কী? মারয়ামকে সুসংবাদ শোনানোর সময় এ কথা বলা যে, তার নাম মাসীহ ইবনে মারয়াম– নিশ্চয় এর উদ্দেশ্য তাঁর পরিচয় বর্ণনা করা নয় (কারণ, মারয়ামের তো এটা জানাই আছে)। সুতরাং 'ইবনে মারয়াম' উল্লেখের কারণ কী? আসলে এর দ্বারা সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, বাপ না থাকার কারণে তাঁর সম্পর্ক কেবল মায়ের সঙ্গেই হবে। এমন কি, মানব জাতিকে খোদার এ বিস্ময়কর নিদর্শন সদা-সর্বদা স্মরণ করানো এবং মারয়ামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য একে যেন নামের অংশ বানিয়ে দেওয়া হল।

৪৬. 'এবং যিনি লোকজনের সঙ্গে কথা বলবেন কোলে থাকাবস্থায় ও পূর্ণ বয়স্ক হয়ে, আর যিনি হবেন পুণ্যবানদের একজন[১]।'

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

উক্ত সুসংবাদ শুনে মানুষ হিসাবে মারয়ামের এই পেরেশানী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যে, বিশ্ববাসী কী করে মেনে নেবে যে, একাকী নারী দ্বারা ছেলে পয়দা হয়েছে? অগত্যা তারা আমাকে অপবাদ দেবে এবং সন্তানকে চিরদিন দুর্নাম করে কষ্ট দেবে। আমি কীভাবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করব? এ জন্য সম্মুখে وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ বলে নিশ্চিন্ত করলেন যে, আল্লাহ তাঁকে কেবল আখেরাতেই নয় বরং দুনিয়াতেও উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন এবং শত্রুদের সকল অপবাদ মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে দেবেন।

এস্থলে وجيه শব্দের অর্থ সেই রকম, যেমন মূসা আ. সম্পর্কে সূরা আহযাবে (৬৯) বলা হয়েছে يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ آذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ('হে ঈমানদারগণ! তোমরা ওদের মত হয়ো না, যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল, তার পর আল্লাহ তাঁকে ওদের কথন (রটনা) থেকে নির্দোষ প্রমাণ করে দিলেন এবং তিনি ছিলেন আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান।') বলা যায়, যাদের وجيه বলে ঘোষণা করা হয়, তাঁদের আল্লাহ তাআলা মিথ্যা অপবাদ ও অভিযোগ থেকে নির্দোষ প্রমাণ করে থাকেন।

সুতরাং হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের বংশ সম্পর্কে যে নিকৃষ্টরা কটূক্তি করবে, অথবা খোদাকে বা কোন মানুষকে অযথা তাঁর জনক বলবে, অথবা সত্যের খেলাফ এ কথা বলবে যে, তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে বা তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, অথবা ঈশ্বরত্ব বা ঈশ্বর-পুত্রত্ব ইত্যাদি বাতিল আকীদার শিরেকী শিক্ষা প্রদানকে তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত করবে– এ ধরনের সমস্ত অভিযোগ থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রকাশ্যভাবে নির্দোষ প্রতিপন্ন করবেন এবং তাঁর মান-মর্যাদা ও পাক-পবিত্রতা বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ করে দেবেন। জন্ম ও নবুওয়াত লাভের পর দুনিয়াতে তাঁর যে মর্যাদা লাভ হয়েছিল, এর পূর্ণতা সাধিত হবে পুনরায় দুনিয়াতে অবতরণের পর। এ-ই হচ্ছে আহলে ইসলামের সর্বসম্মত আকীদা।

অতঃপর আখেরাতে সূরা মায়েদার (আয়াত : ১১৬) বর্ণনা অনুযায়ী বিশেষভাবে তাঁকে ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِي الخ ('হে ঈসা ইবনে মারয়াম! তুমি কি লোকদের বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমাকে ও আমার মাকে দুজন মা'বূদ সাব্যস্ত করে নাও?')– এ প্রশ্ন করে এবং বিশেষ বিশেষ নে'য়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পূর্বাপর সমগ্র সৃষ্টিকুলের সম্মুখে তাঁর মান-মর্যাদার প্রকাশ ঘটানো হবে।

তদুপরি, তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হবেন শুধু তাই নয়, বরং তিনি আল্লাহ তাআলার সবিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে পরিগণিত হবেন– ومن المقربين।

১. অর্থাৎ তিনি খুবই শরীফ ও উচ্চ পর্যায়ের নেককার হবেন। আর প্রথমত মায়ের কোলে ও পরে বড় হয়ে বিস্ময়কর কথা-বার্তা বলবেন।

৪৭. মারয়াম বলল, 'হে আমার রব! কেমন করে আমার সন্তান হবে, অথচ আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি১?' তিনি বললেন, 'এভাবেই! আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোন বিষয় সম্পাদন (করার ইচ্ছা) করেন, তখন তাকে কেবল বলেন,

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ

এ কথাগুলির দ্বারা বস্তুত মারয়ামের জন্য পূর্ণ সান্ত্বনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপরোক্ত সুসংবাদসমূহ শুনে তাঁর এ ধারণা হতে পারত যে, মান-মর্যাদা তো কোন এক সময় হাসিল হবে, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে তো (বিনা বাপে) জন্মের পরই অপবাদের শিকার হতে হবে। তখন আমার আত্মরক্ষার কী উপায় হবে? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে– ঘাবড়িয়ো না, তোমাকে মুখ খুলতে হবে না, বরং শুধু এতটুকু বলে দিয়ো যে, আজ আমি রোযা রেখেছি, কথা বলতে পারি না। বাচ্চা নিজেই উত্তর দেবে। সূরা মারয়ামে এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

একটি অপব্যাখ্যা ও তার জবাব

কতক অপব্যাখ্যাকারীর মতে وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا দ্বারা মারয়ামকে শুধু এই সান্ত্বনা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল যে, ছেলে বোবা হবে না বরং আর সকল ছেলের মতই বাল্যকালে ও পরিণত বয়সে কথা বলবে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, হাশরের ময়দানেও লোকেরা হযরত ঈসা আ.কে এই বলে সম্বোধন করবে– يَا عِيْسٰى أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ وَكَلِمَتُه أَلْقٰهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ('হে ঈসা! তুমি আল্লাহর রাসূল ও তাঁর কালিমা, যা তিনি মারয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তাঁর [সৃষ্ট বিশেষ] রূহ। তুমি শৈশবে দোলনায় কথা বলেছিলে') এবং স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও কিয়ামতের দিন বলবেন- اُذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ('তোমার প্রতি ও তোমার মায়ের প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছিলাম, তুমি কোলে ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলতে—মায়েদা : ১১০)' প্রশ্ন হচ্ছে, তবে কি সেখানেও এই বিশেষ নিদর্শন বয়ান করার উদ্দেশ্য মারয়ামকে নিশ্চিত করা যে, ছেলে বোবা নয় বরং সাধারণ ছেলেদের মতই কথা বলতে পারবে? (নিশ্চয় না। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে, আয়াতে মূলত হযরত ঈসা আ. এর মুজেযা বয়ান করা হয়েছে যে, তিনি কোলে থাকাবস্থায় অস্বাভাবিক উপায়ে কথা বলবেন—অনুবাদক)।

১. বোঝা গেল, তিনি সুসংবাদের দ্বারা এ-ই বুঝলেন যে, বর্তমান অবস্থাতেই ছেলে হবে; নতুবা বিস্ময় প্রকাশের কী ছিল?

كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

'হও' অমনি তা হয়ে যায়[১] ।'

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۝

৪৮. আর আল্লাহ তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব, প্রজ্ঞা, তাওরাত ও ইনজীল[২] ।

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّيْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ

৪৯. এবং (তাকে) বনী ইসরাঈলের নিকট রাসূল বানিয়ে (পাঠাবেন। আর তিনি বলবেন), 'আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি[৩]। (তা এই) যে, আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতি বানাই[৪],

---

১. অর্থাৎ এভাবেই মানুষের স্পর্শ ছাড়া হয়ে যাবে। স্বাভাবিক নিয়মের খেলাফ বলে আশ্চর্য হয়ো না। আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করেন এবং যেভাবে চান পয়দা করে দেন– তাঁর কুদরতের কোন সীমা নেই। এক কাজের এরাদা করলেন আর তা হয়ে গেল। তিনি উপাদানেরও মুখাপেক্ষী নন, সাধারণ নিয়ম-নীতিরও নন।

২. অর্থাৎ তাকে লেখা শিক্ষা দেবেন, অথবা ব্যাপকভাবে সকল আসমানী কিতাবের এবং বিশেষভাবে তাওরাত ও ইন্‌জীলের ইলম দান করবেন, আর অতি গভীর হেকমতের কথা শিখাবেন, অন্তরে ঢেলে দেবেন।

অধমের (মুফাসসিরের) মতে কিতাব ও হেকমতের দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহ্ উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, হযরত ঈসা আ. (শেষকালে আসমান থেকে) অবতরণ করে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্ অনুযায়ী পথ-নির্দেশ করবেন। আর এটা তখনি হতে পারে যখন এ উভয়ের ইলম তাঁকে প্রদান করা হবে।

৩. পয়গম্বর হয়ে স্বজাতি বনী ইসরাঈলের নিকট এ কথা বলবেন।

৪. কেবল আকার-আকৃতি বানানোকে خلق বা সৃষ্টি শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে নিতান্তই বাহ্যিক হিসাবে। যেমন, সহীহ হাদীসের মধ্যে মামুলি তাসবীর (বা ছবি অঙ্কন)-কে خلق শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে বলা হয়েছে– احيوا ماخلقتم (তোমরা যা সৃষ্টি করেছ, তাতে প্রাণ দাও।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ২১০৫) তদ্রূপ আল্লাহ তাআলাকে أحسن الخالقين (সর্বোত্তম স্রষ্টা) বলে অভিহিত করা হয়েছে, যার দ্বারা বোঝা গেল, শুধু বাহ্যিক অবস্থার হিসাবে গাইরুল্লাহর জন্যও এ শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে– যদিও 'সৃষ্টি'-র প্রকৃত অর্থ হিসাবে আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কাউকে خالق বলা যায় না। সম্ভবত এ জন্যই এখানে أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّيْنِ طَيْرًا 'আমি মাটি দিয়ে পাখি সৃষ্টি করি' না বলে বরং বলেছেন 'আমি মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি বানিয়ে ওতে ফুৎকার দেই, অতঃপর তা আল্লাহর হুকুমে পাখি হয়ে যায়।'

الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا

অতঃপর তাতে ফুঁ দেই, ফলে তা আল্লাহর হুকুমে পাখি হয়ে যায়। আর আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করি এবং মৃতদের জীবিত করি আল্লাহর হুকুমে।[১] আর তোমাদের

যা হোক, হযরত ঈসা আ. উক্ত মুজেযা দেখালেন। বরং বলা হয় যে, তাঁর দ্বারা বাল্যকালেই নিদর্শনরূপে এই মুজেযা প্রকাশ পায়, যাতে অপবাদ আরোপকারীদেরকে আল্লাহ তাআলার কুদরতের একটি সামান্য নমুনা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, আমার ফুৎকারে যেমন আল্লাহ তাআলা মাটির প্রাণহীন আকৃতিকে প্রাণী বানিয়ে দেন, তেমনি যদি তিনি মানব-স্পর্শ ছাড়াই শুধু জিবরাঈল ফেরেশতার ফুৎকার দ্বারা এক সতী-সাধ্বী নারীর গর্ভে ঈসা আ.এর রূহ ফুঁকে দেন, তবে তাতে আশ্চর্যের কী আছে? বরং হযরত মাসীহ যেহেতু জিবরাঈলের ফুৎকারে পয়দা হয়েছেন, অতএব মাসীহ আ.-এর এই ফুৎকারকে এই বিশেষ ধরনের জন্মেরই ক্রিয়া মনে করা উচিত।

সূরা মায়েদার শেষের দিকে হযরত মাসীহ আ. এর এসব মুজেযা ও অলৌকিকতা সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হবে। তা দ্রষ্টব্য। সারকথা এই যে, হযরত মাসীহ আ.এর মধ্যে ফেরেশতাসুলভ ও রূহানী গুণাবলির প্রাচুর্য ছিল বলে এরই অনুকূল ক্রিয়াদি তাঁর থেকে প্রকাশ পেত। কিন্তু যদি ফেরেশতার উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব থেকে থাকে এবং যদি আদি-পিতা (হযরত আদম আ) ফেরেশতাদের সেজদাপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তবে যার মধ্যে সমগ্র মানবীয় গুণাবলি (তথা সমস্ত আত্মিক ও দৈহিক কামালাত)-এর সমন্বয় পূর্ণরূপে ঘটেছে– তিনি হযরত মাসীহ থেকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠতর হবেন, এতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। বলা বাহুল্য, এমনি কামালাতের ধারক ও বাহক পবিত্র সত্তা হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই পবিত্র সত্তা।

১. সেই যুগে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের খুব প্রভাব ছিল। তাই মাসীহ আ.-কে এমন মুজেযাসমূহ দান করা হয়, যেগুলি মানুষের নিকট তাদের সবচেয়ে বেশি গৌরবময় শাস্ত্রে হযরত মাসীহ এর সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। মৃতকে জীবিত করা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার গুণ, যা باذن الله ('আল্লাহর হুকুমে') -এই শর্তটি দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত। কিন্তু মাধ্যম হওয়ার কারণে মাসীহ আ. একে সম্প্রসারিত করে নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন।

একটি অবাস্তব দাবি

এ কথা বলা যে, আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে অথবা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে ঘোষণা করেছেন যে, কখনো কোন মৃতকে দুনিয়াতে পুনর্জীবিত করা হবে না –নিছক দাবি মাত্র, এর কোনই প্রমাণ নেই। আর কুরআনে (যুমার : ৪৩) فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ ('অতঃপর তিনি যাদের ব্যাপারে মৃত্যুর ফয়সালা করেছেন, তাদের রূহ রেখে দেন।') বলা হয়েছে, এর দ্বারা যদি বোঝানো হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তাআলা মৃতের রূহকে আটক করেন এবং ঘুমন্ত ব্যক্তির রূহকে সেভাবে আটক করেন না– তবে এ কথা কোথায় বলেছেন যে, এই আটক করার পর পুনর্বার রূহকে ছেড়ে দেওয়ার ইখতিয়ার তাঁর থাকে না?

تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ؁

জানিয়ে দেই যা তোমরা খাও ও যা তোমরা নিজেদের ঘরে মজুদ করে রাখ[১]। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ

৫০. 'আর (আমি এসেছি) আমার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সমর্থনকারীরূপে। এবং এজন্য এসেছি, যাতে তোমাদের জন্য সে সব বস্তুর কতক হালাল করে দেই, যা তোমাদের উপর

মুজেযার তাৎপর্য ও প্রামাণিকতা

বস্তুত, নবুওয়াতের দাবির সমর্থনে আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়মের খেলাফ যা প্রকাশ পায়, তাই মুজেযা। সুতরাং যেসব আয়াতে ও হাদীসে কোন বিষয় সম্পর্কে সাধারণ নিয়মের কথা বলা হয়েছে, সেগুলির কারণে মুজেযা ও অলৌকিক ঘটনাদি অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে স্বীয় নির্বুদ্ধিতা ও মুজেযার অর্থ ও প্রকৃতি সম্পর্কে নিজের অজ্ঞানতা প্রকাশ করা। মুজেযা যদি সাধারণ নিয়ম-নীতি অনুযায়ীই হবে, তবে তাকে মুজেযা বলা হবে কেন? হযরত মাসীহ আ. যে বিনা বাপে পয়দা হয়েছিলেন অথবা তিনি যে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য এবং মৃতকে জীবিত করতে পারতেন, ইত্যাদি— এসব মুজেযা ইসলামী জগতের পূর্বাপর সকল দীনদারের নিকট সর্বসম্মতরূপে গৃহীত হয়ে এসেছে। সাহাবা ও তাবেয়ীদের মধ্যে এর বিপক্ষে একটি কথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আজ যেসব মুলহেদ ও চরম বিপথগামী দাবি করে, এ মুজেযা স্বীকার করার অর্থ কুরআনের মুহকাম আয়াতের বিরোধিতা করা, তারা যেন এমন বিষয়াদিকে 'মুহকামাত' বলতে চায়, যার সঠিক অর্থ সমগ্র উম্মতের কেউই বুঝতে পারেনি। অথবা তারা যেন দাবি করছে যে, উম্মতের সকলেই 'মুহকাম' আয়াতগুলি ছেড়ে দিয়ে মুতাশাবিহাতের পিছনে পড়ে فِي قلوبهم زيغ এর পাত্র (অর্থাৎ বক্রপন্থী) সাব্যস্ত হয়েছে। অথবা বর্তমানের মুলহেদরা ছাড়া আর কেউই 'মুতাশাবিহাত'কে 'মুহকামাত'-এর পাশাপাশি রেখে অর্থ নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়নি। (আল্লাহর পানাহ!)

প্রকৃত সত্য এই যে, যে সকল আয়াতের জাহেরী অর্থ সমগ্র উম্মত গ্রহণ করে এসেছে, তা-ই 'মুহকামাত'। পক্ষান্তরে সেগুলির অর্থবিকৃতি করে সেগুলি শুধু উপমা ও রূপক অর্থে ব্যবহৃত বলে দাবি করা এবং আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়মের অজুহাতে মুজেযাসমূহ অস্বীকার করা— এটাই বস্তুত 'যায়েগীন' বা বক্রপন্থীদের কাজ– যাদের থেকে সতর্ক থাকার জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেদায়েত করে গিয়েছেন।

১. ভবিষ্যতের জন্য। সারকথা এই যে, অতীত ও ভবিষ্যতের কোন কোন অদৃশ্য বিষয়ের খবর আমি তোমাদের দিয়ে থাকি। কর্মগত মুজেযাসমূহের পর এস্থলে একটি জ্ঞানগত মুজেযার কথা বলা হল।

عَلَيۡكُمۡ وَجِئۡتُكُمۡ بِاٰيَةٍ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ ۟ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوۡنِ ۝

হারাম করা হয়েছিল[১]। আর তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের রবের নিদর্শন নিয়ে। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার কথা মান[২]।

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيۡ وَرَبُّكُمۡ فَاعۡبُدُوۡهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسۡتَقِيۡمٌ ۝

৫১. 'নিশ্চয় আল্লাহ আমার রব ও তোমাদের রব, অতএব তাঁর ইবাদত কর। এ-ই সরল পথ[৩]।'

فَلَمَّاۤ اَحَسَّ عِيۡسٰى مِنۡهُمُ الۡكُفۡرَ قَالَ مَنۡ اَنۡصَارِیۡۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الۡحَوَارِيُّوۡنَ نَحۡنُ اَنۡصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشۡهَدۡ بِاَنَّا مُسۡلِمُوۡنَ ۝

৫২. অতঃপর যখন ঈসা বনী ইসরাঈলের পক্ষ থেকে কুফরী লক্ষ করলেন[৪], তখন তিনি বললেন, 'কারা হবে আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী[৫]?' হাওয়ারীগণ বললেন, 'আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী[৬]। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আনুগত্য কবূল করেছি[৭]।

---

১. অর্থাৎ আমি তাওরাতকে খোদার কিতাব বলে সমর্থন করি। তবে তার মৌলিক বিষয় ও বিধানসমূহ বহাল রেখে আল্লাহ তাআলারই নির্দেশে আমি কিছু শাখাগত বিষয়ের যুগোপযোগী পরিবর্তন-পরিবর্ধন করব, যেমন কতক বিধানে পূর্বে যে কাঠিন্য ছিল তা তুলে নেওয়া হবে। একে নসখও বলা যেতে পারে, অথবা পূর্ণতাও বলা যায়।

২. অর্থাৎ আমার সত্যতার নিদর্শন যখন দেখে নিলে, তখন তোমাদের কর্তব্য, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে আমার কথা মেনে নেওয়া ।

৩. অর্থাৎ সকল কথার চূড়ান্ত কথা এবং সকল নীতির মূলনীতি এই যে, আল্লাহ তাআলাকে আমার ও তোমাদের উভয়ের একই রকম রব মনে কর (পিতাপুত্রের সম্পর্ক স্থাপন করো না) এবং তাঁরই বন্দেগী কর। এই তাওহীদ, তাকওয়া ও রাসূলের আনুগত্যই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌছার সরল-সঠিক পথ।

৪. অর্থাৎ তিনি বুঝতে পারলেন যে, এরা তাঁর দীন গ্রহণ করবে না, বরং শত্রুতা করবে এবং কষ্ট দেওয়ার জন্য পিছনে লেগে থাকবে।

৫. অর্থাৎ আমার সঙ্গী হবে এবং আল্লাহ তাআলার দীন প্রচার-প্রসার করতে আমাকে সাহায্য করবে।

৬. আল্লাহ তাআলার সাহায্য করার অর্থ তাঁর দীন ও শরীয়ত এবং তাঁর পয়গম্বরদের সাহায্য করা, যেভাবে মদীনার আনসারগণ স্বীয় পয়গম্বর আলাইহিস সালাম ও সত্য ধর্মের সাহায্য করে দেখিয়েছিলেন।

৭. 'হাওয়ারী' কারা ছিলেন এবং কী কারণে তাঁদের এ উপাধি হল, এতে আলেমদের বিভিন্ন মত রয়েছে। তন্মধ্যে বিখ্যাত মত এই যে, প্রথম যে দুই ব্যক্তি হযরত ঈসা আ.-এর অনুসারী

৫৩. 'হে আমাদের রব! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন আমরা তাতে ঈমান এনেছি এবং রাসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব আপনি আমাদের (নাম, আপনাকে) স্বীকারকারী-দের সঙ্গে লিখে নিন[১]।'

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنۡزَلۡتَ وَاتَّبَعۡنَا الرَّسُوۡلَ فَاكۡتُبۡنَا مَعَ الشّٰهِدِيۡنَ﴿۵۳﴾

৫৪. আর কাফেররা ষড়যন্ত্র করল এবং আল্লাহও কৌশল করলেন, আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী[২]।

وَمَكَرُوۡا وَمَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيۡرُ الۡمٰكِرِيۡنَ﴿۵۴﴾

[রুকূ - ৬]

৫৫. (স্মরণ কর), যখন আল্লাহ বললেন, 'হে ঈসা! আমি তোমাকে পুরাপুরি নিয়ে নেব, তোমাকে নিজের কাছে তুলে নেব এবং তোমাকে কাফেরদের (অপবাদ) থেকে

اِذۡ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيۡسٰۤى اِنِّىۡ مُتَوَفِّيۡكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيۡنَ

হয়েছিলেন তারা ছিলেন ধোপা। তারা কাপড় পরিষ্কার করতেন বলে তাদের 'হাওয়ারী' (অর্থাৎ ধোপা) বলা হত। হযরত ঈসা আ. তাঁদের বললেন, 'কাপড় আর কী ধোবে; আস, আমি তোমাদের অন্তর ধুইয়ে দিই।' সে মত তারা (তাঁর) সঙ্গী হলেন। অতঃপর এমন সব সঙ্গীই উক্ত উপাধিতে আখ্যায়িত হতে লাগলেন।

১. পয়গম্বরের সম্মুখে স্বীকার করার পর প্রতিপালকের সম্মুখে এই স্বীকারোক্তি করলেন যে, আমরা ইন্‌জীল কিতাবের উপর ঈমান এনে আপনার রাসূলের অনুসরণ করেছি। আপনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের নাম মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন। অর্থাৎ ঈমানদারদের রেজিস্ট্রিতে আমাদের নাম তুলে দিন, যেন তা থেকে আর ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

২. مكر –বলে সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশলকে– ভাল উদ্দেশ্যে হলে তা ভাল, মন্দ কাজের জন্য হলে মন্দ। এ জন্যই কুরআন শরীফে আছে- وَلَا يَحِيۡقُ الۡمَكۡرُ السَّيِّئُ (ফাতির : ৪৩) এতে المكر-এর সঙ্গে السَّيِّئ (বা মন্দ) শব্দ যোগ করা হয়েছে এবং এস্থলে আল্লাহ তাআলাকে وَاللّٰهُ خَيۡرُ الۡمٰكِرِيۡنَ বলা হয়েছে।

আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, হযরত ঈসা আ.-এর বিরুদ্ধে ইহুদীরা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও গোপন তৎপরতা শুরু করে দিল, এমনকি বাদশাহকে কানপড়া দিল যে, এই ব্যক্তি (আল্লাহর পানাহ!) ধর্মদ্রোহী। তাওরাতকে বিকৃত করতে চায় এবং সকলকে বিপথগামী করে ছাড়বে। বাদশাহ মাসীহ আ.কে গ্রেফতার করার হুকুম জারী করল। এক দিকে এ হচ্ছিল, অন্য দিকে একে নস্যাৎ করার জন্য আল্লাহ তাআলার সূক্ষ্ম ও গোপন তদবীর সক্রিয় হচ্ছিল। এর আলোচনা সামনে আসছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কৌশল সবচেয়ে উত্তম ও মজবুত, যা কেউ ছিন্ন করতে পারে না।

كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ۝٥٥

পবিত্র করব। আর তোমার অনুসারীদের কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল রাখব, যারা (তোমাকে) অস্বীকার করে। অতঃপর আমারই কাছে তোমাদের (সকলকে) ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসা করে দেব যাতে তোমরা কলহ-বিবাদ করছিলে।'

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ۝٥٦

৫৬. অতএব যারা কাফের, আমি ওদের দুনিয়া ও আখেরাতে কঠোর শাস্তি দেব এবং ওদের কোন সাহায্যকারী নেই।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ۝٥٧

৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তিনি তাদেরকে তাদের প্রতিদান পুরাপুরি দেবেন। আর আল্লাহ জালেমদের পছন্দ করেন না[১]।

---

১. **শত্রুদের হাত থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর হেফাজত**

বাদশাহ লোকদের হুকুম করল, যেন মাসীহ আ.কে গ্রেফতার করে শূলে চড়ানো হয় এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়, যাতে অন্য লোকেরা তাঁর অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকে। তাফসীরে ইবনে কাছীরে আছে: فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به- এর জওয়াবে আল্লাহ তাআলা মাসীহ আ. কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমি এই হতভাগাদের ইচ্ছা ও অভিসন্ধিকে নস্যাৎ করে দেব। এদের অভিপ্রায় হচ্ছে তোমাকে ধরে হত্যা করে ফেলা, তোমার জন্ম ও আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেওয়া এবং এভাবে আল্লাহ তাআলার মহান নে'য়ামতের অমর্যাদা করা। কিন্তু আমি ওদের থেকে আমার এই নে'য়ামত নিয়ে নেব এবং তোমার নির্ধারিত বয়স ও তোমার আবির্ভাবের মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ করে ছাড়ব এবং তোমাকে এমন পুরাপুরি অক্ষতভাবে নিয়ে যাব যে, ওরা তোমার একটা চুলও ছিড়তে পারবে না। ওরা তোমাকে নিয়ে যেতে পারবে না, বরং আল্লাহ তাআলা তোমাকে তাঁর আশ্রয়ে নিয়ে যাবেন। ওরা তোমাকে শূলে চড়াতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাকে আকাশে উঠিয়ে নেবেন। ওদের অভিপ্রায় হল তোমাকে অপমানকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে লোকজনকে তোমার অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখা, কিন্তু আল্লাহ তাআলা ওদের নাপাক হাতকে তোমার পর্যন্ত পৌছতে দেবেন না, বরং এ অপবিত্র সমাবেশ থেকেই তোমাকে পাক-সাফ অবস্থায় উঠিয়ে নেবেন।

আর তোমার বেইজ্জতীর বদলে আল্লাহ বরং তোমাকে সম্মানিত করবেন। লোকেরা তোমার শত্রুদের ভয়ে তোমার আনুগত্য থেকে বিরত তো থাকবেই না; বরং তোমার অনুসরণকারী ও

গুণগ্রাহীদের কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত অমান্যকারীদের উপর বিজয়ী ও শক্তিশালী করে রাখা হবে। পৃথিবীতে যতদিন তোমাকে অস্বীকারকারী ইহুদী আর মান্যকারী মুসলমান বা খ্রিস্টান থাকবে, সর্বদা মান্যকারীরা অস্বীকারকারীদের উপর প্রবল থাকবে। তার পর এমন এক সময় আসবে, যখন তোমাকে এবং তোমার পক্ষীয় ও বিপক্ষীয় সকলকে আমার হুকুমের দিকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের সকল বিবাদের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেব। তখন সকল মতবিরোধ খতম করে দেওয়া হবে।

এ মীমাংসা কখন হবে? এ সম্পর্কে 'فَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا الخ' (অতএব যারা কাফের হয়েছে, আমি ওদের দুনিয়া ও আখেরাতে কঠোর শাস্তি দেব)–এ আয়াতে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে বোঝা যায় যে, আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই এর নমুনা শুরু হয়ে যাবে। তখন সমস্ত কাফেরই কঠোর শাস্তিতে নিপতিত হবে, কোন শক্তিই ওদের সাহায্যকারী ও বিপদ থেকে উদ্ধারকারী হতে পারবে না। পক্ষান্তরে, যারা ঈমানদার থাকবে– দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের পুরাপুরি ছওয়াব দান করা হবে এবং জালেমদের মূল কর্তন করে দেওয়া হবে।

ঈসা (আ.) সম্মর্কে ইসলামী আকীদা

মুসলমানদের সর্বসম্মত আকীদা এই যে, যখন ইহুদীরা ওদের নাপাক ষড়যন্ত্রগুলো পরিপক্ক করে নিল, তখন আল্লাহ তাআলা হযরত মাসীহ আ.কে জীবিতাবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুতাওয়াতির (তথা অসংখ্য-অগণিত) হাদীসসমূহের বর্ণনা মতে কিয়ামতের নিকটবর্তী কালে যখন দুনিয়া কুফর ও গোমরাহীতে এবং দাজ্জালী ও শয়তানীতে ভরে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলের শেষ নবী হযরত মাসীহ আ.কে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন উম্মত ও বিশ্বস্ত সৈনিক হিসাবে অবতীর্ণ করে দুনিয়াবাসীকে দেখিয়ে দেবেন যে, পূর্ববর্তী নবীগণের সঙ্গে শেষ নবীর কী গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

হযরত মাসীহ আ. দাজ্জালকে কতল করবেন এবং ওর অনুসারীদের বেছে বেছে হত্যা করবেন। কোন ইহুদীই জান বাঁচাতে পারবে না, বৃক্ষ ও পাথর পর্যন্ত ডেকে বলবে, আমার আড়ালে এই যে ইহুদী, হত্যা করুন। হযরত মাসীহ আ. ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন। খ্রিস্টানদের বাতিল আকীদা-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের সংশোধন করে সমগ্র দুনিয়াকে প্রকৃত ঈমানের উপর স্থাপিত করবেন। তখন সকল কলহ-বিবাদের ফয়সালা হয়ে যাবে এবং ধর্মীয় মতবিরোধসমূহ মিটে গিয়ে এক আল্লাহর সত্য ধর্ম ইসলাম রয়ে যাবে। ঐ সময় সম্পর্কেই বলা হয়েছে وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِه قَبْلَ مَوْتِه 'কিতাবীদের যত দল আছে, তারা ঈসার প্রতি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করবে।' (সূরা নিসা- আয়াত ১৫৯)। এর পূর্ণ বিবরণ এবং মাসীহ আ.এর আকাশে উত্থিত হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা সূরা নিসায় আসবে।

যা হোক, আমার মতে (৫৫ নং আয়াতের) ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ শুধু আখেরাতের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক, যেমন সম্মুখে فِي الدنيا والآخرة, শব্দাবলি পরিষ্কার প্রমাণ করছে। আর এ থেকে এ কথাও বোঝা যায় যে, إلى يوم

القيامة এর অর্থ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত। যেমন সহীহ হাদীসসমূহেও পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, কিয়ামতের পূর্বে এমন একটি মোবারক সময় অবশ্যই আসবে, যখন সকল মতবিরোধ মিটে গিয়ে একটি মাত্র দীন (ইসলাম) অবশিষ্ট থাকবে। (আগে পরের সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই।) (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৯২৭০; সুনানে আবি দাউদ, হাদীস ৪৩২৪)

আয়াত নং ৫৫ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা উচিত

'توفي' শব্দ সম্পর্কে আবুল বাকা-এর 'কুল্লিয়াত'-এ আছে: التوفي الإماتة وقبض الروح وعليه استعمال العامة أو الاستيفاء وأخذ الحق وعليه استعمال البلغاء، অর্থাৎ সাধারণের নিকট 'توفي' শব্দ 'মৃত্যু দেওয়া ও প্রাণ সংহার করা'র অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অলঙ্কারশাস্ত্রবিদদের নিকট 'পুরাপুরি উসূল করা ও সঠিকভাবে গ্রহণ করা' অর্থ হয়। শেষোক্ত দলের নিকটও মৃত্যুর অর্থে 'توفي' শব্দ এ হিসাবেই ব্যবহৃত হয় যে, মৃত্যুতে কোন বিশেষ অঙ্গ নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে গোটা প্রাণটাই উসূল (হনন) করে নেওয়া হয়। এখন ধরুন, আল্লাহ তাআলা যদি কারো প্রাণ দেহসহ নিয়ে নিলেন (যেমন হযরত মাসীহ আ.-এর ক্ষেত্রে হয়েছে), তবে এ ক্ষেত্রে 'توفي'-র ব্যবহার আরো সুন্দর হল। যে সকল অভিধান-প্রণেতা 'توفي'-র অর্থ 'রূহ কব্য করা' লিখেছেন, তাঁরা তো আর এ কথা বলেননি যে, দেহসহ রূহ কব্য করাকে 'توفي' বলে না। এমন কোন নিয়মও তাঁরা বলেননি যে, যখন 'توفي'-র কর্তা (فاعل) আল্লাহ তাআলা এবং (مفعول) রূহওয়ালা (প্রাণী) হয়, তখন মৃত্যু ছাড়া আর কোন অর্থ হতে পারে না। হাঁ, সাধারণত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে জান কব্য হয় বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রের হিসাবে প্রায়ই মৃত্যু শব্দটি এর সাথে লিখে দেওয়া হয়, অন্যথায় 'দেহসহ জান কব্য' করাও এই শব্দের আভিধানিক অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

কালামে পাকে সূরা যুমারের ৪২নং আয়াতে আছে- اللّٰهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا {আল্লাহ (প্রাণীসমূহের) রূহ কব্য করে নেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যেসব প্রাণীর মৃত্যু (-র সময়) আসেনি, তাদের রূহও (কবয করেন) তাদের নিদ্রাকালে।} এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা 'توفي نفس', (জান-কব্য)-এর দুটি অবস্থা বয়ান করেছেন– মৃত্যু ও নিদ্রা। এই শ্রেণীভেদের দ্বারা, অধিকন্তু 'أنفس', কে 'توفي' ক্রিয়ার (مفعول) ধরে এবং 'حين, مَوْتِهَا' এর শর্ত সংযোগ করে বোঝানো হল যে, 'توفي' ও 'موت', দুটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। সারকথা, জান-কবযের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে- একটি হচ্ছে মৃত্যুর আকারে, দ্বিতীয়টি নিদ্রার আকারে। কুরআন কারীমের ব্যবহারে জানা গেল যে, এই উভয়টির উপর 'توفي' শব্দের প্রয়োগ হয়, শুধু মৃত্যুর অর্থে নয়। যেমন সূরা আন্‌আমের ৬০নং আয়াতে يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ('তিনিই সেই সত্তা, যিনি রাতে তোমাদের করায়ত্ত করে নেন এবং যা কিছু তোমরা দিনে করেছ, তা তিনি জানেন।') توفى নিদ্রার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অতএব, দুটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিদ্রার অর্থে 'توفي' ব্যবহার করেছেন, অথচ নিদ্রাতে জান-কব্য পুরাপুরি হয় না। তদ্রূপ তিনি যদি সূরা 'আলে-ইমরান' ও 'মায়িদা'র দুটি আয়াতে 'توفي' শব্দটি দেহসহ জান-কব্য অর্থে প্রয়োগ করে থাকেন, তবে অসম্ভবের কী আছে? বিশেষত যেখানে দেখা যাচ্ছে, কুরআন কারীমই মৃত্যু ও নিদ্রা অর্থে 'توفي' শব্দের ব্যবহার

শুরু করেছে। ইসলামপূর্ব কালের মানুষ তো এই সত্য সম্পর্কেই অনবহিত ছিল যে, মৃত্যু বা নিদ্রাতে আল্লাহ তাআলা মানুষ থেকে কোন জিনিস নিয়ে নেন। এ জন্যই তাদের ভাষায় মৃত্যু ও নিদ্রার অর্থে 'توفي' -এর ব্যবহার দেখা যায় না। কুরআন কারীমই মৃত্যু ইত্যাদির তাৎপর্য বুঝাতে সর্বাগ্রে এই শব্দের ব্যবহার শুরু করেছে। সুতরাং মৃত্যু ও নিদ্রার ন্যায় 'দেহসহ জান-কব্য' করার অর্থে এ শব্দ প্রয়োগ করার অধিকার তারই রয়েছে।

যা হোক, অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে বর্তমান আয়াতে 'توفي' এর দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশ্য নয় (উদ্দেশ্য হল– মাসীহ আ.-কে পুরাপুরি –জান ও দেহ উভয়সহ– নিয়ে নেওয়া)। অধিকন্তু, ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধতম হাদীসে রয়েছে, হযরত মাসীহ আ. জীবিতাবস্থায় আকাশে উত্তোলিত হয়েছেন। (সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ১১৫২৭; তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম, হাদীস : ৬২৩৩) জগদ্বিখ্যাত তাফসীর 'রূহুল মাআনী' ইত্যাদিতেও তা-ই আছে। তাঁর জীবিত অবস্থায় উত্তোলিত হওয়া বা দ্বিতীয়বার অবতরণের কথা পূর্ববর্তী মনীষীগণের কেউ অস্বীকার করেছেন বলে উল্লেখ নেই। বরং 'التلخيص الحبير' এর মধ্যে হাফেজ ইবনে হাজর (র) উক্ত বিষয়ে মুসলিম জাতির ঐক্যমতের কথা উল্লেখ করেছেন। আর ঈসা আ.এর আকাশ থেকে অবতরণ সম্পর্কিত হাদীসগুলিকে ইবনে কাছীর প্রমুখ মুফাসসির 'مُتَوَاتِر' বলেছেন। إكْمال إكمال المعلم কিতাবে ইমাম মালেক (র) থেকে এ বিষয়ের ব্যাখ্যা নকল করা হয়েছে।

তদুপরি, হযরত মাসীহ আ. এর আকাশে উত্তোলিত হওয়ার সাথে তাঁর মুজেযাগুলির একটি বিশেষ যোগসূত্র পাওয়া যায়। হযরত ঈসা আ. যেন প্রথম থেকেই সতর্ক করে দিলেন যে, যখন একটি মাটির নির্জীব আকৃতি আমার ফুৎকারে আল্লাহ তাআলার হুকুমে পাখী হয়ে উপরে উড়ে যেতে পারে, তখন যে মানুষটিকে আল্লাহ তাআলা 'রূহুল্লাহ' বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং 'রূহুল কুদ্স' (বা জিবরাঈল ফেরেশতা)-এর ফুৎকারে যার জন্ম, তার পক্ষে কি এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহর হুকুমে উড়ে আকাশ পর্যন্ত চলে যাবে? যার হাতের পরশে বা দু একটি শব্দ উচ্চারণ করায় আল্লাহ তাআলার হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগী আরোগ্য এবং মৃত জীবিত হতে পারে, তিনি যদি ফেতনা-ফাসাদে ভরপুর এই পৃথিবী থেকে পৃথক হয়ে হাজার হাজার বছর ফেরেশতাদের মত আকাশের উপর জীবিত ও সুস্থ থাকেন, তবে তা অসম্ভব হওয়ার কী আছে? ইমাম বাগাবী, (তাবেয়ী) কাতাদাহ (র) এর কথা উদ্ধৃত করেছেন-

فطار مع الملائكة فهو معهم حول العرش وصار إنسيا ملكيا سماويا أرضيا

('তিনি ফেরেশতাদের সঙ্গে উড়ে গেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে আরশের আশপাশে আছেন। তিনি একই সাথে মানুষ, ফেরেশতা এবং আসমানের ও যমীনেরও।')

এ বিষয়ের উপর স্বতন্ত্র কিতাবাদিও প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং যে কিতাবের প্রতি আলেম সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা হল আমাদের শ্রদ্ধাভাজন আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) রচিত দুর্লভ জ্ঞানভাণ্ডার 'عقيدة الإسلام'। উক্ত বিষয়ের উপর এমন পূর্ণাঙ্গ আলোচনাসম্বলিত কিতাব সম্ভবত আর নেই।

৫৮. এসব আমি আপনাকে পাঠ করে শোনাচ্ছি, যা (আপনার নবুওয়াতের) নিদর্শনাবলি ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বর্ণনা।

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ۝۵۸

৫৯. নিশ্চয় ঈসার অবস্থা আল্লাহর নিকট আদমের অবস্থার ন্যায়– তিনি তাঁকে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তাঁকে বললেন, 'হও', অমনি তিনি হয়ে গেলেন[১]।

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ۝۵۹

৬০. এ-ই সত্য, আপনার রবের পক্ষ থেকে। অতএব আপনি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না[২]।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ۝۶۰

৬১. আর যে কেউ এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে যুক্তিতর্ক করে, আপনার নিকট (সঠিক) জ্ঞান আসার পরও—আপনি (তাকে) বলে দিন, 'আস! আমরা ডেকে আনি আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের, আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের। তার পর আমরা সকলে (আল্লাহর দরবারে) বিনীতভাবে প্রার্থনা করি এবং যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর আল্লাহর লা'নত দেই[৩]।'

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ۝۶۱

---

১. খ্রিস্টানরা এ নিয়ে নবীজির সঙ্গে খুবই বাদানুবাদ করেছিল যে, ঈসা বান্দা নয় বরং আল্লাহ তাআলার পুত্র। শেষ পর্যন্ত ওরা বলতে লাগল, তিনি আল্লাহ তাআলার পুত্র না হলে বলুন, কার পুত্র? উত্তরে এই আয়াত নাযিল হল (তাফসীরে তবারী ৫/৪৬০-৪৬১)। অর্থাৎ আদম আ.-এর তো পিতাও ছিল না, মাতাও না। ঈসা আ.-এর পিতা না হলে আশ্চর্যের কী (মুযেহুল কুরআন)। এ হিসাবে আদমকে খোদার পুত্র প্রমাণে বেশি জোর দেওয়া উচিত। অথচ এ কথা কেউই বলে না।

২. অর্থাৎ মাসীহ আ. সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা যা কিছু বলেছেন, তা-ই সত্য, যার মধ্যে সন্দেহ-সংশয়ের কোনই অবকাশ নেই। যা প্রকৃত সত্য, তা-ই হুবহু বুঝিয়ে দেওয়া হল।

৩. **নাজরানের নাসারাদের সঙ্গে 'মুবাহালা'**

আল্লাহ তাআলা হুকুম করলেন, নাজরানবাসী নাসারারা এত বোঝানোর পরও সত্য স্বীকার না করলে ওদের সঙ্গে 'মুবাহালা' করুন। আর মুবাহালার জোরদার ও পূর্ণাঙ্গ উপায় এটা

সাব্যস্ত করা হল যে, উভয় দল নিজেদের পরিবার-পরিজনসহ সমবেত হবে এবং খুব কান্নাকাটি করে ঐকান্তিকভাবে আল্লাহ তাআলার নিকট দো'য়া করে বলবে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তার উপর আল্লাহর লানত ও গযব পতিত হোক। মুবাহালার এই পন্থায় সূচনাতেই প্রকাশ পেয়ে যাবে যে, কোন্ দল নিজের অন্তরেই স্বীয় সততা ও সত্যতা সম্পর্কে কতখানি আস্থা ও বিশ্বাস রাখে।

মুবাহালার আহ্বান শুনে নাজরানবাসী প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে সময় চাইল। পরামর্শ সভায় ওদের মধ্যে বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ, দূরদর্শী ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা বলল, 'হে খ্রিস্টান সম্প্রদায়! তোমরা অন্তরে নিশ্চিতরূপে বুঝতে পেরেছ যে, মুহাম্মদ প্রেরিত নবী এবং তিনি হযরত মাসীহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও অকাট্য কথাই বলে দিয়েছেন। তোমাদের জানা আছে, আল্লাহ তাআলা ইসমাঈল বংশে নবী প্রেরণের ওয়াদা করেছিলেন। ইনিই যে সেই প্রতিশ্রুত নবী, তাতে অসম্ভবের কী। আর কোন জাতি নবীর সঙ্গে মুবাহালা ও মুলাআনা (একে অন্যের বিরুদ্ধে লানতের দো'য়া করা) করলে তার পরিণতি- আল্লাহ তাআলার হাতে সেই জাতির ছোটবড় সকলের ধ্বংস ও শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। বড় কথা, পয়গম্বরের অভিশাপের ক্রিয়া বংশপরম্পরায় চলতে থাকে। অতএব বুদ্ধিমানের কাজ এ-ই যে, আমরা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে স্বদেশে ফিরে যাই।

পরামর্শ সভায় এই সিদ্ধান্ত পাশ করে ওরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌছল। তখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান, হুসাইন, ফাতেমা, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুমসহ বাইরে অবস্থান করছিলেন। এ সকল নূরানী চেহারা দেখে ওদের লাট পাদ্রি বলল, আমি এমন পবিত্র চেহারাসমূহ দেখছি, যাদের দো'য়া পাহাড়কে পর্যন্ত হটিয়ে দিতে পারে। তাদের সঙ্গে মুবাহালা করে ধ্বংস হয়ো না। মুবাহালা করলে একজন খ্রিস্টানও ভূপৃষ্ঠে অবশিষ্ট থাকবে না। শেষ পর্যন্ত ওরা বিরোধিতার পথ পরিহার করে বার্ষিক কর দিতে রাজী হল এবং সন্ধি করে ফিরে গেল।

হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি ওরা মুবাহালা করত তবে উপত্যকা অগ্নিতে পরিণত হয়ে ওদের উপর বর্ষিত হত এবং আল্লাহ তাআলা নাজরানকে সমূলে ধ্বংস করে দিতেন–এক বছরের মধ্যে সকল খ্রিস্টান হালাক হয়ে যেত। (তাফসীরে ইবনে কাসীর- ইবনে মারদূয়াহ্ এর সূত্রে-১/৫৫৪; তাফসীরে তাবারী ৫/৪৭১)

'মুবাহালা'র বৈধতা এখনো আছে কি?

কুরআন এ কথা বলেনি যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরও মুবাহালার পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবাহালার ফল যা প্রকাশ পাওয়ার ছিল, তা অন্য মুবাহালাতেও প্রকাশ পাওয়া অনিবার্য। কতক পূর্ববর্তী বুযুর্গের কর্মপন্থা ও হানাফী মাযহাবের কোন কোন ফকীহর ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে, মুবাহালার ধর্মীয় বিধান (বৈধতা) এখনো বাকী আছে। তবে কেবল সেসব বিষয়ে, যা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আর এ জরুরী নয় যে, মুবাহালাতে বাচ্চা ও নারীদের শরীক করতেই হবে। আর মুবাহালাকারীদের উপরও সেই ধরনের শাস্তি আসা জরুরী নয়, যা হুযূর

৬২. নিশ্চয় এ-ই সত্য বৃত্তান্ত। এবং আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই[১]। আর নিশ্চয় আল্লাহই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[২]।

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾

৬৩. এর পরও যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তো ফাসাদকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত[৩]।

فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

[রুকূ - ৭]

৬৪. আপনি বলুন, 'হে কিতাবীরা! এসে যাও এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান– (তা এই) যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না, কোন কিছুকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করব না এবং

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবাহালায় আসত। বরং এর দ্বারা এক রকম হুজ্জত পূর্ণ করে বিতর্ক ও বাহাস থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য। আমার মতে, প্রত্যেক মিথ্যাবাদীর সাথে নয় বরং শুধু হঠকারী মিথ্যাবাদীর সাথে মুবাহালা হতে পারে। প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে কাছীর বলেন-

ثُمَّ قال تعالى آمرا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করলেন, সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে যারা সত্যের বিরোধিতা করে, ওদের সাথে মুবাহালা করুন।'

১. মুবাহালার আহ্বানের সঙ্গে বলে দেওয়া হল, মুবাহালার বিষয় এই যে, হযরত মাসীহ সম্পর্কে কুরআনে যা কিছু বিবৃত হল তা-ই সত্য এবং খোদার দরবার সকল প্রকারের শিরক ও পিতা-পুত্র ইত্যাদি সম্পর্ক থেকে পবিত্র।

২. তিনি তাঁর মহাশক্তি ও হেকমতের বলে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর সাথে সেই আচরণই করবেন, যা তাদের স্ব স্ব অবস্থার উপযোগী।

৩. যদি দলীল-প্রমাণ দ্বারাও না মানে, মুবাহালা করতেও প্রস্তুত না হয় তবে বুঝতে হবে যে, সত্য প্রতিষ্ঠা করা ওদের উদ্দেশ্য নয়, অন্তরেও নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের সত্যতার ব্যাপারে ওদের আস্থা নেই– শুধু ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করাই মূল লক্ষ্য। এমতাবস্থায় ওরা জেনে রাখুক, সকল ফাসাদকারীই আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে রয়েছে।

أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝٦٤

আল্লাহর পরিবর্তে আমাদের কেউ কাউকে রব বানাবে না[১]।' এতদসত্ত্বেও যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা (তাদের) বলে দাও, 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা (আল্লাহর হুকুমের) পূর্ণ অনুগত[২]।'

يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِىْٓ إِبْرٰهِيْمَ وَمَآ أُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْإِنْجِيْلُ إِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝٦٥

৬৫. হে কিতাবীরা! তোমরা ইবরাহীম সম্বন্ধে কেন বিতর্ক কর, অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তাঁর পরে নাযিল করা হয়েছিল? তোমাদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই?

---

১. ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানের প্রতিনিধি দলকে أَسْلِمُوا (অর্থাৎ মুসলমান হয়ে যাও) বললে ওরা বলেছিল أَسْلَمْنَا (অর্থাৎ আমরা মুসলমান)। এ থেকে বোঝা গেল, মুসলমানদের মত ওরাও মুসলমান হওয়ার দাবিদার ছিল। অনুরূপ ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সম্মুখে যখন তাওহীদের কথা বলা হত তখন ওরা বলত, 'আমরাও আল্লাহকে এক মানি'; বরং প্রত্যেক ধর্মের লোকই একপর্যায়ে গিয়ে কোন না কোনভাবে স্বীকার করে যে, 'বড় খোদা একজনই'।

এস্থলে এই সত্যের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, যেই মৌলিক আকীদার উপর আমরা উভয়ে একমত তা এমন বিষয়, যা আমাদের সকলকে এক করতে পারে। তবে শর্ত এই যে, সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যেন আমরা নিজেদের 'তসরূপ' ও 'তাহরীফ' (অর্থাৎ মনমত বিকৃতি সাধনের) দ্বারা তার হাকীকত ও মূলকেই পরিবর্তন না করি। সেজন্য প্রয়োজন– মুখে যেমন নিজেদের মুসলমান ও একত্ববাদী বলে থাক, তেমনি প্রকৃতভাবে ও কার্যক্ষেত্রেও নিজেদের একমাত্র লা-শরীক আল্লাহ তাআলার কাছে সমর্পন করে দেওয়া– তিনি ছাড়া কারো বন্দেগীও করবে না, তাঁর খাস গুণাবলির মধ্যে কাউকে শরীকও করবে না এবং যে আচার-ব্যবহার একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রভু-পরওয়ারদেগারের সঙ্গেই সমীচীন, তা আর কোন আলেম, ফকীর, পীর, পয়গম্বরের সঙ্গে করবে না। যেমন: কাউকে আল্লাহর পুত্র বা নাতি সাব্যস্ত করা; অথবা শরী'য়তের স্পষ্ট বিধানের প্রতি লক্ষ না করে শুধু কোন ব্যক্তির হালাল বা হারাম বলার উপর বৈধ ও অবৈধতার ভিত্তি ন্যস্ত করা, যেমনটি اِتَّخَذُوْٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ (ওরা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেমদের ও সংসারবিরাগীদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে–তাওবা : ৩১) আয়াতের তাফসীর থেকে প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য, এসব বিষয় ইসলাম ও একত্ববাদের দাবির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

২. অর্থাৎ তোমরা ইসলাম ও তাওহীদের দাবি করেও তা থেকে ফিরে গেলে। কিন্তু আমরা আলহামদুলিল্লাহ এর উপর কায়েম আছি, অর্থাৎ আমরা নিজেদেরকে একমাত্র এক আল্লাহর কাছে সমর্পন করে দিয়েছি এবং তাঁরই আজ্ঞাবহ হয়ে আছি।

৬৬. দেখ, তোমরাই এমন লোক যে, তোমরা (ইতিপূর্বে) এমন বিষয়ে বিতর্ক করেছ, যে বিষয়ে তোমাদের কিঞ্চিত জ্ঞান ছিল। এখন কেন তোমরা এমন বিষয়ে বিতর্ক করছ, যে বিষয়ে তোমাদের মোটেই জ্ঞান নেই? বস্তুত আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না[১]।

هَاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۝

৬৭. ইবরাহীম ইহুদীও ছিলেন না এবং খ্রিস্টানও না, বরং তিনি ছিলেন 'হানীফ' (অর্থাৎ সকল মিথ্যা ধর্ম-বিমুখ) ও (আল্লাহর) পূর্ণ অনুগত। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না[২]।

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۝

---

১. ইসলাম ও তাওহীদের দাবিতে সবাই যেমন অভিন্ন ছিল, তেমনি হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করার ব্যাপারেও সকলে একমত ছিল। ইহুদী ও খ্রিস্টান উভয় দলের প্রত্যেকে দাবি করত, ইবরাহীম আ. তাদের ধর্মমতের উপর ছিলেন। অর্থাৎ নাউযুবিল্লাহ তিনি ইহুদী বা খ্রিস্টান ছিলেন।

এরই উত্তরে বলা হয়েছে, যে ইনজীল ও তাওরাতকে অনুসরণ করে ইহুদী বা নাসারা জাতির উৎপত্তি হল, সেই কিতাবদ্বয় তো ইবরাহীম আ. এর বহু শতাব্দী পর অবতীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং ইবরাহীম আ.কে নাসরানী বা ইহুদী কী করে বলতে পার? বরং যে অর্থে তোমরা নিজেরা ইহুদী বা নাসারা, সেই অর্থে তো স্বয়ং মূসা আ. ও ঈসা আ.-কেও ইহুদী বা নাসরানী বলা যায় না। আর যদি তোমাদের দাবি এই হয় যে, হযরত ইবরাহীম আ. এর শরীয়ত তোমাদের ধর্মের সর্বাধিক নিকটবর্তী, তবে এও ভুল। এ কথা তোমরা কোথায় পেলে? তোমাদের কিতাবে তো এর উল্লেখ নেই।

যে কথা আল্লাহ তাআলা বলেননি, যার সত্যতার কোন প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই, মোট কথা- যে বিষয়ে মানুষের কাছে কোনই জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তর্ক করা বোকামি ছাড়া আর কী! যেসব বিষয়ে তোমাদের অপূর্ণ ও ভাসাভাসা জ্ঞান আছে, যেমন মাসীহ আ.এর ঘটনাবলি অথবা আখেরী যমানার নবীর সুসংবাদ ইত্যাদি, এমনসব বিষয়ে তোমরা তর্ক-বিতর্ক করলে, কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের মোটেই জ্ঞান নেই, যার স্পর্শ বা হাওয়াও তোমাদের লাগেনি, সে বিষয় আল্লাহ তাআলার কাছে সোপর্দ করে দাও। বস্তুত তিনিই জানেন, ইবরাহীম আ. কী ছিলেন এবং বর্তমানে দুনিয়াতে কোন্ দলের মতাদর্শ তাঁর সর্বাধিক নিকটবর্তী।

২. অর্থাৎ ইবরাহীম আ. নিজেকে 'হানীফ' ও 'মুসলিম' বলেছেন। যে ব্যক্তি একমাত্র সত্যপথ অবলম্বন করে এবং সকল ভ্রান্তপথ বর্জন করে, তাকে 'হানীফ' বলে। আর মুসলিমের অর্থ আজ্ঞাবহ (হুকুমমান্যকারী)। এখন নিজেরা বুঝে দেখ, বর্তমানে কে সবকিছু ছেড়ে একমাত্র

৬৮. নিশ্চয় মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ তারা, যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল এবং এই নবী ও যারা (এই নবীর প্রতি) ঈমান এনেছে[১]। আর আল্লাহ মুমিনদের

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ

আল্লাহর রাস্তা অবলম্বন করেছে এবং নিজেকে একমাত্র তাঁরই কাছে সোপর্দ বা আত্মসমর্পন করে দিয়েছে। বলা বাহুল্য, এমন যে করেছে সে-ই ইবরাহীম আ. এর সর্বাধিক নিকটবর্তী ও সদৃশ।

আয়াতে 'ইসলামে'র অর্থ

مُسلمًا– এখানে 'ইসলাম' দ্বারা একমাত্র শরী'য়তে মুহাম্মদীকে উদ্দেশ্য করার প্রয়োজন নেই, বরং এর মূল অর্থ হচ্ছে তাস্‌লীম ও তাফ্‌বীয বা আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদন এবং ফরমাবরদারী (আনুগত্য ও তাবেদারী)। এটিই সকল নবীর দীন-ধর্ম ছিল এবং বিশেষভাবে ইবরাহীম আ. এই নাম ও উপাধির দাবি খুবই আদায় করেছিলেন। যেমনঃ সূরা বাকারায় (আয়াত ১৩১) রয়েছে- إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ (যখন তাঁর রব তাঁকে বললেন, 'তুমি আজ্ঞাবহ হও', তখন তিনি বললেন, 'আমি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকের আজ্ঞাবহ হয়েছি।')

বস্তুত হযরত ইবরাহীম আ. এর জীবনের প্রতিটি ঘটনা এ সত্যই উজ্জ্বল করে যে, তিনি আপাদমস্তক ইসলাম, আত্মসমর্পণ ও আল্লাহ তাআলার বিধানে আত্মনিবেদনের জীবন্ত নিদর্শন ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কুরআনে ইসমাঈল আ.-এর যবেহর ঘটনায় বলা হয়েছে- فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّه لِلْجَبِيْنَ (অতঃপর যখন উভয়ে আদেশ মান্য করলেন এবং তিনি তাকে উপুড় করে মাটিতে ফেললেন–সাফ্‌ফাত : ১০৩) বস্তুত এ বাক্যটি তাঁর ইসলামী শানেরই জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করছে। صلى الله على نبينا وعليه وبارك وسلم

১. আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন যে, ইবরাহীম আ.-এর সঙ্গে সর্বাধিক সম্পর্ক তৎকালীন মুমিনদের ছিল এবং পরবর্তী উম্মতদের মধ্যে এই নবীর উম্মতের (মুসলিমদের) রয়েছে। বস্তুত নাম ও আদর্শ দু'দিক থেকেই এই উম্মত হযরত ইবরাহীম আ.-এর সঙ্গে সর্বাধিক সম্পর্কধারী। আর এই উম্মতের পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকৃতি ও প্রকৃতি বা সূরত ও সীরত সব দিক থেকে হযরত ইবরাহীম আ.-এর ঘনিষ্ঠতম ও সদৃশতম। তিনি সূরা বাকারায় (আয়াত : ১২৯) উল্লিখিত ইবরাহীম (আ.)-এর এই দো'য়ার ফলে আবির্ভূত হয়েছেন– رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ الخ ('হে আমাদের প্রতিপালক! আর তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠান, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করবেন।') এ জন্যই ইসলামের প্রাথমিক যুগে হাবশায় হিজরতকারী মুসলমানদেরকে সেখানকার খ্রিস্টান বাদশাহ (নাজাশী) 'হিযবে ইবরাহীম' বা ইবরাহীমের দল আখ্যায়িত করেছিলেন। সম্ভবত এ ধরনেরই ঘনিষ্ঠতার কারণে দরূদ শরীফে كَمَا صَلَّيْتَ

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ۝

অভিভাবক[১]।

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ۝

৬৯. কিতাবীদের একদল মনে-প্রাণে চায় যে, তোমাদের পথভ্রষ্ট করে দেবে। অথচ ওরা কেবল নিজেদেরই পথভ্রষ্ট করে, কিন্তু ওরা উপলব্ধি করে না[২]।

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ۝

৭০. হে কিতাবীরা! তোমরা কেন আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার কর, অথচ তোমরা (তাওরাত প্রভৃতি কিতাবকে আল্লাহর কালাম বলে) স্বীকার কর[৩]?

على ابراهيم বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেই ধরনের ও নমুনার রহমত নাযিল করুন, যে রকম হযরত ইবরাহীম ও তাঁর বংশের উপর করেছিলেন।

তিরমিযী শরীফের হাদীসে রয়েছে إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي أبي وخليل ربي (প্রত্যেক নবীর জন্য নবীগণের মধ্যে অভিভাবক থাকেন। আমার অভিভাবক হচ্ছেন আমার পিতা এবং আমার রবের বন্ধু– ইবরাহীম) (জামে তিরমিযী, হাদীস ৩২৩৮-৩২৩৯; মুসতাদরাক, হাদীস ৩১৫১)। সামনের কোন সূরায় এ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা আসবে ইনশাআল্লাহ।

১. অর্থাৎ শুধু কারো সঙ্গে মিল ও সাদৃশ্যের দ্বারা নিজ পথ সত্য হওয়ার ব্যাপারে তখনই দলীল গ্রহণ করা যায়, যখন নিজের প্রতি ওহীর আগমন হয় না। কিন্তু মুসলমানদের ওলী তো আল্লাহ তাআলা, অর্থাৎ তারা সরাসরি আল্লাহর হুকুমে ও তাঁর ওহী অনুসারে চলে। (মুযেহুল কুরআন)

২. পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ (আল্লাহই মুমিনদের অভিভাবক)। এখানে আল্লাহ বলেছেন, যেহেতু আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ওলী (অভিভাবক), কাজেই (হে কিতাবীরা)! তাদের উপর তোমাদের ষড়যন্ত্র চলতে পারে না।

নিঃসন্দেহে কতক কিতাবধারীর ইচ্ছা ও চেষ্টা হল, ওরা নিজেরা যেমন গোমরাহ তেমনি মুসলমানদেরও সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে। কিন্তু মুসলমানরা ওদের ফাঁদে পড়ার নয়, বরং এর দ্বারা ওরা নিজেদের গোমরাহীর পাল্লাই ভারী করছে। মুসলমানদের পথহারা করার যে চেষ্টা-তদবীর ওরা করছে, এর ক্ষতি বরং ওদের নিজেদেরই উপর বর্তাবে, কিন্তু বর্তমানে ওরা তা বুঝতে পারছে না।

৩. অর্থাৎ তোমরা তাওরাত ইত্যাদি মান্য কর, আর তাতে বর্তমান পয়গম্বর ও কুরআন কারীম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যা তোমরা অন্তরে বোঝ এবং নির্জনে স্বীকারও কর। অতএব প্রকাশ্যে কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে এবং শেষ নবীর সত্যতা স্বীকার করে

৭১. হে কিতাবীরা! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর এবং কেন জেনেশুনে সত্য গোপন কর[১]?

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

[রুকূ - ৮]

৭২. কিতাবীদের একদল (অন্যদের) বলেছে, 'তোমরা দিনের শুরুতে তা মেনে নাও যা মুসলমানদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতঃপর দিনের শেষে (তা) প্রত্যাখ্যান কর, হয়ত (এতে) তারা (অর্থাৎ মুসলমানরা, স্বীয় ধর্ম থেকে) ফিরে যাবে[২]।

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

নিতে বাধা কিসে? ভাল করে বুঝে নাও, কুরআনের অস্বীকৃতির অর্থ পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থেরই অস্বীকৃতি।

১. তাওরাতের কিছু বিধান ওরা দুনিয়ার স্বার্থে একেবারে মওকুফ করে দিয়েছিল। কোন কোন আয়াতের শাব্দিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, কোন কোনটির অর্থ বিকৃত করে ফেলেছিল। তদুপরি কোন কোন বিষয় গোপন করে রেখেছিল, যা সবাইকে বলত না, যেমন শেষ যমানার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিভিন্ন সুসংবাদ।

২. এই আয়াতগুলিতে কিতাবধারীদের কিছু চালবাজি ও প্রতারণার উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর একটি এই ছিল যে, ওদের কিছু লোক সকাল বেলায় বাহ্যত মুসলমান হয়ে যাবে, মুসলমানদের সঙ্গে নামায পড়বে। অতঃপর সন্ধ্যা বেলায় এই বলে ইসলাম থেকে ফিরে যাবে যে, 'আমাদের বড় আলেমদের থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, ইনি সেই নবী নন যাঁর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁর অবস্থাদিও সত্যপন্থীদের মত প্রমাণিত হয়নি'।

ফল এই দাঁড়াবে যে, এ আচরণে অনেক দুর্বল ঈমানদার ইসলাম থেকে ফিরে যাবে এবং ভাববে, ইসলাম ধর্মের মধ্যে অবশ্যই তারা কোন দোষ-ত্রুটি দেখে থাকবে, যা তারা ইসলামে প্রবেশ করার পর প্রকাশ পেয়েছে। অধিকন্তু আরব অশিক্ষিতদের মধ্যে কিতাবীদের সম্পর্কে এ ধারণা ছিল যে, তারা জ্ঞান-বিদ্যার চর্চা করে, অতএব তারা জ্ঞানী। এ নতুন ধর্ম সত্য হলে এই জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা তা বর্জন করত না, বরং নিজেরা আগে বেড়ে তা গ্রহণ করত।

وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ط قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ط قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط

৭৩. 'আর তোমরা (বাস্তবে) কেবল তাকেই মানবে, যে তোমাদের ধর্মের অনুসারী[১]।' আপনি বলে দিন, 'নিশ্চয় আল্লাহর হেদায়েতই হেদায়েত[২]। (তোমরা এসব করছ কেবল) এ কারণে যে, তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা অন্য কাউকে দেওয়া হচ্ছে কেন, অথবা তারা তোমাদের রবের সামনে তোমাদের উপর জয়ী হচ্ছে কেন☆[৩]? আপনি

---

১. অর্থাৎ যে ইহুদীরা মুসলমানদের সামনে গিয়ে মুনাফিকরূপে নিজেদের মুসলমান বলে প্রকাশ করবে, তাদের সর্বদা এ ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত যে, তারা সত্যসত্যই মুসলমান হয়ে যায়নি, বরং আগের মত ইহুদীই রয়েছে। আর অন্তর থেকে তারা শুধু তাদেরই কথা মানবে, যারা ইহুদীদের ধর্মের অনুগামী এবং মূসা আ. এর শরী'য়তের অনুসারী বলে দাবিদার।

কোন কোন মুফাসসির وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ এর এ অর্থ করেছেন যে, তোমাদের এই যে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করা এবং নিজেদের মুসলমান বলে প্রকাশ করা– এটা শুধু তাদের জন্য, যারা তোমাদের ধর্মের অনুসারী। অর্থাৎ এই তদবীর দ্বারা স্বধর্মবালম্বীদের হেফাজত উদ্দেশ্য যে, তারা যেন মুসলমান না হয়ে যায়, অথবা যারা হয়ে গেছে তারা যেন ফিরে আসে।

২. অর্থাৎ হেদায়েত তো আল্লাহ তাআলা দান করলেই পাওয়া যায়। যার দিলে আল্লাহ হেদায়েতের নূর ঢেলে দিয়েছেন, সে তোমাদের এসব চালাকিতে পথভ্রষ্ট হওয়ার নয়।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তোমাদের রবের সামনে (যুক্তিতর্কে) তোমাদের উপর জয়ী হবে কেন?

৩. অর্থাৎ সেসব ধোঁকাবাজি ও ষড়যন্ত্র শুধু হিংসাবশত এবং এই অন্তর্জালায় করা হয় যে, অন্যদেরও কেন শরী'য়ত, নবুওয়াত ও রেসালাত দেওয়া হচ্ছে, যেমন ইতিপূর্বে তোমাদের (হে কিতাবীরা) দেওয়া হয়েছিল? অথবা দীনী ও ধর্মীয় চেষ্টা-সাধনায় অন্য লোকেরা কেন তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাচ্ছে এবং খোদার সামনে তোমাদের অভিযুক্ত করছে?

ইহুদীরা সর্বদা এ কথা প্রচার করে এসেছে যে, দুনিয়াতে কেবল তারাই ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী। তাওরাত তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে, মূসার মত মহান পয়গম্বর তাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। এই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে আরব-নিরক্ষরদের কী সম্পর্ক!

তাওরাতের একটি ভবিষ্যদ্বানী

কিন্তু তাওরাতে বর্ণিত সেই বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী ভ্রান্ত হওয়ার ছিল না, যাতে বলা হয়েছে– আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলের ভাই বনী ইসমাঈলের মধ্য থেকে মূসারই মত একজন স্বতন্ত্র শরী'য়তধারী নবীর আবির্ভাব ঘটাবেন, তাঁর মুখে স্বীয় কালাম (কুরআন কারীম) তুলে

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

বলুন, 'শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহরই হাতে, তিনি তা যাকে ইচ্ছা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

৭৪. 'তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় মেহেরবানীর জন্য বিশেষভাবে মনোনীত করে নেন। আর আল্লাহ মহা দয়াবান[১]।'

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ

৭৫. কিতাবীদের মধ্যে কতক এমন যে, যদি তুমি তাদের নিকট ধনের স্তূপ আমানত রাখ, তবে তা তোমাকে পরিশোধ করে দেবে। আবার ওদের মধ্যে কতক এমনও রয়েছে যে, যদি তুমি তাদের নিকট একটি দীনারও আমানত রাখ, তবে তোমাকে তা ফেরত দেবে না, যাবৎ না তুমি তাদের মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাক[২]। এটা এ কারণে যে, ওরা বলে

ধরবেন। সূরা মুয্যাম্মিলের ১ম রুকূতে (আয়াত ১৫) ইরশাদ হয়েছে– إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্যপ্রদানকারী, যেমন পাঠিয়েছিলাম ফেরাওনের প্রতি এক রাসূল)। অতএব বনী ইসমাঈল এ দৌলত লাভ করে এবং তাঁরা জ্ঞান-গরিমা, যুক্তি-প্রমাণ ও ধর্মীয় চেষ্টা-সাধনার ময়দানে কেবল বনী ইসরাঈলকেই নয় বরং পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর সকলকে ছাড়িয়ে যায়। فالحمد لله على ذلك

বি. দ্র. এই আয়াতটির তাফসীর একাধিকভাবে করা হয়েছে। আমরা এস্থলে সেই তাফসীরই অবলম্বন করেছি, যার প্রতি তরজমায় ইঙ্গিত রয়েছে।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ভাণ্ডার অফুরন্ত, তদুপরি তিনিই ভাল জানেন, কে কোন্ শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়ার যোগ্য। নবুওয়াত, শরী'য়ত, ঈমান-ইসলাম এবং সর্বপ্রকার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক যোগ্যতা ও গুণাবলির বণ্টন তাঁরই হাতে– যখন যাকে সংগত মনে করেন তাকে দান করেন।

২. আহলে কিতাবের ধর্মীয় খেয়ানত ও মুনাফিকীর আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে তাদের পার্থিব খেয়ানতের কথাও এসে গেছে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, যারা সামান্য পয়সার জন্য নিয়ত খারাপ করে ফেলে এবং আমানতের হেফাজত করতে পারে না, ধর্মীয় বিষয়ে ওরা বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে বলে কোনই আশা করা যায় না। দেখ, ওদের মধ্যে এমন অনেক লোক রয়েছে, যাদের নিকট বেশি নয় একটি স্বর্ণমুদ্রা আমানত রাখলে একটু পরেই অস্বীকার করে বসে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাগাদার জন্য সব সময় একজন ওদের মাথার উপর খাড়া এবং পিছে লেগে না থাকে, ততক্ষণ আমানত আদায় করে না।

রেখেছে, 'নিরক্ষর লোকদের ক্ষেত্রে আমাদের কোন গোনাহ নেই[১]।' আসলে ওরা জেনেশুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে[২]।	وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ۝
৭৬. কেন নয়, (নিশ্চয় গোনাহ হবে)– যে কেউ স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং সে পরহেজগারও বটে, তো আল্লাহ পরহেজগারদের ভালবাসেন[৩]।	بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ۝
৭৭. যারা আল্লাহর (সঙ্গে কৃত) অঙ্গীকার ও নিজেদের শপথের পরিবর্তে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করে[৪], নিশ্চয় আখেরাতে ওদের কোনই	اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ

অবশ্য ওদের সকলেই যে এক রকম তা নয়। কতক এমনো আছে যে, তাদের নিকট সোনার স্তূপ রেখে দিলেও এক রত্তিও খেয়ানত করবে না। কিন্তু এমন ভদ্র ও বিশ্বস্ত লোকেরাই ইহুদীদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে ইসলামের শীতল ছায়াতলে স্থান নিচ্ছে, যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

১. অর্থাৎ পরের হক খাওয়ার জন্য এ মাসআলা গড়েছিল যে, আরব-নিরক্ষররা যারা ওদের ধর্মমতের উপর নয়, তাদের ধন-সম্পদ যেভাবেই হস্তগত করা হোক তা বৈধ। অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমানতে খেয়ানত করলে কোন গোনাহ নেই, বিশেষকরে আরবের যারা স্বীয় বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছে– আল্লাহ তাদের ধন ওদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন!!

২. অর্থাৎ জেনেশুনে আল্লাহ তাআলার উপর মিথ্যারোপ করছে– আমানতে খেয়ানত করার অনুমতি তিনি কস্মিনকালেও দেননি। আজও ইসলামী শরীয়তের বিধান এই যে, মুসলিম বা কাফের কারো আমানতে খেয়ানত করা জায়েয নয়।

৩. অর্থাৎ খেয়ানত ও প্রতিশ্রুতিভঙ্গে গোনাহ কেন হবে না, যেখানে আল্লাহ তাআলার মৌলিক নীতি এই যে, যে কেউ আল্লাহ ও বান্দাদের সঙ্গে কৃত ওয়াদা-অঙ্গীকার রক্ষা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে চলবে অর্থাৎ মন্দ চিন্তা, ঘৃণ্য আমল ও অসৎ চরিত্র পরিহার করবে— তাকেই আল্লাহ ভালবাসেন। আমানতদারীর গুণও এর অন্তর্ভুক্ত।

৪. অর্থাৎ যারা দুনিয়ার সামান্য ধন-সম্পদ নিয়ে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কৃত ওয়াদা ও নিজেদের পরস্পরের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ফেলে, পরস্পরের মুআমালাও ঠিক রাখে না, আল্লাহর সঙ্গে যে ওয়াদা-অঙ্গীকার হয়েছিল তার উপরও কায়েম থাকে না, বরং সম্পদ ও সম্মানের লোভে পড়ে শরী'য়তের বিধান পরিবর্তন ও আসমানী কিতাবের বিকৃতি সাধন করতে থাকে।

لَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

অংশ নেই এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ ওদের সাথে কথা বলবেন না, ওদের প্রতি দৃষ্টি দেবেন না এবং ওদের পবিত্র করবেন না। আর ওদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি[১]।

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَمِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَمِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَمِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

৭৮. নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে এমন একদল আছে, যারা নিজেদের জিহ্বা মোচড়িয়ে কিতাব পড়ে, যাতে তোমরা তাকে কিতাবের অংশ মনে কর, অথচ তা কিতাবের অংশ নয়। এবং ওরা বলে, 'এ আল্লাহর নিকট থেকে, অথচ তা আল্লাহর নিকট থেকে নয়[২]। আর ওরা জেনেশুনে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে।

এদের শাস্তির কথা সম্মুখে বর্ণিত হবে। হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, "আল্লাহ তাআলা ইহুদীদের থেকে শপথ নিয়েছিলেন যে, 'তোমরা প্রত্যেক নবীর সাহায্যকারী থাকবে।" অতঃপর ওরা দুনিয়ার স্বার্থ-লোভে তা থেকে ফিরে যায়। এ ছিল ইহুদীদের চরিত্র। বলা বাহুল্য, যে কেউ দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, তার এই অবস্থাই হয়।

১. এ ধরনের আয়াত সূরা বাকারার একুশতম রুকুর মধ্যে (আয়াত : ১৭৪) রয়েছে। এই শব্দাবলির তাফসীর সেখানে দ্রষ্টব্য।

২. এখানে কিতাবধারীদের তাহরীফের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আসমানী কিতাবে ওরা নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু বিষয়াদি বাড়িয়ে-কমিয়ে এমন ভঙ্গি ও সুরে পড়ে, যাতে অনভিজ্ঞ শ্রোতা ধোঁকা খায় এবং মনে করে যে, এও আসমানী কিতাবের অংশ। অধিকন্তু কিতাবীরা মুখে দাবিও করে যে, এই সব আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে এসেছে। অথচ তা না কিতাবে আছে, না আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে। বরং খোদ ঐ বিকৃত কিতাবকেও সমষ্টিগতভাবে আল্লাহর কিতাব বলা যায় না। কেননা, তাতে বিভিন্ন রকম কারসাজি ও জালিয়াতি করা হয়েছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে বাইবেলের যেসব কপি মজুদ রয়েছে, সেগুলির পরস্পরের মধ্যে বহু মতভেদ পাওয়া যায়। এমনকি, কোন কোন বিষয় এমনো আছে যা আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে কিছুতেই হতে পারে না। বিখ্যাত আরবী তাফসীর 'রূহুল মাআনী' গ্রন্থে এর বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। আর ওদের তাহরীফ তথা ধর্মগ্রন্থের বিকৃতির প্রমাণে আমাদের আলেমগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের উত্তম জাযা দান করুন।

৭৯. কোন মানুষের জন্য এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হেকমত ও নবুওয়াত দান করবেন, অতঃপর সে লোকদের বলবে, 'তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও১।' কিন্তু (ওহে কিতাবীরা!

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ

১. **শানে নুযূল**

নাজরান-প্রতিনিধি দলের উপস্থিতিতে কতিপয় ইহুদী ও খ্রিস্টান বলেছিল, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি কি চান, খ্রিস্টানরা যেভাবে ঈসা ইবনে মারয়ামের পূজা করে, আমরাও সেভাবে আপনার উপাসনা করি? তিনি বললেন, আমরা এ থেকে আল্লাহর পানাহ চাই যে, আমরা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারো ইবাদত করি অথবা অন্যদের এর প্রতি আহ্বান করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের এ কাজের জন্য পাঠাননি। এ পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাফসীরে তবারী : ৫/৫২৪; আলউজাব : ১/২০৫)

অর্থাৎ, যে মানুষকে আল্লাহ তাআলা কিতাব, হেকমত ও বিচার-শক্তি দান করেন এবং নবুওয়াতের মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন, যাতে তিনি আল্লাহ তাআলার বাণীকে সঠিকভাবে পৌঁছিয়ে লোকদেরকে আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের প্রতি মনোযোগী করতে পারেন, সেই মানুষের দ্বারা এ কাজ কখনো হতে পারে না যে, তিনি তাদের এক আল্লাহর বন্দেগী থেকে হটিয়ে স্বয়ং নিজের বা অন্য কোনো সৃষ্টিজীবের বান্দা বানাবেন। এর অর্থ তো হবে, আল্লাহ তাআলা যাকে যে দায়িত্বের যোগ্য জেনে পাঠিয়েছেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে সে তার যোগ্য ছিল না।

দুনিয়ার কোন সরকার অযোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করে না

দুনিয়ার কোন সরকারও কোন ব্যক্তিকে বিশেষ দায়িত্ব-পদে নিয়োগ করতে চাইলে প্রথমে দুটি বিষয় চিন্তা করে: এক, এ ব্যক্তি সরকারের পলিসি বোঝার ও স্বীয় কর্তব্য পালন করার যোগ্যতা রাখে কি না। দুই, সরকারী হুকুম পালন ও জনসাধারণকে সরকারের অনুগত রাখার কতটুকু আশা তার দ্বারা করা যায়। রাষ্ট্রপ্রধান বা পার্লামেন্ট এমন মানুষকে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বা দূত নিয়োগ করতে পারে না, যার দ্বারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়ানোর বা তার পলিসি ও বিধানের অবাধ্য হওয়ার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হবে। অবশ্য তার যোগ্যতা বা আনুগত্যের পরিমাণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিতে সরকার কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থ হল– এ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আল্লাহ পাকের ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনাও নেই। যদি কারো সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানে থাকে যে, সে আমার প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য থেকে বিন্দুমাত্র হটবে না, তবে পরবর্তী সময়ে এর ব্যতিক্রম হওয়া অসম্ভব। অন্যথায় আল্লাহর জ্ঞানে ভ্রান্তি ধরা পড়ে। এরূপ ধারণা থেকে আল্লাহ তাআলার পানাহ!

আয়াতের আরো শিক্ষাসমূহ

এখান থেকে নবীগণের 'ইসমত' বা নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টিও বুঝে আসে। যেমন, ইমাম আবু হায়্যান ও মাওলানা কাসেম নানুতবীর মত মনীষীগণ স্ব স্ব রচনায় আলোচনা করেছেন।

كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۙ﴿۷۹﴾

রাসূল তোমাদের বলছেন,) 'তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, যেমন তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও (তা) পাঠ করতে[১]।'

وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۸۰﴾

৮০. আর সে তোমাদের এ আদেশও করবে না যে, 'তোমরা ফেরেশতা ও নবীগণকে রব সাব্যস্ত কর[২]।' তোমরা মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদের কুফর করতে বলবে[৩]?

সুতরাং নবীগণ যেখানে সামান্যতম গোনাহ থেকে পবিত্র, সেক্ষেত্রে শিরক ও আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা কোথায়? এতে খ্রিস্টানদের এ দাবিও খণ্ডন হয়ে গেল যে, মাসীহ আ. নিজেই তাঁর ঈশ্বর ও ঈশ্বরপুত্র হওয়ার আকীদা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তদুপরি, এ দ্বারা ঐ মুসলমানদেরও নসীহত হয়ে গেল, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করেছিলেন, সালামের বদলে আমরা আপনাকে সেজদা করলে ক্ষতি কী? অধিকন্তু এতে আহলে কিতাবকেও সতর্ক করা হয়েছে, যারা নিজেদের মধ্যকার যাহেদ-আবেদ ও পাদ্রিদের খোদার মর্যাদা দিয়ে রেখেছিল।

বি. দ্র. প্রখ্যাত মুফাসসির আবু হায়্যানের মতে مَا كَانَ لِبَشَرٍ الخ –এ যে نفي তথা না-সূচক অর্থ রয়েছে, তা তেমন যেমন مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا, অথবা وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللهِ –এর نفي। (এ-ই আমার নিকট অধিকতর ঠিক)।

১. 'মুযেহুল কুরআন' গ্রন্থে আছে, যাকে আল্লাহ তাআলা নবী বানান এবং যিনি লোকদের কুফর-শিরক থেকে বের করে ইসলামে প্রবেশ করান, তিনি তাদের কুফর শিক্ষা দেবেন কীভাবে? হাঁ, (ওহে আহলে-কিতাব!) তিনি তোমাদের বলছেন যে, 'পূর্বে তোমাদের মধ্যে যে দীনদারী ছিল– অর্থাৎ ধর্মীয় কিতাব পড়া ও পড়ানো, তা আর রয়নি। এখন আমার সাহচর্যে সেই গুণ হাসিল কর।' আর তোমরা আলেম, হাকীম, ফকীহ, আরেফ, চিন্তাশীল, মুত্তাকী ও আল্লাহর পাক্কা ইবাদতকারী হয়ে যাও। মনে রেখো, এই সব বিষয় বর্তমানে কুরআন কারীম পড়ে ও পড়িয়ে এবং শিখে ও শিখিয়েই হাসিল করা যেতে পারে।

২. যেমন নাসারারা মাসীহ ও 'রূহুল কুদুসকে', ইহুদীদের কেউ কেউ উযাইরকে এবং মুশরিকদের মধ্যে কেউ কেউ ফেরেশতাদেরকে 'রব' সাব্যস্ত করেছিল। আর ফেরেশতা ও পয়গম্বরই যখন আল্লাহর শরীক হতে পারেন না, তখন পাথরের মূর্তি ও ক্রুশের কাঠ তো কোন্ ছাই!

৩. অর্থাৎ প্রথমে তো তিনি রব্বানী (বা আল্লাহওয়ালা) ও তাওহীদবাদী মুসলমান বানাতে চেষ্টা করলেন। যখন লোকেরা তা গ্রহণ করে নিল, তখন কি তিনি তাদের শিরক ও কুফরীর দিকে নিয়ে যাবেন এবং নিজ হাতেই নিজের সকল সাধনা ও সুফসল ধ্বংস করে দেবেন? এ কোন সুস্থবুদ্ধির কথা নয়।

[রুকূ - ৯]

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ

৮১. (স্মরণ কর), যখন আল্লাহ নবীদের থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, 'আমি তোমাদের যে কিতাব ও হেকমত (প্রজ্ঞা) দিয়েছি, তার পর (যদি) তোমাদের নিকট এমন কোন রাসূল আসেন যিনি তোমাদের নিকট যে কিতাব রয়েছে তার সত্যায়নকারী— তবে তোমরা অবশ্যই ঐ রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবে।' আল্লাহ বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এই বিষয়ে আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করলে?' তাঁরা বললেন, 'আমরা স্বীকার করলাম[১]।' তিনি

১. অর্থাৎ কোনো নবী (লোকদের) নিজ বন্দেগীর তালীম দিতে পারেন না, বন্দেগী একমাত্র আল্লাহ তাআলারই শেখানো হয়। অবশ্য নবীদের প্রাপ্য এই যে, লোকেরা তাঁদের প্রতি ঈমান আনবে, তাঁদের কথা শুনবে এবং সর্বপ্রকার সহায়তা করবে।

সাধারণ লোকদের তো কথাই নেই, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং পয়গম্বরদের থেকে এ মর্মে পরিপক্ক অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, যখন তোমাদের মধ্যকার কোন নবীর পর অন্য নবী আসবেন (যিনি নিশ্চিতরূপে পূর্ববর্তী নবীগণের ও তাঁদের কিতাবের এজমালী বা বিস্তারিতভাবে সমর্থন করবেন)– তখন পূর্ববর্তী নবীকে অবশ্যই পরবর্তী নবীর সত্যতার উপর ঈমান আনতে হবে এবং তাঁকে সাহায্য করতে হবে। জীবিত থাকলে তো নিজে, নতুবা নিজ উম্মতকে তাকীদ করে যাবেন যে, পরবর্তী নবীর উপর তারা যেন ঈমান এনে তাঁর সাহায্য-সহায়তা করে। এই ওসিয়ত করে যাওয়াও তাঁকে সাহায্য করার অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যাপারে নবীগণ থেকে শপথ গ্রহণ

এই সাধারণ নিয়মানুসারে দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা ও তাঁকে সাহায্য করার অঙ্গীকার ব্যতিক্রমহীনভাবে পূর্ববর্তী সকল নবী থেকে নেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা স্ব স্ব উম্মতের কাছ থেকেও এই ওয়াদা-অঙ্গীকার নিয়ে থাকবেন। কেননা, তাঁরই সত্তা –যা সকল গুণের ভাণ্ডার– গায়বের জগতে সর্বাগ্রে আর দৃশ্যমান জগতে সকল নবীর শেষে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। এবং তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন হওয়ার নয় এবং তাঁরই মহান অস্তিত্ব দ্বারা পূর্ববর্তী সকল নবী ও সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন: হযরত আলী রা., হযরত ইবনে আব্বাস রা. প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীগণ থেকে উল্লিখিত অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। এবং স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ۝

বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী আছি[১]।'

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ۝

৮২. এর পরও যারা ফিরে যাবে, তারাই হল নাফরমান[২]।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا

৮৩. তবে কি ওরা আল্লাহর দীন ছাড়া অন্য কোন দীন অন্বেষণ করে? অথচ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁরই আজ্ঞাবহ[৩]

ইরশাদ করেছেন, বর্তমানে মূসা আ. জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর হত না (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৫১৫৬; মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, হাদীস : ১০১৬৪)। তিনি আরো বলেছেন, যখন ঈসা আ. অবতীর্ণ হবেন তখন তিনি আল্লাহর কিতাব (কুরআন কারীম) এবং তোমাদের নবীর সুন্নত অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৫৫)

হাশরের 'শাফাআতে কুবরা'-র জন্য অগ্রসর হওয়া, তাঁর পতাকাতলে সকল মানবগোষ্ঠীর সমবেত হওয়া, শবে মেরাজে বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদের ভিতর নবীকুলের ইমামতি করা– এ সবই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত মহান ও সার্বজনীন শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্বেরই নিদর্শন।

اللّٰهُمَّ صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم

১. এই কথাগুলো শুধু অঙ্গীকারের তাকীদ ও গুরুত্বের জন্য বলা হয়েছে। কেননা, যে অঙ্গীকার-পত্রে আল্লাহ তাআলা ও পয়গম্বরদের সাক্ষ্য থাকবে, তার চেয়ে অধিক পরিপক্ক দলীল আর কী হতে পারে!

২. যে বিষয়ের অঙ্গীকার আল্লাহ তাআলা নবীকুল থেকে এবং নবীগণ স্ব স্ব উম্মত থেকে নিলেন, এখন যদি দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়– তবে নিঃসন্দেহে সে হবে চরম পর্যায়ের বিশ্বাসঘাতক ও নাফরমান। বাইবেলে প্রেরিত পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ের ২১-২২ পদে রয়েছে: 'যতদিন পর্যন্ত পবিত্র নবীগণের মুখে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার বিষয়াবলির বাস্তবায়ন না হবে, ততদিন আসমান তা (সেই অঙ্গীকার) অবশ্যই ধারণ করে রাখবে। কারণ মূসা বাপ-দাদাদের বলেছেন, তোমাদের রব আল্লাহ তাআলা তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমারই মত এক নবীর আবির্ভাব ঘটাবেন– যা কিছু তিনি তোমাদের বলবেন তা সবই তোমরা শুনবে।'

৩. অর্থাৎ চিরকালের জন্য ইসলামই হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম, যার অর্থ ফরমাবরদারী (বা আনুগত্য)। সুতরাং যখন আল্লাহ তাআলার কোন হুকুম কোন সত্যধারী ও সত্যবাদী পয়গম্বরের মাধ্যমে পৌঁছে, তখনি তার সম্মুখে মাথা নত করে দাও। সে মত বর্তমান কালে

وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

এবং তাঁরই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে[১]।

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾

৮৪. আপনি বলুন, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং তার প্রতি, যা আমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তার প্রতি, যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও (তাঁর) সন্তানসন্ততির উপর এবং তার প্রতি, যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে প্রদান করা হয়েছিল তাদের রবের পক্ষ থেকে। আমরা তাদের মধ্যে কারো ক্ষেত্রে পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই আজ্ঞাবহ[২]।'

যে আহকাম ও হেদায়েত নবীকুলের সর্দার শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন, তাই খোদার প্রেরিত ধর্ম। ওরা কি তা ছেড়ে মুক্তি ও সাফল্যের অন্য কোন রাস্তা খোঁজে? ওরা ভাল করে বুঝে রাখুক– খোদার দীন ছেড়ে চিরমুক্তি ও সত্যিকার সাফল্য কোথাও পাওয়া যেতে পারে না।

মানুষের জন্য শোভনীয় নয় যে, সে নিজ ইচ্ছায় ও খুশীতে সেই আল্লাহর ফরমাবরদারী ও আনুগত্য গ্রহণ না করবে, যে আল্লাহর সৃষ্টিগত হুকুমের অধীন আসমান-যমীনের সব জিনিস– চাই খুশী ও স্বেচ্ছায় হোক, যেমনঃ ফেরেশতা ও আজ্ঞাবহ বান্দারা; কিংবা বাধ্য ও অনন্যোপায় হয়ে হোক, যেমনঃ বিশ্বজগতের ছোটবড় সবকিছুর মধ্যে তাদের ইচ্ছা ছাড়াই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা প্রকাশিত ও সংঘটিত হয়।

১. যেহেতু শেষ পর্যন্ত সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে, সুতরাং বুদ্ধিমানের উচিত, পূর্ব থেকেই নিজেকে প্রস্তুত রাখা। এখানে নাফরমানী বা অবাধ্যতা করলে সেখানে মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না।

২. অর্থাৎ যখন যা কিছু আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে অথবা কোন পয়গম্বরকে দেওয়া হয়েছে, আমরা বিনা পার্থক্যে সবকিছুকে সত্য মানি। একজন আজ্ঞাবহ মুসলমানের কাজ এই নয় যে, খোদার কোনো পয়গম্বরকে মানবে আর কোনো পয়গম্বরকে মানবে না। মূলত সর্বশেষে وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ বলে ইসলামের তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়া হল এবং জানিয়ে দেওয়া হল যে, ইসলাম কোন সত্য নবী ও কোন আসমানী গ্রন্থকে মিথ্যা বলার পক্ষপাতী নয়। ইসলামের মতে, কুরআন কারীম বা শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অমান্য করা যেমন কুফর, তেমনি কোন এক নবী বা আসমানী গ্রন্থ অস্বীকার করলেও মানুষ কাফের হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে সর্বশেষ নবীর এই শানই হওয়া উচিত যে, তিনি পূর্ববর্তী সকল কিতাব ও নবীর সমর্থনকারী হবেন এবং যাদের কাছে আঞ্চলিক সতর্ককারী

৮৫. আর যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ থেকে তা মোটেই গ্রহণ করা হবে না[১]। আর সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে[২]।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۝

৮৬. আল্লাহ সেই সম্প্রদায়কে কীভাবে পথ প্রদর্শন করবেন, যারা কাফের হয়ে গেছে ঈমান আনার পর এবং রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দান ও তাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শনাদি আসার পর? আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না[৩]।

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۝

ও হেদায়েতকারীর আগমন হয়েছিল, এমন সব জাতিকে মহাসমন্বয়ের সর্ববৃহৎ পতাকাতলে সমবেত হওয়ার পথ দেখাবেন।

বি. দ্র. এ ধরনের আয়াত প্রথম পারার শেষের দিকেও (আয়াত ১৩৬) রয়েছে, তার তাফসীর দ্রষ্টব্য।

১. অর্থাৎ যখন খোদার দীন (ইসলাম) পরিপূর্ণরূপে এসে গেছে, তখন কোন মিথ্যা বা অপরিপূর্ণ দীন গ্রহণ করা যায় না। সূর্যোদয়ের পর কেরোসিনের চেরাগ জ্বালানো অথবা গ্যাস, বিজলী ও তারকারাজির আলো তালাশ করা নিতান্তই অর্থহীন ও স্পষ্ট বোকামি। আঞ্চলিক নবুওয়াত ও হেদায়েতের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন সর্বশ্রেষ্ঠ, আখেরী ও বিশ্বজনীন নবুওয়াত ও হেদায়েত থেকেই আলো হাসিল করা বাঞ্ছনীয়। কেননা, এ আলো সব আঞ্চলিক আলোর কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার, পূর্বেকার সকল আলো যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন কবি বলেন-

فإنك شمس والملوك كواكب ÷ إذا طلعت لم يبد منهن كوكب.

('তুমি সূর্যসম্রাট আর রাজন্যবর্গ হচ্ছে তারকাপুঞ্জ– সূর্যোদয়ের পর তারকারাজির একটিও দেখা যায় না।')

২. অর্থাৎ ছওয়াব ও কামিয়াবী থেকে একেবারেই বঞ্চিত হবে। মূলধনই হারিয়ে ফেলার চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী হতে পারে? সত্য গ্রহণের যে যোগ্যতা দিয়ে আল্লাহ তাআলা পয়দা করেছিলেন, সে তো স্বীয় অসৎ ক্ষমতা ও অসদাচরণ দ্বারা তাও বিনষ্ট করে দিল। (এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী হবে?)

৩. যারা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর জেনেশুনে কুফরী অবলম্বন করেছে, অর্থাৎ তারা অন্তরে বিশ্বাস রাখে এবং চোখে সত্য দেখছে বরং নিজেদের খাস বৈঠকে স্বীকার করে যে, এই রাসূল সত্য; তাঁর সততা ও সত্যতার উজ্জ্বল প্রমাণ, সুস্পষ্ট নিদর্শন ও পরিষ্কার সুসংবাদসমূহ ওদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে, এতদসত্ত্বেও গর্ব ও হিংসার বশবর্তী হয়ে এবং সম্মানের মোহে

أُولَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمۡ أَنَّ عَلَيۡهِمۡ لَعۡنَةَ ٱللَّهِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ ﴿٨٧﴾

৮৭. ওদের শাস্তি এই যে, ওদের উপরে আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষ– সকলের লা'নত[১]

خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮. যাতে ওরা চিরকাল থাকবে[২]। ওদের থেকে শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং ওদের অবকাশও দেওয়া হবে না[৩]।

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾

৮৯. তবে তার পর যারা তওবা করবে এবং (নিজেদের) পরিশুদ্ধ করে নেবে, তো নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৪]।

কুফর ও শত্রুতা বর্জন করে ইসলাম গ্রহণ করছে না, যেমন অধিকাংশ ইহুদী ও খ্রিস্টানদের অবস্থা ছিল– এমন হঠকারী, জেদী, শত্রুদের ব্যাপারে কেমন করে আশা করা যায় যে, এরূপ মনোভাবের উপর দৃঢ় থাকাকালে আল্লাহ তাআলা ওদেরকে মুক্তি, কল্যাণ ও স্বীয় সন্তুষ্টির পথে নিয়ে যাবেন অথবা বেহেশত পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা (করে) দেবেন? এমন বেইনসাফ, একগুয়ে জালেমদেরকে প্রকৃত কামিয়াবীর রাস্তা দেওয়া তাঁর নিয়ম নয়।

এ থেকেই সেই হতভাগ্যদের সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে, যারা অন্তরের মারেফত ও বিশ্বাসের ধাপ থেকে অগ্রসর হয়ে একবার মুসলমানও হয়েছিল, তারপর পার্থিব স্বার্থে ও শয়তানী ধোঁকায় পড়ে ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছে। এরা বরং প্রথম দল থেকেও অধিক বক্র ও বেহায়া। ফলে অধিকতর অভিশাপ ও শাস্তির যোগ্য হবে।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা স্বয়ং এবং সেই সাথে ফেরশতা, মুসলমান– সকলে ওদের উপর অভিশাপ করেন। এবং প্রত্যেক মানুষ, এমনকি ওরা নিজেরাও নিজেদের উপর অভিশাপ করে থাকে, যখন ওরা বলে, জালেম ও মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত!! যদিও ওরা বোঝে না, এই লানত ওদের উপরই পতিত হচ্ছে।

২. অর্থাৎ এই লানতের ক্রিয়া চিরকাল থাকবে– দুনিয়াতে অভিসম্পাত ও আখেরাতে আল্লাহ তাআলার শাস্তিরূপে।

৩. অর্থাৎ ওরা কখনই শাস্তির কঠোরতায় কমতি অনুভব করবে না এবং কিছুক্ষণের জন্য আযাব স্থগিত করে ওদের আরামও দেওয়া হবে না।

৪. এমন কঠিন বদকার, গোনাহগার ও ঘোর বিদ্রোহীকে কোন বাদশাহ ক্ষমা করতে পারে কি? কিন্তু এ একমাত্র সেই গাফূর ও রহীমেরই দরবার, যেখানে এমন শক্ত অপরাধ ও বিদ্রোহের পরও অপরাধী অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি দিলে তওবা করলে এবং সঠিক চাল-চলন অবলম্বন করলে সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

৯০. যারা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছে, অতঃপর কুফরের মধ্যে বাড়তে থেকেছে, নিশ্চয় তাদের তওবা কখনো কবুল করা হবে না, আর তারাই পথভ্রষ্ট[১]।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۝

৯১. যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের কারো থেকে সমগ্র পৃথিবী ভরতি সোনাও কখনই গ্রহণ করা হবে না[২] যদিও সে মুক্তিপণরূপে তা প্রদান করে। ওদেরই জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি এবং ওদের কোন সাহায্যকারী নেই[৩]।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ۝

আয় আল্লাহ! আমার গোনাহ ক্ষমা করে দিন। আপনি তো বড়ই ক্ষমাপ্রিয়, দয়ালু। (সেই সাথে অনুবাদক ও পাঠকদেরও ক্ষমা করে দিন। আমাদের সকলকে তওবা করার তাওফীক দিন এবং আপনার দয়ায় মাফ করুন। –অনুবাদক)

১. অর্থাৎ যারা সত্যকে মেনে নেওয়ার পর বুঝেশুনে তা অস্বীকার করল, তারপর শেষ পর্যন্ত অস্বীকৃতির মধ্যে উন্নতি করতে থাকল, কখনো কুফর থেকে সরবার নামও নেয়নি এবং সত্য ও সত্যপন্থীদের সঙ্গে শত্রুতাও ছাড়েনি, বরং নিরবচ্ছিন্নভাবে সত্যের অনুসারীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে থেকেছে। অবশেষে যখন মৃত্যু এল এবং ফেরেশতা জান বের করতে লাগলেন তখন তওবার চিন্তা হল, অথবা কখনো কোন স্বার্থের কারণে বাহ্যত তওবার গতানুগতিক শব্দাবলি শুধু মুখে উচ্চারণ করে নিল, কিংবা কুফরের হালতে থাকাবস্থায়ই অন্য এমন কিছু আমল থেকে তওবা করে নিল যাকে নিজ জ্ঞানে গোনাহ মনে করত– এই সব তওবা কোন কাজের নয়। আল্লাহ তাআলার দরবারে এগুলো কবুল হওয়ার কোনই আশা নেই। বরং কবুল হওয়ার মত খাঁটি তওবা এমন লোকদের ভাগ্যে জুটবেই না। সর্বদা গোমরাহীর রাজ্যে দিশাহারা হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকাই ওদের কাজ।

২. অর্থাৎ দুনিয়ার শাসকদের ন্যায় সেখানে আল্লাহর দরবারে সোনা-রূপার (বা টাকা পয়সার) ঘুষ চলবে না। সেখানে কাজের জিনিস তো হচ্ছে একমাত্র ঈমান। মনে করুন, একজন কাফের এত বড় ধনী যে, সমস্ত জমিন ভরে যায় এত সোনা ওর আছে এবং তা সবই দান-খয়রাত করে দেয়– তবুও আল্লাহ তাআলার নিকট এর কোনই মূল্য নেই। আখেরাতেও এই আমল কোন কাজে আসবে না। কারণ, আমলের রূহ হচ্ছে ঈমান, আর রূহ-শূন্য আমল মৃতের মত– তা আখেরাতের অনন্ত জীবনে কোন কাজের হতে পারে না।

৩. অর্থাৎ মনে করুন, কাফেরের নিকট সেখানে ওই পরিমাণ সম্পদ রয়েছে এবং নিজের পক্ষ থেকে সবিনয়ে দরখাস্ত করে মুক্তিপণ স্বরূপ তা সবই পেশ করে মুক্তি পেতে চাইল— তবুও

পারা ৪ [রুকূ - ১০]

৯২. তোমরা কখনো (পরম) পুণ্য হাসিল করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে কিছু ব্যয় কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, অবশ্যই আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত[১]।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

৯৩. তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে সকল খাদ্যবস্তু বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল- শুধু তা

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا

তা কবুল করা হবে না। আর যদি পেশই না করে, তবে তো কোন কথাই নেই। সূরা মায়েদার ৬ষ্ঠ রুকূতে আছে (আয়াত ৩৬)-

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

(যারা কাফের, ওদের নিকট যদি পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো থাকে, যাতে কিয়ামত দিবসের শাস্তির বদলে তা দিতে পারে, তবুও ওদের থেকে তা কবুল করা হবে না। আর ওদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি।)

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার জানা আছে, তোমাদের কে কেমন জিনিস খরচ করেছে, কোথায় খরচ করেছে এবং কী জন্য খরচ করেছে। যতটুকু প্রিয় বস্তু, যে রকম খরচের স্থানে, যে পরিমাণ এখলাস ও সৎ নিয়তে খরচ করবে, সেই অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার নিকট বিনিময় পাওয়ার আশা রাখবে। সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেকী হাসিল করতে চাইলে তোমাদের সব চেয়ে প্রিয় বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে কিছু আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যে জিনিসের প্রতি দিলের আকর্ষণ যত বেশি, তা ব্যয় করার মর্তবা তত বেশি। এমনি তো যে কোন বস্তু ব্যয়েই ছওয়াব রয়েছে। আর ইহুদী (ও খ্রিস্টান)-দের আলোচনার মধ্যে এই আয়াত নাযিল করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই ইশারা করা যে, যেহেতু ওদের নিকট নিজেদের সর্দারী-মাতব্বরী খুবই প্রিয় ছিল, যা অক্ষুণ্ন রাখার খাতিরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হচ্ছিল না, সেহেতু তা-ই আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বিসর্জন না করা পর্যন্ত ওরা ঈমানের মর্তবা হাসিল করতে পারবে না।'

পূর্বা-পর সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে বর্তমান আয়াতের সম্পর্ক এই যে, সেখানে বলা হয়েছে, কাফেরদের ধন-সম্পদ ব্যয় করা বৃথা, পক্ষান্তরে এখানে বলা হচ্ছে যে, মুমিন যা কিছু ব্যয় করে তা দ্বারা পুণ্যে পরিপূর্ণতা হাসিল হতে থাকে।

ছাড়া, যা ইসরাঈল নিজের জন্য হারাম করেছিলেন[১]। আপনি বলুন, 'তোমরা তাওরাত নিয়ে আস এবং তা পাঠ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও[২]।'

مَا حَرَّمَ اِسۡرَآءِيۡلُ عَلٰى نَفۡسِهٖ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ تُنَزَّلَ التَّوۡرٰىةُ ؕ قُلۡ فَاۡتُوۡا بِالتَّوۡرٰىةِ فَاتۡلُوۡهَاۤ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ﴿۹۳﴾

১. **শানে নুযূল**

ইহুদীরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের বলত, 'আপনারা নিজেদের ইবরাহীমের ধর্মের অনুসারী কেমন করে বলেন? আপনারা তো সেইসব জিনিস খান, যা আল্লাহ তাআলা ইবরাহীমের পরিজনের জন্য হারাম করেছিলেন, যেমন উটের গোশত ও দুধ।

(এর উত্তরে) আল্লাহ তাআলা বলছেন, লোকেরা এখন যা খায় তা সবই ইবরাহীমের সময় হালাল ছিল, যাবৎ না তাওরাত নাযিল হয়। তাওরাতে অবশ্য একমাত্র বনী ইসরাঈলের জন্য কতিপয় জিনিস হারাম হয়ে যায়।

আর (তাওরাতপূর্ব সময়ে) হযরত ইসরাঈল (ইয়াকূব) আলাইহিস সালাম শুধু উটের গোশত খাবেন না বলে কসম করেছিলেন। তাঁর অনুসরণে তাঁর সন্তানরাও তা বর্জন করে। বিশেষ ব্যথাজনিত কারণে তিনি মানত করেছিলেন যে, আরোগ্য রাভ করলে নিজের আকর্ষণীয় দ্রব্য বর্জন করবেন। তাঁর নিকট উটের গোশত ও দুধই আর্কষণীয় ছিল বলে কসমের কারণে এ দুটি বর্জন করলেন। (যাই হোক, এ দু'টি বস্তু ইবরাহীম আ.-এর যুগে হালাল ছিল, হারাম ছিল না)।

হালাল জিনিসকে হারাম করে— এমন কসম আমাদের শরী'য়তে জায়েয নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ('হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি তা হারাম করেন কেন?' সূরা তাহরীম : আয়াত ১)। কেউ যদি এমন কসম খেয়ে বসে, তবে তা ভেঙ্গে ফেলবে এবং কাফ্ফারা আদায় করবে।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

পূর্বের (৯২) আয়াতে প্রিয় জিনিস ব্যয় করার উল্লেখ ছিল। বর্তমান আয়াতে ইয়াকূব আ. এর একটি প্রিয় জিনিস বর্জন করার কথা উল্লেখিত হল। এই হিসাবে আয়াত দুটির মধ্যে সূক্ষ্ম সম্পর্ক রয়েছে।

আয়াতটিতে এও জানিয়ে দেওয়া হল যে, পূর্ববর্তী শরী'য়তসমূহে নস্খ (রহিতকরণ) সংঘটিত হত– যেমন : যে জিনিস এককালে হালাল ছিল পরে তা হারাম হয়েছে। এভাবেই যদি এখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'য়ত ও পূর্ববর্তী শরী'য়তসমূহের মধ্যে হালাল ও হারামের হিসাবে পার্থক্য হয়, তবে তাকে অসম্ভব মনে করার ও অস্বীকার করার কোনই কারণ নেই।

২. অর্থাৎ তোমরা যদি এতে সত্যবাদী হও যে, ওই জিনিসগুলি (উটের গোশত ও দুধ) ইবরাহীমের সময় থেকে হারাম ছিল, তবে তোমাদের কিতাব তাওরাতে তা দেখাও। তাতে যদি না পাওয়া যায় তবে তোমাদের মিথ্যাবাদী হওয়ার মধ্যে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে

৯৪. সুতরাং এর পরও যারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করবে, তারাই (বড়) জালিম[১]।

فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

৯৫. আপনি বলুন, 'আল্লাহ সত্য বলেছেন, সুতরাং তোমরা ইবরাহীমের দীনের অনুগত হয়ে যাও, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না[২]।

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۫ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِیْمَ حَنِیْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۝

৯৬. সর্বপ্রথম ঘর যা মানবজাতির জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সেটি, যা মক্কায় অবস্থিত- যা বরকতময় ও বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক[৩]।

اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝

না। হাদীসে আছে, ইহুদীরা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। (তাফসীরে তবারী ৫/৫৮০-৫৮১) আর এভাবে উম্মী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতার আরো একটি দলীল প্রতিষ্ঠিত হল।

১. অর্থাৎ এর পরও যদি তোমরা নিজেদের সেই পুরনো মিথ্যা গীতই গাইতে থাক যে, 'না, না, এসব জিনিস ইবরাহীমের সময় থেকে হারাম ছিল এবং আমরাই ইবরাহীমের ধর্মের আসল অনুসারী', তবে এ ভীষণ অবিচারের কথা হবে।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা হালাল ও হারাম সম্পর্কে, এমনিভাবে ইসলাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়ে ঠিক ঠিক খাঁটি ও নিরপেক্ষ কথা শুনিয়ে দিয়েছেন- যাকে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে না। এখন মুসলমানদের মত তোমাদেরও উচিত আসল দীনে-ইবরাহীম ও তার মৌলিক বিষয়াদির অনুসরণ ও অনুকরণ করা। আর খাঁটি তাওহীদই ছিল তার মৌলিক বিষয়াদির প্রধান জিনিস। অতএব তোমাদেরও উচিত- উযাইর, মাসীহ, পাদ্রি ও যাজকদের উপাসনা ছেড়ে দিয়ে পাক্কা তাওহীদবাদী মুসলমান হয়ে যাওয়া।

৩. মুসলমানদের দাবি, 'আমরা ইবরাহীম আ. এর সর্বাধিক নিকটবর্তী ও সাদৃশ্যধারী' -এতেও ইহুদীরা আপত্তি তুলল যে, 'ইবরাহীম আ. তাঁর আসল দেশ ইরাক ত্যাগ করে শামদেশে হিজরত করেন, সেখানেই তিনি বাস করেন, সেখানেই ওফাতপ্রাপ্ত হন। তাঁর পরে তাঁর সন্তান-সন্ততিও শামেই থাকেন। এই পবিত্র ভূখণ্ডে আরো কত নবীর আবির্ভাব হয়। তাঁদের সকলের কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসই ছিল। অতএব তোমরা হেজাযবাসী, যারা বাইতুল মুকাদ্দাসকে ছেড়ে কাবাকে নিজেদের কেবলা বানিয়েছ এবং শামদেশ থেকে দূরে একদিকে পড়ে আছ, কোন্ মুখে দাবি করতে পার যে, তোমরা ইবরাহীম ও তাঁর মিল্লাতের সর্বাধিক নৈকট্য ও সম্পর্কধারী?

বর্তমান আয়াতে এই অভিযোগকারীদের বলা হচ্ছে, বাইতুল মুকাদ্দাস ও অন্যান্য পবিত্র স্থান তো পরে নির্মিত হয়েছে। দুনিয়ার বুকে সর্বাগ্রে যে বরকতময় ঘর মানব জাতির

৯৭. তাতে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি, যেমনঃ মাকামে ইবরাহীম। আর যে ব্যক্তি সেই ঘরে প্রবেশ করল, সে নিরাপদ হয়ে গেল[১]। আর আল্লাহরই জন্য এ ঘরের হজ করা মানুষের উপর ফরয, (অর্থাৎ) যে সেখান পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তার উপর। আর কেউ অস্বীকার করলে, আল্লাহ তো বিশ্ববাসী থেকে (সম্পূর্ণ) অমুখাপেক্ষী[২]।

فِيهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

আল্লাহঅভিমুখী হওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়েছিল এবং একটি ইবাদতের স্থান ও হেদায়েতের নিদর্শনস্বরূপ নির্মিত হয়েছিল, তা এই কাবা শরীফই– যা বরকতময় শহর মক্কা মুআজ্জমায় অবস্থিত।

১. **কাবা শরীফের জাহেরী ও বাতেনী বরকত-মর্যাদা**

আল্লাহ তাআলা শুরু থেকেই কাবাঘরকে জাহেরী ও বাতেনী, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বরকতরাশির দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন এবং সারা জগতের হেদায়েতের উৎসরূপে নির্ধারিত করেছেন। পৃথিবীর বুকে যেখানেই বরকত ও হেদায়েত রয়েছে, তা এই পবিত্র ঘরেরই প্রতিবিম্ব ও কিরণ মাত্র। এখান থেকেই তিনি অতি মর্যাদাবান সৃষ্টিদ্বয় জিন ও মানুষের রাসূলের আবির্ভাব ঘটান এবং হজের অনুষ্ঠানাদি পালন করার জন্য বিশ্ববাসীকে এর প্রতি আহ্বান জানান। বিশ্বজনীন ধর্ম ইসলামের অনুসারীদের, পূর্ব-পশ্চিমে যেখানেই থাকুক, এরই দিকে মুখ করে নামায পড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং এই ঘরের তওয়াফকারীদের উপর অতি দুর্লভ বরকত ও নূরের বারিবর্ষণ করেছেন। পূর্ববর্তী নবীগণও হজ আদায়ের উদ্দেশ্যে খুবই উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তলবিয়ার চিৎকার-ধ্বনি করতে করতে এই আলোকরশ্মিরই প্রতি ছুটে আসতেন এবং আল্লাহ তাআলা বাইতুল্লাহ শরীফেরই বরকতে মক্কা নামক ভূখণ্ডটির মধ্যে নানা রকম সুস্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছেন।

তাই প্রত্যেক যুগেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এর প্রতি অস্বাভাবিক ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করে এসেছে এবং সকল যুগে এখানে প্রবেশকারীকে নিরাপদ মনে করা হয়েছে। এর নিকট মাকামে ইবরাহীমের অবস্থান সাক্ষ্য বহন করছে যে, এখানে হযরত ইবরাহীমের পদার্পণ হয়েছে। এবং আরববাসীদের সর্বস্বীকৃত ইতিহাস ঘোষণা করছে যে, এ সেই পাথর, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কাবাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন এবং আল্লাহ তাআলার কুদরতে পাথরের উপর তাঁর পায়ের চিহ্ন পড়ে গিয়েছিল, যা আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে। ইতিহাসের বর্ণনা ছাড়াও এই পবিত্র পাথরের অস্তিত্ব যেন এ বিষয়ের একটি শক্তিশালী প্রমাণ যে, এই ঘর নূহ আ.এর তুফানের ধ্বংসলীলার পর হযরত ইবরাহীম আ.-এর পবিত্র হস্তে নির্মিত হয়েছিল, যাঁর সাহায্যার্থে হযরত ইসমাঈল আ. নির্মাণকার্যে শরীক ছিলেন। প্রথম পারার শেষের দিকে এর আলোচনা হয়েছে।

২. এ পবিত্র ঘরের মধ্যে আল্লাহ তাআলার জামালের কোন বিশেষ তাজাল্লী রয়েছে, যে কারণে হজ সম্পাদনের জন্য একে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। হজ এমন এক ইবাদত, যার

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۸﴾

৯৮. আপনি বলুন, 'হে কিতাবীরা! তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ কেন অস্বীকার কর? অথচ তোমরা যা কর, আল্লাহ তার প্রত্যক্ষদর্শী[১]।'

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۹﴾

৯৯. বলুন, 'হে কিতাবীরা! তোমরা মুমিনদের আল্লাহর পথ থেকে কেন বাধা দিচ্ছ তাতে ত্রুটি অন্বেষণ করে? অথচ তোমরা (ইসলামের সত্যতার) সাক্ষী। আর আল্লাহ বে-খবর নন তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে[২]।'

প্রত্যেকটি কাজ দ্বারা সেই চির সৌন্দর্যময় ও প্রকৃত মাহবূবের প্রতি এশ্‌ক ও মহব্বতের প্রকাশ ঘটে। অতএব যে তাঁকে ভালবাসার দাবি করে এবং শারীরিক ও আর্থিক দিক দিয়ে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌছার শক্তি-সামর্থ্য রাখে, তার কর্তব্য জীবনে কমপক্ষে একবার প্রিয়তমের দুয়ারে উপস্থিত হওয়া এবং পাগলের মত সেখানকার চক্কর লাগানো। (এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যার জন্য হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম (র) রচিত قبله نما দ্রষ্টব্য)

ভালবাসার যে দাবিদার এতটুকু কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত হবে না, তাকে মিথ্যা প্রেমিক মনে করতে হবে। সে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে মরুক। সেই মাহবূবে হাকীকীর কোন পরোয়া নেই। কেউ ইহুদী হয়ে মরুক, কেউ নাসরানী– তাঁর কী ক্ষতি? (হজের আহকামের তফসীল ফিকহের কিতাবাদিতে দ্রষ্টব্য।)

১. পূর্ব থেকে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সম্বোধন করা হচ্ছিল। মাঝখানে ওদের কতক সংশয়ে উত্তর দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে পুনরায় ওদের সতর্ক ও তিরস্কার করা হচ্ছে। আয়াতের মর্ম হচ্ছে, সত্য ও সততার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এবং কুরআন করীমের এমন সাচ্চা ও পাক্কা আলোচনাসমূহ শোনার পরও তোমাদের কী হল যে, কিতাবী হওয়া সত্ত্বেও তোমরা সর্বদা আল্লাহ তাআলার কালাম ও তাঁর আনয়নকারীকে অস্বীকার করায় লিপ্ত রয়েছ? মনে রেখো! তোমাদের কার্যকলাপ আল্লাহর সম্মুখে রয়েছে। তোমাদের নিয়ত ও কলা-কৌশল তিনি বেশ জানেন। যখন ধরবেন, পাইপাই হিসাব নিয়ে ছাড়বেন।

২. অর্থাৎ শুধু এতটুকুই নয় যে, তোমরা নিজেরা ঈমানের সৌভাগ্য হাসিল করা থেকে বঞ্চিত আছ, বরং অন্যদেরও আল্লাহ তাআলার পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে সচেষ্ট আছ এবং যে ভাগ্যবানেরা ঈমানের সৌভাগ্য লাভ করেছে, তোমরা ইসলাম সম্পর্কে কাল্পনিক ত্রুটির কথা বলে তাদের ইসলাম ধর্ম থেকে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছ। তদুপরি এই ক্রিয়া-কলাপ অজ্ঞতাহেতু করছ না, বরং জেনে-শুনে সরল বিষয়াদিকে বক্র সাব্যস্ত করার ফিকিরে আছ। তোমাদের এই কলা-কৌশল থেকে আল্লাহ তাআলা বেখবর নন, যথাসময়ে সমুচিত শাস্তি দেবেন।

১০০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কিতাবীদের একদলের আনুগত্য কর, তবে তোমরা ঈমান আনার পর ওরা তোমাদের আবার কাফের বানিয়ে ফেলবে[১]।

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ۝

১০১. আর তোমরা কীভাবে কাফের হবে, অথচ তোমাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর রাসূল? আর যে কেউ আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করবে, তাকে অবশ্যই সরল পথের হেদায়েত দান করা হবে[২]।

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

---

১. প্রথমে আহলে কিতাবকে ধমকানো হয়েছে যে, তোমরা জেনেশুনে কেন লোকদের গোমরাহ করছ? এস্থলে মুসলমানদের নসীহত করা হচ্ছে যে, তোমরা ফাসাদকারীদের ধোঁকায় পতিত হয়ো না। ওদের কথা মত চললে আশঙ্কা রয়েছে যে, তোমরা ক্রমান্বয়ে ঈমানের আলো থেকে বের হয়ে পুনরায় কুফরের অন্ধকার গহ্বরে গিয়ে পতিত হবে।

২. অর্থাৎ এটা খুবই ভয়াবহ কথা যে, মুসলমানরা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে যাবে অথবা কাফেরদের মত কাজ করতে শুরু করবে! অথচ তাদের মধ্যে আল্লাহর আজীমুশশান পয়গম্বর বর্তমান রয়েছেন, যিনি রাতদিন রূহের খোরাক তথা আল্লাহ তাআলার কালাম এবং এর নতুন-নতুন আয়াত পড়ে তাদের শোনাচ্ছেন। সত্য কথা হচ্ছে, যে ব্যক্তি সব দিক থেকে চোখ বন্ধ করে এক আল্লাহকে মজবুতভাবে ধরেছে এবং তাঁরই উপর মনেপ্রাণে ভরসা করেছে, তাকে কোন শক্তিই কামিয়াবীর সরলপথ থেকে এদিক-সেদিক হটাতে পারবে না।

শানে নুযূল

ইসলামপূর্ব কালে মদীনার আনসারদের দুই গোত্র 'আউস' ও 'খাযরাজ' এর মধ্যে খুবই শত্রুতা ছিল। সামান্য সামান্য বিষয়ে পরস্পরে লড়াই ও খুনাখুনি হত এবং বছরের পর বছর তা চলতে থাকত। উদাহরণস্বরূপ: ঐতিহাসিক 'বুআছ' যুদ্ধ একশ বিশ বছর ধরে চলেছিল। অবশেষে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের ফলে তাদের ভাগ্য-নক্ষত্র উদিত হয় এবং ইসলামের শিক্ষা ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবতের ফয়েয ও বরকতে শত শত বছর ধরে পরস্পর রক্তপিপাসু গোত্র দুটো প্রীতি-মধুর ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

শত্রুভাবাপন্ন গোত্র দুটোর এহেন বন্ধুত্ব ও উভয়ের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা ইসলামের খেদমত ও সাহায্য ইহুদীদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল। এক অন্ধ ইহুদী 'শাম্মাস ইবনে কায়স' কোন এক দুষ্কৃতিকারীকে এই বলে পাঠাল যে, গোত্রদ্বয়ের কোন সম্মিলিত বৈঠকে কৌশলে

[রুকূ - ১১]

১০২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেরূপ ভয় তাঁকে করা উচিত। এবং এ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করো যে, তোমরা মুসলমান[১]।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ۝

১০৩. আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রশি আঁকড়ে ধর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না[২]। আর

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا

'বুআছ' যুদ্ধের আলোচনা শুরু করবে। সেমত সেই ব্যক্তি সুযোগ বুঝে বুআছ যুদ্ধের স্মৃতি তাজা করে দেয়— এমন কবিতা শোনাতে শুরু করে। শোনামাত্র সেই নির্বাপিত অগ্নি পুনরায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। প্রথমে বাচনিক যুদ্ধ চলল। অবশেষে যখন সশস্ত্র লড়াই শুরু হতে যাবে, ঠিক এই সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজেরদের জামাতসহ সেখানে উপস্থিত হলেন।

তিনি তাদের বললেন, 'মুসলমান সম্প্রদায়! আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর, আমি তোমাদের মাঝে বর্তমান, এ সত্ত্বেও জাহেলী যুগের এই আহ্বান কিরূপে হল? আল্লাহ তাআলা তোমাদের হেদায়েত দান করেছেন, ইসলামের দ্বারা ধন্য করেছেন, জাহেলী যুগের অন্ধকারকে মিটিয়ে দিয়েছেন। আবার কি তোমরা সেই কুফরী ক্রিয়াকাণ্ডের দিকে ফিরে যেতে চাও, যা থেকে বের হয়ে এসেছিলে? নবীকণ্ঠের এই আওয়াজ শোনামাত্র শয়তানী বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, আউস ও খাযরাজ অস্ত্র ফেলে দিল এবং একে অপরের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। সকলে বুঝতে পারল, এসব তাদের দুশমনদের ফেতনাবাজি ছিল, যা সম্পর্কে ভবিষ্যতে সতর্ক থাকা উচিত। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ কয়েকখানি আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে তবারী : ৫/৬৩২, ৬২৭)

১. অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে পরিপূর্ণ আল্লাহ-ভীতি থাকা উচিত। তাকওয়া-পরহেজগারীর রাস্তা থেকে কিছুতেই হটবে না এবং তাতে অটল থাকার জন্য সর্বদা আল্লাহ তাআলার নিকট দো'য়া করতে থাকবে। শয়তানেরা ইসলামের পথ থেকে তোমাদের পা পিছলিয়ে দিতে চায়। তোমাদের উচিত ওদের নিরাশ করে দেওয়া এবং মৃত্যু-মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলমান বিরোধী কোন আচরণ না করা। তোমাদের জীবিত থাকা ও মৃত্যু বরণ করা খাঁটি ইসলামের উপর হওয়া উচিত।

২. অর্থাৎ সবাই মিলে আল্লাহর মজবুত রশি কুরআনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাক। এই রশি ছেঁড়ার নয়, কিন্তু ছুটতে পারে। যদি সকলে মিলে পূর্ণ শক্তি দিয়ে তা ধরে থাক, তবে কোন শয়তানই তোমাদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টিতে কৃতকার্য হতে পারবে না। বরং ব্যক্তিগত জীবনের মত মুসলমান জাতির সম্মিলিত শক্তিও অনড়, দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য হয়ে যাবে। আর কুরআন কারীমকে আঁকড়ে ধরার ফলস্বরূপ বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং একটি মৃত জাতি পুনর্জীবন লাভ করে।

تَفَرَّقُوْا ۪ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۰۳﴾

তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতি সঞ্চার করলেন, ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে[১]। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের প্রান্তে, অতঃপর তিনি তোমাদের তা থেকে রক্ষা করলেন[২]। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা পথপ্রাপ্ত হও[৩]।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۴﴾

১০৪. তোমাদের মধ্যে যেন এমন একটি জামাত থাকে, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহবান করতে থাকবে এবং সৎকাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম[৪]।

কিন্তু কুরআনকে আঁকড়ে ধরার অর্থ এই নয় যে, তাকে ব্যক্তিগত মতামত ও স্বার্থের অনুগত বানানো হবে; বরং কুরআন কারীমের সেই অর্থই গ্রহণযোগ্য হবে, যা সহীহ হাদীসসমূহ ও সলফে সালেহীনের সর্বসম্মত ব্যাখ্যার খেলাফ নয়।

১. অর্থাৎ শত শত বছরের শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ অন্তর থেকে বের করে দিয়ে আল্লাহ তাআলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে তোমাদের ভাই ভাই করে দিয়েছেন। ফলে তোমাদের দীন ও দুনিয়া উভয়ই দুরুস্ত হয়েছে এবং এমন প্রভাব কায়েম হয়েছে, যা দেখে শত্রুরা ভীত-সন্ত্রস্ত হচ্ছে। এ ভ্রাতৃসুলভ ঐক্য আল্লাহর এত বড় নে'য়ামত যে, সারা পৃথিবীর ধন-ঐশ্বর্য ব্যয় করলেও তা লাভ করা যেত না।

২. অর্থাৎ কুফর ও গোনাহর কারণে দোযখের একেবারে প্রান্তে উপনীত হয়েছিলে– মৃত্যুর পরপরই তাতে পতিত হতে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের হাত ধরে তা থেকে রক্ষা করেছেন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের আলো হৃদয়ে ঢেলে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার এসব আজীমুশশান দীনী ও দুনিয়াবী অনুগ্রহ স্মরণ রাখলে তোমরা আর কখনো গোমরাহীর দিকে ফিরে যাবে না।

৩. অর্থাৎ এ কথাগুলি এমন স্পষ্ট করে শোনানোর উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যেন সর্বদা সঠিক পথে চলতে থাক। উল্লিখিত ধ্বংসাত্মক ও ভয়াবহ ভুলের পুনরাবৃত্তি না কর এবং কোন শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সরল-সুদৃঢ় পথ বর্জন না কর।

৪. অর্থাৎ তাকওয়া-পরহেজগারী, আল্লাহ তাআলার রজ্জু ধারণ, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব— এসব বিষয় তখনই অক্ষুণ্ন থাকতে পারে, যখন মুসলমানদের মধ্যে

১০৫. আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং মতভেদ করেছে- তাদের নিকট সুস্পষ্ট বিধানাবলী পৌছার পরও। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি[১]—

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

একটি বিশেষ দল শুধু দাওয়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য কায়েম থাকবে। তাদের মিশনই এই হবে যে, তারা নিজেদের কথা ও কাজ দ্বারা দুনিয়াবাসীকে কুরআন ও সুন্নতের দিকে আহ্বান করবে এবং যখন লোকদের ভাল কাজে উদাসীন অথবা মন্দ কাজে লিপ্ত দেখবে, তখন তাদেরকে সাধ্যানুযায়ী কল্যাণের দিকে আকৃষ্ট ও অকল্যাণ থেকে নিবৃত্ত করতে কোন ত্রুটি করবে না।

বলা বাহুল্য, এ কাজ তাঁরাই করতে পারেন, যাঁরা ভাল ও মন্দ কর্মের জ্ঞান এবং কুরআন-হাদীস সম্পর্কে গভীর ইলম রাখার সাথে সাথে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ হবেন। নতুবা প্রবল আশঙ্কা রয়েছে, একজন জাহেল মানুষ ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল মনে করে এসলাহের বদলে সমস্ত কিছুকে এলোমেলো করে ফেলবে, অথবা কোন মন্দের এসলাহের এমন পদ্ধতি অবলম্বন করবে, যা অধিকতর মন্দের দ্বার উন্মুক্ত করবে, অথবা নম্রতার স্থলে কঠোরতা ও কঠোরতার স্থানে নম্রতা দেখাতে শুরু করবে। সম্ভবত এ জন্যই মুসলমানদের সবাইকে নয় বরং একটি বিশেষ জামাতকে এই দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান, সৎকার্যের নির্দেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার পরিপূর্ণ উপযুক্ত হবে।

হাদীসে আছে, যখন লোকেরা অসৎকাজে জড়িয়ে পড়বে এবং কোন বাধাদানকারী থাকবে না, তখন সকলের উপর আযাব আসার আশঙ্কা রয়েছে। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৩৮)

তবে কোন্ কোন্ অবস্থা ও সময়ে সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধ করার ব্যাপারে মানুষকে অপারগ গণ্য করা হবে এবং কোন্ কোন্ স্থলে তা ওয়াজিব বা মুস্তাহাব, এর বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। আবু বকর রাযী (র) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তা দ্রষ্টব্য।

১. অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট আহকাম পৌছার পর শুধু কুসংস্কার ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে শরী'য়তের মূল বিষয়াদিতে বিভক্ত ও শাখা বিষয়াদিতে ভিন্ন মতাবলম্বী হয়ে যায়। পরিশেষে দলাদলির কারণে ওদের ধর্ম ও জাতীয়তা ধ্বংস হয়ে গেল এবং ওদের সবাই আল্লাহ তাআলার শাস্তির যোগ্য হল।

দীনের মৌলিক বিষয়াদিতে বিবাদ-বিসংবাদ অত্যন্ত নিন্দনীয়

শরী'য়তের সুস্পষ্ট বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পরও যেসব মতভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি করা হয়, তা যে অত্যন্ত দোষনীয় ও ধ্বংসকারী তা বর্তমান আয়াত থেকে জানা গেল। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে মুসলমান নামধারীদের মধ্যেও শত শত ফেরকা ইসলামী শরী'য়তের সুস্পষ্ট, সর্বস্বীকৃত ও পরিপক্ক মৌলিক বিষয়াদি বর্জন করে এবং এ সবের

১০৬. যেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কতক মুখ হবে কালো[১]। যাদের মুখ কালো হবে (ওদের বলা হবে), 'তোমরা কি ঈমান আনার পর আবার কাফের হয়ে গিয়েছিলে[২]? অতএব এখন শাস্তি আস্বাদন

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۗ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا

মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করে উক্ত শাস্তির যোগ্য হয়ে আছে। তবে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও আল্লাহ-রাসূলের ওয়াদানুসারে একটি আজীমুশ্শান জামাত আল্লাহ তাআলার রশিকে শক্তভাবে ধরে আছে এবং বিখ্যাত হাদীস (তিরমিযী : ২৬৪১) ما أنا عليه وأصحابي ('যার উপর আমি ও আমার সাহাবীগণ আছি।') এর উপর কায়েম আছে, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের পথ ও আদর্শের উপর অবিচল রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

উল্লেখ্য, সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম ও মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে যেসব শাখাগত বিষয়ে মতভেদ হয়েছে, বর্তমান আয়াতের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এ সকল শাখাগত মতভেদের কারণসমূহ সম্পর্কে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় কিতাবাদিতে বিশদ ব্যাখ্যাসহ যথেষ্ট লিখেছেন।

১. অর্থাৎ কিছু লোকের চেহারায় ঈমান ও তাক্ওয়ার নূর চমকাতে থাকবে এবং সম্মান-গাম্ভীর্যসহ তাদের আনন্দিত ও প্রফুল্ল দেখা যাবে। পক্ষান্তরে, কতিপয় লোকের চেহারা কুফর ও নেফাক অথবা অবাধ্যতা ও গোনাহর কালিমায় কালো হবে। ওদের চেহারায় লাঞ্ছনা ও অপমানের ছাপ ফুটে উঠবে। বলতে গেলে, প্রত্যেকের ভিতরকার অবস্থা বহিরাকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হবে।

২. এই শব্দাবলি মুর্তাদ, মুনাফিক, কিতাবী— প্রভৃতি সকল কাফেরদের অথবা সকল বেদআতী ও ফাসেক-ফাজেরদের বলা যেতে পারে।

'মুর্তাদ' বলা হয়, ঈমান আনার পর যারা আবার কাফের হয়ে যায়। 'মুনাফিক' বলে, যারা মুখে স্বীকার করার পরও অন্তরে কাফের থেকে যায়। আর 'কিতাবীরা' আপন আপন নবী ও কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে বলে দাবি করে। এর দাবি তো এই যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ওদের কিতাবসমূহে যেসব সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে তাতে ওরা বিশ্বাস করবে এবং নবীদের হেদায়েতানুসারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু তাঁকে অস্বীকৃতিতে ওরা সবার চেয়ে অগ্রসর। এভাবে ওরা নিজেদের নবী ও কিতাবের প্রতি ঈমান আনার পরও কাফের হচ্ছে।

বেদআতীদের মৌখিক দাবি এই যে, তারা কুরআন-সুন্নতের অনুসারী এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছে। কিন্তু তার পর অনেক অসার ও বাতিল জিনিসকে দীনের অন্তর্ভুক্ত করে, অথবা দীনের কোন কোন জরুরী বিষয় অস্বীকার করে খাঁটি দীনের উপর তারা থাকেনি। এভাবে তারাও এক পর্যায়ে أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ এর সম্বোধন-পাত্র হল।

كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾

কর– কারণ, তোমরা কুফরী করতে।[১]

وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. পক্ষান্তরে যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে আল্লাহর রহমতের মধ্যে[১]। তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. এগুলি আল্লাহর আয়াত, যা আমি আপনাকে যথাযথভাবে তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছি। আর আল্লাহ বিশ্ববাসীর উপর জুলুম করতে চান না[২]।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

১০৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই, এবং আল্লাহরই কাছে সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে[৩]।

এখন রইল ফাসেকরা, যাদের আকীদা সহীহ আছে। তাদের প্রতিও এই সম্বোধন হলে অর্থ এই হবে যে, তোমরা ঈমান আনার পর কাফেরদের মত আমল করলে কেন? অর্থাৎ কুফর দ্বারা আমলী কুফর উদ্দেশ্য হবে।

আর যদি এ সম্বোধনকে সকল কাফেরের বেলায় প্রযোজ্য ধরা হয় তবে মর্মার্থ এই হবে যে, আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। তোমরা সেই ঈমানী যোগ্যতা নষ্ট করে কাফের কেন হলে? তবে পূর্ববর্তী আয়াতগুলি থেকে বাহ্যত মনে হয়, এস্থলে কুফর দ্বারা কার্যগত কুফর অর্থাৎ নিন্দনীয় মতভেদ ও দলাদলি উদ্দেশ্য। والله أعلم

১. অর্থাৎ বেহেশতে। বেহেশ্ত শুধু আমল দ্বারা লাভ করা যায় না, আমলের পরে তা আল্লাহর রহমতে লাভ হয়। আর বেহেশ্তই সেই স্থান, যেখানে আল্লাহ তাআলা সব রকম রহমতের ব্যবস্থা করেছেন (এসব কারণে رحمة الله বলে বেহশত বোঝানো হয়েছে)। কবির ভাষায় بہشت آنجا کہ آزارے نہ باشد (বেহেশত তা-ই, যেখানে দুঃখ-কষ্ট বলতে কিছু নেই।)

২. প্রকৃতপ্রস্তাবে আল্লাহ কর্তৃক জুলুম তো সম্ভবই নয়, বাহ্যত যাকে মানুষ জুলুম মনে করতে পারে তার সংঘটনও আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হতে পারে না। যেমন: বান্দার উপর কঠিন বিধান আরোপ করা, যার দ্বারা শুধু কষ্ট দেওয়া ও বিব্রত করা উদ্দেশ্য হয়। অথবা রহমতের উপযুক্ত ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া, বা স্বল্প শাস্তির স্থলে অধিক শাস্তি জারী করা, অথবা কারো সামান্য নেকীর বিনিময় না দেওয়া ইত্যাদি। ভাল করে বুঝে রাখা দরকার, আল্লাহ তাআলার প্রতিটি হুকুম নিতান্তই বান্দার তরবিয়তের জন্য এবং যার সঙ্গে তাঁর যে আচরণ, তা নিতান্তই মঙ্গলজনক ও হেকমতপূর্ণ।

৩. যখন সবকিছু আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি ও তাঁরই মালিকানাধীন এবং সকল বিষয়ের পরিণতি তাঁরই হাতে, তখন জুলুম কী করে ও কী জন্য করা হবে?

[রুকূ - ১২]

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ

১১০. তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, যাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে মানব জাতির (কল্যাণের) জন্য[১]। তোমরা ভাল কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজে নিষেধ কর[২] এবং আল্লাহর

---

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক ও মর্মার্থ**

পূর্ববর্তী রুকূর শুরুতে (আয়াত ১০২) বলা হয়েছিল يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ الخ ('হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক যেরূপ ভয় তাঁকে করা উচিত।')। মাঝখানে এরই প্রাসঙ্গিক কিছু আদেশ ও নিষেধ এবং প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণীর উল্লেখ হয়েছে। এখান থেকে পুনরায় পূর্ববর্তী বিষয়ের উপসংহারস্বরূপ বলা হচ্ছে:

হে মুসলমানগণ! আল্লাহ তাআলা সকল উম্মতের মধ্যে তোমাদেরকে উত্তম উম্মত সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর অসীম জ্ঞানে প্রথম থেকে এ-ই নির্ধারিত হয়েছিল। পূর্ববর্তী নবীদেরও অনেককে এই সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, শেষ নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন সকল নবীর চেয়ে উত্তম হবেন, তেমনি তাঁর উম্মত সকল উম্মত ও জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে। কেননা, এই উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন শরী'য়ত লাভ করবে, উলূম ও মারেফতের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত হবে। ঈমান, আমল ও তাক্ওয়ার সকল বিভাগ তাদের সাধনা ও কুরবানীর দ্বারা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। তারা কোন খাস বংশ ও জাতি অথবা বিশেষ দেশ ও রাষ্ট্রে সীমিত থাকবে না, বরং তাদের কাজের চৌহদ্দি সমগ্র পৃথিবী ও মানব জীবনের সমস্ত বিভাগ। এ উম্মতের অস্তিত্বই যেন গোটা মানবজাতির হিতাকাঙ্ক্ষা ও কল্যাণ সাধনের জন্য এবং যথাসম্ভব তাদেরকে বেহেশতের দুয়ারে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। أخرجت للناس- এর মধ্যে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে।

বি. দ্র. এই সূরার নবম রুকূতে وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ আয়াতে (৮১) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান নেতৃত্ব ও বিশ্বজনীনতার বর্ণনা ছিল। দশম রুকূর إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ আয়াতে (৯৬-৯৭) এ উম্মতের কেবলার শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো হয়েছে। একাদশ রুকূর وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا আয়াতে (১০৩) এই উম্মতের কিতাব ও শরী'য়তের পরিপক্কতার কথা বলা হয়েছে। এখন বারতম রুকুর শুরু থেকে খোদ এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষের কথা ঘোষণা করা হচ্ছে।

২. المنكر (মন্দ কাজ)– এর মধ্যে কুফর, শিরক, বিদআত, কুপ্রথা, ফিস্ক-ফুজূর এবং হর রকমের চরিত্রহীনতা ও অশ্লীল বিষয় শামিল রয়েছে। এ সকল বিষয় থেকে বারণ করারও বিবিধ পদ্ধতি আছে– কখনো মুখে, কখনো হাতে, কখনো কলমে, কখনো অস্ত্রে; অর্থাৎ সর্বপ্রকার জেহাদ এর অন্তর্ভুক্ত। এই গুণটি যেমন ব্যাপকতা ও গুরুত্বসহ উম্মতে মুহাম্মদিয়ার মধ্যে পাওয়া গেছে, তার নজীর পূর্ববর্তী উম্মতসমূহে দেখা যায়নি।

الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ۝

প্রতি ঈমান রাখ[১]। আর কিতাবীরা যদি ঈমান আনত তবে তাদের জন্য উত্তম হত। তাদের মধ্যে কিছু তো ঈমানদার, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাফরমান[২]।

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ۭ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۣ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ۝

১১১. (মুখে) কষ্ট দেওয়া ছাড়া ওরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি ওরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে তোমাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতঃপর ওরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না[৩]।

---

১. আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান রাখার মধ্যে আল্লাহর তাওহীদের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি ও তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান রাখাও শামিল রয়েছে।

সত্য কথা হল, খাঁটি ও পরিপূর্ণ তাওহীদের প্রতি গুরুত্বারোপ ও তার প্রচার-প্রসার কখনো কোন উম্মতের মধ্যে অতটা পরিদৃষ্ট হয়নি; যতটা আল্লাহর রহমতে এই উম্মতের মধ্যে দেখা গিয়েছে। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ এই (সর্বোত্তম) উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, তার উচিত আল্লাহ তাআলার শর্ত পূর্ণ করা অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ করা, অসৎকাজে নিষেধ করা ও আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনা।' যার সারার্থ হল, নিজে দুরুস্ত হয়ে অন্যদেরও দুরুস্ত করা। এটাই ছিল হযরত সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের শান ও অবস্থা।

২. অর্থাৎ কিতাবীরা যদি ঈমান আনত, তবে তারাও এই শ্রেষ্ঠ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। ফলে দুনিয়াতে ওদের সম্মান বৃদ্ধি পেত এবং পরকালে দ্বিগুণ বিনিময় লাভ হত। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কিতাবীদের মধ্য থেকে দুই চারজন বাদে (যেমন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা., নাজাশী রা. প্রমুখ) কেউই সত্য গ্রহণ করেনি। সত্য প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও ওরা নাফরমানীতে লিপ্ত রইল।

৩. অর্থাৎ ওদের অধিকাংশ যদি নাফরমান হয়, তবে হতে দাও, ওদের আধিক্য বা জাগতিক সাজ-সরঞ্জামে তোমাদের ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই। (হে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত!) আল্লাহ তাআলার ওয়াদা রয়েছে, এই শয়তানী লশকর তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না (যদি তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে নিজেদের প্রমাণিত করে রাখতে পার); শুধু গালিগালাজ করা এবং কাপুরুষের মত নিন্দাবাদ করে বেড়ানো অথবা ছোটখাট সাময়িক কষ্ট দেওয়া– ব্যস্ এ পর্যন্তই ওরা করতে পারে। কিন্তু তোমাদের উপর প্রবল ও বিজয়ী হওয়া অথবা কোন বড় ধরনের ক্ষতি সাধন করা– এ ওদের দ্বারা কখনই হবে না। তোমাদের বিরুদ্ধে ওরা যুদ্ধে অবতরণ করলে পিঠ দেখিয়ে পলায়ন করবে এবং কোন দিক থেকেই ওদের সাহায্য পৌছবে না, যাতে ওদের পরাজয় ঠেকাতে পারে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। সাহাবা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমের যমানায় কিতাবীদের এ অবস্থাই হয়েছিল। ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস সাধনের জন্য

১১২. ওদের উপর লাঞ্ছনা আরোপ করে দেওয়া হয়েছে ওরা যেখানেই থাকুক, তবে আল্লাহর 'সনদ' ও মানুষের 'সনদ' গ্রহণ করলে (ভিন্ন কথা)*[১]। আর ওরা আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরেছে। এবং ওদের উপর আরোপ করে দেওয়া হয়েছে মুখাপেক্ষিতা। তা এজন্য যে, ওরা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে চলত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তা এজন্যও যে, ওরা নাফরমানী করত এবং সীমালঙ্ঘন করতে থাকত[২]।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّھُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَاۗءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۭ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

ওরা সর্বাত্মক চেষ্টা করে কিছুই করতে পারেনি। যেখানেই সংঘর্ষ হয়েছে ওরা ভীত-সন্ত্রস্ত গাধার মত পালিয়ে গেছে। সকল স্থানেই আল্লাহর সাহায্য-সহায়তা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতেরই ভাগ্যে জুটেছে এবং শত্রুরা হতভম্ব ও অসহায় অবস্থায় পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়ে পালিয়েছে বা বন্দী হয়েছে বা প্রজা হয়ে রয়েছে বা জাহান্নামে পৌছে গেছে। فلله الحمد والمنة

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি অথবা মানুষের পক্ষ থেকে কোন অঙ্গীকার থাকলে (ভিন্ন কথা)'।

১. এই আয়াতগুলি কিতাবীদের মধ্যে শুধু ইহুদীদের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হয়, যেমন সামনের আলোচনা ও কুরআনের অন্যান্য আয়াতদৃষ্টে বোঝা যায়। অর্থাৎ, ইহুদীদের উপর চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। এই হতভাগারা যেখানেই থাকবে, লাঞ্ছনার ছাপ ওদের থেকে নিশ্চিহ্ন হবে না। বড় বড় কোটিপতি ইহুদী আযাদী ও স্বাধীনতার সাথে স্বীয় জান-মালের হেফাজত করতে পারবে না। কেননা, ওদের স্বাধীন রাষ্ট্র কোথাও নেই– তবে 'আল্লাহর সনদ ব্যতীত' অর্থাৎ তাওরাতের কয়েকটি অবশিষ্ট রসম পালন করার ওসীলায় ওরা রক্ষা পায় এবং 'মানুষের সনদ ব্যতীত', অর্থাৎ কারো প্রজা হয়ে তার আশ্রয়ে থাকতে পায়। তাফসীরে 'মূযেহুল কুরআনে' এ রকমই বলা হয়েছে।

আর কোন কোন মুফাসসির حبل من الله এবং حبل من الناس দ্বারা আল্লাহ তাআলার যিম্মা ও মুসলমানদের চুক্তি উদ্দেশ্য করেছেন, অর্থাৎ মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তি করে আল্লাহর যিম্মায় আসা ছাড়া (ওদের আর কোনো উপায় নেই)। কেউ কেউ বলেছেন যে, حبل من الله দ্বারা ইসলাম উদ্দেশ্য, আর حبل من النّاس দ্বারা চুক্তি উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে অথবা মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে এই লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পেতে পারে। কারণ, মৈত্রীচুক্তিও জান-মালের নিরাপত্তা দান করে। والله أعلم

২. অর্থাৎ নাফরমানী করতে করতে সকল সীমা লঙ্ঘন করেছে, যার সর্বশেষ প্রতিক্রিয়া এই হয়েছিল যে, ওরা আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অস্বীকার করতে ও নিষ্পাপ

لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ۝

১১৩. ওরা সকলে এক রকম নয়। কিতাবীদের মধ্যে একটি দল আছে, যারা (সঠিক পথের উপর) অধিষ্ঠিত, যারা রাতের প্রহরগুলিতে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং তারা সেজদা করে।

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ۝

১১৪. তারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সৎকাজের আদেশ করে, মন্দ কাজে নিষেধ করে এবং নেককাজে দ্রুত অগ্রসর হয়। আর তারাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত[১]।

وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ۝

১১৫. এবং তারা যা- কিছু নেককাজ করবে, তা(-র প্রতিদান) থেকে তাদের অবশ্যই বঞ্চিত করা হবে না[২] আর আল্লাহ পরহেযগারদের সম্বন্ধে

পয়গম্বরদের কতল করতে অভ্যস্ত হয়ে গেল। এ ধরণের আয়াত প্রথম পারায়ও (বাকারা, ৬১) রয়েছে। সেখানকার তাফসীর দ্রষ্টব্য।

১. অর্থাৎ সব কিতাবীদের অবস্থা একরকম নয়– এত খারাপদের মধ্যে কিছু ভালও আছে। এই বিকৃতমনা হতভাগাদের মধ্যেই কিছু সৌভাগ্যবান মানুষ রয়েছে, যারা আয়াতে বর্ণিত গুণাবলিতে গুণান্বিত, যাদের আল্লাহ তাআলা সত্য গ্রহণের তাওফীক দিয়েছেন। ফলে তারা ইসলামের ছায়াতলে স্থান নিয়েছে এবং সত্যের পথে এমনি অবিচল-দৃঢ় হয়ে গিয়েছে যে, কোন শক্তিই তাদের টলাতে পারে না। তারা রাতের আঁধারে আরামের ঘুম ও নরম বিছানা ছেড়ে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হয়, আপন প্রভুর সম্মুখে কাকুতি-মিনতি ও বিনয় অবলম্বন করে সেজদায় মাথা নত করে দেয়, নামাযে আল্লাহ তাআলার কালাম পড়ে, আল্লাহ তাআলা ও পরকালের প্রতি যথাযথ ঈমান রাখে, খাঁটি তাওহীদে বিশ্বাস করে, কিয়ামতের দিনের ভয় রাখে এবং কোনো নেক কাজে ডাকা হলে দৌড়ে অন্যদের আগে অগ্রসর হতে চায়। তাছাড়া কেবল নিজেই সৎপথের উপর চলে না, বরং অন্যদেরও সরল পথে আনতে চেষ্টা করে।

ইহুদীদেরই মধ্যে এই লোকদের নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সৌভাগ্য এবং রুশ্দ ও হেদায়েতের বিশেষ অংশ দান করেছেন। এস্থলে মূলত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সাথীদের আলোচনা করা হল।

২. বরং দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে, যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে— اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا ('তাদের দেওয়া হবে দ্বিগুণ ছওয়াব, কারণ তারা অবিচল থেকেছে।' –কাসাস, ৫৪) এবং হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যা দান করেছেন।

সবিশেষ অবহিত[১]।

১১৬. যারা কাফের, নিশ্চয় ওদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহর মোকাবেলায় ওদের কোন উপকারে আসবে না। আর ওরা জাহান্নামী, ওরা তাতে চিরকাল থাকবে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

১১৭. এ পার্থিব জীবনে ওরা যা-কিছু ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত এরূপ– যেমন একটা বাতাস, যাতে আছে তীব্র ঠাণ্ডা, যা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল এমন এক সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেতে আঘাত হানল এবং তা বিনাস করে ফেলল[২]। বস্তুত আল্লাহ ওদের উপর

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ

---

১. এজন্যই যখন ইহুদীদের কদর্যতার আলোচনা আসে, তখন আল্লাহ তাআলা এই পরহেজগারদের পৃথক করে রাখেন, আর পরহেজগারী অনুপাতে দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সঙ্গে আচরণও একেবারে ভিন্নভাবে করা হবে।

২. নেক্কার ও পরহেজগারদের মোকাবেলায় আল্লাহ তা'আলা এখানে কাফেরদের অবস্থা ও পরিণতি উল্লেখ করছেন। প্রথমে বলেছেন وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ('তারা যা কিছু নেককাজ করবে, তার অমর্যাদা কখনই করা হবে না।') অর্থাৎ মুমিনদের অতি সামান্য নেকীও কাজে আসবে, তাদের কোন সৎকর্মেরই অমর্যাদা করা হবে না। পক্ষান্তরে, একজন কাফের যা কিছু ধন-সম্পদ ও শক্তি-সামর্থ্য দুনিয়াতে ব্যয় করবে, চাই নিজে তাকে অতি বড় ছওয়াব ও মঙ্গলের কাজ মনে করুক, আখেরাতে তার কোনই মর্যাদা হবে না। কেননা, ঈমান ও সঠিক মারেফতের রূহ না থাকায় ওর প্রত্যেক আমল প্রাণহীন ও মৃত। তার প্রতিদানও তদ্রূপ। এই নশ্বর জগতের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে ওর সব শেষ হয়ে যাবে।

ঈমান ছাড়া আমলের উদাহরণ

আমলকে চিরস্থায়ী করে রাখার শর্ত ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস। ঈমান ছাড়া আমলের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন: কোন জালেম দুষ্টজন শস্যক্ষেত্র বা বাগান করল, কিন্তু তাকে হিম ও বরফ থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা করেনি। শস্য-শ্যামলতা দৃষ্টে কিছু দিন ওর মনে খুব আনন্দ লেগেছে এবং আশা-ভরসা জেগেছে। অতঃপর ওরই দুষ্কৃতি ও পাপের কারণে হঠাৎ হিমবায়ু প্রবাহিত হল এবং এই পরিমাণ বরফ পতিত হল যে, মুহূর্তের মধ্যে সেই মনোরম শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত নিজের এই সার্বিক ধ্বংস ও ক্ষতির জন্য সে হায় আফসোস করতে থাকে, কোন আশাই ওর পূর্ণ হল না, অভাবের দিনে তার ফসল দ্বারা সে উপকৃতও হতে পারল না। আর যেহেতু এই ধ্বংস ছিল ওর জুলুম ও দুষ্কৃতির শাস্তি, সেহেতু উক্ত মুসিবতের কারণে পরকালে কোন প্রতিদানও পাবে না, যেমনটি মুমিনরা

وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

জুলুম করেননি, বরং ওরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করে[১]।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ۭ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ښ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ۭ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ

১১৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের লোকদের ছাড়া কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ো না। ওরা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে কোন ত্রুটি করে না। ওরা মনে-প্রাণে কামনা করে, তোমরা কষ্ট ভোগ কর। ওদের মুখ থেকে শত্রুতা প্রকাশ হয়ে পড়ে, আর ওদের অন্তর যা (অর্থাৎ যে শত্রুতা) গোপন রাখে, তা আরো গুরুতর। আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনাদি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলাম, যদি তোমরা বুদ্ধি রাখ[২]।

পেয়ে থাকে। ঠিক এই দৃষ্টান্ত ঐ কাফেরদের, যারা কুফর ও শিরকের উপর কায়েম থেকে নিজেদের ধারণায় অনেক পুণ্য ও সৎকাজ করে।

বাকী যে হতভাগা স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য ও টাকা-পয়সা সত্য ও সত্যপন্থীদের শত্রুতায় অথবা অন্যায় ও দুষ্কর্মে ব্যয় করে, ওর তো কথাই নেই। ওর ব্যয় শুধু ব্যর্থই নয়, বরং টাকা-পয়সা খরচ করে সে নিজের জন্য অধিকতর বিপদ ক্রয় করেছে।

ওদের সবার স্মরণ রাখা উচিত, ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোন কিছুই ওদের আল্লাহ তাআলার শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না, আর না মুত্তাকীদের বিরুদ্ধে নিজ আশা-আকাঙ্ক্ষায় ওরা কৃতকার্য হবে।

বি. দ্র. ريح শব্দটি এক বচনে কুরআন শরীফে সাধারণত আযাবের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন: إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا الخ ، رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ; এবং বহুবচন অর্থাৎ رياح ব্যবহৃত হয়েছে রহমতের ক্ষেত্রে, যেমন: يرسل الرياح مبشرات ، وأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ، يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا। বিখ্যাত মুফাসসির আবু হায়্যান (র) এমনই বলেছেন।

১. এমন মনে করার কারণ নেই যে, কাফেরের কোন সৎকাজ কবূল করা না হলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার উপর জুলুম হল। বস্তুত তা নয়, এই জুলুম ওরা নিজেরা নিজেদের উপর নিজ হাতে করেছে। যদি ওরা কুফর অবলম্বন না করত, তবে এই অশুভ দিনের সম্মুখীন হতে হত না।

২. কোন কোন মুফাসসিরের মতে বর্তমান আয়াতগুলি ইহুদীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। কারণ, কতক মুসলমান ইসলাম পূর্বকালে প্রতিবেশিত্ব, বন্ধুত্বসুলভ চুক্তি ইত্যাদির কারণে ওদের সঙ্গে যে সম্পর্ক রাখতেন, ইসলাম উত্তরকালেও তার উপর তাঁরা কায়েম থাকেন

১১৯. শুনে রাখ, তোমরাই এমন লোক যে, তোমরা ওদের ভালবাস, অথচ ওরা তোমাদের ভালবাসে না এবং তোমরা সকল কিতাবের প্রতি ঈমান রাখ[১]। ওরা যখন তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন বলে, 'আমরা ঈমান	هَاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۖۚ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ

এবং এই বন্ধুত্বের কারণে মুসলমানদের কোন কোন গোপন কথা ওদের নিকট গোপন রাখতে তাঁরা যত্নশীল হতেন না।

আর কারো কারো মতে আয়াতগুলি মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়। কেননা, সাধারণত মুসলমানগণ বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে ওদের মুসলমান মনে করতেন এবং পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন না। ফলে মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

আয়াতে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, মুসলমানরা নিজেদের ইসলামী ভাইদের ছাড়া কাউকেই অন্তরঙ্গ বন্ধু ও মনের মানুষ বানাবে না। কারণ ইহুদী হোক বা খ্রিস্টান, মুনাফিক হোক বা মুশরিক, ওদের মধ্যে কোন দলই তোমাদের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। ওদের কামনা, তোমরা কষ্টে থাক এবং সর্বদা দীনী বা জাগতিক দিক দিয়ে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হও। যে শত্রুতা বা বিদ্বেষ ওদের অন্তরে রয়েছে, তা তো গুরুতর। কিন্তু কোন কোন সময় ওরা শত্রুতা ও আক্রোশবশত অসতর্কভাবে কোন কথা বলেও ফেলে, যা ওদের গভীর শত্রুতার স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে; হিংসা ও দুশমনীর কারণে ওদের মুখ আয়ত্তে থাকে না।

অতএব এমন দুরাত্মা শত্রুদেরকে নিজেদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আল্লাহ তাআলা দোস্ত ও দুশমনের নিদর্শন এবং (বিজাতীয় লোকদের সাথে) বন্ধুত্ব ইত্যাদির বিধি-বিধান খুলে বলে দিলেন। যার জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, সে এসব চিন্তা করে কাজ করবে। (কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন সম্পর্কে কিছু আলোচনা এই সূরারই প্রথম দিকে রয়েছে এবং কিছু সূরা 'মায়েদা' ইত্যাদিতে আসবে।)

১. অর্থাৎ এটা খুবই অসংগত ব্যাপার যে, তোমরা সাগ্রহে ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর, অথচ ওরা তোমাদের বন্ধু নয়, বরং তোমদের ধ্বংসসাধনকারী শত্রু। আর এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাব মান– তা যে জাতিরই হোক এবং যে কোন কালে যে কোন নবীর উপরই অবতীর্ণ হয়ে থাকুক। (আল্লাহ যেগুলির নাম বলে দিয়েছেন, সেগুলির উপর নির্দিষ্টভাবে এবং যেগুলির নাম বলেননি তাদের উপর সাধারণভাবে ঈমান রাখ।) পক্ষান্তরে, ওরা তোমাদের কিতাব ও নবীকে মানে না, বরং স্বয়ং নিজেদের কিতাবের প্রতিও ওদের প্রকৃত ঈমান নেই। এ হিসাবে উচিত ছিল ওরা তোমাদের প্রতি কিছুটা হলেও মহব্বত রাখবে, আর তোমরা ওদের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি পোষণ করবে। কিন্তু এখানে ব্যাপার উলটা।

এনেছি[১]'; আর যখন (তোমাদের থেকে) আলাদা হয়, তখন তোমাদের প্রতি (তীব্র) আক্রোশে নিজেদের আঙ্গুল কামড়াতে থাকে[২]। আপনি বলুন, 'তোমরা নিজেদের আক্রোশে মর[৩]'। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরসমূহে যা আছে সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত[৪]।

الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

১২০. তোমাদের কোন কল্যাণ স্পর্শ করলে তা ওদের খারাপ লাগে, পক্ষান্তরে তোমাদের উপর কোন অনিষ্ট এসে পড়লে ওরা তাতে আনন্দিত হয়[৫]। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, তবে ওদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ওদের কার্যকলাপকে বেষ্টন করে রয়েছেন[৬]।

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

---

১. মুনাফিকরা তো এ কথা বলতই, সাধারণ ইহুদী ও খ্রিস্টানরাও তর্ক-বিতর্ক ও বিবিধ প্রসঙ্গে آمنا বলত এবং এই উদ্দেশ্য করত যে, আমরা আমাদের কিতাবের উপর ঈমান রাখি এবং তা স্বীকার করি।

২. অর্থাৎ ইসলামের উন্নতি ও মুসলমানদের পরস্পর মিল-মহব্বত দেখে ওরা জ্বলে মরে এবং এর বিপরীত কিছু করতে পারে না বলে রাগে-গোস্বায় নিজেদের আঙুল কামড়াতে থাকে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদের আরো বেশি উন্নতি ও বিজয় দান করবেন। তোমরা রাগে-গোস্বায় জ্বলে মরতে থাক, তবে নিদারুণ মুসিবত সইতে না পেরে মরে গেলেও তোমাদের বাসনা পূর্ণ হবে না। আল্লাহ তাআলা ইসলামকে প্রবল ও মুসলমানদের বিজয় দান করবেনই করবেন।

৪. এ জন্যই আল্লাহ তাআলা ওই দুর্বৃত্তদের বাতেনী হাল-অবস্থা ও অন্তরের কামনা-বাসনা সম্পর্কে মুসলমানদের অবহিত করে দিলেন। আর ওদেরকে শাস্তিও এমন দেবেন, যা ভিতরের দুষ্কর্ম ও গোপন শত্রুতার উপযুক্ত।

৫. তোমাদের সামান্য ভাল দেখলে– যেমন: মুসলমানদের ঐক্য ও সম্প্রীতি বা শত্রুদের উপর বিজয়– ওরা হিংসার আগুনে জ্বলতে শুরু করে। আর তোমাদের উপর কোন মুসিবত আসতে দেখলে আনন্দে আটখানা হয়ে যায়। আচ্ছা, এমন হীন-কমিনা জাতির কাছ থেকে সহানুভূতি ও হিতাকাঙ্ক্ষার আশা করা যায় কি যে, ওদের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করা হবে?

৬. ওদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক না রাখলে ওরা আরো বেশি আক্রোশের বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও অধিক ক্ষতিসাধন করবে বলে আশঙ্কা হতে পারত।

[রুকূ - ১৩]

وَاِذۡ غَدَوۡتَ مِنۡ اَهۡلِكَ تُبَوِّئُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ مَقَاعِدَ لِلۡقِتَالِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ۟

১২১. (স্মরণ করুন), যখন আপনি সকাল বেলায় নিজ পরিবারবর্গের নিকট থেকে বের হলেন, আপনি মুমিনদের যুদ্ধের ঘাঁটিসমূহে মোতায়েন করছিলেন– আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ–

اِذۡ هَمَّتۡ طَّآئِفَتٰنِ مِنۡكُمۡ اَنۡ تَفۡشَلَا ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ۟

১২২. যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারিয়ে ফেলার উপক্রম করেছিল, অথচ আল্লাহ ছিলেন তাদের সাহায্যকারী। আর আল্লাহরই উপর মুমিনদের ভরসা করা উচিত।

وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ ۟

১২৩. নিশ্চয় আল্লাহ বদরের ময়দানে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, আর তখন তোমরা ছিলে দুর্বল। অতএব আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা শোকর করতে পার[১]।

এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমরা যদি ধৈর্য ও স্থিরতা এবং তাকওয়া ও পবিত্রতার উপর সত্য সত্যই কায়েম থাক, তবে ওদের কোন কৌশল ও ষড়যন্ত্রই তোমাদের উপর কার্যকর হবে না। যা কিছু ওরা করছে সবই আল্লাহ তাআলা জানেন এবং যে কোন সময় ওদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন-ভিন্ন করে দেওয়ার শক্তি তাঁর আছে। আল্লাহ তাআলার প্রতি তোমাদের যে কর্তব্য, তা পালনে যত্নবান থাক– তা হলে তিনি তোমাদের চলার পথ নিষ্কণ্টক করে দেবেন।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

সম্মুখে উহুদ যুদ্ধের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ যুদ্ধে কিছু সংখ্যক মুসলিম মুনাফিকদের বিভ্রান্তিকর কলা-কৌশলে কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং মুসলমানদের দুটি গোত্র ধৈর্য ও তাক্ওয়া প্রায় হাতছাড়া করতে বসেছিল, ফলে মুনাফিকদের আনন্দিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সহায়তা করলেন এবং গোত্র দুটিকে ধ্বংসাত্মক পদস্খলন থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

১. **বর্তমান আয়াতগুলিতে উহুদ যুদ্ধের ঘটনা স্মরণ করানো হয়েছে**

দ্বিতীয় হিজরী সনের রমযান মাসে বদরের ময়দানে কুরায়শ বাহিনী ও মুসলমান মুজাহিদদের মধ্যে সম্মুখযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাতে মক্কার কাফেরদের সত্তর জন নাম করা ব্যক্তি নিহত হয় এবং এই পরিমাণ বন্দী হয়। এ শোচনীয় পরাজয়ে কুরায়শদের প্রতিশোধ-আগুন জ্বলে উঠল। নিহত সর্দারদের আত্মীয়-স্বজন সমগ্র আরববাসীর মনে

গায়রত বা জাত্যভিমান উস্কে দিল এবং মক্কাবাসীদের নিকট আপীল করল, বাণিজ্য কাফেলা শাম দেশ থেকে যে সম্পদ এনেছে (এবং যা বদর যুদ্ধের কারণ হয়েছিল), তার সবই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে উৎসর্গ করা হোক, যাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের থেকে আমাদের নিহতদের প্রতিশোধ নিতে পারি। সকলেই এ প্রস্তাব মঞ্জুর করে নিল।

সে মত তৃতীয় হিজরী সনে কুরায়শদের সঙ্গে অন্য অনেক আরব গোত্রও মদীনা আক্রমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। এমনকি, নারীরাও সহযাত্রী হল, যাতে প্রয়োজন হলে আত্মভিমান জগ্রত করে যুদ্ধে পুরুষ সৈন্যদের পিছপা হওয়া থেকে বাধা দিতে পারে। অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য রণসম্ভারে সুসজ্জিত তিন হাজার সৈন্যের এই বাহিনী মদীনা থেকে তিন-চার মাইল দূরবর্তী উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে এসে তাবু স্থাপন করল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁর অভিমত ছিল, মদীনার ভিতরে থেকে শত্রুসৈন্যের মোকাবেলা করা হোক। এরই সমর্থনে তাঁর একটি স্বপ্নও ছিল। এস্থলে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের পরামর্শ চাওয়া হলে সেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রায়ের অনকূলে রায় দেয়। কিন্তু বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি এবং শাহাদতের অমিয় সুধা পানের বাসনা পুরণ হয়নি– এমন কিছু জোশিলা মুসলমান মদীনার বাইরে গিয়ে মোকাবেলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, যাতে শত্রুরা তাঁদের সম্পর্কে ভীরুতা ও দুর্বলতার সন্দেহ না করতে পারে। অধিকাংশের রায় এ দিকেই গেল।

এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব অবস্থায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের ভিতর তশরীফ নিলেন এবং যুদ্ধবস্ত্র পরিধান করে বাইরে আসলেন। এ সময় অনেকের মনে হল, তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য করছেন। তাই তাঁরা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ইচ্ছা না হলে এখানেই তশরীফ রাখুন। তিনি ইরশাদ করলেন, এক পয়গম্বরের জন্য সমীচীন নয় যুদ্ধবস্ত্র পরিধানের পর যুদ্ধ না করে তা খুলে ফেলা।

যখন তিনি মদীনার বাইরে তশরীফ নিলেন তখন সঙ্গে প্রায় এক হাজার লোক ছিল। কিন্তু মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই মাঝ পথ থেকে প্রায় তিনশ' সৈন্য নিয়ে (যাদের মধ্যে কিছু মুসলমানও ছিল) এই বলে প্রত্যাবর্তন করল যে, 'আমার পরামর্শ না মেনে অন্যদের কথায় যখন আমল করা হল, তখন আর আমাদের লড়াই করার দরকার নেই– অযথা নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে কেন নিক্ষেপ করব।' মুরব্বীদের অনেকে বোঝালেন, কিন্তু কোন কাজ হল না। শেষ পর্যন্ত হুযূর মাত্র সাত শত সৈন্যের বাহিনী নিয়ে রণাঙ্গনে উপনীত হলেন। তিনি নিজেই যুদ্ধের নিয়মানুসারে ব্যূহ রচনা ও সৈন্যবিন্যাস করলেন। প্রত্যেক ব্যাটেলিয়ানকে যথাস্থানে স্থাপন করলেন এবং নির্দেশ দিলেন, আমি হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত কেউ যুদ্ধ করবে না।

১২৪. (স্মরণ করুন), যখন আপনি মুমিনদের বলছিলেন, 'তোমাদের জন্য কি এ যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রব তোমাদের সাহায্য করবেন (আসমান থেকে) অবতারিত তিন হাজার ফেরেশতা দিয়ে[১]?'

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿١٢٤﴾

১২৫. হ্যাঁ, অবশ্যই। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর এবং ওরা এই মুহূর্তে তোমাদের উপর এসে পড়ে, তবে তোমাদের রব তোমাদের সাহায্য করবেন বিশেষ নিদর্শনধারী পাঁচ হাজার ফেরেশতা দিয়ে[২]।

بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

বনু হারেছা ও বনু সালিমার ঘটনা

এমন সময়, আবদুল্লাহ বিন উবাই পৃথক হয়ে যাওয়ায় বনু হারেছা ও বনু সালিমা গোত্রদ্বয়ের দিলে কিছুটা দুর্বলতা পয়দা হল। মুসলমানদের সংখ্যালঘিষ্ঠতা দেখে তারা হিম্মতহারা হতে শুরু করল এবং ময়দান থেকে পিছিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সাহায্য করে তাদের অন্তর মজবুত করলেন এবং এই বুঝ দান করলেন যে, এক খোদারই সাহায্য ও মদদের উপর মুসলমানদের ভরসা করা উচিত– সংখ্যা ও সাজসরঞ্জাম কোন জিনিস নয়। যখন তিনি সাহায্য ও জয়যুক্ত করতে চান, তখন সাজসরঞ্জাম ছাড়াই গায়বী মদদে বিজয় হাসিল হয়, যেমন বদরের রণাঙ্গনে হয়েছিল। অতএব মুসলমানদের একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা উচিত, যাতে তাঁর তরফ থেকে অধিকতর নে'য়ামত ও অনুগ্রহ লাভ হয় এবং অধিকতর কৃতজ্ঞতার সুযোগ মেলে। (বদর যুদ্ধের পূর্ণ তফসীল সূরা আনফালে আসছে– সেখানের তাফসীর দ্রষ্টব্য।)

বি. দ্র. 'দুটি দল' বলতে বনু সালিমা ও বনু হারেছা উদ্দেশ্য। যদিও আয়াতে তাদের প্রতি কিছুটা তিরস্কার করা হয়েছে, কিন্তু তাদের মুরব্বীদের কেউ কেউ বলতেন, এই আয়াতটি নাযিল হওয়ায় আমরা বরং খুশী, কারণ والله وليهما –এই সুসংবাদটি তিরস্কারের চেয়েও বড়।

১. অর্থাৎ যাঁরা আকাশ থেকে একমাত্র এই কাজের জন্যই অবতারিত হবেন।
অধিকাংশ আলেমদের নিকট অগ্রাধিকারযোগ্য মত এই যে, এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। তাতে সাজসরঞ্জামসহ কাফেরদের বিরাট সৈন্য-সমাবেশ দেখে মুসলমানরা পেরেশান হলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সান্ত্বনা দানের জন্য এ কথা বললেন। সে মত ফেরেশতাদের সাহায্য-বাহিনী আকাশ থেকে পৌঁছল। সূরা আনফালে এর বিস্তারিত আলোচনা আসবে। সেখানেই ফেরেশতা অবতরণের হেকমত ও তাঁদের সংখ্যার মধ্যে যে বাহ্যিক অনৈক্য রয়েছে, সে সম্পর্কে পর্যালোচনা হবে।

২. অর্থাৎ তিন হাজার অবশ্যই যথেষ্ট, তা সত্ত্বেও তোমরা যদি সবর কর ও অটল থাক এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে নাফরমানী থেকে বাঁচতে থাক, আর কাফের বাহিনী সহসা

১২৬. আর আল্লাহ তা (অর্থাৎ ফেরেশতা দিয়ে সাহায্যের ব্যবস্থা) করেছেন শুধু তোমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এবং যাতে তার কারণে তোমাদের অন্তর প্রশান্ত হয়। আর সাহায্য শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়; যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[১]।

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَىِٕنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۗ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۙ

তোমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দেয়, তবে তিন হাজারের পরিবর্তে পাঁচ হাজার ফেরেশতা পাঠানো হবে, যাঁদের বিশেষ আলামত থাকবে এবং তাঁদের ঘোড়ারও বিশেষ চিহ্ন থাকবে।

বিবিধ সংখ্যক ফেরেশতা-দলের ওয়াদা

বদর যুদ্ধে যেহেতু কাফেরদের সংখ্যা এক হাজার ছিল, তাই প্রথমে সেই হিসাবে এক হাজার ফেরেশতার ওয়াদা করা হয়, যেমন সূরা আনফালে (আয়াত, ৯) বর্ণিত হবে। পরে মুসলমানদের পেরেশানী দূর করণার্থে সংখ্যা তিনগুণ করা হল। কারণ, কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের তিনগুণ ছিল। অতঃপর –শা'বী (র) বর্ণিত হাদীস মত (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৩৭৮২৫)– মুসলমানগণ যখন সংবাদ পেলেন যে, মুশরিকদের সাহায্যার্থে কুরয বিন জাবের বিরাট বাহিনী নিয়ে আসছে, তখন এক নতুন চাঞ্চল্য সৃষ্টি হওয়ায় মুসলমানদের সান্ত্বনা ও সাহস বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ তাআলা ওয়াদা দিলেন যে, ধৈর্য ও পরহেজগারী অবলম্বন করে চললে তোমাদের সাহায্যার্থে পাঁচ হাজার ফেরেশতা পাঠাব। যদি মুশরিকদের সৈন্যবাহিনী একেবারে সহসা এসে পৌঁছেও, তবু চিন্তা করবে না, আল্লাহ তাআলা যথাসময়ে তোমাদের সাহায্য করবেন। পাঁচ হাজারের সংখ্যা সম্ভবত এজন্য রাখা হয় যে, সৈন্যরা পাঁচভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে, তাই এক এক ভাগে এক এক হাজারের বাহিনী পৌঁছানো হবে।

কুরয বিন জাবেরের সাহায্য না পৌঁছায় অনেকের মতে উক্ত পাঁচ হাজারের ওয়াদাও পুরা হয়নি। কেননা, তার জন্য وَيَأْتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا ('যদি ওরা তোমাদের উপর সহসা এসে পড়ে।') এর শর্ত ছিল। আর কারো কারো মতে পাঁচ হাজার ফেরেশতা নাযিল হয়েছিল। والله أعلم এ সম্বন্ধে আরো আলোচনা সূরা আনফালে আসবে।

১. অর্থাৎ এসব গায়বী মদদ অসাধারণভাবে জাহেরী আসবাবের আকারে শুধু এ জন্য করা হয়েছে, যাতে তোমাদের অন্তর থেকে চাঞ্চল্য ও ভীতি দূর হয়ে স্থিরতা ও প্রশান্তি লাভ হয়। নতুবা খোদার মদদ এসব জিনিসের উপর নির্ভরশীল নয় এবং তা বাহ্যিক আসবাবেরও মুখাপেক্ষী না। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে ফেরেশতাদের ছাড়া শুধু নিজের মহাশক্তি বলে তোমাদের কার্যসিদ্ধি করে দিতে পারেন, অথবা তোমাদের মাধ্যম ছাড়া কাফেরদের পরাজিত ও বিফল করতে পারেন। অথবা একজন ফেরেশতা দ্বারাই পাঁচ হাজার ফেরেশতার কাজ নিতে পারেন। আর ফেরেশতাগণও যে সাহায্য পৌঁছান তাও

১২৭. (আর তিনি এজন্য সাহায্য করেছেন), যাতে তিনি কাফেরদের এক অংশ ধ্বংস করে ফেলেন অথবা ওদের অপদস্থ করেন, ফলে ওরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়[১]।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮. আপনার কোনই ইখতিয়ার নেই। (আপনি বরং ধৈর্য ধরুন)— হয় আল্লাহ ওদের প্রতি সদয় হবেন (হেদায়েত দান করবেন), অথবা ওদের শাস্তি দেবেন, কেননা ওরা অন্যায়কারী[২]।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার শক্তি ও ইচ্ছাতেই সাধিত হয়– স্বতন্ত্র শক্তি ও ইচ্ছা তিনি ছাড়া কারো মধ্যে নেই।

বাকি কোন্ ক্ষেত্রে কী রকম আসবাব ও মাধ্যম দ্বারা কাজ নেওয়া হবে, তা আল্লাহ তাআলারই হেকমতের অধীন– সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্যাদি তিনি ছাড়া আর কারো জানা নেই। কবির ভাষায়-

حدیث از مطرب و مے گو و راز دہر کم تر جو   کہ کس نکشود و نکشاید بہ حکمت ایں معمارا

অর্থ– কথা হোক আল্লাহ-প্রেমের সুরা ও প্রেমের উচ্ছ্বাস সম্পর্কে। কালের রহস্য খুঁজতে যেয়ো না। কারণ, এ কারিগরের হেকমত কখনও কেউ উন্মোচন করতে পারেনি এবং তা পারবেও না।

১. অর্থাৎ ফেরেশতা পাঠানোর দ্বারা তোমাদের সাহায্য করা উদ্দেশ্য ছিল যে, তাতে তোমাদের অন্তর মজবুত হবে এবং আল্লাহর তরফ থেকে সুসংবাদ ও সান্ত্বনা পেয়ে তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে ও সাহসিকতার সাথে শত্রুদের মোকাবেলা করতে পারবে, ফলে কাফেরদের শক্তি টুটে যাবে, ওদের বাহু কর্তিত হয়ে যাবে, প্রবীন নামকরা মুশরিকদের কতক নিহত হবে, কতক অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হবে এবং যুদ্ধ থেকে বেঁচে যাওয়া বাদবাকিরা হাজার লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতার সাথে ফিরে যাবে।

বস্তুত তা-ই হয়েছিল। যুদ্ধে এই উম্মতের ফেরাওন আবু জাহলসহ সত্তরজন কাফের সর্দার নিহত হয়, সত্তরজন বন্দী হয় এবং (অবশিষ্টরা) অত্যন্ত অপদস্থ ও ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে।

২. **শানে নুযূল ও মর্ম**

উহুদ যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন, যাঁদের অন্যতম ছিলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা শহীদ-সর্দার হযরত হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। মুশরিকরা অত্যন্ত হিংস্রভাবে শহীদদের নাক, কান ইত্যাদি কর্তন করেছিল, পেট ফেড়ে

১২৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব | وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

ফেলেছিল, এমনকি (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা) হযরত হামযা রা.-এর কলিজা বের করে চিবিয়েছিল। বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন– সামনের চারটি দাঁতের মধ্যে নীচের ডান দিকের দাঁতখানি শহীদ হয়। লৌহ শিরস্ত্রাণের কড়া ভেঙ্গে তাঁর মোবারক গণ্ডদেশে ঢুকে পড়ে। কপাল আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং শরীর মোবারক রক্তাক্ত হয়। এমতাবস্থায় তিনি পা পিছলে মাটির উপর বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। কাফেররা রটিয়ে দিল— أَنَّ محمدا قد قُتِل (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হয়েছেন।) এতে মুসলিমগণ দিশাহারা হয়ে পড়লেন। একটু পরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুঁশ এল, তখন জবান মোবারক থেকে বের হল, 'সেই জাতি কেমন করে সফলতা লাভ করবে, যারা নিজেদের নবীর চেহারায় আঘাত হেনেছে– যিনি আল্লাহর দিকে তাদের ডাকছিলেন।' মুশরিকদের হিংস্র ব্যবহার ও পাশবিক জুলুম-অত্যাচারের এই দৃশ্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সইতে পারলেন না। ওদের নামকরা কয়েক ব্যক্তির জন্য বদদো'য়ার ইচ্ছা করলেন বা বদদো'য়া শুরু করে দিলেন। (তিরমিযী, হাদীস ৩০০৩-৩০০৪)

এতে যে তিনি সবদিক দিয়ে ন্যায়ের উপর ছিলেন তা সুস্পষ্ট। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল, তাঁর প্রিয় নবী স্বীয় মহামর্যাদা অনুপাতে এর চেয়েও উচ্চ আসনে সমাসীন হোন। অর্থাৎ ওরা জুলুম করতে থাকবে, আর তিনি চুপ থাকবেন এবং তাঁকে যেসব কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (যেমন দাওয়াত, তাবলীগ, জেহাদ ইত্যাদি), তা তিনি পালন করে যাবেন। তবে এসবের পরিণাম আল্লাহ তাআলার হাতে সোপর্দ করে দেবেন। তিনি স্বীয় হেকমতানুসারে যা ইচ্ছা করবেন। নবীর বদদো'য়া দ্বারা ওদের ধ্বংস করে দেওয়ার চেয়ে এ কি উত্তম নয় যে, এই দুশমনদেরই ইসলামের হেফাজতকারী ও তাঁর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ আশেক বানিয়ে দেন? বস্তুত তাই হল— যাদের জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদদো'য়া করছিলেন, কিছুদিন পরই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাঁর পদতলে স্থান দিলেন এবং ইসলামের উৎসর্গিতপ্রাণ সৈনিক বানিয়ে দিলেন।

সারকথা, لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ আয়াতাংশে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিলেন যে, বান্দার কোন ইখতিয়ার নেই এবং তার ইলমও সর্বব্যাপী নয়। আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা তাই করবেন। যদিও কাফেররা তোমাদের দুশমন ও অত্যাচারী, কিন্তু তিনি চাইলে ওদের হেদায়েত দান করবেন বা শাস্তি দেবেন– আপনি নিজের তরফ থেকে বদদো'য়া করবেন না।

কোন কোন রেওয়ায়াতদৃষ্টে এই আয়াতগুলির শানে-নুযূল অন্য কিছু মনে হয়। এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। فتح الباري গ্রন্থে এ বিষয়ে একাধিক স্থানে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। তা দ্রষ্টব্য।

আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছ ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত মেহেরবান[১]।

يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

[রুকূ - ১৪]

১৩০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা সুদ খেয়ো না[২]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا

---

১. অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে এক আল্লাহরই ইখতিয়ার চলে– সব কিছু তাঁরই সৃষ্টি ও স্বত্ব। তিনি যাকে সংগত মনে করবেন ঈমানের তাওফীক দান করবেন। আর যাকে ইচ্ছা কুফরীর শাস্তিতে পাকড়াও করবেন।

সম্ভবত সর্বশেষে وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যাদের জন্য আপনি বদদো'য়া করতে চাচ্ছিলেন, তাদের ঈমান দান করে ক্ষমা ও রহমতের পাত্র বানানো হবে।

২. **এখানে সুদের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা**

উহুদ যুদ্ধের আলোচনার মাঝে সুদ-নিষিদ্ধতার কথা বাহ্যত অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও উভয়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান আছে বলে প্রতিভাত হয়। ইতিপূর্বে إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا এর মধ্যে জেহাদে কাপুরুষতা প্রদর্শনের উল্লেখ ছিল। আর সুদ খাওয়ার ফলেও দুই কারণে কাপুরুষতা জন্মে। এক, হারাম মাল ভক্ষণে ইবাদতের তাওফীক হ্রাস পায়, আর জেহাদ হচ্ছে বড় ইবাদত। দুই, সুদগ্রহণ চরম কৃপণতার পরিচায়ক। কারণ, সুদখোর নিজের প্রদত্ত অর্থ সবই ফেরত নিয়ে নেয় এবং মাঝখানে অন্যের যে উপকারটুকু হল, তারও পৃথক বিনিময় উসূল করে– শুধু শুধু কারও উপকার করে না। সুতরাং ধন-সম্পদের ব্যাপারে যে ব্যক্তি এতই কৃপণ যে, সে আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে কারো বিন্দুপরিমাণ সহায়তা করতে পারে না, সে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জান দিতে পারবে কেমন করে?

(মুফাসসির) আবু হায়্যান লিখেছেন: তখন ইহুদী ও অন্যদের সাথে মুসলমানদের সুদী লেনদেন প্রায়ই হত। তাই ওদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা মুশকিল ছিল। অথচ ইতিপূর্বে لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً এর মধ্যে ওদেরকে আর বন্ধুরূপে গ্রহণ না করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল আর উহুদের ঘটনায়ও ইহুদী মুনাফিকদের কারসাজির বিরাট প্রভাব ছিল। তাই মুসলমানদের সতর্ক করে দেওয়া হল যে, সুদী লেনদেন বর্জন কর, নতুবা এর কারণে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এই অভিশপ্তদের সাথে সম্পর্ক কায়েম থাকবে, যার কারণে তোমরা ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

أَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

বহু বহু গুণ[১] এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও[২]।

১৩১. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝

এবং সেই আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে[৩]।

১৩২. وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

আর আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মান্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়[৪]।

১৩৩. وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ

এবং দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং জান্নাতের দিকে[৫], যার প্রশস্ততা আসমানসমূহ ও যমীনের

---

১. এর অর্থ এই নয় যে, স্বল্প সুদ গ্রহণ কর, চক্রবৃদ্ধিহারে গ্রহণ করো না। আসলে, জাহেলিয়াতের যুগে এভাবেই সুদ গ্রহণ করা হত। যেমন, আজো আমাদের যুগের বানিয়ারা এমনই করে থাকে। একশ টাকা দিয়ে (চক্রবৃদ্ধিহারে) সুদের উপর সুদ বাড়িয়ে চলল, শেষ পর্যন্ত একশ টাকায় হাজার হাজার টাকার মালিক হয়ে গেল। এই পদ্ধতিকেই এস্থলে أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রথমত সুদ সম্পূর্ণরূপে হারাম ও জঘন্য। আর أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً-এর পদ্ধতি তো আরো বেশি ঘৃণ্য। যেমন কেউ বলল, 'মিয়া, মসজিদে গালাগালি করো না।' এর অর্থ এই নয় যে, মসজিদের বাইরে গালি দেওয়ার অনুমতি আছে। বরং অধিকতর ঘৃণা ও জঘন্যতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এমন শব্দাবলি বলা হয়ে থাকে।

২. অর্থাৎ সুদ খাওয়ায় মঙ্গল নেই, বরং আল্লাহকে ভয় করে সুদ খাওয়া বর্জন করার মধ্যে তোমাদের মঙ্গল নিহিত।

৩. অর্থাৎ সুদখোর দোযখে যায়– যা আসলে কাফেরদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

৪. রাসূলের হুকুম মান্য করাও প্রকৃতপ্রস্তাবে আল্লাহরই হুকুম মান্য করা। কারণ, আল্লাহই নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন রাসূলের আদেশ মানি এবং তাঁর পুরাপুরি আনুগত্য করি। যে আহমকরা আনুগত্য ও দাসত্বের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেনি, তারা রাসূলের আনুগত্যকে শিরক আখ্যায়িত করেছে।

উহুদের যুদ্ধে রাসূলের আদেশ অমান্য করা হয়েছিল (যেমন সম্মুখে এর আলোচনা হবে), তাই ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হচ্ছে যে, আল্লাহর রহমত এবং কল্যাণ ও সাফল্যের আশা তখনি করা যেতে পারে যখন তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের কথা মত চলবে।

৫. অর্থাৎ সেইসব আমল ও আখলাকের দিকে ধাবিত হও, যেগুলি –আল্লাহ তাআলার ওয়াদা অনুসারে– তাঁর ক্ষমা ও বেহেশতের অধিকারী বানিয়ে দেয়।

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾

(প্রশস্ততার) ন্যায়[১], যে জান্নাত প্রস্তুত করা হয়েছে পরহেজগারদের জন্য–

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় ব্যয় করে[২] এবং ক্রোধ দমন করে ও লোকদের ক্ষমা করে– আর আল্লাহ সদাচারীদের ভালবাসেন[৩]

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۠ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۠ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. এবং যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি জুলুম করে বসলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে[৪]– আর আল্লাহ ছাড়া কে আছে, যে পাপ ক্ষমা করবে?– এবং তারা যা করে ফেলেছে, তাতে অনড় থাকে না। আর তারা জানে (যে, আল্লাহ তওবা কবুল করেন)।

---

১. যেহেতু মানুষের চিন্তায় আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির চেয়ে অধিক আর কোনো বিস্তৃতি হতে পারে না, সেহেতু সহজে বোঝানোর জন্য বেহেশতের প্রশস্ততাকে তারই সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেন বলে দেওয়া হল, বেহেশতের প্রশস্ততা সর্ববৃহৎ প্রশস্ততা। আর প্রশস্ততা যখন এতখানি, তখন দৈর্ঘ্যের অবস্থা যে কী, তা আল্লাহ তাআলাই জানেন।

২. অর্থাৎ সুখ-স্বচ্ছলতায় যেমন তারা আল্লাহকে ভোলে না, তেমনি দুঃখ-কষ্ট ও অস্বচ্ছলতার সময়ও ব্যয় করতে পিছপা হয় না। সর্বাবস্থায় তারা সামর্থ্য মত ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে, সুদখোরদের মত কৃপণ ও পয়সার পূজারী নয়। বলতে গেলে, তারা শারীরিক জেহাদের সাথে আর্থিক জেহাদও করে থাকে।

৩. রাগ সংবরণ করা বড় গুণ। তদুপরি তারা (শুধু রাগ সংবরণ নয়) বরং মানুষের বাড়াবাড়ি বা ভুল-ভ্রান্তি একেবারে মাফ করে দেয়, আর শুধু মাফই করে না বরং তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও সদাচার করে। সম্ভবত, ইতিপূর্বে যাদের প্রতি বদদো'য়া করতে বারণ করা হয়েছিল এখানে তাদের প্রতি রাগ দমন করতে এবং ক্ষমাসুন্দর মনোভাব দেখাতে উৎসাহিত করা হয়েছে। অনুরূপ, উহুদ যুদ্ধে যে অল্প সংখ্যক সাহাবী আদেশ অমান্য করেছিলেন অথবা পলায়ন করেছিলেন, তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করা এবং তাঁদের সঙ্গে ক্ষমা ও অনুগ্রহসুলভ আচরণ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

৪. فَعَلُوْا فَاحِشَةً– অর্থাৎ যখন তারা প্রকাশ্যে কোন নির্লজ্জতার কাজ করে বসে যার প্রভাব অন্যদের উপর পড়ে, অথবা (ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ) এমন কোনো মন্দ কাজ করে ফেলে যার ক্ষতি নিজ পর্যন্তই সীমিত থাকে, তখন তারা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

১৩৬. তাদেরই প্রতিদান হচ্ছে তাদের রবের ক্ষমা ও জান্নাতরাজি, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। আর (সৎ)কর্মশীলদের পারিশ্রমিক কতই না উত্তম[১]!

أُولَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭. নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে বহু ঘটনা ঘটে গেছে*। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমন কর এবং দেখ, অস্বীকারকারীদের কী পরিণাম হয়েছিল[২]।

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মহিমা ও ক্ষমতা, তাঁর শাস্তি ও পুরস্কার, তাঁর হুকুম ও আহকাম, তাঁর দরবারে উপস্থিতি এবং পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ভীতি অন্তরে স্মরণ করে মুখেও তাঁর যিক্‌র আরম্ভ করে দিল। ভীত-বিহ্বল ও অস্থির হয়ে তাঁকে ডাকল, তাঁর সম্মুখে সেজদাবনত হল (যেমন 'সালাতুত তাওবা' এর হাদীসে রয়েছে)। তার পর শরী'য়তসম্মত উপায়ে গোনাহর ক্ষমা চাইল, যেমন: পাওনাদারের হক আদায় করল অথবা তার নিকট থেকে মাফ নিল এবং আল্লাহর দরবারে তওবা ও এস্তেগফার করল (কারণ, আসল ক্ষমাকারী তো তিনিই)। মানবীয় দুর্বলতাবশত কৃত গোনাহর উপর অনড় থাকল না, বরং আল্লাহ তাআলা বান্দার খাঁটি তওবা কবুল করেন এ কথা জেনে অনুতপ্ত হল ও গোনাহ ছেড়ে দিয়ে তওবা করতে করতে তাঁর দরবারে হাযির হয়ে গেল—

এমন লোকেরাও দ্বিতীয় পর্যায়ের মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের জন্য বেহেশত প্রস্তুত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই তওবাকারীদের গোনাহ মাফ করে স্বীয় জান্নাতে স্থান দেবেন এবং তাঁরা তওবা বা অন্যান্য যে নেক আমল করে থাকবেন, তার উত্তম বিনিময় দান করবেন।

* **দ্বিতীয় তরজমা**– 'বহু উম্মত গত হয়েছে'।

২. অর্থাৎ তোমাদের পূর্বে বহু জাতি ও মিল্লাত অতীত হয়েছে, বড় বড় ঘটনা ঘটেছে। এ কথাও বারবার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যারা নবীদের শত্রুতা ও সত্যের বিরোধিতায় তৎপর ছিল এবং আল্লাহ-রাসূলের সমর্থন ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে হারামখুরী, অত্যাচার ও পাপাচার করে যাচ্ছিল, তাদের কঠিন পরিণাম হয়েছে। বিশ্বাস না হলে পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করে ওদের ধ্বংসাবশেষ ও ধ্বংস-স্মৃতি দেখে নাও– যা আজো তোমাদের দেশের নিকটে বর্তমান রয়েছে।

এসব ঘটনা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ, যে মুশরিকরা আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে সত্যকে পরাস্ত করার জন্য বের হয়েছিল, তাদের জন্য উচিত নয় এতটুকু সাময়িক সফলতায় গর্বিত হওয়া। কেননা,

১৩৮. এসব মানুষের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য পথের দিশা ও সদুপদেশ[১]।

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

১৩৯. তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তিতও হয়ো না। তোমরাই প্রবল থাকবে, যদি তোমরা ঈমানদার হও[২]।

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

১৪০. যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তবে ওই লোকদেরও অনুরূপ আঘাত লেগেছে।

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ

তাদের শেষ পরিণতি ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়। আর কাফেরদের পাষণ্ডতা ও বর্বরতায় বা নিজেদের সাময়িক পশ্চাৎপদতায় মুসলমানদেরও দুঃখকাতর ও নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কারণ, অবশেষে সত্যের বিজয় হবেই হবে। অতীত কাল থেকে আল্লাহ তাআলার এই নীতিই চলে এসেছে, যা ব্যাহত হওয়ার নয়।

১. অর্থাৎ সকল মানুষের কান খোলার জন্য কুরআনে এসব বিষয় বিবৃত হয়েছে, যা শুনে মানুষ আল্লাহভীরুতা, হেদায়েত ও নসীহত হাসিল করে থাকে। অবশ্য যার অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই, নসীহতপূর্ণ হুঁশিয়ারীতে সে কীভাবে লাভবান হবে?

২. এ আয়াতগুলি উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। যখন মুসলিম মুজাহিদগণ আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হচ্ছিলেন, তাঁদের বড় বড় বাহাদুরের লাশগুলো চোখের সামনে নাক-কান কর্তিত অবস্থায় পড়েছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও পাষণ্ডরা আহত করে দিয়েছিল, বাহ্যত মুসলমানদের চূড়ান্ত পরাজয়ের আয়োজন দেখা যাচ্ছিল– এমন নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলার আশ্বাসবাণী শুনিয়ে দেওয়া হল- وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا ...الخ

(শুনে রাখ! যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নির্মমতায় ঘাবড়ে গিয়ে খোদার দুশমনদের মোকাবিলায় কিছুমাত্র কাপুরুষতা ও দুর্বলতা প্রদর্শন করো না। বিপদাপদে পড়ে, দুঃখ-চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া মুমিনের জন্য শোভা পায় না। মনে রেখো! আজো তোমরাই বিজয়ী ও সম্মানিত। কেননা, তোমরা হকের নুসরতের জন্য দুঃখ-কষ্ট সইছ এবং জান দিচ্ছ, আর চূড়ান্ত বিজয়ও তোমাদের। শেষ পর্যন্ত তোমরাই বিজয়ী হবে)। শর্ত এই যে, ঈমান ও একীনের পথের উপর স্থির থাকতে হবে এবং আল্লাহ তাআলার ওয়াদাসমূহের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে রাসূলের আনুগত্য ও আল্লাহ তাআলার পথে জেহাদ করতে হবে, তা থেকে পিছু হটা যাবে না।

খোদায়ী এই আওয়াজ মুসলমানদের ভগ্ন হৃদয়কে শক্তিশালী করল এবং মৃতদেহে নবজীবন সঞ্চার করল। ফলে, বাহ্যদৃষ্টিতে ইতিপূর্বের বিজয়ী কাফেররা আঘাতপ্রাপ্ত মুজাহিদদের প্রতি-আক্রমণ সামলিয়ে উঠতে পারল না বরং রণাঙ্গন থেকে দিশাহারা হয়ে পলায়ন করল।

قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۟

বস্তুত আমি ওই দিনগুলি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তিত করতে থাকি[১]। আর (আল্লাহ এরূপ করেছেন), যাতে আল্লাহ তাদের জেনে নেন যারা (প্রকৃত) মুমিন[২] এবং যেন তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ করেন –আর আল্লাহ জালেমদের ভালবাসেন না[৩]

১. উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের যে কঠিন ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল, তাতে তাঁরা খুবই মনভাঙ্গা হয়ে পড়েছিলেন। তদুপরি মুনাফিক ও দুশমনদের বিদ্রূপ-ভর্ৎসনা শুনে অধিকতর কষ্ট-ভারাক্রান্ত হচ্ছিলেন। কেননা, মুনাফিকরা বলতে লাগল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সত্য নবীই হয়ে থাকেন তবে এত ক্ষয়-ক্ষতি কেন হল, অথবা স্বল্প সময়ের জন্য হলেও সাময়িক পরাজয় কেন হল?

আল্লাহ তাআলা বর্তমান আয়াতগুলিতে মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, এই যুদ্ধে যদি তোমরা আহত হয়ে থাক অথবা তোমাদের কষ্ট-ক্লেশ হয়ে থাকে, তবে বিপক্ষীয়দেরও উপর অনুরূপ বিপদাপদ এসেছে। উহুদে তোমাদের পঁচাত্তর জন শহীদ ও অনেকে আহত হয়েছে। কিন্তু এক বছর পূর্বেই ওদের সত্তর জন দোযখী ও বহু সংখ্যক হতাহত হয়েছিল। আর এই যুদ্ধেও প্রথম দিকে ওরা নিহত ও আহত হয়েছে, যেমন এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়— وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ (আল্লাহ তো তোমাদের সঙ্গে তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছিলেন, যখন তোমরা তাঁর হুকুমে ওদের হত্যা করছিলে। –আলে ইমরান, ১৫২)। অধিকন্তু বদরের যুদ্ধে ওদের সত্তর জন লাঞ্ছিত অবস্থায় বন্দী হয়েছিল। পক্ষান্তরে তোমাদের একজনেরও এই অপমান হয়নি।

যা হোক, ওদের ক্ষয়-ক্ষতির সঙ্গে তোমাদের ক্ষতির তুলনা করলে দুঃখ-কষ্টের ও অনুতাপের কোন অবকাশ থাকে না। আর ওদের জন্যও গৌরব ও অহংকারে মাথা উঁচু করার সুযোগ নেই। অবশ্য আমার নীতি সর্বদা এ-ই যে, কঠোরতা ও নম্রতা, সুখ ও দুঃখ, কষ্ট ও আরামের দিনগুলিকে আমি মানবজাতির মধ্যে আবর্তন করতে থাকি, যার মধ্যে বহু হেকমত নিহিত রয়েছে। আর ওরা যখন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও বাতিলের সহায়তার ব্যাপারে হিম্মতহারা হয়নি, তখন তোমরা হকের সহায়তার বিষয়ে কেমন করে সাহসহারা হতে পার?

২. অর্থাৎ যাতে মুনাফিকদের থেকে খাঁটি ঈমানদারদের পৃথক করে দেন এবং যাতে উভয় দলের অবস্থা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে।

৩. এখানে ظٰلِمِيْن বলতে যদি মুশরিকরা উদ্দেশ্য হয় যারা উহুদে বিপক্ষ-দল ছিল, তবে অর্থ এই হবে যে, ওদের সাময়িক সফলতার কারণ এই নয় যে, আল্লাহ তাআলা ওদের ভালবাসেন, বরং অন্যান্য কারণে ওরা কৃতকার্য হয়েছিল। আর যদি মুনাফিকরা উদ্দেশ্য

১৪১. এবং যাতে আল্লাহ ঈমানদারদের পাক-পবিত্র করেন এবং কাফেরদের নিশ্চিহ্ন করে দেন[১]।

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ

১৪২. তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখন পর্যন্ত আল্লাহ তাদের জেনে নেননি, তোমাদের মধ্যে যারা জিহাদকারী এবং জেনে নেননি অটল-অবিচল লোকদের।[২]

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ

১৪৩. আর তোমরা তো মৃত্যু কামনা করতে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে, সুতরাং এখন তো তা দেখে নিলে স্বচক্ষে[৩]।

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

হয় যারা ঠিক যুদ্ধের সময় মুসলমানদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল, তবে অর্থ এই যে, ওরা আল্লাহ তাআলার নিকট (ভালবাসার নয়) ক্রোধের পাত্র ছিল, সে জন্য ঈমান ও শাহাদতের মর্যাদা থেকে ওদের দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

১. অর্থাৎ জয় ও পরাজয় পরিবর্তনশীল জিনিস। আর মুসলমানদের শাহাদতের উচ্চ মর্যাদা দান করা উদ্দেশ্য ছিল। তাছাড়া মুমিন ও মুনাফিককে যাচাই করা, মুসলমানদের পরিশুদ্ধ করা অথবা গোনাহ থেকে পবিত্র করা এবং কাফেরদের ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন করা– এসবও উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, ওরা যখন নিজেদের সাময়িক প্রাধান্য ও বিজয়ের কারণে অহংকারী হয়ে কুফর ও পাপাচারে বাড়াবাড়ি করবে, তখন আরো বেশি আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও গযবের যোগ্য হবে। এ কারণে মুসলমানদের এই সাময়িক পরাজয় ঘটল, নতুবা আল্লাহ তাআলা কখনই কাফেরদের প্রতি সন্তুষ্ট নন।

২. অর্থাৎ জান্নাতের যেসব উচ্চ মাকাম ও স্তরে আল্লাহ তাআলা তোমাদের পৌছাতে চান, তোমরা কি মনে কর যে, অনায়াসে সেখানে গিয়ে প্রবেশ করবে এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদের পরীক্ষা নিয়ে দেখবেন না যে, তোমাদের মধ্যে কতজন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে এবং কতজন যুদ্ধের সময় স্থিরপদ থাকে? এ রকম খেয়াল না করা উচিত। উচ্চ মাকামে তাদেরই অধিষ্ঠিত করা হয়, যারা খোদার রাস্তায় হরেক রকম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে ও সমূহ স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। কবির কথায়-

یہ رتبۂ بلند ملا جسکو مل گیا ÷ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں

('এ উচ্চ মর্যাদা যার ভাগ্যে জুটেছে সেই পেয়েছে, প্রত্যেক দাবিদার কি এ মর্যাদা পেতে পারে?)

৩. যে সাহাবীগণ বদর যুদ্ধে যোগদান করা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তাঁরা বদরে শহীদগণের ফযীলতের কথা শুনে শুনে কামনা করতেন, আল্লাহ যদি আবার কোন

[রুকূ - ১৫]

১৪৪. মুহাম্মদ তো একজন রাসূল, যাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। তো, তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন, তবে কি তোমরা নিজেদের পিছনের দিকে ফিরে যাবে? যে কেউ তার পিছনের দিকে ফিরে যাবে, সে মোটেই আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ অবশ্যই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন[১]।

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَا۟ئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ۝

সুযোগ দিতেন তবে আমরাও আল্লাহর রাস্তায় নিহত হতাম এবং শাহাদতের মর্যাদা হাসিল করতাম। এ সাহাবীরাই উহুদ যুদ্ধের সময় পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা উচিত।

বর্তমান আয়াতে তাঁদের বলা হচ্ছে, পূর্বে যে জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করতে তা তোমাদের চোখের সামনে এসে গেছে। এখন সামনে অগ্রসর না হয়ে পিছু হটার মানে কী?! হাদীসে আছে, শত্রুর সাক্ষাৎ কামনা করো না। কিন্তু তার সম্মুখীন হয়ে গেলে দৃঢ়পদ থেকো। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ২৯৬৬)

১. **শানে নুযূল ও সংশ্লিষ্ট ঘটনা**

উহুদ যুদ্ধে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যুদ্ধের নকশা তৈরি করেছিলেন। সকল ব্যূহ রচনা করার পর দেখা গেল, একটি গিরিপথ উন্মুক্ত। সেই পথে মুসলিম বাহিনীর পিছন দিক থেকে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. এর নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজকে মোতায়েন করে নির্দেশ দিলেন, আমাদের অবস্থা যাই হোক, তোমরা এখান থেকে কিছুতেই হটবে না। মুসলমানদের জয়-পরাজয় যাই হোক, এমন কি তোমরা যদি দেখ যে, পাখী ওদের গায়ের গোশত খাচ্ছে, তবুও তোমরা স্বস্থান ত্যাগ করবে না– وانا لن نزال غالبين ماثبتم مكانكم ('আমরা বিজয়ী থাকব যাবৎ তোমরা স্বস্থানে কায়েম থাকবে।')

মোট কথা, সৈন্যবাহিনীকে পূর্ণ হেদায়েত দানের পর যুদ্ধ শুরু হল। রণাঙ্গন অত্যন্ত সরগরম, ইসলামের মুজাহিদগণ অগ্রসর হয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করছিলেন। আবু দুজানা, আলী মুর্তাজা প্রমুখ বীর মুসলিম সেনাদের বীরত্ব ও বাহাদুরীর সম্মুখে মুশরিকদের কোমর ভেঙ্গে পড়ছিল। পালানোর পথ ছাড়া ওদের সামনে আর কোন উপায় দেখা যাচ্ছিল না। এভাবে আল্লাহ তাআলা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করে দেখালেন। পরাজয়ের মুখে কাফেররা দিশাহারা হয়ে পলায়ন করল। ওদের মেয়েদের, যারা (আপন লোকদের) আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করতে এসেছিল, হাঁটুর উপর কাপড় তুলে এদিক- সেদিক পলায়ন করতে দেখা গেল। মুজাহিদরা গনীমতের মাল হস্তগত করতে শুরু করলেন।

উক্ত গিরিপথে বসানো তীরন্দাজগণ এই দৃশ্য দেখে ভাবলেন, বিজয় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, দুশমন ভেগেছে। এখানে অযথা অবস্থান করার কী প্রয়োজন, অগ্রসর হয়ে শত্রুদের তাড়া করা এবং গনীমতের মালে অংশ নেওয়া দরকার। আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. তাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ স্মরণ করালেন, কিন্তু তারা ভাবলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের আসল উদ্দেশ্য তাঁরা পূর্ণ করেছেন, এখানে থাকার এখন আর দরকার নেই। এই মনে করে সকলে গনীমতের মালের উপর হামলে পড়লেন। আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর মাত্র এগার জন সাথীসহ গিরিপথের হেফাজতে রইলেন। তখন মুশরিক অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি খালেদ বিন ওলীদ (যিনি তখনো 'হযরত' ও রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু' হননি) ফিরে এসে গিরিপথের দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে দিলেন। দশ-বারজন তীরন্দাজ আড়াই শ অশ্বারোহীর আক্রমণ কী করে প্রতিরোধ করতে পারেন! তবুও আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর ও তাঁর সঙ্গীগণ প্রতিরোধের আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং প্রাণ বিসর্জন দেন।

মুসলিম মুজাহিদগণ পিছন দিকের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলেন, এমতাবস্থায় হঠাৎ মুশরিক আরোহীরা তাঁদের মাথার উপর গিয়ে পৌছল। ওদিকে সম্মুখ থেকে পলায়নরত মুশরিক বাহিনীও ফিরে এল। মুসলমানগণ উভয় দিক থেকে পরিবেষ্টিত হয়ে গেলেন এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। এতে বহু মুসলিম সৈন্য শহীদ হলেন এবং আহত হলেন।

এই হট্টগোলের মধ্যেই ইবনে কামিয়্যা একটি ভারী পাথর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নিক্ষেপ করল, ফলে তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হল এবং নূরানী চেহারা আহত হল। ইবনে কামিয়্যার ইচ্ছা ছিল তাঁকে শহীদ করে ফেলা, কিন্তু ইসলামের পতাকাবাহী মুস'আব ইবনে উমায়র প্রতিরোধ করলেন। আঘাতের প্রচণ্ডতায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির উপর পড়ে গেলেন। এ সময় কোন এক শয়তান ঘোষণা দিয়ে দিল, তিনি নিহত হয়ে গিয়েছেন।

এ কথা শুনে মুসলমানগণ সম্বিতহারা হয়ে পড়লেন এবং তাঁদের পায়ের নীচে মাটি রইল না। কেউ কেউ হাত-পা ছেড়ে বসে পড়লেন। কতক দুর্বল ঈমানধারী ভাবল, মুশরিক সর্দার আবু সুফিয়ানের নিকট গিয়ে নিরাপত্তা হাসিল করি। কতক মুনাফিক বলল, যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হয়ে গেছে, তখন ইসলাম পরিত্যাগ করে নিজেদের পুরাতন ধর্মেই প্রত্যাবর্তন করা উচিত। তখন আনাস ইবনে মালেকের চাচা আনাস ইবনে নযর বলে উঠলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হয়ে গিয়ে থাকলেও মুহাম্মদের প্রভু তো নিহত হননি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে তোমাদের জীবিত থাকার স্বার্থকতা কী! যে সত্যের জন্য তিনি প্রাণ বিসর্জন দিলেন, তোমরাও সেই জন্য জান দিয়ে দাও।' এই বলে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলেন, বীর বিক্রমে আক্রমণ করলেন এবং যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন।

এমন সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজ শোনা গেল- إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ! أَنَا رَسُولُ اللهِ 'আল্লাহর বান্দাগণ! এদিকে আস, আমি আল্লাহর রাসূল!' কাব ইবনে মালেক

তাঁকে চিনে চিৎকার দিয়ে উঠলেন, 'হে মুসলমানগণ! সুসংবাদ গ্রহণ কর! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বর্তমান!' আওয়াজ শোনামাত্র মুসলমানগণ সেদিকে ছুটে আসলেন। ত্রিশজন সাহাবী তাঁর নিকটবর্তী হয়ে প্রতিরোধ করলেন এবং মুশরিক বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। এস্থলে সাদ বিন আবু ওক্কাস, তালহা, আবু তালহা, কাতাদাহ বিন নু'মান প্রমুখ সাহাবীগণ অস্বাভাবিক শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করলেন। শেষ পর্যন্ত মুশরিকরা রণাঙ্গন ছেড়ে যেতে বাধ্য হল এবং এই আয়াতগুলি নাযিল হল। وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ ... الخ (তাফসীরে তবারী ৬/৯৯-১০২)

অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো খোদা নন, একজন রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন, যাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের অনুসারীগণ দীন-ধর্ম রক্ষা করেছেন এবং জান ও মাল বিসর্জন দিয়ে তা কায়েম রেখেছেন। অতএব তাঁরও দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। যদি কোন সময় তাঁর ওফাত ঘটল বা তিনি শহীদ হলেন, তবে কি তোমরা দীনের খেদমত ও হেফাজতের রাস্তা ছেড়ে উলটা দিকে ফিরে যাবে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ পরিত্যাগ করবে? (যেমন, উপস্থিত ক্ষেত্রে কেবল নিহত হওয়ার খবর শুনে অনেকে সাহসহারা হয়ে বসে পড়েছিল), অথবা মুনাফিকদের পরামর্শ অনুযায়ী নাউযুবিল্লাহ দীন ছেড়ে দেবে? তোমাদের থেকে এমনটি কখনই আশা করা যায় না। আর যদি কেউ এমন করল, তবে সে নিজেরই ক্ষতি করল– আল্লাহর কী ক্ষতি করতে পারবে? তিনি তোমাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন, বরং তিনি যদি তোমাদেরকে তাঁর দীনের কাজে লাগান, তবে শোকর কর। কবির ভাষায়-

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنم ÷ منت شناس ازو کہ بخدمت گذاشتت

'বাদশাহর খেদমত করছ বলে গর্ব করো না, বরং অনুগ্রহ স্বীকার কর যে, তিনি তোমাকে খেদমতের সুযোগ দিয়েছেন।'

আর শোকর এ-ই যে, তোমরা দীনের খেদমতে অধিকতর মজবুত ও দৃঢ়পদ হও।

এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, হযরতের ওফাতের পর কতক লোক দীন থেকে ফিরে যাবে। আর যারা অবিচল থাকবে, তারা অনেক বড় সওয়াব লাভ করবে। বস্তুত হযরতের পরে বহু লোক মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. তাদের পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে আনেন এবং কতককে (যারা ফেরেনি) হত্যা করা হয়।

বর্তমান আয়াত দ্বারা ঈসা (আ) এর মৃত্যু প্রমাণিত হয় না

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ এর মধ্যে خَلَتْ ক্রিয়াটি خلو ধাতু থেকে নির্গত, যার অর্থ 'গত হওয়া', 'অতীত হওয়া', ও 'ছেড়ে যাওয়া'। এর জন্য মৃত্যু জরুরী নয়, যেমন وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ আয়াতে إذا خلوا এর অর্থ, যখন 'ওরা তোমাদের ছেড়ে পৃথক হয়'। তদুপরি الرسل শব্দটির আলিফ-লাম (استغراقي) এসতেগরাকী বা রাসূলগণের সকলকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়নি, বরং তা (جنس) জিন্‌স বা রাসূলগণের জাতি বোঝানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, এস্থলে দাবি প্রমাণে (রাসূলগণের) সামগ্রিকতার কোন ভূমিকা

১৪৫. কারো জন্য সম্ভব নয় যে, সে আল্লাহর হুকুম ছাড়া মৃত্যুবরণ করবে (কেননা, আল্লাহ প্রত্যেকের মৃত্যুর সময়) সুনির্দিষ্ট করে লিখে রেখেছেন[১]। যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতিদান চাইবে, আমি তাকে দুনিয়ার

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ

নেই। (অতএব বর্তমান আয়াত থেকে মাসীহ ইবনে মারইয়াম [আ.]-এরও মৃত্যু হয়ে গেছে– এ কথা বের করা যায় না।)

ঠিক অনুরূপ বাক্য হযরত মাসীহ আ. সম্পর্কেও বলা হয়েছে- مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ('মাসীহ ইবনে মারয়াম কেবল একজন রাসূল। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন।') এখানে সামগ্রিকতার অর্থ নিলে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে, মাসীহর পূর্বে সকল রাসূল গত হয়ে গিয়েছেন, তাঁর পরে আসার কেউ অবশিষ্ট থাকেনি। (জানা কথা, এ সম্পূর্ণ ভুল। অতএব) বোঝা গেল, আলিফ-লাম এস্থলে অবশ্যই للجنس, যা জাতি অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

ঠিক তদ্রূপ বর্তমান আয়াতেও তা للجنس। হযরত ইবনে মাসউদের মুসহাফে ও ইবনে আব্বাসের কেরাতে الرسل এর স্থলে رسل শব্দটি আলিফ-লাম বিহীন আছে। এতেও উপরোক্ত কথার সমর্থন হয়। বাকী আয়াতের মধ্যে 'خَلَتْ' এর পরে শুধু মৃত্যু বা হত্যার উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাভাবিক মৃত্যু আসা অবধারিত ছিল এবং হত্যার খবরটি তখন রটানো হয়েছিল। তবে যেহেতু তাকদীরে ছিল মৃত্যু, নিহত হওয়া নয়— তাই مات-কে প্রথমে আনা হয়েছে।

হুজুর সা. এর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর রা. সাহাবাগণের সামনে বর্তমান আয়াতটি قد خلت الشاكرين পর্যন্ত, এবং اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ আয়াতটিও পড়লেন। তখন তাঁরা أفإن مات ও দ্বারা হুজুর সা. এর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া যে সম্ভব, সে সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। আবু বকর রা. এর উদ্দেশ্যও এ-ই ছিল। কিন্তু এর দ্বারা তিনি (আয়াত অতরণের সময়ই) মৃত্যু ঘটে যাওয়াকে প্রমাণ করেননি এবং কেউ এমন বুঝেওনি। এই শব্দ যদি মৃত্যু ঘটে যাওয়ার সংবাদ বহণ করত, তবে বুঝে নিতে হত যে, অবতরণের সময় অর্থাৎ ওফাতের সাত ববছর পূর্বেই তাঁর মুত্যু ঘটে গেছে!!

এই ব্যাখ্যার ফলে কোন কোন মুহাররিফ তথা আয়াতের অপব্যাখ্যাকারীর সমস্ত অপপ্রয়াস ধূলির মত উড়ে যায়। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানে আলোচনা আর লম্বা করা যায় না। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের জন্য ইশারা করে দেওয়া হল মাত্র।

১. যেহেতু আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো ব্যক্তি মরতে পারে না এবং প্রত্যেকের মৃত্যু নির্ধারিত সময়েই ঘটবে, রোগের কারণে হোক বা হত্যার ফলে, অথবা অন্য কোন কারণে, অতএব আল্লাহর উপর ভরসাকারীর এতে ঘাবড়াতে নেই এবং বড় বা ছোট কারো মৃত্যুর কথা শুনে নিরাশ বা মন খারাপ করে হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

(প্রতিদান) থেকে কিছু দেব[১]; আর যে আখেরাতের প্রতিদান চাইবে, আমি তাকে আখেরাতের (প্রতিদান) থেকে (যত ইচ্ছা) দেব[২] এবং আমি কৃতজ্ঞদের অবশ্যই পুরস্কার দেব[৩]।

يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشّٰكِرِيْنَ ۝

১৪৬. কত নবী রয়েছেন, যাঁদের সঙ্গী হয়ে বহু আল্লাহওয়ালা যুদ্ধ করেছে। অতঃপর আল্লাহর পথে তাদের উপর যে কষ্ট-বিপদ এসেছে তার কারণে তারা সাহস হারায়নি, দুর্বলও হয়নি এবং (শত্রুর সামনে) নতও হয়নি। আর আল্লাহ অটল-অবিচল লোকদের ভালবাসেন[৪]।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ যদি আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ('আমি তাকে দুনিয়াতেই যতটুকু ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা নগদ দিয়ে দেই।' –সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ২)

২. অর্থাৎ সে নিশ্চিতরূপে আখেরাতে প্রতিফল পাবে।

আয়াতের পূর্ববর্তী বাক্যে তাদের প্রতি কটাক্ষ রয়েছে, যারা গণীমতের মালের লোভে আদেশ অমান্য করেছিলেন আর এই বাক্যে তাঁদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যাঁরা আগাগোড়া আনুগত্যে অটল ছিলেন।

৩. অর্থাৎ যারা দীনের উপর দৃঢ়পদ থাকবে, তারা দীনও লাভ করবে দুনিয়াও পাবে– তবে শর্ত হচ্ছে এই নে'য়ামতের মর্যাদা বুঝতে হবে (كذا في الموضح)

৪. অর্থাৎ তোমাদের পূর্বে বহু আল্লাহওয়ালা নবীদের সঙ্গে থেকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং যুদ্ধে তাঁদের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু সেই সব বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের দরুন তাঁদের ইচ্ছা-এরাদায় শিথিলতা আসেনি, তাঁরা হিম্মতহারা হননি, দুর্বলতাও প্রকাশ করেননি এবং দুশমনদের সামনে নতিও স্বীকার করেননি। আল্লাহ তাআলা এমন স্থিরপদ লোকদের খুবই ভালবাসেন।

এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সেইসব মুসলমানকে সতর্ক করলেন এবং লজ্জা দিলেন, যারা উহুদের যুদ্ধে দুর্বলতা দেখিয়েছিলেন। এমন কি, কেউ কেউ বলে ফেলেছিলেন যে, কারো মধ্যস্থতায় আবু সুফিয়ান থেকে নিরাপত্তা হাসিল করা হোক।

সারকথা, যেহেতু পূর্ববর্তী উম্মতদের সত্য-অনুসারীরা বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়ে এ রকম ধৈর্য ও অবিচলতার প্রমাণ দিয়েছিলেন, অতএব এই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের পক্ষে তাঁদের চেয়েও বেশি ধৈর্য ও স্থিরতার পরিচয় দেওয়া উচিত।

১৪৭. আর তাদের কথা এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা বলতে থেকেছে, 'হে আমাদের রব! আপনি আমাদের পাপ এবং আমাদের কাজে আমাদের দ্বারা যে সীমালঙ্ঘন হয়েছে, তা ক্ষমা করুন এবং আমাদের পা অটল-অবিচল রাখুন ও কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন[১]।'

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ۝

১৪৮. অতঃপর আল্লাহ তাদের দান করেছেন— দুনিয়ার প্রতিফল ও আখেরাতের উত্তম প্রতিদান। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন[২]।

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ۝

[রুকূ - ১৬]

১৪৯. হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা কাফেরদের আনুগত্য কর, তবে ওরা তোমাদেরকে তোমাদের পিছনের দিকে (অর্থাৎ কুফরের দিকে) ফিরিয়ে দেবে, ফলে তোমরা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ

---

১. অর্থাৎ বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়ে তাঁরা ভয়-বিহ্বলতার কোন কথা বলেননি, যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে যাওয়ার ও দুশমনদের আনুগত্য স্বীকার করার একটি শব্দও মুখ থেকে বের করেননি। বলে থাকলে, শুধু এই বলেছেন, 'প্রভু হে! তুমি আমাদের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বাড়াবাড়ি (সীমা লঙ্ঘন) ক্ষমা করে দাও, আমাদের অন্তরকে মজবুত ও দৃঢ় রাখ, যাতে সত্যের পথ থেকে আমাদের পদস্খলন না হয়। আর কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।'

তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, অনেক সময় মানুষের গোনাহ-খাতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি মুসিবত আসার কারণ হয়ে থাকে। আর আমাদের মধ্যে কেউ দাবি করতে পারে না যে, তার দ্বারা কখনো কোন ত্রুটি হয়নি। যা হোক, মুসিবতের কারণে ঘাবড়ে গিয়ে মানুষের শরণাপন্ন হওয়ার পরিবর্তে তাঁরা স্বীয় খালেক ও মালেকের শরণাপন্ন হয়েছেন।

২. অর্থাৎ দুনিয়ায় তাঁদের বিজয় ও কামিয়াবী এবং মর্যাদা ও আধিপত্য দান করলেন। আর আখেরাতের যে উত্তম পুরস্কার লাভ হল তার তো কথাই নেই। দেখ, যারা আল্লাহর সঙ্গে নিজের মুআমালা ঠিক রাখে এবং নেক কাজ করে, তাদের আল্লাহ তাআলা এমন ভালবাসেন এবং এরকম ফল দান করেন।

فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ

(চরম) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে[১]।

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ

১৫০. (ওরা নয়) বরং আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী[২]।

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ

১৫১. এখনই আমি কাফেরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করব– কারণ, ওরা এমন বস্তুকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছে, যার কোন সনদ তিনি অবতীর্ণ করেননি। ওদের আবাসস্থল জাহান্নাম, আর জালেমদের বাসস্থান কতই না নিকৃষ্ট[৩]!

---

১. অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের মন ভাঙ্গার ফলে কাফের ও মুনাফিকরা সুযোগ পেল। অনেকে দোষারোপ করতে ও খোঁটা দিতে লাগল, আবার অনেকে হিতাকাঙ্ক্ষীর ছদ্মবেশে বোঝাতে শুরু করল যে, ভবিষ্যতে আর মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করো না।

এ কারণে আল্লাহ তাআলা (মুসলমানদের) সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, 'তোমরা শত্রুদের ধোঁকায় পড়ো না। খোদা না করুন, যদি ওদের প্রতারণায় পড়, তবে যে অন্ধকার থেকে আল্লাহ তোমাদের বের করেছেন, পুনরায় পিছিয়ে গিয়ে সেই অন্ধকারেই পড়বে এবং ক্রমান্বয়ে সত্য ধর্মেরই রশি হাতছাড়া হয়ে যাবে। এর পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু নয়।'

ইতিপূর্বে আল্লাহওয়ালাদের পথে চলতে মুসলমানদের উৎসাহিত করা হয়েছে। আর এখানে অন্তর্দুষ্ট দুরাচারীদের কথা শুনতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে মুসলমানরা সতর্ক থাকে এবং নিজেদের লাভ-লোকসান কিসে, তা বুঝতে পারে।

২. অতএব তাঁরই আনুগত্য করা উচিত এবং তাঁরই সাহায্যের উপর ভরসা করা সমীচীন। বস্তুত যার সাহায্যে আল্লাহ রয়েছেন, তার কী প্রয়োজন আল্লাহর দুশমনদের সাহায্যের প্রতীক্ষা করা অথবা ওদের সামনে আনুগত্যের গর্দান ঝুঁকিয়ে দেওয়া?

হাদীসে আছে, উহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আবু সুফিয়ান 'হুবল'-এর জয়ধ্বনি করে বলেছিল– لنا عزى ولا عزى لكم 'আমাদের জন্য 'উযযা' দেবতা রয়েছে, তোমাদের কোন উয্যা নেই।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের বললেন, 'তোমরা উত্তরে বলে দাও- الله مولانا ولا مولى لكم 'আল্লাহ আমাদের অভিভাবক, তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই।' (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪০৪৩)

৩. অর্থাৎ এ (উহুদ যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়) ছিল তোমাদের পরীক্ষা। এখন আমি কাফেরদের দিলের মধ্যে এমন ভয়-ভীতি সঞ্চার করব যে, তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত, দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ওরা পুনরায় এসে তোমাদের আক্রমণ করার সাহস করতে পারবে না।

১৫২. আল্লাহ তো তোমাদের সঙ্গে তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছিলেন যখন তোমরা তাঁর হুকুমে ওদের হত্যা করছিলে[১]। তার পর যখন তোমরা কাপুরুষতা দেখালে, (করণীয়) কাজের বিষয়ে পরস্পর মতভেদ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ

বাস্তবেও তাই হয়েছিল। আবু সুফিয়ান ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে স্বীয় বাহিনী নিয়ে ভেগে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে একবার মনেও হল যে, আঘাতপ্রাপ্ত ও ক্লান্ত-শ্রান্ত বাহিনীকে এভাবেই ছেড়ে আসলাম, চল আবার গিয়ে তাদের খতম করে আসি। কিন্তু আল্লাহপ্রদত্ত ভীতি ও ইসলামের প্রভাববশত এই পরিকল্পনা বাস্তবে কার্যকর করার সাহস ওদের হয়নি। পক্ষান্তরে, মুসলিম মুজাহিদগণ 'হামরাউল আসাদ' পর্যন্ত ওদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন, আর তাঁরা পরবর্তীকালেও কখনো উহুদের ঘটনার পুনরাবৃত্তির সুযোগ দেননি।

মুশরিকদের দুর্বলতা ও প্রকৃত মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য

মুশরিক যত শক্তিই দেখাক না কেন, ওর অন্তর খুবই দুর্বল হয়। কেননা, সে দুর্বল সৃষ্টির আনুগত্য করে থাকে, যেমন মা'বূদ তেমন আবেদ– ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ (অর্থাৎ ওরা উভয়ই দুর্বল)। আর এমনিতেও আসল শক্তি ও ক্ষমতা তো খোদার সাহায্যেই লাভ হয়– যা থেকে কাফের-মুশরিক অবশ্যই বঞ্চিত। এ জন্যই মুসলমান যতদিন খাঁটি মুসলমান থেকেছে, কাফেররা সর্বদা তাদের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল। বরং আমরা আজ পর্যন্ত লক্ষ্য করছি যে, মুসলমানদের অনৈক্য, বিভেদ, দুর্বলতা ও অবনতি সত্ত্বেও দুনিয়ার সমগ্র কাফের শক্তি এই ঘুমন্ত ও আহত সিংহকে ভয় করে এবং সর্বদা চিন্তায় অস্থির থাকে, যেন এই জাতি জাগ্রত হতে না পারে। হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'এক মাসের দূরত্বে থাকতেই আমার ভয় দুশমনদের অন্তরে সঞ্চার করা হয়।' (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৩৫) এরই তাছীর নিঃসন্দেহে মুসলমান জাতি লাভ করেছে فلله الحمد على ذلك وله المنة

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন, যদি তোমরা ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ কর তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জয়যুক্ত করবেন। সে মত যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আল্লাহ তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছিলেন। তাঁরা আল্লাহর হুকুমে কাফেরদের হত্যা করতে করতে স্তূপীকৃত করলেন– মুশরিকদের পতাকাবাহী একের পর এক সাত বা নয়জন সেখানেই খতম হল। শেষপর্যন্ত তারা দিশাহারা হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। মুসলমানগণ নিশ্চিত বিজয় ও সৌভাগ্যের সূর্য দেখতে পাচ্ছিলেন এবং তাঁদের সামনে গনীমতের মালপত্র পড়ে রয়েছিল। এমতাবস্থায় তীরন্দাজদের একটি ভুলের সুযোগ নিলেন সেনাপতি খালেদ বিন ওলীদ এবং রাতারাতি যুদ্ধের পট পরিবর্তন হয়ে গেল, যেমন ইতিপূর্বে আমরা লিখেছি।

بَعۡدِ مَاۤ اَرٰىكُمۡ مَّا تُحِبُّوۡنَ ؕ مِنۡكُمۡ مَّنۡ يُّرِيۡدُ الدُّنۡيَا وَمِنۡكُمۡ مَّنۡ يُّرِيۡدُ الۡاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمۡ عَنۡهُمۡ لِيَبۡتَلِيَكُمۡ ۚ وَلَقَدۡ عَفَا عَنۡكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ ذُوۡ فَضۡلٍ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۝

করলে এবং অবাধ্যতা করলে[১], তোমরা যা ভালবাস তা তোমাদের দেখানোর পর– (তখন তিনি তাঁর সাহায্য বন্ধ করে দিলেন)। তোমাদের মধ্যে কতক দুনিয়া চাচ্ছিল এবং কতক চাচ্ছিল আখেরাত[২]। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে ওদের সামনে থেকে হটিয়ে দিলেন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য[৩]। তিনি তো তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন[৪]। আর আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি বড় মেহেরবান[৫]।

১. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীরন্দাজদের যে আদেশ দিয়েছিলেন তাঁরা তার খেলাফ করলেন এবং পরস্পর বিতর্ক করতে লাগলেন। কেউ বলেছিলেন, আমাদের এখানেই থাকা উচিত। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ বললেন, এখন আর এখানে থাকার দরকার নেই, বরং অগ্রসর হয়ে গনীমতের মাল হাসিল করাই সমীচীন।

শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ তীরন্দাজই স্ব স্ব স্থান ছেড়ে চলে গেলেন। মুশরিকরা সেই রাস্তা দিয়েই অতর্কিত আক্রমণ করে বসল। অন্যদিকে কাফেররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতলের সংবাদ ছড়িয়ে দিল। এসব ব্যাপার মুসলমানদের অন্তরে দুর্বলতা সৃষ্টি করল, যার ফলে কাপুরুষতা ও ভীরুতা প্রকাশ পেল। বলা যায়, কাপুরুষতার কারণ বিতর্ক, এবং বিতর্কের কারণ নাফরমানী ছিল।

২. অর্থাৎ কিছু লোক পার্থিব সামগ্রী (তথা গনীমতের মাল) লাভের আশায় পদস্খলিত হলেন– যার খেসারত সকলকে ভোগ করতে হল। হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, 'এই আয়াতের অবতরণের পূর্বে আমি কখনো ধারণা করিনি যে, আমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়ার অন্বেষীও হতে পারে।'

৩. অর্থাৎ ওরা যেখানে তোমাদের সম্মুখ থেকে পলায়ন করছিল, এখন তোমরা ওদের সম্মুখ থেকে পলায়ন করতে শুরু করলে। তোমাদের ভুলের কারণে পরিস্থিতি পাল্টে গেল। আর এতেও তোমাদের জন্য পরীক্ষা ছিল, যাতে কাঁচা (দুর্বল) ও পাকা (সবল) সাফ প্রকাশ পেয়ে যায়।

৪. অর্থাৎ যে ভুল হয়েছিল তা আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণরূপে মাফ করে দিয়েছেন। এখন কারো পক্ষে উক্ত কাজের জন্য তাঁদের সমালোচনা ও দোষারোপ করা জায়েয নয়।

৫. এজন্যই আল্লাহ তাআলা তাঁদের ভুল-ত্রুটি মাফ কর দেন এবং ভর্ৎসনা করার ক্ষেত্রেও স্নেহ-মমতার দিক বজায় রাখেন।

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْٓ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۵۳﴾

১৫৩. (স্মরণ কর), যখন তোমরা (পাহাড়ে) আরোহণ করছিলে এবং কারও দিকে ফিরেও দেখছিলে না, অথচ রাসূল তোমাদের পিছন থেকে তোমাদের ডাকছিলেন[১]। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে দুঃখের বদলে দুঃখ দিলেন[২], যাতে যা তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং যে বিপদ তোমাদের উপর পতিত হয় তার কারণে তোমরা দুঃখ না পাও। আর আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে সম্যক অবহিত[৩]।

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ

১৫৪. অতঃপর, তিনি তোমাদের উপর দুঃখের পর অবতীর্ণ করলেন প্রশান্তি অর্থাৎ তন্দ্রা,

---

১. অর্থাৎ তোমরা ভেগে পাহাড়-পর্বত ও বন-জঙ্গলে চলে যাচ্ছিলে এবং ভয়-বিহ্বলতার চোটে পিছনে ফিরেও কাউকে দেখছিলে না। এ সময় আল্লাহর নবী যথারীতি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে তোমাদের এমন করতে নিষেধ করছিলেন এবং নিজের প্রতি আহ্বান করছিলেন। কিন্তু তোমরা এহেন পেরেশানী ও অস্থিরতার মধ্যে কেমন করে তাঁর ডাক শুনতে পাবে! পরিশেষে যখন কাব ইবনে মালেক চিৎকার দিলেন, তখন তাঁরা শুনতে পেলেন এবং ফিরে এসে প্রিয় নবীর চারপাশে সমবেত হলেন।

২. অর্থাৎ তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে কষ্ট দিলে, এর বদলে তোমাদের উপর কষ্ট এল– দুঃখের বিনিময়ে দুঃখ পাওয়া গেল, যাতে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা হয়ে যায় যে, সর্বাবস্থায় রাসূলের আদেশ মেনে চলা উচিত– চাই তাতে গনীমত ইত্যাদির মত লাভজনক বস্তু হাতছাড়া হয়ে যাক, বা কোন বিপদ ধেয়ে আসুক।

বি. দ্র. অধিকাংশ মুফাসসির فَاَثَابَهُمْ غَمًّا بِغَمٍّ এর অর্থ করেছেন, আল্লাহ তোমাদেরকে দুঃখের উপর দুঃখ দিলেন। অর্থাৎ এক দুঃখ তো ছিল প্রাথমিক বিজয় ও সফলতা হাতছাড়া হওয়ার কারণে, দ্বিতীয়টা ছিল নিজ দলের মানুষ নিহত ও আহত হওয়া এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহীদ হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে যাওয়ার কারণে।

কেউ অর্থ করেছেন, বিজয় ও সফলতা হাতছাড়া হওয়ায়, গনীমতের মাল হাত থেকে চলে যাওয়ায় এবং শারীরিক ও আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ায় যে দুঃখ হয়েছিল, তার বিনিময়ে এমন একটি বড় দুঃখ দেওয়া হল যা পূর্ববর্তী সকল দুঃখ-কষ্টকে ভুলিয়ে দিল, অর্থাৎ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হওয়ার মিথ্যা সংবাদ। এই অতিশয় দুঃখের কারণে আগপাছের কোন কিছুরই হুঁশ রয়নি, এমনকি তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজও শুনতে পাননি। একাগ্রতার সঙ্গে একদিকে মনোযোগী হয়ে পড়লে অন্য দিকের ব্যাপারে এমন বিস্মৃতি ও গাফলত এসে যায়।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের অবস্থা ও নিয়ত জানেন এবং সে অনুযায়ীই আচরণ করে থাকেন।

اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ

যা তোমাদের একদল লোককে আচ্ছন্ন করে নিল[১]। আর (অপর) একদল লোকের চিন্তা হচ্ছিল কেবল নিজেদের জানের[২]। ওরা আল্লাহ সম্বন্ধে জাহেলদের ধারণার ন্যায় অবাস্তব ধারণা করছিল[৩]। ওরা বলছিল, 'আমাদের হাতে কোন ইখতিয়ার

---

১. অর্থাৎ এ যুদ্ধে যারা শহীদ হওয়ার ছিলেন তাঁরা শহীদ হলেন, যারা হটে যাওয়ার ছিলেন তারা হটে গেলেন। আর যাঁরা ময়দানে রয়ে গেলেন, তাঁদের মধ্যে মুখলেস মুসলমানদের উপর আল্লাহ তাআলা হঠাৎ তন্দ্রা অবতীর্ণ করলেন। তাঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে লাগলেন। হযরত তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাত থেকে কয়েকবার তলোয়ার খসে মাটিতে পড়ে গেল। এ ছিল সেই বাতেনী শান্তি ও স্থিরতার বাহ্যিক প্রভাব, যা এমন হট্টগোল-অবস্থার মধ্যেও মুমিনদের অন্তরে আল্লাহর মেহেরবানী ও রহমতে অবতীর্ণ হয়। তারপর তাঁদের মন থেকে শত্রুদের ভয়-ভীতি একেবারে মুছে যায়।

এ অবস্থা ঠিক ঐ সময় সৃষ্টি হয়েছিল, যখন মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা উধাও হয়ে গিয়েছিল, লাশের পর লাশ মাটিতে পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করছিল, সৈন্যরা আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়ছিলেন। বলতে গেলে, এই নিদ্রা ছিল তাঁদের জাগ্রত হওয়ার সুসংবাদ। তন্দ্রাভিভূত করে তাঁদের সমস্ত ক্লান্তি দূরীভূত করা হয় এবং তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে, ভয় ও আতঙ্ক, অশান্তি ও অস্থিরতার সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন শান্ত ও স্থির হয়ে নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন কর। তৎক্ষণাৎ সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারদিকে সমবেত হয়ে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্র সাফ হয়ে গেল। সম্মুখ থেকে শত্রুদের পলায়নরত দেখা গেল। সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী রা.-এর সৈন্যরাও বিজয় ও সাফল্যের আলামতস্বরূপ এমন তন্দ্রাভিভূত হয়েছিলেন।

২. এরা হল দুর্বলচিত্ত ভীত মুনাফিক। ওদের না ছিল দীন-ইসলামের ফিকির, না ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিন্তা। ওরা শুধু নিজ নিজ প্রাণ রক্ষার ভাবনায় মত্ত ছিল। কী জানি, আবু সুফিয়ানের বাহিনী পুনরায় এসে আক্রমন করে বসে কি না? তা করলে আমাদের কী গতি হবে? এ রকম চিন্তা-ভাবনা যাদের, তাদের আবার তন্দ্রা বা নিদ্রা কিসের?

৩. অর্থাৎ আল্লাহর ওয়াদাসমূহ কোথায় গেল? মনে হয় ইসলামের ব্যাপার এখানেই শেষ হল। পয়গম্বর ও মুসলমানদের আর বাড়ী ফিরে যেতে হবে না, এখানেই যুদ্ধে সকলকে ধ্বংস হতে হবে। যেমন: অন্যত্র বলা হয়েছে- بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا ('মূলত তোমরা এ ধারণাই করেছিলে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনগণ নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট কখনো ফিরে আসতে পারবে না।' ফাতাহ : ১২)

الْاَمْرِ مِنْ شَیْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ یُخْفُوْنَ فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا یُبْدُوْنَ لَكَ ؕ یَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِیْ بُیُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِیْنَ كُتِبَ

আছে কি[১]?' আপনি বলুন, 'নিশ্চয় সমস্ত ইখতিয়ার আল্লাহর হাতে[২]।' ওরা নিজেদের মনে এমন কথা গোপন করে, যা আপনার কাছে প্রকাশ করে না। ওরা বলে, 'যদি আমাদের হাতে কোন ইখতিয়ার থাকত তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না[৩]।' আপনি বলুন, 'তোমরা যদি নিজেদের

১. هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ –অর্থাৎ আমাদের কাজ কি কিছু হবে, না সবই শেষ হয়ে গেছে? অথবা অর্থ এই যে, আমরা যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী-সাথী, আমাদের হাতে কোনও বিজয় ও সাফল্য এল কি? অথবা অর্থ এই যে, আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই করেছেন। আমাদের বা অন্য কারো কি কোন ইখতিয়ার আছে?

এসব তো হল ওদের শব্দাবলির বাহ্যিক অর্থ, কিন্তু ওদের অন্তরের কথা সম্মুখে আসছে।

২. অর্থাৎ মুনাফিকদের কথা هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ('আমাদের কোন ইখতিয়ার আছে কি?') 'কথা সত্য বটে কিন্তু মতলব খারাপ' –এর পর্যায়ভুক্ত। নিঃসন্দেহে এ কথা সত্য বটে যে, তোমাদের হাতে কিছু নেই, সকল কিছু আল্লাহর হাতে– যাকে ইচ্ছা রক্ষা বা ধ্বংস করবেন, জয়যুক্ত বা পরাজিত করবেন, বিপদগ্রস্ত বা আরামপ্রাপ্ত করবেন, সফল বা বিফল করবেন। একই ঘটনাকে এক সম্প্রদায়ের জন্য রহমত এবং অন্য সম্প্রদায়ের জন্য শাস্তির বিষয় বানানো– সবই তাঁর হাতে। কিন্তু উল্লিখিত কথার দ্বারা তোমরা নিজেদের অন্তরে যে অর্থ নিচ্ছ, অন্তরের সেই চুরি খোদা তাআলা বেশ জানেন। সামনে তা বর্ণিত হবে।

৩. ওদের অন্তরের আসল চোর এখানে ফাঁস করা হয়েছে! তা এই যে, هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ বলে ওরা মনে মনে এই অর্থ গ্রহণ করত এবং সম্ভবত খাঁটি মুসলমানগণ থেকে পৃথক হয়ে তা পরস্পরে বলাবলিও করত যে— 'দেখ, শুরুতে আমাদের কথা মানল না, কিছু সংখ্যক আবেগপ্রবণ অনভিজ্ঞ মানুষের কথায় মদীনার বাইরে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত খেসারত পোহাতে হল, (পরাজয় বরণ করল)। যদি আমাদের ইখতিয়ারে কিছু থাকত এবং আমাদের পরামর্শক্রমে আমল করা হত, তবে এমন ক্ষতিগ্রস্ত হতে হত না। আমাদের এতসব আপন লোকও মারা যেত না। (অধিকাংশ মুনাফিক বংশসূত্রে মদীনার আনসারদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে শামিল ছিল, তাই مَا قُتِلْنَا هٰهُنَا আয়াতাংশে তাঁদের নিহত হওয়াকে নিজেদের নিহত হওয়া আখ্যায়িত করেছে।)

বি. দ্র. বাহ্যত মনে হয়, মুনাফিকরা এ কথাগুলো মদীনায় বলেছিল (উহুদে নয়)। কারণ, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নিজ দলসহ চলে গিয়েছিল (উহুদে যায়নি)। এ ক্ষেত্রে নিকটবর্তীতার কারণে ههنا দ্বারা উহুদের প্রতি ইশারা হবে। কিন্তু কোন কোন হাদীস অনুসারে এই কথা মু'আত্তাব বিন কুশায়র নামে জনৈক মুনাফিক যুদ্ধক্ষেত্রে বলেছিল। তাহলে বলা হবে, সম্ভবত কোন কারণে কতক মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের সাথে প্রত্যাবর্তন করেনি। (যুদ্ধে রয়ে গিয়েছে।) والله أعلم

عَلَيۡهِمُ الۡقَتۡلُ اِلٰی مَضَاجِعِهِمۡ ۚ وَلِيَبۡتَلِیَ اللّٰهُ مَا فِیۡ صُدُوۡرِكُمۡ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِیۡ قُلُوۡبِكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوۡرِ ﴿۱۵۴﴾

ঘরের ভিতরে থাকতে, তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য লিখে দেওয়া হয়েছিল তারা অবশ্যই বের হয়ে আসত নিজেদের মৃত্যুস্থানের দিকে[১]। আর (আল্লাহ এসব করেছেন) এজন্য, যাতে তিনি তোমাদের মনে যা আছে তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরে কী আছে তা পরিষ্কার-পরিশুদ্ধ করেন। আর আল্লাহ অন্তরসমূহে যা আছে সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত[২]।

اِنَّ الَّذِيۡنَ تَوَلَّوۡا مِنۡكُمۡ يَوۡمَ الۡتَقَی الۡجَمۡعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسۡتَزَلَّهُمُ الشَّيۡطٰنُ بِبَعۡضِ مَا كَسَبُوۡا ۚ وَلَقَدۡ عَفَا اللّٰهُ عَنۡهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ حَلِيۡمٌ ﴿۱۵۵﴾

১৫৫. দুই সৈন্যদল মুখোমুখী হওয়ার দিন তোমাদের মধ্যে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, বস্তুত শয়তান তাদের পদস্খলিত করে দিয়েছিল তাদেরই কতক কৃতকর্মের পরিণামে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, সহনশীল[৩]।

---

১. অর্থাৎ এই নিন্দা-সমালোচনা ও আফসোস-আক্ষেপ করায় কোন লাভ নেই। আল্লাহ তাআলা তো প্রত্যেকের জন্য মৃত্যু, মৃত্যুর স্থান এবং তার কারণ ও সময় লিখে রেখেছেন, যা কখনই টলতে পারে না। যদি তোমরা ঘরের ভিতর ঢুকে বসে থাকতে এবং ধরে নাও, তোমাদেরই পরামর্শ মানা হত, তবুও যাদের ভাগ্যে উহুদের নিকটবর্তী যে যে স্থানে মৃত্যু বা নিহত হওয়া লিখিত ছিল, তারা সেদিকে কোন না কোন কারণে বের হয়ে আসত এবং সেখানেই নিহত হত। এ তো নিহতদের উপর আল্লাহ তাআলার মেহেরবাণী যে, যেখানে নিহত হওয়া লেখা ছিল সেখানেই নিহত হয়েছে, তবে আল্লাহর রাস্তায় খুশী মনে বাহাদূরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করে শহীদ হয়েছে। সুতরাং এতে দুঃখ ও আফসোস করার কী? খোদার রাস্তার বাহাদূরদের নিজদের সাথে তুলনা করো না।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তো দিলের গোপন রহস্যও জানেন, কারো কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়। তো, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের সকলকে একটি পরীক্ষায় ফেলা, যাতে তোমাদের মনের ভিতর যা কিছু আছে তা বের হয়ে আসে– আর পরীক্ষার আগুনে পুড়ে ভেজাল পৃথক হয়ে যায়। যারা খাঁটি, তারা সাফল্যের মালা পরে এবং ভবিষ্যতের জন্য তাঁদের অন্তর ওয়াসওয়াসা ও দুর্বলতা থেকে পাক-সাফ হয়ে যায়। আর মুনাফিকদের আভ্যন্তরীণ কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং লোকেরা পরিষ্কারভাবে ওদের ভিতরকার কদর্যতা বুঝতে শুরু করে।

৩. মুখলেসীন তথা খাঁটি মুমিনদেরও কোন কোন সময় এক-আধটু গোনাহ হয়ে যায়। আর যেভাবে একটি পুণ্যের ওসিলায় আরেকটি পুণ্যের তাওফীক হয়, তেমনি এক পাপের মন্দ ফলশ্রুতিতে শয়তান অন্য ভুল-ভ্রান্তি ও পাপের দিকে উৎসাহিত করার সুযোগ পায়। উহুদ

[রুকূ - ১৭]

১৫৬. হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা কুফর অবলম্বন করেছে[১] এবং যারা স্বীয় ভাইদের সম্বন্ধে বলে[২]– যখন তারা যমীনের বুকে (কোথাও) সফর করে অথবা জেহাদে থাকে– 'যদি তারা আমাদের কাছে থাকত তবে মারা যেত না এবং নিহতও হত না'। (ওরা এসব এজন্য বলে), যাতে আল্লাহ এ কথাকে মুসলমানদের অন্তরে আক্ষেপ (সৃষ্টির কারণ) বানান[৩]। বস্তুত

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَكُوۡنُوۡا كَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَقَالُوۡا لِاِخۡوَانِهِمۡ اِذَا ضَرَبُوۡا فِى الۡاَرۡضِ اَوۡ كَانُوۡا غُزًّى لَّوۡ كَانُوۡا عِنۡدَنَا مَا مَاتُوۡا وَمَا قُتِلُوۡا ۚ لِيَجۡعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسۡرَةً فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ ؕ

যুদ্ধে যে মুখলেস মুসলমানগণ রণাঙ্গন থেকে হটে গিয়েছিলেন, বস্তুত পিছনের কোন গোনাহর অশুভ পরিণামে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। যেমন: একটি গোনাহ তো এই ছিল যে, তীরন্দাজদের অনেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের পাবন্দী করেননি।

কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানী, এর পরিণামে কোন ধ্বংসাত্মক পরাজয় নেমে আসেনি। তাছাড়া তাঁদের কোন গোনাহ অবশিষ্ট রয়নি, আল্লাহ তাআলা তাঁদের ত্রুটি সম্পূর্ণ মাফ করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের সমালোচনা করার অধিকার কারো নেই।

১. অর্থাৎ তোমরা কাফের-মুনাফিকদের মত এ নিরর্থক ধারণাকে কস্মিনকালেও অন্তরে স্থান দিয়ো না যে, ঘরে বসে থাকলে মৃত্যু আসত না, নিহতও হত না।

২. যেহেতু মুনাফিকরা বাহ্যত মুসলমান সেজে রয়েছিল, সেহেতু তারা মুসলমানদেরকে নিজেদের ভাই বলেছে। অথবা তার কারণ এই যে, বংশ-সূত্রে ওরা মদীনার আনসারদের ভাই-বেরাদার ছিল। আর যেহেতু এ কথা হিতাকাঙ্ক্ষা ও সহানুভূতির আকারে বলত, সেজন্য اخوان শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ তারা অযথা বাইরে গিয়ে মারা গেল, আমাদের কাছে নিজ ঘরে যদি থেকে যেত তবে মারা যাওয়ার বা নিহত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। এ কথা এই উদ্দেশ্যে বলত, যাতে মুসলমান শ্রোতাদের অন্তরে আক্ষেপ ও আফসোস সৃষ্টি হয় এবং তারা ভাবে যে, সত্যিই চিন্তা-ভাবনা না করে বের হয়ে যাওয়া এবং যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণে এই ফল হল। ঘরে থেকে গেলে এই মুসিবত আসত না।

কিন্তু মুসলমানগণ এত কাঁচা ছিলেন না যে, ওদের এহেন মুখরোচক কথার শিকার হবেন। এসব কথায় উলটা মুনাফিকদেরই মুখোস খুলে গেল।

কোন কোন মুফাসসির لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ -এর لام -কে لام العاقبة তথা পরিণতির অর্থে ধরে বলেছেন, মুনাফিকদের মুখে ও অন্তরে এসব কথা এজন্য জারী করে

وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

আল্লাহই জীবিত রাখেন ও মৃত্যু ঘটান[১]। আর আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড উত্তমরূপে দেখেন[২]।

وَلَىِٕنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

১৫৭. যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ কর[৩], তবে আল্লাহর ক্ষমা ও মেহেরবানী তো ওরা যা সঞ্চয় করে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট।

وَلَىِٕنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ

১৫৮. আর তোমরা মৃত্যুবরণ কর অথবা নিহত হও, সর্বাবস্থায় আল্লাহরই সামনে তোমাদের একত্র করা হবে[৪]।

দেওয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহ ওদেরকে সর্বদা উক্ত আক্ষেপ ও আফসোসের আগুনে জ্বলতে দেন। তাছাড়া ওদের যাতে এ আক্ষেপও থাকে যে, মুসলমানরা আমাদের মত হল না এবং আমাদের কথা কেউ শুনলও না। এ হিসাবে ليجعل এর সম্পর্ক لاتكونوا এর সাথেও হতে পারে।

১. অর্থাৎ মৃত্যু ঘটানো ও জীবন দান করা আল্লাহর কাজ। অনেক মানুষ জীবনভর সফর করে বেড়ায় এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে গমন করে, কিন্তু তাদের মৃত্যু হয় ঘরে বিছানার উপর। পক্ষান্তরে, কত মানুষ ঘরের কোণে পড়ে থাকায় অভ্যস্ত, কিন্তু পরিশেষে আল্লাহ কোন কিছুর অজুহাতে তাদের বাইরে বের হতে দেন এবং সেখানে তারা মারা যায় বা নিহত হয়। মানুষ-সৃষ্ট বাধা-বিপত্তিতে এ বিষয় পরিবর্তিত হয় না।

হযরত খালেদ বিন ওলীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মৃত্যুকালে বলেছিলেন, আমার শরীরে এক বিঘত জায়গাও তরবারী ও বর্শার আঘাতমুক্ত নেই, কিন্তু আজ আমি একটি উটের মত ঘরে মরছি- فلا نامت أعين الجبناء (অর্থাৎ আল্লাহ করুন, এটা দেখে কাপুরুষদের চোখ খুলুক)। (তারীখে দামেশ্‌ক ১৬/২৭২-২৭৩)

২. তাই মুনাফিক ও কাফেররা কোন্ পথ অবলম্বন করছে এবং মুসলমানরা ওদের সাদৃশ্য ও অনুসরণ থেকে কতটা দূরে থাকছে, আল্লাহ তাআলা তা দেখছেন। তিনি প্রত্যেককে তার অবস্থানুযায়ী ন্যায্য প্রতিফল দেবেন।

৩. অর্থাৎ তাঁরই পথে।

৪. অর্থাৎ ধরে নাও, তোমরা সফরে বা জেহাদে বের হলে না এবং আপাতত মৃত্যু থেকে রক্ষা পেলে, কিন্তু কোন না কোন সময় তোমাদের অবশ্যই মরতে বা নিহত হতে হবে এবং তখন তো সকলকে আল্লাহর সামনেই সমবেত হতে হবে। তখন বোঝা যাবে, যে ভাগ্যবানরা আল্লাহর রাস্তায় মরল বা নিহত হল, তারা আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও দয়ার

فَبِمَا رَحۡمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنۡتَ لَهُمۡ ۚ وَلَوۡ كُنۡتَ فَظًّا غَلِيۡظَ الۡقَلۡبِ لَا نۡفَضُّوۡا مِنۡ حَوۡلِكَ ۠ فَاعۡفُ عَنۡهُمۡ وَاسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِى الۡاَمۡرِ ۚ فَاِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُتَوَكِّلِيۡنَ ﴿۱۵۹﴾

১৫৯. কেবল আল্লাহর রহমতের বদৌলতেই আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয়। আর যদি আপনি রূঢ়, কঠোর-হৃদয় হতেন তবে তারা আপনার নিকট থেকে সরে পড়ত। অতএব আপনি তাদের মার্জনা করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং (প্রয়োজনীয়) বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন আপনি (ঐ কাজের) সংকল্প করেন, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরকারীদের ভালবাসেন[১]।

কী বিরাট অংশই না পেল, যার সামনে তোমাদের পার্থিব উপার্জন ও সঞ্চিত ধন-ঐশ্বর্য কিছুই নয়।

সারকথা, ঘর থেকে বের না হলে মারা যেত না– মুনাফিকদের এ কথা মেনে নিলেও বের না হওয়াটা ক্ষতি বৈ কিছুই না। কেননা, তাতে সেই মৃত্যু থেকে বঞ্চিত হত, যার জন্য লাখো জীবন উৎসর্গ করা যেতে পারে এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে যা মৃত্যু নয় বরং শাশ্বত জীবন। কবির ভাষায় :

فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے ÷ جو جینا ہے تو مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ

'আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণের ভেতর নিহিত রয়েছে অমরত্বের রহস্য। অতএব অমরতা লাভ করতে চাইলে জীবনদানে প্রস্তুত হও।'

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

মুসলমানদেরকে স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির ব্যাপারে সতর্ক করে এবং ক্ষমার ঘোষণা শোনানোর পর উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, ভবিষ্যতে বন্ধুরূপী ওই শত্রুদের (মুনাফিকদের) কথায় প্ররোচিত হয়ো না। বর্তমান আয়াতে তাঁদের সেই ক্ষমার পূর্ণতাবিধান করা হয়েছে।

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের দ্বারা মারাত্মক ভুল হয়ে গিয়েছিল বলে সম্ভবত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর ক্রোধান্বিত হয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যতে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ না করতে মনস্থ করে থাকবেন। সেজন্য আল্লাহ তাআলা অতি বিস্ময়কর ও অপূর্ব ভঙ্গিতে তাদের জন্য সুপারিশ করেছেন।

আয়াতের মর্ম

প্রথমত, আল্লাহ নিজ তরফ থেকে ক্ষমার ঘোষণা করলেন। কারণ তাঁর জানা ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রোধ ও কষ্ট একমাত্র স্বীয় প্রভুর জন্যই হয়ে থাকে। অতঃপর আল্লাহ বললেন- فَبِمَا رَحۡمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنۡتَ لَهُمۡ অর্থাৎ আপনার ও তাদের উপর

إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ

১৬০. যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কেউই তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তাঁর পর

আল্লাহর কত বড় রহমত যে, আপনাকে তিনি এ রকম সচ্চরিত্র ও কোমল-স্বভাব বানিয়ে দিয়েছেন। অন্য কেউ হলে, আল্লাহ জানেন, এমন কঠিন পরিস্থিতিতে কী মনোভাব পোষণ করত। এ একমাত্র আল্লাহরই মেহেরবানী যে, আপনার মত স্নেহপরায়ণ, কোমল-হৃদয় পয়গম্বর তাদের ভাগ্যে জুটেছে। ধরুন, আল্লাহ না করুন, আপনার অন্তর যদি কঠোর হত এবং স্বভাবে যদি রুক্ষতা থাকত, তবে এই সম্প্রদায় আপনার পাশে কী করে থাকতে পারত? তাদের দ্বারা কোনো ভুল হলেই আপনি শক্তভাবে ধরতেন এবং তারা লজ্জা ও ভয়ে কাছেও আসতে পারত না। ফলে তারা অতি বড় ভাগ্য ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থেকে যেত এবং ইসলামী জামাতের ঐক্য-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়ে যেত।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপনাকে কোমল-হৃদয় ও নম্র-ভদ্র বানিয়েছেন বলে আপনি সংশোধনের সাথে সাথে তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করে থাকেন। সুতরাং আপনার হকসম্পর্কিত যে ত্রুটি এস্থলে হয়েছে, তা আপনি মাফ করে দিন। আর যদিও আল্লাহ স্বীয় হক মাফ করে দিয়েছেন, তবু তাদের অধিকতর মনতুষ্টির জন্য আমার নিকটও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। যাতে এই ভগ্ন হৃদয়গুলি আপনার সন্তুষ্টি ও খুশী উপলব্ধি করে সম্পূর্ণ শান্ত ও নিঃসংকোচ হয়ে যায়।

আর শুধু ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হবেন না, ভবিষ্যতে কাজ-কর্মে যথারীতি তাদের সঙ্গে পরামর্শও করে যাবেন। পরামর্শ করার পর যখন কোন বিষয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং সংকল্প গ্রহণ করা হবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করে বিনাদ্বিধায় তা করে ফেলবেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর ভরসাকারীদের পছন্দ করেন এবং তাদের কাজ সম্পন্ন করে দেন।

বি. দ্র. হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল- عزم ('আযম') কী? এর উত্তরে তিনি বলেছেন, مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم- বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করা, তারপর তাদের অনুসরণ করা (ইবনে কাছীর)।

আর مجمع الزوائد এ হযরত আলী রা. এর হাদীসে আছে, তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে বিষয় আমরা কুরআন ও হাদীসে পাব না, সে বিষয়ে কোন্ পথ অবলম্বন করব?' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'খোদার ইবাদতগুজার ফকীহদের সঙ্গে পরামর্শ করবে। আর لا تمضوا فيه رأي خاصة –অর্থাৎ, শুধু দু'এক জনের রায় জারী করবে না।' (মুজামে আওসাত, হাদীস : ১৬৪১; মাজমাউয্ যাওয়াইদ, হাদীস : ৮৪৩)

بَعْدِهٖ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ۝

তোমাদের সাহায্য করবে? আর মুমিনদের আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত[১]।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ؕ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ۝

১৬১. কোন নবীর জন্য সম্ভব নয় যে, তিনি (কোন জিনিস) গোপন করে ফেলবেন। আর যে কেউ গোপন করবে, সে কিয়ামতের দিন নিজের গোপন করা জিনিস নিয়ে উপস্থিত হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের (ফল) পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না[২]।

---

১. পূর্ববর্তী আয়াতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে, আল্লাহর উপর ভরসা করুন। এখানে বলা হচ্ছে, ভরসার উপযুক্ত সেই সত্তাই হতে পারেন, যিনি সকলের চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত। সকল মুসলিমের উচিত, তাঁরই সাহায্যের উপর ভরসা করা। তাই আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ত্রুটি নিজে ক্ষমা করে এবং স্বীয় পয়গম্বর দ্বারা ক্ষমা করিয়ে এখানে তাদের উপদেশ দিচ্ছেন যে, 'কারো কথায় না পড়ে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে, তাঁর সাহায্য হলে কোন শক্তিই তোমাদের উপর জয়লাভ করতে পারবে না– যেমন বদর যুদ্ধে দেখেছ। আর কোন মঙ্গলহেতু তিনি সাহায্য না করলে অন্য কেউই সাহায্য করতে পারবে না– যেমন উহুদ যুদ্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেছ।'

২. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ এর দ্বারা হয় মুসলমানদের পূর্ণরূপে সান্ত্বনা দেওয়া উদ্দেশ্য, যাতে তাদের মনে এই ওয়াসওয়াসা না আসে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাহ্যত মাফ করে দিলেও তাঁর অন্তরে ক্রোধ রয়েছে, পরে হয়ত তা প্রকাশ করবেন। এমন সন্দেহ দূর করণার্থে এখানে বলা হয়েছে, ভিতরে এক রকম, আর বাইরে অন্য রকম– এ নবীদের স্বভাব নয়।

অথবা আয়াতে মুসলমানদের বোঝানো হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা, নিষ্পাপতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তাদের পুরাপুরি সচেতন থাকা কর্তব্য। তাঁর সম্পর্কে কখনো কোন অসঙ্গত বা অহেতুক ধারণা আনতে নেই– যেমন, এ ধারণা পোষণ করা যে, তিনি হয়ত গণীমতের কিছু সম্পদ গোপন করেছেন! نعوذ بالله

এ কথা সম্ভবত এজন্য বলেছেন যে, ঐ তীরন্দাজগণ গণীমতের জন্য গিরিপথের মুখ ত্যাগ করে ছুটে গেলেন। অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি গণীমত থেকে তাঁদের অংশ দিতেন না? তিনি কোন বস্তু কি গোপন করে রাখতেন? (নিশ্চয়ই না।) কোন কোন হাদীসে আছে, বদরের যুদ্ধে গণীমতের মাল থেকে একটি চাদর বা তলোয়ার হারিয়ে গিয়েছিল। কেউ বলল, হয়ত হুযূর নিজের জন্য তা রেখে থাকবেন। এতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তিরমিযী, বর্ণনা ৩০০৯; আবু দাউদ, বর্ণনা ৩৯৭১)

১৬২. আচ্ছা, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে, যে আল্লাহর ক্রোধ কামাই করেছে এবং ওর বাসস্থান হচ্ছে দোযখ? আর (তা) কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল[১]!

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

১৬৩. আল্লাহর নিকট মানুষের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। আর তারা যা কিছু করে, আল্লাহ উত্তমরূপে দেখেন[২]।

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৬৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদেরই মধ্য থেকে[৩]-

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا

যা হোক, মুসলমানদের বোঝানো উদ্দেশ্য যে, যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কোমল স্বভাব ও ভদ্রতাগুণে তোমাদের ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দেন, অতএব তোমাদেরও কর্তব্য তাঁর মহিমা, নিষ্পাপতা ও পবিত্রতা সম্পর্কে সবিশেষ খেয়াল রাখা। কোনো রকম দুর্বল ও হীন ধারণা মুমিনদের ধারে-কাছেও আসা উচিত নয়। অন্যদিকে, যেহেতু তাঁর স্নেহপরায়ণতা ও কোমলতা স্মরণ করিয়ে উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের ত্রুটি ক্ষমা করানো হচ্ছিল, তাই প্রসঙ্গক্রমে বদরে সংঘটিত একটি ত্রুটির কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, যাতে তিনি স্বীয় কোমল স্বভাবহেতু এর ব্যাপারেও মনে কিছু না রাখেন, (বরং ক্ষমা করে দেন)।

বি. দ্র. غلول এর আসল অর্থ গনীমতের মালে খেয়ানত করা। তবে কখনো সাধারণ খেয়ানত অর্থেও ব্যবহৃত হয়, বরং কোন কোন সময় কোন দ্রব্যবিশেষ গোপন করে ফেলার অর্থেও প্রযোজ্য হয়। যেমন: হযরত ইবনে মাসউদ রা. এই অর্থে ব্যবহার করে বলেছেন- غلوا مصاحفكم (তোমাদের কুরআনের কপি গোপন রাখ।)

১. অর্থাৎ যে নবী সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত, বরং অন্যদেরও আল্লাহর অনুগত করতে চান, তিনি কি সেইসব লোকদের ন্যায় কাজ করতে পারেন, যারা আল্লাহর ক্রোধ ও গযবের পাত্র এবং দোযখের উপযুক্ত? কখনো না।

২. অর্থাৎ নবী ও অন্যান্য মানুষ সমান নয়। লোভ, লালসা ইত্যাদির মত হীন কাজ নবীদের দ্বারা হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা সকলকেই জানেন যে, কে কোন্ স্তরের এবং তিনি সকলের কাজ-কাম দেখেন। তিনি কি এমন নিম্ন স্বভাববিশিষ্ট লোকদের নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন? (আল্লাহর পানাহ!)

৩. অর্থাৎ তিনি তাদেরই শ্রেণী ও জাতি থেকে একজন মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন– যাঁর কাছে বসা, কথাবার্তা বলা, ভাষা বোঝা এবং সবরকম নূর ও বরকত হাসিল করা সহজ।

عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٤﴾

যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদের পবিত্র করেন (অর্থাৎ শিরক ইত্যাদি থেকে) এবং তাদেরকে কিতাব ও গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেন। আর তারা তো পূর্বে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল[১]।

তাঁর হাল-অবস্থা, স্বভাব-চরিত্র, জীবনের ঘটনাবলি, আমানতদারী, দীনদারী, আল্লাহভীতি ও পবিত্রতা সম্পর্কে তারা বিশেষভাবে অবহিত। নিজেদেরই সম্প্রদায়ের মানুষের দ্বারা যখন মুজেযা প্রকাশ পেতে দেখে, তখন তার প্রতি ঈমান আনা সহজ হয়। ধরুন, কোন জিন বা ফেরেশতাকে রাসূল বানিয়ে পাঠানো হলে তার মুজেযা দেখে এ ধারণা করা সম্ভব ছিল যে, যেহেতু তিনি মানবজাতি থেকে ভিন্ন জীব, তাই সম্ভবত এসব অলৌকিক ঘটনা তার জিন বা ফেরেশতাসুলভ বৈশিষ্ট্যের ফল– অতএব আমাদের দ্বারা এসব ঘটতে পারে না বলে এটা নবুওয়াতের প্রমাণ হতে পারে না।

যা হোক, আল্লাহর এ মহান অনুগ্রহ মুমিনদের স্বীকার করা উচিত যে, তিনি এমন রাসূল পাঠিয়েছেন যাঁর নিকট থেকে তারা অনায়াসে ফয়েয হাসিল করতে পারে। আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তাদেরই সাথে অত্যন্ত নম্রতা, ভদ্রতা, ও স্নেহ-প্রীতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

১. এ ধরনের আয়াত সূরা বাকারারও দুই স্থানে বিবৃত হয়েছে (বাকারা, ১২৯, ১৫১)। সার কথা এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারটি মহান দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে।

নবীজির (সা.) সুমহান দায়িত্বসমূহ

এক- تلاوت آيات (আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো)। একই ভাষাভাষী হওয়ার কারণে তাঁরা আয়াতগুলির জাহেরী অর্থ বুঝতেন ও সে মত আমল করতেন।

দুই. تزكية نفوس অর্থাৎ নফসের ময়লা ও অপবিত্রতা এবং শিরক ও সকল ধরণের গোনাহ থেকে তাদের পবিত্র করা এবং অন্তরসমূহ মেজে-ঘষে পরিষ্কার করা। এ জিনিস আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর আমল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত এবং তাঁর কলবের তাওয়াজ্জুহ ও তাসাররুফের দ্বারা (আল্লাহর হুকুমে) লাভ হত।

তিন. تعليم كتاب আল্লাহর কিতাবের মর্ম (ও উদ্দেশ্য) বলে দেওয়া। বিশেষ বিশেষ স্থলে এর প্রয়োজন দেখা দিত। যেমন: কুরআনের একটি শব্দের অর্থ প্রচলিত ব্যবহার ও বাগধারা হিসাবে বুঝে সাহাবীদের মনে প্রশ্ন উদয় হল, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাস্থানের পূর্বাপর সম্পর্কদৃষ্টে আল্লাহর কিতাবের নির্ধারিত (ও উদ্দিষ্ট) অর্থটি বলে দিতেন ও তাঁদের সন্দেহ দূর করে দিতেন। কুরআন শরীফের অনেক স্থলে এমনটি হয়েছে, যেমন এই আয়াতে– اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ الخ (আন'আম, ৮২) এবং আরো বিভিন্ন স্থলে হয়েছিল।

১৬৫. কি, যখন তোমাদের উপর এমন বিপদ আসল যার দ্বিগুণ তোমরা (শত্রুপক্ষকে) পৌঁছিয়েছ, তখন তোমরা বলছ যে, 'এ কোথা থেকে এল'১?' আপনি বলে দিন, 'তা	اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ

চার. تعليم حكمت (গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়াবলি শিক্ষা দান করা) এবং কুরআন কারীমের দুর্বোধ্য রহস্য ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি এবং শরী'য়তের নিগূঢ় ও গভীর কারণাদি সম্পর্কে অবহিত করা– চাই স্পষ্টভাবে বা ইঙ্গিতে।

আল্লাহর দেওয়া সামর্থ্য ও তাঁর সাহায্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অজ্ঞ ও মূর্খ জাতিকে ইলম ও আমলের সর্বোচ্চ স্তরসমূহে অধিষ্ঠিত করলেন, যারা যুগযুগ ধরে চরম অজ্ঞতা ও সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল। তাঁর কিছুদিনের শিক্ষা ও সংসর্গের ফলে তারা সারা দুনিয়ার জন্য শিক্ষক ও পথের দিশারী হয়ে গেলেন। সুতরাং তাঁদের উচিত, এই বিরাট নেয়ামতের মর্যাদা উপলব্ধি করা এবং কখনো ভুলেও এমন আচরণ না করা, যাতে তাঁর পবিত্র অন্তরে কষ্ট আসতে পারে।

১. পূর্বা-পর সম্পর্ক

পূর্ব থেকে উহুদের ঘটনা আলোচিত হচ্ছিল। এই যুদ্ধে মুসলমানদের যে ত্রুটি হয়েছিল, মাঝখানে তা ক্ষমা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রমাধুর্য ও (মুসলমানদের উপর তাঁর) হুকুক সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়। এখন পুনরায় উহুদের ঘটনার দিকে প্রত্যাবর্তন করা হচ্ছে।

আয়াতের মর্মার্থ

(আল্লাহ বলেন,) উহুদ যুদ্ধে তোমাদের যে কষ্ট ও ক্ষতি পোহাতে হয়েছিল তাতে তোমরা বিস্মিত হয়ে বলছ, 'এই মুসীবত কেমন করে আসল? আমরা তো মুসলমান মুজাহিদ ছিলাম, আল্লাহর রাস্তায় তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে বের হয়েছিলাম। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর মারফত সাহায্য-সহায়তার ওয়াদা করেছিলেন। তাহলে আমাদের উপর এই বিপদ কেমন করে এবং কোথা থেকে এল?'

এরূপ বলার সময় চিন্তা করা দরকার, যে পরিমাণ কষ্ট তোমাদের উপর এসেছিল, তার দ্বিগুণ কষ্ট তোমাদের দ্বারা ওদের উপর পৌঁছেছিল। উহুদে তোমাদের প্রায় সত্তর জন শহীদ হল, অপরদিকে বদরে ওদের সত্তরজন নিহত হয়েছিল এবং সত্তরজন তোমাদের হাতে বন্দী হয়েছিল, যাদের উপর তোমাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল– ইচ্ছা করলে হত্যা করতে পারতে। তদুপরি উহুদে প্রথমদিকে ওদের বিশজনেরও বেশি নিহত হয়েছিল। উহুদে স্বল্প সময়ের জন্য তোমাদের পরাজয় হলেও বদরে ওরা ধ্বংসাত্মক ও ভয়াবহ পরাজয় বরণ করছিল। আর উহুদেও যতক্ষণ তোমরা অবিচলভাবে যুদ্ধ করেছিলে, ওরা পরাজিত হয়েছিল এবং শেষে ময়দান ছেড়ে ভেগে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় ইনসাফের কথা এই যে, তোমাদের জন্য স্বীয় কষ্টের অভিযোগ করা এবং বেশি মনঃক্ষুণ্ন হওয়া চলে না।

أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٦٥﴾	এসেছে তোমাদেরই পক্ষ থেকে[১]।' নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে শক্তিমান।
وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٦٦﴾	১৬৬. দুই সৈন্যদলের মুখোমুখি হওয়ার দিন তোমাদের উপর যা কিছু পতিত হয়েছে, তা (পতিত হয়েছে) আল্লাহরই হুকুমে, আর এজন্য, যাতে তিনি ঈমানদারদের জেনে নেন;
وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ۗ	১৬৭. এবং জেনে নেন তাদের, যারা মুনাফিক[২]। আর ওদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা আস, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর বা (শত্রুদের) প্রতিরোধ কর[৩]।' তারা বলেছিল, 'আমরা

১. চিন্তা করলে বুঝবে, তোমরা নিজেরাই এই বিপদের কারণ হয়েছিলে। তোমরা জোশে এসে নবীর ও অনেক অভিজ্ঞ লোকদের মত গ্রহণ না করে নিজেদের ইচ্ছা ও ইখতিয়ার মত মদীনার বাইরে যুদ্ধের স্থান নির্ধারণ করলে। অতঃপর কঠোর নিষেধ সত্ত্বেও তীরন্দাজগণ গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছেড়ে দিল। তাছাড়া এক বছর পূর্বে যখন বদরের বন্দীদের ব্যাপারে তোমাদের ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে, হয় ওদের কতল করে ফেল, না হয় এই শর্তে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও যে, ভবিষ্যতে এই সংখ্যক মানুষই তোমাদের থেকে নেওয়া হবে অর্থাৎ শহীদ হবে—তখন তোমরা মুক্তিপণের ব্যবস্থাই অবলম্বন করলে এবং শর্ত গ্রহণ করে নিলে। এখন ঐ শর্তটিই পূর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং বিস্ময় প্রকাশের ও অভিযোগ করার সুযোগ কোথায়? এ আপদ তো তোমরা নিজেদের তরফ থেকে গ্রহণ করেছিলে। (বদরের বন্দীদের পূর্ণ ঘটনা সূরা আনফালে আসবে)।

২. তিনি যাকে যখন ইচ্ছা জয়ী এবং যখন ইচ্ছা পরাজিত করতে পারেন। পরাজিত করার কারণ এই নয় যে, তখন তিনি জয়ী করতে অসমর্থ ছিলেন। বরং এজন্য যে, স্বয়ং তোমাদের কাজকর্মের দ্বারা অবস্থাই এমন পয়দা হয়ে গিয়েছিল যে, সামগ্রিক বিজয় দান করার মধ্যে মঙ্গল ছিল না।

যা হোক, যা কিছু ঘটেছে তাঁরই হুকুম ও ইচ্ছায় হয়েছে, তবে তার কারণ তোমরা নিজেরা ছিলে। আর এতে হেকমত এই ছিল যে, একদিকে প্রত্যেক খাঁটি মুমিনের ঈমান ও এখলাস এবং অন্যদিকে প্রত্যেক মুনাফিকের নেফাকের অবস্থা যেন প্রকাশ পেয়ে যায়। এবং খাঁটি ও ভেজাল, কাঁচা ও পাকা পৃথক হয়ে পড়ে।

৩. যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে যখন মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই তিন শত মানুষ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে লাগল তখন বলা হয়েছিল, ঠিক যুদ্ধের সময় কোথায় ভাগছ? আস, ইসলামের দাবিতে সত্য হলে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর। নতুবা অন্তত শত্রুদের প্রতিরোধ করায় অংশগ্রহণ কর, অর্থাৎ সৈন্যদলে শরীক থেকে সংখ্যাধিক্য দেখিয়ে শত্রুদের উপর প্রভাব বিস্তার কর।

قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا تَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ۚ

যদি যুদ্ধ (হবে বলে) জানতাম, তবে নিশ্চয় তোমাদের অনুসরণ করতাম[১]।' ওরা সেদিন ঈমানের চেয়ে কুফরের অধিক নিকটবর্তী ছিল[২]। ওরা স্বীয় মুখে তা বলে, যা ওদের অন্তরে নেই[৩]। আর যা-কিছু ওরা গোপন করে, সে সম্বন্ধে আল্লাহ ভালভাবে অবগত।

অথবা ادفعوا ।او-এর অর্থ এই যে, আল্লাহর রাস্তায় দীনের খাতিরে যুদ্ধ না করলেও অন্তত দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে অথবা নিজের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির হেফাজতের জন্য দুশমনের প্রতিরোধ কর। কারণ, দুশমন কামিয়াব হলে প্রতিশোধ নিতে মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে ভেদাভেদ করবে না। ফলে সকল মুসলমানের মত তোমাদেরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

মোটকথা, সর্বপ্রকারে ওদের মন-মানসিকতা অনুযায়ী হুজ্জত পূর্ণ করা হয় (এবং কৈফিয়ত করার পথ পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়), যাতে অন্তরে যা কিছু আছে তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়।

১. অর্থাৎ যুদ্ধ হবে বলে মনে হচ্ছে না, অযথা অভিনয় মাত্র। আমরা যদি বুঝতাম, সত্যসত্যই যুদ্ধ হবে তবে অবশ্যই সঙ্গী হতাম। তো, যখন যুদ্ধ দেখব তখন যোগদান করব।

অথবা তাদের কথার অর্থ এই যে, যুদ্ধের মত যুদ্ধ হলে তবু সঙ্গে থাকতাম। এটা কোন যুদ্ধ নাকি যে, এক পক্ষে তিন হাজার লস্কর আর অন্য পক্ষে এক হাজার অস্ত্রসস্ত্রহীন মানুষ। এ কিসের যুদ্ধ? শুধু শুধু নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া।

অথবা لو نعلم قتالا বলে ওরা এরূপ প্রকাশ করছিল যে– মিয়াসাব! আমরা যদি রণকৌশল ও যুদ্ধের নিয়মনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতাম, তবে তোমাদের সঙ্গে থাকতাম। কিন্তু পরোক্ষভাবে ওরা এই খোঁটা দিল যে, আমাদের পরামর্শ গ্রহণ না করে অন্যদের মতে কাজ করলে, যার অর্থ এই যে, আমাদের অনভিজ্ঞ মনে কর এবং নিজেদের অভিজ্ঞ। অতএব তোমাদের সাথে আমাদের নেবে কেন? –যা হোক, ওরা মিথ্যা ছল-চাতুরী করে চলে গেল।

২. মুনাফিকরা অন্তরে কাফের ছিল আর মুখে ঈমান প্রকাশ করত। ঐ দিন ঠিক যুদ্ধ-মুহূর্তে নবী আলাইহিস সালাম ও মুসলমানদের ছেড়ে চলে যাওয়ায় এবং মিথ্যা হিলাবাজি করায় ওদের মুনাফিকী স্পষ্টত প্রকাশ পেয়ে গেল। তখন প্রকাশ্যেও ওরা ঈমানের তুলনায় কুফরের বেশি নিকটবর্তী হয়ে গেল। আর নিজেদের কর্ম দ্বারা মুসলমানদের ক্ষতি করল এবং কাফেরদের শক্তি যোগাল।

৩. অর্থাৎ মুখে বলে لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا تَّبَعْنٰكُمْ আর দিলের কথা বলে না। দিলের মধ্যে ছিল– ঠিক আছে, মুসলমান পরাজিত ও অপমানিত হোক এবং আমরা খুশীতে বগল বাজাই।

১৬৮. (ওরাই তারা), যারা নিজেরা (ঘরে) বসে থেকে স্বীয় ভাইদের সম্পর্কে বলে, 'যদি তারা আমাদের কথা মানত তবে নিহত হত না[১]।' আপনি বলে দিন, 'তা হলে নিজেদের উপর থেকে মৃত্যু হটিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও[২]।'

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۞

১৬৯. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তুমি তাদের মোটেই মৃত মনে করো না, বরং (তারা) জীবিত, (তারা) আপন রবের নিকটে, তাদের রিযিক দেওয়া হয়;

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۞

১৭০. তারা খুশি– আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার কারণে। এবং তারা আনন্দ অনুভব করে তাদের নিয়েও, যারা তাদের পরে এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি– এ কারণে যে, এদেরও কোন ভয় নেই এবং এরা দুঃখিত হবে না।

فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞

১৭১. তারা আনন্দিত হয় আল্লাহর নে'য়ামত ও অনুগ্রহের কারণে এবং এ কারণে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না[৩]।

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

---

১. অর্থাৎ নিজেরা কাপুরুষ হয়ে বসে রইল, আর আত্মীয় ও ভাই-বেরাদর (মদীনার আনসার) সম্পর্কে বলল, আমাদের কথা শুনে ঘরে বসে থাকলে নিহত হত না।

২. অর্থাৎ ঘরে বসে থাকলে যদি জান রক্ষা পেতে পারে তবে দেখা যাক, ওরা কেমন করে মৃত্যুকে ঘরে আসতে বাধা দেয়? ঘরে থেকেও যদি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচা না গেল, তবে বাহাদুরের মত রণক্ষেত্রে গৌরবের মৃত্যু বরণ করে না কেন?

৩. **শহীদের ফজীলত ও মর্যাদা**

অর্থাৎ ঘরে বসে থাকলেও মৃত্যু তো না এসে পারে না, তবে মানুষ সেই মৃত্যু থেকে বঞ্চিত থাকে, যাকে মৃত্যুর পরিবর্তে অমর জীবন বলা উচিত। মৃত্যুর পর শহীদগণ এক বিশেষ ধরনের জীবন লাভ করেন, যা অপরাপর মৃতদের ভাগ্যে জোটে না। তাঁরা আল্লাহ তাআলার স্বতন্ত্র নৈকট্য লাভ করেন এবং বড় বড় উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। বেহেশতের রিযিক আযাদীর সাথে তাঁদের কাছে পৌঁছে থাকে। আমরা যেভাবে উন্নত মানের

[রুকূ - ১৮]

১৭২. যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের উপর আঘাত আসার পরও, তাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল ও পরহেজগার- তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান,

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۚ

উড়োজাহাজে বসে স্বল্প সময়ে যেখানে ইচ্ছা উড়ে চলে যাই, শহীদগণের রূহও সবুজ রঙের পাখীসমূহের পাকস্থলীর মধ্যে প্রবেশ করে বেহেশতে বিচরণ করে থাকে। ঐ সবুজ পাখীদের আকৃতি-প্রকৃতি কেমন, তা আল্লাহই ভালো জানেন। সেখানকার জিনিসপত্র আমাদের কল্পনার আওতায় কী করে আসবে?

শহীদগণের দুই আনন্দ

তখন শহীদগণ এজন্য অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎফুল্ল হন যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় কৃপায় তাঁদের শাহাদতের সৌভাগ্য দান করেছেন, তাঁর বিরাট বিরাট নে'য়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন এবং নিজ অনুগ্রহে সর্বদার জন্য বেশি বেশি নে'য়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছেন। হুযূর আলাইহিস সালামের মাধ্যমে শহীদগণের জন্য যেসব ওয়াদা করা হয়েছিল, তা চোখে দেখে তাঁরা অতীব আনন্দিত হন। তাঁরা আরো প্রত্যক্ষ করেন যে, আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের সাধনা মোটেই নষ্ট হতে দেন না, বরং কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি করে তার ফল দান করেন।

তাছাড়া, তাঁরা শুধু যে নিজেদের অবস্থায় আনন্দিত ও উল্লসিত হন তাই নয়, বরং তাঁদের যেসব মুসলমান ভাইকে দুনিয়াতে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ ও অন্যান্য দীনী কাজে ব্যস্ত অবস্থায় রেখে এসেছেন, তাদের ব্যাপারে এ কথা চিন্তা করে এক বিশেষ আনন্দ লাভ করেন যে, তারা যদি আমাদের মত আল্লাহর পথে নিহত হয় অথবা কমপক্ষে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে, তবে নিজ নিজ মর্যাদানুসারে এ রকমই আনন্দপূর্ণ নিরাপদ জীবনের স্বাদ তারাও উপভোগ করবে। তারা ভবিষ্যতেরও কোনো ভয় করবে না, অতীতেরও কোনো দুঃখ থাকবে না- নিরাপদ ও নিশ্চিন্তভাবে সোজা আল্লাহর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করবে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, উহুদ বা বীরে মাউনা-এর শহীদগণ আল্লাহর দরবারে পৌঁছে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, আহা! কেউ যদি আমাদের এই ভোগ-বিলাসের সংবাদ আমাদের ভাইদেরও পৌঁছে দিত! ফলে তারাও এই জীবনের প্রতি আগ্রহী হত এবং জেহাদ থেকে বিরত থাকত না। (তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম, বর্ণনা ৪৪৯৮)

উত্তরে আল্লাহর তাআলা বললেন, 'আমি পৌঁছাচ্ছি।' অনন্তর তিনি এই আয়াতগুলি নাযিল করলেন এবং তাঁদের জানিয়ে দিলেন যে, তোমাদের আকাঙ্ক্ষানুসারে সংবাদ পৌঁছে দিয়েছি। এতে তারা আরো আনন্দিত হলেন।

১৭৩. যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, '(মক্কার) লোকজন তোমাদের মোকাবেলার জন্য (সাজ-সরঞ্জাম) জমা করেছে, অতএব তাদের ভয় কর'। তখন এ সংবাদ তাদের ঈমান আরো বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি অতি উত্তম কার্যসম্পাদনকারী[১]!'

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝

১. সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও শানে নুযূল

উহুদ থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পথে আবু সুফিয়ান বলল, 'আমরা বড় ভুল করেছি–পরাজিত ও আহত মুসলমানদের এমনি ছেড়ে আসলাম।' অতএব পরামর্শ হল, পুনরায় মদীনায় গিয়ে তাদের খতম করে দেই।

এ খবর শুনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়ে দিলেন, যারা গতকাল আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে হাযির ছিল, তারা যেন আজ শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। যদিও মুসলিম মুজাহিদগণ ছিলেন সদ্য আঘাতপ্রাপ্ত, তবুও আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে তারা বের হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদের দলসহ মদীনা থেকে আট মাইল দূরবর্তী 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবনে মুসলমানরা আসছে শুনে আবু সুফিয়ান দারুণ ভয় পেয়ে গল। ফলে দ্বিতীয় আক্রমনের ইচ্ছা বাদ দিয়ে মক্কার পানে পলায়ন করল।

আবদুল কাইস গোত্রের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মদীনায় যাচ্ছিল। আবু সুফিয়ান ওদের কিছু অর্থ দিয়ে রাজি করাল, যাতে মদীনায় পৌঁছে এমন সংবাদ প্রচার করে দেয়, যা শুনে মুসলমানগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। সে মত মদীনায় এসে ওরা বলতে শুরু করল, মুসলমানদের নিপাত করার উদ্দেশ্যে মক্কাবাসীরা বিরাট বাহিনী ও সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছে। এ খবর শুনে মুসলমানদের অন্তরে ভয়ের স্থলে ঈমানের জোশ বৃদ্ধি পেল এবং কাফের বাহিনীর অবস্থা শুনে বলতে লাগলেন : حسبنا الله ونعم الوكيل সারা দুনিয়ার মোকাবেলায় আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাফসীরে তবারী ৬/২৪৮-২৪৯)

কোন কোন মুফাসসির বলেন, উহুদ যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান ঘোষণা করেছিল, আগামী বছর বদরের ময়দানে পুনরায় লড়াই হবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কবুল করেছিলেন। সে মত পরবর্তী বছর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের যুদ্ধাভিযানে বের হতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, 'কেউ না গেলেও আল্লাহর রাসূল একলা যাবে।' ওদিকে আবু সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে মক্কা থেকে বের হল। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হয়ে সাহসহারা ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং দুর্ভিক্ষের ভান করে মক্কায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করল। কিন্তু এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইল, যাতে মুসলমানদের দোষ দেওয়া যায়। সে মত মদীনাগামী এক ব্যক্তিকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে রাযি করাল, যেন

১৭৪. অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহসহ এ অবস্থায় ফিরে আসল যে, কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি। বস্তুত তারা আল্লাহর মর্জির অনুসরণ করেছে। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল[১]।

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ۝

১৭৫. ও তো (আস্ত) শয়তান, যে (তোমাদেরকে) ওর বন্ধুদের ভয় দেখায়। অতএব তোমরা ওদের ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও[২]।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۠ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

সেখানে পৌঁছে এদিকের এমন সংবাদ রটায়, যাতে মুসলমানরা শঙ্কিত হয়ে যুদ্ধাভিযানে বের না হয়। মদীনায় পৌঁছে সে বলতে লাগল যে, মক্কাবাসীরা বিরাট বাহিনী একত্র করেছে। অতএব তোমাদের যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের মনোবল দান করলেন। তাঁরা বললেন, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।'

শেষ পর্যন্ত মুসলমানগণ ওয়াদা মোতাবেক বদরে উপস্থিত হলেন। সেখানে বড় বাজার জমত। তিন দিন অবস্থান করে তাঁরা ব্যবসা করলেন এবং প্রচুর লাভ করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এই যুদ্ধকে 'ছোট বদর' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

এ সময় যারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহগামী হয়ে বদর গেলেন, বর্তমান আয়াতে তাঁদের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ, উহুদের যুদ্ধে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরও তাঁরা এ রকম সাহসিকতা দেখালেন।

মুসলমানদের এহেন সাহসিকতা ও প্রস্তুতির সংবাদ শুনে মুশরিক বাহিনী রাস্তা থেকেই ফিরে গেল। এর ফলে মক্কাবাসীরা (নিজেদের) এই বাহিনীর নাম রেখেছিল جيش السويق অর্থাৎ যে বাহিনী শুধু ছাতু খেতে গিয়েছিল এবং ছাতু খেয়েই ফেরত এসেছে।

বি. দ্র. لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا –কথাটি শুধু তাঁদের গুণকীর্তন ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বলা হয়েছে, নতুবা তাঁদের সকলেই এ রকম ছিলেন।

১. অর্থাৎ আল্লাহর মেহেরবানী লক্ষণীয় যে, তাঁদের যুদ্ধও করতে হয়নি, কিছুমাত্র কষ্টেও তাঁরা পতিত হননি। অনায়াসে ছওয়াব কামাই ও ব্যবসায় লাভ করে এবং শত্রুদের উপর ভীতিকর প্রভাব ফেলে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিসহ নিরাপদে বাড়ী ফিরে আসলেন।

বি. দ্র. 'বদরে সুগরা' এর মত 'হামরাউল-আসাদ' অভিযানেও এক বণিক দলের সঙ্গে মাল বেচা-কেনা হয়েছিল এবং মুসলমানগণ তাতে প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন। সম্ভবত وفضل দ্বারা উক্ত আর্থিক লাভই বোঝানো হয়েছে।

২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি মক্কা থেকে এসে ভীতিপ্রদ সংবাদ রটাচ্ছে, সে হয় শয়তান বা শয়তানের প্ররোচনায় এমন করছে। উদ্দেশ্য হল, তোমাদের উপর তার চেলা-চামুণ্ডা ও ভাই-

১৭৬. যারা কুফরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়*, তারা যেন আপনাকে চিন্তায় না ফেলে। ওরা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ চান যে, পরকালে ওদের জন্য কোন অংশ রাখবেন না। আর ওদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি[১]।

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

১৭৭. যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফর ক্রয় করেছে, নিশ্চয় তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এবং তাদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি[২]।

اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

১৭৮. আর কাফেররা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমার পক্ষে ওদের অবকাশ প্রদান ওদের জন্য (কিছুমাত্র) মঙ্গলকর। আমি

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۗ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ

বেরাদরের প্রভাব বসিয়ে তোমাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করা। সুতরাং তোমরা যদি ঈমান রেখে থাক (এবং তা অবশ্যই রাখ, যার প্রমাণ কার্যত দেখিয়েছ), তবে এই শয়তানদের মোটেই ভয় করো না, একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল। কবির ভাষায়

ہر کہ ترسید از حق و تقوی گزید ÷ ترسد از وے جن وانس وہر کہ دید

'যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে এবং পরহেজগারী অবলম্বন করে, তাকে সকল সৃষ্টি অর্থাৎ মানব-দানব সকলেই ভয় করে।'

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যারা দ্রুত অগ্রসর হয়ে কুফরে লিপ্ত হয়'।

১. অর্থাৎ শয়তানের ভীতিপ্রদর্শনে মুমিন ভীত হয় না। হাঁ, মুনাফিকরা ওর কথা শুনে কুফরের দিকে ছুটে চলে। আপনি এমন অভিশপ্ত মুনাফিকদের আচরণে দুঃখিত ও চিন্তিত হবেন না। ওরা আল্লাহর দীন ও তাঁর নবীর কিছুই ক্ষতি করতে পারে না, বরং নিজেদেরই ক্ষতি করে। ওদের সীমাতিরিক্ত নেফাক ও দুষ্কৃতি ইঙ্গিত বহন করছে যে, আল্লাহ তাআলা পরিণতিতে ওদের প্রকৃত সাফল্য ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রাখবেন এবং ভীষণ শাস্তি দেবেন। যারা এমন শত্রু, দুরাত্মা ও বক্রমনা, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর চিরন্তন নিয়ম এ-ই। এহেন লোকদের কারণে বেশি চিন্তিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

২. অর্থাৎ যারা ঈমানী ফিতরত (অর্থাৎ ঈমান আনার শক্তি)-কে বিসর্জন দিয়ে কুফর গ্রহণ করেছে, যেমন: ইহুদী, খ্রিস্টান, মুশরিক, মুনাফিক বা অন্য কেউ— এরা সবাই মিলেও আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। হাঁ, ওরা নিজ হাতে নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করছে– যার ফলে ওদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে।

لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

তো ওদের এজন্য অবকাশ দেই, যাতে ওদের পাপ আরো বৃদ্ধি পায়। আর ওদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি[১]।

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ

১৭৯. আল্লাহ আদৌ মুসলমানদের সে অবস্থায় রেখে দেওয়ার নন যে অবস্থায় এখন তোমরা (মুসলমানরা) আছ, যে পর্যন্ত না তিনি অপবিত্রকে পৃথক করে দেন পবিত্র থেকে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত করবারও নন। তবে আল্লাহ স্বীয় রাসূলগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নেন[২]। অতএব তোমরা ঈমান রাখ

---

১. অর্থাৎ কাফেররা নিজেদের দীর্ঘ জীবন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ধন-দৌলত, ঐশ্বর্য ইত্যাদি দেখে মনে করতে পারে যে, আমরা আল্লাহর বিরাগভাজন ও ধিকৃত হলে আমাদের এত প্রাচুর্য ও অবকাশ কেন দেওয়া হল এবং এমন ভাল অবস্থায় কেন রাখা হয়?

এর উত্তরে আল্লাহ বলছেন, এই অবকাশ প্রদান ওদের জন্য মোটেই কল্যাণকর নয়। অবকাশ দেওয়ার ফল তো এই হবে যে, ওরা নিজেদের ইচ্ছায় প্রাণ ভরে খাহেশ পূর্ণ করতে এবং পাপের ভাণ্ডার জমা করতে থাকবে। ফলে শাস্তির আরো বেশি উপযুক্ত হবে! ওরা মনে করছে যে, আমরা বড়ই ইজ্জতের সাথে আছি। অথচ অপমানকর ও লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি ওদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এখন বুঝে নিক, অবকাশ প্রদান ওদের পক্ষে মঙ্গলকর হল না অমঙ্গলকর। نعوذ بالله من شرور انفسنا

২. অর্থাৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অবকাশ প্রদান যেরূপ কাফেরদের পক্ষে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার প্রমাণ নয়, তেমনি খাঁটি মুসলমানরা বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হলে (যেমন উহুদের যুদ্ধে হয়েছিলেন) তা আল্লাহর অপ্রিয় ও বিরাগভাজন হওয়ার দলীল নয়। আসলে, আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের এই গোলমেলে অবস্থায় ছেড়ে রাখতে চান না, যার মধ্যে এখন পর্যন্ত তারা রয়েছে অর্থাৎ বহু সংখ্যক কাফের মুনাফিকরূপে কলেমা পড়ে ধোঁকা দেওয়ার জন্য তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকত, বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে যাদের প্রতি মুনাফিক শব্দ প্রয়োগ করা মুশকিল ছিল। অতএব প্রয়োজন ছিল এমন অবস্থা ও ঘটনাপ্রবাহ সৃষ্টি করা, যা দ্বারা সব ভেজাল থেকে নির্ভেজাল এবং নাপাক থেকে পাক স্পষ্টভাবে পৃথক হয়ে যায়।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ

অর্থাৎ উক্ত পরীক্ষায় ফেলা ছাড়াই সকল মুসলমানকে মুনাফিকদের নাম ও কর্ম সম্পর্কে অবহিত করে দেওয়া আল্লাহর জন্য সম্ভব ছিল। কিন্তু সকলকে এ ধরনের গায়বী ব্যাপার জানিয়ে দেওয়া খোদায়ী হেকমত ও মঙ্গলের অনুকূল নয়। হাঁ, তিনি স্বীয় রাসূলদের

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি। আর যদি তোমরা ঈমান ও পরহেজগারীর উপর থাক, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান[১]।

تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

১৮০. যারা, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহ থেকে তাদের যা দিয়েছেন তাতে কৃপণতা করে– তারা যেন মনে না করে যে, তা তাদের জন্য মঙ্গলকর। বরং তা তাদের জন্য অতি মন্দ। যে সম্পদে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামতের দিন তা বেড়ি বানিয়ে তাদের গলায় পরানো হবে[২]। আর

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ

নির্বাচন করে গায়বের যতটুকু খবর দেওয়া প্রয়োজন তা দিয়ে দেন। সারকথা, সাধারণ লোকদেরকে সরাসরি গায়বের কোন নিশ্চিত সংবাদ দেওয়া হয় না, নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম)-কে দেওয়া হয় বটে, তবে যতটুকু আল্লাহর ইচ্ছা।

১. অর্থাৎ নবীগণের সঙ্গে আল্লাহর যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং পাক-নাপাককে পৃথককরণের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার যে সাধারণ নিয়ম রয়েছে, তার বিষয়ে বেশি অনুসন্ধানের দরকার নেই। তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ ও রাসূলের কথার উপর (বিনাবাক্যে) বিশ্বাস রাখা এবং তাক্ওয়া ও পরহেযগারীর উপর কায়েম থাকা। এসব করলে সবই অর্জিত হল।

২. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

সূরার প্রথমদিকে বিরাট অংশ জুড়ে কিতাবীদের (ইহুদী ও খ্রিস্টানদের) বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মাঝে বিশেষ প্রসঙ্গক্রমে উহুদ যুদ্ধসম্পর্কিত বিবিধ বিষয়ের আলোচনা চলে এসেছে। এখান থেকে পুনরায় কিতাবীদের ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোচনা হচ্ছে।

আয়াতের মর্ম ও শিক্ষা

কিতবীদের মধ্যে ইহুদীদের কার্যক্রম অত্যন্ত ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক ছিল। অধিকাংশ মুনাফিকও এদের মধ্য থেকে ছিল। আর উপরের আয়াতে জানানো হয়েছিল যে, আল্লাহ তাআলা এখন পবিত্র থেকে অপবিত্রকে পৃথক করে ছাড়বেন। তো, এই পার্থক্য দৈহিক ও আত্মিক জেহাদের সময় যেমন প্রকাশ পেত, তেমনি আর্থিক জেহাদের সময়ও খাঁটি ও মেকি এবং কাঁচা ও পাকা সুস্পষ্টভাবে আলাদা হয়ে যেত (অর্থাৎ মুনাফিকরা দ্বীনি প্রয়োজনে সম্পদ ব্যয় করত না।) এজন্য বলা হয়েছে, ইহুদী মুনাফিকরা যেমন জেহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করে, তেমনি ধন-সম্পদ খরচ করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু জেহাদ থেকে দূরে থেকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কয়েক দিনের অবকাশ পাওয়া ওদের পক্ষে যেমন মোটেই মঙ্গলকর নয়– তদ্রূপ, বখিলী করে প্রচুর সম্পদ জমা করাতেও ওদের কোনই উপকার হতে পারে না। যদি দুনিয়ার জীবনে কোন বিপদের

وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۟

আল্লাহরই জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার[১] এবং তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ পূর্ণ অবহিত[২]।

[রুকূ - ১৯]

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ

১৮১. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলেছে, 'আল্লাহ অভাবী আর আমরা ধনী'[৩]।

সম্মুখীন নাও হল, তবু কিয়ামত দিবসে অবশ্যই এই সঞ্চিত সম্পদ শাস্তিরূপে ওদের গলার বেড়ি হয়ে থাকবে।

আয়াতে মুসলমানদেরও সতর্ক করে দেওয়া হল যে, যাকাত প্রদানে ও প্রয়োজন-ক্ষেত্রে খরচ করতে তারা কখনো যেন টালবাহানা না করে। নতুবা যে ব্যক্তি কৃপণতা, লালসা ইত্যাদি দোষে ইহুদী ও মুনাফিকদের নীতি অবলম্বন করবে, তাকেও নিজ অবস্থানুযায়ী শাস্তি পেতে হবে। যেমন: সহীহ হাদীসে রয়েছে– যাকাত প্রদানে বিরত লোকদের ধন-সম্পদ বিষাক্ত অজগর বানিয়ে তাদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হবে (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪০৩)। (আল্লাহর পানাহ!)

১. অর্থাৎ অবশেষে তোমরা মরে যাবে এবং সকল সম্পদ তাঁরই থেকে যাবে, যাঁর হাতে প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রথম থেকেই ছিল। মানুষ নিজ ইখতিয়ারে দান করলে ছওয়াব পাবে।

২. অর্থাৎ কৃপণতা বা বদান্যতা যা কিছু করবে এবং যেরূপ নিয়ত করবে– আল্লাহ তাআলা সব কিছুর খবর রাখেন, সে মতই প্রতিফল দেবেন।

৩. অর্থাৎ শুধু এতটুকুই নয় যে, ইহুদীরা অতিশয় কৃপণতার কারণে অর্থ খরচ করে না, বরং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার কথা শুনলে ঠাট্টা করে এবং আল্লাহ তাআলার শানে বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তা বলতেও কুণ্ঠিত হয় না। যেমন: যখন– مَن ذا الذي يُقْرِض الله قرضًا حسنا ('এমন কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে?') আয়াতটি (বাকারা, ২৪৫) নাযিল হল, তখন ওরা বলতে লাগল, 'আল্লাহ আমাদের কাছে ঋণ চায়, অতএব 'আল্লাহ ফকীর-মুখাপেক্ষী, আর আমরা ধনী-ঐশ্বর্যশালী।' (নাউযুবিল্লাহ!) অথচ একজন নির্বোধও বুঝতে পারে যে, সৎকাজে খরচ করাকে ঋণ শব্দে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যার মধ্যে অনন্ত রহমত ও স্নেহ-মমতার প্রকাশ রয়েছে।

জানা কথা, আল্লাহ নিজের দেওয়া টাকা-পয়সা, আমাদের দ্বারা আমাদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহে আমাদেরই পার্থিব ও পরকালীন উপকারার্থে ব্যয় করিয়ে থাকেন, আমাদের খরচের দ্বারা তাঁর কোনই লাভ হতে পারে না।

আর তাঁর উপকার হয়– এমন অবাস্তব কথা ধরে নিলেও ধন-সম্পদ ও সকল কিছু তো তাঁরই স্বত্ব। সুতরাং এ ব্যয়কে প্রকৃতপ্রস্তাবে ঋণ বলা যায় না। বস্তুত এ তাঁর পরম দয়া ও অনুগ্রহ যে, এই ব্যয়ের উত্তম প্রতিদান দেওয়াও নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছেন এবং ব্যয়

اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

আমি ওদের এ কথা এবং ওরা যে নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, তা অবশ্যই লিখে রাখব। আর আমি বলব, 'তোমরা জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন কর'[১]।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

১৮২. তা (শাস্তি) সেসব কর্মের কারণে, যা তোমরা নিজ হাতে অগ্রিম পাঠিয়েছিলে। বস্তুত, আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন[২]।'

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ

১৮৩. (ওরা এমন লোক), যারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের আদেশ করেছেন আমরা যেন কোন রাসূলের প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত

করাকে ঋণ প্রদান শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে উক্ত দায়িত্বকে নিতান্ত জরুরী ও অবশ্য পালনীয় করেছেন। কিন্তু ইহুদীরা নিজেদের বক্র-দৃষ্টি ও অন্তর-দুষ্টতার কারণে শোকর করার পরিবর্তে উক্ত শব্দাবলির কারণে ঠাট্টা করতে শুরু করল। আল্লাহ তাআলার মহান শানে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হতে নিরস্ত থাকল না। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, 'আল্লাহ তোমাদের কথা শুনেছেন। এর করণে যে ধরপাকড় হবে তার অপেক্ষায় থাক।'

১. অর্থাৎ সাধারণ নিয়মানুসারে উক্ত অভিশপ্ত ও অপবিত্র কথাগুলো তোমাদের পাপের খাতায় (অর্থাৎ আমলনামায়) লিখিয়ে দিচ্ছি, যেখানে তোমাদের লোকদের অপরাপর অভিশপ্ত ও অপবিত্র কার্যকলাপ লিখিত রয়েছে, যেমন অন্যায়ভাবে নিষ্পাপ নবীদের হত্যা করা। কারণ, এই হতচ্ছাড়া বাক্য যেমন তোমাদের খোদা-পরিচিতির নিদর্শন, তেমনি সেই হতচ্ছাড়া কর্মটা তোমাদের নবীভক্তির নিদর্শন! যখন তোমাদের আমলনামা হাজির করা হবে তখন বলা হবে, 'এই নাও, নিজেদের অপকর্মের মজাটা আস্বাদন কর এবং তোমরা যেমন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে আল্লাহওয়ালাদের দিল জ্বালিয়েছিলে, এখন খোদায়ী শাস্তির অগ্নিকুণ্ডে নিজেরা জ্বলতে থাক।

২. অর্থাৎ যা কামাই করেছিলে তারই প্রতিদান সামনে এসেছে, আল্লাহর দরবারে বিন্দু পরিমাণ জুলুম নেই- إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ الخ ('নিশ্চয় আল্লাহ কণা পরিমাণও জুলুম করেন না।' সূরা নিসা, আয়াত ৪০)।

অসম্ভব হলেও ধরা যাক, জুলুম করা যদি আল্লাহর গুণ হত, তবে তাঁর অন্য গুণাবলির মত এও কামেল হত। এজন্য যদি আল্লাহকে জালেম ধরা হয়, তবে (সাধারণ) জালেম কেন বরং চরম জালেমই বলতে হবে। তাঁর এক বিন্দু পরিমাণ জুলুমও পাহাড়ের চেয়ে কম হতে পারে না। অর্থাৎ কেমন যেন 'ظلام' (বা চরম জালেম) শব্দ ব্যবহার করে সতর্ক করে দেওয়া হল যে, তাঁর শানে সামান্য জুলুমেরও অভিযোগ করা তাঁকে চরম জালেম সাব্যস্ত করার নামান্তর।

تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِىْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾

ঈমান না আনি যতক্ষণ না তিনি আমাদের নিকট এমন কোন কুরবানী আনেন, যাকে গ্রাস করবে আগুন[১]।' আপনি বলুন, 'আমার পূর্বে তোমাদের নিকট বহু রাসূল আগমন করেছিলেন নিদর্শনাদি নিয়ে এবং সেই জিনিসও নিয়ে, যার কথা তোমরা বলেছ। তাহলে তোমরা তাদের হত্যা করলে কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও[২]?'

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿١٨٤﴾

১৮৪. তার পরও যদি ওরা আপনাকে অস্বীকার করে, তবে আপনার পূর্বেও বহু রাসূলকে অস্বীকার করা হয়েছে, যারা এসেছিলেন– বহু নিদর্শন, বিভিন্ন সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে[৩]।

---

১. কোন কোন রাসূলের এই মুজেযা ছিল যে, কুরবাণী বা কোন কিছু আল্লাহর নামে মানত করলে আসমান থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। আর তা ছিল কবুল হওয়ার আলামত। যেমনঃ বর্তমান বাইবেলেও হযরত সুলায়মান আ. সম্পর্কে এমন ঘটনার উল্লেখ আছে। একে বাহানা বানিয়ে ইহুদীরা বলত, আমাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে– যার এই মুজেযা নেই তাঁর প্রতি ঈমান না আনতে।

বস্তুত এ ওদের মিথ্যা বাহানা ছিল, ওদের কিতাবসমূহে এ ধরনের কোন হুকুমই ছিল না, আজো বর্তমান নেই। আর প্রত্যেক নবীরই ওই মুজেযা ছিল– এও প্রমাণ করা সম্ভব না। প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তাআলা তাঁর যুগ ও অবস্থা অনুযায়ী মুজেযা দান করেছেন। সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার জন্য প্রত্যেক নবীর একই মুজেযা হওয়াও কোন জরুরী নয়।

২. অর্থাৎ যদি তোমরা নিজ দাবিতে সত্য হও এবং উক্ত বিশেষ মুজেযা দেখানোর উপর তোমাদের ঈমান আনা নির্ভরশীল হয়, তবে পূর্বে যে নবীগণ নিজ সত্যতার স্পষ্ট নিদর্শনসহ এই বিশেষ মুজেযাও নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের তোমরা কেন হত্যা করলে? তোমাদের পূর্ববর্তীদের এহেন কর্ম, যার প্রতি তোমরা আজ পর্যন্ত সন্তুষ্ট রয়েছ– এটাই কি প্রমাণ করে না যে, তোমাদের এ কথাঃ 'কোন নবী যাবৎ ওই বিশেষ মুজেযা না দেখাবেন তাবৎ তাকে আমরা মানব না' –ছলচাতুরি ও একগুঁয়েমি মাত্র।

৩. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, এই অভিশপ্তদের অযৌক্তিক তর্ক ও হঠকারিতার কারণে দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত হবেন না এবং আরো যারা আপনাকে মিথ্যা বলে, ওদেরও পরোয়া করবেন না। আপনার পূর্বে বহু রাসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে, যাঁরা সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি (অর্থাৎ মুজেযাসমূহ), ছোট ছোট সহীফা ও বড় বড় উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে এসেছিলেন। নবীগণকে মিথ্যা বলা বিরুদ্ধবাদীদের সনাতন অভ্যাস। সুতরাং আপনি কোন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হননি।

১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান পূর্ণমাত্রায় কিয়ামতের দিনেই দেওয়া হবে[১]। তখন যাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রান দিয়ে জান্নাতে দাখিল করা হল, সে-ই সফলকাম হল। আর পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ বৈ কিছু নয়[২]।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

১৮৬. নিশ্চয়ই তোমাদের পরীক্ষা করা হবে তোমাদের সম্পদ ও প্রাণের বিষয়ে। এবং তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের থেকে এবং মুশরিকদের থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও পরহেজগারী অবলম্বন কর, তবে তা তো বড় হিম্মতের কাজ[৩]।

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ۗ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٨٦﴾

---

১. অর্থাৎ মৃত্যুর স্বাদ সকলকেই আস্বাদন করতে হবে। তারপর কিয়ামতের দিন প্রত্যেক সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী এবং বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীকে নিজ নিজ কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল অবশ্যই পেতে হবে। 'পূর্ণ' এজন্য বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের পূর্বেই দুনিয়াতে বা কবরে স্বল্প পরিমানে প্রতিফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২. অর্থাৎ দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী চাকচিক্য ও বাহ্যিক টিপ্‌টপ্ ধোঁকায় ফেলার বস্তু, যাতে বিমোহিত হয়ে অধিকাংশ নির্বোধ পরকাল সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায়। অথচ মানুষের প্রকৃত কামিয়াবী হচ্ছে– দুনিয়ার জিন্দেগীতে প্রতিটি কাজ তার পরিণাম চিন্তা করে করা এবং এমন কাজ করা, যা আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা এবং বেহেশত পর্যন্ত পৌছার পক্ষে সহায়ক হয়।

বি. দ্র. কোন কোন তাসাওউফপন্থীর দাবি, আমরা বেহেশতও চাই না, দোযখকেও ভয় করি না। এই আয়াতের দ্বারা তাদের দাবিরও খণ্ডন হয়ে গেল। কেননা বোঝা গেল, দোযখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া এবং বেহেশতে দাখিল হয়ে যাওয়াই প্রকৃত সাফল্য। বেহেশতের বাইরে থেকে কোনই উচ্চতর সাফল্য লাভ হতে পারে না। হাদীস শরীফেও আছে– وحولها ندندن (জান্নাত লাভেরই প্রার্থনা আমরা করি।) (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৭৮৯)

আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমত ও মেহেরবানীতে আমাদেরও এই সাফল্য দান করুন।

৩. মুসলমানদের সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, ভবিষ্যতেও জান ও মালের বিষয়ে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং তোমাদের সব রকমের আত্মত্যাগ করতে হবে। নিহত হওয়া, আহত

১৮৭. (স্মরণ কর), যখন আল্লাহ কিতাবীদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমরা মানুষের নিকট অবশ্যই তা (অর্থাৎ কিতাব) বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না। অতঃপর ওরা সেই অঙ্গীকার নিজেদের পশ্চাতে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং তার বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করল। ওরা যা গ্রহণ করে তা কতই না নিকৃষ্ট[১]!

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ۝

হওয়া, কারা ও বন্দী জীবনের কষ্ট পোহানো, অসুস্থ হওয়া, ধন-সম্পদের ক্ষতি হওয়া, আত্মীয়-স্বজন হারানো ইত্যাদি বিপদের সম্মুখীন তোমাদের হতে হবে। তদুপরি আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মুখ থেকে অনেক মনোকষ্টকর ও বেদনাদায়ক কথা শুনতে হবে। এসবের এলাজ (বা প্রতিকার) হচ্ছে ধৈর্য ও তাক্ওয়া। যদি ধৈর্য, স্থিরতা ও পরহেজগারীর দ্বারা এ সব বিপদাপদের মোকাবেলা কর, তবে তা খুবই সৎসাহস ও দৃঢ় হিম্মতের কাজ হবে- যার তাকীদ আল্লাহ তাআলা করেছেন।

বি. দ্র. বুখারী শরীফের এক হাদীস (৪৫৬৬) থেকে বোঝা যায়, এই আয়াত বদর যুদ্ধের পূর্বে নাযিল হয়, আর জেহাদের হুকুম আসে এর পর। তবে, জেহাদের হুকুম আসার পরও ধৈর্য ও সংযমের হুকুম মোটামুটিভাবে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এবং সব যুগে স্থান-কাল বিবেচনায় তার উপর আমলও করা হয়েছে। তবে ধৈর্য ও ক্ষমা আর রোষ ও কঠোরতার স্থান-কাল বুঝতে হবে, যার দিকনির্দেশনা শরী'য়তের বিধান থেকে জানা যায়।

আয়াতখানি এস্থলে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই উপদেশ দেওয়া যে, তোমরা কাফের ও মুনাফিকদের দুষ্কৃতি ও ধৃষ্টতার কারণে সীমাতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ো না। এখনো অনেক কিছু শুনতে হবে, দুঃখ-কষ্ট পোহাতে হবে। অতএব ধৈর্য ও স্থিরতা দ্বারা এসবের মোকাবেলা করতে থাক। অনুরূপ, দুনিয়ার জীবনে মত্ত হয়ে, যা নিতান্তই ধোঁকার আস্তানা, এই সত্য থেকে উদাসীন হয়ো না যে, আল্লাহ তাআলা জান ও মাল উভয় বিষয়ে তোমাদের পরীক্ষা করবেন।

১. অর্থাৎ কিতাবী আলেমদের থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল যে, আল্লাহর কিতাবের মধ্যে যেসব হুকুম ও সুসংবাদ রয়েছে, সেগুলি লোকদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেবে এবং কোন কথাই গোপন করবে না, হেরফের করে সেসবের অর্থও পরিবর্তন করবে না। কিন্তু ওরা বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে এবং দুনিয়ার সামান্য লাভের খাতিরে সমস্ত ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করে শরী'য়তের আহকাম পরিবর্তন করে ফেলল, আল্লাহর আয়াতসমূহের মধ্যে শাব্দিক ও আর্থিক বিকৃতি ঘটাল। যে বিষয় প্রকাশ করা সর্বাধিক জরুরী ছিল, অর্থাৎ সর্বশেষ নবীর সুসংবাদ, ওরা তাই সর্বাধিক গোপন করল। মাল খরচ করতে যতটুকু বখিলী করত, ইলম খরচ করতে আরো বেশি কৃপণতা করল।

১৮৮. তুমি কখনই মনে করো না যে, যারা নিজেদের কাজকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং যা করেনি তার জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে– তাদের সম্বন্ধে কখনই মনে করো না যে, তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে। বরং তাদের জন্য রয়েছে যাতনা-দায়ক শাস্তি[১]।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

১৮৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান[২]।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

অধিকন্তু এই কৃপণতার উদ্দেশ্যও দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের মহব্বত ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

এস্থলে মুসলমান আলেমদেরও পরোক্ষভাবে সতর্ক করে দেওয়া হল, তোমরা দুনিয়ার মহব্বতে জড়িয়ে এমন করো না।

১. ইহুদীরা মাসলা-মাসায়েল ভুল বলত, ঘুষ খেত এবং (তাওরাতে বর্ণিত) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলি ও সুসংবাদসমূহ জেনেবুঝে গোপন করত। তদুপরি (এ কথা ভেবে) ওরা আনন্দিত হত যে, ওদের চালাকী কেউ বুঝতে পারছে না এবং আশা করত, 'বড় আলেম, দীনদার ও সত্যের অনুসারী' বলে লোকেরা ওদের প্রশংসা করুক। অন্যদিকে, মুনাফিকদের অবস্থাও ওদের মতো ছিল। জেহাদের সময় এলে ঘরে লুকিয়ে থাকত এবং এভাবে জান রক্ষা করতে পেরে আনন্দিত হত। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর যুদ্ধে যোগদান করতে না পারার মিথ্যা ওজর-আপত্তি পেশ করে তাঁর দ্বারা নিজেদের প্রশংসা করাতে চাইত।

এদের সকলকে বলা হচ্ছে, এসব কর্মকাণ্ড দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে না। বরং, এ ধরনের লোকেরা দুনিয়াতেই অপদস্থ হয়ে থাকে। আর যদি কোন কারণে এখানে বেঁচেও যায়, তবে আখেরাতে কোন উপায়েই মুক্তি পাবে না।

বি. দ্র. আয়াতে যদিও ইহুদী ও মুনাফিকদের আলোচনা রয়েছে, তবু মুসলমানদেরও শোনানো উদ্দেশ্য যে, অসৎ কাজ করে আনন্দিত হবে না, সৎকাজ করে উল্লসিত হবে না এবং যে সৎকাজ করনি তার জন্য প্রশংসার আশা করবে না, বরং করার পরও প্রশংসিত হওয়ার অভিলাষ করবে না।

২. যেহেতু আসমান ও পৃথিবীর মধ্যে তাঁরই রাজত্ব, সুতরাং তাঁর রাজত্বের বাইরে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবে? তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান, তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বাইরে যাওয়ার সাধ্য কার আছে?

[রুকূ - ২০]

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

১৯০. নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বহু নিদর্শন রয়েছে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য[১]—

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

১৯১. যারা আল্লাহকে স্মরণ করে– দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে[২] এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনা করে (এবং বলে ওঠে)– 'হে আমাদের রব! আপনি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনি (দোষ-ত্রুটি থেকে) পবিত্র। অতএব আপনি আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন[৩]।

---

১. অর্থাৎ বুদ্ধিমান মানুষ যখন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, এদের অদ্ভুত ও বিস্ময়কর অবস্থা এবং রাত ও দিনের দৃঢ় ও শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তখন সে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে, এসব সুশৃঙ্খল সৃষ্টি নিশ্চয়ই কোন এক নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালী ও সর্বময় ইচ্ছা ও শক্তির অধিকারী সত্তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি তাঁর মহাশক্তি ও ইখতিয়ার দ্বারা ছোট বড় প্রত্যেকটি সৃষ্টির সীমা নির্ধারণ করে রেখেছেন। কোনো বস্তুর সাধ্য নেই উক্ত সীমারেখার বাইরে যাওয়ার। যদি এই বিশাল মেশিনের একটি অংশও অথবা এ কারখানার কোন একজন শ্রমিকও সেই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকের শক্তি ও ইখতিয়ারবহির্ভূত হত, তবে নিখিল বিশ্বের এই পূর্ণাঙ্গ ও সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা কিছুতেই টিকে থাকতে পারত না।

২. অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তারা আল্লাহ থেকে উদাসীন থাকে না, তাঁর স্মরণ সর্বদা তাদের অন্তরে ও মুখে জারী থাকে। এক হাদীসে (মুসলিম ৩৭৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন– كان يذكر الله على كل أحيانه (অর্থাৎ তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকির করতে থাকতেন)। নামাযও আল্লাহর স্মরণের অতি বড় মাধ্যম। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায দাঁড়িয়ে পড়তে না পারে সে বসে পড়বে। আর যে বসে না পারে সে শুয়ে পড়ে নেবে।

কোন কোন হাদীসে আছে, যে রাতে এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় সে রাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে কাঁদতে থাকেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬২০)

৩. অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ ও (আসমান-যমীনের বিষয়ে) চিন্তা-ভাবনার পর তারা বলে, প্রভু হে! তুমি এই বিশাল কারখানা অযথা, উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করনি। নিশ্চয় এসব বিরল,

১৯২. 'হে আমাদের রব! আপনি যাকে জাহান্নামে ফেললেন, তাকে নিশ্চয় লাঞ্ছিত করলেন[১]। আর পাপীদের কোন সাহায্যকারী নেই[২]।

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنۡ تُدۡخِلِ النَّارَ فَقَدۡ اَخۡزَيۡتَهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ ﴿۱۹۲﴾

১৯৩. 'হে আমাদের রব! আমরা একজন আহবানকারীকে ঈমান আনার জন্য আহবান করতে শুনেছি অর্থাৎ এ আহ্বান যে, 'তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন[৩]'। সুতরাং

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيۡ لِلۡاِيۡمَانِ اَنۡ اٰمِنُوۡا بِرَبِّكُمۡ فَاٰمَنَّا ٭ۖ رَبَّنَا

বিস্ময়কর ও বিজ্ঞানময় ব্যবস্থাপনা একটি বিরাট ও মহান পরিণতিতে পর্যবসিত হওয়া চাই। অর্থাৎ, এখানে এসে তাদের চিন্তাধারা পরকালের প্রতি ধাবিত হয়ে যায়, যা বস্তুত দুনিয়ার বর্তমান জীবনেরই শেষ পরিণতি। এজন্যই তারা সম্মুখে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার দো'য়া করেছে আর মধ্যভাগে আল্লাহ তাআলার পাক-পবিত্রতা বয়ান করে ইঙ্গিত করে দিয়েছে যে, যে নির্বোধেরা আল্লাহর কুদরতের এমন সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শন দেখেও তাঁকে চিনতে পারে না বা তাঁর মর্যাদার হানি করে কিংবা এই বিশ্ব-সৃষ্টিকে বৃথা ও উদ্দেশ্যহীন মনে করে, তাঁর সত্তা ওদের ভ্রান্ত চিন্তা ও আজেবাজে কথা থেকে পবিত্র।

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল, আকাশ, ভূ-মণ্ডল ও অন্যান্য খোদায়ী সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করা তখনই প্রশংসনীয় হতে পারে, যখন এই গবেষণার ফল হবে আল্লাহর স্মরণ ও পরকালের প্রতি মনোনিবেশ। পক্ষান্তরে যে সকল প্রকৃতি-পূজারী এসব সৃষ্টিতত্ত্বের বেড়াজালে ফেঁসে যায় এবং স্রষ্টার সঠিক পরিচয় পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না– বিশ্ববাসী ওদের মহা বিজ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞানী বললেও কুরআনের ভাষায় ওরা (أولو الألباب) তথা বুদ্ধিধারী নয়, বরং ওরা চরম পর্যায়ের মূর্খ ও নির্বোধ।

১. যে ব্যক্তি যত বেশি সময় দোযখে থাকল, সে সেই পরিমাণ লাঞ্ছিত হল। এ নিয়মানুসারে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা শুধু কাফেরদের জন্য (কারণ, চিরস্থায়ী জাহান্নামী ওরাই)। আর যেসব আয়াতে ব্যাপকভাবে মুমিনদের ব্যাপারে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তারা লাঞ্ছিত হবে না– সেগুলোর উদ্দেশ্য হল এই চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা না হওয়া।

২. অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তাআলা দোযখে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করবেন, তাকে কেউই সহায়তা করে বাঁচাতে পারবে না। হাঁ, যাদের ক্ষেত্রে শুরুতেই বা পরবর্তীতে ছেড়ে দেওয়া ও মাফ করে দেওয়ার মর্যি হবে (যেমন গোনাহগার মুমিনগণ), তাদের জন্য সুপারিশকারীগণকে অনুমতি দেওয়া হবে ক্ষমাপ্রাপ্তির লক্ষ্যে সুপারিশ করতে। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়, বরং কুরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত।

৩. এই আহ্বানকারী হচ্ছেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি মহান আওয়াজে বিশ্ববাসীকে আহ্বান করেছেন। অথবা এর দ্বারা কুরআন কারীম উদ্দেশ্য, যার আওয়াজ ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে।

فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا
وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

আমরা ঈমান এনেছি[১]। হে আমাদের রব! অতএব আমাদের গোনাহ ক্ষমা করুন আমাদের থেকে আমাদের মন্দ কর্মগুলো দূরীভূত করুন এবং আমাদের মৃত্যু দান করুন পুণ্যবান লোকদের সঙ্গে[২]।

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ
وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّكَ
لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾

১৯৪. 'হে আমাদের রব! আর আপনি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যার ওয়াদা করেছেন, তা আমাদের দান করুন এবং কিয়ামতের দিন আমাদের লাঞ্ছিত করবেন না[৩]। নিশ্চয় আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না[৪]।'

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَاۤ اُضِيْعُ
عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ
بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا

১৯৫. অতএব তাদের রব তাদের দো'য়া কবুল করলেন। কারণ, আমি তোমাদের মধ্যকার কোন আমলকারীরই আমল বিনষ্ট করি না, সে পুরুষ হোক বা নারী। তোমরা পরস্পর অভিন্ন[৫]। অতএব যারা হিজরত করেছে,

---

১. পূর্বে (১৯১ আয়াতে) ঈমানে আক্‌লী (অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানগত ঈমান) এর উল্লেখ ছিল, এখানে ঈমানে সামঈ (আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বানকারীর আহ্বান শুনে ঈমান আনা) এর উল্লেখ হল, যার মধ্যে রাসূলের প্রতি ঈমান ও কুরআনের প্রতি ঈমানও অন্তর্ভুক্ত।

২. অর্থাৎ আমাদের বড় বড় গোনাহ মাফ করে দিন এবং ছোট ছোট ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর পর্দা ফেলে দিন। আর যখন মৃত্যু দান করবেন, তখন নেক বান্দাদের দলভুক্ত করে দুনিয়া থেকে উঠাবেন।

৩. অর্থাৎ 'পয়গম্বরদের মুখে আপনি যেসব ওয়াদা করেছেন, (যেমন: দুনিয়াতে অবশেষে মুসলমানদেরকে আল্লাহর দুশমনদের উপর বিজয় ও সাহায্য দান করা এবং আখেরাতে বেহেশত ও আল্লাহ-সন্তুষ্টি দান করা,) –সেসব দ্বারা আমাদের এমনভাবে ধন্য করুন, যাতে কিয়ামতের দিন আমাদের সামান্যতম অপমানও না হয়।

৪. অর্থাৎ আপনার পক্ষে তো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কোন সম্ভাবনাই নেই। তবে আমাদের মধ্যে সম্ভাবনা আছে এমন ভুল করে বসার, যার ফলে আমরা আপনার ওয়াদাসমূহের যোগ্য রইব না এবং সেগুলির ফায়দা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাব। তাই দরখাস্ত এই যে, আমাদের ঐ সকল আমলের উপর দৃঢ় থাকার তাওফীক দান করুন, যেগুলি আপনার ওয়াদাসমূহের ফায়দা লাভ করার জন্য আবশ্যক।

৫. অর্থাৎ পুরুষ হোক বা নারী– আমার দরবারে কারো পরিশ্রম নষ্ট হওয়ার নয়, সে যে কাজ করবে অবশ্যই তার ফল পাবে। এখানে আমল শর্ত: নেক আমল করে একজন

وَأُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ

নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে– নিশ্চয়ই আমি তাদের থেকে তাদের মন্দ কর্মগুলো দূর করে দেব এবং নিশ্চয়ই তাদের দাখিল করব জান্নাতসমূহে, যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত[১]। (তারা এসব লাভ করবে)

মহিলাও স্বীয় যোগ্যতানুসারে পরকালে সেই মর্তবা হাসিল করতে পারে, যা পুরুষ হাসিল করতে পারে।

بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ– যেতেতু তোমরা একই মানব-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, একই আদম-সন্তান, একই ইসলামী ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ এবং একই সমাজবদ্ধ জীবনে পরস্পরের অংশীদার, সুতরাং আমল ও তার প্রতিফলেও তোমাদের উভয়কে একই মনে করা হবে। হাদীসে আছে, উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্হা আরয করেছিলেন: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরআন শরীফের কোথাও আমাদের মেয়েদের হিজরত ও অন্যান্য নেক আমলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়নি।' আলোচ্য আয়াতে এরই উত্তর দেওয়া হয়েছে। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩০২৩; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ৩১৭৪)

১. অর্থাৎ যখন কোন আমলকারীর ছোট-খাট আমলও বিনষ্ট হয় না, তখন আল্লাহর জন্য নিবেদিতপ্রাণ বাহাদুরদের তো কথাই নেই– যারা কুফরী ও পাপাচার বর্জনের সাথে দারুল কুফরও ত্যাগ করেছে এবং আপন ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন, ও ধন-সম্পত্তি সব কিছু ছেড়ে দারুল ইসলামের দিকে হিজরত করেছে। কাফেররা তাদের উপর এমন অত্যাচার ও নির্যাতন করেছে যে, তাঁরা দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছে। এতসব করেও দুশমন তাদের শান্তিতে থাকতে দেয়নি, বরং নানা দুঃখ-কষ্ট তাঁদের দিতে থেকেছে। আর এসব কিছু এজন্য যে, তারা আল্লাহর নাম নিত এবং তাঁরই কলেমা পড়ত।

يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ

('ওরা রাসূল ও তোমাদের শুধু এ কারণে বহিষ্কার করে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ।' –সূরা মুমতাহিনা, ১)

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

('ওরা মুমিনদের কেবল এজন্য শাস্তি দিয়েছিল যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, যিনি সর্বশক্তিমান, প্রশংসনীয়।' –সূরা বুরূজ, ৮)

শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেছে এবং তাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। এই বান্দারাই তারা, যাদের সকল গোনাহ-খাতা মাফ করে দেওয়া হয়েছে এবং যাদের জন্য বেহেশত অপেক্ষা করছে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানস্বরূপ। আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান[১]।	ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝
১৯৬. দেশ-বিদেশে কাফেরদের বিচরণ তোমাকে যেন কিছুতেই ধোঁকা না দেয়।	لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ۝
১৯৭. (এ) সামান্য ভোগমাত্র, অতঃপর ওদের বাসস্থান জাহান্নাম। আর (তা) অতি নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল[২]।	مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۗ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝
১৯৮. কিন্তু যারা আপন রবকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত, যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে[৩] আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানিস্বরূপ[৪]। আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা পুণ্যবানদের জন্য অতি উত্তম।	لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝
১৯৯. নিশ্চয় কিতাবীদের মধ্যে কিছু লোক এমনো আছে, যারা ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং তার প্রতি, যা তোমাদের উপর	وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ

১. অর্থাৎ উত্তম প্রতিদান তো আল্লাহরই নিকট রয়েছে– অন্য কোথাও থেকে তা লাভ হতে পারে না। অথবা অর্থ এই যে, উক্ত প্রতিদানের (জান্নাত) চেয়েও উত্তম প্রতিদান আল্লাহর নিকট রয়েছে– অর্থাৎ তাঁর দীদার মোবারক বা বরকতময় দর্শন। (আল্লাহ তাআলা আমাদের ও সকল মুমিনকে তাঁর দীদার লাভে ধন্য করুন, আমীন।)

২. অর্থাৎ কাফেররা যে এদিক-সেদিক ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধন-সম্পদ কামাই করছে এবং সদর্পে ঘুরাফেরা করছে, তাতে মুসলমানদের ধোঁকায় পড়া উচিত নয়। এ নিছক কয়েক দিনের চাকচিক্য। এক ব্যক্তিকে যদি কয়েকদিন পোলাও-কোর্মা খাওয়ানোর পর ফাঁসি বা আজীবন কারাদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়, তবে তা কী সুখভোগ! বস্তুত সামান্য পরিশ্রম ও কষ্ট করে যে ব্যক্তি চিরকালের জন্য পরম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারল, সেই প্রকৃত সুখী ও সৌভাগ্যবান।

৩. (জান্নাতের) এই সুখভোগ ও কামিয়াবীকে উপরোক্ত ক্ষণস্থায়ী আনন্দ ও চাকচিক্যের সাথে তুলনা করে দেখ, কোনটি উত্তম– এটি না ওটা?

৪. জান্নাতীদেরকে মেহমান এজন্য বলা হয়েছে যে, মেহমানকে পানাহারের কোনই চিন্তা-ফিকির করতে হয় না– সে সম্মান ও আরামের সাথে বসে বসে সব কিছু তৈরী পায়।

অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তার প্রতিও, যা তাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে; তারা আল্লাহর সামনে বিনয় প্রকাশকারী, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে না। তাদেরই জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট প্রতিদান[১]। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী[২]।

خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

২০০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, (শত্রুর মোকাবেলায়) অটল-অবিচল থাক এবং (আল্লাহর ইবাদত ও দীন রক্ষার কাজে) লেগে থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার[৩]।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

---

১. পূর্বের আয়াতে সাধারণ মুত্তাকী-পরহেজগারদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। এখন কিতাবীদের মধ্যে যারা মুত্তাকী, তাদের আলোচনা বিশেষভাবে করা হচ্ছে।

যে কিতাবীগণ আল্লাহর প্রতি যথাযথ ঈমান এনেছে, কুরআন মান্য করেছে এবং যেহেতু স্বয়ং কুরআনে তাওরাত ও ইনজীলের সমর্থন রয়েছে, সেহেতু সেগুলোও মেনেছে– তবে সেভাবে নয় যেভাবে মানত দুনিয়া-পূজারী আহ্বার তথা ইহুদী পণ্ডিতরা, তারা সামান্য পার্থিব স্বার্থের খাতিরে আল্লাহর আয়াত গোপন বা পরিবর্তন করে ফেলত– এবং আল্লাহর সামনে বিনয় ও এখলাসের সাথে নিবেদিত হয়েছে এবং তাঁর অবতারিত কিতাবসমূহ সঠিকভাবে স্বীকার করে নিয়েছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীগুলিও গোপন করেনি এবং আহকামও পরিবর্তন করেনি— এমন পাক-পবিত্র সত্যনিষ্ঠ কিতাবধারীদের জন্য আল্লাহর নিকট বিশেষ প্রতিদান রয়েছে। এমন কিতাবীরা দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে, কুরআন-হাদীস দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

২. অর্থাৎ হিসাবের দিন খুব দূরে নয়, সেদিন শীঘ্রই আসবে। আর হিসাব শুরু হওয়ার পর সকল মানুষের পাই পাই হিসাব দ্রুত সম্পন্ন করে দেওয়া হবে।

৩. সূরার উপসংহারে মুসলমানদের ব্যাপক অর্থপূর্ণ একটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে– যাকে সূরার সারাসার বলা যায়। অর্থাৎ, তোমরা যদি কামিয়াব হতে এবং ইহ-পরকালে সাফল্য লাভ করতে চাও, তবে দুঃখ-কষ্ট সয়েও আনুগত্যের উপর অবিচল থাক, অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক, দুশমনদের মোকাবেলায় দৃঢ়তা ও স্থিরতা প্রদর্শন কর, ইসলাম ও ইসলামের সীমান্ত রক্ষায় নিশ্ছিদ্রভাবে জমে থাক, যেদিক থেকে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা হয়, সেদিকে লৌহপ্রাচীরের মত কঠিন হয়ে সদা প্রহরারত থাক। (যেমনঃ অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে)

وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ

('আর ওদের মোকাবেলার জন্য আপন সাধ্যানুযায়ী সমরশক্তি ও পালিত ঘোড়ার দল প্রস্তুত রাখ, যার দ্বারা আল্লাহর শত্রুদের ও তোমাদের শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত রাখবে।' –সূরা আনফাল, ৬০)

আর সর্বদা সকল কাজে আল্লাহকে ভয় করতে থাক। এসব কিছু করতে পারলে বুঝে নেবে, তোমরা সফলতা লাভ করে ফেলেছ।

اللّٰهُمَّ اجعلنا مفلحين وفائزين بفضلك ورحمتك في الدنيا والآخرة آمين

হাদীসে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য যখন উঠতেন, তখন উপরের দিকে তাকিয়ে (১৯০ নং আয়াত) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত (মোট ১১ আয়াত) তেলাওয়াত করতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৫৬৯)

تم سورة آل عمران فله الحمد والمنة وعلى رسوله ألف ألف سلام وتحيّة.

সূরা নিসা

سُوْرَةُ النِّسَآءِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ৪ । ১৭৬ আয়াত । ২৪ রুকূ । মাদানী

آياتها ١٧٦، ركوعاتها ٢٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

১. হে মানুষ! তোমাদের রবকে ভয় করতে থাক, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং এ দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর-নারী[১]। আর তোমরা

১. অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর বাম পাঁজর থেকে সবার আগে হযরত হাওয়াকে বের (পয়দা) করেন। তারপর এ দুজন থেকে সমস্ত নর ও নারীকে পয়দা করেছেন এবং পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। অতএব প্রকৃতপ্রস্তাবে আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবকে এক প্রাণ ও এক ব্যক্তি থেকে পয়দা করেছেন। সারকথা, যেহেতু তিনিই তোমাদের সকলকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা, সেহেতু তাঁকে ভয় করা ও তাঁর ফরমাবরদারী করা তোমাদের জন্য জরুরী।

এতে দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথম, আল্লাহ তাআলা তোমাদের সকলের স্রষ্টা ও অস্তিত্বদাতা। দ্বিতীয়, সকল মানুষের সৃষ্টির আদি উৎস হচ্ছে একই প্রাণ অর্থাৎ মানুষের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম, যাঁর থেকে আল্লাহ তাআলা সকলকে সৃষ্টি করেছেন। এ থেকে জানা গেল, আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক তো আল্লাহরই সঙ্গে। কেননা, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যে পরিমাণ সম্পর্ক ও নৈকট্য থাকে, তা আর কারো মধ্যে সম্ভব নয়। এর পরবর্তী পর্যায়ের সম্পর্ক ও নৈকট্য হচ্ছে তা, যা মানব গোষ্ঠীর পরস্পরের মধ্যে পাওয়া যায়। কেননা, তাদের সকলের সৃষ্টির উৎস এক প্রাণ, এক ব্যক্তি।

এ থেকে জানা গেল, প্রথমত আমাদের উপর আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য। কারণ, তিনি আমাদের স্রষ্টা। অতঃপর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সমশ্রেণী অর্থাৎ মানব গোষ্ঠীর প্রতি সদয় হওয়া ও তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করাও আমাদের কর্তব্য। কারণ, আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের সৃষ্টির উৎস একই সত্তাকে বানিয়েছেন। সুতরাং যে নৈকট্য ও সম্পর্ক মানবজাতির পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান, তা অন্য কোনো বস্তুর সাথে নেই। এ কারণেই শরী'য়তের দৃষ্টিতে (ও যুক্তি-বুদ্ধির বিবেচনায়) মানুষের জন্যে অপর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা এমন জরুরী এবং অসদ্ব্যবহার এমন নিন্দনীয় যে, এমনটি আর অন্যান্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে নয়। এর বিশদ বিবরণ কুরআন-হাদীসে ও শরী'য়তের বিধানে বিদ্যমান রয়েছে। হযরত শায়খ র.-এর ভাষায়-

كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাঁর উসিলা দিয়ে তোমরা একে অপরের নিকট (সাহায্য ইত্যাদির) আবেদন করে থাক এবং সতর্ক থাক আত্মীয়দের সম্পর্কে[১]। নিশ্চয় আল্লাহ

بنی آدم اعضائے یک دیگراند
کہ در آفرینش زیک جوہر اند
چوں عضوے بدرد آورد روزگار
دگر عضو ہا را نماند قرار

(আদম সন্তান একে অপরের অঙ্গস্বরূপ, যেহেতু তাদের সৃষ্টি হয়েছে একই মূল থেকে। কোনো দিন যদি এক অঙ্গ ব্যথায় ভোগে, তবে তার অন্যান্য অঙ্গেরও শান্তি থাকে না।')

সারকথা, এস্থলে আল্লাহ তাআলা যে সকলের স্রষ্টা, এই সত্য প্রকাশ করে তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং মানবজাতি যে একই উৎস থেকে সৃষ্ট, এই সত্যের সন্ধান দিয়ে পরস্পর এক দেহের মত হয়ে থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বরং আয়াতের সামনের অংশে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন।

১. আল্লাহ তাআলা খালেক ও রব অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হওয়া ছাড়াও তাঁকে ভয় করার ও তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য হওয়ার আরেকটি কারণ রয়েছে। তা এই যে, তাঁর উসিলা দিয়ে তোমরা পরস্পর একে অপর থেকে স্বীয় হক (অধিকার) ও প্রয়োজন চেয়ে থাক এবং তাঁর কসম দিয়ে একে অপরকে আশ্বস্ত কর। অর্থাৎ, নিজেদের পরস্পরের লেনদেন ও সাময়িক প্রয়োজনাদিতেও তাঁরই মাধ্যম ধরে থাক। সারকথা, আল্লাহ-মুখাপেক্ষিতা মানুষের অস্তিত্ব ও স্থিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল বিষয় ও প্রয়োজনেই মানুষ তাঁর মুখাপেক্ষী। এজন্য তাঁর আনুগত্যের আবশ্যকতা আরো জোরদার হল।

আত্মীয়তার হক আদায়ের গুরুত্ব

তাঁর আনুগত্যের পর তোমাদের প্রতি নির্দেশ এই যে, আত্মীয়তা সম্বন্ধেও সতর্ক হও অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করতে থাক এবং সম্পর্কচ্ছেদ ও অসদ্ব্যবহার থেকে বিরত থাক। সকল মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার কথা তো আয়াতের প্রথমাংশে এসেছে। আর আত্মীয়দের সঙ্গে যেহেতু নৈকট্য ও সম্পর্ক বেশি, সেহেতু তাদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করা থেকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। কেননা, অন্যান্য মানুষের তুলনায় তাদের হক অনেক বেশি। যেমন, হাদীসে কুদসীতে আছে-

قال الله تبارك وتعالى : أنا الله وأنا الرحمن، خلقتُ الرحم وشققتُ لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعتُه.

('আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আল্লাহ, আমি রহমান। আমি رَحِم তথা রক্তসম্পর্কের আত্মীয়তা সৃষ্টি করেছি এবং তার জন্য আমার নাম (রহমানকে) বিদীর্ণ করেছি। অতএব যে

ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষা করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করব; আর যে ব্যক্তি তা ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।') (জামে তিরমিযী, হাদীস : ২০১৯)

অন্য হাদীসে আছে-

خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فأخذت بحقوق الرحمن فقال : مه ، قالت : هذا مقام العائذ منك من القطيعة ، قال : ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ، قالت : بلى يا رب، قال : فذاك .

('আল্লাহ সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করলেন এবং তা সমাপ্ত হওয়ার পর রক্তসম্পর্কের আত্মীয়তা উঠে দাঁড়িয়ে রহমানের নিকট আরয করতে চাইল। তিনি বললেন, কী বলতে চাও? সে বলল, এ তো সম্পর্কচ্ছেদ থেকে আশ্রয়গ্রহণকারীর স্থান। তিনি বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করব যে তোমার সম্পর্ক রক্ষা করবে; এবং তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করব যে তোমার সম্পর্কচ্ছেদ করবে? সে বলল, হাঁ, আয় রব! তিনি বললেন, তবে তাই হবে।') (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৮৩০)

আর এক হাদীসে আছে-

الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله : من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته .

('রাহিম' [আত্মীয়তা] রহমা· থেকে উৎসারিত। তাই আল্লাহ বললেন, যে ব্যক্তি তোমার সম্পর্ক রক্ষা করবে, আমিও তার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করব। আর যে ব্যক্তি তোমার সম্পর্ক ছেদ করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করব।') (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৯৮৮)

আরো এক হাদীসে আছে-

الرحم معلقة بالعرش، تقول : من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله .

('রক্তসম্পর্কের আত্মীয়তা [আল্লাহর] আরশের সাথে সম্পর্কিত। সে বলে, যে ব্যক্তি আমার সম্পর্ক রক্ষা করবে আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করুন এবং যে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করুন।') (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৫৫৫)

এসব হাদীস উল্লিখিত কথার সমর্থন করছে এবং উপরোক্ত রক্তসম্পর্কের বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করছে।

এখন সারকথা এই দাঁড়াল যে, সৃষ্টির উৎসস্থল ও উদ্দেশ্যের ঐক্যের কারণে সমগ্র মানব-গোষ্ঠীর হক (অধিকার) রক্ষা করা ও তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করা জরুরী। অতঃপর স্থান বিশেষে কোন বিশেষ কারণে যদি এই ঐক্যসূত্র ঘনিষ্ঠতর হয়, যেমন আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রে; অথবা ক্ষেত্রবিশেষে সদ্ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়, যেমন এতীম, মিসকীন ইত্যাদির ক্ষেত্রে, তবে সে সব ক্ষেত্রে হক আদায় করা অধিকতর জোরদার ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হবে। তদুপরি, রক্তসম্পর্কের হক রক্ষা ও তার প্রতি যত্নবান থাকার ব্যাপারে স্পষ্ট খোদায়ী নির্দেশও এসে যাওয়ায় এর গুরুত্ব ও তাকীদ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেল।

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝

তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন[১]।

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ۝

২. আর এতীমদের ধন-সম্পদ তাদের কাছে সোপর্দ করে দাও এবং (তোমাদের) খারাপ সম্পদ (তাদের) ভাল সম্পদের দ্বারা পরিবর্তন করো না এবং তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের ধনসম্পদ (মিলিয়ে তা) গ্রাস করো না। নিশ্চয় এটা মহা পাপ[২]।

বস্তুত, এই সূরার মধ্যে মানব-গোষ্ঠীর পরস্পরের উক্ত সাধারণ সম্পর্ক ও অন্যান্য বিশেষ সম্পর্কের ব্যাপারেই অধিক বিধান বর্ণিত হয়েছে। বলতে গেলে, সম্মুখে বর্ণিত এসব বিধান বর্তমান আয়াতে উল্লিখিত মৌলিক বিষয়েরই তফসীল বা বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

১. অর্থাৎ তোমাদের সমস্ত অবস্থা ও আমল সম্বন্ধে তিনি অবহিত। সুতরাং তোমরা যদি তাঁর হুকুমের আনুগত্য কর, তবে প্রতিদান পাবে, নতুবা শাস্তির যোগ্য হবে।

আর তিনি তোমাদের মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্ক, তার স্তর এবং প্রত্যেক স্তরের উপযোগী যেসব হক বা অধিকার রয়েছে, তাও বেশ জানেন। অতএব এ সম্পর্কে তিনি তোমাদের যে বিধান দেন, তাকে সঠিক বলে জানবে এবং সেই মত আমল করবে।

২. অর্থাৎ এতীমদের সম্পর্কে তাদের অভিভাবকদের প্রতি নির্দেশ এই যে, যখন তারা বালেগ হয়ে যাবে তখন তাদের ধন-সম্পত্তি তাদের কাছে সোপর্দ করে দেবে। আর প্রতিপালনকালে এতীমদের কোন ভাল জিনিস নিয়ে তার পরিবর্তে খারাপ ও নিকৃষ্ট জিনিস তাদের মালে শামিল করে দেবে না এবং নিজ মালের সাথে মিশিয়ে তাদের মাল খাবে না। যেমন, অভিভাবকদের জন্য এই অনুমতি আছে যে, এতীমদের একান্নভুক্ত রাখবে। কিন্তু শর্ত এই যে, এই একান্নভুক্তির বাহানায় এতীমদের যেন ক্ষতি না হয়, এতীমদের মাল যেন গ্রাস করা না হয়। কারণ, এতীমদের ধন-সম্পদ গ্রাস করা কঠিন গোনাহ।

আত্মীয়তার হক সম্পর্কে আহকাম বয়ান করতে গিয়ে এতীমদের বিধান আগে সম্ভবত এ জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের অসহায়ত্ব, অপারগতা ও নিঃসম্বলতার কারণে নিরাপত্তা ও স্নেহ-দরদের অধিক মুখাপেক্ষী। আর এই কারণেই খারাপ মাল দিয়ে তাদের ভাল মাল নিতে এবং অংশীদারির বাহানায় তাদের ক্ষতি করতে বর্তমান আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে। এবং সামনের একাধিক আয়াতে এতীমদের সম্পর্কে আরো কিছু আহকাম বর্ণিত হয়েছে।

এই বিধি-বিধান ও সতর্কবার্তাসমূহ সকল এতীমের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। অবশ্য আত্মীয় এতীমদের ব্যাপারে তা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর এটাই আয়াতের শানে নুযূল ও আয়াতগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যের কারণ এবং বাস্তব অবস্থার অনুকূল। কারণ, এতীম বাচ্চার ওলী সাধারণত তার কোন আত্মীয়ই হয়ে থাকে।

৩. আর তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, এতীম মেয়েদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না, তবে অন্য নারীদের মধ্যে যারা তোমাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে কর– দু দুজন, তিন তিনজন, চার চারজন[১]। কিন্তু যদি আশঙ্কা কর যে, (একাধিক স্ত্রীর মধ্যে) সুবিচার করতে পারবে না, তবে (বিয়ে কর) একজনকেই অথবা তোমাদের মালিকানাধীন

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ

---

১. **শানে নুযূল**

সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, যে সকল এতীম মেয়ে স্বীয় অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকত এবং আত্মীয়তার কারণে তার ধন-সম্পত্তির মধ্যে শরীক হত, তাদের ক্ষেত্রে দু'টি অবস্থা সৃষ্টি হত। কখনো এমন হত যে, সেই এতীম মেয়ে আপন সৌন্দর্য ও সম্পত্তির কারণে তার নিকট আকর্ষণীয় হত। তখন অভিভাবক স্বল্প মহরে তাকে বিবাহ করে নিত। কারণ, এ এতীম মেয়ের হক দাবি করার তো কেউ নেই।

আর কখনো এমন হত যে, এতীম মেয়ে সৌন্দর্যের দিক থেকে আকর্ষণীয় হত না বটে, কিন্তু অভিভাবক মনে করত, অন্যের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলে মেয়ের সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং সম্পত্তিতে অন্য লোক শরীক হয়ে বসবে। এই স্বার্থ চিন্তায় তাকে বিয়ে তো করে নিত, কিন্তু বিবাহিতার প্রতি আকর্ষণ না থাকায় তার প্রতি খেয়াল রাখত না। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ২৪৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩০১৮)

এতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং অভিভাবকদের প্রতি নির্দেশ আসে– যদি তোমাদের এই আশঙ্কা হয় যে, তোমরা এতীম মেয়েদের সম্বন্ধে সুবিচার করতে পারবে না এবং তাদের মহর ও তাদের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কে ত্রুটি হবে, তবে তোমরা তাদের বিয়ে না করে বরং তোমাদের পছন্দ মত অন্য মেয়েদের –একজন থেকে চারজন পর্যন্ত– বিয়ে করতে পার। সুতরাং শরী'য়তসম্মতভাবে তাদের বিয়ে করে নাও, যাতে এতীম মেয়েদের কোন ক্ষতি না হয়, কেননা এক্ষেত্রে তোমরা তাদের সহায়ক থাকবে; এবং তোমরাও কোন অমঙ্গল ও গোনাহে পতিত না হও।

উল্লেখ্য যে, মুসলমান স্বাধীন ব্যক্তির জন্য সর্বোচ্চ চার বিয়ে এবং ক্রীতদাসের জন্য দুই বিয়ের অনুমতি আছে। হাদীসের মধ্যেও এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এবং এ ব্যাপারে ইমামগণেরও সর্বসম্মত রায় রয়েছে। তবে একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য এই যে, তাঁর জন্য এরো অধিক বিয়ের অনুমতি ছিল।

বি. দ্র. এতীম মেয়েদের বিয়ের তৃতীয় একটি অবস্থার কথাও হাদীসে রয়েছে। তা এই যে, সৌন্দর্য ও সম্পত্তি উভয় না থাকায় যে মেয়ের প্রতি কোন আকর্ষণ থাকত না, অভিভাবক তার বিয়ে অন্যত্র দিয়ে দিত। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, এ অবস্থার সাথে আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই।

ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا۟

দাসীকে[১]। এ তোমাদের অবিচারে লিপ্ত না হওয়ার নিকটতম পন্থা[২]।

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا۟

৪. তোমরা স্ত্রীদেরকে খুশী মনে তাদের মহর দিয়ে দাও[৩]। আর যদি তারা সন্তুষ্টচিত্তে তোমাদের জন্য তার কোন অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা সানন্দে- স্বচ্ছন্দে ভোগ কর[৪]।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِیْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِیٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِیْهَا

৫. তোমরা নির্বোধদের কাছে নিজেদের ধন-সম্পদ অর্পন করো না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবনধারণের উপায় বানিয়েছেন; তবে তা থেকে তাদের খাওয়াতে ও পরাতে থাক এবং

---

১. অর্থাৎ তোমাদের যদি আশঙ্কা হয় যে, একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সুবিচার ও সমব্যবহার করতে পারবে না, তবে এক বিয়েতেই সন্তুষ্ট থাক। অথবা দাসীতেই –এক বা একাধিক– ক্ষান্ত থাক, অথবা ইচ্ছা করলে এক বিবাহিতা নারীর সঙ্গে এক বা একাধিক দাসীও রাখতে পার।

২. অর্থাৎ শুধু এক স্ত্রী গ্রহণ করলে অথবা শুধু নিজের দাসীতে সন্তুষ্ট থাকলে অথবা এক স্ত্রীর সঙ্গে এক বা একাধিক দাসী রাখাতে এই আশা করা যায় যে, তোমরা অবিচার ও অসম ব্যবহার থেকে রক্ষা পাবে। কারণ, স্ত্রীগণের যে সকল হক রয়েছে, তা দাসীদের নেই। ফলে তাদের উভয়ের মধ্যে সমতা না হলেও তোমরা দোষী সাব্যস্ত হবে না।

বি. দ্র. যে ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী রয়েছে, ভরন-পোষনের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। আর তাদের সঙ্গে রাতযাপনের ব্যাপারেও সমতা রক্ষা করতে হবে। সমতা বজায় না রাখলে কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি এমন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবে যে, এক পার্শ্ব হেঁচড়ে হেঁচড়ে চলবে।

কারো বিবাহে যদি এক আযাদ নারী ও এক দাসী থাকে, তবে দাসী অর্ধ পালার সুযোগ পাবে। আর দাসী যদি নিজ মালিকানাধীন হয়, তবে পালায় তার কোন প্রাপ্য নির্ধারিত নেই। তা মালিকের খুশীর উপর নির্ভর করে।

৩. অর্থাৎ তোমরা যে নারীদের বিয়ে করবে তাদের মহর খুশীমনে ও সাগ্রহে দেবে, তাদের পক্ষে তোমাদের নিকট তাগাদা করে আদায় করার কেউ থাকুক বা না থাকুক । এমনটি করলে এতীম মেয়েদের বিয়ে করায় কোনই বাধা নেই। বাধা তো তখন, যখন তাদের মহর বা তাদের কোন হক আদায় করায় ত্রুটি করা হয়।

৪. অর্থাৎ স্ত্রী যদি নিজ খুশীতে মহরের কিছু অংশ মাফ করে দেয় অথবা মহর নিয়ে পুনরায় স্বামীকে দান করে দেয় তবে কোন ক্ষতি নেই, স্বামী তা সানন্দে ভোগ করতে পারে।

যে খাদ্য সুস্বাদু ও রুচিকর, তাকে هنيء এবং যে খাদ্য হজম হয়ে সহজে শরীরের অংশে পরিণত হয় এবং স্বাস্থ্য ও বলশক্তির সহায়ক হয়, তাকে مرئ বলে।

وَّاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا۝

তাদের ন্যায়সংগত কথা বল[১]।

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِذَا دَفَعْتُمْ

৬. আর এতীমদের যাচাই করতে থাক, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে উপনীত হয়। অতঃপর যদি তাদের মধ্যে সুবুদ্ধি দেখ, তবে তাদের ধন-সম্পদ তাদের কাছে অর্পন করে দাও[২]। আর তারা বড় হয়ে যাবে– এ ভয়ে তাদের ধন-সম্পদ অপচয় ও তাড়াহুড়ো করে খেয়ে ফেলো না[৩]। যে অমুখাপেক্ষী, সে (এতীমদের সম্পদ থেকে) নিবৃত্ত থাকবে, আর যে অভাবী, সে (তা থেকে)

---

১. অর্থাৎ এতীমদের মধ্যে যারা অবুঝ, তাদের হাতে তাদের সেই সম্পদ দিয়ে দিয়ো না, যা আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য জীবনধারণের উপায় হিসাবে পয়দা করেছেন, বরং তার পূর্ণ হেফাজত কর এবং ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা কর। আর যতদিন পর্যন্ত লাভ-লোকসানের বুদ্ধিশুদ্ধি তাদের না হয়, ততদিন তা থেকে তাদের ভরণপোষন কর এবং সান্ত্বনা দিতে থাক যে, এ সম্পদ তোমাদেরই, আমরা তো তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী! যখন তোমরা বুদ্ধিমান হয়ে যাবে তখন তোমাদের দিয়ে দেব।

২. অর্থাৎ সাবালক হওয়ার সময় পর্যন্ত এতীমদের সুবুদ্ধির পরীক্ষা নিতে থাক। বালেগ হওয়ার পর যদি তাদের মধ্যে স্বীয় লাভ-লোকসানের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং মাল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা দেখতে পাও, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করে দাও। এতীমদের বুদ্ধি পরীক্ষার উপায় হল, স্বল্প মূল্যের মামুলি দ্রব্যাদি তাদের দ্বারা বেচা-কেনা করানো এবং এ উপায়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া। এ থেকে জানা গেল, অভিভাবকের অনুমতিতে যে বেচা-কেনা হবে তা বৈধ। এটাই ইমাম আবু হানীফার (র.) মাযহাব।

আর বালেগ হওয়ার পরও যদি তার মধ্যে বুদ্ধি-জ্ঞান না আসে, তবে ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে যখন তার সুবুদ্ধি এসে যাবে তখন তাকে মাল অর্পণ করে দিতে হবে, নতুবা পঁচিশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর– জ্ঞানবুদ্ধি হোক না হোক– তাকে ধন-সম্পদ দিয়ে দিতেই হবে।

৩. অর্থাৎ এতীমদের সম্পদ প্রয়োজনের অধিক খরচ করা নিষিদ্ধ। যেমন, এক টাকার স্থলে দু টাকা খরচ করে ফেলা। আর এ-ও নিষিদ্ধ যে, এতীমরা বড় হয়ে স্বীয় মাল নিয়ে যাবে– এ আশঙ্কায় তোমরা তাড়াতাড়ি খরচ করতে শুরু করলে। মোট কথা, এতীমদের ধন-সম্পদ প্রয়োজনের সময় এবং প্রয়োজন পরিমাণ খরচ করা উচিত।

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

ন্যায়সংগতভাবে খাবে[১]। অতঃপর যখন তাদের সম্পদ তাদের কাছে অর্পন করবে, তখন তাদের ব্যাপারে সাক্ষী রাখবে। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট[২]।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

৭. পুরুষদের অংশ রয়েছে ঐ সম্পদে, যা পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন রেখে যায় এবং নারীদেরও অংশ রয়েছে ঐ সম্পদে, যা পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন রেখে যায়- সে সম্পদ কম হোক বা বেশি, নির্ধারিত অংশ[৩]।

---

১. অর্থাৎ এতীমের সম্পদ অভিভাবক নিজের কাজে খরচ করবে না। অবশ্য যদি এতীমদের প্রতিপালনকারী অভাবী হয়, তবে অবশ্য নিজের খেদমত অনুপাতে এতীমের ধন থেকে পারিশ্রমিক নেবে, কিন্তু ধনীর জন্য কিছু নেওয়া জায়েয নয়।

২. কোন শিশুর পিতা মরে গেলে কতিপয় মুসলমানের সামনে তার ধনসম্পত্তি লিপিবদ্ধ করে আমানতদারের হাতে সোপর্দ করা উচিত। অতঃপর বালেগ-বুদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার পর সেই লেখা অনুযায়ী তার ধন তার হাতে সমর্পন করবে এবং যা কিছু খরচ হয়ে থাকবে তা তাকে বুঝিয়ে দেবে। আর যা কিছু এতীমের হাতে সোপর্দ করা হবে, তা সাক্ষীদের দেখিয়ে করবে, কোন সময় মতবিরোধ হলে যেন সহজে মীমাংসা করা যায়।

আর প্রতিটি জিনিসের হেফাজতকারী এবং হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহ তাআলা যথেষ্ট, তার জন্য কোন হিসাব বা সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই। এসব বিষয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের সুবিধা ও পবিত্রতার জন্য নির্ধারণ করেছেন।

উল্লেখ্য, এতীমের ধন-সম্পদ আদান-প্রদানের সময় সাক্ষী রাখা ও তা লিপিবদ্ধ করা ফরয নয়, বরং মুস্তাহাব।

৩. হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বযুগে রীতি ছিল, ছোট হোক বা বড়, কন্যাদের মীরাছ দেওয়া হত না। আর নাবালেগ ছেলেরাও মীরাছ পেত না। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপযোগী পুরুষই ওয়ারিস পরিগণিত হত। ফলে এতীম ছেলেমেয়েরা মীরাছে কোন অংশই পেত না। তাদের সম্পর্কেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

আয়াতের সারকথা এই যে, মাতাপিতা ও অন্য আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে পুরুষগণ অর্থাৎ পুত্রসন্তানরা অংশ পাবে, চাই তারা স্বল্পবয়স্ক হোক বা প্রাপ্তবয়স্ক। অনুরূপ, নারীগণ অর্থাৎ কন্যারাও, বালেগ হোক বা নাবালেগ, মাতাপিতা ও অপরাপর আত্মীয়ের ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে তাদের অংশ পাবে। আর এই অংশগুলি সুনির্ধারিত, সেগুলি দেওয়া জরুরী, চাই সম্পত্তি কম হোক বা বেশি।

এই বিধানের দ্বারা জাহেলী যুগের ঘৃণিত প্রথার খণ্ডন হয়ে গেল এবং এতীমদের ও অন্যদের হকের হেফাজত করে তাদের হক মারা যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হল।

৮. যদি (সম্পত্তি) বন্টনকালে আত্মীয়, এতীম ও অভাবগ্রস্ত লোকজন উপস্থিত হয়, তবে তা থেকে তাদের কিছু দিয়ে দাও এবং তাদের ন্যায়সংগত কথা বলে দাও[১]।

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا۝

৯. আর (এতীমদের ব্যাপারে) তারা যেন ভয় করে, যাদের অবস্থা হল– তারা নিজেদের পিছনে দুর্বল সন্তানাদি রেখে গেলে তাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হত (যে, আমাদের পরে না জানি তাদের কী অবস্থা হবে!)। অতএব তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সঠিক কথা বলে[২]।

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا۝

১০. যারা এতীমদের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, নিশ্চয় তারা নিজেদের পেটে কেবল

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى

বি. দ্র. এই আয়াতে পাওনাদারদের পাওনা ও তা নির্ধারণের বিষয় আলোচিত হয়েছে। সামনের রুকূতে ওয়ারিসদের মধ্যে কার কী অংশ, তার বিশদ বিবরণ আসছে।

১. উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের সময় আত্মীয় ও বংশীয় লোকেরা সমবেত হলে মীরাছের মধ্যে যাদের অংশ নেই অথবা যারা এতীম ও অভাবী, তাদের কিছু খাইয়ে বিদায় কর, অথবা ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে সুযোগ-সুবিধা মত তাদেরকেও কোন জিনিস দিয়ে দাও। এরূপ করা মুসতাহাব। আর যদি ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে পানাহার বা কিছু দান করার সুযোগ না থাকে, যেমন তা যদি এতীমদের সম্পদ হয় এবং মৃত ব্যক্তি ওসিয়তও করেনি, তবে তাদের মিষ্ট ভাষায় কথা বলে বিদায় করবে। অর্থাৎ নম্রতার সঙ্গে ওযর করবে যে, এই সম্পদ এতীমদের এবং মৃত ব্যক্তি ওসিয়তও করেনি, তাই আমরা (তোমাদের দিতে) অক্ষম।

সূরার শুরুতে বর্ণিত হয়েছে, সকল আত্মীয়স্বজন স্তরভেদে সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকার রাখে, অনুরূপ এতীম-মিসকীনরাও। আর যে আত্মীয় এতীম বা মিসকীনও হবে, তার তো এ অধিকার আরও বেশি রয়েছে। তাই মীরাছ বণ্টনের সময় তাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু না কিছু দেওয়া উচিত। কোন কারণে দেওয়া সম্ভব না হলেও সদ্ব্যবহার থেকে যেন বঞ্চিত না হয়।

২. এই নির্দেশ মূলত এতীমের অভিভাবকের জন্য, তবে অন্যদেরও এই বিষয়ে খেয়াল রাখা দরকার।

আয়াতের অর্থ এই যে, প্রত্যেকেই যেমন এ বিষয়ে চিন্তিত থাকে যে, আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তানাদির সাথে না জানি মন্দ ও কঠোর ব্যবহার হয় কি না! তদ্রূপ এতীমের সঙ্গে তোমাদেরও সেই রকম ব্যবহার করা উচিত, যা তোমরা নিজেদের পরে স্বীয় সন্তানসন্ততির সঙ্গে পছন্দ করে থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং এতীমদের সাথে সঙ্গত ও ভাল কথা বল। অর্থাৎ যদ্বারা তাদের মনে কষ্ট না হয় এবং তাদের ক্ষতি না হয়, বরং তাদের মঙ্গল হয়।

ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۭ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝

আগুনই ভরে এবং শীঘ্রই তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে[১]।

[রুকূ - ২]

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۤ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۗءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۭ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

১১. আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান[২]। এখন যদি শুধু নারীই থাকে- (দুই বা) দুয়ের অধিক, তবে তাদের জন্য রয়েছে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। আর যদি (নারী) একজনই হয়, তবে তার জন্য অর্ধাংশ[৩]। আর

১. পূর্বের একাধিক আয়াতে নানাভাবে এতীমদের ধন-সম্পদের ব্যাপারে সর্তক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান আয়াতে সেই নির্দেশকেই জোরালো করার জন্য এতীমদের সম্পর্কে খেয়ানত করার উপর কঠিন ধমকি উচ্চারণ করা হয়েছে। তা এই যে, যে কেউ এতীমদের মাল অন্যায়ভাবে খায়, সে যেন নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরে। অর্থাৎ এই খাওয়ার পরিণাম হচ্ছে জাহান্নামের আগুনে যাওয়া। আয়াতের শেষ বাক্যে এ কথা স্পষ্টভাবে বলেও দেওয়া হয়েছে।

২. পূর্বে (৭নং আয়াতে) মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন যে তার ওয়ারিস হয়, সে কথার উল্লেখ ছিল এবং তাদের অংশ নির্ধারিত হওয়ার বিষয়ে এজমালি ইঙ্গিত ছিল। এখন আত্মীয়স্বজনের এবং তাদের মধ্যে কার কী অংশ তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

পূর্বে এতীমদের হকের ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। যা দ্বারা বোঝা গেল যে, ওয়ারিসদের মধ্যে কোন এতীম থাকলে তার অংশ খুব সতর্কতা ও যত্নের সাথে দেয়া উচিত। বলা বাহুল্য, জাহেলী যুগে এতীমদের মাহরুম করার যে প্রচলন ছিল, তা কঠিন জুলুম ও মাহাপাপ।

এস্থলে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সর্বাগ্রে সন্তানাদির অংশ বর্ণিত হচ্ছে। তা এই যে, যদি মৃত ব্যক্তির ছেলে-মেয়ে উভয় সন্তানাদি থাকে তবে তাদেরকে মীরাছ দেওয়ার নিয়ম এই যে, এক ছেলে দুই মেয়ের সমান অংশ পাবে। যেমন, এক ছেলে ও দুই মেয়ে থাকলে অর্ধেক সম্পত্তি ছেলের হবে এবং অর্ধেক দুই মেয়ের হবে। আর যদি এক ছেলে ও এক মেয়ে থাকে, তবে দুই তৃতীয়াংশ ছেলের হবে এবং এক তৃতীয়াংশ মেয়ের।

৩. অর্থাৎ,যদি মৃত ব্যক্তি শুধু কন্যাই রেখে যায়, ছেলেসন্তান না থাকে, তবে তারা যদি দুয়ের অধিক হয় তবুও দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি এক মেয়েই রেখে যায় তবে সে ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ

মৃতের মাতাপিতা অর্থাৎ দুজনের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ষষ্ঠাংশ, যদি মৃতের সন্তান থাকে[১]। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিস হয় তার পিতামাতা, তবে তার মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ[২]। আর যদি মৃতের কয়েক ভাই থাকে, তবে তার মায়ের জন্য ষষ্ঠাংশ[৩]। (এ সবই হবে) ওসিয়ত (কার্যকর করার) পর, যা

উল্লেখ্য যে, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ -এর ব্যাখ্যায় জানা গেছে, এক ছেলের সঙ্গে এক মেয়ে থাকলে মেয়ে এক তৃতীয়াংশ পাবে। এ থেকে বোঝা গেল, দুই মেয়ে থাকাবস্থায় প্রত্যেকের এক তৃতীয়াংশ পাওয়া অধিকতর যুক্তিসংগত। কারণ, ছেলের অংশ মেয়ের অংশের চেয়ে বেশি। অতএব ছেলের কারণে যখন মেয়ের অংশ এক তৃতীয়াংশ থেকে কম হল না, তখন অন্য মেয়ের কারণে কী করে কমতে পারে।

সারকথা, দুই মেয়ে থাকলে তাদের অংশ কী হবে, তা আয়াতের প্রথমাংশ থেকে বোঝা গেছে। বিধায় فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً الخ থেকে দুই মেয়ের অধিক থাকলে কী হুকুম তা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে কারো এই সন্দেহ না হয় যে, দুই মেয়ের পাওনা যেহেতু এক মেয়ের অপেক্ষা বেশি, অতএব সম্ভবত তিন বা চার মেয়ের পাওনা দুই মেয়ের থেকে বেশি হবে। কিন্তু মাসআলা এ রকম মোটেই নয়, বরং মেয়েরা যখন একাধিক হবে– দুজন হোক বা দশজন, সর্বাবস্থায় তারা দুই তৃতীয়াংশই পাবে।

বি. দ্র. সন্তানাদির ওয়ারিস হওয়ার দুটি অবস্থা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এক, ছেলে ও মেয়ে উভয় প্রকার সন্তান থাকা; দুই, শুধু মেয়ে সন্তান থাকা; এর আবার দুই অবস্থা– এক মেয়ে হবে বা একাধিক। এখন শুধু ছেলে থাকার অবস্থা বাকী রইল। এর হুকুম এই যে, সমগ্র সম্পত্তি ছেলের হয়ে যাবে– চাই এক ছেলে হোক বা বেশি।

১. মাতাপিতার মীরাছের তিন অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে। প্রথম অবস্থার সারকথা এই যে, যদি মৃতের সন্তান থাকে, ছেলে বা মেয়ে, তবে মৃতের মাতাপিতার প্রত্যেকে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ষষ্ঠাংশ পাবে।

২. দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, যদি মৃতের কোন সন্তান না থাকে, শুধু মাতাপিতা ওয়ারিস হয়, তবে তার মা এক তৃতীয়াংশ পাবে, অর্থাৎ বাকী দুই তৃতীয়াংশ তার পিতা পাবে।

৩. তৃতীয় অবস্থা এই যে, যদি মৃতের একাধিক ভাইবোন থাকে, চাই আপন হোক বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় এবং সন্তান কেউই না থাকে, তবে এমতাবস্থায় তার মা ষষ্ঠাংশ পাবে অর্থাৎ বাদবাকী পিতা পাবে, ভাইবোন কিছুই পাবে না। আর যদি শুধু এক ভাই বা এক বোন থাকে, তবে মা এক তৃতীয়াংশ এবং বাদবাকী পিতা পাবে।

فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ⑪

মৃত ব্যক্তি করে যায় অথবা ঋণ (পরিশোধের) পর, (যদি তা থাকে)[১]। তোমাদের পিতা ও তোমাদের ছেলেরা– এদের মধ্যে কে উপকার সাধনে তোমাদের বেশি নিকটবর্তী, তা তোমরা জান না। (এসব) আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ সম্যক অবহিত, প্রজ্ঞাবান[২]।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۭ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ

১২. আর তোমাদের জন্য রয়েছে তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ, যদি তাদের সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ। (এ বণ্টন) ওসিয়ত (কার্যকর করার) পর, যা তারা করে যায়, অথবা ঋণ (পরিশোধের) পর, (যদি তা থাকে)[৩]। আর স্ত্রীদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ,

---

১. অর্থাৎ ওয়ারিসদের যে অংশের কথা বলা হল, তা সবই মৃতের ওসিয়ত ও তার ঋণ পরিশোধ করার পর ওয়ারিসদের দেওয়া হবে। বস্তুত ওয়ারিসদের সম্পত্তি তা-ই হবে, যা ওসিয়ত ও ঋণ পরিমাণ অর্থ বের করে নেওয়ার পর অবশিষ্ট থাকবে। অর্ধেক, তৃতীয়াংশ ইত্যাদি অংশ বলতে অবশিষ্ট সম্পত্তিরই অংশ উদ্দেশ্য, সমগ্র সম্পত্তির নয়।

বি. দ্র. মৃতের ধন-সম্পদ প্রথমত তার কাফন-দাফনে লাগিয়ে যা বাঁচবে, তা দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। অতঃপর যা থাকবে তা মৃতের ওসিয়তে এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত খরচ করা হবে। এর পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টিত হবে।

২. বর্তমান আয়াতে দুই প্রকার মীরাছ বর্ণিত হল, সন্তানাদির মীরাছ ও মাতাপিতার মীরাছ। এখন বলা হচ্ছে, যেহেতু তোমাদের জানা নেই– কার দ্বারা তোমাদের উপকার হবে এবং কতটুকু উপকার হবে, এ জন্য তোমাদের এতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। যার যে অংশ আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সঠিকরূপে তারই বাস্তবায়ন কর। কারণ, আল্লাহ তাআলা সকল বিষয়ে জ্ঞাত ও বড়ই হেকমতওয়ালা।

৩. এখন স্বামী ও স্ত্রীর মীরাছ বর্ণিত হচ্ছে। স্বামী তার স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে– যদি স্ত্রীর কোন সন্তান না থাকে। আর যদি স্ত্রীর সন্তান থাকে, চাই একজন মাত্র পুত্র বা কন্যা হোক এবং ঐ স্বামীরই ঔরসজাত হোক বা অন্য স্বামীর– তবে স্বামী তার স্ত্রীর সম্পত্তির চতুর্থাংশ পাবে– ঋণ ও ওসিয়ত আদায়ের পর।

لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن

যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ। (এ বণ্টন) ওসিয়ত (কার্যকর করার) পর, যা তোমরা করে যাও অথবা ঋণ (পরিশোধের) পর, (যদি তা থাকে)[১]। আর যদি (মৃত) পুরুষ বা নারী– যার মীরাস বণ্টন হবে– পিতা-পুত্রহীন হয় এবং মৃতের এক ভাই বা বোন থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ[২]। আর যদি তারা একাধিক হয়,

---

১. তদ্রূপ, স্ত্রী তার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির চতুর্থাংশ পাবে, যদি স্বামীর কোন সন্তান না থাকে। আর যদি স্বামীর সন্তান থাকে, চাই ঐ স্ত্রীরই গর্ভজাত হোক বা অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত, তবে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির অষ্টমাংশ পাবে, ঋণ ও ওসিয়ত আদায়ের পর।

এ অংশ সবরকম ধন-সম্পত্তি থেকে পাবে– টাকা-পয়সা বা ফসলাদি হোক, হাতিয়ার বা অলঙ্কারাদি, বাড়ীঘর বা বাগ-বাগিচা হোক। বাকি থাকল স্ত্রীর মহর, তা ঋণের অন্তর্ভুক্ত। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের দুটি করে অবস্থা বর্ণিত হল।

২. এখান থেকে বৈপিত্রেয় (অর্থাৎ একই মায়ের গর্ভজাত, কিন্তু অন্য পিতার ঔরসে জন্মপ্রাপ্ত) ভাইবোনের মীরাছের উল্লেখ হচ্ছে। জানা দরকার যে, মৃতের পিতা ও পুত্র থাকতে তার ভাই ও বোন কিছুই পায় না, অবশ্য পিতা ও পুত্র না থাকলে ভাই ও বোন মীরাছ পাবে।

ভাই ও বোন তিন রকমের হয় : (১) আপন ভাই-বোন, যারা একই পিতামাতা থেকে জন্মপ্রাপ্ত, তাদের عيني ভাই-বোন বলা হয়। (২) সৎ ভাইবোন, যারা একই পিতা কিন্তু বিমাতা থেকে জাত, যাদের علاتي বৈমাত্রেয় ভাই-বোন বলা হয়। (৩) সৎ ভাই-বোন, যারা একই মা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পিতা থেকে জাত, তাদের اخيافي বৈপিত্রেয় ভাই-বোন বলা হয়। বর্তমান আয়াতে শেষ প্রকারের উল্লেখ হয়েছে, (সকল প্রকারের নয়)। যার এক প্রমাণ এই যে, বিভিন্ন সাহাবীর কেরাতে وله أخ أو أخت এর পর من الأم (মায়ের দিক থেকে) শব্দ বর্তমান রয়েছে। তাছাড়া এ বিষয়ে সকল উলামায়ে কেরামের 'ইজমা'ও রয়েছে।

আয়াতের অর্থ এই যে, যদি মৃত পুরুষ বা নারীর পিতা, দাদা ও সন্তানাদি (তদ্রূপ ছেলের ঘরের সন্তানাদি) না থাকে, শুধু বৈপিত্রেয় এক ভাই বা এক বোন থাকে, তবে এই এক ভাই বা বোন এক ষষ্ঠাংশ পাবে। অতএব এস্থলে নর ও নারী অর্থাৎ বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের অংশ সমান-সমান, কমবেশি নয়।

বাকী রইল আপন ও বৈমাত্রেয় ভাই ও বোন, এই দুই শ্রেণীর অংশ সন্তানের মত– যদি মৃতের পিতা ও পুত্র কেউ না থাকে। অবশ্য এ দুই শ্রেণীর মধ্যে আপন ভাই-বোন অগ্রগণ্য, তারা না থাকলে বৈমাত্রেয় ভাইবোন ওয়ারিছ হবে। এ সূরারই শেষে এদের মীরাছের আলোচনা আসবে।

كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿١٢﴾

তবে তারা সকলে এক তৃতীয়াংশে অংশীদার হবে। (এ বণ্টন) যে ওসিয়ত করা হয় তা (কার্যকর করার) পর, অথবা ঋণ (থাকলে, তা পরিশোধের) পর, যখন তা (অর্থাৎ ওসিয়ত) ক্ষতিকর না হবে[১]। এ নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, ধৈর্যশীল[২]।

বি. দ্র. كلالة- এর তাফসীরে যে বলা হল : যার পিতা-পুত্র নেই, এ সর্বসম্মত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন, সেই সঙ্গে দাদী-নানীও না থাকতে হবে। অর্থাৎ তাঁর কাছে পিতা-পুত্রের যে হুকুম, দাদী-নানীরও একই হুকুম। সাহাবীদের যুগ থেকেই এ ইখতেলাফ চলে এসেছে।

১. অর্থাৎ বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন একাধিক থাকলে তারা সকলে মিলে সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে– ওসিয়ত (কার্যকর) ও ঋণ (আদায়ের) পর।

আর ওসিয়ত মীরাছ থেকে অগ্রগণ্য তখনই হবে, যখন অন্যদের ক্ষতি না করা হয়। ক্ষতির দুটি উপায় রয়েছে—প্রথম এই যে, এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির অধিক ওসিয়ত করা; দ্বিতীয়, মীরাছে যে ব্যক্তি অংশীদার তার জন্যও ওসিয়ত করে যাওয়া। এ দুই অবস্থার কোনটাই দুরুস্ত নয়। অবশ্য সকল ওয়ারিছ তা মেনে নিলে ভিন্ন কথা, নতুবা শরীয়তে তা অগ্রাহ্য।

বি. দ্র. ওয়ারিসদের দিক থেকে যেহেতু আশঙ্কা ছিল, মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে মৃতের ঋণ ও ওসিয়ত আদায় না করে সমস্ত সম্পত্তি নিজেরাই রেখে দেয় কি না, এ জন্য মীরাছের সাথে বারবার ঋণ ও ওসিয়তের বিধান তাকিদের সাথে বর্ণিত হয়েছে। আর ওসিয়ত যেহেতু দান ও অনুগ্রহের ব্যাপার এবং প্রায়ই কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি এর অধিকারী হয় না, এ কারণে তা বিনষ্ট হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল, সেহেতু গুরুত্ব ও সতর্কতা বোঝানোর জন্য ওসিয়তকে প্রত্যেক স্থলে ঋণের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও ওসিয়তের স্থান ঋণের পরে, যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আবার কাফন-দাফনের মত ওসিয়তও মৃতের হক। পক্ষান্তরে, উত্তরাধিকার ও ঋণ অন্যদের হক– এই হিসাবে ঋণ থেকে ওসিয়ত অগ্রগণ্য, যদিও অন্য কারণে ঋণ ওসিয়ত থেকে অগ্রগণ্য।

আর এখানে غير مُضار অর্থাৎ অন্যদের ক্ষতি না করার যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, এই শর্ত পূর্বের সকল স্থানেও প্রযোজ্য হবে।

২. আয়াত নং ১১ থেকে এ পর্যন্ত পাঁচ প্রকার ওয়ারিসের মীরাছ বর্ণিত হল—কন্যার, মাতাপিতার, স্বামীর, স্ত্রীর, ও বৈপিত্রেয় ভাইবোনের। এই পাঁচ প্রকার ওয়ারিসকে ذوي الفروض (যাদের অংশ কুরআনে নির্ধারিত) বলা হয়। এই পাঁচ প্রকারের মীরাছ বর্ণনার পর তাকীদস্বরূপ বলা হচ্ছে যে, এ আল্লাহর নির্দেশ, এর তামীল বা বাস্তবায়ন জরুরী। আর আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ, কে আনুগত্য করল, কে অবাধ্যতা করল, কে মীরাছ, ওসিয়ত ও ঋণের ব্যাপারে হক ও ইনসাফ অনুযায়ী কাজ করল, কে অবিচার ও ক্ষতি করল– সবই তিনি

১৩. এগুলি আল্লাহর সীমা। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলবে, তিনি তাদের জান্নাতসমূহে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। আর এ-ই বিরাট সাফল্য।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝١٣

জানেন। তবে অত্যাচার ও অবিচারের শাস্তিতে দেরি হওয়ায় কেউ যেন ধোঁকায় না পড়ে। কারণ, আল্লাহ তাআলার সহনক্ষমতাও সর্বোচ্চ স্তরের।

'আসাবা' ও 'জাবিল আরহাম' এর মীরাছ

মনে রাখা দরকার যে, এ পর্যন্ত যে ওয়ারিসদের আলোচনা হল তাদের ذوي الفروض (আল্লাহ তাআলা কর্তৃক যাদের অংশ নির্ধারিত) বলা হয়। এদের ছাড়াও আরো এক প্রকার ওয়ারিস আছে, যাদের 'আসাবা' (عصبة) বলা হয়। তাদের জন্য কোন অংশ, যেমন অর্ধেক, তৃতীয়াংশ ইত্যাদি নির্ধারিত নেই। বরং 'যাবিল ফুরূয' বা নির্ধারিত অংশীদারদের দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তারা তা পাবে। যেমন, কারো যদি 'আসাবা' থাকে এবং যাবিল ফুরূয এর মধ্যে কেউ না থাকে, তবে তার ত্যাজ্য সম্পত্তি সমস্তটা আসাবাই পাবে। আর যার উভয় ধরণের ওয়ারিস হবে, তার সম্পত্তি 'যাবিল ফুরূয'দের দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা 'আসাবা'রা পাবে। আর অবশিষ্ট কিছু না থাকলে 'আসাবা'রা পাবে না।

আসাবা কারা? মূলত পুরুষ আত্মীয় 'আসাবা' হয়, নারী নয়। আবার সেই পুরুষ আত্মীয়কে এমন হতে হবে, যার ও মৃতের মধ্যে কোন নারীর মাধ্যম নেই। 'আসাবা'র চার স্তরঃ প্রথম স্তরে ছেলে ও নাতি (ছেলের ছেলে), দ্বিতীয় স্তরে পিতা ও দাদা, তৃতীয় স্তরে ভাই ও ভাতিজা, চতুর্থ স্তরে চাচা ও চাচার ছেলে। 'আসাবা' যদি কয়েক ব্যক্তি হয়, তবে যে মৃতের নিকটবর্তী সে অগ্রগণ্য হবে। যেমন, নাতির আগে পুত্র, ভাতিজার আগে ভাই অগ্রগণ্য হবে। অতঃপর সৎ (বৈমাত্রেয়) ভাই থেকে আপন ভাই অগ্রগণ্য হবে।

উল্লিখিত চার প্রকার আসাবার মধ্যে সন্তান ও ভাইদের ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নারীও আসাবা হয়, অর্থাৎ মৃতের ছেলের সঙ্গে মেয়ে এবং ভাইয়ের সঙ্গে বোনও আসাবা হবে। তবে এ আসাবা আসল বা প্রকৃত আসাবা নয়। আর সন্তান ও ভাইদের ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে নারী আসাবা হবে না। যেমন, চাচার পুত্র আসাবা, কিন্তু তার সঙ্গী হয়ে চাচাত বোন আসাবা হয় না।

বি. দ্র. উল্লিখিত দুই শ্রেণী অর্থাৎ যাবিল ফুরূয ও আসাবা ছাড়াও ইমাম আবু হানীফা র. এর নিকট তৃতীয় প্রকারের ওয়ারিস রয়েছে, যাদের 'যাবিল আরহাম' বলা হয়। অর্থাৎ তারা এমন আত্মীয়, যাদের মধ্যে ও মৃতের মধ্যে নারীর মাধ্যম রয়েছে এবং যারা যাবিল ফুরূযের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং আসাবাও নয়– যেমন দৌহিত্র, নানা, ভাগনে, মামা, খালা, ফুফু ও তাদের সন্তানসন্ততি। যখন কোন মৃতের 'যাবিল ফুরূয' ও 'আসাবা' কেউ না থাকে, তখন তার ত্যাজ্য সম্পত্তি 'যাবিল আরহাম' পাবে। এর বিস্তারিত আলোচনা ফারায়েযের কিতাবে রয়েছে।

১৪. আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর সীমাসমূহ লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে ফেলবেন, যাতে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি[১]।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٤﴾

[রুকূ-৩]

১৫. তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা অশ্লীল কাজ (ব্যভিচার) করবে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন (পুরুষ)-কে সাক্ষী বানাবে। তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তবে সেই নারীদের ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ রাখবে, যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের তুলে নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য (অন্য) কোনো পথ নির্ধারণ করে দেন[২]।

وَالّٰتِیْ یَاْتِیْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِی الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿١٥﴾

---

১. অর্থাৎ এতীমদের অধিকার এবং ওসিয়ত ও মীরাছ সংক্রান্ত যেসব হুকুম ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তা আল্লাহর নির্ধারিত আইন-কানুন। আর যে কেউ আল্লাহর আহকামের আনুগত্য করবে, যার মধ্যে ওসিয়ত ও মীরাছের হুকুমও শামিল রয়েছে, তার জন্য চিরকাল বেহেশ্‌ত রয়েছে। পক্ষান্তরে, যে কেউ অবাধ্যতা করবে এবং আল্লাহর সীমাসমূহ থেকে একেবারে বের হয়ে যাবে, সে চিরকাল লাঞ্ছনার সাথে জাহান্নামের আযাবে থাকবে।

২. এতীমদের সম্পর্কে এবং মীরাছের বিধিবিধান বর্ণনার পর এখন আত্মীয়দের ব্যাপারে আহকাম বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথমে নারীদের বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। সারমর্ম এই যে, নারীদের দ্বারা কোন অপরাধ হয়ে গেলে তাদের শাস্তি দেওয়া ও শাসন করা জরুরী। তবে তাদের উপর বাড়াবাড়ি ও অত্যাচার করা উচিত নয়। অন্ধকার যুগে উভয় ব্যাপারে অন্যায়-অবিচার হত।

বর্তমান আয়াতে শাস্তি দানের ব্যাপারে এই বিধান দেওয়া হয়েছে যে, কারো স্ত্রী ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছে বলে জানা গেলে তার অপরাধ প্রমানের জন্য মুসলমানদের মধ্য থেকে সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন সাবালক ও স্বাধীন চারজন সাক্ষী পাওয়া জরুরী। যদি চার ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, তবে সেই নারীকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখতে হবে। এবং তার জন্য ঘর থেকে বের হওয়া এবং কারো সাথে মেলামেশা করা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে, যাবৎ না সেই নারী মরে যায় অথবা আল্লাহ তাআলা তার জন্য কোন বিধান ও শাস্তি নির্ধারণ করে দেন।

(উল্লেখ্য যে,) সে সময় পর্যন্ত ব্যভিচারিণীর জন্য কোন শাস্তি নির্ধারণ করা হয়নি, তবে এর ওয়াদা করা হয়েছে। সে মত কিছু দিন পর সূরা নূরের মধ্যে এর শাস্তিবিধান অবতীর্ণ

১৬. আর তোমাদের মধ্যে যে দুই ব্যক্তি অশ্লীল কাজ করবে, তাদের শাস্তি প্রদান করবে[১]। অতঃপর তারা যদি তওবা করে এবং (নিজেদের) সংশোধন করে নেয়, তবে তাদের থেকে নিবৃত্ত হও। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যধিক তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু[২]।

وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

১৭. তওবা, যা (কবুল করা) আল্লাহর দায়িত্ব– তা কেবল এমন লোকদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দকর্ম করে ফেলে, অতঃপর তারা অবিলম্বে তওবা করে। তো এমন লোকদের আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আর

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ

করা হয় যে, কুমারীকে একশত বেত্রদণ্ড এবং বিবাহিতা নারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে দিতে হবে।

১. অর্থাৎ দুই ব্যক্তি– তা এক পুরুষ ও এক নারী হোক বা উভয়ই পুরুষ হোক– যদি কুকর্ম করে, তবে শাস্তি হিসেবে ওদের কষ্ট দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে। মুখের দ্বারা ও হাতের দ্বারা সংগত পরিমাণ ওদের সতর্ক করবে ও শাস্তি দেবে।

এ থেকে জানা গেল, তখন যিনা ও পুংমৈথুন উভয়ের হুকুম এই ছিল যে, সতর্ক করা ও শিক্ষার জন্য বিচারকের মতে যে পরিমাণ শাস্তি-ভর্ৎসনা ও পেটানো সংগত মনে হয়, সেই পরিমাণ দেওয়া হবে।

অতঃপর ওয়াদা মত যিনার হদ বা শাস্তি-বিধান যখন অবতীর্ণ হল, তখন পুংমৈথুনের জন্য কোন পৃথক শাস্তির কথা বর্ণিত হয়নি। এতে আলেমদের মধ্যে মতভেদ হল যে, পুংমৈথুনের জন্যও কি সেই শাস্তি হবে যা ব্যভিচারের জন্য বর্ণিত হয়েছে, নাকি এর জন্য পূর্ববর্ণিত শাস্তিই (হাত-মুখ দ্বারা কষ্ট দেওয়া) বলবৎ থাকবে, অথবা তরবারীর দ্বারা কিংবা অন্য কোন উপায়ে তাকে মেরে ফেলা হবে?

বি. দ্র. অনেক আলেমের মত এই যে, আয়াতখানি ব্যভিচার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, আর কারো কারো মতে পুংমৈথুন সম্পর্কে। এবং কতকের মতে ব্যভিচার ও পুংমৈথুন উভয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

২. অর্থাৎ এর পর যদি তারা সেই অপকর্ম থেকে তওবা করে এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে আর তাদের পিছনে পড়ো না। তাদেরকে ধমক ও ভর্ৎসনা দ্বারা নির্যাতন করা বন্ধ করে দাও। আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের তওবা কবুলকারী এবং তাদের প্রতি মেহেরবান, তোমাদেরও এমনি করা উচিত।

عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧﴾

আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়[১]।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۭ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٨﴾

১৮. আর তওবা এমন লোকদের জন্য নয়, যারা মন্দকাজ করতে থাকে, অবশেষে যখন ওদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলতে থাকে, 'আমি এখন তওবা করছি'। এবং এমন লোকদেরও (তওবা) নেই, যারা কাফের অবস্থায় মারা যায়। ওদের জন্য আমি প্রস্তুত করেছি যাতনাদায়ক শাস্তি[২]।

১. অর্থাৎ তওবা তো নিঃসন্দেহে এমন জিনিস, যার দ্বারা ব্যভিচার ও পুংমৈথুনের মত সাংঘাতিক পাপও আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন– যেমন, পূর্ববর্তী আয়াত থেকে বোঝা গেছে। কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা যে নিজ মেহেরবানীতে তওবা কবুল করার দায়িত্ব নিয়েছেন, তা প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐ লোকদের জন্য নির্দিষ্ট, যারা অজ্ঞতা ও ভুলবশত কোন সগীরা বা কবীরা গোনাহ করে বসে, কিন্তু নিজ অন্যায়ের ব্যাপারে সতর্ক ও অবহিত হওয়ামাত্র তারা অনুতপ্ত হয় এবং তওবা করে। সুতরাং এমন লোকদের গোনাহ-খাতা আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করে দেন।

আর আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ, তাঁর জানা আছে– কে অজ্ঞতাবশত পাপ করেছে এবং কে আন্তরিকতার সাথে তওবা করেছে। এবং তিনি হেকমতওয়ালা। ফলে যে তওবা কবুল করা হেকমতের অনুকূল হয়, তিনি তা কবুল করে নেন।

বি. দ্র. (بجهالة) 'অজ্ঞতার শর্ত' ও (عن قريب) 'অবিলম্বের শর্ত' দ্বারা বোঝা গেল, যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত গোনাহ করে এবং সতর্ক হওয়ার পর অবিলম্বে তওবা করে নেয়, তার তওবা ইনসাফ ও হেকমতের নিয়মানুসারে অবশ্যই গ্রহণীয়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি জেনেশুনে ও জ্ঞাতসারে আল্লাহর নাফরমানী করার দুঃসাহস করল অথবা অবগতির পর তওবা করতে বিলম্ব করল ও পূর্বাবস্থায়ই কায়েম রইল, তার গোনাহ ইনসাফ ও সুবিচারের নীতি অনুযায়ী আসলে ক্ষমার যোগ্য নয়। হ্যাঁ, তার তওবা কবুল করলে তা আল্লাহ তাআলার নিতান্ত মেহেরবানী। এ তাঁর অনুগ্রহ যে, তিনি নিজ মেহেরবানীতে এই উভয়ের তওবাও কবুল করে নেন। কিন্তু কবুল করার দায়িত্ব শুধু প্রথম অবস্থায়, শেষের দুই অবস্থায় নয়।

২. অর্থাৎ যারা সর্বদা গোনাহ করে চলে, বিরত হয় না, যাবৎ না মৃত্যু দৃষ্টিগোচর হয় এবং তখন বলে, 'আমি এখন তওবা করছি'– এমন লোকদের তওবা কবুল হয় না। অনুরূপ, ওদেরও তওবা কবুল হয় না, যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং পরকালের আযাব দেখে তওবা করে। এমন সব লোকদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে।

আয়াতের তাফসীরে একাধিক মত

জানা প্রয়োজন, তওবা কবুল হওয়া এবং না হওয়া সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াত দুটির যে তাফসীর আমরা করেছি, তা কতিপয় বড় মুহাক্কিক আলেমের তাহ্কীকের আলোকে

১৯. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকাররূপে নিয়ে নেবে☆। এবং তাদের এ উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না যে, তোমরা তাদের যে সম্পদ দিয়েছ তার কিছুটা নিয়ে নেবে; কিন্তু তারা কোন প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজ করলে (ভিন্ন কথা)[১]। আর স্ত্রীদের সাথে

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ

করা হয়েছে। আর এই তাফসীরের সৌন্দর্য এই যে, (بِجَهَالَةٍ) 'অজ্ঞতা'-র শর্ত ও (عن قريب) 'অবিলম্বে' শব্দটি উভয়ই স্ব স্ব জাহেরী অর্থের উপর বহাল থাকছে এবং (على الله) 'আল্লাহর দায়িত্বে'-এর অর্থটিও অনায়াসে বুঝে আসছে। আর এস্থলে তওবা কবুল হওয়া ও না হওয়ার আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ বিষয়ে সতর্ক করা যে, যেনতেন তওবা কবুল হয় না, আর তওবারও একাধিক অবস্থা রয়েছে এবং কবুল হওয়ার প্রশ্নে তাদের মাঝে পার্থক্যও আছে, যাতে কেউ তওবার উপর ভরসা করে পাপ করতে দুঃসাহসী না হয়ে পড়ে। এই উদ্দেশ্যটিও উক্ত তাফসীর অনুসারে হাসিল হয়ে যায়।

কিন্তু অনেক মুফাসসিরগণ (بِجَهَالَةٍ)-'অজ্ঞতাবশত হওয়া'-কে 'শর্ত' গণ্য না করে 'সাধারণ অবস্থার বর্ণনা' ধরেছেন। অর্থাৎ গোনাহ সাধারণত অজ্ঞতা-নির্বুদ্ধিতা বশতই হয়ে থাকে, এজন্য তা উল্লেখ করা হয়েছে। আর (عن قريب) 'অবিলম্বে'-এর অর্থ তারা করেছেন– 'মৃত্যুর পূর্বে' তওবা করা। কারণ, দুনিয়ার জীবন খুবই স্বল্পকালীন। অতএব মৃত্যুর আগে তওবা করলেই 'অবিলম্বে' তওবা করেছে ধরা হবে। সারকথা, আয়াত দুটির অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ যে তওবা কবুল করার ওয়াদা করেছেন, তা সেই লোকদের সম্পর্কে, যারা অজ্ঞতা ও অপরিনামদর্শিতার কারণে গোনাহ করে বসে, তারপর মৃত্যু আসার পূর্বে তওবা করে নেয়। পক্ষান্তরে, যারা মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে গেছে এবং অন্তিম হালতে পৌঁছে গেছে অথবা যারা কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের তওবা কখনো কবুল হবে না।

বি. দ্র. যখন মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গেল এবং পরকালের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল, তখনকার তওবা গ্রহণীয় নয়, অবশ্য পরকালের জগত দেখার পূর্বে তওবা করলে তা কবুল হয়ে থাকে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** '...তোমরা জোরপূর্বক নারীদের মালিক বনে যাবে'।

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক ও শানে-নুযুল**

পূর্বে (১৫নং আয়াতে) নারীরা অপকর্ম করলে তার জন্য শাসন করার ও শাস্তি দানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর বর্তমান আয়াতে ইসলাম-পূর্ব যুগে নারীদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করা হত, তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।

জুলুম-অত্যাচারের অন্যতম উপায় এই ছিল যে, কেউ মারা গেলে তার স্ত্রীকে মৃতের অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত ছেলে, বা ভাই কিংবা অন্য কোন ওয়ারিস নিয়ে যেত। অতঃপর ইচ্ছা করলে

أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝١٩

সদ্ভাবে জীবনযাপন কর। যদি তোমরা তাদের অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, তোমরা কোন জিনিস অপছন্দ কর, অথচ আল্লাহ তাতে বহু কল্যাণ রেখেছেন[১]।

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ۭ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝٢٠

২০. আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং তাদের একজনকে বহু সম্পদ দিয়ে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত নিয়ো না। তোমরা কি অপবাদ দিয়ে ও প্রকাশ্য গোনাহ করে তা নিতে চাও[২]?

তাকে বিয়ে করত অথবা অন্যের কাছে বিয়ে দিয়ে তার মহর পুরাটা বা আংশিক নিজে নিয়ে নিত অথবা তাকে বিয়ে ছাড়াই আজীবন নিজের কাছে আটকে রাখত এবং তার সম্পত্তির ওয়ারিস হয়ে বসত।

এ সম্পর্কে বর্তমান আয়াত নাযিল হয়। যার সারমর্ম এই যে, যখন কেউ মারা যায় তখন তার স্ত্রী নিজ বিয়ের ব্যাপারে স্বাধীন, মৃতের ভাইয়ের বা তার কোন ওয়ারিসের অধিকার নেই যে, জোরপূর্বক নিজে তাকে বিয়ে করবে বা অন্যত্র বিয়ে করতে এই মতলবে বাধা দিবে যে, স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে সে যা পেয়েছিল তা থেকে যাতে কিছু অংশ ফিরিয়ে দেয়। হাঁ, যদি প্রকাশ্য অপকর্মে লিপ্ত হয় তবে তাকে আটকে রাখতে পারে।

১. অর্থাৎ স্ত্রীগণের সঙ্গে কথাবার্তা ও দাম্পত্য জীবনে কোমল ও সদ্ব্যবহার কর। অন্ধকার যুগে যে অপমানকর ও কঠোর ব্যবহার করা হত তা বর্জন কর। আর যদি স্ত্রীর কোন আদত-অভ্যাস তোমাদের ভাল না লাগে তবে ধৈর্য ধর, সম্ভবত তার মধ্যে কোনও কল্যাণ নিহিত আছে। আর হতে পারে যে, কোন জিনিস তোমাদের অপছন্দ, অথচ আল্লাহ তাআলা তাতে তোমাদের জন্য দীনী বা পার্থিব কোনো বড় মঙ্গল নিহিত রেখেছেন। সুতরাং তোমাদের সহ্য করা উচিত এবং বদভ্যাসের মোকাবেলা বদভ্যাস দ্বারা করা উচিত নয়।

২. ইসলাম-পূর্ব যুগে এমনও হত যে, কেউ প্রথমা স্ত্রী ছেড়ে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে চাইলে পূর্ব স্ত্রীর উপর অপবাদ আরোপ করত এবং নানাভাবে তার উপর বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা করত, যাতে বাধ্য হয়ে মহর ফেরত দিয়ে দেয় এবং মহরের টাকা নতুন বিয়ের কাজে আসে। বর্তমান আয়াত এই রীতির প্রতিরোধে অবতীর্ণ হয় এবং এতে বলা হয় যে, যদি কেউ প্রথমা স্ত্রীকে ছেড়ে দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করে, তবে এ অবস্থায় প্রথমা স্ত্রীকে যে প্রচুর সম্পদ প্রদান করেছিল তা থেকে কিছুই ফেরত নেবে না। তোমরা কি অপবাদ দিয়ে এবং স্পষ্ট জুলুম করে প্রথমা স্ত্রী থেকে সেই সম্পদ নিতে চাও? এ কখনো জায়েয নয়।

২১. আর তোমরা কেমন করে তা ফেরত নিতে পার, অথচ তোমাদের একজন অপরজনের কাছে গমন করেছ এবং স্ত্রীরা তোমাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছে[১]?

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٢١﴾

২২. তোমরা ঐ নারীদের বিয়ে করো না, যাদের বিয়ে করেছে তোমাদের বাপ-দাদারা; তবে অতীতে যা ঘটেছে (তা মাফ)। নিশ্চয় এটা নির্লজ্জ ও ঘৃণ্য কাজ এবং মন্দ পন্থা[২]।

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٢٢﴾

---

১. অর্থাৎ বিয়ের পর যখন স্বামী-স্ত্রী মিলিত হয়েছে এবং সহবাস হয়েছে, তখন এর বিপরীতে পূর্ণ মহর স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। সুতরাং কেমন করে স্বামী সেই মহর ফেরত নিতে পারে? আর তখনো মহর আদায় করে না থাকলে কেমন করে তার মহর আটকিয়ে রাখতে পারে? এখন তো স্ত্রী নিজ খুশীতে তা মাফ করা ছাড়া তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় নেই। আর বিবাহকালে স্ত্রীগণ তোমাদের থেকে পরিপক্ক ও শক্ত প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে তারা তোমাদের ভোগদখলে এসেছিল এবং তোমরা তাদের দ্বারা পূর্ণ লাভবান হয়েছ। তা না হলে তাদের উপর তোমাদের ভোগদখলের কী অধিকার ছিল? এখন বিয়ের এই পরিমাণ পরিপূর্ণতা ও সম্পূর্ণ ভোগদখলের পর স্ত্রীগণের মহর ফেরৎ নেওয়া বা তাদের মহর না দেওয়া কেমন করে সম্ভব?

বি. দ্র. সহবাসের পর যেমন পূর্ণ মহর স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়ে যায়, তেমনি সহবাসের পালা না এসে শুধু নির্জন মিলন হয়ে থাকলেও পূর্ণ মহর আদায় করা ওয়াজিব হবে। হাঁ, যদি নির্জন মিলনেরও সুযোগ না হয়ে থাকে, অথচ স্বামী তালাক দিয়ে ফেলেছে, তবে অর্ধেক মহর আদায় করা ওয়াজিব হবে।

২. অন্ধকার যুগের লোকেরা নিজেদের সৎ মা এবং কেউ কেউ অন্য মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ এমন) রমনীদেরও বিয়ে করে বসত। এটাকে নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে, যে নারীদের তোমাদের পিতৃবর্গ বিবাহ করেছিল তোমরা তাদের বিয়ে করো না। এ রীতি নির্লজ্জতা এবং আল্লাহর ক্রোধ ও ঘৃণার বিষয়। আর এ অত্যন্ত কুৎসিৎ পদ্ধতি। অন্ধকার যুগেও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা একে ঘৃণার চোখে দেখত এবং এই বিয়েকে 'মাকতের' বিবাহ (ঘৃণার বিবাহ) এবং বিবাহে জন্মপ্রাপ্ত সন্তানকে 'মাকতি' (ঘৃণিত) বলা হত। অতএব এহেন বিবাহ, যা অতীতে হয়ে গেছে, ভবিষ্যতে যেন কিছুতেই না হয়।

বি. দ্র. পিতার বিবাহে আসা নারীর যে হুকুম, দাদা ও নানার বিবাহে আসা নারীও সে হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, দাদা-নানা যত উর্ধ্বেরই হোক না কেন।

[রুকূ - ৪]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا

২৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে– তোমাদের মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজি, ভাগিনী[১], তোমাদের সেই মাতাগণ যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে, তোমাদের দুধবোন[২], তোমাদের স্ত্রীদের মা এবং তোমাদের স্ত্রীদের কন্যা, যারা তোমাদের প্রতিপালনে আছে (এবং যারা) তোমাদের এমন স্ত্রীদের গর্ভজাত, যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছ। আর যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে (তাদের কন্যাদের বিবাহ করায়) তোমাদের কোন গোনাহ নেই। এবং (হারাম করা হয়েছে) তোমাদের ঐ পুত্রদের স্ত্রী, যারা তোমাদের ঔরসজাত এবং দুই বোনকে

---

১. সৎ মায়ের সঙ্গে বিয়ের অবৈধতা বয়ান করে এখন যে মেয়েদের বিয়ে করা জায়েয নয়, তাদের সকলের কথা বলা হচ্ছে। এই মেয়েরা কয়েক শ্রেণীর। যারা বংশীয় সম্পর্কের কারণে হারাম, প্রথমে তাদের আলোচনা হচ্ছে। তারা সাতজন– মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজী ও ভাগিনী। কারো জন্য এদের কাউকে বিয়ে করা জায়েয নয়।

বি. দ্র. দাদী ও নানী যত উপরেরই হোক, সকলে মায়ের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ, পৌত্রী ও দৌহিত্রী, নীচ পর্যন্ত সকলে কন্যার পর্যায়ভুক্ত। আর বোনের হুকুমের মধ্যে সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়, সকল বোন শামিল। ফুফুর মধ্যে, বাপদাদা যত উর্ধ্বের হোক তাদের তিন প্রকার বোনই অন্তর্ভুক্ত। খালার মধ্যে মা ও নানী এবং নানীর নানী, সকলের তিন প্রকার বোনই শামিল। ভাতিজীর মধ্যে তিন প্রকার ভাইয়েরই মেয়েরা এবং ভাইদের নাতনীরা, সকলে অন্তর্ভুক্ত এবং ভাগিনীর মধ্যে তিন রকম বোনেরই মেয়েরা এবং বোনদের নাতনীরা– সকলে শামিল রয়েছে।

২. যে মেয়েদের সঙ্গে বংশসূত্রে বিয়ে হারাম, তাদের আলোচনার পর এখন দুধ-সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিয়ে হারাম সেই মেয়েদের আলোচনা হচ্ছে। তারা দুই শ্রেণীর– মা ও বোন। আর এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বংশসূত্রে যে সাতজন হারাম, দুধসূত্রেও তারা হারাম। অর্থাৎ দুধ-মেয়ে, দুধ-ফুফু, দুধ-খালা, দুধ-ভাতিজী, দুধ-ভাগিনীও হারাম। হাদীসে এই বিধান বর্তমান রয়েছে।

بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

একত্র করা[১]; তবে অতীতে যা হয়ে গেছে (তা মাফ)। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

পারা - ৫

وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَٰبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا

২৪. এবং (হারাম করা হয়েছে) সকল সধবা নারী, তবে যারা তোমাদের মালিকানাধীন হয়ে গেছে (তাদের কথা ভিন্ন)। (এসব বিধান) আল্লাহ তোমাদের উপর ফরয করেছেন[২]। আর তাদের ছাড়া অন্য সকল

---

১. এখন বৈবাহিকসূত্রে যে মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে হারাম, তাদের উল্লেখ হচ্ছে। এরা দুই শ্রেণীর। প্রথম, যাদের সাথে সর্বদার জন্য বিয়ে নাজায়েয– তারা হচ্ছে ১. স্ত্রীর মাতা (শাশুড়ী) এবং ২. সেই স্ত্রীর (পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত) কন্যা, যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়েছে। আর যদি সহবাসের পূর্বেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেওয়া হয় তবে তার কন্যার সঙ্গে বিয়ে হতে পারে। ৩. তোমাদের পুত্রবধূ, এবং নীচ পর্যন্ত পৌত্রবধূ ও দৌহিত্রবধূ।

দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন নারীদের, যাদের সঙ্গে সর্বদার জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ নয়, বরং যতদিন পর্যন্ত কোন নারী তোমাদের বিবাহে আছে, ততদিন পর্যন্ত ওই নারীর আত্মীয়া এই মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ অবৈধ। স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে গেলে বা মরে গেলে তাদের সঙ্গে বিবাহ জায়েয হয়ে যাবে। যেমন স্ত্রীর বোন, স্ত্রীর বর্তমানে তার সাথে বিয়ে হতে পারে না বটে, কিন্তু পরে হতে পারে। স্ত্রীর ফুফু, খালা, ভাতিজী ও ভাগিনীও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

বি. দ্র. আয়াতে যে বলা হল– তোমাদের ঔরষজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ, এর দ্বারা মুখে ডাকা তথা পালকপুত্রকে খারিজ করা হয়েছে। দুধসম্পর্কীয় পুত্রকে নয় (অর্থাৎ পালকপুত্র যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে পিতা তাকে বিবাহ করতে পারবে। কিন্তু দুধসম্পর্কীয় পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়)।

আর إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ এর অর্থ এই যে, এই বিধান আসার পূর্বে অন্ধকার যুগে দুই বোনকে যে একত্রে বিয়ে করা হত, তা মাফ।

আর في حجوركم এর অর্থ হল, যাদের তোমরা নিজেদের কাছে লালন-পালন করে থাক অর্থাৎ সন্তানদের মতই তাদের সঙ্গে ব্যবহার করে থাক এবং বলতে গেলে সন্তানই মনে কর। এর দ্বারা তাদের সঙ্গে বিবাহের অবৈধতা আরো স্পষ্ট হয়ে গেল। এই উদ্দেশ্য নয় যে, তাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম হওয়ার জন্য তাদের লালন-পালন করা জরুরী।

২. মাহরাম মেয়েদের আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে, যেসব মেয়ের স্বামী বর্তমান তাদের আলোচনা হচ্ছে। অর্থাৎ যে নারী কারো বিবাহ-বন্ধনে রয়েছে, তার বিবাহ অন্য কারো সঙ্গে

بِاَمۡوَالِكُمۡ مُّحۡصِنِيۡنَ غَيۡرَ مُسٰفِحِيۡنَ فَمَا اسۡتَمۡتَعۡتُمۡ بِهٖ مِنۡهُنَّ فَاٰتُوۡهُنَّ اُجُوۡرَهُنَّ فَرِيۡضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ

নারী তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের সম্পদের দ্বারা (তাদের) অন্বেষণ করবে- বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে, কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নয়[১]। অতএব সেই নারীদের

হতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত সে তালাকের মাধ্যমে বা স্বামীর মৃত্যুর কারণে বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্ত না হয়ে যায় এবং তালাকের ইদ্দত বা মৃত্যুর ইদ্দত পালন করে না নেয়, ততদিন কেউ তাকে বিয়ে করতে পারে না।

তবে যদি সধবা কোন নারী তোমাদের মালিকানাভুক্ত হয়ে যায়, তবে সে এই হুকুমের বহির্ভূত এবং সে তোমাদের জন্য হালাল হবে- যদিও তার স্বামী জীবিত থাকে এবং তাকে তালাক না দিয়ে থাকে। এর উপায় এই যে, কোন কাফের পুরুষ ও কাফের নারী পরস্পর বিবাহ-বন্ধনে আছে, এমন অবস্থায় মুসলমানরা দারুল হরবের উপর আক্রমণ করে ঐ নারীকে বন্দী করে দারুল ইসলামে নিয়ে এসেছে। এখন সেই নারী যে মুসলমানের অধিকারভুক্ত হবে, তার জন্য সে হালাল হবে, যদিও তার কাফের স্বামী দারুল হরবে জীবিত রয়েছে এবং তাকে তালাকও দেয়নি।

(كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ) : সকল মাহরাম মেয়েদের আলোচনা করে পরিশেষে তাকীদরূপে বলে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহর এসব নির্দেশের অনুসরণ তোমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

বি. দ্র. যে কাফের নারী দারুল হরব থেকে বন্দী হয়ে দারুল ইসলামে আসবে, তার হালাল হওয়ার জন্য এক হায়েয অতিবাহিত হওয়া জরুরী। এবং এও জরুরী যে, সেই নারী মুশরিক-মূর্তিপূজক হবে না, বরং কিতাবীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১. অর্থাৎ যে নারীদের সঙ্গে বিবাহ হারাম বলে উল্লেখ করা হল, তাদের ছাড়া আর সকলের সাথে বিবাহ হালাল, তবে চারটি শর্তসাপেক্ষে। প্রথম, (اَنۡ تَبۡتَغُوۡا)-তোমাদের পক্ষ থেকে তলব করতে হবে অর্থাৎ (স্বামী-স্ত্রী) উভয় দিক থেকে মুখের দ্বারা ইজাব ও কবুল হওয়া চাই। দ্বিতীয়, (بِاَمۡوَالِكُمۡ) মহর দিতে হবে।

তৃতীয়, (مُّحۡصِنِيۡنَ غَيۡرَ مُسٰفِحِيۡنَ) সেই নারীদেরকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং নিজ তত্ত্বাবধানে রাখা উদ্দেশ্য হবে- শুধু কাম চরিতার্থ করা ও যৌন ক্রিয়াকরণ উদ্দেশ্য হবে না, যেমন যিনার মধ্যে হয়ে থাকে। অর্থাৎ সর্বদার জন্য ঐ নারী তার স্ত্রী হয়ে যাবে, তালাক ছাড়া কখনো সম্পর্ক ছিন্ন হবে না। মোদ্দাকথা, বিবাহের কোনো সময় নির্ধারিত থাকবে না। এ দ্বারা (متعة) 'মুতা' বিবাহের অবৈধতা জানা গেল- এ সম্পর্কে আহলে হকের 'ইজমা' (তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) রয়েছে।

চতুর্থ শর্ত, যা অন্যান্য আয়াতে উল্লেখিত রয়েছে, (যেমন, সূরা মায়েদা, আয়াত ৫) গোপনভাবে বন্ধুত্ব যেন না হয়, অর্থাৎ কমপক্ষে দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন নারী এ ব্যাপারে সাক্ষী হবে। দুজন সাক্ষী ছাড়া ইজাব-কবুল হলে বিবাহ দুরুস্ত হবে না- ব্যভিচার বলে গণ্য হবে।

فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۲۴﴾

মধ্যে যাদের তোমরা সম্ভোগ করলে, তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মহর প্রদান কর[১]। আর (মহর) নির্ধারণ করার পর (কম-বেশি) যে পরিমাণের উপর তোমরা পরস্পর সম্মত হলে, তাতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়[২]।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ

২৫. আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীদের বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না, সে তোমাদের নিজেদের মালিকানাধীন মুসলমান দাসীদের থেকে কাউকে বিয়ে করবে[৩]। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে

---

১. অর্থাৎ স্বামী যে নারীকে বিবাহ করেছে এবং বিয়ের পর স্বল্প বা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার থেকে ফায়দা হাসিল করেছে, কমপক্ষে একবার হলেও সহবাস বা নির্জন-সাক্ষাৎ করেছে, তাকে পূর্ণ মহর দেওয়া ওয়াজিব। স্ত্রীর ক্ষমা ছাড়া নিষ্কৃতির কোনো উপায় নেই।

অবশ্য স্ত্রীর দ্বারা মোটেই উপকার হাসিল না হয়ে থাকলে এবং স্বামী তাকে (এ অবস্থায়) তালাক দিয়ে দিলে নির্ধারিত মহরের অর্ধেক দিতে হবে। আর যদি ফায়দা হাসিলের পূর্বেই স্ত্রীর দ্বারা এমন কিছু হয় যাতে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়, তবে স্বামী মহরের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তাকে কিছুই দিতে হবে না।

২. অর্থাৎ মহর নির্ধারিত হওয়ার পর স্ত্রী নিজ খুশীতে নির্ধারিত মহর থেকে কিছু কম নিলে অথবা স্বামী নির্ধারিত মহরের কিছু বেশি দিয়ে দিলে কোন দোষ নেই এবং এটা নাজায়েয নয়। হাঁ, পরস্পরের সম্মতিতে হওয়া চাই।

শেষে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল এবং সবরকম লাভ ও ক্ষতি উত্তমরূপে জানেন এবং যে নির্দেশ দেন তা আদ্যোপান্ত হেকমতপূর্ণ হয়ে থাকে। এর অনুসরণে তোমাদের জন্য ইহ-পরকালের কল্যান ও ফায়েদা এবং বিরোধিতায় কেবল ক্ষতি ও অমঙ্গল নিহিত।

৩. অর্থাৎ যার স্বাধীন নারী বিয়ে করার এবং তার মহর ও ব্যয়ভার বহন করার সামর্থ্য নেই, এমন ব্যক্তির জন্য কারো মুসলমান বাঁদীকে বিয়ে করে নেওয়া উত্তম। কারণ, দাসীর মহর কম হয়ে থাকে এবং ব্যয়ভারেও আসানী হয়। কারণ, মালিক তাকে নিজের কাছে রাখলে– যেমনটা সাধারণত হয়ে থাকে– স্বামী তার ব্যয়ভার থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে, আর স্বামীর কাছে দিয়ে দিলেও স্বাধীন মহিলার তুলনায় তার ব্যয়ভার অবশ্যই হালকা হবে।

বি. দ্র. যার স্বাধীন নারী বিবাহ করার সামর্থ্য আছে, তার জন্য দাসী বিয়ে করা ইমাম শাফেয়ী (রহ) প্রমুখের মতে হারাম, আর ইমাম আবু হানীফার রহ. মাযহাবে মাকরূহে

الْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَاَنْ تَصْبِرُوْا

সম্যক অবহিত। তোমরা পরস্পর এক ও অভিন্ন[১]। অতএব তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে তাদের বিয়ে কর এবং ন্যায়সংগতভাবে তাদেরকে তাদের মহর প্রদান কর- তারা হবে বিবাহ বন্ধনে আগমনকারিণী, কাম চরিতার্থকারিণী নয় এবং গোপন প্রণয়কারিণীও নয়[২]। আর যখন তাদের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করা হল, এর পর যদি তারা অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদের শাস্তি স্বাধীন নারীদের শাস্তির অর্ধেক[৩]। এ বিধান তার জন্য, তোমাদের মধ্যে যে কষ্টে পতিত হওয়ার আশঙ্কা করে। আর ধৈর্য ধরাই তোমাদের জন্য উত্তম। এবং

তানযীহি। তদ্রূপ, বিবাহ সহী হওয়ার জন্য অধিকাংশ ইমামের মতে দাসীকে মুসলমান হতে হবে, আর আবু হানীফার নিকট তা উত্তম, শর্ত নয়। হ্যাঁ, কারো বিবাহে আযাদ নারী থাকলে তার জন্য দাসী বিয়ে করা সকলের নিকট হারাম।

১. অর্থাৎ তোমাদের সকলের ঈমানের আসল অবস্থা আল্লাহ তাআলার জানা আছ, (এরূপ বিধানের ক্ষেত্রে) বাহ্যিক ঈমানই তোমাদের জন্য বিবেচ্য ও যথেষ্ট। কতক দাসীর ঈমান আল্লাহর নিকট কতক আযাদ নারীর ঈমানের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হতে পারে। সুতরাং ঈমানী অবস্থার দিক থেকে দাসী বিয়ে করাকে দোষের মনে করা ও তাকে অপছন্দ করা উচিত নয়। তাছাড়া তোমরা সকলে পরস্পর এক, একই উৎস থেকে জন্ম লাভ করেছ, একই দীন-ধর্মের অন্তর্ভুক্ত আছ। এর পরও দাসী বিবাহ করাকে দোষণীয় ও লজ্জাকর কেন মনে কর?

এই আয়াতাংশে দাসী বিয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং তার প্রতি ঘৃণা দূর করা উদ্দেশ্য।

২. অর্থাৎ তোমরা দাসীদের বিবাহ করবে তাদের মালিকের অনুমতি নিয়ে, এবং দস্তুর মত তাদের মহর দিয়ে দেবে। আর বিবাহ তখন হবে, যখন তারা খুশী মনে বিবাহ-বন্ধনে আসবে, তারা কাম চরিতার্থকারিণী ও গোপন প্রণয়কারিণী যেন অবশ্যই না হয়, অর্থাৎ ব্যভিচার উদ্দেশ্য না হয়।

৩. অর্থাৎ যে আযাদ পুরুষ বা নারী বিয়ের উপকার লাভ করেছে অর্থাৎ সহবাস করেছে, তার পর ব্যভিচার করল, তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। আর যদি বিয়ের পূর্বে যিনা করে, তবে তাকে একশত বেত্রাঘাত করার বিধান রয়েছে। আর দাসদাসীর বেলায় বিবাহের পূর্বে ও পরে- সর্বাবস্থায় শুধু পঞ্চাশ বেত, বেশি নয়।

আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٥﴾

[রুকূ - ৫]

২৬. আল্লাহ চান তোমাদের জন্য (হালাল-হারামের বিধান) পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে, তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথে পরিচালিত করতে ও তোমাদের ক্ষমা করতে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়[২]।

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦﴾

২৭. এবং আল্লাহ চান তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দিতে। আর যারা কামনা-বাসনার পিছনে পড়ে থাকে তারা চায় যে, তোমরা (সুপথ

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ

---

১. অর্থাৎ দাসী বিয়ে করার বৈধতা ও উৎকৃষ্টতা তারই জন্য, তোমাদের মধ্যে যে আশঙ্কা করে কষ্টের অর্থাৎ যিনায় লিপ্ত হওয়ার। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধরে থাক এবং বাঁদীদের বিয়ে না কর, তবে তোমাদের পক্ষে খুবই ভাল। কেননা, আযাদ নারীর গর্ভজাত সন্তানও আযাদ হবে। হাঁ, ধৈর্য ধারণে ও আত্মসংযমে সমর্থ হবে কি না, এ ব্যাপারে সন্দেহ হলে উত্তম হল– কারো দাসীকে বিবাহ করে নেওয়া। আর আল্লাহ তাআলা ধৈর্য ধারণকারীদের প্রতি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

২. অর্থাৎ এই সব আহকাম প্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, হালাল ও হারাম তোমাদের যেন জানা হয়ে যায় এবং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রমুখ পূর্ববর্তী নবীগণের রাস্তা তোমাদের ভাগ্যে জোটে। এও উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করতে চান।

আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল ও সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত এবং তাঁর প্রত্যেক হুকুমে ও প্রত্যেক ব্যবস্থায় হেকমত রয়েছে। অতএব তোমরা যদি তাঁর হুকুমের আনুগত্য না কর, তবে হেদায়েত থেকেও মাহরূম থাকবে এবং পূর্ববর্তীদেরও বিরোধিতা হবে এবং আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

আলোচ্য আয়াতের পূর্বের আয়াতগুলিতে– ব্যভিচার ও পুংমৈথুনের অবৈধতা, এহেন পাপ থেকে তওবা, নারীদের সম্পর্কে কতিপয় আহকাম, যে নারীদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ তাদের উল্লেখ, বিবাহের মহর এবং অন্য শর্তাবলির আলোচনা, ব্যভিচার থেকে নিষেধাজ্ঞা ও এর শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা ছিল। বিভিন্ন কারণে এই বিধানাবলির আনুগত্য করা লোকদের জন্য কঠিন ছিল। এ জন্য বর্তমান আয়াত ও পরবর্তী দুটি আয়াতে এই হুকুমগুলির অনুসরণের বিষয়ে তাকীদ ও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا

থেকে) বহু দূরে সরে যাও[১]।

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا

২৮. আল্লাহ তোমাদের ভার হালকা করতে চান। আর মানুষকে দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে[২]।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْۤا

২৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরে একে অন্যের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে কোন ব্যবসা-বানিজ্য হলে (ভিন্ন কথা)[৩]। আর তোমরা পরস্পর খুনাখুনিও করো না। নিশ্চয় আল্লাহ

---

১. অর্থাৎ এই যে উল্লিখিত বিধি-বিধান, এর উদ্দেশ্য তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করা। আর যারা স্বীয় রিপুর বশীভূত, তারা তো এই চায় যে, তোমরা সঠিক পথ থেকে দূরে গিয়ে পতিত হও অর্থাৎ ওদের মতই তোমরাও স্বীয় রিপুর অনুসরণ কর এবং পথভ্রষ্ট হয়ে যাও। অতএব যা কিছু কর, বুঝে কর।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ভাল করে জানা আছে, সে স্বীয় রিপু ও ভোগের সামগ্রী থেকে কতটুকু ধৈর্য ধারণ করতে পারে? তাই তিনি প্রত্যেক হুকুমে আসানীরও ব্যবস্থা রেখেছেন। মানুষের জন্য উপকারী হলেই তা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, চাই সহজ হোক বা কঠিন– বিষয়টা এমন নয়। যেমন: নারী ও রিপু, এ থেকে সংযমী হওয়া মানুষের জন্য খুব কঠিন ছিল, তাই তার কাম চরিতার্থ করে নেওয়ার জন্য আল্লাহ জায়েয পদ্ধতি (বিবাহ) বাতলিয়ে দিয়েছেন, যাতে সে নিজের কামনা হাসিল করতে পারে। কামভাব চরিতার্থকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করে দেননি। আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহমতে শরী'য়তে কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি যে, কাউকে হালাল ছেড়ে হারামের দিকে দৌড়াতে হবে।

আয়াতসমূহের সারকথা এই যে, নিজেকে রিপুর তাড়না থেকে রক্ষা করা এবং নারীদের সাথে সম্পর্কিত উল্লিখিত বিধি-বিধানের অনুসারী হওয়া মোটেই কঠিন বিষয় নয়। আর এসবের অনুসরণ নিতান্ত জরুরী ও আদ্যোপান্ত উপকারী বৈ আর কিছু নয়।

৩. অর্থাৎ কারো জন্য কারো ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা– যেমন মিথ্যা বলে, প্রতারণা করে, বা চুরি করে, মোটেই জায়েয নয়। হাঁ, যদি তোমরা পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসা অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয় কর, তবে তার মাধ্যমে লব্ধ মাল খাওয়ায় কোন দোষ নেই। সারকথা, মাল পরিহার করা তো তোমাদের জন্য কঠিন, কিন্তু তা জায়েয উপায়ে ভোগ করা নিষিদ্ধ নয়।

أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

তোমাদের প্রতি অতি মেহেরবান[১]।

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

৩০. আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন ও জুলুম করে এ কাজ করবে, শীঘ্রই আমি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করব। আর এ আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ[২]।

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

৩১. তোমাদের যা কিছু নিষেধ করা হয় তার মধ্যে যেগুলো গুরুতর, তোমরা যদি তা পরিহার কর, তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট গোনাহ ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদের দাখিল করব সম্মানজনক স্থানে[৩]।

---

১. অর্থাৎ তোমরা নিজেরা একে অন্যকে হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত সদয়। এজন্যই বিনা কারণে কারো ধন বা প্রাণ নষ্ট করতে তিনি নিষেধ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি এমন বিধান পাঠিয়েছেন, যার মধ্যে তোমাদের জন্য পুরোপুরি মঙ্গল ও কল্যাণ রয়েছে।

২. অর্থাৎ যে কেউ জুলুম ও সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত না হবে, বরং অন্যায়ভাবে অন্যদের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করবে অথবা জুলুমপূর্বক কাউকে হত্যা করে ফেলবে, তার ঠিকানা হচ্ছে দোযখ। আর এমন জালেমদের অগ্নিতে নিক্ষেপ করা আল্লাহ তাআলার পক্ষে কঠিন নয় বরং অতি সহজ। সুতরাং কেউ যেন মনে না করে যে, আমরা তো মুসলমান, দোযখে কেমন করে যেতে পারি? আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন মালিক ও সর্বক্ষমতার অধিকারী, ন্যায় ও সুবিচার করা থেকে তাঁকে কিসে বাধা দিতে পারে?

৩. **পূর্বা-পর সম্পর্ক ও আয়াতের মর্ম**

পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, কেউ অন্যায়ভাবে কারো জান বা মালের ক্ষতি করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। এ থেকে জানা গেল, আল্লাহ তাআলার নাফরমানী বান্দার জন্য শাস্তির কারণ। এখন বর্তমান আয়াতে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং তা থেকে বিরত থাকলে ক্ষমার ও বেহেশতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হচ্ছে, যাতে প্রত্যেক মানুষ গোনাহ পরিহার করতে সচেষ্ট হয়।

আয়াতের সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি কবীরা গোনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকল, যেমন কারো ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা বা চুরি করা অথবা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা পরিহার করল, তাহলে তার ঐ সমস্ত (সংশ্লিষ্ট) সগীরা গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে, যা চুরি ও হত্যা সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

আয়াতটি সম্পর্কে মু'তাযিলাদের ভুল ব্যাখ্যা ও তার জবাব

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় আলোচনাসাপেক্ষ। তবে এসবের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আয়াতের প্রকৃত ও অগ্রগণ্য অর্থ জানতে পারা, যাতে সকল বিষয় বোঝা সহজ হয়। মু'তাযিলা ও

তাদের অনুসারীরা ভাসাভাসা দৃষ্টিতে এই আয়াতের যে অর্থ বুঝেছে তা হচ্ছে, কবীরা গোনাহসমূহ থেকে বাঁচতে থাকলে অর্থাৎ সেসবের একটিও না করলে সগীরা গোনাহ যতই হোক না কেন, তা অবশ্যই ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যদি সগীরা গোনাসমূহের সাথে কবীরা গোনাহ ঘটনাক্রমে একটি বা দু'টিও করা হয়ে যায়, তবে আর ক্ষমা সম্ভব নয়; বরং (ছোট-বড়) সবগুলোর শাস্তিই জরুরী হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলেন যে, উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা করারও ইখতিয়ার আছে, আবার পাকড়াও করা ও শাস্তি প্রদানেরও ইখতিয়ার আছে। তাঁর উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। প্রথম ক্ষেত্রে ক্ষমার অবশ্যম্ভাবী হওয়া এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পাকড়াওকে অনিবার্য মনে করা মু'তাযিলাদের দুর্বুদ্ধি ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

আর আয়াতখানির জাহেরী শব্দাবলি ও বিষয়বস্তু স্থূলদৃষ্টিতে দেখলে মু'তাযিলাদের মাযহাব অগ্রাধিকারযোগ্য মনে হয়। তবে এর খণ্ডনে আহলে সুন্নতের বিজ্ঞ আলেমদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে। কেউ বলেছেন, (انتفاء المشروط من انتفاء الشرط) 'শর্তের অবর্তমানে শর্তাধীন বিষয়ের অবর্তমান হওয়া মোটেই জরুরী নয়। (সুতরাং কবীরা গোনাহ যদি কেউ করে ফেলে তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই শাস্তি দেবেন, তাকে ক্ষমা করতেই পারেন না- এটা জরুরী নয়। -অনুবাদক)

কেউ বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত 'কাবায়ের' শব্দ দ্বারা সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ অর্থাৎ শিরক উদ্দেশ্য। তবে কবীরা শব্দের বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে শিরকের বিবিধ শাখা-প্রশাখার দিকে লক্ষ্য করে।

উৎকৃষ্ট জবাব ও আয়াতের অগ্রগণ্য মর্ম

আরো জবাবও দেওয়া হয়েছে। এবং আয়াতটিকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা এসব বিষয় বাদ দিয়ে এই আয়াতটির সেই উত্তম অর্থ বয়ান করে দিচ্ছি, যা কুরআন-হাদীস, সুস্থ যুক্তি-বুদ্ধি, শরীয়তের মৌলিক নিয়ম-নীতি ও বিজ্ঞ মনীষীদের কথার দ্বারা সমর্থিত। সেই সংগে এর দ্বারা মু'তাযিলাদের কথার অসারতা এবং তাদের চিন্তা-ভাবনা ও বুঝ-সমঝের স্থূলতা প্রমাণিত হয়।

এস্থলে এ কথা পরিষ্কার যে, বর্তমান আয়াত-اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ এবং সূরা নজমের আয়াত (৩২) – اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ (যারা বড় বড় গোনাহ ও নির্লজ্জতার কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকে, তবে সামান্য বিচ্যুতির ব্যাপার ভিন্ন')- এই উভয় আয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই, শুধু শব্দাবলিতে একটু পার্থক্য। অতএব এক আয়াতের যে অর্থ হবে, দ্বিতীয় আয়াতেরও সেই অর্থই গ্রহণ করা হবে।

আয়াতসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হাদীস ও তার অর্থ

সূরা নজমের আয়াত সম্বন্ধে উম্মতের শ্রেষ্ঠ আলেম ও কুরআন বিশারদ হযরত ইবনে আব্বাস রা. যে আলো দান করেছেন, তা বুখারী শরীফসহ অপরাপর হাদীসগ্রন্থে পরিষ্কারভাবে বর্তমান রয়েছে-

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ما رأيت شيئا أشبه باللمم مِـمّا قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان المنطق ، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه .

('ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু হোরায়রা রা. একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা (اللمم) 'লামাম' এর অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ও উপযোগী। এর মর্ম উদ্ঘাটন করার জন্য হাদীসটির চেয়ে উত্তম আর কিছু আমি পাইনি। আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন– হুযূর সাল্লাইহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ আদম সন্তানের মধ্যে যার জন্য যিনার যে অংশ লিখে রেখেছেন, সে তা অবশ্যই করবে– চোখের যিনা দেখা; জিহ্বার যিনা কথা; নফস কামনা-বাসনা করে এবং যৌনাঙ্গ তা সত্যে পরিণত করে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।' (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৬১২; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৬৫৭)

(তো, যৌনাঙ্গের কাজ (ব্যভিচার) হচ্ছে কবীরা গোনাহ ও অশ্লীল কাজ। আর চোখের দেখা, নফসের কামনা-বাসনা ইত্যাদি হল 'লামাম' তথা লঘু পাপ। –অনুবাদক)

যার সুস্থ বুঝ-বুদ্ধি আছে, তার বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, এই হাদীসখানি আলোচিত আয়াত দু'টির অর্থের উপর পরিপূর্ণ আলোকপাত করেছে এবং কুরআনের সুপণ্ডিত হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর ভাষ্য অনুযায়ী (لَمَم) 'লামাম' (তদ্রূপ سيآت) এর অর্থ-মর্ম বোঝার জন্য এর থেকে উত্তম আর কিছু পাওয়া যায়নি।

অতএব এই অর্থের মোকাবেলায় আলোচ্য আয়াতের অন্য কোন ব্যাখ্যা কী করে অগ্রাধিকারযোগ্য ও পছন্দনীয় হতে পারে? বিশেষত মু'তাযিলাদের আজে-বাজে কথা কেমন করে প্রণিধানযোগ্য হতে পারে? আর সত্যিই উল্লিখিত হাদীসের মর্ম এবং হযরত ইবনে আব্বাস রা. তা থেকে যে বিষয় বের করেছেন, তা এমনই চমৎকার ও গ্রহণযোগ্য তাহকীক যে, এ দ্বারা উভয় আয়াতের বিষয়বস্তু একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। এর পর মু'তাযিলাদের আজে-বাজে কথার কোনো অবকাশ থাকে না। ফলে সত্যপন্থীদের পক্ষে তার খণ্ডনেরও প্রয়োজন থাকে না। তদুপরি এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট মতভেদেরও চমৎকার সমাপ্তি হয়ে যায়।

আয়াতের অর্থ ও মর্ম স্পষ্টকরণের উদ্দেশ্যে আমরা উল্লিখিত হাদীসখানির সারমর্ম বলে দিচ্ছি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, সূরা নজ্‌মের আয়াতে যে 'লামাম' শব্দ এসেছে এবং যার ক্ষমার ওয়াদা করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আবু হুরায়রা রা.-এর হাদীস থেকে শ্রেয় কোন কিছু আমাদের জানা নেই। আর তার সারাসার এই যে, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

আল্লাহ তা'আলা আদম-সন্তানের জন্য যিনার যে অংশ অবধারিত করে দিয়েছেন, তা অবশ্যই তার ভাগ্যে আসবে। তো, ব্যভিচার-কর্মে চোখের অংশ হল দেখা এবং মুখের অংশ হচ্ছে তার সাথে সেইসব কথা বলা, যেগুলো ব্যভিচার-কর্মের জন্য ভূমিকা ও

উপকরণস্বরূপ। আর নফসের অংশ হচ্ছে যিনার কামনা-বাসনা। কিন্তু ব্যভিচার-কর্মের বাস্তবায়ন ও অবাস্তবায়ন আসলে যৌনাঙ্গের উপর নির্ভরশীল।

অর্থাৎ যদি যৌনাঙ্গ দ্বারা যিনা সাধিত হয়, তবে চোখ, মুখ, অন্তর– সবার ব্যভিচারী হওয়া নিশ্চিত হয়ে গেল। আর যদি সমস্ত উপকরণ ও মাধ্যম হাসিল হওয়া সত্ত্বেও শুধু যৌনাঙ্গের কাজ না করে, বরং এখানে এসে আসল যিনা থেকে তওবা ও আত্মরক্ষা করে ফেলে– তবে এখন যিনার সমস্ত উপকরণ, যেগুলো যিনার ভূমিকাস্বরূপ ছিল বলে গোনাহ গণ্য করা হয়েছিল, তা সবই ক্ষমাযোগ্য হয়ে গেল। কেননা, উক্ত কাজগুলো যিনার উপকরণ হত বলে গোনাহতে দাখিল হয়েছিল। যখন সেগুলো গোনাহর মাধ্যম রইল না, তখন যিনা থেকে আত্মরক্ষার কারণে সেসব যেন বিলীন হয়ে গেল, সুতরাং সেগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

অতএব আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত এই হাদীস শুনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বুঝে নিলেন যে, 'লামাম' হচ্ছে সেসব বিষয়, যেগুলো মূলত গোনাহ হত না, কিন্তু গোনাহের কারণ হয় বলে সেগুলোকে গোনাহ গণ্য করা হয়েছে। অতএব সূরা নজমের আয়াতের অর্থ এই হবে যে, সেই লোকেরা বড় বড় ও প্রকাশ্য গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে বটে, তবে তাদের দ্বারা 'লামাম' সংঘটিত হয়ে যায়; কিন্তু বড় ও প্রকৃত গোনাহ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তারা তাদের ত্রুটিসমূহ থেকে তওবা ও আত্মরক্ষা করে ফেলে।

হাদীসটির আলোকে আয়াত দুটির সারমর্ম

ইবনে আব্বাস রা. যেমন আবু হুরায়রা রা. এর হাদীস থেকে সূরা নজ্‌মের আয়াতের অর্থ বুঝে নিলেন, আমাদেরও উচিত ইবনে আব্বাস রা.-এর ইরশাদ অনুযায়ী সূরা নিসার আলোচ্য আয়াতের অর্থও অনায়াসে বুঝে নেওয়া। এরপর আর আয়াতের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য সগীরা-কবীরা গোনাহর বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন থাকবে না এবং মুতাযিলাদের যুক্তি-প্রমাণের উত্তর প্রদানের ফিকিরও করতে হবে না। তাছাড়া সগীরা গোনাহসমূহ মুছে ফেলার কারণ এবং তা থেকে বাঁচার অর্থও স্পষ্ট হবে। তদুপরি আরো ছোট খাট বিষয়েরও সমাধান হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী উল্লিখিত আয়াত দু'টির সার-সংক্ষেপ এই দাঁড়াল–

যারা সেই সব কবীরা গোনাহ থেকে বিরত থাকবে এবং আত্মরক্ষা করতে থাকবে, যেগুলো গোনাহসমূহের ক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্য ও প্রধান বিষয় বলে পরিগণিত– এই বিরত থাকা ও আত্মরক্ষার কারণে তাদের সেই মন্দ কাজগুলো মাফ করে দেওয়া হবে, যেগুলো তারা মুখ্য ও বড় গোনাহ সম্পাদনের লালসায় করেছিল। যেমন এক ব্যক্তি মসজিদে গেল চুরি করার উদ্দেশ্যে, কিন্তু সেখানে গিয়ে চুরির ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তার সতর্ক হওয়ার সৌভাগ্য হলো এবং চুরি থেকে তওবা-আত্মরক্ষা করল। অথবা কোন নারীর কাছে যিনার উদ্দেশ্যে গেল, কিন্তু ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেল ও তা থেকে বিরত থাকল– তাহলে তার সেসব ছগীরা গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে যা চুরি বা যিনা করার উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয়েছিল।

৩২. তোমরা এমন জিনিসের অভিলাষ করো না, যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন[১]। পুরুষদের জন্য রয়েছে তাদের উপার্জনের অংশ এবং নারীদের জন্য রয়েছে তাদের উপার্জনের অংশ। আর তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর দয়া প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত[২]।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِیْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِیْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ﴿۳۲﴾

৩৩. মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজন যে সম্পত্তি রেখে যায়, তার প্রতিটির জন্য আমি ওয়ারিস নির্ধারণ করে দিয়েছি। আর যাদের

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِیَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَالَّذِیْنَ عَقَدَتْ

যিনার আনুষঙ্গিক ছোট ছোট গোনাহ অন্য কোন কবীরা গোনাহ– যেমন মদ্যপান– না করার কারণে মাফ হয়ে যাবে, এমন নয়।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যে বিষয়ে কাউকে অপরের উপর আভিজাত্য, শ্রেষ্ঠত্ব, বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন, তোমরা তার লোভ-লালসা করো না। কেননা, এটা কারো ব্যক্তিগত জান-মালে অকারণে হস্তক্ষেপ করার মতই, আর এই হস্তক্ষেপের অবৈধতা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এর দ্বারা পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।

কয়েকজন নারী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করেছিলেন যে, কী কারণে আল্লাহ তাআলা সর্বত্র পুরুষদেরই সম্বোধন করেন? এবং মীরাছের মধ্যে পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ অংশ দেওয়া হয় কেন? বর্তমান আয়াতে এ সব কিছুর উত্তর রয়েছে। (জামে তিরমিযী, হাদীস ৩০২২)

২. অর্থাৎ পুরুষ ও নারী যে যেমন কাজ করে, তার জন্য তেমন অংশ নির্ধারিত রয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের পূর্ণ ফল লাভ করে থাকে, তাতে কিছুমাত্র কম করা হয় না, যাতে কেউ কোনো অভিযোগের সুযোগ না পায়। আর আল্লাহ স্বীয় হেকমত ও রহমত অনুযায়ী কাউকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করলে অন্য কারো পক্ষ থেকে লোভ-লালসা ও অভিযোগ করা নিতান্তই অসমীচীন। অবশ্য নিজ আমলের বিনিময়ে অধিকতর ছওয়াব ও অনুগ্রহ চাওয়া সঙ্গত ও উত্তম, এতে কোনো দোষ নেই। অতএব এখন যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্বের অন্বেষক, তার উচিত আমলের দ্বারা অন্বেষণ করা, হিংসা ও লোভের দ্বারা নয়।

আর আল্লাহ তাআলার প্রত্যেক বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রয়েছে– প্রত্যেকের মর্যাদা ও অধিকার সম্বন্ধে তিনি বেশ জানেন এবং প্রত্যেকের সঙ্গে তার মর্যাদানুপাতিক ব্যবহার করেন। সুতরাং যাকে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন, তা সরাসরি তাঁর ইলম ও হেকমতভিত্তিক, তাতে স্বীয় অজ্ঞতাহেতু দ্বিধা-আপত্তি করা উচিত নয়।

أَيۡمَٰنُكُمۡ فَـَٔاتُوهُمۡ نَصِيبَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا ۝٣٣

সঙ্গে তোমাদের চুক্তি হয়েছে, তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু প্রত্যক্ষকারী[১]।

[রুকূ - ৬]

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ

৩৪. পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল; কারণ, আল্লাহ তাদের একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন; এবং এ কারণেও যে, পুরুষরা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে[২]।

---

১. অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে আমি সেই সম্পদের ওয়ারিস নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন রেখে মারা যায়, আমি কাউকে তা থেকে বঞ্চিত রাখিনি। আর যাদের সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার হয়েছে, তাদের অংশ তাদের অবশ্যই দিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলার সকল বিষয়ের ইলম রয়েছে, ওয়ারিসদের কার কী অংশ হওয়া উচিত এবং যাদের সঙ্গে অঙ্গীকার হয়েছে তাদের কী পাওয়া উচিত এবং এই আহকাম কে মান্য করে, আর কে অমান্য করে– তা সবই তিনি জানেন।

বি. দ্র. অধিকাংশ সাহাবী হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একা একা মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাদের বংশ ও আত্মীয়-স্বজন সকলেই কাফের রয়ে গিয়েছিল। সেই সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুজন করে মুসলমানকে পরস্পর ভাই-ভাই করে দিয়েছিলেন– এ দুজনই পরস্পর একে অন্যের ওয়ারিস হত। যখন তাদের আত্মীয়রাও মুসলমান হয়ে গেল, তখন বর্তমান আয়াত অবতীর্ণ হয়ে ঘোষণা দিল যে, উত্তরাধিকার সম্পত্তি আত্মীয়-স্বজনদেরই প্রাপ্য, অতএব তাতে মুখে ডাকা ভাইদের (অর্থাৎ যারা বংশসূত্রে ভাই নয়) কোন অংশ নেই। তবে জীবনে তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার অক্ষুণ্ন রাখবে এবং মৃত্যুর সময় তাদের জন্য কিছু ওসিয়ত করে গেলে খুবই ভাল। (সহীহ বুখারী, হাদীস ২২৯২)

২. পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শরী'য়তে পুরুষ ও নারীদের অধিকারের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে নারীদের অভিযোগ করার সুযোগ নেই।

এখন বর্তমান আয়াতে পুরুষ ও নারীর মর্যাদার কথা বলা হচ্ছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীর মর্যাদা থেকে অগ্রবর্তী। সুতরাং এই মর্যাদার পার্থক্যের কারণে আহকামের মধ্যে যে পার্থক্য হবে তা একান্তই হেকমতপূর্ণ ও বাস্তবধর্মী। এতে নারী ও পুরুষ হেকমতের নিয়মানুসারে কিছুতেই সমান হতে পারে না। অতএব মেয়েদের পক্ষে এর প্রত্যাশা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

সারকথা এই যে, আল্লাহ তাআলা নারীদের উপর পুরুষদের শাসক ও অভিভাবক বানিয়েছেন– দুটি কারণে। প্রধান ও আল্লাহ প্রদত্ত কারণ তো এই যে, তিনি জন্মগতভাবেই কতককে কতকের উপর অর্থাৎ নারীদের উপর পুরুষদের, ইলম ও আমলে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর এ দুটি জিনিসই সকল গুণের ভিত্তি। দ্বিতীয় কারণ, যা মানবার্জিত, তা এই

قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۚ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۝

অতএব সতী নারীরা (স্বামীর) অনুগত, (তাদের) অবর্তমানে আল্লাহর হেফাজতে হেফাজতকারিণী হয়[১]। আর তোমরা যে স্ত্রীদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের বোঝাও, তাদের শয়ন-শয্যা পৃথক করে দাও এবং তাদের প্রহার কর[২]। এতে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের বিরুদ্ধে আর কোন পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত, মহান[৩]।

যে, পুরুষরা নারীদের জন্য স্বীয় ধনসম্পদ ব্যয় করে, মহর ও খোরপোষ ইত্যাদি সকল প্রয়োজনের দায়িত্ব বহন করে। অতএব, নারীদের কর্তব্য পুরুষদের বাধ্য থাকা।

বি. দ্র. এক সাহাবী নারী স্বামীর খুবই অবাধ্যতা করলে স্বামী তাকে চপেটাঘাত করেন। স্ত্রী গিয়ে নিজ পিতার কাছে নালিশ করলেন। পিতা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে ঘটনা বললেন। তিনি মহিলাকে স্বামী থেকে প্রতিশোধ নিতে বললেন। এমন সময় এই আয়াত নাযিল হল। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি চেয়েছিলাম কিছু, আর আল্লাহ তাআলা চাইলেন অন্য কিছু। আর আল্লাহ যা চাইলেন তাই উত্তম। (তাফসীরে তাবারী : ৬/৬৮৮-৬৮৯; তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম, রেওয়ায়েত : ৫২৪৬)

১. অর্থাৎ যে নারীরা পুণ্যবতী, তারা স্বামীদের আনুগত্য করে থাকে এবং আল্লাহর হুকুম অনুসারে স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী নিজ সত্তার ও স্বামীর ধন-সম্পদের হেফাজত করে থাকে এবং স্বামীর সম্পদের মধ্যে কোন রকম খেয়ানত করে না।

২. অর্থাৎ কোন স্ত্রী যদি স্বামীর সঙ্গে অসদাচরণ করে, তবে প্রথমে স্বামী তাকে নসীহত করবে ও বোঝাবে। যদি সে না মানে তবে দ্বিতীয় ধাপে পৃথক শয়ন করবে, তবে একই ঘরে। এতেও যদি না শোনে তবে শেষ পর্যায়ে তাকে প্রহারও করবে, কিন্তু এমনভাবে নয় যে, গায়ে দাগ পড়ে যায় বা হাড় ভেঙ্গে যায়।

প্রত্যেক অন্যায়ের মাত্রা আছে, সেই অনুসারেই শিক্ষা ও শাস্তির অনুমতি রয়েছে, যার তিনটি স্তর পর্যায়ক্রমে আয়াতের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে এবং প্রহার হচ্ছে সর্বশেষ পর্যায়। সুতরাং সামান্য দোষে মারতে নেই। হাঁ, অন্যায় বেশি হলে মারতে দোষ নেই। যে পরিমাণ সমীচীন, সে পরিমাণ মারবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে হাড় না ভাঙ্গে এবং আঘাতে দাগ বসে না যায়।

৩. অর্থাৎ স্ত্রীরা যদি উপদেশ প্রদান বা পৃথক শয়ন বা প্রহারের পর অসদাচরণ ও অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসে এবং বাহ্যত অনুগত হয়ে যায়, তবে তোমরাও ক্ষান্ত হয়ে যাও। তাদের

৩৫. আর যদি তোমরা তাদের (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পক্ষ থেকে একজন সালিস ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন সালিস নিযুক্ত কর[১]। এ দুজন যদি আপোষ-মীমাংসার ইচ্ছা করে, তবে আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলন সৃষ্টি করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত[২]।

وَاِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَیۡنِهِمَا فَابۡعَثُوۡا حَكَمًا مِّنۡ اَهۡلِهٖ وَحَكَمًا مِّنۡ اَهۡلِهَا ۚ اِنۡ یُّرِیۡدَاۤ اِصۡلَاحًا یُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَیۡنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِیۡمًا خَبِیۡرًا ﴿۳۵﴾

৩৬. তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, কোন কিছুকে তার শরীক করো না[৩] এবং সদ্ব্যবহার কর মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজন, এতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, পার্শ্বচর (তথা সঙ্গী-সাথী), মুসাফির ও তাদের সঙ্গে যারা তোমাদের

وَاعۡبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشۡرِكُوۡا بِهٖ شَیۡـًٔا وَّبِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا وَّبِذِی الۡقُرۡبٰی وَالۡیَتٰمٰی وَالۡمَسٰكِیۡنِ وَالۡجَارِ ذِی الۡقُرۡبٰی وَالۡجَارِ الۡجُنُبِ وَالصَّاحِبِ

দোষ-ক্রটির অন্বেষণে লেগে থেকো না। অযথা তাদের অভিযুক্ত করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সবার চেয়ে প্রবল ও শক্তিশালী এবং সকলের প্রভু ও বিচারক। সুতরাং তাদের ব্যাপারে কুধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু করো না এবং সামান্য অপরাধে চরম শাস্তি দিয়ো না। উল্লেখ্য, প্রহার হচ্ছে শাস্তির চরম স্তর।

১. মুসলিমগণ! তোমাদের যদি আশঙ্কা হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ ও জিদ রয়েছে, যার কারণে তারা নিজেদের বিবাদ নিজেরা মীমাংসা করতে পারবে না, তবে তোমাদের উচিত পুরুষের আত্মীয়-স্বজন থেকে একজন সালিস ও স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করে মীমাংসার উদ্দেশ্যে স্বামী-স্ত্রীর নিকট পাঠানো। কারণ, আত্মীয়বর্গ এদের হাল-অবস্থাও অধিকতর জানবে এবং তাদের থেকে হিতাকাঙ্ক্ষার আশাও বেশি করা যায়। সালিস দুজন হাল-অবস্থার খোঁজ-খবর নেবে এবং যার যতটুকু অন্যায় দেখবে, তাকে সে অনুযায়ী বুঝিয়ে দুজনকে পরস্পর মিলিয়ে দেবে।

২. অর্থাৎ উভয় সালিস যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিটমাট করে দেওয়ার ইচ্ছা রাখে, তবে আল্লাহ তাআলা তাদের সদুদ্দেশ্য ও সুচেষ্টার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল-মহব্বত পয়দা করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সকল বিষয়ে জ্ঞাত ও সর্বাধিক অবহিত। বিবাদ দূর করার ও হৃদ্যতা হাসিল হওয়ার উপায়-উপকরণ সবই তাঁর বেশ জানা আছে। এ জন্য স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ নিরসনে কোনই অসুবিধা হবে না ইনশাআল্লাহ।

৩. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে এবং পরকালের ছওয়াবের আশা করে ইবাদত ও নেক আমল কর । গর্ব ও রিয়ার (লোক-দেখানোর) উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করাও শিরক, যদিও নিম্ন পর্যায়ের।

بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۟

মালিকানাধীন। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না যারা দাম্ভিক, আত্মগর্বী[১]–

اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۟

৩৭. যারা কৃপণতা করে, মানুষকে কৃপণতার শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদের যা দান করেছেন তা গোপন করে। আর আমি কাফেরদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি[২]–

---

১. এতীম, নারী, ওয়ারিস ও স্বামী-স্ত্রী– এদের হক অর্থাৎ প্রাপ্যসমূহ এবং এদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের বিষয় বয়ান করে এখন ইরশাদ হচ্ছে যে, সম্পর্ক অনুযায়ী ও প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেকের হক পর্যায়ক্রমে আদায় কর। সকলের আগে আল্লাহর হক, তারপর মাতাপিতার, অতঃপর পর্যায়ক্রমে সকল সম্পর্কধারী ও অভাবীদের।

আর নিকট ও দূর প্রতিবেশী বলতে বংশসূত্রে নিকটবর্তিতা ও দূরবর্তিতা, অথবা স্থান হিসাবে নিকটবর্তিতা ও দূরবর্তিতা উদ্দেশ্য। প্রথম অবস্থায় অর্থ হবে– আত্মীয় প্রতিবেশীর হক অনাত্মীয় প্রতিবেশীর চেয়ে বেশি। দ্বিতীয় অবস্থায় উদ্দেশ্য হবে– নিকট প্রতিবেশীর হক দূর প্রতিবেশী অর্থাৎ যে দূরে থাকে তার থেকে বেশি। আর পার্শ্বচর বলতে সফরসঙ্গী, সহকর্মী, একই মনিবের দুই ভৃত্য, একই উস্তাদের দুই ছাত্র এবং বন্ধু, শাগরেদ, মুরীদ প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। আর মুসাফিরের মধ্যে মেহমান ও অমেহমান উভয়ই শামিল রয়েছে। আর মালিকানাধীন– এর মধ্যে দাসদাসী ছাড়াও পশু-পক্ষীও অন্তর্ভুক্ত।

ان الله لا يحب ... —শেষে বলে দেওয়া হল যে, যার মেযাজে গর্ব ও আত্মগরিমা থাকে, যার কারণে কাউকেই নিজের সমান মনে না করে স্বীয় ধনের উপর অহংকার করে, সে এসব হক আদায় করে না। অতএব তোমরা এমন ব্যক্তি থেকে পৃথক ও দূরে থাক।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আত্মগর্বী ও অহংকারীদের ভালবাসেন না, যারা কৃপণতা করে এবং স্বীয় ধন-সম্পদ ও আল্লাহ-প্রদত্ত ইলমকে মানুষের নিকট থেকে লুকিয়ে রাখে; কাউকে উপকৃত করে না। অধিকন্তু কথায় ও কাজে অন্যদেরও কৃপণতার উৎসাহ দিয়ে থাকে। এই কাফেরদের জন্য আমি অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

বি. দ্র. বর্তমান আয়াতখানি ইহুদীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল, যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ব্যাপারে নিজেরাও কৃপণতা করত এবং মুসলমানদেরও খরচ করতে বাধা দিতে চাইত। আর তাওরাত কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে গুণাবলির উল্লেখ ছিল এবং ইসলামের সত্যতার যে নিদর্শনাদি বর্তমান ছিল, সেগুলি গোপন করে রাখত। সুতরাং মুসলমানদের উচিত, এহেন কর্ম থেকে বেঁচে থাকা।

৩৮. এবং যারা নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে লোক-দেখানোর জন্য এবং আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনে না। আর শয়তান যার সাথী হয়, তো সে অত্যন্ত মন্দ সাথী[১]।

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ۝

৩৯. ওদের কী ক্ষতি হত, যদি ওরা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনত এবং আল্লাহ ওদের যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করত? আর আল্লাহ ওদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত[২]।

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ۝

৪০. নিশ্চয় আল্লাহ কণা পরিমাণও জুলুম করেন

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ

১. অর্থাৎ ওই সব আত্মগর্বী-অহংকারীদের আরেকটি স্বভাব এই যে, ওরা নিজেদের ধন-সম্পদ লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে খরচ করে, অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে খরচ করতে তো নিজেরাও বখিলী করে এবং অন্য লোকদেরও বখিলী করতে উৎসাহিত করে, কিন্তু লোক-দেখানোর জন্য ঠিকই নিজেদের ধন ব্যয় করতে থাকে। আর ওদের আল্লাহর প্রতিও ঈমান নেই এবং কিয়ামতের প্রতিও বিশ্বাস নেই, ফলে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও পরকালের ছওয়াব অর্জন তাদের উদ্দেশ্য হবে কী করে? অথচ আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় কাজ হচ্ছে দানের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের ছওয়াবের আশা রাখা এবং এই আশায় উক্ত হকদারদের দান করা।

এর দ্বারা জানা গেল, আল্লাহর রাস্তায় কৃপণতা করা যেমন খারাপ, তেমনি লোক-দেখানোর জন্য খরচ করাও খারাপ। আর এরূপ কাজ ওরাই করে থাকে, যাদের বন্ধু হচ্ছে শয়তান, সেই ওদের এরূপ কর্মে উৎসাহিত করে থাকে।

২. অর্থাৎ কাফেরদের কোনই ক্ষতি হত না যদি ওরা কুফরের স্থলে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনত এবং বখিলী ও রিয়ার স্থলে ইখলাসের সাথে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করত। বরং এতে ওদের আগাগোড়া লাভই হত। ক্ষতি তো রয়েছে তাতে, যা ওরা অবলম্বন করছে। আর আল্লাহ খুব ভালভাবেই জানেন– ওরা কী করছে এবং কী নিয়তে করছে। তারই বিনিময় ওরা লাভ করবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ বলে ধন-সম্পদকে ওদের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। বর্তমান আয়াতে وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ বলে এই সত্যের প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, ওরা যে সম্পদকে নিজেদের মনে করে ইচ্ছামত খরচ করছে, তাকে বরং আল্লাহর সম্পদ মনে করে তাঁরই হুকুমানুসারে খরচ করা উচিত ছিল।

না। আর যদি (কণা পরিমাণ) সৎকর্ম হয়, তিনি তা বৃদ্ধি করে দেন এবং তাঁর নিকট থেকে মহাপ্রতিদান প্রদান করেন[১]।

حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا۝

৪১. তখন (এদের) কী অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং এই লোকদের সম্পর্কে আপনাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব[২]?

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۢ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا۝

৪২. যারা কাফের হয়েছিল এবং রাসূলের নাফরমানী করেছিল, ওরা সেদিন কামনা করবে, হায়! যদি ওদেরসহ ভূমিকে সমতল করে দেওয়া হত! আর ওরা আল্লাহ থেকে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না[৩]।

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا۝

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কারো হক অণু পরিমাণও নষ্ট করেন না। সুতরাং এই কাফেরদের যে শাস্তি হবে, তা সম্পূর্ণ ইনসাফভিত্তিক এবং ওদের অপকর্মের বিনিময়স্বরূপ হবে। পক্ষান্তরে যদি কারো অণু পরিমাণও নেক কাজ থাকে, তবে তার বিনিময় বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন এবং নিজের পক্ষ থেকে পুরস্কার হিসাবে তাকে বিরাট ছওয়াব দান করবেন।

২. অর্থাৎ এ কাফেরদের কী মন্দ অবস্থাই না হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত ও প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব, যে ওদের অবস্থা বর্ণনাকারী এবং ওদের কর্মকাণ্ডের প্রকাশকারী হবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য প্রত্যেক উম্মতের নবী এবং প্রত্যেক যুগের পুণ্যবান ও বিশ্বস্ত লোকেরা। কারণ, তাঁরা কিয়ামতের দিন অবাধ্যদের অবাধ্যতা ও মান্যকারীদের মান্যতার কথা বর্ণনা করবেন এবং সকলের হাল-অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন। আর আপনাকে, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এদের সম্বন্ধে অর্থাৎ আপনার উম্মত সম্বন্ধে অন্য নবীদের মত অবস্থা বর্ণনাকারী ও সাক্ষী বানিয়ে হাযির করব।

আর এ সম্ভাবনাও আছে যে, هؤلاء বলে পূর্ববর্তী নবীগণ অথবা এ উম্মতের কাফেরদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নবীগণ উদ্দেশ্য হলে অর্থ এই হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী নবীগণের সত্যতার বিষয়ে সাক্ষ্য দান করবেন, যখন তাঁদের উম্মতরা তাঁদের কথা অস্বীকার করবে। আর যদি কাফেররা উদ্দেশ্য হয় তবে অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী নবীগণ যেমন নিজ নিজ উম্মতের কাফের-ফাসেকদের কুফরী ও ফাসেকী বিষয়ে সাক্ষী দেবেন, তেমনি আপনি হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার উম্মতের কাফের-ফাসেকদের বদ্ আমলের ব্যাপারে সাক্ষী হবেন, যাতে ওদের খারাবী ও অপকর্ম জোরদারভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়।

৩. অর্থাৎ যেদিন প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে তাদের অবস্থা বর্ণনাকারীকে হাযির করা হবে, সেদিন কাফের-নাফরমান লোকেরা এ আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায় আমাদের যদি মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হত এবং আমরা মাটিতে মিশে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম, আজ আর জীবিতই

না হতাম এবং আমাদের থেকে হিসাব-কিতাব না নেওয়া হত! আর তারা আল্লাহ তাআলা থেকে কোন বিষয়ই গোপন করতে পারবে না– কণায় কণায় সব কিছুর হিসাব হবে।

সামনের আয়াতের বিষয়বস্তু ও এর প্রাসঙ্গিকতা

সূরার প্রথম থেকে আত্মীয়-স্বজন, স্বামী-স্ত্রী প্রমুখের হক আদায়ের তাকীদ, কারো হক নষ্ট করতে ও জান-মালের ক্ষতি করতে নিষেধ এবং গোনাহসমূহের অমঙ্গল সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। তারপর وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا الخ আয়াতে আত্মীয়, এতীম, মিসকীন, প্রতিবেশী সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং প্রসঙ্গত গর্ব, অহংকার, কৃপণতা ও রিয়া সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। এগুলো এমনই দূষণীয় বিষয়, যা অন্যের হক আদায় করা এবং কারো সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা থেকে মানুষকে বিরত রাখে।

এরপর সম্মুখের আয়াতে মুসলমানদের সম্বোধন করে নামায সম্পর্কে দু'টি বিষয়ের তাকীদ করা হয়েছে। নামায সকল ইবাদতের মধ্যে শীর্ষ ও শ্রেষ্ঠ, শরী'য়তে এর গুরুত্ব সর্বাধিক। এবং এর আরকান, শর্তাবলি, আদাব ইত্যাদি যত বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, অন্য কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে এত গুরুত্বসহ বর্ণিত হয়নি। নামাযসংক্রান্ত বিষয়াবলির মধ্যে এ দু'টি বিষয় অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং নফসের কাছে খুবই কষ্টসাধ্য। তাছাড়া বিষয় দু'টি নামাযের আরকানের বিশুদ্ধতা ও সৌন্দর্যের জন্য প্রাণস্বরূপ।

প্রথমটি এই যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেয়ো না যাবৎ না মুখ থেকে যা বের হয় তা বুঝতে পার। দ্বিতীয়টি, জানাবত অর্থাৎ অপবিত্র অবস্থায়ও নামায থেকে দূরে থাক যাবৎ না গোসল করে সারা শরীর ভালভাবে পবিত্র করে নাও। কেননা, নামাযের মধ্যে দুটি জিনিস অতীব গুরুত্বপূর্ণ, একটি হচ্ছে একাগ্রতা ও বিনয়, দ্বিতীয় হচ্ছে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। নেশা বিনয় ও একাগ্রচিত্ততার পরিপন্থী আর জানাবত পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার পরিপন্থী। বরং নেশা ওযু ভঙ্গেরও কারণ এবং এ জন্য পবিত্রতারও পরিপন্থী। সুতরাং এ দু'টি বিষয়ের অর্থ এই দাঁড়াল যে, নামায পরিপূর্ণ যত্নশীলতার সঙ্গে পড় এবং সমস্ত জাহেরী ও বাতেনী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখ, যদিও তা নফসের জন্য খুবই কষ্টকর।

এস্থলে বিষয় দু'টির উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করার দুটি উপকারিতা বুঝে আসে। **এক.** ইতিপূর্বে পরস্পরের পাওনা-দাওনা ও হক আদায় এবং দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত-বন্দেগীসহ আরো যেসব নির্দেশ, বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছে, তা পালন করা এবং একই সাথে কৃপণতা, রিয়া, আত্মগৌরব ও অহংকার থেকে বেঁচে থাকা নফসের জন্য কঠিন। অতএব এর এলাজ বা প্রতিকার করার জন্য উক্ত দুটি বিষয়ের তাকিদ করা হয়েছে। অর্থাৎ নামাযকে যদি তার জাহেরী ও বাতেনী আদব-কায়দা ও শর্তাবলিসহ আদায় কর, তবে উল্লিখিত সমস্ত আদেশ-নিষেধ পালন করা তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। কেননা, নামাযের বদৌলতে সকল আদেশ ও ইবাদতের মধ্যে আসানী ও আকর্ষণ এবং সমস্ত নিষিদ্ধ ও গোনাহর কাজে ঘৃণা জন্মে যায়।

[রুকূ - ৭]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ

৪৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না যা বল তা বুঝতে পার, এবং জানাবত তথা অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল করে নাও, তবে তোমরা মুসাফির হলে (তার বিধান ভিন্ন)[১]। আর যদি তোমরা

দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, উল্লিখিত এতসব হুকুমের কথা শুনে অলস ও ভীরু লোকেরা নিজেদের অপারগ মনে করে সাহসহারা হয়ে পড়তে পারে এবং এই অলসতার প্রতিক্রিয়া নামাযের মধ্যেও প্রকাশ পেতে পারে। অথচ এই নামায সর্বদাই পড়তে হয় এবং এর বহু আদব-কায়দা রয়েছে। অতএব এস্থলে নামায ও তদীয় আদব-কায়দার গুরুত্ব বর্ণনা খুবই সমীচীন হয়েছে।

মোটকথা, যে কেউ যত্ন ও গুরুত্বসহকারে নিয়মিত নামায কায়েম করবে, তার জন্য অন্যান্য দৈহিক ও আর্থিক হুকুম পালন করাও সহজ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্যান্য হুকুম পালনে অবহেলা করে, তার দ্বারা নামায কায়েমের মধ্যেও অবহেলা করা অসম্ভব নয়।

১. পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল– وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا الخ এবং তারই প্রসঙ্গে কাফেরদের নিন্দা করা হয়েছে, যারা এই নির্দেশাবলির বিরোধিতা করত। এখন আবার মুসলমানদের নামাযসংক্রান্ত বিশেষ কিছু হেদায়েত দান করা হচ্ছে।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

পূর্বের আলোচনার সাথে এই হেদায়েতগুলির সম্পর্ক এই যে, ইতিপূর্বে কাফের ও কিতাবীদের দুটি দোষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল– এক, আল্লাহর উপর ঈমান না আনা; দুই, স্বীয় ধন আল্লাহর উদ্দেশ্যে খরচ না করা; বরং লোক-দেখানো ও নিজ সুনাম বৃদ্ধির জন্য ধন খরচ করা। বলা বাহুল্য, প্রথম দোষের কারণ ইলমের অভাব ও মূর্খতার প্রাবল্য, এবং দ্বিতীয় দোষের কারণ রিপুর তাড়না ও নফসের কামনা-বাসনা। এতে জানা গেল, গোমরাহীর বড় কারণ দুটি। **এক**– অজ্ঞতা, যার কারণে হক ও বাতিলের ভেদাভেদ বোঝাই সম্ভব হয় না। **দুই**– নফসের কামনা-বাসনা, যার কারণে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করা সত্ত্বেও হক অনুযায়ী আমল করতে পারে না। কেননা, কামনা-বাসনার দ্বারা ফেরেশতা-শক্তি দুর্বল এবং পাশবিক শক্তি সবল হয়ে ওঠে। যার পরিণতি হচ্ছে ফেরেশতাদের থেকে দূরত্ব এবং শয়তানের নৈকট্য, যা বহু অনিষ্টের মূল।

এখন আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে প্রথমত নেশার অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। কারণ, এ হচ্ছে অজ্ঞতার অবস্থা। অতঃপর জানাবত অর্থাৎ অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়তে বারণ করেছেন। কারণ, এটা ফেরেশতাদের থেকে দূরত্ব ও শয়তানদের

أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ	অসুস্থ হও বা সফরে থাক কিংবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর, এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটির ইচ্ছা কর এবং নিজেদের মুখ ও হাত মসেহ কর[১]। নিশ্চয়

নৈকট্যের অবস্থা। হাদীসে আছে, যেখানে কোনো জুনুবী ব্যক্তি রয়েছে, সেখানে ফেরেশতাগণ আগমন করেন না। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২২৯, ৪১৭৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ১২০৫; মুসনাদে বায্যার– কাশফুল আসতার, হাদীস : ২৯৩০)

এখন আয়াতের অর্থ এই দাঁড়াল যে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কুফর ও রিয়ার অনিষ্টতা ও অকল্যাণ বুঝতে পারলে এবেং এদের বিপরীত গুণাবলির সৌন্দর্য জানতে পারলে, তখন এ থেকে নেশা ও জানাবত অবস্থায় নামায পড়ার অনিষ্টতাও ভালভাবে বুঝে নাও। কারণ, এ দুটির উৎস তা-ই, যা কুফরী ও রিয়ার উৎস। নেশাবস্থায় নামাযের নিকট যাওয়া উচিত নয়, যতক্ষণ না তোমাদের এতটুকু হুঁশ আসে যে, যা মুখ দিয়ে বল তা বুঝতেও পার এবং জানাবতের অবস্থায়ও নামাযের নিকটে যাওয়া উচিত নয় যতক্ষণ না গোসল করে নাও, তবে সফর অবস্থায় (ভিন্ন হুকুম)। এ হুকুম সম্মুখে বর্ণিত হবে।

বি. দ্র. এ হুকুম তখন দেওয়া হয়েছিল, যখন নেশা হারাম হয়নি, তবে নেশাবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে, সাহাবীদের এক জামাত দাওয়াতে একত্র হয়েছিলেন। যেহেতু তখনো শরাব হারাম হয়নি, তাই তাঁরা শরাব পান করেছিলেন। মাগরিবের সময় হলে সকলে ঐ অবস্থাতেই নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইমাম সূরা 'কাফিরূন'-এর মধ্যে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ এর স্থলে أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ পড়ে বসলেন, যাতে অর্থ সম্পূর্ণ উলটা ও ভুল হয়ে গেল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান আয়াত অবতীর্ণ হয়। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩২৭৫; তাফসীরে তাবারী : ৭/৪৬)

এখন যদি নিদ্রার প্রাবল্য বা অসুস্থতার কারণে কারো এমন অবস্থা হয়ে যায় যে, সে কী বলছে তার খবর থাকে না– তবে এ অবস্থায়ও নামায দুরুস্ত হবে না। হাঁ, হুঁশ আসার পর কাযা অবশ্যই পড়ে নেবে।

১. অর্থাৎ জানাবত অবস্থায় গোসল ছাড়া নামায না পড়ার হুকুম তখন, যখন কোন ওযর না থাকে। আর যদি এমন ওযর থাকে, যার কারণে পানি ব্যবহার করতে পারে না অথচ পবিত্রতা অর্জন জরুরী, তবে এমন অবস্থায় মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নেওয়া যথেষ্ট।

এখন পানি ব্যবহার না করতে পারার অবস্থা তিনটি : এক, অসুস্থতা– যাতে পানি ক্ষতিকর। দুই, সফরে থাকলে, আর সাথে পানি এতটুকু যে, ওযু করে ফেললে পান করার কোন পানি থাকবে না এবং পিপাসায় প্রাণনাশের সম্ভাবনা, আবার অনেক দূর পর্যন্ত পানি পাওয়া যাবে না। তিন, পানি মোটেই নেই। আর পানি না থাকাবস্থায় পবিত্রতা অর্জন জরুরী হওয়ার দুটি

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

আল্লাহ পাপ মোচনকারী, অতি ক্ষমাশীল[১]।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ

৪৪. তুমি কি তাদের দেখনি, যাদের কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে? ওরা তো গোমরাহী ক্রয় করে এবং চায় যে, তোমরাও (সরল) পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাও!

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا

৪৫. আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের বিলক্ষণ জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহ যথেষ্ট[২]।

অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। একটি হচ্ছে, কেউ পেশাব-পায়খানা সেরে এসেছে, তার ওযুর দরকার। দ্বিতীয় এই যে, স্ত্রীসহবাস করেছে, তার গোসলের প্রয়োজন।

বি. দ্র. তায়াম্মুমের পদ্ধতি এই যে, পাক মাটিতে উভয় হাত মারবে। অতঃপর সমস্ত মুখের উপর ভালভাবে হাত বুলিয়ে নেবে। এরপর আবার দুই হাত মাটির উপর মেরে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মসেহ করে নেবে।

মাটি পবিত্র। এবং তা পানির ন্যায় কতক জিনিসকে পবিত্র করে, যথাঃ চামড়ার মোজা, তলোয়ার, ইত্যাদি। অধিকন্তু হাতে-মুখে মাটি মাখার মধ্যে পরিপূর্ণ বিনয় ও দীনতার প্রকাশ রয়েছে, যা পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার সর্বোচ্চ উপায়। অতএব মাটি জাহেরী ও বাতেনী উভয় রকমের অপবিত্রতা বিদূরিত করে, এজন্যই ওযর অবস্থায় একে পানির স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া তায়াম্মুম যেন অনায়াসে করা যায়, তার জন্য পানির স্থলাভিষিক্ত এমন জিনিসকে করা হয়েছে যা পানির তুলনায় সহজলভ্য। আর তা হল মাটি। কারণ, তা সর্বত্র পাওয়া যায়। অধিকন্তু মাটি মানুষের মূল, আর মূলের দিকে প্রত্যাবর্তনে রয়েছে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে আত্মরক্ষার উপায়।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা প্রয়োজনের সময়ে তায়াম্মুমের অনুমতি দিয়ে দিলেন এবং মাটিকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে দিলেন। কেননা, তিনি আসানী ও সুবিধা দানকারী এবং বান্দাদের গোনাহ ক্ষমাকারী। তিনি নিজ বান্দাদের লাভ ও কল্যাণ পছন্দ করেন।

এর দ্বারা এও বোঝা যায় যে, নামাযের মধ্যে নেশাবস্থায় উলটা-পালটা যা পড়া হয়েছিল তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। ফলে, এই দুশ্চিন্তা অমূলক যে, ভবিষ্যতে তো নেশাবস্থায় নামায পড়া হবে না, কিন্তু পূর্বে যে-ভ্রান্তি হয়েছে তার জন্য শাস্তি হয় কিনা!

২. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

আলোচ্য আয়াতগুলিতে ইহুদীদের কিছু অপরাধ এবং ওদের ধোঁকা-প্রবঞ্চনার বিবরণ রয়েছে। এবং ওদের গোমরাহী ও কুফরের কথা স্বয়ং ওদের এবং ওদের সাথে অন্যদেরও জানানো হচ্ছে, যাতে তারা ওদের থেকে দূরে থাকে। বস্তুত إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا থেকে يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ এর পূর্ব পর্যন্ত ইহুদীদের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা

৪৬. ইহুদীদের মধ্যে কতক এমন, যারা (কিতাবুল্লাহর) বাক্যাবলি তার স্থান থেকে সরিয়ে দেয়[১] এবং বলে, 'সামি'না ওয়া আসাইনা' (আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম)[২] এবং 'ইসমা' গাইরা মুসমা'ইন' (শুনুন, আপনাকে না শোনানো হোক)[৩] এবং (বলে), 'রা'ইনা'[৪]। (তারা এসব বলে)

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ

হয়েছে। মাঝে বিশেষ সম্পর্কহেতু নেশা ও জানাবত অবস্থায় নামায পড়া থেকে বারণ করার পর এখন পুনরায় ইহুদীদের বিভিন্ন পাপাচারের কথা আলোচিত হচ্ছে।

আয়াতের মর্ম

اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ –ইহুদীরা কিতাব থেকে কিছু অংশ লাভ করেছে অর্থাৎ, শব্দাবলি পড়তে পেরেছে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য যে আমল, তা করার সৌভাগ্য ওদের হয়নি। বরং ওরা গোমরাহী ক্রয় করে, অর্থাৎ দুনিয়ার মান-ইজ্জত ও ঘুষ-উৎকোচের জন্য শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা ও গুণাবলি গোপন করে এবং জেনেশুনে তা অস্বীকার করে। আর ওরা চায়, মুসলমানরাও দীন থেকে ফিরে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাক।

আর হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তাআলা তোমাদের শত্রুদের খুব ভাল করে জানেন, তোমরা তদ্রূপ জান না। সুতরাং আল্লাহ তাআলার কথায় পূর্ণ আস্থা রাখ এবং ওদের থেকে আত্মরক্ষা কর। আর তোমাদের সাহায্য করার জন্য এবং ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। অতএব শত্রুদের ভয় না করে দীনের উপর অটল-অবিচল থাক।

১. অর্থাৎ ইহুদীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহ তাআলা তাওরাতে যা নাযিল করেছেন তা যথাস্থান থেকে সরিয়ে দেয়, অর্থাৎ শাব্দিক ও অর্থগত বিকৃতি করে।

২. অর্থাৎ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের কোন হুকুম দিতেন, তখন ইহুদীরা উত্তরে বলত, 'আমরা শুনলাম' যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আপনার আদেশ কবুল করলাম। কিন্তু চুপে চুপে বলত, 'আমরা মানলাম না।' অর্থাৎ আমরা কেবল কানে শুনলাম, অন্তরে মানলাম না।'

৩. অর্থাৎ ইহুদীরা যখন হুযূরকে সম্বোধন করত তখন বলত, 'শুনুন, আপনাকে শোনানো না হোক,' অর্থাৎ এমন বাক্য ব্যবহার করত, যার দুই অর্থ হতে পারে। এক অর্থের হিসাবে দো'য়া বা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, কিন্তু দ্বিতীয় অর্থের দিক থেকে বদদো'য়া ও নিন্দাজ্ঞাপন উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন: এই বাক্যটি বাহ্যত ভাল দো'য়ার জন্য ব্যবহৃত, যার অর্থ এই যে, 'আপনি সর্বদা প্রবল ও সম্মানিত থাকুন। কেউ আপনাকে মন্দ কথা শোনাতে না পারুক।' কিন্তু ওরা অন্তরে এই অর্থ উদ্দেশ্য করত যে, 'আপনি কারো কথা না শুনুন অর্থাৎ বধির হয়ে যান'।

৪. অর্থাৎ ইহুদীরা হযরতের খেদমতে এলে راعنا, বলত। এরও দুই অর্থ। একটি ভাল, দ্বিতীয়টি মন্দ। সূরা বাকারাতে এর বর্ণনা রয়েছে (আয়াত নং ১০৪)। ভাল অর্থটি হচ্ছে– আমাদের

أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ[১] وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

নিজেদের জিহবাকে ঘুরিয়েফিরিয়ে এবং দীনের প্রতি কলঙ্ক আরোপ করার উদ্দেশ্যে[১]। অথচ ওরা যদি বলত, 'সামি'না ওয়া আতা'না' (আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম) এবং (বলত), 'ইসমা' ওয়ানজুরনা' (শুনুন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ রাখুন)– তবে তা ওদের জন্য উত্তম ও অধিকতর সঠিক হত। কিন্তু আল্লাহ ওদের কুফরীর কারণে ওদের উপর লা'নত করেছেন, ফলে ওরা ঈমান আনে না– অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া[২]।

কথা বিবেচনা করুন এবং আমাদের প্রতি সুদৃষ্টি দিন, যাতে আমরা আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারি এবং যা জিজ্ঞাসা করার জিজ্ঞাসা করতে পারি। আর মন্দ অর্থ এই যে, ইহুদীদের ভাষায় শব্দটি নিন্দাজ্ঞাপনার্থে ব্যবহৃত, অথবা (আরবী ভাষার শব্দ হিসাবে) জিহ্বা চেপে راعينا বলত, অর্থাৎ ওহে আমাদের রাখাল। বলা বাহুল্য, এ ইহুদীদের নিতান্তই দুষ্কৃতি।

১. অর্থাৎ ইহুদীরা এই শব্দগুলোকে নিজেদের কথার সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে এমন ভঙ্গিতে বলত যে, শ্রোতারা ভাল অর্থেই ধরে নিত এবং মন্দ অর্থের দিকে তাদের চিন্তাও যেত না, অথচ অন্তরে ওরা মন্দ অর্থ উদ্দেশ্য করত এবং তারপর দ্বীনের উপর এই বলে কলঙ্ক আরোপ করতে চাইত যে, যদি এই ব্যক্তি নবী হত, তবে আমাদের প্রতারণা অবশ্যই ধরতে পারত। তো, এখন আল্লাহ তাআলা ওদের প্রতারণা ভালভাবে প্রকাশ করে দিলেন।

২. আল্লাহ তাআলা ইহুদীদের তিনটি কথা বর্ণনা করার পর এখন ওদের তিরস্কার করে, এবং সেই সাথে নসীহত করত ইরশাদ করছেন যে, যদি ইহুদীরা عَصَيْنَا এর স্থলে أَطَعْنَا বলত এবং اِسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ এর বদলে শুধু اِسْمَعْ বলত এবং رَاعِنَا এর পরিবর্তে أَنْظُرْنَا বলত, তবে ওদের পক্ষে উত্তম হত এবং এটি সঠিক ও সত্য হত এবং উপরোক্ত শব্দাবলি দ্বারা ওরা যেসব অর্থ নিজেদের অন্তরে উদ্দেশ্য করত, সেই কদর্যতা ও দুষ্কৃতির আদৌ অবকাশ হত না।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা যেহেতু ওদেরই কুফরের কারণে স্বীয় রহমত ও হেদায়েত থেকে ওদের দূর করে দিয়েছেন, সেহেতু ওরা সহজ-সরল ও উপকারী কথা বোঝে না এবং ঈমান আনে না। তবে স্বল্প সংখ্যক লোক এসব দুষ্কৃতি ও ভ্রষ্টতা থেকে বিরত রয়েছেন এবং এ কারণে আল্লাহর লানৎ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। যেমনঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা।

৪৭. হে কিতাবীরা! তোমরা ঐ কিতাবের প্রতি ঈমান আন যা আমি নাযিল করেছি তোমাদের নিকট যে কিতাব আছে তার সমর্থকরূপে- এর পূর্বে যে, আমি (তোমাদের) চেহারাগুলি বিকৃত করে পিছনের দিকে উলটিয়ে দেই, অথবা আমি তোমাদের লা'নত করি যেমন লা'নত করেছিলাম 'শনিবার'সংশ্লিষ্ট লোকদের। আর আল্লাহর নির্দেশ তো কার্যকর হয়েই থাকে[১]।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَٰبَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَٰبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

৪৮. নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করা ক্ষমা করবেন না, তবে এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের গোনাহ –যার জন্য ইচ্ছা– ক্ষমা করবেন☆। আর যে কেউ আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করল, সে ভয়ানক অপবাদ আরোপ করল☆☆[২]।

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

---

১. পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে ইহুদীদের গোমরাহী ও বিভিন্ন দুষ্কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। এখন ওদের সম্বোধন করে ঈমান আনার ও কুরআনকে মানার হুকুম দেওয়া হচ্ছে এবং এর বিরোধিতার ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করা হচ্ছে।

বলা হচ্ছে, হে আহলে কিতাব! কুরআনের প্রতি ঈমান আন, যার আহকাম তাওরাতের সমর্থক ও অনুকূল। আর ঈমান আন– তোমাদের চেহারার চিহ্নগুলি যথা চোখ, নাক, ইত্যাদি নিশ্চিহ্ন করে ফেলার আগে। অর্থাৎ এর পূর্বে যে, আমি তোমাদের আকৃতি বিকৃত করে ফেলি এবং তোমাদের চেহারাকে পিঠের দিকে ঘুরিয়ে দেই। অর্থাৎ নাক-মুখ-চোখ ইত্যাদি উঁচু-নিচু লোপ করে গোটা চেহারা পিন্ডাকার করে ফেলি, তারপর সেটি পিছন দিকে নিয়ে পিছন দিককে সামনের দিকে ঘুরিয়ে দেই অথবা শনিবারের লোকদের মত তোমাদের বিকৃত করে পশু বানিয়ে দেই। শনিবারের লোকদের ঘটনা সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে (আয়াত নং ১৬৩)।

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'এ ছাড়া অন্যান্য (গোনাহ) –যার জন্য ইচ্ছা– ক্ষমা করবেন।

☆☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'সে মারাত্মক গোনাহে লিপ্ত হল'।

২. অর্থাৎ মুশরিককে কখনো ক্ষমা করা হবে না এবং ওর শাস্তি অনন্ত। অবশ্য শিরক থেকে নীচের যত গোনাহ আছে, সগীরা বা কবীরা, তা সবই ক্ষমার যোগ্য। আল্লাহ তাআলা যাকে ক্ষমা করার ইচ্ছা করেন তার ছোট বড় গোনাহ ক্ষমা করে দেন– চাই কিছু

৪৯. তুমি কি ওদের দেখনি, যারা নিজেরা নিজেদের পবিত্র বলে? বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আর ওদের প্রতি সুতা পরিমাণও অবিচার করা হবে না[১]।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝٤٩

৫০. দেখ! ওরা কীভাবে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে! আর সুস্পষ্ট গোনাহ হিসাবে এ-ই যথেষ্ট[২]।

انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ۝٥٠

[রুকূ - ৮]

৫১. তুমি কি ওদের দেখনি, যাদের কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে? ওরা তো মূর্তি ও 'তাগুত' (তথা শয়তান)-কে মান্য করে এবং কাফেরদের সম্বন্ধে বলে, 'এরা মুসলমানদের

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ

শাস্তি দিয়ে, অথবা বিনা শাস্তিতে। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইহুদীরা যেহেতু কুফর ও শিরক করছে, সেহেতু ওরা ক্ষমার আশা করতে পারে না।

১. অর্থাৎ বহু বহু অনাচার সত্ত্বেও ইহুদীরা নিজেরা নিজেদের পাক-সাফ ও পবিত্র বলে, এমনকি নিজেদের আল্লাহর সন্তান ও আল্লাহর প্রিয়ভাজন বলে থাকে, যা একেবারে অবাস্তব কথা। বরং আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা পাক-পবিত্র করেন। ইহুদীদের কথার দ্বারা কিছু হতে পারে না।

আর এই মিথ্যা বড়াইকারীদের উপর সামান্য অবিচারও হবে না, অর্থাৎ ওরা নিজেদের পাপাচারের শাস্তিতে গ্রেফতার হবে, অন্যায় শাস্তি ওদের আদৌ দেওয়া হবে না।

শানে নুযূল

ইহুদীরা, যারা বাছুর পূজা করত এবং হযরত উযাইর আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলত– ওরা যখন পূর্বের আয়াত إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ الخ শুনল, তখন বলতে লাগল, আমরা মুশরিক নই, বরং আমরা তো বিশেষ বান্দা ও পয়গম্বরের বংশ এবং পয়গম্বরী আমাদের উত্তরাধিকার। আল্লাহ তাআলার কাছে ওদের এই বড়াই পছন্দ হয়নি। এতে এই আয়াত নাযিল হল।

২. অর্থাৎ কেমন আশ্চর্যের কথা, ওরা আল্লাহর উপর কেমন মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে! এবং কুফর ও শিরক করা সত্ত্বেও ওরা নিজেদের আল্লাহর প্রিয়পাত্র বলে এবং আল্লাহর নিকট মকবুল হওয়ার দাবি করে। ওদের সুস্পষ্ট অপরাধী হওয়ার জন্য এরূপ সাংঘাতিক অপবাদই যথেষ্ট।

أَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿٥١﴾

চেয়ে বেশি সুপথে রয়েছে[১]।'

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۭ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿٥٢﴾

৫২. এরাই তারা, যাদের আল্লাহ লা'নত করেছেন। আর আল্লাহ যাকে লা'নত করেন, তুমি তার জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না[২]।

أَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿٥٣﴾

৫৩. ওদের কি রাজত্বে কোন অংশ আছে? তা হলে তো ওরা লোকদের এক তিল পরিমাণও দেবে না[৩]।

أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ

৫৪. না কি ওরা মানুষকে হিংসা করে, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদের যা দিয়েছেন তার

---

১. বর্তমান আয়াতেও ইহুদীদের দুষ্কৃতি ও কদাচার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ইহুদীদের শত্রুতা বৃদ্ধি পেলে ওরা মক্কার মুশরিকদের কাছে গিয়ে ওদের সাথে একাত্ম হল এবং ওদের সন্তুষ্টির জন্য মূর্তিসমূহের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল, এমনকি একথাও বলল যে, 'তোমাদের ধর্ম মুসলমানদের ধর্ম থেকে উত্তম'। (তাফসীরে তবারী ৭/১৪৬)

এর কারণ হিংসা ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং হিংসাও এ জন্য যে, নবুওয়াত ও ধর্মের সর্দারী ওদের ছেড়ে অন্যদের হাতে গেল কেন।

২. অর্থাৎ এই লোকেরা, যারা কিতাবধারী হয়েও হীন ব্যক্তি-স্বার্থের খাতিরে মূর্তিসমূহকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করল এবং কুফরী তরীকাকে ইসলামী তরীকার চেয়ে ভাল বলল, ওদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অভিশাপ। আর যাকে আল্লাহ অভিশাপ করেন, দুনিয়া ও আখেরাতে ওর কোন সহায় ও সাহায্যকারী হতে পারে না। সুতরাং সাহায্য-সহায়তার আশায় ওরা যে মক্কার মুশরিকদের সাথে মিতালী করল, তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। তাই তো ইহুদীরা দুনিয়াতে সীমাহীন লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হয়েছে এবং আখেরাতেও শাস্তি ভোগ করবে।

৩. ইহুদীরা মনে করত, পয়গম্বরী ও ধর্মের সর্দারী ওদের উত্তরাধিকার এবং তা ওদেরই জন্য শোভন। এ জন্য ওরা আরব-নবীর আনুগত্যকে নিজেদের জন্য লজ্জাকর মনে করত এবং ওরা বলত, শেষ পর্যন্ত হুকুমত ও রাজত্ব আমাদেরই অধিকারে চলে আসবে, কিছু দিনের জন্য অন্যের হাতে গেলেই বা ক্ষতি কী? এতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অর্থ এই যে, রাজত্বের মধ্যে ইহুদীদের কিছু অংশ আছে কি? অর্থাৎ মোটেই নেই। যদি ওরা রাজ-ক্ষমতার মালিক হয়ে যায়, তবে লোকদের তিল পরিমাণও দেবে না, অর্থাৎ ওরা এমন কৃপণ যে, রাজত্বের মালিক হলেও ফকীরকে তিল পরিমাণও দান করবে না।

إِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا

জন্য? অথচ আমি তো ইবরাহীমের বংশধরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম এবং তাদের দিয়েছিলাম বিশাল রাজত্ব[১]।

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا

৫৫. তাদের মধ্যে কেউ তো এমন, যে উক্ত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে। পক্ষান্তরে ওদের মধ্যে কেউ এমন, যে তা থেকে বিরত থেকেছে। আর (শাস্তির জন্য) জ্বলন্ত আগুনরূপে জাহান্নামই যথেষ্ট[২]।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

৫৬. যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, নিশ্চয় আমি ওদের আগুনে নিক্ষেপ করব[৩]। যখনই ওদের চামড়া পুড়ে যাবে, আমি তার বদলে ওদের অন্য চামড়া দেব, যাতে ওরা শাস্তি আস্বাদন করতে থাকে[৪]। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[৫]।

---

১. অর্থাৎ ইহুদীরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহ লক্ষ্য করে হিংসায় জ্বলে মরছে। বলা বাহুল্য, এ নিতান্তই ওদের অর্বাচীনতা। কেননা, আমি (আল্লাহ তাআলা) হযরত ইবরাহীম আ. এর বংশে কিতাব, হেকমত ও বিশাল রাজত্ব দান করেছি। এখনো তা ইবরাহীমেরই বংশে রয়েছে। অতএব ইহুদীরা আপনার নবুওয়াত ও মর্যাদা দেখে কেন হিংসা করছে ও তা অস্বীকার করছে?

২. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশে আল্লাহ তাআলা পূর্ব থেকে মান-মর্যাদা দান করে রেখেছেন এবং তা এখনো তাঁরই বংশধরের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং যে কেউ বিনা কারণে শুধু হিংসাবশত তা অস্বীকার করবে, ওকে পোড়ানোর জন্য দোযখের প্রজ্বলিত আগুনই যথেষ্ট।

৩. পূর্বের আয়াতে বিশেষ কিছু মুমিন ও কাফেরের উল্লেখ ছিল। এখন সকল মুমিনদের পুরস্কার ও কাফেরদের শাস্তির কথা মূলনীতিরূপে উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে ঈমানের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং কুফর সম্পর্কে পূর্ণ সতর্কীকরণ হয়।

৪. অর্থাৎ কাফেরের শাস্তি যেন হ্রাস না পায় সেই উদ্দেশ্যে তাদের গায়ের চামড়া পুড়ে যাওয়ার সাথে সাথে পুনরায় নতুন চামড়া দেওয়া হবে। মোদ্দাকথা, কাফেররা চিরকাল শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

৫. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় প্রবল ও পরাক্রমশালী, কাফেরদের এরূপ শাস্তি দিতে তাঁর কোনই কষ্ট ও বেগ পেতে হবে না। তদুপরি তিনি হেকমতওয়ালা, কাফেরদেরকে উক্ত শাস্তি প্রদান সম্পূর্ণ হেকমতপূর্ণ।

৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি অবশ্যই তাদের এমনসব জান্নাতে দাখিল করব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, যাতে তারা অনন্তকাল বাস করবে। তাদের জন্য সেখানে থাকবে পাক-পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আমি তাদের দাখিল করব ঘন ছায়ায়[১]।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴿٥٧﴾

৫৮. নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের এ আদেশ করছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার পাওনাদারদের পৌঁছে দাও এবং যখন লোকদের মাঝে বিচার কর তখন ইনসাফের সাথে বিচার কর[২]। আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দেন, তা কতই না উত্তম! নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা[৩]।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

৫৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আদেশ মান্য কর এবং আদেশ মান্য কর রাসূলের ও

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا

---

১. অর্থাৎ মুমিনরা অনন্তকাল বেহেশতে থাকবে এবং তাদের ভাগ্যে এমন জীবনসঙ্গীনী জুটবে, যারা হায়েয ও অন্যান্য নাপাকি থেকে পাক-সাফ হবে। অধিকন্তু ঘন ও স্নিগ্ধ ছায়াতলে তাদের প্রবেশ করানো হবে, যা সূর্যতাপ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হবে।

২. ইহুদীদের অভ্যাস ছিল আমানতে খেয়ানত করা এবং বিচার-মীমাংসায় ঘুষ ইত্যাদি নিয়ে কারো পক্ষপাতিত্ব করে সত্যের পরিপন্থী বিচার করা। এ জন্য আয়াতে মুসলমানদের এই উভয় বিষয় থেকে বারণ করা হচ্ছে।

বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবাগৃহে প্রবেশ করতে চাইলে কাবাগৃহের চাবিরক্ষক উছমান ইবনে তালহা চাবি দিতে অস্বীকার করলেন। এতে হযরত আলী রা. তার থেকে চাবি ছিনিয়ে নিয়ে দরজা খুলে দেন। কাজ সমাধা করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে তশরীফ আনলে হযরত আব্বাস রা. সেই চাবির রক্ষক হওয়ার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দরখাস্ত করলেন। এতে এই আয়াত অবতীর্ণ হল এবং উছমান ইবনে তালহার হাতেই চাবি ন্যস্ত করা হল।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমানত আদায় করতে এবং ইনসাফ অনুসারে বিচার করতে তোমাদের যে নির্দেশ দিচ্ছেন, তা তোমাদের জন্য শুধুই মঙ্গলকর ও উপকারী। আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বিষয় সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত আছেন। সুতরাং এখন যদি ক্ষেত্র বিশেষে আমানত আদায় করা বা সুবিচার করা তোমাদের নিকট উপকারী মনে না হয়, তবে আল্লাহর নির্দেশের মোকাবেলায় এমন ধারণা মোটেই বিবেচ্য হবে না।

الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের[১]। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের কাছে নিয়ে যাও যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে ঈমান রাখ[২]। এ-ই উত্তম এবং এর পরিণাম খুবই ভাল[৩]।

[রুকূ - ৯]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

৬০. আপনি কি ওদের দেখেননি, যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে

---

১. পূর্বের আয়াতে শাসকদেরকে সুবিচারের আদেশ করা হয়েছে, এখন অন্যদেরকে আদেশ করা হচ্ছে শাসকদের অনুগত থাকার। এ থেকে প্রকাশ পায় যে, শাসকদের আনুগত্য তখনি ওয়াজিব, যখন তারা সত্যের অনুসরণ করবে।

বি. দ্র. বাদশাহ, বিচারক, সেনাপতি এবং অন্যান্য দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তির আদেশ মান্য করা ততক্ষণ পর্যন্ত জরুরী, যতক্ষণ তারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম বিরোধী আদেশ না দেবে। যদি আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের স্পষ্ট বিরোধিতা করে, তবে ঐ আদেশ কখনো মানা যাবে না।

২. অর্থাৎ তোমাদের ও শাসকদের মধ্যে যদি এ বিষয়ে মতভেদ হয় যে, শাসকের এই হুকুম আল্লাহ ও রাসূলের (অর্থাৎ শরী'য়তের বিধানের) অনুকূল না বিরোধী, তবে তা কুরআন ও হাদীসের সামনে রেখে নিষ্পত্তি করে নাও যে, হুকুমটি প্রকৃতই আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের অনুকূল না বিরোধী। অতঃপর কুরআন-হাদীসের আলোকে যা প্রমাণিত হয়, তাই সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নিয়ে সেই মত আমল করতে হবে এবং বিরোধ-বিবাদ দূর করে দিতে হবে, যদি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি তোমাদের ঈমান থেকে থাকে। কারণ, আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি যার ঈমান থাকবে, সে মতভেদের ক্ষেত্রে অবশ্যই আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাঁদের হুকুমের বিরোধিতা করতে খুবই ভয় করবে।

এ থেকে বোঝা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে মুসলমান নয়। সুতরাং দুই মুসলমান যদি পরস্পর বিবাদরত হয় এবং একজন বলে যে, 'চল শরী'য়তের (বিধানের) দিকে প্রত্যাবর্তন করি, দ্বিতীয়জন বলল, আমি শরী'য়ত মানি না অথবা বলল, আমি শরী'য়তের ধার ধারি না' তবে দ্বিতীয়জনকে অবশ্যই কাফের বলা হবে।

৩. অর্থাৎ নিজেদের ঝগড়া-বিবাদ ও বিরোধকে আল্লাহ-রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা— পরস্পর কলহ করা অথবা স্বীয় রায় অনুসারে বিচার করা থেকে মঙ্গলকর এবং এই প্রত্যাবর্তনের পরিণতি খুবই উত্তম।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۝

ওরা তার প্রতি ঈমান এনেছে? ওরা নিজেদের মামলা তাগুতের (শয়তানের) কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ ওদের আদেশ করা হয়েছে ওকে অমান্য করতে। আর শয়তান চায় ওদের চরম গোমরাহীতে লিপ্ত করতে[১]।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

৬১. যখন ওদের বলা হয়, 'আল্লাহ যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রাসূলের

---

১. ইহুদীরা ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসার ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করা ও ঘুষ নেওয়ায় অভ্যস্ত ছিল। সেজন্য যারা মিথ্যাবাদী, মুনাফিক ও আত্মসাৎকারী হত, তারা স্বীয় মোকদ্দমা ইহুদী সম্প্রদায়ের আলেমদের নিকট নিয়ে যেতে পছন্দ করত, কারণ তারা খাতির করবে। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো মোটেই পক্ষপাতিত্ব না করে সত্যের পক্ষে রায় দেবেন বলে এরা তাঁর কাছে মোকদ্দমা নিয়ে যাওয়া পছন্দ করত না।

শানে নুযূল

মদীনা শরীফে এক ইহুদী ও এক মুনাফিক কোন এক বিষয়ে কলহে লিপ্ত হয়। এই বিবাদে ইহুদী ছিল সত্যবাদী, আর মুনাফিক ছিল মিথ্যাবাদী। ইহুদী বলল, 'চল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাই।' মুনাফিক বলল, 'চল ইহুদী সর্দার ও আলেম কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে যাই।' শেষ পর্যন্ত ওরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গেল। তিনি ইহুদীর পক্ষে রায় দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচারে অসন্তুষ্ট মুনাফিক বাইরে গিয়ে বলে কি, 'চল, হযরত উমরের কাছে যাই, তিনি যে মীমাংসা করে দেবেন তাই মেনে নেব।' সম্ভবত মুনাফিক মনে করে থাকবে, 'আমি ইসলামের দাবিদার, তাই উমর ইহুদীর বিপক্ষে ও আমার পক্ষে রায় দেবেন।' আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই নির্দেশে হযরত উমর রা. মদীনায় কলহ-বিবাদ মীমাংসা করতেন।

উভয়ে হযরত উমরের নিকট গেল। যখন উমর রা. উক্ত বিবাদের বিষয় শুনলেন এবং ইহুদীর কথায় এও জানতে পারলেন যে, ইতিপূর্বে এই মামলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করা হয়েছিল এবং তিনি ইহুদীকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করে তার পক্ষে রায় দিয়েছেন— তখন হযরত উমর রা. ঐ মুনাফিককে হত্যা করে ফেললেন এবং বললেন, 'যে কেউ এমন বিচারকের বিচার না মানবে, তার বিচার এ-ই।'

তখন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গিয়ে হযরত উমরের বিরুদ্ধে খুনের বিচার প্রার্থনা করল এবং কসম খেয়ে বলতে লাগল– 'হযরত উমরের নিকট আমরা শুধু এই উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম যে, তিনি এ বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেবেন, আপনার বিচার অস্বীকার করার জন্য আমরা যাইনি। এতে আলোচ্য আয়াতখানি নাযিল হয়। ফলে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পেয়ে গেল এবং হযরত উমর রা. 'ফারুক' উপাধিতে ভূষিত হলেন। (আসবাবুল ওয়াহিদী, পৃ ৩০০; ফাতহুল বারী ৫/৪৬)

وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿٦١﴾

দিকে আস', তখন আপনি মুনাফিকদের দেখবেন– ওরা আপনার দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে[১]।

فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ﴿٦٢﴾

৬২. তো, তখন (ওদের) কী অবস্থা হবে, যখন ওদের উপর ওদেরই কৃতকর্মের কারণে কোন মুসিবত এসে পড়বে? তারপর ওরা আল্লাহর নামে শপথ করতে করতে আপনার কাছে আসবে (ও বলবে), 'আমাদের উদ্দেশ্য কল্যাণসাধন ও আপোস-মীমাংসা বৈ কিছু ছিল না'[২]।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًاۢ بَلِيْغًا ﴿٦٣﴾

৬৩. এরাই তারা, যাদের অন্তরের কথা আল্লাহ জানেন। সুতরাং আপনি ওদের উপেক্ষা করুন, ওদের নসীহত করুন এবং ওদের এমন কথা বলুন যা ওদের জন্য উপকারী☆[৩]।

---

১. অর্থাৎ যখন কোনো মোকদ্দমার ব্যাপারে মুনাফিকদের বলা হয় যে, আল্লাহ তাআলা যে হুকুম নাযিল করেছেন সেদিকে আস এবং তাঁর রাসূলের সম্মুখে মামলা পেশ কর, তখন ইসলামের দাবিদার হওয়ায় তারা পরিষ্কার অস্বীকার তো করতে পারে না, কিন্তু তাঁর নিকট যাওয়া এবং আল্লাহর হুকুম মানা থেকে বিরত থাকে এবং এই ভেবে পিছিয়ে থাকে যে, দেখি কোন কৌশলে বাঁচা যায় কি না এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে নিজ ইচ্ছা মত স্বীয় মোকদ্দমা অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যায় কিনা।

২. অর্থাৎ এসব কিছু তো হল, কিন্তু এই মুনাফিকরা তখন কী করবে যখন ওদের উপর ওদেরই কৃতকর্মের ফলে আযাব আপতিত হবে? অর্থাৎ ঝগড়া মীমাংসার জন্য আপনার নিকট না এসে ওরা এখন পিছিয়ে থাকে, কিন্তু যখন ওদের উপর শাস্তি আসতে শুরু করবে, তখন বাধ্য হয়ে রাসূলের খেদমতে কসম খেতে খেতে উপস্থিত হবে এবং বলবে, আমরা তো হযরত উমরের খেদমতে শুধু এই কারণে গিয়েছিলাম যে, সম্ভবত তিনি পরস্পরে সন্ধি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে দেবেন– রাসূলের ফয়সালা থেকে ফিরে যাওয়া ও জান বাঁচানো আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না।'

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'ওদের অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টিকারী হবে'।

৩. এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে বলছেন যে, ওরা মুখে যা বলতে চায় বলতে দিন, আল্লাহ তাআলা ওদের অন্তরের কথা সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছেন অর্থাৎ ওদের নেফাক ও মিথ্যা উত্তমরূপে জানেন। অতএব আপনিও আল্লাহর

৬৪. আমি কোন রাসূল এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে পাঠাইনি যে, আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁর আদেশ মান্য করা হবে। আর যখন ওরা নিজেদের অকল্যাণ করেছিল, তখন যদি ওরা আপনার নিকট আসত, তার পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন- তবে অবশ্যই ওরা আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু পেত[১]।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَاۗءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

৬৫. অতএব আপনার রবের কসম! ওরা মুমিন হবে না যতক্ষণ না ওরা নিজেদের মধ্যে সংঘটিত বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকেই বিচারক বানাবে। অতঃপর আপনার ফয়সালা সম্বন্ধে নিজেদের মনে কোন সংকীর্ণতা বোধ করবে না এবং (তা) সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবে[২]।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝

ইলমের উপর নির্ভর করে মুনাফিকদের কথা উপেক্ষা করুন। আপনি ওদের কথার পরোয়া করবেন না। তবে ওদের উপদেশ দিতে এবং উপকারী কথা বলতে অবশ্যই ত্রুটি করবেন না এবং ওদের হেদায়েত থেকে নিরাশ হবেন না।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যে কোন রাসূলকে নিজ বান্দাদের প্রতি পাঠান, তাঁকে এই উদ্দেশ্যেই পাঠান যাতে বান্দারা আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁর কথা মেনে চলে।

সুতরাং এই লোকদের কর্তব্য ছিল- প্রথম থেকেই রাসূলের হুকুম বিনা দ্বিধায় মনেপ্রাণে গ্রহণ করা। আর যদি গোনাহ ও মন্দ করার পরও সতর্ক হয়ে আল্লাহর কাছে মাফ চাইত এবং রাসূলও ওদের ক্ষমার জন্য দো'য়া করতেন, তবুও আল্লাহ তাআলা ওদের তওবা কবুল করতেন। কিন্তু ওরা এমনই নিকৃষ্ট যে, প্রথমত ওরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম থেকে, যা মূলত আল্লাহর হুকুম ছিল, সরে গেল। অতঃপর যখন এর শাস্তি ওদের উপর পতিত হল তখনো ওরা সতর্ক হলো না এবং তওবা করল না, বরং মিথ্যা কসম খেতে ও অজুহাত বানাতে লাগল। এমন লোকদের ক্ষমা কী করে হবে?

২. অর্থাৎ মুনাফিকরা কী অমূলক চিন্তায় রয়েছে এবং কেমন ছল-চাতুরী করে মতলব হাসিল করতে চাচ্ছে! ওদের খুব ভাল করে বোঝা উচিত, আমি কসম করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না ওরা হে রাসূল! -ওদের ছোট ও বড় এবং আর্থিক, দৈহিক- সকল বিবাদ-বিসংবাদে আপনাকে বিচারক ও ফয়সালাকারী মেনে নেবে, অতঃপর আপনার প্রত্যেক বিচার সন্তুষ্টচিত্তে

৬৬. আমি যদি ওদের নির্দেশ দিতাম যে, তোমরা নিজেদের প্রাণ নাশ কর অথবা নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বের হয়ে যাও, তবে ওরা এমনটি করত না– ওদের মধ্যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া। আর ওরা যদি ওদের যে উপদেশ দেওয়া হয় তা করত, তবে অবশ্যই তা ওদের জন্য উত্তম হত এবং তা (দীনের উপর) খুবই অবিচলতা সৃষ্টিকারী হত।

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ۗ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ۙ﴿۶۶﴾

৬৭. এবং তখন আমি অবশ্যই আমার পক্ষ থেকে ওদের মহা প্রতিদান দান করতাম;

وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ﴿۶۷﴾

৬৮. এবং অবশ্যই ওদের সরল পথে পরিচালিত করতাম[১]।

وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿۶۸﴾

৬৯. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান্য করে, তারা তাঁদের সঙ্গ লাভ করবে যাঁদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন অর্থাৎ– নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও পুণ্যবানগণের। আর সঙ্গী হিসাবে কতই না উত্তম তাঁরা[২]।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿۶۹﴾

ও সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে নিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওরা মুমিন বলে গণ্য হতে পারে না। অতএব যা করার, তা বুঝেশুনেই যেন করে।

১. অর্থাৎ সকলের জানের মালিক যেহেতু আল্লাহ তাআলা, সেজন্য তাঁর নির্দেশ হলে জান দিতেও কারো কুণ্ঠাবোধ করা উচিত নয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যদি কখনো লোকদের স্বীয় জান দিতে এবং নির্বাসিত হতে আদেশ করতেন, যেমন বনী ইসরাঈলকে করেছিলেন, তবে স্বল্পসংখ্যক সত্য ও পাক্কা ঈমানদার লোক ছাড়া কেউ এই আদেশ পালন করত না। অতএব এই মুনাফিকরা কী করে উক্ত আদেশ পালন করতে পারত?

এখন ওদের বোঝা উচিত, আমি ওদের যে নির্দেশগুলি দিয়ে রেখেছি, সেগুলি নিতান্তই ওদের মঙ্গলের জন্য। ওদেরকে তো জান দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি অথবা ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হওয়ারও নয়। এখন যদি এই সহজ-সরল আদেশগুলিই ওরা মেনে চলে, তবে অন্তর থেকে নেফাক সম্পূর্ণ বের হয়ে যাবে এবং খাঁটি মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে। কিন্তু আফসোসের বিষয়, ওরা বুঝছে না এবং এই সুযোগ গ্রহণ করছে না যে, একটুখানি চেষ্টাতেই দীন ও দুনিয়া উভয়ই দুরুস্ত হয়ে যেতে পারে।

২. নবীগণ হচ্ছেন তাঁরা, যাঁদের নিকট আল্লাহর ওহী আসে অর্থাৎ ফেরেশতা তাঁদের কাছে আগমন করে আল্লাহর বার্তা পৌঁছে যান। আর সিদ্দীক তাঁরা, যাঁদের পবিত্র অন্তর

৭০. এ অনুগ্রহ আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর সর্বজ্ঞ হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট[১]।

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۟

[রুকূ - ১০]

৭১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর, অতঃপর পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে (অভিযানে) বের হয়ে পড় অথবা সকলে একত্রে বের হও[২]।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ۟

পয়গম্বরগণের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে আগত সংবাদ ও আহকামের সত্যতার ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্ত সাক্ষ্য দেয় এবং বিনা প্রমাণে তা গ্রহণ করে নেয়। শহীদ তাঁরা, যাঁরা পয়গম্বরগণের হুকুম অনুসারে প্রাণ দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকেন। এবং সালেহীন বা পুণ্যবান তাঁরা, যাঁদের মন-মেজায পুণ্যের উপরই গড়ে উঠেছে এবং তাঁরা নিজেদের দেহ-মন উভয়কে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে শুদ্ধ ও পাক-পবিত্র করেছেন।

আয়াতের মর্ম এই যে, এই চার শ্রেণীর লোক অন্যান্য লোকদের চেয়ে উত্তম। কিন্তু যে মুসলমানগণ মর্যাদায় তাদের সমকক্ষ নয়, এমন সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মেনে চলবে– তারাও উক্ত চার শ্রেণীর বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গ লাভ করবে। আর এই হযরতদের সঙ্গ মস্ত বড় সৌভাগ্য ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়, কেউ যেন একে মামুলি মনে না করে।

বি. দ্র. এই আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত আছে যে, ইতিপূর্বে যে মুনাফিকদের উল্লেখ হয়ে আসছে, তারা এই সঙ্গ ও সংস্রববঞ্চিত।

১. আল্লাহ ও রাসূলের আজ্ঞাবহ লোকদের জন্য নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহদের সান্নিধ্য লাভ করা আল্লাহ তাআলার মস্ত বড় অনুগ্রহ। এটা নিতান্তই তাঁর দয়া– তাদের আনুগত্যের বিনিময় নয়। আর এ দয়া থেকে মুনাফিকরা একেবারে বঞ্চিত।

আর জ্ঞাত ও অবহিত হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। প্রত্যেক খাঁটি বান্দা ও মুনাফিক এবং প্রত্যেক আজ্ঞাবহ দাসের আনুগত্যের মাত্রা, তার প্রকৃত পাওনা এবং দয়া লাভের পরিমাণ– সবই তিনি বিস্তারিতভাবে জানেন। অতএব এসব বিষয় অতি সূক্ষ্ম ও সুবিস্তৃত হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা-পূরণের ব্যাপারে কারো যেন দ্বিধা-সংশয় না হয়।

২. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

এখান থেকে জেহাদের আলোচনা হচ্ছে। পূর্বের আয়াতে এর উল্লেখ ছিল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে পুরস্কারস্বরূপ নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহদের সঙ্গ লাভ করবে। আর আল্লাহ তাআলার বিধানাবলির মধ্যে জেহাদের বিধান যেহেতু কষ্টকর ও কঠিন, বিশেষত মুনাফিকদের জন্য, যাদের আলোচনা পূর্বের

৭২. আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্যই বিলম্ব করবে[১]। অতঃপর যদি তোমাদের উপর কোন মুসিবত আসে, তবে বলবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতি দয়া করেছেন যে, আমি তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম না[২]।'

وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ۝

৭৩. আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর পক্ষ

وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ

আয়াতগুলিতে হয়েছে– এ জন্য এখন জেহাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যাতে যে কেউ উল্লিখিত মহান ব্যক্তিবর্গের সঙ্গ ও সান্নিধ্যের আশা পোষণ করতে শুরু না করে। (এ আশা তো তারাই করতে পারে, যারা জেহাদের মত কঠিন বিধান পালনেও পূর্ণ প্রস্তুত!)

শানে নুযূল ও মর্ম

বর্ণিত আছে, ইসলামের শুরু যুগে অনেক দুর্বলচিত্ত মানুষও ইসলামের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। অতঃপর যখন জেহাদ ফরয হয়ে গেল, তখন কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্ত হল এবং কেউ কেউ কাফেরদের সুরে সুর মিলিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা শুরু করল। এতে বর্তমান আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অর্থাৎ, হে মুসলমানরা! মুনাফিকদের অবস্থা তো ইতিমধ্যে তোমাদের জানা হয়েছে। এখন এতেই মঙ্গল নিহিত যে, তোমরা সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন কর এবং আত্মরক্ষার্থে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ কর— চাই অস্ত্রধারণ করে অথবা কৌশল অবলম্বন করে অথবা বুদ্ধি খাটিয়ে অথবা সাজসরঞ্জাম দিয়ে। আর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে দলে দলে বিভক্ত হয়ে অথবা সকলে সংঘবদ্ধভাবে, যখন যে রকম সুযোগ হয়, যখন যেমন প্রয়োজন দেখা দেয়– ঘর থেকে বের হয়ে পড়।

১. অর্থাৎ হে মুসলিমগণ! তোমাদের মধ্যে এমন লোকও ঢুকে রয়েছে, যারা জেহাদে যেতে বিলম্ব করে, জেহাদ থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহর হুকুম অমান্য করে। তারা কেবল পার্থিব লাভালাভের অপেক্ষায় থাকে।—এ দ্বারা মুনাফিকরা উদ্দেশ্য, যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সঙ্গীসাথীরা। কারণ, এরা যদিও বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল পার্থিব সুযোগ-সুবিধা। আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার লক্ষ্য ওদের মোটেও ছিল না।

২. প্রথমে বলা হয়েছিল যে, মুনাফিকরা বের হতে বিলম্ব করে এবং জেহাদে গমণকারীদের অবস্থা কী, তার অপেক্ষা করতে থাকে। এখন আল্লাহ তাআলা বলছেন, জেহাদে গমনের পর মুসলমানদের যদি কোন কষ্টদায়ক ঘটনা ঘটে, যেমন নিহত বা পরাজিত হল, তখন মুনাফিকরা খুব খুশী হয় এবং বলে, 'আল্লাহর বিরাট মেহেরবানী যে, আমরা যুদ্ধে তাদের সঙ্গে ছিলাম না, নতুবা আমাদেরও রক্ষা হত না। আলহামদুলিল্লাহ, দারুণ বাঁচা বেঁচে গেলাম!!'

لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝٧٣

থেকে অনুগ্রহ হয়, তবে সে এমনভাবে, যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোন বন্ধুত্বই ছিল না– অবশ্যই বলবে, 'হায়! যদি আমি তাদের সঙ্গে থাকতাম, তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম[১]।'

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝٧٤

৭৪. অতএব তারা যেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে। আর যে কেউ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, অতঃপর সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক, আমি অবশ্যই তাকে দান করব মহা প্রতিদান[২]।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ

৭৫. তোমাদের কী হল যে, তোমরা যুদ্ধ কর না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য? যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদের এই জনপদ থেকে বের করে নিয়ে যান, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী। আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কোন অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন এবং আমাদের জন্য নিযুক্ত করে দিন আপনার পক্ষ থেকে

---

১. অর্থাৎ যদি মুসলমানদের উপর আল্লাহর দয়া হয়, যেমন বিজয় লাভ হল অথবা গণীমতের বিস্তর মাল হাতে এল, তবে মুনাফিকরা (যারা জেহাদে যায়নি) দারুণ আফসোস করে, বরং শত্রুদের মত হিংসার আতিশয্যে বলতে থাকে, 'হায় আফসোস! মুসলমানদের সঙ্গে যদি আমরা জেহাদে থাকতাম, তবে আমাদেরও বিরাট সাফল্য লাভ হত। অর্থাৎ গণীমতের মাল হাতে আসত।' অর্থাৎ মুনাফিকদের কেবল নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য আফসোস হয় না, বরং নিজেদের দুর্ভাগ্যের চেয়েও মুসলমানদের সৌভাগ্যের কারণে ওদের হিংসা ও কষ্ট বেশি হয়ে থাকে।

২. অর্থাৎ মুনাফিকরা যদি জেহাদ থেকে বিরত থাকে তবে থাকুক এবং যদি কেবল নিজেদের পার্থিব চিন্তায় ব্যস্ত থাকে তবে থাকুক, কিন্তু যারা আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়েছে, তাদের উচিত আল্লাহর পথে নির্দ্বিধায় সংগ্রাম করা এবং পার্থিব জীবনের ধন-দৌলতের প্রতি লক্ষ না করা এবং এই সত্য উপলব্ধি করে নেওয়া যে, আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর মধ্যেই সর্বপ্রকার কল্যাণ নিহিত– বিজয়-পরাজয় যাই ঘটুক, এবং ধন-সম্পদ লাভ হোক বা না হোক।

وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾

কোন সাহায্যকারী[১]।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾

৭৬. যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কাফের, তারা তাগুতের (শয়তানের) পথে যুদ্ধ করে। অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল[২]।

[রুকূ - ১১]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ

৭৭. তুমি কি তাদের দেখনি, যাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা নিজেদের হাত সংযত রাখ এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান করতে থাক[৩]?' অতঃপর যখন তাদের উপর যুদ্ধ

---

১. অর্থাৎ দুই কারণে কাফেরদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ করা আবশ্যক। এক, আল্লাহর দীনকে বুলন্দ ও জয়ী করার উদ্দেশ্যে। দুই, যে সকল নিপীড়িত মুসলমান মক্কায় কাফেরদের হাতে অসহায় অবস্থায় রয়ে গেছে, তাদের উদ্ধার ও মুক্ত করার জন্য।

মক্কায় এমন অনেক মুসলমান ছিলেন, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হিজরত করতে পারেননি। তাদের (কাফের) আত্মীয়স্বজন তাদের কষ্ট দিতে শুরু করে, যাতে পুনরায় তারা কাফের হয়ে যান। তাই আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের আদেশ দিলেন যে, দুই কারণে তোমাদের কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে– যাতে আল্লাহর দীন বুলন্দ হয় এবং যাতে নিপীড়িত ও দুর্বল মুসলমানরা মক্কার কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি পায়।

২. অর্থাৎ যখন এ কথা সুস্পষ্ট যে, মুসলমানরা আল্লাহর পথে এবং কাফেররা শয়তানের পথে লড়াই করে, অতএব শয়তানের বন্ধু কাফেরদের বিরুদ্ধে নির্দ্বিধায় লড়াই করা মুসলমানদের জন্য জরুরী। তাদের সাহায্যকারী তো আল্লাহ তাআলা, অতএব কোন প্রকার দ্বিধা করা উচিত নয়।

আর জেনে রাখ, শয়তানের কৌশল ও চক্রান্ত দুর্বল, মুমিনদের বিরুদ্ধে তা চলতে পারে না।

এর উদ্দেশ্য, জেহাদের প্রতি মুসলমানদের উৎসাহিত করা এবং তাদের মনোবল বৃদ্ধি করা। পরবর্তী আয়াতগুলিতে স্পষ্টতার সঙ্গে এই আলোচনা আসবে।

৩. হিজরতের পূর্বে মক্কায় কাফেররা মুসলমানদের খুবই কষ্ট দিত ও জুলুম-অত্যাচার করত। মুসলমানগণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাযির হয়ে অভিযোগ করতেন এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ও প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি চাইতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের এই বলে বিরত রাখতেন যে, আমাকে যুদ্ধের

إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ
كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا
رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَا
أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ
الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ
اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

ফরয করা হল, অমনি তাদের একদল লোক মানুষকে ভয় করতে লাগল আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা এর চেয়েও বেশি এবং বলতে লাগল, 'হে আমাদের রব! কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করলেন, কেন আমাদের আরো কিছুকাল পর্যন্ত অবকাশ দিলেন না[1]?' আপনি বলে দিন, 'দুনিয়ার ভোগ অতি সামান্য এবং আখেরাতই উত্তম পরহেজগারের জন্য। আর তোমাদের প্রতি সুতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না[2]।'

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ

৭৮. তোমরা যেখানেই থাকবে, মৃত্যু এসে তোমাদের ধরবে– যদিও তোমরা সুদৃঢ়

হুকুম দেওয়া হয়নি বরং ধৈর্য ও ক্ষমার নির্দেশ রয়েছে। আরো বলতেন যে, তোমাদের প্রতি নামায ও যাকাতের যে হুকুম হয়েছে, তা নিয়মিত পালন করতে থাক। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে মানুষ স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে এবং শারীরিক কষ্ট-যাতনা সহ্য করতে অভ্যস্ত না হয় এবং নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে জেহাদ করা এবং প্রাণ উৎসর্গ করা খুবই কঠিন। মুসলমানগণ এই উপদেশ গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

১. হিজরতের পর যখন মুসলমানদের প্রতি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম হল, তখন তো তাদের এই ভেবে আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল যে, আমাদের দরখাস্ত কবুল হয়েছে এবং উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে। কিন্তু কতক অপরিপক্ক মুসলমান কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করাকে এমন ভয় পেতে লাগল যেমন ভয় আল্লাহর শাস্তিকেই করা উচিত, অথবা তার চেয়ে বেশি। আর তারা আকাঙ্ক্ষা করতে লাগল যে, আরো কিছুকাল যুদ্ধের হুকুম যদি না আসত এবং তারা জীবিত থাকতে পারত, তবে কতই না ভাল হত।

২. অর্থাৎ যেহেতু দুনিয়ার জীবন এবং তার স্বার্থ-সামগ্রীর আকর্ষণহেতু তাদের নিকট জেহাদের হুকুম ভারী মনে হল, সেহেতু আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, তাদের বলে দিন, দুনিয়ার সমগ্র স্বার্থ-সামগ্রী অতি তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী, আর পরকালের ছওয়াব তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকে। সুতরাং তোমাদের উচিত দুনিয়ার স্বার্থ-চিন্তা না করা, আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনে ত্রুটি না করা এবং জেহাদ করতে ভয় না করা। আর নিশ্চিন্ত থাক যে, তোমাদের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ছওয়াব মোটেই বিনষ্ট হবে না। অতএব সাহসিকতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তোমাদের জেহাদে যোগদান করা উচিত।

كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ۝

দুর্গসমূহে থাক[১]। যদি ওদের কোন কল্যাণ লাভ হয় তবে বলে, 'এ আল্লাহর পক্ষ থেকে'; আর যদি ওদের উপর কোন অকল্যাণ পতিত হয়, তবে বলে, 'এ আপনার পক্ষ থেকে[২]।' আপনি বলে দিন, 'সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।' সুতরাং এ লোকদের কী হল, এরা যেন কোন কথাই বোঝে না[৩]?

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ

৭৯. তোমার যা কিছু কল্যাণ লাভ হয়, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর তোমার উপর যা কিছু অকল্যাণ এসে পড়ে, তা তোমার

---

১. অর্থাৎ যতই দৃঢ়, নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন স্থানে থাক না কেন, মৃত্যু কিছুতেই তোমাদের ছাড়বে না। কেননা, মৃত্যু প্রত্যেকের ভাগ্যে লেখা ও নির্ধারিত রয়েছে– যেখানেই থাক যথাসময়ে তা উপস্থিত হবেই। অতএব জেহাদে যদি না যাও, তবুও মৃত্যুর হাত থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবে না। সুতরাং এখনো জেহাদে যেতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া, মৃত্যুকে ভয় করা এবং কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ভীত-বিহ্বল হওয়া সম্পূর্ণ মূর্খতা এবং ইসলামে অপরিপক্ক হওয়ারই পরিচায়ক।

২. অর্থাৎ মুনাফিকদের আরেকটি অদ্ভুত অবস্থা এই যে, যদি যুদ্ধের কলা-কৌশল সঠিক হয়, বিজয় লাভ হয় এবং গনীমতের মাল হস্তগত হয়, তবে ওরা বলে, এ আল্লাহর তরফ থেকে। অর্থাৎ ঘটনাচক্রে এমনটি হয়েছে। (মোটকথা,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রণ-কৌশলের স্বীকৃতি দেয় না। পক্ষান্তরে, যদি চেষ্টা-তদবীরে কাজ না হয় এবং পরাজয় ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রণ-কৌশলকে দোষী সাব্যস্ত করে।

৩. আল্লাহ তাআলা বলছেন, হে নবী! ওদেরকে উত্তর দিয়ে দিন যে, কল্যাণ ও অকল্যাণ সবই আল্লাহর তরফ থেকে আসে, সকল কিছুরই স্রষ্টা ও উৎস আল্লাহ তাআলা, তাতে কারো দখল নেই। আর নবীর কৌশল আল্লাহরই তরফ থেকে আসে। সুতরাং নবীর উপর দোষারোপ করা তোমাদের ভ্রান্তি ও নির্বুদ্ধিতা।

আর বিপর্যস্ত অবস্থাকে কেবলই বিপর্যয় মনে করো না, এ বরং আল্লাহর হেকমত, তোমাদেরই দোষ-ত্রুটির কারণে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং পরীক্ষা করেন।

মুনাফিকদের অভিযোগের বিরুদ্ধে এ হল সংক্ষিপ্ত উত্তর। পরবর্তী আয়াতে এর বিশদ ব্যাখ্যা আসছে।

وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝٧٩

নিজের পক্ষ থেকে[১]। আমি আপনাকে মানব জাতির জন্য বাণীবাহকরূপে পাঠিয়েছি। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট[২]।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝٨٠

৮০. যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে মুখ ফিরিয়ে নিল, তো আমি আপনাকে তাদের পর্যবেক্ষকরূপে পাঠাইনি[৩]।

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ؗ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ؕ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

৮১. ওরা বলে, আনুগত্য (কবুল)। তারপর যখন আপনার কাছ থেকে বেরিয়ে যায়, তো ওদের একদল রাতে তার বিপরীত পরামর্শ করে যা (আপনাকে) বলে। আর ওরা রাতে যা পরামর্শ করে, আল্লাহ তা লিখে রাখেন। অতএব আপনি ওদের উপেক্ষা করুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আর

---

১. অর্থাৎ আসল কথা এই যে, যদিও সমগ্র ভাল ও মন্দের স্রষ্টা আল্লাহই, কিন্তু বান্দার কর্তব্য– নেকী ও কল্যাণকে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ এবং বিপদাপদ ও অকল্যাণকে নিজের কর্মফল মনে করা। নবীর উপর এর দোষ আরোপ করা উচিত নয়। নবী মন্দ ও অকল্যাণের স্রষ্টাও নন, কারণও নন। বরং আল্লাহ তাআলা এ সবের স্রষ্টা আর তোমাদের কর্ম এর কারণ।

২. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের অভিযোগ খণ্ডন করার পর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন যে, আমি আপনাকে সমগ্র মানব গোষ্ঠীর জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছি এবং আমার সব কিছু জানা আছে, আমি সকলের আমলের বদলা অবশ্যই দেব। আপনি কারো অর্থহীন অস্বীকৃতি ও অভিযোগের পরোয়া করবেন না, বরং রেসালাতের দায়িত্ব পালন করতে থাকুন।

৩. আপনার রেসালাত প্রতিষ্ঠা করার পর আল্লাহ তাআলা আপনার ব্যাপারে এখনই এ বিধান দিচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করবে সে নিঃসন্দেহে আমার অনুগত, আর যে ব্যক্তি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে– তবে আমি আপনাকে, হে রাসূল! ওদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি যে, আপনি ওদেরকে গোনাহ থেকে বাধা দিয়ে রাখবেন। আমি ওদের দেখে নেব; আপনার দায়িত্ব কেবল আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া। পুরস্কার বা শাস্তি দান আমার কাজ।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٨١﴾

কার্যসম্পাদনকারী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট[১]।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ﴿٨٢﴾

৮২. ওরা কি কুরআনে গভীরভাবে চিন্তা করে না? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই এতে বহু বৈপরীত্য পেত[২]।

---

১. মুনাফিকদের আরো শঠতা-প্রবঞ্চনার কথা শোনো। ওরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তো বলে যায়, আপনার হুকুম আমরা কবুল করলাম। অথচ বাইরে গিয়ে এর বিপরীত পরামর্শ করে; অর্থাৎ আপনার নাফরমানী ও বিরোধিতার পরামর্শ করে।

কিন্তু ওদের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার নিকটে ওদের সকল পরামর্শ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। অতএব, হে নবী! ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং কোন কিছুর পরোয়া করবেন না, আর নিজের সকল কাজ আল্লাহর হাওয়ালা করে দিন– তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট।

২. পূর্ববর্তী আয়াতগুলির দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে– হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর আনুগত্য আল্লাহরই আনুগত্য এবং তাঁর অবাধ্যদের উপর আল্লাহর শাস্তি আসা অবধারিত। কিন্তু মুনাফিক ও তাঁর বিরোধীরা এ কথা বলতে পারত যে, আল্লাহর কথা ও বাণীসমূহ মানতে তো আমাদের অবশ্যই দ্বিধা নেই, তবে এ যে খোদার কালাম, মানুষের মনগড়া নয়, তা কেমন করে বুঝি? এরই উত্তরে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন–

কুরআনে নেই কোন বৈপরীত্য ও অসংগতি

আসলে, এই লোকেরা কুরআনে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখে না। যদি তা করত তবে পরিষ্কার বুঝতে পারত যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। চিন্তা করে দেখ, যদি কুরআন আল্লাহর বাণী না হত, যেমন তোমরা মনে কর, তবে অবশ্যই কুরআনের অনেক স্থানে বিরোধ ও অসংলগ্নতা পাওয়া যেত। লক্ষ করে দেখ, মানুষ যখন যে অবস্থা বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তখন সেই অবস্থানুরূপ কথা বলে থাকে, অন্য অবস্থার চিন্তা আসে না। রাগের অবস্থায় দয়ামায়ার কথা এবং দয়ার্দ্র অবস্থায় রাগের কথা চিন্তায় আসে না। দুনিয়ার আলোচনায় পরকালের বিবেচনা এবং পরকালের আলোচনা করতে ইহকালের বিবেচনা থাকে না। উপেক্ষার আলোচনায় সমাদরের উল্লেখ আর সমাদরের আলোচনায় উপেক্ষার উল্লেখ থাকে না। মোটকথা, এক অবস্থার কথা অন্য অবস্থার কথা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু কুরআন শরীফ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বাণী বলে এতে প্রত্যেকটি জিনিসের বর্ণনাকালে অপরাপর দিকেও লক্ষ থাকে। গভীর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার আলোকে দেখা যায়, কুরআনের মধ্যে প্রত্যেক স্থলে প্রত্যেকটি বিষয়ের আলোচনা ভারসাম্যপূর্ণ আন্দাজে হচ্ছে। লক্ষ করুন, এস্থলে মুনাফিকদের আলোচনা ছিল, যারা কঠোর সমালোচনার যোগ্য ছিল। কিন্তু এখানেও ওদের আলোচনা করতে গিয়ে ততটুকু অভিযোগই করা হয়েছে যতটুকু

وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ؕ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ؕ وَلَوْ لَا

৮৩. যখন ওদের নিকট শান্তি কিংবা ভয়ের কোন সংবাদ আসে, ওরা তা প্রচার করে দেয়[১]। অথচ ওরা যদি তা রাসূলের কাছে ও ওদের দায়িত্বশীলদের কাছে নিয়ে যেত, তবে তাদের মধ্যে যারা তার স্বরূপ উদঘাটন করতে পারে তারা অবশ্যই তার স্বরূপ জেনে নিত[২]। যদি তোমাদের উপর আল্লাহর

সমীচীন ছিল। আর যে অভিযোগ ওদের বিশেষ একটি দলের বিরুদ্ধে ছিল, তা ঠিক ঐ দলেরই উপর আরোপ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, ওদের একদল এমন করে থাকে (بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ...)। এমন কোথাও দেখা যায় না যে, রাগ বা উত্তেজনা ইত্যাদি অবস্থায় কথা নিজ সীমা ছেড়ে যাচ্ছে এবং অন্য অবস্থার কথার সাথে সামঞ্জস্যহীন মনে হচ্ছে।

তদুপরি এও লক্ষণীয় যে, মানুষ দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করলে দেখা যায়, তা আগাগোড়া এক রকম হয় না, বরং কোন বাক্য সাহিত্যমানে উন্নত আর কোন বাক্য অনুন্নত, কোন কথা সঠিক, কোন কথা ভুল, কোন কোন কথা পরস্পর সদৃশ আবার কোন কোনটি পরস্পরবিরোধী। কিন্তু কুরআন এত বড় গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও এ সকল বৈষম্য ও অসংগতি থেকে পবিত্র, যা মানব ক্ষমতা-বহির্ভূত।

বি. দ্র. আয়াতে এ দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি গভীর চিন্তা ও গবেষণা না করবে, সে কুরআনের মধ্যে সন্দেহ ও বৈষম্য-অসংগতির ধারণা করতে পারে, কিন্তু গবেষণাকারী ব্যক্তির পক্ষে এমনটা হতেই পারে না। যেমন ধরুন, একটু পূর্বেই বলা হয়েছে- قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ -এর পর পরই বলা হচ্ছে- وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ এতে যে ব্যক্তি গভীর চিন্তা করবে না, তার কাছে আয়াত দুটি পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে (অথচ এখানে কোন বৈপরীত্য নেই, যেমন একটু পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে)।

১. অর্থাৎ উক্ত মুনাফিক ও স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানদের একটা দোষ এই যে, যখন তারা শান্তি ও নিরাপত্তার কোন সংবাদ শোনে, যেমন: কারো সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধির ইচ্ছা করলেন কিংবা ইসলামী সৈন্যদলের বিজয়ের সংবাদ শুনল; অথবা তারা যখন আশঙ্কাজনিত কোন সংবাদ শুনে ফেলে, যেমন: শত্রু-সৈন্যের কোথাও সমবেত হওয়া বা মুসলমানদের পরাজয়ের সংবাদ আসা– এমন পরিস্থিতিতে তারা ঘটনার সত্যাসত্য পরীক্ষা না করে তা রটাতে শুরু করে দেয় এবং তাতে অধিকাংশ সময় মুসলমানরা ফেতনা-ফাসাদ ও ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বস্তুত মুনাফিকরা ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে, আর স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানরা বুদ্ধির স্বল্পতায় এমন করত।

২. অর্থাৎ কোথাও থেকে কোন সংবাদ এলে তা প্রথমে নেতা ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গের গোচরে আনা উচিত। তারা যদি তার সত্যাসত্য তাহকীক (বা তদন্ত) করে গ্রহণ করে, তবে তাদেরই কথামত তা স্থান বিশেষে উল্লেখ করবে ও তা অনুযায়ী আমল করবে।

فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۸۳﴾

অনুগ্রহ ও মেহেরবানী না হত, তবে নিশ্চয় তোমরা শয়তানের অনুসরণ করতে—অল্প সংখ্যক ছাড়া[১]।

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

৮৪. অতএব আপনি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুন– আপনার উপর কেবলমাত্র আপনার নিজের দায়ভার ন্যস্ত– এবং মুসলমানদের (তাতে) উদ্বুদ্ধ করুন। আশা করা যায় যে, আল্লাহ কাফেরদের শক্তি প্রতিহত করবেন[২]। আর

বি. দ্র. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার জন্য এক সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলেন। সেই সম্প্রদায় তাকে স্বাগত জানানোর জন্য সম্মুখে অগ্রসর হলে তার ধারণা হল, তারা তাকে আক্রমণ করতে আসছে। এই ভেবে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং রটিয়ে দিলেন যে, উক্ত সম্প্রদায় মুরতাদ হয়ে গেছে। এ সংবাদ সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল এবং পরিশেষে ভুল বলে সাব্যস্ত হল।

১. অর্থাৎ যদি আল্লাহ দয়া করে তোমাদের এসলাহ ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য আহকাম না পাঠাতেন এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুসারে তোমাদের হেদায়েত ও সতর্ক না করতে থাকতেন, যেমন এস্থলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও নেতৃস্থানীয় লোকদের শরণাপন্ন হতে নির্দেশ দিলেন—তবে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবিশেষ অর্থাৎ পরিপূর্ণ জ্ঞানী ও ঈমানদার লোকদের ছাড়া তোমরা গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) হয়ে যেতে। সুতরাং এসব সতর্কবাণীকে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ জ্ঞান কর, শোকর আদায় কর এবং সেই মত কাজ কর।

২. অর্থাৎ যদি উল্লিখিত মুনাফিক ও অপরিপক্ক মুসলমানরা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ভয় করে, তবে হে রাসূল! আপনি একাকী নিজেই জেহাদ করতে বিলম্ব করবেন না, আল্লাহ আপনার সাহায্যকারী। আর মুসলমানদের জেহাদে উদ্বুদ্ধ করুন। যারা যোগদান করবে না তাদের পরোয়া করবেন না। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা কাফেরদের যুদ্ধ ব্যাহত করে দেবেন।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একজনও যদি সঙ্গী না হয় তবু আমি অবশ্যই জেহাদে যাচ্ছি। অতঃপর মাত্র সত্তরজনের কাফেলাসহ তিনি 'বদরে সুগরা' জেহাদে গেলেন। উহুদ যুদ্ধের পর আবু সুফিয়ানের সাথে এই জেহাদের ওয়াদা করা হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা আবু সুফিয়ান ও কাফের সৈন্যদলের মনে এমন প্রভাব ও ভীতির সঞ্চার করে দিলেন যে, কেউই মোকাবেলা করতে আসেনি, ফলে ওরা স্বীয় ওয়াদায় মিথ্যা সাব্যস্ত হল। এভাবে আল্লাহ তাআলা নিজ ইরশাদ অনুযায়ী কাফেরদের যুদ্ধ ব্যাহত করে দিলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সহী-সালামতে প্রত্যাবর্তন করলেন। (তাফসীরে তবারী ৬/২৪২-২৪৩)

وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ⑧⑭

আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিশালী ও কঠোর শাস্তিদাতা[১]।

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ مُّقِيْتًا ⑧⑮

৮৫. যে কেউ ভাল সুপারিশ করবে, সে তা থেকে একটি অংশ পাবে; আর যে কেউ মন্দ সুপারিশ করবে, এর একটি দায়-ভার তার উপর বর্তাবে[২]। আর আল্লাহ সব কিছুর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন[৩]।

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوْ رُدُّوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ حَسِيْبًا ⑧⑯

৮৬. যখন তোমাদের সালাম করা হয়, তখন তার চেয়ে উত্তম পন্থায় সালাম দিয়ো অথবা উত্তরে তাই বলো। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের হিসাবগ্রহণকারী[৪]।

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পাকড়াও ও তাঁর শাস্তি কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে অনেক কঠোর। অতএব যারা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে, ওদের হত্যা করতে এবং ওদের হাতে শাহাদাত বরণ করতে ভয় করে, তারা আল্লাহ তাআলার রোষ ও তাঁর শাস্তি কেমন করে সইতে পারবে?

২. অর্থাৎ কেউ যদি সৎকাজে চেষ্টা-সুপারিশ করে, যেমন মুসলমানদের জেহাদে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়া, তবে এতে ছওয়াবের অংশ পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি মন্দকাজে সচেষ্ট হয়, যেমন মুনাফিক ও দুর্বল মুসলমানরা জেহাদে যেতে ভীত হয়ে অন্যদেরও ভীত করে, তবে এতে গোনাহর অংশ লাভ হবে।

অনুরূপ, কেউ যদি অভাবীর জন্য ধনীর নিকট সুপারিশ করে কিছু দান করাতে পারে, তবে সুপারিশকারীও দানের ছওয়াবে অংশীদার হবে। পক্ষান্তরে, কেউ যদি কোন ফেতনাবাজ কাফের বা চোরকে সুপারিশ করে ছাড়িয়ে নেয়, অতঃপর সে আবার ফেতনা বা চুরি করে, তবে সুপারিশকারীও ফেতনা বা চুরির অপরাধে অংশীদার হবে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান এবং প্রত্যক বিষয়ের অংশ বন্টনকারী। সুতরাং নেকী ও গোনাহর অংশ বন্টনে তাঁর কোনই অসুবিধা নেই।

৪. অর্থাৎ কোন মুসলমানকে সালাম দেওয়া বা দো'য়া করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার নিকট তার জন্য সুপারিশ করা। অতএব মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ও সুবিদিত উত্তম সুপারিশের একটি বিশেষ পন্থার কথা আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বয়ান করছেন এবং এ প্রসঙ্গেই বলছেন, হে মুসলিমরা! যখন কেউ তোমাদের সালাম দেয়, তখন তোমাদের উচিত এর উত্তর দেওয়া। সে ক্ষেত্রে তোমরাও ঐ বাক্য দিয়ে বা তার চেয়ে উত্তম বাক্য দিয়ে উত্তর দাও। যেমনঃ কেউ যদি 'আসসালামু আলাইকুম' বলল, তদুত্তরে 'ওয়াআলাইকুমুস্ সালাম' বলা

৮৭. আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের কিয়ামত দিবসে সমবেত করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। আর কে আল্লাহর চেয়ে কথায় অধিক সত্যবাদী[১]?

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ﴿٨٧﴾

[রুকূ - ১২]

৮৮. তোমাদের কী হল যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু'দল হয়ে গেলে, অথচ আল্লাহ ওদেরই কৃতকর্মের কারণে ওদেরকে উলটা দিকে (অর্থাৎ কুফরীর দিকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন? তোমরা কি তাকে পথে আনতে চাও, যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন? আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি আদৌ তার জন্য কোন পথ পাবে না[২]।

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿٨٨﴾

তোমাদের উপর ওয়াজিব। আর অধিকতর ছওয়াব চাইলে সেই সঙ্গে 'ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ'ও লাগিয়ে দাও। আর সালামদাতাই যদি এই শব্দ বলে থাকে, তবে তোমরা 'ওয়া বারাকাতুহু' যোগ করে দাও। আল্লাহর কাছে প্রত্যেক বিষয়ের হিসাব হবে এবং তার প্রতিদান মিলবে। এতে সালাম ও এর উত্তরও অন্তর্ভুক্ত।

বি. দ্র. আয়াতে ভাল বিষয়ে সুপারিশ করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং মন্দ বিষয়ে সুপারিশ করার ক্ষতি ও অকল্যাণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা, যে ব্যক্তি ভাল সুপারিশ করবে তাকে আল্লাহ তাআলা ছওয়াব দান করবেন। এবং যার সুপারিশ করেছে তাকে সুপরাশিকারীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও প্রত্যুপকারের আদেশ করেছেন। পক্ষান্তরে, মন্দ সুপারিশের ক্ষেত্রে গোনাহ ও বঞ্চিতি ছাড়া কিছুই লাভ হবে না।

১. অর্থাৎ কিয়ামত যে আসবে এবং ছওয়াব ও শাস্তিসম্পকির্ত সব ওয়াদাই যে পূর্ণ হবে– এ সবই সত্য, এতে অন্যথা হবে না। এসব বিষয়কে মামুলি মনে করো না।

২. এস্থলে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত তারাও, যারা বাহ্যতও ঈমান আনেনি, বরং প্রকাশ্যে ও গোপনে কুফরে লিপ্ত ছিল, কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের সঙ্গে বাহ্যিক মেলামেশা ও সৌজন্যের সম্পর্ক রাখত। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যদি মুসলমান সৈন্যবাহিনী কাফেরদের উপর আক্রমণ করে, তবে যেন এই কৌশলে জান-মাল রক্ষা পায়।

শানে নুযূল ও মর্ম

এহেন মুনাফিকী উদ্দেশ্য জানতে পেরে মুসলমানদের একদল এই দুরাচারীদের সাথে মেলামেশা বর্জন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, যাতে ওরা মুসলমান সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন বলে

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ
سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى
يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا
فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ
وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

৮৯. ওরা মনে-প্রাণে চায় যে, তোমরাও কাফের হয়ে যাও যেরূপ ওরা কাফের হয়েছে। তা হলে তোমরা সকলে সমান হয়ে যাবে। অতএব তোমরা ওদের মধ্য থেকে বন্ধু গ্রহণ করো না যতক্ষণ না ওরা আল্লাহর পথে হিজরত করে। আর যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে ওদের ধর ও হত্যা কর যেখানেই ওদের পাও এবং ওদের মধ্য থেকে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী গ্রহণ করো না[১]—

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ
صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا
قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ
عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ
فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ
فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۝

৯০. তবে তাদের বিষয় ভিন্ন, যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রাখে যাদের ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে; অথবা যারা তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় আসে যে, তাদের অন্তর সংকুচিত– তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং স্বজাতির বিপক্ষেও যুদ্ধ করতে। আর যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তোমাদের উপর ওদের প্রবল করে দিতেন, ফলে ওরা অবশ্যই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। অতএব ওরা যদি তোমাদের থেকে নির্লিপ্ত হয় এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে ও তোমাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পেশ

চিহ্নিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, কতক মুসলমান ওদের ঈমান গ্রহণের আশায় পূর্ব সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে চাইলেন। এতে বর্তমান আয়াত অবতীর্ণ হল। (তাফসীরে তবারী ৭/২৮৪-২৮৫) আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে যে, হেদায়েত ও গোমরাহী আল্লাহর হাতে, তোমরা এর ফিকির করো না। অতএব তোমরা সম্মিলিতভাবে ওদের সাথে সেই ব্যবহারই কর, পরবর্তী আয়াতে যার উল্লেখ হচ্ছে। কিছুতেই ওদের ব্যাপারে দুই দল হয়ো না।

১. অর্থাৎ উক্ত মুনাফিক লোকেরা কুফরের উপর এমন দৃঢ়পদ যে, নিজেরা ইসলাম গ্রহণ করবে দূরের কথা, ওরা তো বরং চায় তোমরাও ওদের মত কাফের হয়ে ওদের সমান হয়ে যাও। সুতরাং এখন তোমাদের কর্তব্য, যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা ঈমান এনে স্বদেশ ত্যাগ করে (মদীনায়) তোমাদের কাছে চলে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের বন্ধু বানিয়ো না। ওদের সাহায্য-সহায়তাও করো না। বরং যদি ওরা ঈমান ও হিজরত কবুল না করে, তবে ওদের যেখানে বাগে পাও বন্দী কর ও হত্যা কর। অধিকন্তু ওদের থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাক এবং কোনই সম্পর্ক রেখো না।

করে, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য ওদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখেননি[১]।

৯১. তোমরা অবশ্যই অন্য কিছু লোক পাবে, যারা তোমাদের থেকে নিরাপদে থাকতে চায় এবং নিজ সম্প্রদায় থেকেও নিরাপদে থাকতে চায়। যখনই ওদের (দৃষ্টি) ফাসাদের দিকে ফেরানো হয়, তৎক্ষণাৎ তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অতএব ওরা যদি তোমাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত না হয়, তোমদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পেশ না করে এবং নিজেদের হাত সংবরণ না করে, তবে ওদের ধর ও হত্যা কর যেখানেই ওদের পাও। আর ওদেরই বিরুদ্ধে আমি তোমাদের স্পষ্ট সনদ দিয়েছি[২]।

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۟

১. অর্থাৎ, বাহ্যিক মেলামেশার কারণে উক্ত লোকদের বন্দী করা ও হত্যা করা থেকে রেহাই দিয়ো না। তবে দুটি ক্ষেত্র এর ব্যতিক্রম। এক, যাদের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি রয়েছে তাদের সঙ্গে যদি ওরাও অঙ্গীকার ও সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়, তবে ওরাও তোমাদের সন্ধির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। দুই, উল্লিখিত মুনাফিকদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করতে অক্ষম হয়ে তোমাদের সঙ্গে সন্ধি করে এবং এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় যে, ওরা নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ হয়েও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং তোমাদের পক্ষ হয়েও স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, তদুপরি এই চুক্তির উপর কায়েমও থাকে– এমন লোকদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করো না। বরং ওদের সন্ধির প্রস্তাব মঞ্জুর করে নাও।

আর ওরা যে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রয়েছে, একে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ মনে কর। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তোমাদের উপর ওদের নির্ভীক ও প্রবল করে দিতে পারতেন।

২. অর্থাৎ কতক লোক এমনো আছে, যারা তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করে যায় যে, তোমাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করবে না এবং স্বজাতির বিরুদ্ধেও না, যাতে ওরা উভয় থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। কিন্তু ওরা উক্ত অঙ্গীকারের উপর কায়েম থাকে না, বরং যখন স্বজাতির প্রাবল্য দেখতে পায় তখন ওদের সাহায্যকারী হয়ে যায়। সুতরাং এমন লোকদের তোমরাও ক্ষমা করো না। তোমাদের হাতে তো সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে যে, ওরা স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলেছে।

[রুকূ - ১৩]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰۤى اَهْلِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ؕ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰۤى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؗ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ

৯২. কোন মুসলমানের কাজ নয় মুসলমানকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত (করলে ভিন্ন কথা)[১]। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ভুলবশত হত্যা করবে, (তার জন্য জরুরী) একজন মুসলিম দাস মুক্ত করা এবং নিহতের পরিবারবর্গকে রক্তপণ প্রদান করা, তবে তারা ক্ষমা করে দিলে (ভিন্ন কথা)। আর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু-সম্প্রদায়ের হয় এবং সে নিজে মুসলমান হয়, তবে (হত্যাকারীর জন্য জরুরী) একজন মুসলিম দাস মুক্ত করা। আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ের হয়, যাদের ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে, তবে (হত্যাকারীর জন্য জরুরী) নিহতের পরিবারবর্গকে রক্তপণ প্রদান করা এবং একজন মুসলিম দাস মুক্ত করা। আর যে ব্যক্তি সামর্থ্য না রাখে, (তার জন্য জরুরী)

---

১. এস্থলে ভুলবশত (বা অনিচ্ছাকৃত) হত্যার বিধান বর্ণিত হচ্ছে। প্রথমে বলা হয়েছে যে, ইসলামের কলেমা পাঠকারীকে হত্যা করা মহাপাপ। কিন্তু ভুলবশত হত্যা করা হলে সেটা অপারগতা। অতঃপর এমন হত্যার বিধান বর্ণিত হয়েছে। তারপর প্রসঙ্গত জেহাদকারীদের ফযীলত এবং দারুল-কুফর থেকে দারুল-ইসলামের দিকে হিজরত করার আবশ্যকতা এবং সফর ও ভয়-ভীতির কালে নামায-পদ্ধতির কথা বর্ণিত হবে।

ভুলবশত হত্যার বিভিন্ন অবস্থা

ভুলবশত হত্যা অর্থাৎ মুসলমানকে ভুলে হত্যা করার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে– যেমন ভুলে মুসলমানকে শিকার জন্তু মনে করে মেরে ফেলল, বা শিকারেরই প্রতি তীর বা গুলি নিক্ষেপ করল, কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে লাগল কোন মুসলমানের গায়ে। ভুলক্রমে হত্যার একটি অবস্থা এও যে, কাফেরদের মধ্যে একজন মুসলমান রয়েছে, তাকে কাফের মনে করে হত্যা করে ফেলল।

এখানে এই অবস্থারই বিধান বর্ণনা উদ্দেশ্য, কারণ মুজাহিদদের অনেক সময় এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। আর পূর্ববর্তী আয়াতসমূহেরও বিবেচনায় এস্থলে এ অবস্থাই প্রাসঙ্গিক। তবে অনিচ্ছাকৃত হত্যার অন্যান্য অবস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত, সবগুলোর বিধান একই।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

লাগাতার দু'মাস রোযা রাখা, আল্লাহর নিকট থেকে পাপমোচন করানোর জন্য। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান[১]।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا

৯৩. আর যে কেউ কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম, যাতে সে চিরকাল পড়ে থাকবে। আর আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য প্রস্তুত করবেন মহাশাস্তি[২]।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ

৯৪. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে সফর কর, তখন যাচাই-বাছাই করে

---

১. এ আয়াতে 'ভুলক্রমে হত্যার' দুটি হুকুম বর্ণিত হয়েছে। একটি হল মুসলিম দাস মুক্ত করা, এর সামর্থ্য না থাকলে এক নাগাড়ে দুমাস রোযা রাখা। এ আল্লাহ তাআলার দরবারে নিজ পাপের কাফ্‌ফারাস্বরূপ। দ্বিতীয় হুকুম হল, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের রক্তপণ আদায় করা। এ তাদের হক, তারা মাফ করে দিলে মাফও হতে পারে। কিন্তু কাফফারা কারো মাফের দ্বারা মাফ হতে পারে না।

আর এখানে তিনটি অবস্থা হতে পারে। কেননা, যে মুসলমানকে ভুলে হত্যা করা হয়েছে, তার ওয়ারিসগণ হয় মুসলমান হবে নতুবা কাফের। যদি কাফের হয়, তবে ওদের সাথে হয় সন্ধি রয়েছে কিংবা শত্রুতা। প্রথমোক্ত দুই অবস্থায় (অর্থাৎ তার ওয়ারিসরা মুসলমান হলে, অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কাফের হলে) নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদেরকে রক্তপণ দিতে হবে। তৃতীয় অবস্থায় (অর্থাৎ ওয়ারিসরা কাফের ও শত্রু হলে) রক্তপণ দিতে হবে না। অবশ্য কাফফারা (দাস মুক্ত করা, সামর্থ্য না থাকলে রোযা রাখা) সকল অবস্থাতেই আদায় করতে হবে।

বি. দ্র. দিয়ত বা রক্তপণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ফিকহী গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।

২. অর্থাৎ যদি এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে ভুলে নয়, বরং ইচ্ছা করে এবং মুসলমান বলে জানার পরও হত্যা করে, তবে ওর জন্য রয়েছে পরকালে জাহান্নাম, লানৎ ও মহাশাস্তি। কাফ্‌ফারা দ্বারা এ থেকে রেহাই হবে না। এখন রইল দুনিয়ার শাস্তি, সূরা বাকারাতে (আয়াত ১৭৬) তার আলোচনা হয়েছে।

বি. দ্র. অধিকাংশ আলেমদের নিকট চিরকালীন শাস্তি হচ্ছে সেই ব্যক্তির জন্য, যে মুসলিম হত্যাকে হালাল মনে করে। কেননা, এমন ব্যক্তির কুফরের মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। অথবা 'চিরকাল' বলতে উদ্দেশ্য এই যে, সে সুদীর্ঘকাল জাহান্নামে থাকবে। অথবা অর্থ এই যে, সে ব্যক্তি চিরকালীন শাস্তিরই যোগ্য, তবে আল্লাহ মালিক—তিনি যা খুশী তা করবেন।

سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٩٤﴾

নিয়ো এবং যে ব্যক্তি তোমাদের সালাম প্রদান করে তাকে বলো না, 'তুমি মুসলমান নও'। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহর নিকট রয়েছে প্রচুর গনীমত[১]। তোমরাও তো ইতিপূর্বে এমনই ছিলে, তারপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব তোমরা যাচাই-বাছাই করে নাও[২]। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবহিত[৩]।

---

১. **শানে নুযূল**

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদের উদ্দেশ্যে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ব্যক্তি মুসলমান ছিলেন। তিনি স্বীয় ধন, আসবাবপত্র ও গবাদি পশু নিয়ে ওদের ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছিলেন এবং মুসলমানদের দেখে আস্‌সালামু আলাইকুম বললেন। মুসলমানগণ মনে করলেন যে, সেও কাফের, জান-মাল রক্ষার্থে নিজেকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করছে। সে জন্য তারা তাকে মেরে ফেললেন এবং তার গবাদি পশু ও আসবাবপত্র নিয়ে নিলেন। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২০২৩, ২৪৬২; জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩২৭৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৪৭৫২; সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৫৯১)

এতে বর্তমান আয়াত নাযিল হয় এবং মুসলমানদের সতর্ক ও তাকীদ করে বলা হয়, 'যখন তোমরা জেহাদের নিমিত্ত সফরে যাও তখন অনুসন্ধান করে কাজ করো, চিন্তা-ভাবনা না করে কাজ করো না। যে ব্যক্তি তোমাদের সামনে ইসলাম প্রকাশ করে, তার মুসলমান হওয়া তোমরা কখনই অস্বীকার করবে না। আল্লাহর নিকট প্রচুর সম্পদ রয়েছে, এরূপ তুচ্ছ সম্পদের প্রতি নজর দেওয়া উচিত নয়।

২. তোমরা ইতিপূর্বে এরূপই ছিলে, অর্থাৎ ইসলাম-পূর্ব কালে দুনিয়ার উদ্দেশ্যে অন্যায় খুন করতে। কিন্তু এখন মুসলমান হয়ে কিছুতেই এরূপ করবে না। বরং যাকে মুসলমান হিসাবে সন্দেহও হয়, তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে।

অথবা অর্থ এই যে, ইতিপূর্বে ইসলামের প্রাথমিককালে তোমরাও কাফেরদের শহরে বাস করতে, তোমাদের পৃথক রাষ্ট্র ও পৃথক বাসস্থান ছিল না। এরূপ অবস্থায় তোমাদের ইসলাম যেমন গ্রহণযোগ্য মনে করা হত এবং তোমাদের জান-মালের হেফাজত ও রেয়াত করা হয়েছিল, তেমনি এখন এরূপ মুসলমানদের হেফাজত ও রেয়াত তোমাদেরও অবশ্য কর্তব্য। তদন্ত না করে তাদের কতল করবে না, সতর্কতা ও চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করবে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের বাহ্যিক আমল ও অন্তরের উদ্দেশ্য– সব কিছুই জানেন। অতএব যাকে হত্যা করবে, একমাত্র আল্লাহর হুকুমানুসারে হত্যা করবে, তাতে স্বীয় স্বার্থের যেন মোটেই ভূমিকা না থাকে।

৯৫. মুসলমানদের মধ্যে যারা (ঘরে) বসে থাকে অথচ তাদের কোন ওজর নেই, তারা এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধনসম্পদ ও জান-প্রাণ নিয়ে জেহাদকারীরা সমান নয়। আল্লাহ নিজেদের ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণ নিয়ে জেহাদকারীদেরকে, যারা বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আর প্রত্যেককে আল্লাহ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ জেহাদকারীদেরকে যারা বসে থাকে তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন মহা প্রতিদানের মাধ্যমে–

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۭ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۭ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۭ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٩٥﴾

৯৬. (তা হচ্ছে) আল্লাহর পক্ষ থেকে বহু মর্যাদা, ক্ষমা ও মেহেরবানী[১]। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾

আয়াতে এও উদ্দেশ্য যে, যদি কোন কাফের শুধু জান-মালের ভয়ে তোমাদের সম্মুখে ইসলাম প্রকাশ করে এবং ধোঁকা দিয়ে আত্মরক্ষা করে, তবে আল্লাহ তাআলার সবই জানা আছে, তাঁর শাস্তি থেকে সে রেহাই পেতে পারবে না। তবে তোমরা তাকে কিছুই বলো না, এ তোমাদের করার বিষয় নয়—আমি দেখে নেব।

১. ইতিপূর্বে অজ্ঞাতভাবে ও ভুলক্রমে কোন মুসলমানকে হত্যা করে ফেলার ব্যাপারে ভর্ৎসনা ও সতর্ক করা হয়েছে। এতে কারও কারও জেহাদ থেকে বিরত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কারণ, মুজাহিদদের প্রায়ই এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। অতএব জেহাদকারীদের ফযীলত বর্ণনা করে জেহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে।

আয়াতের সারার্থ এই যে, খোঁজা, পঙ্গু, অন্ধ, অসুস্থ প্রভৃতি অসমর্থ লোকদের প্রতি জেহাদের হুকুম নেই। এদের ছাড়া সকল মুসলমানের মধ্যে জেহাদকারীদের এমন উচ্চ মর্যাদা রয়েছে, যা জেহাদ থেকে যারা বিরত থাকে তাদের নেই; যদিও যারা জেহাদ করে না তারাও বেহেশতী। এ থেকে জানা গেল, জেহাদ ফরযে কেফায়া, ফরযে আইন নয়। অর্থাৎ মুসলমানদের যথেষ্ট পরিমাণ জামাত যদি জেহাদ করতে থাকে, তবে যারা জেহাদে যোগদান করে না তাদের গোনাহ হবে না, নতুবা সকলেই পাপী হবে।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন গাফুর ও রহীম– তিনি জেহাদকারীদের প্রতিদান, মাগফেরাত ও রহমতের যে ওয়াদা দিয়েছেন তা অবশ্যই পূরণ করবেন। অথবা... كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا-এর অর্থ এই যে, অজ্ঞাতসারে মুজাহিদের হাতে কোন মুসলমান নিহত হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেবেন। অতএব জেহাদে ভুলক্রমে কোন মুসলমান নিহত হতে পারে– এ আশঙ্কায় জেহাদ থেকে বিরত থেকো না।

[রুকূ - ১৪]

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ
اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوْا كُنَّا
مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۖ قَالُوْٓا اَلَمْ
تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا
فِيْهَا ۖ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ
وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾

৯৭. যাদের জান ফেরেশতারা এ অবস্থায় বের করে যে, তারা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিল ফেরেশতারা (তাদের) বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?' ওরা বলে, 'আমরা যমীনের বুকে অসহায় ছিলাম।' ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহর পৃথিবী কি এমন প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে পারতে?' অতএব এরূপ লোকদের বাসস্থান জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩٨﴾

৯৮. তবে অসহায় নর-নারী ও শিশুদের (ব্যাপার ভিন্ন), যারা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না–

فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ
وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾

৯৯. এমন লোকদের ব্যাপারে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী[১]।

---

১. কতক মুসলমান এমনো আছে, যারা অন্তর থেকে ঈমানদার বটে, কিন্তু তারা অমুসলিম রাষ্ট্রে কাফেরদের নিকট পরাভূত হয়ে বাস করে এবং ওদের ভয়ে দীন ইসলামের কাজকর্ম প্রকাশ্যে করতে পারে না, জেহাদের হুকুমও পালন করতে পারে না। অতএব সেখান থেকে হিজরত করা তাদের উপর ফরয। বর্তমান রুকুতে এ বিষয়েরই উল্লেখ রয়েছে।

আয়াতের সারার্থ এই যে, যারা নিজেদের উপর জুলুম করে অর্থাৎ কাফেরদের সাথে মিলেমিশে থাকছে এবং হিজরত করছে না, মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা তাদের জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমরা কোন্ ধর্মের অনুসারী ছিলে। উত্তরে তারা বলে, আমরা তো মুসলমানই ছিলাম, কিন্তু দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে দীনের কাজ করতে পারতাম না। তখন ফেরেশতারা বলেন, আল্লাহর পৃথিবী তো অতি পশস্ত ছিল, তোমরা সেখান থেকে হিজরত করে চলে যেতে তো পারতে। অতএব এম লোকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। অবশ্য দুর্বল এবং নারী ও শিশুরা যারা হিজরতের উ' ায়ও করতে পারে না এবং হিজরতের কোন রাস্তাও যাদের জানা নেই, তারা ক্ষমার যোগ্য।

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ۭ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝١٠٠

১০০. যে কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে যাওয়ার বহু জায়গা ও প্রাচুর্য পাবে। আর যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের জন্য হিজরতের উদ্দেশ্যে নিজের ঘর থেকে বের হবে, অতঃপর মৃত্যু তাকে পেয়ে বসবে, তার প্রতিদান আল্লাহর যিম্মায় অবধারিত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

[রুকূ - ১৫]

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۝١٠١

১০১. যখন তোমরা যমীনে সফর কর, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করায় তোমাদের গোনাহ নেই– যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফেররা তোমাদের বিপদে ফেলবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু[২]।

বি. দ্র. এ থেকে জানা গেল, যে দেশে মুসলমানরা প্রকাশ্যভাবে ইসলামের উপর আমল করতে পারে না, সেখান থেকে হিজরত করা ফরয। সম্পূর্ণ অপারক ও অক্ষম ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য সেখানে পড়ে থাকার অনুমতি নেই।

১. এ আয়াতে হিজরতের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং মুহাজেরদের সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর খাতিরে হিজরত করবে এবং স্বদেশ ত্যাগ করবে, সে বসবাসের জন্য বহু স্থান লাভ করবে এবং তার রিয্ক ও জীবিকায় সচ্ছলতা আসবে। সুতরাং হিজরত করতে এ ভয় করো না যে, কোথায় থাকব এবং কী খাব। আর এ আশঙ্কাও করো না যে, রাস্তায় মৃত্যু এসে পড়লে এদিকও হল না সেদিকও হল না। কেননা, এরূপ হলেও হিজরতের ছওয়াব অবশ্যই লাভ হবে। আর মৃত্যু তো যথাসময়েই আসবে, নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আসতেই পারে না।

২. অর্থাৎ যখন তোমরা জেহাদ ইত্যাদির জন্য সফরে যাও এবং তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু কাফেরদের পক্ষ থেকে আশঙ্কা হয় যে, সুযোগ পেলে ওরা তোমাদের উপর হামলা করবে– তবে নামায সংক্ষিপ্ত কর। অর্থাৎ, যে নামায বাড়ী-ঘরে চার রাকাত পড়া হয়, তা দু রাকাত পড়ো।

বি. দ্র. আমাদের মাযহাবে সফর তিন মনযিলের (বর্তমানের হিসাবে প্রায় ৭৮ কি. মি. –অনুবাদক) হতে হবে। এর কম হলে 'কসর' পড়া জায়েয হবে না। আর কাফেরদের

১০২. আর যখন আপনি তাদের মাঝে উপস্থিত থাকেন এবং তাদের জন্য নামায কায়েম করেন, তখন তাদের একদল আপনার সঙ্গে দাঁড়াবে এবং তারা নিজেদের অস্ত্রসস্ত্র সাথে রাখবে। অতঃপর যখন তারা সেজদা করে ফেলবে, তখন তোমাদের পিছনে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল– যারা নামায পড়েনি, তারা আসবে। তারা আপনার সঙ্গে নামায পড়বে এবং নিজেদের আত্মরক্ষার সরঞ্জাম ও অস্ত্রসস্ত্র সাথে রাখবে। কাফেররা চায় যে, তোমরা নিজেদের অস্ত্রসস্ত্র ও সরঞ্জামাদি থেকে অসতর্ক হয়ে পড়, তাহলে ওরা তোমাদের উপর একযোগে আক্রমন করে বসবে[১]। আর যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ থাক, তবে অস্ত্রসস্ত্র রেখে দেওয়ায় তোমাদের কোন গোনাহ নেই; তবে

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ ۗ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۖ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۭ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ

হামলার ভয় তখন ছিল, যখন উক্ত হুকুম নাযিল হয়। কিন্তু এই ভয় দূরীভূত হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে দু রাকাতই পড়তে থাকেন এবং সাহাবীদেরও তাই পড়তে আদেশ করেন। অতএব এখন সর্বদাই সফরে কসর পড়ারই বিধান, উক্ত ভয় থাকুক বা না থাকুক। আর এ আল্লাহ তাআলার দয়া। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা অবশ্যই গ্রহণ করে নেওয়া উচিত, হাদীস শরীফে তাই রয়েছে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৮৬)

১. এর পূর্বে সফরের নামাযের বর্ণনা ছিল। এখন ভয়ের অবস্থায় নামাযের পদ্ধতি বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ কাফের সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হলে মুসলিম সৈন্য দু অংশে বিভক্ত হবে। একাংশ ইমামের সঙ্গে অর্ধেক নামায পড়ে শত্রুদের মোকাবেলায় দাঁড়াবে, আর দ্বিতীয়াংশ এসে ইমামের সঙ্গে বাকী অর্ধেক নামায পড়বে। ইমামের সালামের পর উভয় দল নিজেদের রয়ে যাওয়া অর্ধেক নামায পৃথকভাবে পড়ে নেবে। মাগরিবের নামায হলে ইমামের সঙ্গে প্রথম দল দু রাকাত এবং দ্বিতীয় দল এক রাকাত পড়বে।

আর এমতাবস্থায় নামাযের মধ্যে আসা-যাওয়ার অনুমতি আছে, এতে অসুবিধা নেই। অধিকন্তু যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম নিজের সঙ্গে রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে, যাতে সুযোগ পেয়ে কাফেররা সহসা হামলা না করতে পারে।

وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

নিজেদের আত্মরক্ষার সরঞ্জাম সঙ্গে রাখ[১]। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন[২]।

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۝

১০৩. অতঃপর যখন নামায পড়ে ফেলবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে- দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে[৩]। তার পর যখন আশঙ্কামুক্ত হবে, তখন যথাযথভাবে নামায পড়বে। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর তার নির্ধারিত সময়ে ফরয[৪]।

---

১. অর্থাৎ বৃষ্টি, অসুস্থতা ও দুর্বলতার কারণে অস্ত্রশস্ত্র বহন করতে অসুবিধা হলে নামাযের সময় অস্ত্রশস্ত্র খুলে রাখার অনুমতি আছে বটে, তবে নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, যেমন ঢাল, বর্ম নিজের সঙ্গে নিয়ে নেবে।

বি. দ্র. শত্রুদের ভয়ে উল্লিখিত উপায়ে নামায পড়ার অবকাশও যদি না পাওয়া যায়, তবে জামাত ক্ষান্ত করে একাকী পদাতিক অবস্থায় নামায পড়ে নেবে। আর যদি বাহন থেকে অবতরণেরও সুযোগ না পাওয়া যায়, তবে আরোহী অবস্থায় ইশারায় নামায পড়ে নেবে। এতটুকুরও যদি অবকাশ না হয়, তবে নামায ছেড়ে দেবে এবং পরে কাযা করবে।

২. আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুসারে কৌশল ও সতর্কতার সাথে কাজ কর এবং আল্লাহর দয়ার আশা রাখ। তিনি তোমাদের হাতে কাফেরদের অপমানিত ও অপদস্থ করে ছাড়বেন, ওদের ভয় করো না।

৩. অর্থাৎ ভয়ের সময় উদ্বেগ ও অশান্তির কারণে নামাযে কোন প্রকার ত্রুটি হয়ে গেলে, ভীতাবস্থার নামায আদায়ের পর সর্বদা ও সর্বাবস্থায়- দাঁড়িয়ে হোক, বসে হোক বা শুয়ে হোক, আল্লাহকে স্মরণ কর, এমন কি ঠিক কোলাহল ও সংঘর্ষের সময়ও। কেননা, নির্ধারিত সময় ও অন্যান্য শর্তাবলির পাবন্দী তো নামাযের সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু আল্লাহকে স্মরণ করা- তা তো সর্বাবস্থায় সম্ভব। সুতরাং তাঁকে সদা-সর্বদা স্মরণ কর, কোন অবস্থাতেই তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল থেকো না।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন, যে ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধি কোন কারণে অবলুপ্ত হয়ে যায়, কেবল সেই ব্যক্তিই মাজুর বা অপারক। নতুবা কোন মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করার ব্যাপারে অক্ষম নয়।

৪. অর্থাৎ যখন উল্লিখিত ভয় দূরীভূত হয়ে যাবে এবং তোমরা নিশ্চিন্ত হবে, তখন তোমরা যে নামায পড়বে তা সকল রোকন, শর্ত ও আদব লক্ষ রেখে যথানিয়মে শান্ত ও স্থিরচিত্তে পড়বে, যেমন নিরাপদ অবস্থায় পড়া উচিত। আর নামাযের মধ্যে বাড়তি যেসব নড়াচড়ার অনুমতি দেওয়া হল, তা কেবল ভীতাবস্থায় প্রযোজ্য।

১০৪. তোমরা (শত্রু)-সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবনে দুর্বলতা দেখিয়ো না। যদি তোমরা ব্যথাহত হও, তবে ওরাও তো ব্যথাহত হয় যেমন তোমরা ব্যথাহত হও। আর তোমরা আল্লাহর নিকট তা আশা কর যা ওরা আশা করে না। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান[১]।

وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۟

[রুকূ - ১৬]

১০৫. নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের মাঝে সে অনুসারে বিচার করেন যা আল্লাহ আপনাকে বুঝিয়েছেন। আর আপনি খেয়ানতকারীদের পক্ষে যুক্তিতর্ককারী (তাদের পক্ষাবলম্বনকারী) হবেন না[২]।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىكَ اللّٰهُ ؕ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۟

নিশ্চয় নামায নির্দিষ্ট সময়ে পড়া ফরয। সফরে, বাড়ীতে এবং ভয় ও নির্ভয়– সর্বাবস্থায় নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই তা আদায় করতে হবে। যখন ইচ্ছা তখন পড়বে, তা হবে না। অথবা كِتَابًا مَّوْقُوْتًا-এর অর্থ এই যে, নামায বাড়ীতে, সফরে, বিপদে, নিরাপদে কখন কীভাবে পড়তে হবে, আল্লাহ তাআলা তা সম্পূর্ণ সুবিন্যস্ত ও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

১. অর্থাৎ কাফেরদের অনুসন্ধানে এবং ওদের পশ্চাদ্ধাবনে সাহসিকতার সঙ্গে কাজ কর, শিথিলতা করো না। ওদের সাথে যুদ্ধে তোমরা যদি ব্যথা ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাক, তবে এই ব্যথা-বেদনার অংশীদার তো ওরাও। আর ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলার নিকট তোমাদের সেই সমস্ত আশা আছে, যা ওদের নেই, অর্থাৎ দুনিয়াতে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় ও আখেরাতে বিরাট ছওয়াব।

আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল ও তোমাদের কাজ-কর্ম উত্তমরূপে জানেন। তাঁর দেওয়া বিধানে তোমাদের জন্য দীন ও দুনিয়া উভয়ের বিরাট কল্যাণ ও বিস্তর হেকমত নিহিত রয়েছে। সুতরাং তাঁর বিধান পালনকে সৌভাগ্য ও বিরাট নেয়ামত মনে কর।

২. মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের মুসলমানদের মধ্যে কেউ কখনো কোন গোনাহ বা অপরাধ করলে শাস্তি ও দুর্নাম থেকে বাঁচার জন্য হিলাবাহানা তৈরি করত এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে এমন ভঙ্গিতে তা প্রকাশ করত, যেন তিনি ওদের নিরপরাধ মনে করেন। সে সঙ্গে তারা কোন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর দোষ চাপিয়ে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করত এবং এর জন্য পরস্পর সলা-পরামর্শ করত।

১০৬. আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۚ

শানে নুযূল

যেমন: একবার একটা ঘটনা ঘটল যে, এ ধরনের এক মুসলিম অন্য মুসলমানের ঘরে সিঁধ কেটে কিছু অস্ত্রপাতিসহ একটি আটার বস্তা চুরি করে নিয়ে গেল। ঘটনাক্রমে বস্তায় ছিদ্র থাকায় চোরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় আটা পড়তে থাকে। চোর চালাকি করে চুরির মাল ঘরে না রেখে রাতেই এক ইহুদীর কাছে গিয়ে তা আমানত রেখে এল। ভোরে মালিক আলামত দেখে চোরকে গিয়ে ধরল। কিন্তু তালাশ করে তার ঘরে কিছু পাওয়া গেল না। অধিকন্তু চোর কসম খেয়ে বলল, সে এ সম্পর্কে কিছু জানে না। তখন আটার চিহ্ন সামনে দেখে মালিক অগ্রসর হয়ে গিয়ে ইহুদীকে ধরল। সে স্বীকার করল। মাল সত্যিই ওর ঘরে আছে, তবে তা রাতে সেই মুসলমান আমানত রেখে গেছে। অতএব সে (ইহুদী) চোর নয়।

মালিক এ মোকদ্দমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পৌছাল। চোরের নিজ সম্প্রদায় ও তার দলের লোকেরা একমত হল, যে ভাবে হোক তার সম্পর্কে যেন চুরির অভিযোগ প্রমাণিত না হয়, বরং ইহুদীকেই চোর সাব্যস্ত করতে হবে। সে মত তারা ইহুদীর সঙ্গে বিবাদ বাঁধাল এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে চোরের নির্দোষিতার পক্ষে কসম খেল এবং সাক্ষ্য দিল। ফলে ইহুদী অপরাধী ও চোর বলে সাব্যস্ত হওয়ার উপক্রম হল।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা কয়েকখানি আয়াত নাযিল করলেন এবং হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সকলকে জানিয়ে দিলেন যে, চোর এই মুসলমান ব্যক্তিই, ইহুদী এ ব্যাপারে সত্যবাদী ও নিরাপরাধ। এভাবে সর্বদার জন্য সকলের নিকট এমন লোকদের মুখোশ খুলে দেওয়া হল।

আয়াতের মর্ম এই যে, 'হে রাসূল! আমি আপনার প্রতি আমার সত্য কিতাব এ উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করেছি যে, আপনি আমার বোঝানো ও বাতলানোর আলোকে ভাল ও মন্দ, মুমিন ও কাফের সকলের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করবেন। আর যারা দাগাবাজ, প্রবঞ্চনাকারী, ওদের কথায় বিশ্বাস ও ওদের পক্ষপাতিত্ব কিছুতেই করবেন না এবং ওদের কসম ও সাক্ষ্য অনুসারে কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে অপরাধী বানাবেন না। যেমন: এ ঘটনায় ঐ দাগাবাজদের পক্ষ অবলম্বন করে ইহুদীকে অপরাধী সাব্যস্ত করবেন না।'

১. অর্থাৎ, তদন্তের পূর্বে শুধু বাহ্যিক অবস্থা দেখে চোরকে নিরপরাধ এবং উল্লিখিত ইহুদীকে চোর মনে করে নেওয়া আপনার নিষ্কলুষতা ও মহান মর্যাদার অনুকূল নয়। অতএব ক্ষমা প্রার্থনা প্রয়োজন। আর যে মুখলিস সাহাবীগণ ইসলামী ও জাতীয় ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদির কারণে চোরের প্রতি সুধারণা করে ইহুদীকে চোর বানাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তাদের জন্যও এতে পরিপূর্ণ সতর্কবাণী রয়েছে।

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ۟ۙ

১০৭. আর তাদের পক্ষে বিবাদ-বিতর্ক করবেন না যারা নিজেদের সাথে খেয়ানত করে। নিশ্চয় আল্লাহ এমন কাউকে পছন্দ করেন না, যে খেয়ানতকারী, পাপী।

يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ۟

১০৮. ওরা মানুষের কাছে লজ্জাবোধ করে, কিন্তু আল্লাহর কাছে লজ্জাবোধ করে না, অথচ আল্লাহ তখনও ওদের সাথে থাকেন যখন ওরা রাতে তিনি পছন্দ করেন না এমন কথার পরামর্শ করে। আর আল্লাহ ওদের (যাবতীয়) কর্মকাণ্ড বেষ্টন করে রেখেছেন[১]।

هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ

১০৯. দেখ! তোমরা তো এমন যে, পার্থিব জীবনে ওদের পক্ষে বিবাদ-বিতর্ক করলে। তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে ওদের পক্ষে কে বিতর্ক করবে অথবা কে হবে ওদের

---

১. সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতি, বিশেষ করে স্বীয় উম্মতের প্রতি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সীমাহীন স্নেহ-মমতা বিদ্যমান ছিল, তার আতিশয্যে হয়তবা উক্ত অপরাধীদের জন্য তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকবেন। এতে ইরশাদ হচ্ছে যে, এই প্রবঞ্চনাকারীদের পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে কেন বাদ-প্রতিবাদ করছেন, যা আল্লাহর পছন্দ নয়? এরা তো রাতে চুপে চুপে মানুষের সঙ্গে কুপরামর্শ করে। কিন্তু আল্লাহকে লজ্জা করে না, যিনি সর্বদা ওদের সঙ্গে রয়েছেন এবং ওদের সকল কাজ-কর্ম ঘিরে আছেন।

আর যদি তিনি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা নাও করে থাকেন, তবুও প্রার্থনা করার সম্ভাবনা তো অবশ্যই বর্তমান ছিল। যেমন, কুরআন শরীফে অন্যত্র হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে পরিষ্কার ইরশাদ হয়েছে (সূরা হুদ : ৭৪-৭৫) : يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوْطٍ، إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَحَلِيْمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ (অর্থাৎ কোমল-হৃদয় হযরত ইবরাহীম আ. দয়াপরবশ হয়ে অপরাধী কওমের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করেছিলেন।) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষেও এটা করার সম্ভাবনা ছিল। তাই পূর্বেই আল্লাহ তাআলা এই নির্দেশ দিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ লোকদের জন্য সুপারিশ করা থেকে বিরত রাখলেন।

عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا

কার্যসম্পাদনকারী[১]?

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

১১০. যে কেউ কোন মন্দ কাজ করবে অথবা নিজের অনিষ্ট করবে, তার পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে- সে আল্লাহকে পাবে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

১১১. যে কেউ কোন গোনাহ করে, সে তা নিজেরই ক্ষতির জন্য করে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান[৩]।

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓـئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا

১১২. আর যে কেউ কোন ত্রুটি বা গোনাহ করে, তার পর কোন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর তা

---

১. এতে চোরের জ্ঞাতিগোষ্ঠী এবং যারা চোরের পক্ষপাতিত্ব করেছিল, তাদের সম্বোধন করা হয়েছে। সারকথা, আল্লাহ তাআলার সকল কিছু জানা আছে, এই অহেতুক সহানুভূতি দ্বারা কিয়ামতের দিন চোরের কোনই লাভ হতে পারে না।

২. سوء ও ظلم এর দ্বারা বড় গোনাহ ও ছোট গোনাহ বোঝানো উদ্দেশ্য। অথবা سوء বলতে সেই গোনাহ বোঝানো হয়েছে যার দ্বারা অপরের কষ্ট হয়, যেমন কারো উপর অপবাদ আরোপ করা; আর ظلم দ্বারা উদ্দেশ্য তা, যার অনিষ্ট নিজ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে।

সারকথা এই যে, গোনাহ যেমনই হোক, তার এলাজ (চিকিৎসা) হচ্ছে এসতেগ্‌ফার ও তওবা। তওবা করলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই মাফ করে দেন। যদি লোকেরা জেনে শুনে ধোঁকা দিয়ে কোন অপরাধীকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে ফেলে অথবা ভুলক্রমে অপরাধীকে নির্দোষ মনে করে নেয়, এতে অপরাধীর অপরাধ হ্রাস পেতে পারে না। অবশ্য তওবা দ্বারা সম্পূর্ণ মাফ হতে পারে।

আয়াতে সেই চোরের প্রতি এবং ভুলক্রমে যারা তার পক্ষ অবলম্বন করেছিল তাদের সকলের প্রতি তওবা ও এসতেগফারের নির্দেশ দেওয়া হল। অধিকন্তু এতে এ সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখনো যদি কেউ স্বীয় মনোভাবের উপর এঁটে বসে থাকে এবং তওবা না করে, তবে সে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে।

৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় গোনাহ করবে, এর আপদ তার উপরই বর্তাবে এবং এর শাস্তি তাকেই দেওয়া হবে, এর জন্য অন্য কারো শাস্তি হতে পারে না। কেননা, এমনটি করা তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে, যে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত না বা সে হেকমতশূন্য। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো সম্পূর্ণ ও অকাট্যরূপে অবহিত ও হেকমতওয়ালা, তাঁর নিকট এর অবকাশ কোথায়? সুতরাং নিজে চুরি করে ইহুদীর ঘাড়ে এর বোঝা চাপালে লাভ হতে পারে না।

وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا﴿۱۱۲﴾

চাপিয়ে দেয়, সে অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে নেয়[১]।

[রুকূ - ১৭]

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا﴿۱۱۳﴾

১১৩. যদি আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না হত, তবে ওদের মধ্যে একদল আপনাকে বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা করেই ফেলেছিল। অথচ ওরা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারে না এবং ওরা আপনার কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব ও হেকমত (প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়াদি) অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে সেসব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না। বস্তুত আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বড়[২]।

---

১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি ছোট বা বড় গোনাহ করে কোন নিরপরাধ ব্যক্তির ঘাড়ে চাপাল, সে তো ডবল গোনাহর তলে পড়ে গেল। একটি হল মিথ্যা অপবাদ, দ্বিতীয়টি তার কৃত আসল গোনাহ। সুতরাং বোঝা গেল, নিজে চুরি করে ইহুদীর উপর অপবাদ আরোপ করায় লাভ তো ছার, গোনাহর বোঝা আরো বৃদ্ধি পেল।

২. এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে, এবং উল্লিখিত প্রতারকের (চোরের) প্রতারণা প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া এতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান মর্যাদা ও নিষ্পাপতা তুলে ধরা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে, সকল গুণের মধ্যে তাঁর সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম গুণ হচ্ছে– ইলমে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁর উপর রয়েছে আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ, যা আমাদের ধারণাতীত ও বর্ণনাতীত।

এতে এই সত্যের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে চোরের নিরপরাধ হওয়ার ধারণা হয়েছিল, তা নিতান্তই বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে এবং বিভিন্ন সাক্ষ্য ও কথা শ্রবণ করে এবং সেসব সত্য মনে করার কারণে হয়েছিল; সত্য থেকে বিচ্যুতি বা এ বিষয়ে উদাসীনতা নিশ্চয় তার কারণ ছিল না। আর এতে তাঁর কোনই দোষ ছিল না। অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলার ফযলে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পেয়ে গেল, তখন সেই চোরের অপরাধী হওয়ার বিষয়ে মনে কোনই সংশয় থাকেনি।

আর এসব কথার দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, ভবিষ্যতে যেন এই ধোঁকাবাজরা রাসূলকে বিভ্রান্ত করার ও ধোঁকা দেওয়ার অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকে এবং তিনি স্বীয় মর্যাদা ও পবিত্রতা অনুযায়ী চিন্তা-ভাবনা ও সতর্কতার সাথে কাজ করতে পারেন।

১১৪. মানুষের বহু পরামর্শে কোনই কল্যাণ নেই, তবে যে ব্যক্তি দান খয়রাত বা সৎকাজ অথবা মানুষের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করার নির্দেশ দেয় (তার কথা ভিন্ন)। আর যে কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এসব করবে, আমি অবশ্যই তাকে বিরাট প্রতিদান দেব[১]।

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾

১১৫. যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে তার নিকট সরল পথ প্রকাশ হওয়ার পরও এবং মুসলমানদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করবে, আমি ওকে সেদিকেই ছেড়ে দেব যা সে অবলম্বন করেছে (অর্থাৎ ওর অবলম্বন করা পথে চলতে দেব) এবং ওকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল[২]!

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٥﴾

---

১. কিছু মুনাফিক ও প্রতারক এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কানে কানে কথা বলত, যাতে মানুষের মধ্যে নিজেদের মূল্য বৃদ্ধি করতে পারে এবং মজলিসে বসে পরস্পরে অযথা কানাঘুষা করতে থাকত– কারো দোষান্বেষণ, কারো গীবত, কারো কুৎসা করত। এতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন যে, যারা পরস্পর কানে কানে শলা-পরামর্শ করে, তাদের অধিকাংশ পরামর্শ কল্যাণশূন্য হয়ে থাকে। স্পষ্ট ও সত্য কথা গোপন করার প্রয়োজন নেই। গোপন করার অর্থ হচ্ছে মতলব ভাল না!

অবশ্য গোপন করতে হলে সদকা ও দান খয়রাতের বিষয় গোপন করবে, যাতে গ্রহণকারীকে লজ্জিত হতে না হয়। অথবা কোন অজ্ঞ মানুষকে ভ্রান্তি থেকে রক্ষার্থে তাকে ভাল কথা ও সঠিক মাসলা বলতে হলে গোপনভাবে বলবে, যাতে তাকে লজ্জায় পড়তে না হয়, অথবা দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হলে এবং রাগী ব্যক্তি উত্তেজনাবশত মীমাংসায় আসতে না চাইলে গোপনে তাকে বুঝাবে, এমনকি এক্ষেত্রে তওরিয়া করা অর্থাৎ কৌশলী কথা বলারও অনুমতি আছে।

শেষে আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন যে, যে কেউ উল্লিখিত বিষয়াবলি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করবে এবং অন্য উদ্দেশ্য থাকবে না, তাকে মহা ছওয়াব দান করা হবে।

২. অর্থাৎ যদি কারো সম্মুখে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, এর পরও সে রাসূলের হুকুমের বিরোধিতা করে এবং সকল মুসলমানকে ছেড়ে নিজের আলাদা পথ অবলম্বন করে, তবে এমন ব্যক্তির ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। উল্লিখিত চোর এরূপই করেছিল। সে অপরাধ

[রুকূ - ১৮]

১১৬. নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না, তবে এছাড়া অন্যান্য (গোনাহ)- যার জন্য ইচ্ছা- ক্ষমা করবেন*১। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করেছে, সে সুদূর গোমরাহীতে পতিত হল২।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ⑪

স্বীকার করে তওবা করার পরিবর্তে হাত কাটা যাওয়ার ভয়ে মক্কায় পালিয়ে গিয়ে মুশরিকদের সঙ্গে মিলিত হল।

বি. দ্র. শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ বর্তমান আয়াত থেকে এই মাসলাও বের করেছেন যে, 'উম্মতের ইজমা' এর বিরোধিতাকারী ও তা অমান্যকারী জাহান্নামী, অর্থাৎ উম্মতের ইজমা মেনে চলা ফরয। হাদীস শরীফে এসেছে, মুসলমানদের জামাতের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে- যে ব্যক্তি পৃথক পথ অবলম্বন করল, সে দোযখে পতিত হল। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৩০৫, ২৩০৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ৩৯৬; আল-মাকাসিদুল হাসানাহ্, হাদীস : ১২৮৮)

✯ **দ্বিতীয় তরজমা**- 'এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের (গোনাহ)- যার জন্য ইচ্ছা- ক্ষমা করবেন'।

১. অর্থাৎ শিরকের নীচের গোনাহ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু শিরক কখনো ক্ষমা করবেন না। মুশরেকের জন্য শাস্তিই অবধারিত। অতএব চুরি করা ও মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা যদিও কবীরা গোনাহ ছিল, তবুও সম্ভাবনা ছিল আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহমতে সেই চোরকে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু উক্ত চোর যেহেতু রাসূলের হুকুম অমান্য করে মুশরিকদের সাথে গিয়ে মিলিত হল, সেহেতু এখন তার মাগফেরাতের সম্ভাবনাও রইল না।

বি. দ্র. এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ ছাড়া কারো উপাসনা করাই শুধু শিরক নয়, বরং আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় কারো বিধানকে পছন্দ করাও শিরক।

২. কেননা, সেই ব্যক্তি তো স্বয়ং আল্লাহ তাআলা থেকেই পরিষ্কার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আল্লাহর মোকাবেলায় অন্য মাবূদ বানিয়ে শয়তানের পূর্ণ অনুগত হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রহমত- সব কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে বসেছে। আর যে ব্যক্তি এত দূরে গিয়ে পড়ল, সে আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাতের যোগ্য কেমন করে হতে পারে? বরং এমন লোকের মাগফেরাত তো হেকমতের পরিপন্থী। এ কারণেই মাগফেরাত থেকে এমন লোকদের নিরাশ করে দেওয়া হয়েছে।

পক্ষান্তরে, মুসলমান যতই কঠিন গোনাহগার হোক না কেন, তার ত্রুটি যেহেতু কর্মে সীমাবদ্ধ এবং তার আকীদা-বিশ্বাস, সম্পর্ক ও আশাবাদ সব কিছু যথাস্থানে আছে (অর্থাৎ, তার ঈমান আল্লাহ-রাসূলের প্রতি, তার সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে এবং তার আশাবাদ

১১৭. ওরা আল্লাহর পরিবর্তে কেবল নারী (নামের দেবী)দেরই ডাকে। বস্তুত ওরা কেবল অবাধ্য শয়তানকেই ডাকে–

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ۚ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا

১১৮. যাকে আল্লাহ লা'নত করেছেন[১]। আর ও বলেছিল, 'আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়ে নেব[২]

لَعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

আল্লাহর দরবারে)—অতএব তার মাগফেরাত আগে-পরে অবশ্যই হবে, যখন ইচ্ছা আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

১. অর্থাৎ এই মুশরিকরা আল্লাহকে ছেড়ে যেসব মূর্তিকে উপাস্য বানিয়েছে, তাদেরকে স্ত্রীবাচক নামে আখ্যায়িত করে রেখেছে, যথা 'উয্যা, 'মানাত', 'নায়েলা' প্রভৃতি। বস্তুত এই মুশরিকরা আল্লাহর অভিশপ্ত-অবাধ্য শয়তানেরই উপাসনা করছে। সে-ই তো ওদের বিভ্রান্ত করে এমনটা করিয়েছে। আর মূর্তিপূজা করার মধ্যেই শয়তানের আনুগত্য ও সন্তুষ্টি রয়েছে।

এ দ্বারা মুশরিকদের সীমাহীন পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। লক্ষ করুন, প্রথমত আল্লাহ ছাড়া কাউকে উপাস্য বানানোর চেয়ে অধিক পথভ্রষ্টতা আর কিছুই হতে পারে না। অধিকন্তু উপাস্য বানাল, তো কাকে বানাল? পাথরের মূর্তিকে বানাল, যা অনুভূতিহীন জড়পদার্থ, যার নামকরণ হল নারীর নামে। আর তাও আল্লাহর অভিশপ্ত ও বিতাড়িত শয়তানের কথায় ও প্ররোচনায় পড়ে। এহেন পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতার নজীর আছে কি এবং বড় থেকে বড় আহমকও এটা কবুল করতে পারে কি?

২. অর্থাৎ (আদমকে) সেজদা না করে শয়তান অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হওয়ায় তখনই সে বলেছিল, 'আমি যখন ধ্বংস হলামই, তখন তোমার বান্দা আদম-সন্তানদের মধ্য থেকেও এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ও বিরাট অংশকে আমার পথে নিয়ে আসব। অর্থাৎ ওদের পথভ্রষ্ট করে আমার সঙ্গে জাহান্নামে নিয়ে যাব।' সূরা 'হিজর' (আয়াত ৩৯-৪০) ও 'বনী ইসরাঈল' (আয়াত ৬২) ইত্যাদিতে এ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

সারকথা, অবাধ্য ও অভিশপ্ত হওয়া ছাড়াও শয়তান প্রথম থেকেই সমগ্র মানবগোষ্ঠীর চরম শত্রু ও অকল্যাণকামী। তদুপরি এই শত্রুতাকে সে স্পষ্টভাবে প্রকাশও করে দিয়েছে। সুতরাং এখন আর এই সম্ভাবনাও রইল না যে, যদিও শয়তান সব রকমে খবীছ ও গোমরাহ, তবুও হয়ত বা কাউকে সে হিতাকাঙ্ক্ষীস্বরূপ কোন উপকারের কথা বলে দিতে পারে। বরং এ সত্যই জানা গেল যে, এই আদি শত্রু আদমসন্তানকে যা কিছু বলবে, তাদের পথভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের কথাই বলবে। এর পরও এহেন পথভ্রষ্ট ও ধ্বংসকামী শয়তানের আনুগত্য করা কত বড় মূর্খতা ও বোকামী!

'নির্দিষ্ট অংশ' নেওয়ার আরেক অর্থ এও হতে পারে যে, তোমার বান্দারা তাদের ধন-সম্পদের মধ্যে আমার জন্য (অর্থাৎ আমার শেখানো অনুসারে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে) অংশ

১১৯. এবং অবশ্যই তাদের পথভ্রষ্ট করব, তাদের (মিথ্যা) আশা-ভরসা দেব এবং তাদের শিখিয়ে দেব, ফলে অবশ্যই তারা গবাদি পশুর কর্ণচ্ছেদ করবে। তাদের আরো শিখিয়ে দেব, ফলে ওরা অবশ্যই আল্লাহর সৃষ্ট (আকার-আকৃতি) বিকৃত করবে[১]। আর যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধু বানাল, সে সুস্পষ্ট ক্ষতিতে পতিত হল।

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿۱۱۹﴾

১২০. সে ওদের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আশা-ভরসা দেয়। আর শয়তান ওদের কেবল প্রবঞ্চনার প্রতিশ্রুতি দেয়।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿۱۲۰﴾

১২১. ওদের বাসস্থান জাহান্নাম এবং ওরা তা থেকে পলায়নের কোন স্থান পাবে না[২]।

اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿۱۲۱﴾

নির্ধারিত করবে, যেমন লোকেরা মূর্তি বা জিন ইত্যাদি গাইরুল্লাহর নামে মানত মেনে থাকে এবং তার জন্য পশু যবাই করে অথবা পশুর এক অংশ উৎসর্গ করে।

১. অর্থাৎ যারা আমার অংশে আসবে, ওদের আমি সরল পথ থেকে বিভ্রান্ত করব এবং পার্থিব জীবন ও তার বস্তু-সামগ্রী অর্জনের লোভ এবং কিয়ামত ও হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি পরকালীন ঘটনাবলি সংঘটিত না হওয়ার আশা দিতে থাকব। আরো শিক্ষা দেব, যাতে ওরা পশুর কান ছেদ করে তা দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেয় এবং আল্লাহর সৃষ্ট আকার-আকৃতি ও তাঁর নির্দেশিত বিধানাবলি পরিবর্তিত বা বিকৃত করে।

বি. দ্র. কাফেরদের রেওয়াজ ছিল : তারা গরু, ছাগল ও উটের বাচ্চা দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করত এবং কান ছেদ করে বা কানে চিহ্ন লাগিয়ে ছেড়ে দিত। আর আকৃতি বিকৃত করা, যেমন: খোজা বানানো, অথবা দেহে সুই দ্বারা ছিদ্র করে তিল বানানো অথবা শিশুদের মাথায় কারো নামের টিকি রাখা– এগুলো তাদের রেওয়াজ ছিল। এসব কুকর্ম থেকে মুসলমানদের অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

দাড়ি কাটাও উক্ত বিকৃতিরই অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর যত হুকুম-আহকাম আছে তার কোনটিতে পরিবর্তন করা সাংঘাতিক কথা। তিনি যা হালাল করেছেন তা হারাম করা অথবা হারামকে হালাল করা– ইসলাম-বহির্ভূত কাজ। অতএব যে কেউ এসব বিষয়ে লিপ্ত হবে তাকে নিশ্চিতরূপে বুঝতে হবে যে, সে শয়তানের নির্ধারিত অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২. অর্থাৎ শয়তানের দুষ্টামি, নষ্টামি, ভ্রষ্টতা ও শত্রুতার অবস্থা ভালভাবে অবগত হওয়ার পর এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকেনি যে, নিজের সত্য মা'বূদ (আল্লাহ) থেকে বিমুখ হয়ে যে

১২২. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আমি শীঘ্রই তাদের দাখিল করব জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ এ সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন*। আর কে আল্লাহর চেয়ে কথায় অধিক সত্যবাদী?[১]

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ۝

১২৩. (পরকালীন নাজাতের ভিত্তি) না তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর, আর না কিতাবীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর*। যে কেউ মন্দ কাজ করবে, তাকে এর শাস্তি দেওয়া হবে এবং সে নিজের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না।

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

১২৪. আর যে কেউ সৎকাজ করবে– পুরুষ হোক বা নারী– আর সে ঈমানদার, তো এমন লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য জুলুমও হবে না[২]।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ۝

কেউ শয়তানের অনুগত হবে, সে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ওর দেওয়া সব প্রতিশ্রুতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং ওর আনুগত্যের ফল এ-ই হবে যে, ওর সকল অনুসারীদের ঠিকানা হবে দোযখ এবং তা থেকে বের হওয়ার কোনই উপায় হবে না।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আল্লাহ (এ) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আর তাঁর প্রতিশ্রুতি খুবই সত্য'।

১. অর্থাৎ, আর যারা শয়তানের অনিষ্ট থেকে দূরে রয়েছে এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ঈমান এনেছে ও ভাল আমল করেছে, তারা অনন্তকাল বসন্তভরা উদ্যানে বাস করবে। এ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, যা থেকে অধিক সত্য কারো কথা হতে পারে না। অতএব এমন সত্য প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করে শয়তানের মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করা চরম বিভ্রান্তি এবং মারাত্মক ধ্বংসের শিকার হওয়া বৈ কিছু নয়।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** '(আল্লাহর প্রতিশ্রুত পুরস্কার) না তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে (লাভ করা যাবে), আর না কিতাবীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে'।

২. কিতাবী অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টানরা এ ধারণা করত যে, 'আমরা বিশিষ্ট বান্দা, যেসব পাপের কারণে অন্যরা ধৃত হবে, (সেসব কারণে) আমরা হবো না। আমাদের পয়গম্বরগণ সাহায্য-

১২৫. তার চেয়ে উত্তম দীন আর কার, যে স্বীয় সত্তাকে আল্লাহর অনুগত করে দিয়েছে আর সে সৎকর্মশীল এবং সে ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করেছে, যিনি ছিলেন (এক আল্লাহতে) একনিষ্ঠ? আর আল্লাহ ইবরাহীমকে খাঁটি বন্ধু বানিয়েছেন[১]।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿۱۲۵﴾

১২৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। আর আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন[২]।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿۱۲۶﴾

সহায়তা করে আমাদের রক্ষা করবেন। সেই সাথে কতক অজ্ঞ মুসলমান নিজেদের ব্যাপারে অনুরূপ ধারণাই করে বসে।

অতএব আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন যে, নাজাত ও ছওয়াব কারো আশা ও ধারণার উপর নির্ভরশীল নয়। যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে সে ধৃত হবে, সে যে-ই হোক। আল্লাহর শাস্তির সময় কারো সাহায্য-সহায়তা কাজে আসতে পারে না। আল্লাহ যাকে ধরবেন, সে কেবল তিনি ছাড়লেই ছাড়া পেতে পারে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি নেক আমল করে, সেই সাথে ঈমানও রাখে, এমন লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং নিজেদের নেক কাজের পূর্ণ ছওয়াব পাবে।

মোদ্দাকথা, ছওয়াব ও শাস্তি আমলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কারো আশা ও বাসনা দ্বারা কিছুই হয় না। সুতরাং (মনগড়া) আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ কর এবং নেক কাজের হিম্মত কর।

১. ইতিপূর্বে জানা গেছে, আল্লাহর নিকট আমলেরই (অর্থাৎ সৎকর্মের) সমাদর রয়েছে, নিরর্থক কামনা-বাসনার কোন মূল্য নেই। আহলে-কিতাব প্রভৃতি সকলেরই জন্য এই নীতি প্রযোজ্য। এতে আহলে-ইসলাম অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি এবং আহলে-কিতাবের নিকৃষ্টতা ও খারাবীর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এখন স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার হুকুমের সম্মুখে মাথা নত করে দিয়েছে, নেককাজে আন্তরিকতার সাথে ব্রতী হয়েছে এবং সে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দীনের সঠিক আনুগত্য করে– এমন ব্যক্তির সমকক্ষ কে হতে পারে? ইবরাহীম আ. সকলকে ছেড়ে (এক) আল্লাহর হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে আল্লাহ নিজের দোস্ত বানিয়েছিলেন।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত গুণ তিনটি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল, কিতাবীদের মধ্যে মোটেই নেই। সুতরাং আহলে-কিতাবের উল্লিখিত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিরর্থক ও অসার প্রমাণিত হয়ে গেল।

২. অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশরাজ্যে যা কিছু আছে সবই তাঁর দাস, তাঁর সৃষ্টি ও স্বত্ব এবং সবই তাঁর মুঠিতে রয়েছে। তিনি স্বীয় রহমত ও হেকমত অনুযায়ী যার সঙ্গে যেমন ইচ্ছা, আচরণ

[রুকূ - ১৯]

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ ۚ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ

১২৭. তারা আপনার নিকট (এতীম) নারীদের (বিয়ে করার) ব্যাপারে অনুমতি চায়। আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের (বিয়ে করার) ব্যাপারে অনুমতি দিচ্ছেন। আর কিতাবে (কুরআনে) তোমাদের যে বিধান পড়ে শোনানো হয়, তা সেই এতীম মেয়েদের সম্পর্কে, যাদের তোমরা তাদের জন্য নির্ধারিত অধিকার দাও না অথচ তাদের বিয়ে করতে চাও, এবং অসহায় ছেলেদের সম্পর্কে*। আর (আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন) যে, তোমরা এতীমদের জন্য ইনসাফ কায়েম কর[১]। আর তোমরা যা কিছু সৎকর্ম কর,

করতে পারেন। আর তিনি সকলকে তাদের ভাল-মন্দ সর্বপ্রকারের আমলের পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানে সক্ষম। এতে যেন কেও সন্দেহ না করে।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'লোকেরা আপনার কাছে নারীদের ব্যাপারে (শরয়ী বিধান) জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের ব্যাপারে বিধান বর্ণনা করছেন এবং (বিধান বর্ণনা করছে) ঐসব আয়াত, যা তোমাদের সম্মুখে কিতাবে (অর্থাৎ কুরআনে) পাঠ করা হয়– সেই এতীম নারীদের ব্যাপারে, যাদের তোমরা তাদের জন্য নির্ধারিত অধিকার দাও না, অথচ তোমরা তাদের বিবাহ করতে চাও, এবং (যা পাঠ করা হয়) দুর্বল ছেলেদের ব্যাপারে'।

১. **শানে নুযূল**

এই সূরার প্রথম দিকে এতীমদের হক আদায় করতে আল্লাহ তাআলা তাকীদ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, এতীম মেয়ের অভিভাবক যদি মনে করে যে, সে (নিজে তাকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে) তার হক পুরাপুরি আদায় করতে পারবে না, তবে তাকে বিয়ে না করে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দেবে আর সে তার অভিভাবক হয়ে থাকবে। এতে মুসলমানরা এরূপ মেয়েদের বিয়ে করা মওকূফ করে দিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেল, ক্ষেত্রবিশেষে অভিভাবক নিজে বিয়ে করলেই মেয়ের জন্য উত্তম হয়। কারণ সে তার যতটুকু বিবেচনা করবে, অন্যরা তা করবে না। সুতরাং মুসলমানগণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিয়ের অনুমতি চাইলেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৫৭৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩০১৮)

فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ۝	সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত[১]।

এতে এ আয়াত অবতীর্ণ হল, যাতে উক্ত বিয়ের অনুমতি দেওয়া হল এবং বলা হল যে, ঐ যে পূর্বে নিষেধাজ্ঞা শোনানো হয়েছিল, তা তাদের হক আদায় না করার ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য, সেই সঙ্গে এতীমদের হক আদায় করার তাকীদ করা হয়েছিল। তো যদি এতীমদের হক পুরাপুরি আদায় করা হয়, তবে এই বিয়ের অনুমতি রয়েছে।

আয়াতটির সারকথা

আরববাসীরা নারী, শিশু ও এতীমদের কোন কোন হক থেকে বঞ্চিত রাখত। তাদের মীরাছ দিত না এবং বলত যে, মীরাছ পাবে তারা, যারা শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। তাছাড়া এতীম মেয়েদের বিয়ে করে অভিভাবকরা তাদের মহর ও খরচ কম দিত এবং তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে খরচ করত। বর্তমান সূরার শুরুতে এসব বিষয় সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়েছে। এস্থলে কয়েক রুকূ পূর্ব থেকে যা বলা হল তার সংক্ষিপ্তসার এই যে, অবশ্য পালনীয় হচ্ছে আল্লাহর বিধান। (তার বিপরীতে) অন্য কারো যুক্তি, কারো নীতি, কারো হুকুম, কারো কামনা ও ধারণা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আল্লাহ তাআলার বিধান বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তা পরিত্যাগ করে মানবরচিত বিধান গ্রহণ করা ও তা মেনে চলা সুস্পষ্ট কুফর ও গোমরাহী। এ বিষয়টি নানাভাবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করা হয়েছে।

এখন পূর্ববর্তী আয়াতগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নারীদের ব্যাপারে ও এতীম মেয়েদের বিয়ে সম্পর্কে আরো কিছু মাসলা বর্ণিত হচ্ছে, যাতে এতভাবে গুরুত্ব আরোপের পর মেয়েদের অধিকার প্রদান করতে কারো কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বাকী না থাকে। হাদীসে আছে, যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদের সম্পর্কে মীরাছের হুকুম বর্ণনা করলেন, তখন কতিপয় আরব নেতা উপস্থিত হয়ে সবিস্ময়ে বলল, আমরা শুনতে পেলাম যে, আপনি বোন ও কন্যাকে মীরাছ দেওয়াচ্ছেন। অথচ মীরাছ তো তাদের হক, যারা শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং গণীমতের মাল আনয়ন করে। উত্তরে তিনি ইরশাদ করলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এই যে, তাদের মীরাছ দেওয়া হোক।' (উস্‌দুল গাবাহ্ ২/৯৩)

يَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ —তে এই ইঙ্গিতও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াত وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ এর বাস্তব দৃষ্টান্ত সাহাবীগণ (রা), যাঁরা বিবাহ, মহর ও ব্যয়ভার সংক্রান্ত ব্যাপারে নিজেদের অধীনস্তদের সামান্য হক নষ্ট করা জায়েয মনে করেন না এবং আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় স্বীয় স্বার্থ ও মতলব এবং স্বজাতির রীতি-নীতির মোটেই পরোয়া করেন না। আল্লাহ তাআলার হুকুমের বিরোধিতার সম্ভাবনা থেকেও তাঁরা বেঁচে থাকেন। যা করেন, পরিষ্কার অনুমতি গ্রহণের পর করেন– يستفتونك

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের অণু পরিমাণ ভাল কাজ সম্বন্ধেও অবহিত আছেন। অতএব এতীম ও মেয়েদের অধিকারের ব্যাপারে তোমরা যা কিছু ভাল কাজ করবে, তার ছওয়াব অবশ্যই পাবে।

১২৮. যদি কোন স্ত্রী নিজ স্বামীর পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহার বা উপেক্ষা করার আশঙ্কা করে, তবে এতে তাদের কোন গোনাহ নেই যে, তারা পরস্পরের মাঝে কোনরূপ আপোষ-নিষ্পত্তি করে নেবে। আপোষ-নিষ্পত্তি অতি উত্তম[১]। আর (মানুষের) অন্তরে লোভ তো বিদ্যমান রয়েছেই☆[২]। আর তোমরা যদি সদ্ব্যবহার কর ও পরহেযগারী অবলম্বন কর, তবে আল্লাহ তো তোমাদের (সকল) কাজকর্ম সম্বন্ধে সম্যক অবহিত[৩]।

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۲۸﴾

১২৯. তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে কিছুতেই (পূর্ণ) সমতা রক্ষা করতে পারবে না যদিও তার খায়েশ কর না কেন। কিন্তু (একজনের দিকে) সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকেও পড়ো না যে, অপর স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেবে[৪]।

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ

---

১. অর্থাৎ কোন স্ত্রী যদি দেখে, তার থেকে স্বামীর মন উঠে গেছে, ফলে তাকে খুশী ও আকৃষ্ট করার জন্য নিজ মহর, ব্যয়ভার ইত্যাদি থেকে কিছু ছেড়ে দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করে নেয়, তবে পরস্পরের মধ্যে এমন সন্ধি করায় কারো কোন গোনাহ নেই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্ধি-সম্প্রীতি খুবই ভাল কথা। অবশ্য অযথা স্ত্রীকে জ্বালাতন করা এবং সম্মতি ছাড়া তার সম্পদ ব্যয় করা গোনাহ।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'অন্তরসমূহে (জন্মগতভাবেই) কৃপণতা রাখা আছে'।

২. অর্থাৎ নিজের লাভ, অর্থের লালসা ও কৃপণতা প্রত্যেকের মনের ভিতর ঢুকে রয়েছে। সুতরাং মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করে স্ত্রী যদি স্বামীর কিছু উপকার করে, তবে স্বামী খুশী হয়ে যাবে।

৩. অর্থাৎ স্ত্রীর সঙ্গে যদি সদ্ব্যবহার কর এবং অসদাচরণ ও কলহ-বিবাদ পরিত্যাগ করে চল, তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের সকল বিষয় সম্বন্ধে অবহিত বলে এই ভাল কাজের ছওয়াব অবশ্যই দান করবেন।

বলা বাহুল্য, এমন অবস্থায় বিরূপভাব ও অসন্তুষ্টির অবকাশই আসবে না এবং সন্তুষ্ট করার ও নিজের কোন হক ছেড়ে দেওয়ারও প্রয়োজন হবে না।

৪. অর্থাৎ একাধিক স্ত্রী থাকলে অন্তরের ভালবাসা ও প্রতিটি বিষয়ে তাদের মধ্যে পূর্ণ সমতা রক্ষা ও সমব্যবহার করা তোমাদের সাধ্যে নেই। তাই বলে এমন অবিচারও করো না যে, একজনের প্রতি তো একেবারে ঝুঁকে পড়লে আর অন্যজনকে মাঝপথে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখলে যে, তাকে আরামেও রাখছ না, একেবারে পৃথকও করছ না, যাতে সে অন্যকে বিয়ে করতে পারে।

تُصۡلِحُوۡا وَتَتَّقُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا

আর তোমরা যদি (নিজেদের) সংশোধন করতে থাক এবং ভয় করে চল, তবে আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

وَاِنۡ يَّتَفَرَّقَا يُغۡنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنۡ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيۡمًا

১৩০. আর যদি তারা পৃথক হয়ে যায়, তবে আল্লাহ নিজ প্রাচুর্য দ্বারা প্রত্যেককে (অপরজন থেকে) অনপেক্ষ করে দেবেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যশালী, প্রজ্ঞাবান[২]।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ وَلَقَدۡ وَصَّيۡنَا الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ وَاِيَّاكُمۡ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنۡ تَكۡفُرُوۡا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيۡدًا

১৩১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। আর তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের ও তোমাদের আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। আর আল্লাহ অনপেক্ষ, সকল প্রশংসার উপযুক্ত।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيۡلًا

১৩২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। আর কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট[৩]।

---

১. অর্থাৎ যদি এসলাহ (বা সংশোধন) ও আপোষ-নিষ্পত্তির ব্যবস্থা কর এবং বাড়াবাড়ি করা ও হক নষ্ট করা থেকে যথাসাধ্য বেঁচে থাক, তবে নিজ দায়িত্ব আদায় করলে। এর পর আল্লাহ তাআলা মার্জনাকারী।

২. অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী যদি বিচ্ছেদই পছন্দ করে এবং (সে মত) তালাক হয়ে যায়, তবে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকেরই কর্মবিধায়ক ও সকলেরই প্রয়োজনাদি পূরণকারী।

এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, স্ত্রীকে আরামে রাখতে হবে, কষ্ট দিতে পারবে না। আর সক্ষম না হলে তালাক দিয়ে দেওয়াই সংগত।

৩. উপর থেকে 'তারগীব' (উৎসাহ দান) ও 'তারহীব' (সতর্কীকরণ) চলছিল। অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করা এবং বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকা সকলের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহর বিধান বর্তমান থাকতে কারো কথার প্রতি কান দেওয়া কিছুতেই জায়েয নয়। মাঝে, এতীম ও নারীদের যেসব বিষয়ে মানুষ অবিচার-অনাচারে লিপ্ত ছিল, সে সম্পর্কে কতিপয় বিধান বর্ণনা করে এখন আবার সেই তারগীব ও তারহীব-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হচ্ছে।

১৩৩. হে মানুষ! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অপসারিত করে অন্যদের নিয়ে আসতে পারেন। আল্লাহ এরূপ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম[১]।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ۝

১৩৪. যে কেউ দুনিয়ার প্রতিদান চায়, তো আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখেরাত (উভয়ের) প্রতিদান রয়েছে[২]। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা[৩]।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝

আয়াত দুটির সারসংক্ষেপ এই : তোমাদের এই হুকুম শোনানো হচ্ছে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরও শোনানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে থাক এবং তার অবাধ্যতা করো না। যদি কেউ তার হুকুম অমান্য করে, তবে জেনে রাখ, তিনি সকল কিছুর মালিক, তাঁর কারো পরোয়া নেই। পক্ষান্তরে, যদি তাঁর আনুগত্য কর তবে জেনে রাখ যে, তিনি সকল কিছুর মালিক, তোমাদের সবকাজ সমাধা করে দিতে পারেন।

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ-এর পুনরাবৃত্তি

'যা কিছু আকাশ ও পৃথিবীতে রয়েছে সব আল্লাহরই,' কথাটি তিনবার বলা হয়েছে। আল্লাহর দরবারে যে কোন কিছুর অভাব নেই, বরং সেখানে রয়েছে প্রাচুর্য– প্রথমবারে এ সত্যটি বোঝানো উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়বারে, আল্লাহ তাআলার অমুখাপেক্ষিতা ও নিঃশঙ্কতার কথা, অর্থাৎ তোমরা অমান্য করলে তাঁর কারও পরোয়া নেই, এ সত্যটি প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। তৃতীয়বারে, আল্লাহর রহমত ও কার্যসম্পাদনার অনন্য ক্ষমতার প্রকাশ উদ্দেশ্য, তবে (এই রহমত লাভ করতে হলে) শর্ত এই যে, তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এতে সম্পূর্ণ সক্ষম যে, তিনি তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে পৃথিবী থেকে অপসারিত করে দেবেন এবং আজ্ঞাবহ ও ফরমাবরদার অন্য লোকদের সৃষ্টি করবেন। এতেও আল্লাহ তাআলার অমুখাপেক্ষিতা ও ক্ষমতার বিশালতা সুন্দররূপে প্রকাশ পেয়েছে। অধিকন্তু এর দ্বারা নাফরমানদের খুব করে সতর্ককরণ ও ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে।

২. অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করলে তিনি দুনিয়াও দেবেন এবং আখেরাতও দেবেন। সুতরাং শুধু দুনিয়ার পিছনে পড়া এবং তাঁর নাফরমানী করে আখেরাত থেকে বঞ্চিত থাকা বড়ই মূর্খতা।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের সকল কাজ দেখেন এবং সকল কথা শুনেন– তাঁর কাছে যা কিছু প্রার্থনা করবে, তিনি কবুল করবেন।

[রুকূ - ২০]

১৩৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইনসাফের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাকারী, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য প্রদানকারী হয়ে যাও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা (তোমাদের) পিতা-মাতা ও আত্মীয়বর্গের বিপক্ষে হয়[১]। সে (অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য) ধনী হোক বা দরিদ্র, আল্লাহ উভয় ধরণের ব্যক্তির (তোমাদের চেয়ে বেশি) হিতাকাঙ্খী। অতএব তোমরা ইনসাফ করার বিষয়ে (স্বীয়) কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না*[২]। আর যদি তোমরা জিহ্বা ঘুরাও অথবা এড়িয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের (সকল) কাজকর্ম সম্বন্ধে সম্যক অবহিত[৩]।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

১৩৬. হে ঈমানদারগণ! ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই কিতাবের প্রতি, যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى

---

১. অর্থাৎ সত্য ও আল্লাহর হুকুম অনুসারে সাক্ষ্য দেওয়া উচিত, যদিও তাতে তোমাদের বা তোমাদের কোন নিকট আত্মীয়ের ক্ষতি হয়। যা সত্য তাই পরিষ্কার প্রকাশ করে দেওয়া উচিত। পার্থিব লাভের জন্য পরকালের ক্ষতি করো না।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, পাছে তোমরা (সঠিক পথ থেকে) বিচ্যুত হয়ে যাও'।

২. অর্থাৎ সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বীয় কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না, এবং ধনীর খাতির করে অথবা অভাবীর জন্য দরদ দেখিয়ে সত্যকে বর্জন করে বসো না। যা সত্য তাই বল। তোমাদের চেয়ে আল্লাহ তাআলা তাদের বেশি হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তাদের লাভালাভ সম্বন্ধে জ্ঞাত।

৩. 'জিহ্বা ঘুরানো' বলতে বোঝায়, বলল সত্য কথাই, কিন্তু জিহ্বা চেপে ও মোচড়িয়ে, যাতে শ্রোতা সন্দেহে পতিত হয়, অর্থাৎ সত্যকে পরিষ্কার করে বলল না, অস্পষ্টতা রেখে দিল। আর 'এড়িয়ে যাওয়া' বলতে বোঝায়– সম্পূর্ণ কথা না বলা এবং দরকারী কিছু কথা বাদ দেওয়া। এই উভয় অবস্থায় মিথ্যা বলা না হলেও, সত্য পূর্ণরূপে প্রকাশ না করার কারণে গোনাহ হবে। সাক্ষ্য সত্য, সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ দেওয়া উচিত।

رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ یَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِیْدًا ⑬⑥

করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি, যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছিলেন। আর যে কেউ অস্বীকার করবে– আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও কিয়ামত দিবসকে, সে সুদূর (চরম) গোমরাহীতে লিপ্ত হল[১]।

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ یَكُنِ اللّٰهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیْلًا ⑬⑦

১৩৭. যারা ঈমান এনেছে, তার পর কাফের হয়ে গেছে, অনন্তর ঈমান এনেছে, তার পর আবার কাফের হয়ে গেছে, অতঃপর ওদের কুফরী বাড়তে থেকেছে, নিশ্চয় আল্লাহ ওদের কখনই ক্ষমা করবেন না এবং ওদের সুপথ দেখাবেন না[২]।

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِیْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِیْمَا ⑬⑧

১৩৮. আপনি মুনাফিকদের এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, ওদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি–

الَّذِیْنَ یَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِیْنَ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ ؕ اَیَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ

১৩৯. যারা মুসলমানদের ছেড়ে কাফেরদের বন্ধু বানায়। মুনাফিকরা কি কাফেরদের নিকট সম্মান তালাশ করে? বস্তুত সমস্ত সম্মান

---

১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেছে, তাঁর একান্ত কর্তব্য আল্লাহ তাআলার সকল হুকুমের উপর আন্তরিকভাবে ঈমান স্থাপন করা। তাঁর হুকুম-আহকামের মধ্য থেকে কোন একটি হুকুমের উপরও ঈমান না আনলে সে মুসলমান নয়। আর শুধু বাহ্যিক ও মৌখিক কথার কোন মূল্য নেই।

২. প্রকাশ্যে মুসলমান হল বটে, কিন্তু অন্তরে সন্দিহান রইল এবং শেষ পর্যন্ত আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়াই মারা গেল, এমন লোকদের নাজাত হবে না, তারা কাফের। শুধু বাহ্যিক ইসলাম কোন কাজে আসবে না।

আয়াতে মুনাফিকদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এই আয়াত ইহুদীদের বিষয়ে নাযিল হয়েছে। কেননা, ওরা প্রথমে ঈমান এনেছিল, অতঃপর বাছুর পূজা করে কাফের হয়ে গেল। পুনরায় তওবা করে মুমিন হল, আবার হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে অস্বীকার করে কাফের হয়ে গেল। তারপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাত অস্বীকার করে কুফরের মধ্যে উন্নতি করল।

الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝

তো আল্লাহরই[১]।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۝

১৪০. আর তিনি তো কিতাবে (কুরআনে) তোমাদের প্রতি এ হুকুম অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ সম্পর্কে শুনবে যে, তা অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তাকে উপহাস করা হচ্ছে তখন তোমরা ওদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না ওরা অন্য কোন কথায় মশগুল হয়। (যদি বস, তবে) সেক্ষেত্রে তোমরাও ওদেরই মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদের সকলকে জাহান্নামে একত্র করবেন[২]—

---

১. অর্থাৎ মুনাফিক লোকেরা, যারা মুসলমানদের বাদ দিয়ে কাফেরদের বন্ধু বানায়, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। আর কাফেরদের সংস্পর্শে থেকে দুনিয়াতে সম্মান লাভ হবে– ওদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। (কেননা) সমস্ত সম্মানের মালিক আল্লাহ তাআলা। যে তাঁর আনুগত্য করবে সে সম্মান লাভ করবে। সারকথা এই যে, এমন লোকেরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে অপমানিত ও অপদস্থ হবে।

২. অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! আল্লাহ তাআলা ইতিপূর্বে কুরআন শরীফে তোমাদের প্রতি আদেশ পাঠিয়েছেন যে, যে মজলিসে আল্লাহর আহকামের প্রতি অস্বীকৃতি ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয় সেখানে কখনো বসবে না, অন্যথায় তোমরাও তাদের মধ্যে পরিগণিত হবে। অবশ্য যখন তারা অন্য বিষয়ের আলোচনায় রত হয়, তখন তাদের সাথে বসতে বাধা নেই।

মুনাফিকদের মজলিসসমূহে আল্লাহ তাআলার আয়াত ও বিধানকে অস্বীকার করা এবং তা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হতে থাকত। এতে বর্তমান আয়াত নাযিল হয়।

আর 'তোমাদের প্রতি কুরআনে এ হুকুম অবতীর্ণ করেছেন' বলে পূর্বে অবতীর্ণ এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন– وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ الخ ('তুমি যখন তাদের দেখ, যারা আমার আয়াত নিয়ে বিতর্ক করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যাও।' –আন'আম, ৬৮)

বি. দ্র. এ থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি কোন মজলিসে ইসলাম ধর্মের প্রতি হাসিঠাট্টা ও মন্দচার হতে শুনেও সেখানে বসে শুনতে থাকে– যদিও সে কিছু না বলুক, তবুও সে মুনাফিকদের মধ্যে পরিগণিত– اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ।

১৪১. যারা (অর্থাৎ যে মুনাফিকরা) তোমাদের বিষয়ে প্রতীক্ষায় থাকে। এখন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় লাভ হয়, তবে (তোমাদের কাছে এসে) বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' আর যদি কাফেরদের লাভ হয় (বিজয়ের) কোন অংশ, তবে (ওদের) বলে, 'আমরা কি (যুদ্ধে) তোমাদের বেষ্টন করে রাখিনি এবং তোমাদেরকে মুসলমানদের থেকে রক্ষা করিনি[১]?' অতএব আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন এবং আল্লাহ কখনো কাফেরদের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে সুযোগ সৃষ্টি হতে দেবেন না[২]।

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ﴿۱۴۱﴾

[রুকূ - ২১]

১৪২. নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, অথচ তিনিই ওদের ধোঁকায় ফেলেন[৩]। আর যখন ওরা নামাযে

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ

---

১. অর্থাৎ উক্ত মুনাফিকরা এমন যে, ওরা সর্বদা তোমাদের তাক করে বসে থাকে। অতঃপর যদি তোমাদের বিজয় লাভ হয়, তবে তোমাদের বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গী নই? সুতরাং গনীমতের মালে আমাদেরও অংশ রাখ।' পক্ষান্তরে, যদি বিজয়ের কিছু অংশ কাফেররা পায়, তবে ওদের বলে, 'আমরা কি তোমাদের ঘিরে ফেলিনি এবং তোমাদের হেফাজত করিনি এবং আমরা মুসলমানদের আক্রমণ থেকে তোমাদের রক্ষা করিনি? (অতএব) লুটের মালে আমাদের অংশ দাও।'

বি. দ্র. এ থেকে জানা গেল যে, সত্য ধর্মের উপর থেকে বিধর্মীদের সাথে মিল-মহব্বত রাখা– এও নেফাকের অন্তর্ভুক্ত।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের ও ওদের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেবেন। তা এভাবে যে, তিনি তোমাদের বেহেশত দান করবেন এবং ওদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। ওরা দুনিয়াতে যা কিছু করতে পারে করুক, কিন্তু ওদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্থাৎ ঈমানদারদের মূলোচ্ছেদ করা ওদের পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না।

৩. অর্থাৎ ওরা অন্তরে কাফের এবং প্রকাশ্যে মুসলমান সেজে আছে, যাতে উভয় দিকের ক্ষতি ও কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে এবং উভয় দিক থেকে স্বার্থ লাভ করতে থাকে।

قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

দাঁড়ায়, তখন দাঁড়ায় অলসতার সাথে– কেবল লোক দেখানোর জন্য। এবং ওরা আল্লাহকে খুব সামান্যই স্মরণ করে[১]—

مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۝

১৪৩. ওরা ঐ দুয়ের মধ্যে (অর্থাৎ ঈমান ও কুফরের মধ্যে) দোদুল্যমান– না এদের দিকে, না ওদের দিকে। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, আপনি মোটেই তার জন্য কোন পথ পাবেন না[২]।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

১৪৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুসলমানদের ছেড়ে কাফেরদের বন্ধু বানিয়ো না। তোমরা কি আল্লাহকে নিজেদের বিরুদ্ধে (অভিযোগের) সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?

আল্লাহ তাআলা এহেন ধোঁকাবাজির শাস্তিস্বরূপ ওদের সমস্ত দুরাচার ও গোপন দুরভিসন্ধি স্বীয় নবীর কাছে প্রকাশ করে ওদের এমন হেয়-অপদস্থ করলেন যে, ওরা কোথাও দাঁড়ানোর যোগ্য রইল না, সকল ধোঁকাবাজি মুসলমানদের সম্মুখে ফাঁস হয়ে গেল। আর পরকালে ওদের যে শাস্তি হবে তাও সম্মুখবর্তী আয়াতে প্রকাশ করে দিলেন। মোটকথা, ধোঁকাবাজির দ্বারা লাভ তো কিছু হয়ইনি, বরং আল্লাহ তাআলা ওদের এমন অবস্থায় ফেললেন যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই ধ্বংস হল।

১. অর্থাৎ নামায অত্যন্ত জরুরী ও খাঁটি ইবাদত এবং তা আদায় করতে দৈহিক ও আর্থিক কোন ক্ষয়-ক্ষতিরও আশঙ্কা নেই, মুনাফিকরা সেই নামায থেকেও জান বাঁচাতে চায়। অগত্যা লোক দেখানোর জন্য এবং ধোঁকা দেওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে পড়ে নেয়, যাতে ওদের কুফরী সম্পর্কে কেউ জানতে না পারে এবং যাতে ওদের মুসলমান মনে করা হয়। সুতরাং ওদের থেকে কী করে আশা করা যেতে পারে যে, ওরা ইসলামের দিকে ফিরে আসবে?

২. অর্থাৎ মুনাফিকরা কঠিন সংশয় ও বিড়ম্বনায় পড়ে আছে; ইসলামেও ওদের স্বস্তি নেই, কুফরেও নয়, ফলে দারুণ অশান্তিতে ভুগছে। ওরা কখনো এদিকে, কখনো অন্য দিকে, দোটানায় পড়ে আছে। আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত ও পথহারা করতে চান, ওর মুক্তির পথ কোথায় মিলতে পারে?

১৪৫. নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে এবং আপনি ওদের জন্য কিছুতেই কোন সাহায্যকারী পাবেন না[১]।

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا

১৪৬. কিন্তু যারা তওবা করবে, (নিজেদের) সংশোধন করবে, আল্লাহকে আঁকড়ে ধরবে এবং নিজ আনুগত্য আল্লাহর জন্য খাঁটি করবে, তারা ঈমানদারদের সঙ্গে থাকবে। আর আল্লাহ শীঘ্রই ঈমানদারদের মহা প্রতিদান দেবেন[২]।

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَأَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا

১৪৭. আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দিয়ে কী করবেন যদি তোমরা শোকর কর ও ঈমান আন? আর আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ[৩]।

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا

১. অর্থাৎ মুসলমানদের ছেড়ে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা নেফাকের প্রমাণ, মুনাফিকরা তাই করে। অতএব হে মুসলিমগণ, তোমরা কখনো এমন করো না। যদি কর তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে এ মর্মে আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট অভিযোগ ও পরিপূর্ণ দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে যে, তোমরাও মুনাফিক।

আর মুনাফিকদের জন্য দোযখের সর্বনিম্ন স্তর নির্ধারিত রয়েছে। এবং ওরা এমন কোন সাহায্যকারীও পাবে না, যে ওদের এই নিম্নতম স্তর থেকে বের করতে পারবে বা শাস্তি কিছুটা হ্রাস করে দেবে।

২. যে মুনাফিক নেফাক থেকে তওবা করে নিজ আমলের সংশোধন করবে, আল্লাহর মনোনীত ধর্মকে খুব দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করবে, আল্লাহর উপর ভরসা করে দীন-ধর্মকে রিয়া ইত্যাদি দোষ থেকে পাক-সাফ রাখবে, সে খাঁটি মুসলমান– দীন ও দুনিয়াতে সে ঈমানদারদের সঙ্গী হবে। আর ঈমানদাররা বিরাট প্রতিদান লাভ করবে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নেককাজের মূল্যায়নকারী। এবং তিনি বান্দাদের সকল বিষয় খুব ভাল জানেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা ও শোকরগুযারীর সাথে তাঁর আদেশ বরণ করে নেয় এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে, এমন ব্যক্তিকে শাস্তিদানের সাথে সুবিচারক দয়াময় আল্লাহ তাআলার কোনই সম্পর্ক নেই, অর্থাৎ এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ কখনো শাস্তি দেবেন না– তিনি তো অবাধ্য ও নাফরমানদেরই শাস্তি দেন।

পারা - ৬

১৪৮. আল্লাহ মন্দ কথা প্রকাশ করা পছন্দ করেন না, তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে (তার কথা ভিন্ন)। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[১]।	لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿۱۴۸﴾
১৪৯. তোমরা যদি কোন সৎকর্ম প্রকাশ্যে কর বা গোপনে কর অথবা (কারো) দোষ ক্ষমা কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ অত্যধিক ক্ষমাকারী, পূর্ণ ক্ষমতাশালী[২]।	اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿۱۴۹﴾
১৫০. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের অস্বীকার	اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ

১. অর্থাৎ কারো মধ্যে দীন বা দুনিয়ার কোন দোষ জানা গেলে তা প্রকাশ করতে নেই। আর আল্লাহ তাআলা সকলের কথা শোনেন এবং সকলের কাজকর্ম জানেন– প্রত্যেককে তদনুসারে প্রতিফল দান করবেন। একেই অর্থাৎ অন্যের দোষ প্রকাশ করাকেই গীবত বলে। অবশ্য মজলুম ব্যক্তি তার উপর জালেমের জুলুমের কথা লোকের নিকট প্রকাশ করতে পারে। তেমনি আরো কিছু ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয আছে।

এস্থলে উক্ত নির্দেশ সম্ভবত এ জন্য দিলেন যে, মুসলমানের উচিত কোন মুনাফেকের নাম প্রকাশ না করা এবং খোলাখুলিভাবে ওর বদনাম না করা। এতে সে বিগড়ে গিয়ে হয়ত উদ্ধত হয়ে ওঠবে। তা না করে বরং নসীহত করবে, তবে নির্দিষ্টভাবে কাউকে সম্বোধন না করে, বরং এমনভাবে যে, মুনাফিক আপনিই বুঝে নেবে। অথবা নির্জনে ওকে উপদেশ দেবে। এই উপায়ে হয়ত সে নসীহত গ্রহণ করবে। বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করতেন– কারো নাম প্রকাশ করতেন না।

২. এই আয়াতে (জালেমকে) ক্ষমা করে দেওয়ার প্রতি মজলুমকে উৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা ক্ষমতাশালী ও মহা শক্তিমান হয়েও অপরাধকারীদের অপরাধ ক্ষমা করে দেন। অতএব আল্লাহর অধীনস্থ অক্ষম বান্দার পক্ষে তো অন্যদের অন্যায় ক্ষমা করে দেওয়া অধিক সমীচীন। মোদ্দাকথা এই যে, মজলুমের জন্য জালেম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়েয আছে বটে, তবে ধৈর্যধারণ ও ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম।

আয়াতের মধ্যে এই সত্যের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুনাফিকদের সংশোধন কাম্য হলে ওদের অপরাধ ও ওদের দেওয়া কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা এবং নম্র ও গোপনভাবে ওদের বোঝানো উচিত, প্রকাশ্যে মন্দচারি বলে ওদেরকে প্রকাশ্য শত্রু বানিয়ে ফেলা ঠিক নয়।

وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۙ

করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় ও বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি' এবং তার (অর্থাৎ ঈমান ও কুফরের) মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়–

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

১৫১. নিশ্চয় এমন লোকেরাই প্রকৃত কাফের। আর আমি কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি[১]।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ

১৫২. আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁদের মধ্যে কারও ক্ষেত্রে পার্থক্য করেনি, তাদের তিনি সত্বর তাদের প্রতিদান দেবেন। আর আল্লাহ অতি

---

১. এখান থেকে ইহুদীদের আলোচনা হচ্ছে। যেহেতু ইহুদীদের মধ্যে নেফাকের বিষয়টি অত্যধিক পরিমাণে ছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের মুনাফিকরা হয় ইহুদী ছিল অথবা ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক ও সম্প্রীতি অবশ্যই রাখত এবং ওদের পরামর্শক্রমে চলত– সেজন্য কুরআন মাজীদে বহু জায়গায় এই উভয় দলের উল্লেখ একসাথে করা হয়েছে।

আয়াতের সারকথা এই যে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের অমান্য করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে প্রভেদ করতে চায়, অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, কিন্তু রাসূলদের প্রতি ঈমান আনে না অথবা কোন কোন রাসূলকে মানে বটে আর কাউকে কাউকে মানে না, মোটকথা, ওরা নিজেদের জন্য ইসলাম ও কুফরের মাঝামাঝি একটা নতুন ধর্ম বের করে– এমন লোকেরাই হচ্ছে প্রকৃত ও নির্জলা কাফের। ওদের জন্য অপমানকর ও লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে।

বি. দ্র. আল্লাহকে মানা তখনি গ্রহণযোগ্য, যখন সমকালীন নবীর প্রতি ঈমান আনা হয় এবং তাঁর আদেশ মানা হয়। নবীকে মানা ছাড়া আল্লাহকে মানা নিরর্থক, এর কোনই গ্রহণযোগ্যতা নেই, বরং এক নবীকে মিথ্যা বলা আল্লাহর সকল নবীকে মিথ্যা বলা গণ্য হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহুদীরা মিথ্যা বলায় আল্লাহর সকল নবীকেও ওরা অস্বীকার করেছে বলে সাব্যস্ত হল এবং ওরা পাক্কা কাফের গণ্য হল।

أُجُوْرَهُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

[রুকূ - ২২]

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ
كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى
اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً
فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ
اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ
الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا

১৫৩. কিতাবীরা আপনার নিকট দাবি করে যে, আপনি ওদের প্রতি আসমান থেকে কিতাব অবতীর্ণ করে দেন । ওরা তো মূসার নিকট এর চেয়েও বড় জিনিস চেয়েছিল– ওরা বলেছিল, 'আমাদের প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখিয়ে দাও।' ফলে বজ্র এসে ওদের পাকড়াও করল ওদের পাপের কারণে। অতঃপর ওরা বাছুরকে (মাবুদ) বানিয়েছিল, ওদের নিকট বহু নিদর্শন পৌঁছার পরও। কিন্তু আমি তাও ক্ষমা করলাম[২] এবং মূসাকে

---

১. অর্থাৎ যারা কোন নবীকে পৃথক করেনি, বরং আল্লাহর প্রতি ও তাঁর সকল নবীর প্রতি ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাআলা নিজ রহমতে তাদের বিরাট ছওয়াব দান করবেন। এর দ্বারা মুসলিমগণ উদ্দেশ্য, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ সকল নবীর প্রতি ঈমান এনেছে।

২. **শানে নুযূল**

কতক ইহুদী সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি সত্য নবী হলে আসমান থেকে একটি লিখিত কিতাব এক সঙ্গে (অল্প অল্প করে নয়) এনে দিন, যেমন মূসা আলাইহিস সালাম তাওরাত কিতাব এনেছিলেন।' (তাফসীরে তবারী ৭/৬৩৯) এতে এই আয়াত নাযিল হয় এবং পুরো রুকু জুড়ে ওদের জওয়াবে ওদের রুিদ্ধে অনেকগুলি অভিযোগ উল্লেখ করা হয়। তার পর যথার্থ উত্তর প্রদান করা হয়।

আয়াতের সারার্থ এই যে, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ইহুদীরা যে আপনার নিকট শত্রুতামূলকভাবে এমন কিতাবের দাবি করে, তো ওদের এই দৌরাত্ম ও অবাধ্যতা আশ্চর্যের বিষয় নয়, ওদের পূর্বপুরুষেরা তো ওদের নবী মূসা আলাইহিস সালামের নিকট এর চেয়ে গুরুতর ও মারাত্মক বিষয়ের দাবি জানিয়েছিল। ওরা বলেছিল, 'আল্লাহ তাআলাকে প্রকাশ্যে আমাদের চর্মচোখে দেখিয়ে দিন, নতুবা আমরা আপনার কথায় বিশ্বাস করব না।' সূরা বাকারায় (আয়াত ৫৫-৫৬) এ বিষয়ের উল্লেখ হয়েছে। ওদের এ

مُوسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا۝

স্পষ্ট প্রাবল্য দান করলাম[১]।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا۝

১৫৪. আর আমি ওদের উপর 'তূর' পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম ওদের (থেকে) অঙ্গীকার নেওয়ার উদ্দেশ্যে[২], এবং ওদের বলেছিলাম, 'সেজদা করে করে (শহরের) দ্বারে প্রবেশ কর[৩]।' ওদের আরো বলেছিলাম, 'শনিবারে সীমালঙ্ঘন করো না[৪]'। এবং আমি ওদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

দাবির পরিণাম এই হয়েছিল যে, ওরা বজ্রাহত হয়ে সকলেই মরে গিয়েছিল। অতঃপর মূসা আলাইহিস সালামের দো'য়ার ফলে আল্লাহ তাআলা ওদের পুনরায় জীবিত করলেন। এমন আজিমুশশান নিদর্শনসমূহ দেখার পরও ওরা বাছুর-পূজা করল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা ওদের এই অপরাধও ক্ষমা করে দিলেন। সূরা বাকারায় কিছুটা বিস্তারিতভাবে এর আলোচনা রয়েছে (আয়াত ৫১-৫৪)।

১. প্রাবল্য বলতে উদ্দেশ্য এই যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম উক্ত বাছুরকে যবেহ করে আগুনে জ্বালিয়ে দিলেন এবং এর ছাই সমুদ্রের উপর বাতাসে উড়িয়ে দিলেন আর বাছুর-পূজাকারী সত্তর হাজার মানুষকে কতল করা হল।

২. অর্থাৎ যখন ইহুদীরা বলেছিল, তাওরাতের বিধান বড় কঠিন, আমরা তা মানি না, তখন তূর পাহাড়কে যমীন থেকে তুলে ওদের মাথার উপর এনে ধরা হল এবং বলা হল, এই হুকুমগুলি গ্রহণ করে নাও এবং শক্তভাবে ধর, নতুবা এখনই পাহাড় মাথার উপর পড়ল!!

৩. ইহুদীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, শহরে প্রবেশ কর সেজদা করে ও নতশিরে। ওরা সেজদার বদলে নিতম্বের উপর ভর করে পিছলিয়ে ঢুকতে লাগল। ফলে শহরে পৌঁছার পর মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে দ্বিপ্রহরের মধ্যে প্রায় সত্তর হাজারের মত লোক মারা যায়।

৪. ইহুদীদের প্রতি নির্দেশ ছিল, ওরা যেন শনিবারে মাছ না ধরে। কিন্তু অন্যান্য দিনের চেয়ে শনিবারেই নদীতে মাছ বেশি দেখা যেত। ইহুদীরা এ চালাকী করল যে, নদীর ধারে হাউয তৈরি করল। শনিবারে হাউযে নদী থেকে মাছ এলে তার মুখ বন্ধ করে রাখত। পরদিন হাউযের মধ্যে ওরা তা শিকার করত। এই ধোঁকা ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আল্লাহ তাআলা ওদের বানরে পরিণত করে দিলেন, আর সকল জন্তুর মধ্যে বানর অতন্ত ঘৃণ্য প্রকৃতির এবং অতি ধোঁকাবাজ।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝١٥٥

১৫৫. বস্তুত (আমি ওদের শাস্তি দিয়েছি)– ওরা স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে, আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করার কারণে, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার কারণে এবং এ কথা বলার কারণে যে, 'আমাদের অন্তর গেলাফে আবৃত।' (এমন নয়), বরং আল্লাহ ওদের কুফরীর কারণে ওদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন। অতএব ওরা ঈমান আনে না, অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত[১]।

وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ۝١٥٦

১৫৬. এবং (শাস্তি দিয়েছি) ওদের কুফরীর কারণে ও মারয়ামের উপর গুরুতর অপবাদ আরোপ করার কারণে।

وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ

১৫৭. এবং ওরা এ কথা বলার কারণে যে, 'আমরা হত্যা করেছি মাসীহ ঈসা ইবনে মারয়ামকে, যিনি আল্লাহর রাসূল'[২]। অথচ ওরা তাঁকে হত্যাও করেনি এবং তাঁকে শূলেও চড়ায়নি, কিন্তু ওদের বিভ্রম হয়েছিল। আর যারা এ বিষয়ে মতবিরোধ করে, ওরা এর ব্যাপারে সন্দেহে পতিত। কেবল অনুমানের অনুসরণ

---

১. অর্থাৎ ইহুদীরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করল। তখন আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার ভঙ্গ ও আল্লাহর আয়াতসমূহ অমান্য করার কারণে এবং আল্লাহর নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার কারণে এবং 'আমাদের অন্তর তো গেলাফে আচ্ছাদিত'– এই উক্তি করার কারণে ওদের উপরে কঠিন কঠিন শাস্তি আরোপ করলেন।

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের নসীহত করলেন, তখন ওরা বলতে লাগল, 'আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত, আপনার কথা সেই পর্যন্ত পৌছতে পারে না।' আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এ কথা নয়, বরং কুফরের কারণে ওদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা মোহর মেরে দিয়েছেন, যে কারণে ওদের ঈমান নসীব হয়নি। তবে কিছু সংখ্যক মানুষ এর ব্যতিক্রম, যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও তার সঙ্গীগণ।'

২. অর্থাৎ আরো এই কারণে যে, ওরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে অস্বীকার করে দ্বিতীয় কুফরী করল এবং হযরত মারয়ামের উপর গুরুতর অপবাদ আরোপ করল। তদুপরি ওদের এই দাম্ভিক উক্তির জন্যও যে, আমরা আল্লাহর রাসূল মারয়ামের ছেলে ঈসাকে মেরে ফেলেছি। এসব কারণে ইহুদীদের উপর শাস্তি ও সমূহ মুসীবত নাযিল হয়েছিল।

ছাড়া এ বিষয়ে ওদের কোনই জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই ওরা তাঁকে হত্যা করেনি,

مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۙ

১৫৮. বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[১]।

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

১৫৯. কিতাবীদের যত দল আছে, তারা অবশ্যই ঈসার প্রতি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনবে*, আর কিয়ামতের দিন তিনি

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ

---

১. আল্লাহ তাআলা ওদের কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলছেন যে, ইহুদীরা ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যাও করেনি, শূলেও চড়াতে পারেনি। এ সম্বন্ধে ওরা যে বিভিন্ন কথা বলে তা সবই ওদের নিজ নিজ অনুমান। আল্লাহ তাআলা ওদের সন্দেহে পতিত করেছেন, বাস্তব খবর ওদের কারো জানা নেই। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে তুলে নিয়েছেন। আর আল্লাহ তাআলা সব বিষয়ে পূর্ণ সক্ষম এবং তাঁর প্রত্যেক কাজে হেকমত রয়েছে।

ঈসা (আ.)-কে আসমানে উত্তোলনের ঘটনা

ঘটনা এই হয়েছিল যে, যখন ইহুদীরা হযরত ঈসা আ.-কে হত্যা করার সংকল্প করল তখন প্রথমে এক ব্যক্তি তাঁর ঘরে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাআলা ঈসা (আ.)-কে আসমানের উপর তুলে নিলেন, আর সেই ব্যক্তির আকৃতিকে হযরত ঈসা আ.এর আকৃতির অনুরূপ করে দিলেন। অবশিষ্ট লোকেরা ঘরে প্রবেশ করার পর ওকে মাসীহ মনে করে হত্যা করে ফেলল। পরে সম্বিত ফিরলে ওরা বলতে লাগল, এর চেহারা তো মাসীহর চেহারা সদৃশ, কিন্তু অবশিষ্ট দেহ আমাদের সঙ্গীর মনে হয়। কেউ বলল, এই নিহত ব্যক্তি মাসীহ হলে আমাদের মানুষটি (সঙ্গী) কোথায় গেল? আর এ আমাদের মানুষ হলে মাসীহ কোথায়? এরূপ অবস্থায় শুধু অনুমান করে কেউ এ কথা বলল, কেউ অন্য কিছু বলল, বাস্তব জ্ঞান কারো ছিল না। (তাফসীরে তবারী ৭/৬৫১-৬৫৩)

সত্য এ-ই যে, হযরত ঈসা আ. কিছুতেই নিহত হননি, বরং আল্লাহ তাআলা তাঁকে আসমানের উপর তুলে নিয়েছেন এবং ইহুদীদের সন্দেহে পতিত করে দিয়েছেন।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** কিতাবীদের প্রত্যেকে অবশ্যই ঈসার প্রতি নিজ মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনবে।

عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۝

ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেন[১]।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۝

১৬০. আর ইহুদীদের পাপের কারণে আমি ওদের জন্য এমন অনেক পবিত্র বস্তু হারাম করেছিলাম, যা ওদের জন্য হালাল ছিল এবং (তা হারাম করেছিলাম) এ কারণেও যে, ওরা (মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে খুব বেশি বাধা দিত;

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

১৬১. এবং এ কারণে যে, ওরা সুদ গ্রহণ করত, অথচ ওদের তা নিতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, ওরা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাস করত। আর আমি ওদের মধ্যকার কাফেরদের জন্য যাতনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি[২]।

---

১. হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম আসমানের উপর জীবিত অবস্থায় বর্তমান রয়েছেন। যখন দাজ্জাল আবির্ভূত হবে, তখন তিনি এই পৃথিবীতে আগমন করে ওকে হত্যা করবেন এবং ইহুদী ও নাসারারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করবে যে, নিশ্চয় ঈসা জীবিত রয়েছেন, মৃত্যুবরণ করেননি। আর কিয়ামতের দিন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ওদের অবস্থা ও আমল প্রকাশ করে বলবেন যে, ইহুদীরা আমাকে মিথ্যা বলেছিল এবং খ্রিস্টানরা আমাকে আল্লাহর পুত্র বলেছিল।

২. ইতিপূর্বে ইহুদীদের আগে-পরের গুরুতর দুষ্কর্মসমূহের উল্লেখ হয়েছে। এতে ওদের অবাধ্যতা ও পাপাচারের দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। এখন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন যে, সে কারণেই (অর্থাৎ যেহেতু শুরু থেকেই ওরা অবাধ্য ছিল, তাই) আমি ওদের শরীয়তও কঠিন করেছিলাম, যাতে ওদের ঘাড় সোজা হয়। অতএব এখন আর এই সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ওদের জন্য পবিত্র বস্তু-সামগ্রী হারাম করা হয়েছিল তাওরাতে, আর ওদের কর্তৃক হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বিরোধিতা করা এবং হযরত মারয়ামের প্রতি অপবাদ দেওয়ার ঘটনা তো ঘটেছে তাওরাত অবতরণের অনেক পরে। এর অর্থ তো এই দাঁড়াল যে, অপরাধের পূর্বে শাস্তি দেওয়া হয়েছে? (এই সন্দেহের অবকাশ এ জন্য নেই যে, ওরা বহু আগে থেকেই বহুবিধ অপরাধে লিপ্ত রয়েছে।)

বর্তমান রুকুতে আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ এই দাঁড়াল যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের যমানা থেকে আহলে কিতাব যথারীতি একটির পর একটি দুষ্কর্ম, অবাধ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ও নবীগণকে কষ্টপ্রদান ইত্যাদি করে আসছে। অতএব হে আল্লাহর রাসূল

১৬২. কিন্তু ওদের মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক ও ঈমানদার, তারা তার উপর ঈমান রাখে যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং তার উপরও, যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠাকারী, যাকাত প্রদানকারী এবং যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে– এরূপ লোকদের আমি শীঘ্রই বিরাট ছওয়াব প্রদান করব[১]।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

[রুকূ - ২৩]

১৬৩. নিশ্চয় আমি আপনার নিকট ওহী পাঠিয়েছি[২] যেমন ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহ ও

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَآ

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এখন যদি ওরা আপনার সঙ্গে শত্রুতাবশে সর্বোত্তম কিতাব কুরআনকে না মেনে তাওরাতের মত এক সঙ্গে অবতারিত কিতাবের দাবি করে, তবে এই হঠকারী নালায়েকদের পক্ষে তা মোটেই বিচিত্র নয়। ওদের এহেন অসভ্য কার্যকলাপে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হবেন না। ওদের ছোট-বড় ও পূর্বা-পর সকল কাজকর্ম আমার বেশ জানা আছে। তাই ওদের জন্য দুনিয়াতে কঠিন শরী'য়ত নির্ধারণ করেছি এবং আখেরাতের কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

১. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের মধ্যে যাদের ইলম পরিপক্ক এবং যারা ঈমানদার, যেমন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. ও তাঁর সঙ্গী-সাথী, তারা কুরআন, তাওরাত, ইনজীল সবই মানে। আর কী বলব তাদের সম্পর্কে, যারা নামায প্রতিষ্ঠাকারী, যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী– এরূপ লোকদের আমি মহা প্রতিদান দেব। কিন্তু প্রথমোক্ত দল এর ব্যতিক্রম, ওদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে কঠিন শাস্তি।

২. আহলে কিতাব ও মক্কার মুশরিক সকল কাফেরই কুরআন শরীফের সত্যতা ও সততায় নানা প্রকার নিরর্থক সন্দেহ সৃষ্টি করত। যেমন: এস্থলে ওরা বলেছিল, 'তাওরাতের সবটুকুই যেমন একসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল, আপনিও তেমন একটি কিতাব আসমান থেকে আমাদের এনে দিন। তবেই আমরা আপনাকে সত্য বলে মানব।' আসলে মানতে না চাইলে দুষ্টের কত বাহানা!

অতএব এস্থলে আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি আয়াত নাযিল করে কুরআনের তাৎপর্য ও ওহীর মর্যাদা প্রকাশ করে দিলেন এবং কাফেরদের সব রকমের ধারণা ও অহেতুক সন্দেহের খণ্ডন করলেন। অধিকন্তু, খোদায়ী ওহীর অনুসরণকে সাধারণভাবে এবং কুরআন শরীফের

إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾

তাঁর পরবর্তী নবীদের নিকট[১] এবং ওহী পাঠিয়েছিলাম ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব, (তাঁর) সন্তান-সন্ততি, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের নিকট। আর দাউদকে দিয়েছিলাম যাবূর।

আনুগত্যকে বিশেষভাবে বয়ান করে বলে দিলেন যে, আল্লাহর বিধান মান্য করা সকলের উপর ফরয। এতে কারো কোনই ওযর-আপত্তি চলতে পারে না। কেউ তা মেনে নিতে দ্বিধা-সন্দেহ বা অস্বীকার করলে সে গোমরাহ ও বেদীন। অতঃপর সম্মুখে ওদের উক্তির যথাযথ জওয়াব দেওয়া হচ্ছে।

১. এ থেকে জানা গেল, ওহী হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর হুকুম ও তাঁর বাণী, যা পয়গম্বরদের প্রতি পাঠানো হয়ে থাকে এবং পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি যেমন ওহী নাযিল হয়েছিল, তেমনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তাআলা স্বীয় ওহী পাঠিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি তা (অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি প্রেরিত ওহী) মেনেছে, তার পক্ষে এও মানা আবশ্যক। আর যে ব্যক্তি এই ওহী অমান্য করল, সে যেন সেই সবও অমান্য করল।

আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওহীকে (হযরত আদম আ. এর পরিবর্তে) হযরত নূহ আ. ও তাঁর পরবর্তী নবীদের প্রতি প্রেরিত ওহীর সাথে তুলনার কারণ সম্ভবত এই যে, হযরত আদম আ. এর সময় যে ওহী নাযিল হওয়া শুরু হয়, তা নিতান্ত প্রাথমিক অবস্থার ছিল, হযরত নূহ আ. এর প্রতি তার পূর্ণতা ঘটে। বলতে গেলে, প্রাথমিক অবস্থা নিতান্ত শিক্ষামূলক অবস্থা ছিল, হযরত নূহ আ.-এর যমানায় সেই অবস্থা পূর্ণতা লাভ করে। সে মত বড় নবীদের ধারাও হযরত নূহ আলাইহিস সালাম থেকেই শুরু হয় এবং তাঁরই সময় থেকে শুরু হয় খোদায়ী ওহীর অমান্যকারীদের উপর শাস্তি আগমনের পালা।

মোটকথা, নূহ আ. এর পূর্বে আল্লাহর বিধান ও নবীদের না মানার কারণে আযাব নাযিল হত না, বরং অবাধ্যদের ক্ষমার যোগ্য মনে করে অবকাশ দেওয়া হত এবং শুধু বোঝানোর চেষ্টা করা হত। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কালে ধর্মীয় শিক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবং খোদায়ী বিধানে কোন অস্পষ্টতা অবশিষ্ট না থাকায় এবার নাফরমানদের উপর আযাব নাযিল হল। প্রথমে নূহ আ. এর যমানায় প্লাবন এল, তাঁর পরে হযরত হূদ আ., হযরত সালেহ আ., হযরত শু'আয়ব আ. প্রমুখের যমানায় কাফেরদের উপর নানা প্রকারের আযাব এল।

অতএব হযরত নূহ আ. ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের প্রতি প্রেরিত ওহীর সাথে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওহীর তুলনা করার মধ্য দিয়ে আহলে কিতাব ও মক্কাবাসী কাফেরদের পূর্ণরূপে সতর্ক করা হল যে, যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি প্রেরিত ওহী অর্থাৎ কুরআনকে না মানবে, সেও খোদায়ী শাস্তির যোগ্য হবে।

১৬৪. আর (আমি পাঠিয়েছি) এমন অনেক রাসূল, যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে ইতিপূর্বে শুনিয়েছি এবং এমনও অনেক রাসূল, যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শুনাইনি। আর আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছিলেন[১]।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۗ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ۚ﴿۱۶۴﴾

১৬৫. (পাঠিয়েছি) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রাসূলদের, যাতে রাসূলদের (আগমনের) পর আল্লাহর প্রতি মানুষের আপত্তির সুযোগ না থাকে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[২]।

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۶۵﴾

---

১. হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পরবর্তী নবীদের কথা মোটামুটিভাবে উল্লেখ করে তাঁদের মধ্যে যারা ছিলেন বিখ্যাত, উচ্চস্তরের ও অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন, তাঁদের আলোচনা সবিস্তারে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হল। এতে সুস্পষ্টভাবে জানা গেল, তাঁদের ওহীর মতই হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ ওহীও সত্য এবং তা মানা জরুরী। আর এও জানা কথা যে, নবীদের প্রতি ওহী বিভিন্নভাবে এসে থাকে– কখনো ফেরেশতা বার্তা নিয়ে আসেন, কখনো লিখিত কিতাবের আগমন হয়, আবার কখনো বার্তাবাহক ও মাধ্যম ছাড়া স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের সঙ্গে কথা বলেন। তবে যেহেতু এ সবই আল্লাহর হুকুম, অন্য কারো হুকুম নয়, সেহেতু উক্ত সকল অবস্থাতেই ওহীর অনুসরণ করা বান্দাদের জন্য সমভাবে জরুরী, ওহীর আগমনের উপায় যাই হোক– চাই লিখিত হোক বা মৌখিক, অথবা বার্তা আকারে হোক।

অতএব, ইহুদীদের এই দাবি যে, তাওরাতের মত সম্পূর্ণ কিতাব একই সঙ্গে আসমান থেকে এনে দিতে পারলে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করব, নতুবা নয়– এ শুধুই বেঈমানী ও চরম বোকামী! যখন ওহী আল্লাহরই হুকুম এবং তার অবতরণের উপায় বিভিন্ন, তখন যে উপায়েই তার আগমন হোক না কেন, তা মানতে দ্বিধা ও অস্বীকার করা অথবা এই বলা যে, অমুক উপায়ে আগমন করলে মানব, নতুবা মানব না– এ পরিষ্কার কুফর ও সুস্পষ্ট বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

২. আল্লাহ পয়গম্বরদের প্রেরণ করেন মুমিনদের সুসংবাদ শোনানোর জন্য এবং কাফেরদের সতর্ক করার জন্য। আর আল্লাহ তাআলা সকল যুগে নবী-পয়গম্বর পাঠিয়েছেন, যাতে কিয়ামতের দিন লোকেরা এই ওযর-আপত্তি পেশ না করতে পারে যে, কিসে আপনার সন্তুষ্টি কিসে অসন্তুষ্টি তা আমরা জানতাম না, যদি জানতাম তবে সেই মত অবশ্যই জীবন যাপন করতাম।

১৬৬. কিন্তু আল্লাহ ঐ কিতাব সম্বন্ধে, যা তিনি আপনার প্রতি নাযিল করেছেন– সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি তা নাযিল করেছেন স্বীয় জ্ঞানের সঙ্গে[১] এবং ফেরেশতাগণও (এ) সাক্ষ্য দিচ্ছেন। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝

১৬৭. যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে, নিশ্চয় ওরা চরমভাবে গোমরাহ হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۝

১৬৮. যারা কাফের হয়েছে এবং জুলুম করেছে, আল্লাহ কখনই ওদের ক্ষমা করবেন না এবং ওদের সরল পথও দেখাবেন না—

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ۝

১৬৯. তবে (দেখাবেন) জাহান্নামের পথ, যে জাহান্নামে ওরা চিরকাল থাকবে। আর এ আল্লাহর পক্ষে সহজ[২]।

اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

অতএব আল্লাহ তাআলা যখন মুজেযা দিয়ে পয়গম্বরদের পাঠিয়েছেন এবং পয়গম্বরগণ সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন, তখন আর সত্য ধর্ম গ্রহণ না করায় কারো কোন আপত্তি থাকতে পারে না। খোদায়ী ওহী এমনি অকাট্য প্রমাণ যে, এর সামনে কোন অজুহাত টিকতে পারে না, বরং সকল হুজ্জতই খণ্ডিত হয়ে যায়।

১. অর্থাৎ (যুগে যুগে) প্রত্যেক পয়গম্বরের নিকটই ওহী এসেছে, এ কোন নতুন কথা নয়, বরং সকলেরই তা জানা। কিন্তু এ কুরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ নিজের খাস ইলম অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি এই সত্যকে প্রকাশ করে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, জ্ঞানী ব্যক্তিরা অবগত আছেন যে, কুরআন শরীফ থেকে যত জ্ঞান-বিজ্ঞান, তত্ত্ব-তথ্য ও সত্য বিষয়াদি হাসিল হয়েছে এবং অনবরত হতে থাকবে, তা আর কোন গ্রন্থ থেকে হাসিল হয়নি। আর যে পরিমাণ হেদায়েত লোকেরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে লাভ করেছে, আর কারো নিকট থেকে তা হয়নি।

২. কুরআন শরীফ ও হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জোরদার সমর্থন ও সত্যতা বর্ণনার পর আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, এখন যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করল এবং তাওরাতে বর্ণিত তাঁর গুণাবলি ও হাল-অবস্থা গোপন করল এবং সত্যের পরিপন্থী বিষয় প্রকাশ করে লোকদেরও সত্য ধর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখল, তাদের ভাগ্যে মাগফেরাত বা হেদায়েত কিছুই জুটবে না।

১৭০. হে মানুষ! তোমাদের নিকট রাসূল আগমন করেছেন তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য বাণী নিয়ে। অতএব তোমরা (তাঁর প্রতি) ঈমান আন; তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি অস্বীকার কর, তবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা সব আল্লাহরই। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান[১]।

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا۝

১৭১. হে কিতাবীরা! তোমরা তোমাদের ধর্মের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে সঠিক কথা বৈ কিছু বলো না। নিশ্চয় মাসীহ ঈসা ইবনে মারয়াম আল্লাহর রাসূল ও তাঁর 'কালিমা' যা তিনি পাঠিয়েছিলেন মারয়ামের কাছে, এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না যে, '(খোদা) তিনজন'। (এ থেকে) নিবৃত্ত হও, তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। নিশ্চয় আল্লাহ একমাত্র মা'বূদ। তিনি এ থেকে পবিত্র যে, তাঁর কোন সন্তান

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰىهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ؗ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۫ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মধ্যেই হেদায়েত সীমাবদ্ধ। আর তাঁর বিরোধিতার নামই গোমরাহী। এতে ইহুদীদের খুব করে নিন্দা করা হল এবং ওদের ধেয়ান-ধারণার ভ্রান্তি সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

১. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর কিতাবের সত্যতা এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদী অর্থাৎ আহলে কিতাবের ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি বয়ান করার পর এখন সমস্ত মানব সমাজকে সম্বোধন করে আল্লাহ তাআলা বলছেন, হে মানব জাতি! আমার রাসূল সত্য কিতাব ও সত্য দীন নিয়ে তোমাদের কাছে আগমন করেছেন। এখন তাঁর কথা মেনে নেওয়ার মধ্যেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত। যদি না মান তাহলে ভালভাবে জেনে রাখ যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর এবং তিনি তোমাদের সকল অবস্থা ও কার্য সম্বন্ধে অবহিত আছেন, তোমাদের আমলাদির পূর্ণ হিসাব নেওয়া হবে এবং তার বিনিময় দেওয়া হবে।

বি. দ্র. এ থেকে জানা গেল, পয়গম্বরের প্রতি প্রেরিত ওহী মানা ফরজ, তা অস্বীকার করা কুফর।

থাকবে[১]। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। আর কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট[২]।	السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۟

১. কিতাবীরা নিজেদের নবীদের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করত এবং সীমালঙ্ঘন করে তাঁদেরকে খোদা ও খোদার পুত্র বলত। অতএব আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, দীনের বিষয়ে অতিরঞ্জন করো না এবং যার প্রতি ভক্তি হয় তাঁর প্রশংসায় সীমা ছেড়ে যেয়ো না। যতটুকু প্রমাণিত, তার অতিরিক্ত বলো না। আর আল্লাহ তাআলার পবিত্র শানেও তাই বলা উচিত, যা সঠিক ও সত্য বলে প্রমাণিত, নিজেদের তরফ থেকে কিছুই বলো না। তোমরা এ কী সাংঘাতিক কাজ করলে যে, যে হযরত ঈসা আ. আল্লাহ তাআলার রাসূল এবং তাঁর হুকুমে পয়দা হয়েছিলেন, তাঁকে ওহীর খেলাফ আল্লাহর পুত্র বলতে শুরু করলে এবং তিন খোদা অর্থাৎ ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী হলে– তিনজনের একজন হচ্ছেন আল্লাহ, দ্বিতীয়জন হযরত ঈসা আ. ও তৃতীয়জন হযরত মারয়াম। এসব বিষয় থেকে ক্ষান্ত হও। আল্লাহ তাআলা একক ও অদ্বিতীয়, কেউই তাঁর শরীক নয়, এবং কেউই তাঁর পুত্রও হতে পারে না, তাঁর পবিত্র সত্তা এসব থেকে পাকপবিত্র।

এ সকল অনর্থের উৎস এই যে, তোমরা ওহীর আনুগত্য ও অনুসরণ করনি। ওহীর অনুসরণ করলে আল্লাহর জন্য পুত্র সাব্যস্ত করতে না এবং ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে প্রকাশ্য মুশরিক হতে না এবং রাসূলদের সর্দার মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কুরআন মাজীদকে অস্বীকার করে ডবল কাফের হতে না।

বি. দ্র. আহলে কিতাবের এক দল তো (অর্থাৎ ইহুদীরা) হযরত ঈসা আ.-কে রাসূলও মানেনি এবং তাঁকে কতল করতে চাইল। ইতিপূর্বে এর আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় দল (তথা নাসারারা) তাঁকে খোদার পুত্র বলল। ফলে উভয় দল কাফের হয়ে গেল। উভয় দলেরই গোমরাহীর কারণ এই ছিল যে, ওরা ওহীর খেলাফ করেছিল। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, ওহীর অনুসরণের মধ্যেই মুক্তি সীমাবদ্ধ।

২. অর্থাৎ আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর সৃষ্টি, তাঁর স্বত্ব ও দাস। অতএব, কেউ তাঁর শরীক বা পুত্র কেমন করে হতে পারে? আর আল্লাহ তাআলা সকল কার্যের ব্যবস্থাপক এবং সকলের কার্যনির্বাহক হিসাবে তিনিই যথেষ্ট, অন্য কারো প্রয়োজন নেই। অতএব বল তো, তাঁর শরীক বা পুত্রের প্রয়োজন কী করে হতে পারে?

সারকথা এই যে, তাঁর শরীক হওয়ার যোগ্যতা কোন সৃষ্টির মধ্যে থাকার প্রশ্নই ওঠে না এবং তাঁর পবিত্র সত্তার মধ্যে এর বিন্দুমাত্র অবকাশও নেই, আবশ্যকতাও নেই। এ থেকে বোঝা গেল, সৃষ্টিকুলের মধ্যে কাউকে আল্লাহ তাআলার শরীক বা পুত্র বলা তারই কাজ, যে ঈমান ও বিবেক উভয় থেকে বঞ্চিত।

[রুকূ - ২৪]

১৭২. মাসীহ কখনো আল্লাহর বান্দা হওয়াতে লজ্জাবোধ করেন না এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারাও না[১]। আর যারা আল্লাহর দাসত্ব করতে লজ্জাবোধ করবে ও অহংকার করবে, ওদের সকলকে শীঘ্রই তিনি তাঁর নিকট সমবেত করবেন।

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿۱۷۲﴾

১৭৩. তো, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদের দান করবেন পূর্ণ ছওয়াব এবং নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদের আরো বেশি দেবেন। আর যারা (তাঁর দাসত্বে) লজ্জাবোধ করেছে ও অহংকার করেছে, তিনি ওদের যাতনাদায়ক শাস্তি

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

বি. দ্র. উল্লিখিত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, যে কেউ আল্লাহ তাআলার জন্য পুত্র অথবা কাউকে তাঁর শরীক মানে, সে প্রকৃতপ্রস্তাবে সমগ্র সৃষ্টিকুলকে আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহ তাআলাকে সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা মানে না। অনুরূপ, সে আল্লাহ তাআলাকে সকলের প্রয়োজন পূরণ করা ও কার্যনির্বাহের জন্য যথেষ্ট মনে করে না। বলতে গেলে, সে খোদাকে খোদায়িত্ব থেকে বের করে সৃষ্টিকুল ও নশ্বর বস্তুনিচয়ের কাতারে নিয়ে আসল। তো, سُبْحَانَهٗ أَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ('তাঁর সন্তান হওয়া তাঁর জন্য শোভন নয়।') -এ আয়াতের মধ্যে যে অপবিত্রতার প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিল, এতক্ষণে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল (অর্থাৎ তাঁর সন্তান হওয়া তাঁর জন্য খুবই অপবিত্রতার বিষয়, এ অপবিত্রতা থেকে তিনি পরিপূর্ণ পবিত্র)। আর যেহেতু প্রকৃত সন্তান ও রূপক সন্তান উভয়েরই মধ্যে ঐ অপবিত্রতা সর্বাবস্থায় বিদ্যমান, অতএব পরিষ্কার বোঝা গেল যে, তাঁর পবিত্র সত্তা যেমন পুত্র জন্মদান থেকে পবিত্র, তেমনি স্বীয় সৃষ্টির মধ্য থেকে কাউকে পুত্র বানানো থেকেও পবিত্র ও মহত্তম।

১. অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা হওয়া, তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম পালন করা অনেক উচ্চ পর্যায়ের গৌরব ও মর্যাদার বিষয়। এই নে'য়ামতের মূল্য ও গুরুত্ব যে কী, তা বলারই অপেক্ষা রাখে না। এমতাবস্থায় হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম ও নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের নিকট কী করে এটা অপমান ও লজ্জার বিষয় হতে পারে? হাঁ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগীতে বরং লজ্জা ও অপমান রয়েছে। যেমন, খ্রিস্টানরা হযরত মাসীহকে আল্লাহর পুত্র ও উপাস্য হিসাবে মেনেছে এবং মুশরিকরা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যারূপে গ্রহণ করে তাঁদের ও মূর্তিসমূহের ইবাদত করতে শুরু করেছে। সুতরাং ওদের জন্য চিরকালের আযাব ও অপমান নির্ধারিত রয়েছে।

وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا

দেবেন এবং ওরা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের জন্য কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না[১]।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا

১৭৪. হে মানুষ! তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল আলো অবতীর্ণ করেছি।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا

১৭৫. অতএব যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁকে আঁকড়ে ধরেছে, তাদের তিনি শীঘ্রই স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করবেন এবং তাদের পৌছিয়ে দেবেন তাঁর পর্যন্ত (পৌছার) সরল পথে[২]।

---

১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করতে লজ্জাবোধ করবে ও অবাধ্য হবে, তাকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে না, বরং একদিন সকলকেই আল্লাহর সম্মুখে সমবেত হতে হবে এবং হিসাব দিতে হবে।

সুতরাং যারা ঈমান এনেছে এবং নেককাজ করেছে, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার বন্দেগী ঠিক মত করেছে, তাদের কার্যের পূর্ণ ছওয়াব তাদের দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহর বন্দেগী করতে অপমান বোধ করেছে এবং অবাধ্যতা করেছে, তারা মহা শাস্তিতে ধৃত হবে এবং তাদের কোনই হিতাকাঙ্ক্ষী ও সাহায্যকারী হবে না। যাদের শরীক বানিয়ে তারা আযাবে পতিত হয়েছে, তারাও কোন কাজে আসবে না।

অতএব এখন খ্রিস্টানদের ভালভাবে বুঝে নেওয়া উচিত যে, এই উভয় অবস্থার মধ্যে কোনটি তাদের নিজেদের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল এবং কোনটি হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের শানের উপযোগী?

২. ইতিপূর্বে আল্লাহ তাআলার ওহী, বিশেষ করে কুরআন মজীদের মর্যাদা ও সত্যতার আলোচনা এবং তার অনুসরণ ও আনুগত্য করার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ হয়েছিল। প্রসঙ্গত হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের ঈশ্বরত্ব ও তাঁর ব্যাপারে 'খোদা-পুত্র' হওয়ার দাবির কথা এসে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, খ্রিস্টানরা এই আকীদা পোষণ করে থাকে। এ আকীদার খণ্ডন ও ভ্রান্তি প্রমাণের পর এখন উপসংহারে পুনরায় সকলকে আসল ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের তাকীদ করে বলা হচ্ছে, হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট বিশ্বপ্রভুর তরফ থেকে পরিপূর্ণ হুজ্জত (জ্বলন্ত প্রমাণ) ও উজ্জ্বল আলো অর্থাৎ কুরআন শরীফ পৌছে গিয়েছে, যা হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট। এখন আর কারো জন্য দ্বিধা ও সংশয়ের অবকাশ

يَسْتَفْتُوْنَكَ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ؕ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ؕ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ

১৭৬. তারা আপনার নিকট বিধান জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ তোমাদের 'কালালাহ' সম্বন্ধে বিধান জানাচ্ছেন'[১]। যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং তার কোন সন্তান (ও পিতা) না থাকে, আর তার এক বোন থাকে, তবে সেই বোন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে[২]। আর ভাইও বোনের উত্তরাধিকারী হবে যদি তার (বোনের) সন্তান (ও পিতা) না থাকে[৩]।

নেই। অতএব যে কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে এবং এই পবিত্র কিতাবকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, সে আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং সরাসরি তাঁর নিকট পৌঁছে যাবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি এর বিরোধিতা করবে, তার গোমরাহী ও ধ্বংস অনিবার্য।

১. সূরার প্রথম দিকে (আয়াত ১২) 'কালালা'র মীরাছের উল্লেখ হয়েছে। অতঃপর কয়েকজন সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুম এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে বর্তমান আয়াত নাযিল হয়।

'কালালা' এর অর্থ দুর্বল ও শক্তিহীন। এস্থলে সেই ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যার ওয়ারিসদের মধ্যে পিতা ও সন্তানাদি কেউ নেই, যেমন ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। আসল ওয়ারিস তো পিতা ও সন্তানই (অতএব এরা না থাকলে মৃত ব্যক্তি 'কালালাহ' ও দুর্বল হল)।
যার পিতা ও সন্তান নেই, তার আপন ভাই-বোন পুত্র-কন্যার মত মীরাছ পাবে। আর যদি তার আপন ভাই-বোন কেউ না থাকে, তবে বৈমাত্রেয় ভাই-বোনেরও এই হুকুম। এক বোন থাকলে সে (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) অর্ধেক পাবে, দুই বোন থাকলে দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর ভাই ও বোন উভয়ই থাকলে পুরুষ অর্থাৎ ভাই দুই অংশ এবং মেয়ে অর্থাৎ বোন এক অংশ পাবে। যদি শুধু ভাই থাকে, বোন না থাকে তবে ভাই-ই মৃত বোনের সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। আয়াতের পরবর্তী অংশে এসব অবস্থার উল্লেখ রয়েছে।

এখন রইল বৈপিত্রেয় ভাই-বোন, যারা একই মায়ের গর্ভজাত (কিন্তু বাপ ভিন্ন), তাদের বিধান সূরার শুরুতে বর্ণিত হয়েছে, তাদের অংশ নির্ধারিত (আয়াত ১২ দ্রষ্টব্য)।

২. অর্থাৎ যদি এমন পুরুষ মারা যায় যার সন্তানও নেই, পিতাও নেই, রেখে গেছে একটি আপন বা বৈমাত্রেয় বোন। এরূপ অবস্থায় বোন পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

৩. আর যদি বিপরীত অবস্থা হয়, অর্থাৎ যদি কোন নারী পিতা ও সন্তানহীনা অবস্থায় মারা যায় এবং সে আপন বা বৈমাত্রেয় ভাই রেখে যায়, তবে সেই ভাই বোনের সম্পূর্ণ সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। আর যদি সে পুত্র রেখে যায়, তবে ভাই কিছু পাবে না। মেয়ে রেখে গেলে

وَاِنۡ كَانُوۡۤا اِخۡوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ الۡاُنۡثَيَيۡنِ ؕ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمۡ اَنۡ تَضِلُّوۡا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ۟

আর যদি বোন দুজন হয়, তবে তারা তার (মৃত ভাইয়ের) পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে[১]। আর যদি ভাই-বোন তথা নর-নারী উভয় থাকে, তবে এক পুরুষ দুই নারীর সমান অংশ পাবে[২]। আল্লাহ তোমাদের জন্য (তাঁর বিধান) বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হয়ে যাও[৩]। আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সবিশেষ অবহিত[৪]।

তাকে তার অংশ দেওয়ার পর ভাই অবশিষ্ট অংশ পাবে। আর বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন রেখে গেলে তার জন্য ষষ্ঠাংশ নির্ধারিত, যেমন সূরার শুরুতে বর্ণিত হয়েছে।

১. আর যদি দুয়ের বেশি বোন রেখে যায়, তবে তাদেরকেও দুই তৃতীয়াংশ দেওয়া হবে।

২. পুরুষ ও নারী অর্থাৎ ভাই ও বোন রেখে গেলে ভাই দু'বোনের সমান পাবে- যেমন পুত্র দুই মেয়ের সমান পেয়ে থাকে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ রাহীম ও কারীম, নিতান্তই নিজ বান্দাদের হেদায়েতের জন্য এবং তাদের গোমরাহী থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সত্য বিধান বর্ণনা করে থাকেন। যেমন, এস্থলে 'কালালা'র মীরাছ বয়ান করে দিলেন। এতে তাঁর কোনই স্বার্থ নেই, তিনি সকল থেকে অমুখাপেক্ষী, বে-নিয়ায। অতএব এখনো যদি কেউ আল্লাহর এমন মেহেরবানীর কথা স্বীকার না করে বরং তাঁর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার দুর্ভাগ্যের কোন শেষ নেই।

এ থেকে জানা গেল যে, বান্দার জন্য আল্লাহর সকল হুকুমের তাবেদারী করা অবশ্য কর্তব্য; সামান্য ও আংশিক বিষয়েরও খেলাফ করলে তা হবে গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা। অতএব যারা আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তা ও পূর্ণাঙ্গ গুণাবলির বিষয়ে তাঁর হুকুমের খেলাফ করে এবং তাঁর হুকুমের মোকাবেলায় নিজেদের আকল-বুদ্ধি ও কামনা-বাসনার অনুসরণ করে, তাদের গোমরাহী ও কলুষতা যে কোন্ পর্যায়ের তা সহজেই অনুমেয়।

৪. ইতিপূর্বে জানা গিয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের হেদায়েতকে পছন্দ করেন। এখন তিনি বলছেন যে, সকল বিষয়ই তাঁর জানা আছে। উদ্দেশ্য এই যে, দীনী বিষয়াদিতে যখন যে প্রয়োজন দেখা দেয়, তা আল্লাহ-রাসূলকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।

'কালালা'র মাসআলা সম্পর্কে সাহাবীদের জিজ্ঞাসাকে যে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করছেন- আয়াতের মধ্যে এই উভয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অধিকন্তু এও বোঝা যায় যে, আল্লাহ সব কিছু জানেন কিন্তু তোমরা জান না। তোমরা তো এও বলতে পার না যে, 'কালালা' এবং এ ছাড়া অন্যদের

উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে যে অংশসমূহ নির্ধারিত করা হয়েছে তার কারণ আসলে কী। অতএব মানুষের পক্ষে তার সীমিত বুদ্ধির বলে এতটা যোগ্য হওয়া কখনই সম্ভব নয় যে, সে আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সিফাত (গুণরাজি) সংক্রান্ত ব্যাপারে ওহীর খেলাফ কোন ধৃষ্টতা দেখাবে। যে মানুষ নিজ সম্পর্কাদি এবং নিজ আত্মীয়-স্বজনের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বুঝতে অক্ষম, সে আল্লাহর অনুপম ও সাদৃশ্যহীন সত্তা ও তাঁর গুণাবলিকে তাঁর বাতলানো জ্ঞান ছাড়া কী বুঝবে?

বর্তমান আয়াতগুলো থেকে অর্জিত আরো শিক্ষা ও নির্দেশনা :

এস্থলে বর্ণিত আয়াতসমূহ থেকে কয়েকটি বিষয় জানা গেল। প্রথমত, ইতিপূর্বে যেমন وَإِنْ تَكْفُرُوْا فَإِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ বলার পর দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবের অবস্থা উল্লেখ করেছিলেন, তেমনি فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ ইরশাদ করে উদাহরণস্বরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কথা উল্লেখ করলেন, যাতে ওহীর বিরুদ্ধাচারণকারীদের গোমরাহী ও পাপাচার এবং ওহীর অনুসরণকারীদের সত্যতা ও সদাচার পরিষ্কার বুঝে এসে যায়।

প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয়ও পরিষ্কার হয়ে গেল। তা এই যে, আহলে কিতাব তো সাংঘাতিক কাজ করেছে যে, ওরা আল্লাহ তাআলার জন্য শরীক ও সন্তান নির্ধারণের মত মারাত্মক বিষয়কে নিজেদের ঈমান বানিয়ে নিয়েছে এবং আসমানী ওহী বর্জন করে তার বিরোধিতা করেছে। পক্ষান্তরে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অবস্থা এই যে, ঈমান ও ইবাদত-বন্দেগীর মত মৌলিক বিষয়াদির তো কথাই নেই, ছোট-খাট বিষয় তথা মীরাছ, বিবাহ ইত্যাদিসংক্রান্ত সামান্য মাসলাসমূহের ব্যাপারেও তাঁরা ওহীর সন্ধান ও অপেক্ষা করেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন– নিজেদের বুদ্ধি ও কামনার অনুসরণ করেন না। একবারের জিজ্ঞাসায় সান্ত্বনা না হলে বার বার খেদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞাসা করেন। কবির ভাষায় :

ببیں تفاوت راہ از کجاست تا بکجا

(অর্থ : দেখ, উভয় পথের পার্থক্য কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত)

আর এও জানা গেল যে, হযরত সাইয়েদুল মুরসালীনও ওহী ছাড়া নিজ তরফ থেকে কোনো হুকুম দিতেন না। কোন বিষয়ে ওহীসূত্রে হুকুম বর্তমান না থাকলে অপেক্ষা করতেন, অতঃপর ওহী আসলে হুকুম প্রদান করতেন। এ থেকে পরিষ্কার জানা গেল, আল্লাহর একক পবিত্র সত্তা ছাড়া আর কোন বিধানদাতা নেই। বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ। পরিষ্কার উল্লেখিত রয়েছে। বাকি রইল অন্যরা, তারা কেবল মাধ্যম। তাদের মাধ্যমে খোদায়ী বিধান মানুষের নিকট পৌছানো হয়। যেমন বাদশার হুকুম পৌছানোর ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা সকলে আপন আপন স্তর অনুযায়ী মাধ্যম হয়ে থাকে।

অতএব যখন বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ, তখন তাঁর বিধানের মোকাবেলায় অন্য কোন বিধান মানা– এর চেয়ে বড় গোমরাহী আর কী হতে পারে?

তদুপরি এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, একবারে সমস্ত কিতাবের অবতরণ হওয়ার মধ্যে (যার দাবি কিতাবী ও কতক মুশরিকরা করেছিল) সেই স্বার্থকতা নেই, যা প্রয়োজন ও ক্ষেত্র বিশেষে পৃথক পৃথক নাযিল হওয়ার মধ্যে রয়েছে। কেননা, এই উপায়ে যে কেউ নিজ প্রয়োজন মোতাবেক প্রশ্ন করতে পারে এবং কুরআনী ওহীর মাধ্যমে সে উত্তর পেতে পারে– যেমন এ ক্ষেত্রে এবং কুরআন মাজীদের আরো অনেক স্থানে বর্তমান রয়েছে। আর এ পদ্ধতিটি বেশি উপকারী হওয়া ছাড়াও এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক স্মরণীয় ও সম্বোধিত হওয়ার বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়া যায়, তাই এ ব্যবস্থাটি অতুলনীয় গৌরবজনক, যা আর কোন উম্মতের ভাগ্যে জুটেনি। وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (আল্লাহ পরম দয়ালু।)

কোন সাহাবীর প্রশংসায় বা তাঁর প্রশ্নের উত্তরে কোন আয়াতের অবতরণ তাঁর জন্য গৌরবের বিষয়। তদ্রূপ মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে যার কথার অনুকূলে আয়াত অবতীর্ণ হল, এটা তাঁর জন্য কিয়ামত পর্যন্ত গৌরবের কারণ। অতএব 'কালালা' সম্পর্কে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে এ জাতীয় প্রশ্নাবলি ও তার উত্তরের দিকে ইশারা করা হয়েছে। সম্ভবত এ ইশারার জন্যই প্রশ্নকে ব্যাপক রাখা হয়েছে– 'তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে'। প্রশ্নের বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়নি। হ্যাঁ, উত্তর দেওয়ার সময় তা উল্লেখ করা হয়েছে। আর উত্তরকে স্পষ্টতই আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

ওহীর গুরুত্ব-মাহাত্ম্য :

সারকথা এই যে, আল্লাহ তাআলার ওহী সকল বিধানের উৎস। আর এই ওহীরই অনুসরণের উপর হেদায়েত নির্ভর করে। পক্ষান্তরে, এরই বিরোধিতার নাম কুফর ও গোমরাহী। আর যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় সমস্ত ইহুদী, খ্রিস্টান, মুশরিক ও অন্যান্য পথভ্রষ্ট দলের গোমরাহীর মূল ছিল এই বিরোধিতা, এ জন্য আল্লাহ তাআলা স্বীয় কালামে পাকের অনেক স্থানে ওহীর অনুসরণের কল্যাণ এবং এর বিরোধিতার অকল্যাণের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। বিশেষ করে এস্থলে তো দুটি রুকু এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবতীর্ণ করেছেন এবং বিশদ ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্তসহ তা আলোচনা করেছেন। সম্ভবত এ কারণেই ইমাম বুখারী র. স্বীয় কিতাব বুখারী শরীফে [باب كيف كان بدؤ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহীর সূচনা কীভাবে হয়, এ বিষয়ে একটি অধ্যায় সন্নিবেশিত করে إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهِ الخ আয়াতখানিকে তার 'তরজমাতুল বাব' (বা শিরোনাম) বানিয়েছেন এবং উল্লিখিত রুকূ দুটির প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করে গেছেন।

সূরা মায়েদা

سُوْرَةُ الْمَآئِدَةِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ৫ । ১২০ আয়াত । ১৬ রুকূ । মাদানী

آياتها ١٢٠، ركوعاتها ١٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর[1]। তোমাদের জন্য হালাল করা হল

---

১. শরীয়তসম্মত ঈমান হচ্ছে দুটি জিনিসের নাম : এক- সহীহ মারেফত, দুই- আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের সমস্ত বিধানকে সঠিক ও সত্য জ্ঞান করে তা গ্রহণ ও পালনের জন্য আন্তরিকতার সাথে আত্মসমর্পণ করা। এই দিক থেকে ঈমান বস্তুত আল্লাহর সমস্ত আইন ও হুকুম মান্য করার এবং তাঁর সমস্ত হক আদায় করার একটি দৃঢ় অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তি। বলতে গেলে, (সৃষ্টির শুরুতে সমগ্র আদম-সন্তান থেকে) আল্লাহ তাআলার একচ্ছত্র রুবুবিয়্যতের যে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যার সুস্পষ্ট প্রভাব আজ পর্যন্ত মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিতে বিদ্যমান, তারই নবায়ন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয় শরী'য়তসম্মত ঈমানের দ্বারা। আবার এই ঈমানের মধ্যে যা কিছু মৌলিক ওয়াদা-অঙ্গীকার রয়েছে, তারই বিশদ ব্যাখ্যা কুরআন ও হাদীসের মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

অতএব ঈমানের দাবি করার অর্থ হল বান্দার এই অঙ্গীকার করা যে, সে আল্লাহ তাআলার সমস্ত বিধানের ক্ষেত্রে তাঁর আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে– চাই তা সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত হোক বা বান্দাদের সঙ্গে, দৈহিক শিক্ষার ব্যাপারে হোক অথবা আত্মার সংশোধন সম্পর্কে, দুনিয়ার উন্নতি সম্পর্কে হোক বা পরকালের সাফল্যের ব্যাপারে, ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে হোক অথবা সামাজিক জীবন সম্পর্কে, সন্ধি সম্পর্কে হোক বা যুদ্ধ সম্পর্কে। নবী কারীম সা. ইসলাম, জিহাদ, আনুগত্য ইত্যাদি বিষয়ে সাহাবাগণ থেকে বাইআত আকারে যে ওয়াদা নিতেন, তা এই ঈমানী ওয়াদারই একটি প্রকাশ্য রূপ ছিল। আর ঈমান আনার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তাআলার পরাক্রম ও সর্বশক্তিমত্তার সঠিক পরিচয় পেয়েছে, তাঁর পুরষ্কার ও শাস্তির কথা জেনেছে এবং তাঁর ওয়াদাসমূহের সত্যতায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছে। অতএব এর দাবি এই যে, বান্দা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার ধ্বংসাত্মক পরিণতির ভয়ে আল্লাহর সঙ্গে, বান্দাদের সঙ্গে ও স্বয়ং নিজের সঙ্গে কৃত সমস্ত ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণরূপে পালন করবে, এ ব্যাপারে কোন ত্রুটি করবে না। (যাই হোক, اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ- 'অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর' বলে উল্লিখিত সকল ওয়াদা-অঙ্গীকারের প্রতি ইশারা করা হয়েছে)।

এ বক্তব্য অনুযায়ী عقود-এর তাফসীরে পূর্ববর্তী মনীষীদের থেকে যে বিভিন্ন বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, সেই সঙ্গে আয়াতে 'হে ঈমানদারগণ' বলে সম্বোধন করার কারণও বুঝে আসে।

চতুষ্পদ গবাদি পশু[১], সেসব পশু ছাড়া যা তোমাদের পড়ে শোনানো হবে[২]— তবে এহরাম অবস্থায় শিকার করা বৈধ মনে করো না[৩]। নিশ্চয় আল্লাহ যা চান আদেশ করেন[৪]।

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ①

২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা অসম্মান করো না আল্লাহর নিদর্শনাদির[৫], না সম্মানিত

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ

---

১. সূরা নিসা-এ বর্ণিত হয়েছে যে, জুলুম ও ওয়াদাভঙ্গের শাস্তিস্বরূপ কিছু সংখ্যক হালাল ও পবিত্র বস্তু থেকে ইহুদীদের বঞ্চিত করা হয়েছিল فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ (নিসা : ১৬০) আর বস্তুগুলির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে সূরা আনআম-এ। এখন অঙ্গীকার পূরণের নির্দেশ দানের সাথে ভাগ্যবান উম্মতে মুহাম্মদীকে উক্ত দ্রব্যাদি খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, উট, গরু, মেষ, ছাগল এবং সকল গৃহপালিত জন্তু, (তদ্রূপ এ জাতীয় বন্য চতুষ্পদ পশু, যেমন হরিণ ও হরিণ-ধরনের ছোট গাভী প্রভৃতি)– তোমাদের জন্য সর্বাবস্থায় হালাল করা হয়েছে। তবে ওই সকল জন্তু ও ওই সব অবস্থা ব্যতিরেকে, যে সম্পর্কে তোমাদেরই দৈহিক বা রূহানী বা নৈতিক কল্যাণার্থে আল্লাহ তাআলা কুরআন করীমে অথবা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে নিষেধ করেছেন।

২. সম্ভবত এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সব বস্তু, যা এই সূরারই ৩নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

৩. মুহরিম (তথা হজ বা উমরার এহরামধারী) ব্যক্তির জন্য শুধু স্থলভাগের জন্তু শিকার করা নিষেধ, সামুদ্রিক প্রাণী শিকারের অনুমতি রয়েছে।

আর যখন এহরাম অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ, তখন স্বয়ং হরম শরীফের পবিত্রতা বিবেচনায় তা আরো বেশি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এজন্যই হরম শরীফের জন্তু শিকার করা মুহরিম ও গাইরে মুহরিম সকলের জন্য হারাম। যেমন لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ আয়াতাংশের ব্যাপকতা থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় (আর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা তো হাদীসে আছেই-অনুবাদক)।

৪. যে আল্লাহ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তারপর পরিপূর্ণ হেকমতানুসারে প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে তার যোগ্যতানুযায়ী পৃথক পৃথক স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ও শক্তি-সামর্থ্য রেখে দিয়েছেন, জীবন ও মৃত্যুর বিভিন্ন অবস্থা নির্ধারণ করেছেন– নিশ্চয় সেই আল্লাহর স্বীয় সৃষ্টিসমূহের উপর এ অধিকার রয়েছে যে, নিজের কামেল ইখতিয়ার, সর্বব্যাপী জ্ঞান ও অনন্ত হেকমত বলে যে কোন দ্রব্যকে, যে কারো জন্য, যে যে অবস্থায় ইচ্ছা, হালাল বা হারাম করে দেবেন- لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ('তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা যায় না, কিন্তু তাদের প্রশ্ন করা হবে।')

৫. অর্থাৎ যেসব জিনিসকে আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাবূদ হওয়ার নিদর্শন ও বিশেষ স্মৃতিচিহ্ন সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেগুলির অসম্মান করো না। পুরো হরম শরীফ, বাইতুল্লাহ

اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ

মাসের[১], না কুরবানীর জন্য হেরেমে প্রেরিত পশুর, না (গলায়) মালা (পরানো পশুর[২]) এবং না সম্মানিত গৃহের দিকে যাত্রাকারীদের, যারা স্বীয় রবের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে[৩]। আর যখন তোমরা এহরামমুক্ত হও, তখন শিকার করতে পার[৪]। আর তোমাদেরকে

শরীফ, জামারাত (অর্থাৎ কঙ্কর নিক্ষেপের নির্দিষ্ট ৩টি পাথর), সাফা-মারওয়া, হরম শরীফে প্রেরিত কুরবানীর পশু, এহরাম, মসজিদ, কুরআন মাজীদ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। সম্মুখে এসব নিদর্শনের মধ্যে হজের সাথে সম্পর্কিত কিছু বিশেষ বস্তুর উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. 'সম্মানিত মাস' চারটি। যেমন সূরা তওবায় (আয়াত : ৩৬) বলা হয়েছে- مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ তা হচ্ছে যিলক্বদ, যিলহজ, মুহররম ও রজব। এগুলির সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করার অর্থ হল, অন্যান্য মাসের তুলনায় এগুলিতে বেশি করে নেককাজ ও তাক্ওয়া অবলম্বন করা এবং অসৎকর্ম ও ফেতনা-ফাসাদ পরিহার করে চলা। বিশেষত হাজীদের দুঃখ-কষ্ট দিয়ে বাইতুল্লাহ শরীফের হজ থেকে বাধা দেওয়া যাবে না। এসব বিষয় বছরের বার মাসেই অবশ্য পালনীয়, কিন্তু সম্মানিত মাসসমূহে এগুলির গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়।

অবশ্য এই মাসগুলিতে ইসলামের দুশমনদের মোকাবেলায় আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা অধিকাংশ ইমামদেরই মাযহাব অনুসারে নিষিদ্ধ নয়। ইমাম ইবনে জারীর তো বরং এ ব্যাপারে 'ইজমা' নকল করেছেন। সূরা তওবায় এর বিবরণ আসবে ইনশাআল্লাহ ।

২. قلائد হচ্ছে قلادة এর বহুবচন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য সেই মালা, যা هدي বা হেরেমে প্রেরিত কুরবানীর পশুর গলায় চিহ্নরূপে পরানো হত, যাতে চেনা যায় যে, এটি কুরবানীর জন্তু এবং একে বাধা প্রদান না করা হয়। কুরআন কারীম এসব জিনিসের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখেছে। এজন্যই هدي ও তার পরিচায়ক চিহ্নাদির অসম্মান করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

৩. বাহ্যত এই মর্যাদা শুধু মুসলমানদেরই প্রাপ্য। অর্থাৎ, যে মুখলিস (খাঁটি) মুসলমানরা হজ ও উমরার জন্য আগমন করে, তাদের তাজীম ও সম্মান কর এবং তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করো না।

আর যে সকল মুশরিক বাইতুল্লাহর হজের জন্য যেত, ওরাও যদি এ কারণে আয়াতের ব্যাপকতায় পড়ে যে, ওরাও নিজেদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী খোদার রহমত, নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের আশা করত— তবে বলতে হবে যে, এই হুকুম إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا (সূরা তওবা : ২৮) আয়াতের অবতরণের পূর্বেকার। এর অবতরণের পর ঐ হুকুম বহাল থাকেনি। বরং এখন মুশরিকদের জন্য মসজিদুল হারামে আগমনই নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

৪. অর্থাৎ এহরাম অবস্থায় শিকার করা যে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, এহরাম খুলে ফেলার পর সেই নিষেধাজ্ঞা বাকী রইল না।

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۖ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

মসজিদুল হারামে (প্রবেশে) বাধা দেওয়ার কারণে (বাধাদানকারী) সম্প্রদায়ের প্রতি যে শত্রুতা, তা যেন তোমাদের সীমালঙ্ঘন করতে প্ররোচিত না করে[১]। আর তোমরা সৎকর্মে ও পরহেযগারীতে পরস্পরকে সাহায্য কর, পাপ কাজে ও জুলুমে একে অপরের সাহায্য করো না[২]। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা[৩]।

---

১. পূর্ববর্তী আয়াতে যে شعائر বা নিদর্শনাদিকে আল্লাহ তাআলা সম্মানিত ও পবিত্র সাব্যস্ত করেছিলেন, হিজরী ৬ সনে মুশরিকরা তার মর্যাদাহানি করল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং প্রায় দেড় হাজার সাহাবী একমাত্র উমরা আদায় করার জন্য জিলকদ মাসে পবিত্র মদীনা থেকে রওনা হলেন। মুশরিকরা হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে মুসলমানদের এই ইবাদত পালনে বাধা দেয়। এহরাম অবস্থা, কাবার পবিত্রতা, সম্মানিত মাস, হাদী (কুরবানীর পশু) ও কালায়েদ (কুরবানীর পশুর গলায় প্রতীকরূপে লটকানো মালাসমূহ) কোন কিছুরই তারা বিবেচনা করল না।

আল্লাহর এসব নিদর্শনের এহেন অসম্মান হতে দেখে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মুসলমানগণ যদি এমন জালেম ও অসভ্য জাতির মোকাবেলায় অত্যধিক রাগ, বিদ্বেষ ও শত্রুতা প্রকাশ করতেন, তবে তা সংগতই হত এবং প্রতিশোধ গ্রহণের আবেগে মাতোয়ারা হয়ে তাঁদের পক্ষে যে কোন ক্রিয়াকাণ্ড করে বসা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ইসলামে ভালবাসা ও শত্রুতা উভয়ই তুলাদণ্ডে নিরূপিত। ফলে কুরআন কারীম এহেন স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী দুশমনদের মোকাবেলায়ও স্বীয় আবেগ সংযত রাখার নির্দেশ দান করছে। এমন পরিস্থিতিতে মানুষ ধৈর্যহারা হয়ে সীমা ছাড়িয়ে যায়। এজন্য এখানে বলা হচ্ছে যে, কঠোর থেকে কঠোরতর শত্রুতাও যেন সীমালঙ্ঘন করে ফেলার এবং ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা বর্জন করার কারণ না হয়।

২. যদি কোন ব্যক্তি ঘটনাচক্রে একান্তই প্রতিশোধ গ্রহণের জোশে এসে বাড়াবাড়ি করে ফেলে, তবে তা প্রতিরোধের উপায় এই যে, মুসলিম সমাজ জুলুম ও অত্যাচারে সহযোগিতা করবে না, বরং সকলে মিলে নেক কাজ ও পরহেজগারীর উদাহরণ পেশ করতে থাকবে এবং লোকদের বাড়াবাড়ি ও বেইনসাফী প্রতিহত করবে।

৩. অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা ও সমস্ত উত্তম গুনের মূল হচ্ছে আল্লাহ-ভীতি। যদি আল্লাহকে ভয় করে সৎকাজে সহযোগিতা ও অসৎকাজে অসহযোগিতা না করা হয়, তবে সকলের উপর আল্লাহর আযাব পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ؕ

৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু[১], রক্ত[২], শূকরের গোশত, সেই জন্তু যার উপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয়েছে এবং (হারাম করা হয়েছে) শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, আঘাতে মৃত জন্তু, উপর থেকে পতনে মৃত জন্তু, অন্য পশুর শিংয়ের আঘাতে মৃত জন্তু, হিংস্র পশুর খাওয়া জন্তু— তবে যা তোমরা (মরার আগে) যবেহ করতে পেরেছ (তা হারাম নয়)— এবং ঐ পশু, যা পূজার বস্তুর কাছে যবেহ করা হয়[৩] এবং (হারাম করা হয়েছে)

---

১. বর্তমান আয়াতের মাধ্যমে যে সব জিনিস খাওয়া হারাম হল, তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে মৃত জন্তু। যবেহ করে খেতে হয় এমন জন্তু যবেহ ছাড়া আপনিই মরে গেলে তার রক্ত ও শারীরিক উত্তাপ গোশতের মধ্যেই শুষিত হয়ে থেকে যায় এবং এর বিষাক্ততা ও কদর্যতার ফলে কয়েক রকম শারীরিক ও দীনী ক্ষতি সাধিত হয় (তফসীরে ইবনে কাছীর)। সম্ভবত ক্ষতির উক্ত কারণ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যই মৃত জন্তুর উল্লেখের পর রক্ত (পানের) নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর জীবসমূহের মধ্যে বিশেষ একটি শ্রেণী (শূকর) হারাম হওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে, যার নিদারুণ নাপাকী-ভক্ষনপ্রবণতা ও নির্লজ্জতা সর্বজনবিদিত। সম্ভবত এ কারণেই শরী'য়ত শূকরকে রক্তের মতই (نجس العين) ও নির্ভেজাল নাপাক বলে সাব্যস্ত করেছে। মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকর– এই তিনটি বস্তু এমন, যেগুলোর মধ্যে সৃষ্টিগতভাবেই ঘৃণ্যতা, কদর্যতা ও অপবিত্রতা নিহিত রয়েছে।

অতঃপর আরেক প্রকার জন্তুর উল্লেখ করা হয়েছে, যা সৃষ্টিগতভাবে হালাল ও পবিত্র, কিন্তু তা প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়েছে। নিয়তের কদর্যতা ও আকীদার অপবিত্রতার কারণে এও খাওয়া হারাম। যাঁর নির্দেশ ও ইচ্ছায় জীবন-মৃত্যু সংঘটিত হয়, একমাত্র তাঁরই নির্দেশ ও নামে কোন জীবের প্রাণনাশ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, কণ্ঠরোধে মৃত ইত্যাদি জন্তু, যা যবেহ হয়নি, তা সবই মৃত জন্তুর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, যেমন: مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ < مَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ এর সাথে একই বিধানভুক্ত। জাহেলিয়াতের যুগে এসব জিনিস খাওয়ার রীতি ছিল। তাই এত বিস্তারিতভাবে এগুলোর হারাম হওয়া ঘোষনা করা হল।

২. অর্থাৎ প্রবাহিত রক্ত, যেমন সূরা আনআমে (আয়াত : ১৪৫) বলা হয়েছে- اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا

৩. একটু পূর্বে 'হাদি' অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ইবাদতের স্থান পবিত্র কাবার নেয়ায (বা কুরবানী) হিসাবে যে জন্তু যবেহ করা হয়, তার উল্লেখ হয়েছে। এর মোকাবেলায় এস্থলে সেই জন্তুর কথা বলা হচ্ছে, যা مَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়, অথবা مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ - অর্থাৎ আল্লাহর ঘর ছাড়া অন্য

اَلْيَوْمَ يَىِٕسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ؕ اَلْيَوْمَ

জুয়ার তীরের দ্বারা বন্টন করা[১]। এগুলো পাপের কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দীন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তোমরা ওদের ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর[২]। আজ আমি

কোন স্থানের সম্মানার্থে যবেহ করা হয়। এই ২য় ক্ষেত্রেও প্রকৃতপ্রস্তাবে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামেই মানত করার নিয়ত হয়ে থাকে, যদিও যবেহ করার সময় শুধু মুখে 'আল্লাহু আকবার' বলা হোক না কেন।

এই ব্যাখ্যার দ্বারা مَاۤ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ এবং مَاذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ এর পার্থক্য পরিস্কার হয়ে গেল (তফসীরে ইব্‌নে কাছীর)

১. কোন কোন মুফাসসিরের মতে ازلام বলতে ভাগ নির্ণয় করার তীর উদ্দেশ্য, যা জাহেলিয়াতের আমলে যবেহকৃত জন্তুর গোশত ইত্যাদির ভাগ নির্ণয় করতে ব্যবহৃত হত। আর এ ছিল জুয়ারই একটি প্রকার।

কিন্তু হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর প্রমুখ বিজ্ঞ মুফাসসিরদের নিকট উত্তম তাফসীর এই যে, ازلام বলতে সেই সব তীর উদ্দেশ্য, যা মক্কার মুশরিকরা কোন কাজে দ্বিধা-সংশয় হলে করণীয় ঠিক করতে ব্যবহার করত। ওরা এ সকল তীর কাবা শরীফে কুরায়শদের সর্বশ্রেষ্ঠ মূর্তি "হুবল" এর নিকট রেখেছিল। তীরগুলোর কোনটার উপর লেখা ছিল أمرني ربي (অর্থাৎ আমার প্রভু আমাকে হুকুম করেছেন), কোনটার উপর লেখা ছিল نهاني ربي (আমার প্রভু আমাকে নিষেধ করে দিয়েছেন)। এভাবে প্রতিটি তীরের উপর নিজেদের খেয়াল-খুশী মত কিছু না কিছু কথা লিখে রেখেছিল। যখনই কোন কাজে দ্বিধা-সন্দেহ হত, তখন তীর বের করে নিত। أمرني ربي লেখাবিশিষ্ট তীর হাতে আসলে কাজ আরম্ভ করে দিত। তার উলটাটা বের হলে বিরত থাকত। বলতে গেলে, এভাবে ওরা দেব-দেবীর নিকট এক ধরনের পরামর্শ ও সাহায্য প্রার্থনা করত। যেহেতু এ কুসংস্কারের ভিত্তি ছিল নিরেট মূর্খতা ও শিরক, কল্পনাপূজা ও আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ– সেহেতু কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত জোরদারভাবে এবং কঠোরতার সাথে এটা হারাম হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে।

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী نُصُب এর সাথে সামঞ্জস্য থাকায় তার সাথেই 'أزلام' এর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর ইত্যাদি অতি ঘৃণ্য ও অপবিত্র বস্তুর নিষিদ্ধতার সাথে এটাকে যুক্ত করে এ কথাই বলে দেওয়া হল যে, এর অপবিত্রতা ও কদর্যতা উক্ত বস্তুগুলোর চেয়ে কম নয়।

২. এই আয়াতখানি তখন অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন মানবজীবনের প্রতিটি বিভাগ আর হেদায়েতের প্রতিটি অধ্যায়সংক্রান্ত মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন এমনভাবে বর্ণিত হয়ে গিয়েছিল এবং শাখা-প্রশাখার বিবরণও এত তফসীল ও ব্যাপকতার সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল যে, ইসলামের অনুসারীদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য বিধান বিবেচনার যোগ্যই থাকেনি; যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবিয়তের ফলে এমন আজিমুশশান জামাত তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যাকে কুরআনী শিক্ষার জীবন্ত নমুনা বলা যেতে পারত; যখন মক্কা-বিজয় হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার

তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম[১], তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম[২] এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই	أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

সাথে আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করছিলেন; যখন অত্যন্ত ঘৃণিত খাদ্য ও মৃত জন্তু ভক্ষণকারী জাতি বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতার স্বাদ গ্রহণ করছিল, আল্লাহর নিদর্শনসমূহের আদব ও সম্মান অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; ধারণা-কল্পনা এবং أنصاب ও أزلام (মূর্তিপূজার বেদী ও জুয়ার তীর) এসবের বেড়াজাল ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এবং আরব উপদ্বীপকে শয়তানের পূজা থেকে চিরতরে নিরাশ করে দেওয়া হয়েছিল।

এমনি ঐতিহাসিক পটভূমিতে ইরশাদ হল- اَلْيَوْمَ يَئِسَ الخ অর্থাৎ আজ কাফেররা এ থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছে যে, ওরা তোমাদের সুদৃঢ় দীন-ধর্ম থেকে তোমাদের সরিয়ে পুনরায় أنصاب ও أزلام ইত্যাদির দিকে নিয়ে যাবে, অথবা ইসলাম ধর্মকে পরাভূত-পরাজিত করে ফেলবে, অথবা দীনী আহকামের মধ্যে কোন বিকৃতি ও রদ-বদল করতে পারবে। আজ তোমরা কামেল ও মুকাম্মাল (অর্থাৎ পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ) ধর্ম লাভ করলে, যাতে ভবিষ্যতে কোন রদ-বদলের সম্ভাবনা নেই। খোদার অনুগ্রহ তোমাদের উপর সম্পূর্ণ হয়েছে, যার পর তোমাদের পক্ষ থেকে একে বিনষ্ট করার কোন আশঙ্কা নেই। আল্লাহ তাআলা চিরদিনের জন্য দীন ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলেন।

তোমাদের ভয় করার কোনই কারণ নেই– ওরা তোমাদের কিছুই করতে পারবে না। হাঁ, সেই মহান অনুগ্রহকারী ও প্রকৃত নে'য়ামতদানকারীর অসন্তুষ্টির ভয় তোমরা সর্বদা করবে, যাঁর হাতে তোমাদের সকল কল্যাণ, সফলতা ও লাভ-লোকসান রয়েছে। যেন, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ এর মধ্যে এই সতর্কবাণী রয়েছে যে, যতদিন পর্যন্ত মুসলিম জাতির মধ্যে আল্লাহভীতি ও পরহেজগারীর শান বর্তমান থাকবে, ততদিন কাফেরদের ভয় করার কোন কারণ নেই।

১. অর্থাৎ এর (কুরআন-হাদীসের) সংবাদ ও কাহিনীসমূহে পূর্ণ সত্যতা, বয়ানের মধ্যে পূর্ণ তাছীর (প্রভাব) এবং এ দীনের বিধি-বিধানের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রয়েছে। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবাদি ও দীন-ধর্মে যেসব বিষয় সীমিত ও অসম্পূর্ণ ছিল, বর্তমানের এ সুদৃঢ় ধর্মের দ্বারা সেসবের পূর্ণতা ও ব্যাপকতা সাধন করা হল। কুরআন ও হাদীসে হালাল, হারাম ইত্যাদি বিষয়ক যেসব বিধি-বিধান প্রদান করা হয়েছে, সে সবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তো সর্বদা হতে থাকবে, কিন্তু তাতে পরিবর্ধন বা সংস্কার সাধনের আদৌ অবকাশ রাখা হয়নি।

২. সব চেয়ে বড় অনুগ্রহ তো এই যে, ইসলামের ন্যায় পরিপূর্ণ ও চিরন্তন জীবন-বিধান এবং সর্বশেষ নবীর মত নবী তোমাদের দান করেছেন। অধিকন্তু, তাঁর আনুগত্য এবং সরল পথে অটল-অনড় থাকার তাওফীক দান করেছেন। কুরআনের হেফাজত, ইসলামের বিজয় ও বিশ্বের সংস্কার সাধনের উপায়-উপকরণ তোমাদের দান করেছেন।

فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ③

দীনরূপে পছন্দ করলাম[১]। তবে কেউ যদি ক্ষুধার তাড়নায় নিরুপায় হয়ে যায় আর সে পাপের দিকে ধাবিত না হয়, তবে আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ

৪. তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কোন্ বস্তু হালাল করা হয়েছে? আপনি বলে দিন, 'তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে[৩]। আর যেসব শিকারী

---

১. অর্থাৎ এই বিশ্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ দীনের পর এখন অন্য কোন দীনের অপেক্ষা করা নিতান্তই বোকামী। ইসলামের অর্থ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য; এ ছাড়া মুক্তি ও নাজাতের আর কোনই উপায় নেই।

বি. দ্র. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতটির অবতরণই এক মহানেয়ামত। এ জন্যই কোন কোন ইহুদী হযরত উমর (রা) কে বলেছিল, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আয়াতটি আমাদের উপর নাযিল করা হলে, আমরা তা নাযিল হওয়ার দিনকে ঈদের দিনরূপে পালন করতাম।' উত্তরে হযরত উমর (রা) বললেন, 'তোমার কি জানা নেই, যেদিন আমাদের প্রতি এই আয়াতটি নাযিল করা হয়েছিল, সেদিনটিতে মুসলমানদের দুটি ঈদের সমন্বয় ঘটেছিল।' (তাফসীরে তবারী ৮/৮৭-৮৮)

আয়াতটি হিজরী দশ সনে বিদায় হজের আরাফার দিন শুক্রবারে আসরের নামাযের সময় অবতীর্ণ হয়। তখন আরাফার ময়দানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীর চারপাশে ছিল চল্লিশ হাজারেরও বেশি পুণ্যবান সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুমের বিরাট সমাবেশ। এই ঐতিহাসিক ঘটনার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়ার বুকে মাত্র একাশি দিন জীবিত ছিলেন।

২. হালাল-হারামের বিধান তো সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, এখন আর তাতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে পারে না। অবশ্য নিরুপায় ব্যক্তি, যে ক্ষুধা-পিপাসার আতিশয্যে অস্থির ও লাচার হয়ে পড়ে, যদি হারাম বস্তু খেয়ে বা পান করে জান বাঁচায়, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ না করে—তা হলে আল্লাহ তাআলা স্বীয় ক্ষমা ও দয়াগুণে এই হারাম-ভক্ষণকে মাফ করে দেবেন। বলতে গেলে, সেই বস্তুটি তো হারামই রইল, কিন্তু জান বাঁচানোর প্রয়োজনে যে তা খেতে বা পান করতে বাধ্য হল, সে আল্লাহর নিকট গোনাহগার সাব্যস্ত হল না।

৩. পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে অনেক হারাম বস্তুর তালিকা প্রদত্ত হওয়ায় স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, তবে হালাল বস্তু কী কী? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, হালাল বস্তু-সামগ্রীর সীমা তো অনেক ব্যাপক। দীনী বা দৈহিক দিক থেকে ক্ষতিকর কয়েকটি বস্তু বাদে, দুনিয়ার সমস্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বস্তুই হালাল।

الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

জন্তুকে তোমরা শিকার করা শিখিয়েছ যে, তোমরা ওদের তা শিক্ষা দাও যা আল্লাহ তোমাদের শিখিয়েছেন—ওরা তোমাদের জন্য যে পশু ধরে রাখে তা থেকে তোমরা খাও এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর[১]। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী[২]।

আর যেহেতু কেউ কেউ শিকারী জন্তু দ্বারা শিকার করার ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, সেহেতু আয়াতের পরবর্তী অংশে বিস্তারিতভাবে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে।

১. শিকারি কুকুর, বাজপাখী প্রভৃতি দ্বারা শিকার করা প্রাণী নিম্ন শর্তাবলি সাপেক্ষে হালাল : (১) শিকারি জন্তু শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে। (২) তাকে শিকারের পিছনে ছাড়তে হবে। (৩) তাকে এমন পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হবে, যা শরী'য়তসম্মত। অর্থাৎ কুকুরকে শিক্ষা দিতে হবে—যেন শিকার ধরে না খায়। এবং বাজপাখীকে শিক্ষা দিতে হবে—যেন শিকারের পিছনে ধাওয়া করার সময়ও ডাকলে তৎক্ষণাৎ চলে আসে। শিকারকে যদি কুকুর নিজেই খেতে শুরু করে অথবা বাজপাখীকে ডাকলে না আসে, তবে বুঝতে হবে যে, সে মালিকের বাধ্য নয়, সুতরাং শিকার তার জন্য ধরেনি, বরং নিজের জন্য ধরেছে (অতএব তা খাওয়া যাবে না)। (৪) তাকে ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম নিতে হবে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে ছাড়তে হবে।

উক্ত চারটি শর্ত তো এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝে আসে। ৫ম শর্ত যা ইমাম আবু হানীফা (র) এর নিকট ধর্তব্য— এই যে, শিকারি জন্তু শিকারকে এমনভাবে আঘাত করতে হবে যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়। جوارح শব্দটিতে এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ, তা جرح থেকে উদ্‌গত, (যার অর্থ- জখমি করা)। এ পাঁচটির মধ্যে যে কোন একটি শর্ত পাওয়া না গেলে শিকারি জন্তুর হত্যা করা শিকার হারাম। হাঁ, যদি তা মরে গিয়ে না থাকে এবং যবেহ করে ফেলা হয়, তবে وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْتُمْ ('আর হিংস্র পশুর খাওয়া জন্তু হারাম, কিন্তু যা তোমরা যবেহ করতে পেরেছ (তা হারাম নয়)।') অনুসারে হালাল।

২. অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে চল। কোন অবস্থাতেই যেন শরী'য়তের সীমা ও শর্তাবলি লঙ্ঘন না করা হয়।

মানুষ সাধারণত পার্থিব স্বাদ ও আনন্দ উপভোগে পড়ে এবং শিকার প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ ও আখেরাত থেকে উদাসীন হয়ে যায়। এ জন্য সতর্কীকরণের প্রয়োজন ছিল যে, আল্লাহকে ভুলবে না এবং আখেরাতের হিসাবের দিন যে নিকটবর্তী তা স্মরণ রাখবে। সেদিন আল্লাহর নে'য়ামতসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে এবং অমূল্য জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে।

৫. আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পবিত্র বস্তু হালাল করা হল[১]। আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল[২] এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল[৩]। আর (তোমাদের জন্য হালাল)– সচ্চরিত্রা মুসলমান নারীরা[৪] এবং তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদেরও মধ্যকার সচ্চরিত্রা নারীরা[৫], যখন তোমরা

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۪ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ

---

১. অর্থাৎ আজ যেমন তোমাদের পূর্ণাঙ্গ দীন প্রদান করা হয়েছে, তেমনি দুনিয়ার সমস্ত পবিত্র নে'য়ামতরাশিও তোমাদের জন্য সদাসর্বদার জন্য হালাল করে দেওয়া হল, যেগুলি কখনো রহিত করা হবে না।

২. এখানে طعام (খাদ্যদ্রব্য) বলতে যবেহকৃত জন্তু উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কোন ইহুদী বা খ্রিস্টান (ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়ে ইহুদী বা খ্রিস্টান না হয়ে থাকলে) যদি হালাল জন্তু যবেহ করার সময় গাইরুল্লাহর নাম না নেয়, তবে মুসলমানদের পক্ষে তা খাওয়া হালাল।

৩. প্রসঙ্গক্রমে এর উল্লেখ করা হয়েছে। তো, কোন কোন হাদীসে যে রয়েছে لا يأكل طعامك إلا تقي (তোমার খাদ্য পরহেজগার ভিন্ন কেউ যেন না খায়: জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫৫৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস :৫৫৪)– এর অর্থ এই নয় যে, পরহেজগার ভিন্ন অন্যদের জন্য তোমাদের খাদ্য একেবারে হারাম। যখন মুসলমানের জন্য কিতাবধারী কাফেরের যবেহকৃত জন্তু খাওয়ার অনুমতি আছে, তখন একজন তাওহীদবাদী মুসলমানকর্তৃক যবেহ করা জন্তু খাওয়া অন্যদের জন্য কেন হারাম হবে?

৪. 'সচ্চরিত্রা' হওয়ার শর্ত সম্ভবত উৎসাহিত করণার্থে আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিবাহ করার সময় এক মুসলমানের প্রথম লক্ষ্যবস্তু হওয়া উচিত নারীর সতীত্ব ও সুচরিত্র। এর অর্থ এই নয় যে, সচ্চরিত্র নারী ছাড়া আর কারো সঙ্গে বিয়ে দুরুস্ত নেই।

৫. কিতাবী নারীকে বিয়ে করা শরী'য়তে জায়েয। কিন্তু মুশরিক নারীর সঙ্গে বিয়ে জায়েয নয়। সূরা বাকারায় রয়েছে-(আয়াত : ২২১) وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ (তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যাবৎ না ওরা ঈমান আনে।)

তবে স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের কালের খ্রিস্টানরা সাধারণত নামেমাত্র খ্রিস্টান, ওদের মধ্যে অধিকাংশই এমন যারা আসমানী কোন কিতাবও মানে না, ধর্মও না, আল্লাহকেও না। ওদের আহলে কিতাব বলা যায় না। সুতরাং ওদের যবেহকৃত পশু-পাখী এবং ওদের নারীদের হুকুম কিতাবীদের হুকুমের মত হবে না।

আরো উল্লেখ্য যে, কোন বস্তু হালাল হওয়ার অর্থ এই যে, স্বয়ং বস্তুটির মধ্যে হারাম হওয়া বা নিষিদ্ধতার কোন কারণ নেই। কিন্তু যদি পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও অবস্থা এমন হয় যে, উক্ত হালাল বস্তুটি গ্রহণ করলে বিবিধ হারাম কাজে লিপ্ত হতে হয় এবং কুফরে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা হয়,

مُسْفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

তাদেরকে তাদের মহর প্রদান করবে– বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য[১], কাম চরিতার্থ করার জন্য নয় এবং গোপন প্রণয়িণী বানানোর জন্যও নয়[২]। আর যে ব্যক্তি ঈমান প্রত্যাখ্যান করবে, তার (যাবতীয়) আমল বিনষ্ট হবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে[৩]।

[রুকু-২]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى

৬. হে ঈমানদারগণ[৪]! যখন তোমরা নামাযের

তবে এমন হালাল বস্তু ব্যবহারের অনুমতি শরী'য়ত দিতে পারে না। বর্তমান কালের ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সঙ্গে খানা-পিনা, বিনা প্রয়োজনে মেলা-মেশা, ওদের নারীদের খপ্পরে পড়া ইত্যাদি বিষয়ের পরিণতি এমন ভয়াবহ, যা কারো কাছে গোপন নয়।

১. 'বন্ধন' দ্বারা বিবাহ-বন্ধন উদ্দেশ্য। এতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বিবাহ বাহ্যত একটি 'বাঁধন', কিন্তু এই বাঁধন (ও শৃঙ্খল) সেই সকল স্বেচ্ছাচারিতা থেকে শ্রেয়, যেগুলোর লোভে মানুষরূপী কতক পশু বিবাহের ধারাকেই বিলুপ্ত করে দিতে চায়।

২. পূর্বে যেমন নারীর সচ্চরিত্রতার উল্লেখ ছিল, এখানে পুরুষকে চরিত্রবান ও পবিত্র থাকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। যেমনঃ সূরা নূরে রয়েছে– اَلطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ 'সচ্চরিত্র নারীরা সচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষরা সচ্চরিত্র নারীদের জন্য।' (সূরা নূর, আয়াত : ২৬)। এতে এও জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে বিবাহের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সতিত্ব যা একটি অমূল্য রত্ন, তার সংরক্ষণ করা এবং মানববংশ রক্ষা করা। কাম চরিতার্থ করা ও যৌন আসক্তি পূর্ণ করাই উদ্দেশ্য নয়।

৩. কিতাবী নারীর সঙ্গে বিয়ের অনুমতি দেওয়া হল বটে, তবে তার উপকারিতা এই হওয়া উচিত যে, কিতাবী মেয়েদের অন্তরে যেন মুমিনের বাস্তব রূপ প্রতিফলিত হয়, তাদের প্রেমে পড়ে উলটা নিজ ঈমানী দৌলতই যেন স্বামী হারিয়ে না বসে এবং خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত না হয়।

যেহেতু কাফের নারীর সাথে বিয়ে হলে উক্ত বিপর্যয়ের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, সেহেতু وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ বলে সতর্ককরণ এস্থলে খুবই সমীচীন হয়েছে।

এ আমার অভিমত। তবে হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব লিখেছেন, 'অন্য কাফেরদের থেকে আহলে কিতাবকে দুটি হুকুমে আলাদা করা হয়েছে (অর্থাৎ তাদের যবেহ করা পশু ও তাদের নারীরা হালাল)। এ স্বাতন্ত্র্য শুধু দুনিয়ার জীবনেই সীমাবদ্ধ, পরকালে সকল কাফেরেরই পরিণাম এক। কিতাবীরা ভাল কাজ করলেও তা সেখানে গ্রহণযোগ্য নয়।'

৪. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

সামান্য পূর্বে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার প্রতি যেসব বিরাট অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করা হল, তা শুনে একজন শরীফ ও সত্যনিষ্ঠ মুমিনের অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠবে। স্বভাবতই আল্লাহর মহান

الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ

জন্য ওঠ[১], তখন নিজেদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, তোমাদের মাথা মসেহ কর[২] এবং পা টাখনু পর্যন্ত (ধৌত

দরবারে হাযির হয়ে চরম গোলামী ও পরম দাসত্ব প্রকাশ করার বাসনা তার হৃদয়ে জাগ্রত হয়ে উঠবে। এ জন্য ইরশাদ হয়েছে, যখন আমার দরবারে হাযির হওয়ার ইচ্ছা করবে অর্থাৎ নামাযের জন্য উঠবে, তখন পাক-সাফ হয়ে আসবে।

এই আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে যেসব পার্থিব সুস্বাদু সামগ্রী ও আকর্ষণীয় দ্রব্যাদি (অর্থাৎ পবিত্র খাদ্যসামগ্রী ও সতীসাধ্বী নারী) উপভোগের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তা এক পর্যায়ে মানুষকে ফেরেশতাসুলভ গুণাবলি থেকে দূরবর্তী ও পাশব-প্রকৃতির নিকটবর্তী করে দেওয়ার মত বিষয়। তাছাড়া এসব দ্রব্যসামগ্রী উপভোগের অনিবার্য ফল হিসাবেই ওযু ও গোসলের প্রয়োজন দেখা দিয়ে থাকে। সুতরাং ইরশাদ হয়েছে, নফসের আকর্ষণীয় বিষয়াবলি থেকে আলাদা হয়ে যখন আমার দিকে আসার ইচ্ছা কর, তখন প্রথমে পাশবিকতার প্রভাব ও খানা-পিনা ইত্যাদির সৃষ্ট মলিনতা থেকে পবিত্র হয়ে যাও। এই পবিত্রতা ওযু ও গোসল দ্বারা হাসিল হয়। ওযু করায় মুমিনের শরীরই শুধু পাক-সাফ হয় তা নয়, বরং নিয়মানুযায়ী ওযু করা হলে পানির ফোঁটাসমূহের সাথে গোনাহও ঝরে যায়।

১. অর্থাৎ ঘুম থেকে ওঠ অথবা দুনিয়ার কাজ-কর্ম ছেড়ে নামাযের জন্য যখন উঠে দাঁড়াও, তখন প্রথমে ওযু করে নাও। তবে ওযু করা জরুরী, যখন পূর্ব থেকে ওযু না থাকে।

আয়াতের শেষ ভাগে وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ('বরং আল্লাহ তোমাদের পবিত্র করতে চান।') বলে ওযুর যে উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে তাতে জানা গেল যে, হাত-মুখ ইত্যাদি ধোয়ার প্রয়োজন এ জন্যই, যাতে আল্লাহ তাআলা তোমাদের পবিত্র করে স্বীয় দরবারে স্থান দেন। অতএব যদি এ পবিত্রতা পূর্ব থেকে থাকে এবং ওযু ভঙ্গের কোন কারণ না ঘটে থাকে, তবে 'পবিত্র'-কে পবিত্রকরণের প্রয়োজন নেই, বরং একে জরুরী সাব্যস্ত করলে উম্মত কষ্টে পড়বে, যা مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ আয়াতে রহিত করা হয়েছে।

হাঁ, অধিকতর পরিচ্ছন্নতা, উজ্জ্বলতা ও প্রফুল্লতা হাসিল করার জন্য তাজা ওযু করে নিলে তা মুস্তাহাব হবে। সম্ভবত এজন্য اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ আয়াতাংশে কথার ভঙ্গি এমন রাখা হয়েছে, যাতে প্রত্যেকবার নামাযে যাওয়ার সময় তাজা ওযু করতে উৎসাহ বোধ করা হয় (দেখুন, ' তোমরা যখন অপবিত্র হও এবং নামায পড়ার ইচ্ছা কর, তখন ওযু কর'— এভাবে না বলে বলা হয়েছে, ' তোমরা যখন নামাযের জন্য ওঠ, তখন ওযু কর' ।)

২. অর্থাৎ ভিজা হাত মাথায় মুছে নাও। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ناصية এর পরিমাণ (মাথার প্রায় চতুর্থাংশ) থেকে কম অংশে মসেহ করেছেন বলে প্রমাণ নেই। ইমাম আবু হানীফা (র) এ কারণেই এ পরিমাণ মসেহ ফরয বলেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত ও প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়।

وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

কর)[১]। আর যদি তোমরা জানাবত তথা অপবিত্র অবস্থায় হও, তবে উত্তমরূপে পবিত্র হও[২]। আর যদি অসুস্থ হও বা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রীসহবাস কর এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির ইচ্ছা কর এবং তার দ্বারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ কর[৩]।

---

১. বিজ্ঞ মুতারজিম (অর্থাৎ হযরত শাইখুল হিন্দ (র)) پاؤں-এর পর کو শব্দ না লিখে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, أرجلكم এর عطف হয়েছে مغسولات এর উপর। অর্থাৎ এর সম্পর্ক ধোয়ার অঙ্গসমূহের সাথে। অর্থাৎ যেমন মুখ ও হাত ধোয়ার হুকুম, তেমনি পা টাখনু (গোড়ালী) পর্যন্ত ধুইতে হবে– মাথার মত মসেহ করলে হবে না।

বলা বাহুল্য, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের এই ব্যাপারে ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে, এবং বিপুল পরিমাণ হাদীস দ্বারা এ-ই প্রমাণিত হয় যে, পায়ে (বিশেষ ধরনের চামড়ার) মোজা না থাকলে তা ধোওয়া ফরয। হাঁ, যদি মোজা পরিহিত থাকে তবে ফেকাহর কিতাবাদিতে বর্ণিত শর্তাবলি অনুসারে তার উপর মুকীম (স্থানীয় ব্যক্তি) একদিন-একরাত এবং মুসাফির ব্যক্তি তিন দিন পর্যন্ত মসেহ করতে পারে।

২. অর্থাৎ 'জানাবত' থেকে পবিত্র হতে হলে শুধু পূর্বোক্ত চার অঙ্গ ধোওয়া ও মসেহ করা যথেষ্ট নয়। শরীরের উপরিভাগে যেস্থান পর্যন্ত অনায়াসে পানি পৌঁছতে পারে, সে পর্যন্ত পৌঁছানো জরুরী। এ জন্যই হানাফী মাযহাবে গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া জরুরী, ওযুতে জরুরী নয় বরং সুন্নত।

৩. অর্থাৎ অসুখের কারণে পানি ব্যবহার ক্ষতিকর হলে, অথবা সফরে পানি প্রয়োজন পরিমাণ না পেলে, অথবা কেউ পেশাব-পায়খানা করে এসেছে এবং ওযুর দরকার হয়েছে, অথবা জানাবতের কারণে গোসল অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে, কিন্তু পানি পেতে বা ব্যবহার করতে কোন কারণে অপারক– তবে এসব অবস্থায় ওযু বা গোসলের স্থলে তায়াম্মুম করে নেবে।

ওযুর বদলে তায়াম্মুম এবং গোসলের স্থলে তায়াম্মুম, এই উভয় তায়াম্মুমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ, শরী'য়তের বিধানে তায়াম্মুমের যে উদ্দেশ্য, তা উভয় ক্ষেত্রে একই পদ্ধতিতে হাসিল হয়। তায়াম্মুমের রহস্যাদি ও মাসায়েল এবং এই আয়াতের তাফসীর সূরা নিসার সপ্তম রুকূতে (আয়াত : ৪৩) বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

বি. দ্র. বিজ্ঞ মুতারজিম (র) لمستم النساء -এর যে তরজমা করেছেন—'স্ত্রীদের নিকট গিয়েছ' (অর্থাৎ সহবাস করেছ), এই তরজমা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও আবু মূসা আশআরী (রা) এর তফসীরের সাথে সংগতিপূর্ণ, আর ইবনে মাসউদও (রা) একে মৌন সমর্থন করেছেন। বুখারী শরীফ দ্রষ্টব্য। অনুরূপ, হযরত মুতারজিম (র) فتيمموا এর তরজমায় "قصد كرو" (ইচ্ছা করো) লিখে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, 'তায়াম্মুম' এর মূল অভিধানিক

فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ⑥

আল্লাহ তোমাদের উপর কষ্ট আরোপ করতে চান না[১], বরং তোমাদের পবিত্র করতে চান[২] এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা শোকর কর[৩]।

অর্থ হচ্ছে 'ইচ্ছা করা'। আর এই মূল অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে আলেমগণ শর'ঈ তায়াম্মুমের মধ্যেও ইচ্ছা করা তথা নিয়তকে ফরয সাব্যস্ত করেছেন।

১. এ জন্যই যেসব অপবিত্রতা প্রায়ই ঘটে থাকে, তাতে সমস্ত শরীর ধোয়া ফরয করেননি। শুধু সেসব অঙ্গ (মুখ, হাত, পা, মাথা) ধোওয়া ও মসেহ করা জরুরী করা হয়েছে, যেগুলি খোলা রাখাকে অধিকাংশ সভ্য অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণত দোষনীয় মনে করে না। শুধু এগুলি ধোয়া ও মসেহ করাকেই জরুরী করা হয়ছে, যাতে পবিত্রতা অর্জনে কোন কষ্ট ও অসুবিধা না হয়।

হাঁ, 'হদসে আকবর' অর্থাৎ জানাবত, যা মাঝে-মধ্যে ঘটে এবং এ অবস্থায় নফসকে ফেরেশতাসুলভ গুণাবলির প্রতি ধাবিত করার জন্য বিশেষ সতর্কীকরণের প্রয়োজন, তাই আল্লাহ তাআলা তা দূর করার জন্য সর্বশরীর ধোয়া ফরয করেছেন।

অতঃপর অসুস্থতা সফর ইত্যাদি অবস্থায় কত সহজ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। প্রথমত পানির স্থলে মাটিকে পবিত্রকারী বানিয়ে দিলেন। তদুপরি ওযুর অঙ্গসমূহের অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। তা এভাবে যে, যে অঙ্গে প্রথম থেকেই আসানী ছিল অর্থাৎ মাথা মসেহ, তা একেবারেই বাদ দিয়ে দিলেন। আর পা সম্ভবত এ জন্য বাদ দিয়েছেন যে, তা সাধারণত মাটিতে বা মাটির নিকটবর্তী থাকে। আর শরীরের অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় ধূলিবালির সাথে এর মিশ্রন বেশি হয়। এ জন্য পায়ের উপর মাটিমাখা হাত বোলানো যেন নিরর্থক ছিল। ফলে, দুটি অঙ্গ রয়ে গেল– মুখ ও হাত। এ দুটি অঙ্গ মসেহ করলেই ওযু ও গোসল উভয়ের তায়াম্মুম হয়ে যায়।

২. কেননা, তিনি নিজে পবিত্র, অতএব পবিত্রতাই পছন্দ করেন।

৩. পূর্ববর্তী রুকুতে যেসব মহা নে'য়ামতের আলোচানা হয়েছিল, তা শুনে বান্দার দিলে জোশ উঠেছিল যে, প্রকৃত অনুগ্রহকারী আল্লাহ তাআলার বন্দেগীর জন্য তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে যাওয়া চাই। এজন্য তাকে বলে দেওয়া হল, আমার দিকে আসতে হলে উল্লিখিত পদ্ধতিতে পবিত্র হয়ে আসবে। বস্তুত, এই পদ্ধতি বলে দেওয়াও একটি নে'য়ামত। আর ওযু-গোসল-তায়াম্মুম দ্বারা আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা দান করা দ্বিতীয় নে'য়ামত। সুতরাং বলা যায় যে,বান্দা যখন পূর্ববর্তী নে'য়ামতগুলির শুকরিয়া আদায় করার সংকল্প করছিল, তখনি এই নে'য়ামতগুলি প্রদান করা হল। এ জন্য ইরশাদ হচ্ছে- لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ ঐ পূর্ববর্তী নে'য়ামতগুলি স্মরণ করার পূর্বে এই নতুন নে'য়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। সম্ভবত এই لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আয়াত থেকেই হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু 'তাহিয়্যাতুল ওযু' নামাযের সন্ধান পেয়েছেন।

৭. তোমরা স্মরণ কর নিজেদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর পরিপক্ক অঙ্গীকার, যা তিনি তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছিলেন যখন তোমরা বলেছিলে, 'আমরা শুনলাম ও মানলাম[১]।' আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরসমূহে যা আছে সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত[২]।

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

পূর্বা-পর সম্পর্ক

এই নতুন নে'য়ামতের শুকরিয়া আদায়ের প্রতি আকৃষ্ট করার পর সামনের আয়াতে সেই পূর্ব নে'য়ামতরাজি ও মহা অনুগ্রহগুলি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তাই ইরশাদ হচ্ছে— وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ الخ ('আর স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ।')

১. খুব সম্ভব এ সেই অঙ্গীকার, যা সূরা বাকারার শেষে (আয়াত :২৮৫) মুমিনদের মুখে উচ্চারিত হয়েছে অর্থাৎ— وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ('আর তারা বলে উঠল, 'আমরা শুনেছি ও মেনেছি। হে আমাদের রব! আমরা আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করি। আর আপনারই প্রতি আমাদের ফিরে যেতে হবে।')।

যখন সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে বায়'আত হতেন, তখনো এই স্বীকারোক্তি করতেন যে, আমরা সাধ্যানুযায়ী আপনার প্রত্যেক কথা শুনব ও মানব, তা আমাদের ইচ্ছা বা চাহিদার অনুকূল হোক বা খেলাফ হোক। এ তো ছিল সাধারণ অঙ্গীকার। তার পর ইসলামের কোন কোন রুকন বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবেও অঙ্গীকার গ্রহণ করা হত। বলতে গেলে, সূরার শুরুতে اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ (তোমরা প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ কর) বলে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, পরিশেষে তাই আবার স্মরণ করানো হচ্ছে। মাঝখানে এমন সব অনুগ্রহের আলোচনা করা হয়েছে, যা শুনে প্রতিশ্রুতি পালনের অধিকতর উৎসাহ জাগে।

২. একজন সমর্পিত মানুষের মাথা তার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকারী (অর্থাৎ আল্লাহর) সামনে নত থাকা উচিত। ভদ্রতা ও শরাফত এবং ভবিষ্যতে আরো অনুগ্রহ লাভের আশা এ দাবিই করে যে, বান্দা তার প্রকৃত দাতার পূর্ণ আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে, বিশেষত যদি আনুগত্যের অঙ্গীকার করা হয়ে থাকে। পূর্বে আল্লাহর বিবিধ অনুগ্রহ ও নেয়ামতরাজির আলোচনা করা হয়েছে। হয়ত নিজের প্রতি আল্লাহ তাআলার এসব অনুগ্রহ দেখে বান্দা অহংকারী হয়ে যাবে এবং তাঁর নে'য়ামতরাশির মর্যাদা ও নিজ প্রতিশ্রুতির কোন পরোয়া করবে না, এজন্য ইরশাদ করলেন— فَاتَّقُوا اللّٰهَ অর্থাৎ আল্লাহকে সর্বদা ভয় করে চল। তিনি এক নিমিষে সমস্ত নে'য়ামত ছিনিয়ে নিতে পারেন এবং অকৃতজ্ঞতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শাস্তিস্বরূপ ভীষণভাবে পাকড়াও করতে পারেন। যা হোক, ভদ্রতা, আশা ও ভয় সবকিছুর দাবি হচ্ছে আল্লাহ প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য ও ভক্তি প্রদর্শন করা।

৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা একমাত্র আল্লাহর জন্য (তাঁর বিধানের) পূর্ণ প্রতিষ্ঠাকারী, ইনসাফের সাথে সাক্ষ্যপ্রদানকারী হয়ে যাও[১]। আর কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ বর্জনে প্ররোচিত না করে[২]। তোমরা ইনসাফ করো, এ-ই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী[৩] এবং আল্লাহকে

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ

অপরদিকে তিনি অন্তর্যামী—عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ তিনি আমাদের এখলাস বা মুনাফিকী, রিয়া বা আন্তরিক ভক্তি—সব কিছুই উত্তমরূপে জানেন। সুতরাং শুধু মুখে سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا বললে অথবা কৃতজ্ঞতার বাহ্যিক প্রদর্শনীর দ্বারা আমরা তাঁকে ধোঁকা দিতে পারব না।

১. এর পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহসমূহ এবং নিজ ওয়াদা-অঙ্গীকার স্মরণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এখানে ইরশাদ হচ্ছে যে, শুধু মুখে স্মরণ করা নয় বরং কার্যত এর প্রমাণ পেশ করা কাম্য। বর্তমান আয়াতে এ কথাই বলা হচ্ছে যে, যদি তোমরা আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহ এবং নিজ ওয়াদা-অঙ্গীকার ভুলে না থাক, তবে তোমাদের কর্তব্য এই যে, আল্লাহর হকসমূহ আদায় করতে এবং নিজেদের ওয়াদা-অঙ্গীকার সত্য করে দেখাতে সদা প্রস্তুত থাক এবং যখনই তাঁর তরফ থেকে কোন হুকুম আসে, তৎক্ষণাৎ তা পালন করার জন্য দাঁড়িয়ে যাও। আর আল্লাহর হকের সাথে মানুষের হক আদায় করতে পরিপূর্ণরূপে সচেষ্ট ও সতর্ক থাক। সে মতেই قوامين لله এর মধ্যে আল্লাহর হকসমূহ এবং شهداء بالقسط এর মধ্যে "বান্দার হক" এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

এ ধরনের একটি আয়াত পঞ্চম পারার শেষের দিকে (নিসা : ১৩৫) রয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, সেখানে بالقسط এর উল্লেখ لله এর পূর্বে হয়েছে। সম্ভবত কারণ এই যে, সেখানে অনেক পূর্ব থেকে 'বান্দার হুকূক' এর আলোচনা হচ্ছিল, পক্ষান্তরে এখানে পূর্ব থেকে আল্লাহর 'হুকূকে'র উপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। এ হিসাবে সেখানে بالقسط এর এবং এখানে لله এর উল্লেখ প্রথমে করা সমীচীন হয়েছে। তাছাড়া এখানে একটু পরেই চরম শত্রুদের সাথে কেমন আচরণ করা চাই তার উল্লেখ রয়েছে, যার সাথে قسط -কে স্মরণ করানো প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, সূরা নিসায় (উক্ত হুকুমের) পরবর্তীতে প্রিয় দ্রব্যাদির উল্লেখ রয়েছে এবং সেজন্য সেখানে সবচেয়ে প্রিয়জন অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করানো হয়েছে।

২. عدل-এর অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তির সঙ্গে ঢিলেমি ও বাড়াবাড়ি উভয়টি ছেড়ে এমন ব্যবহার করা, যা তার প্রাপ্য। আদল ও ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা এমনি সঠিক ও সমান হওয়া উচিত যে, গভীর থেকে গভীরতর ভালবাসা এবং কঠোর থেকে কঠোরতর শত্রুতাও যেন পাল্লার কোন দিককে ঝুঁকিয়ে দিতে না পারে।

৩. যেসব বিষয় শরী'য়তের দৃষ্টিতে ধ্বংসকর বা কোন না কোন পর্যায়ে ক্ষতিকর, তা থেকে বেঁচে থাকার ফলে মানুষের অন্তরে যে একটি বিশেষ নূরানী অবস্থা পরিপক্ক হয়ে ওঠে তার নাম 'তাকওয়া'।

إِنَّ اللهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ۝

ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে সম্যক অবহিত[১]।

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمۡ مَّغۡفِرَةٌ وَّاَجۡرٌ عَظِيۡمٌ ۝

৯. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান[২]।

وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَكَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ الۡجَحِيۡمِ ۝

১০. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতগুলি অস্বীকার করেছে, তারা জাহান্নামী[৩]।

তাক্ওয়া হাসিল করার দূরবর্তী ও নিকটবর্তী অনেক উপকরণ রয়েছে। সমস্ত নেক আমল ও সৎস্বভাবকে এই উপায়-উপকরণের মধ্যে গণনা করা যেতে পারে। তবে মনে হয়, عدل وقسط (আদল ও ক্বিসত) অর্থাৎ শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে একই রকম বিচার করা এবং সত্যের ব্যাপারে মিত্রতা ও শত্রুতার ভাবাবেগে পরাভূত না হওয়া —তাকওয়া হাসিলের সর্বাধিক কার্যকর ও নিকটতম উপায়সমূহের অন্যতম। এ জন্যই هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ বলা হয়েছে (অর্থাৎ এই সুবিচার তাক্ওয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী)। কেননা, এতে আত্মনিয়োগের পর তাক্ওয়ার অবস্থা দ্রুত হাসিল হয়ে যায়।

১. অর্থাৎ এমন আদল ও ইনসাফ, যাকে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা কোন কিছুই রোধ করতে পারে না এবং যা অবলম্বন করলে মানুষ সহজেই মুত্তাকী হয়ে যেতে পারে— তা হাসিল করার একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহ-ভীতি এবং তাঁর শাস্তির ভয়। আর এই ভয় পয়দা হয় إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ আয়াতাংশের বিষয়কে বারবার মুরাকাবা (অর্থাৎ গভীরভাবে চিন্তা) করতে থাকলে। যখন কোন মুমিন বান্দার অন্তরে এই বিশ্বাস উপস্থিত থাকবে যে, আমাদের গোপন বা প্রকাশ্য কোন কাজই আল্লাহ তাআলার নিকট গোপন নয়, তখন তার অন্তর আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে থাকবে। যার ফল হিসাবে সব কাজে সে ন্যায় ও সুবিচারের পথ অবলম্বন করবে এবং আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ পালন করার জন্য গোলামের মত প্রস্তুত থাকবে। এর ফলে ঐ পুরস্কার লাভ হবে, যার বিবরণ পরবর্তী আয়াত وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا الخ -এর মধ্যে দেওয়া হচ্ছে।

২. অর্থাৎ মানবীয় দুর্বলতার কারণে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, তা মাফ করে দেবেন। শুধু তাই নয়, আজিমুশ শান প্রতিদান ও ছওয়াবও দান করবেন।

৩. প্রথমোক্ত দলের মোকাবেলায় এখানে সেই লোকদের শাস্তির উল্লেখ করা হল, যারা পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, যেগুলি সত্যের পথ প্রদর্শন করার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ করা হয়ে থাকে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑪

১১. হে ঈমানদারগণ! স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, যখন একদল লোক তোমাদের দিকে তাদের থাবা বিস্তারের ইচ্ছা করেছিল। তখন তিনি তোমাদের থেকে ওদের হাত প্রতিহত করে দিলেন। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। এবং আল্লাহরই উপর ঈমানদারদের ভরসা করা উচিত[১]।

[রুকূ - ৩]

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۭ وَقَالَ

১২. নিশ্চয়ই আল্লাহ বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন[২] এবং তাদের মধ্য

---

১. সাধারণ অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করানোর পর এখন আল্লাহ তাআলার কতিপয় বিশেষ অনুগ্রহ স্মরণ করানো হচ্ছে। অর্থাৎ মক্কার কুরায়শ ও ওদের মিত্ররা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য কেমন প্রাণপণ চেষ্টাই না করেছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলার রহমতে ওদের কোন ষড়যন্ত্রই কার্যকর হতে পারেনি। এ বিরাট এহসানের প্রতিক্রিয়া এই হওয়া উচিত যে, মুসলিমগণ বিজয় ও আধিপত্য অর্জন করা সত্ত্বেও আপন শত্রুদের প্রতি অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের দুর্বার আগ্রহে ন্যায় ও ইনসাফের রজ্জু হাতছাড়া করবে না। যেমন: পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে এর তাকীদ করা হয়েছে।

এখন কারো মনে সন্দেহ জাগতে পারে যে, এমন চরম শত্রুদের প্রতি এত উদারতা রাজনৈতিক কৌশলের পরিপন্থী হতে পারে। কেননা, এমন নম্র ব্যবহার লক্ষ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ওদের দুঃসাহস বেড়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এই সন্দেহের অবসান করা হল وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ দ্বারা। (অর্থাৎ মুমিনের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতি হচ্ছে 'তাকওয়া' ও 'আল্লাহ-নির্ভরতা')। তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে বাইরে ও ভিতরে সর্বাবস্থায় তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর সঙ্গে যে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছ, তা পুরাপুরি পালন করে চল। অতঃপর আলহামদুল্লিাহ, কারো থেকে কোন ভয় নেই।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

পরবর্তী আয়াতে আমাদের শিক্ষার জন্য এমন এক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হচ্ছে, যারা আল্লাহ থেকে নির্ভয় হয়ে অঙ্গীকার ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে ওরা লাঞ্ছিত ও পদদলিত হয়েছিল।

২. অর্থাৎ শুধু উম্মতে মুহাম্মদিয়া থেকেই নয়, বরং পূর্ববর্তী উম্মতদের থেকেও অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল।

اللهُ اِنِّیْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَیْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِیْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَیِّاٰتِكُمْ

থেকে আমি বারজন নেতা নির্ধারিত করেছিলাম[১]। আর আল্লাহ বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি[২]; যদি তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন ও তাঁদের সাহায্য কর[৩] এবং আল্লাহকে ঋণ প্রদান কর[৪]

---

১. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলের বারটি সম্প্রদায় থেকে বারজন প্রধান মনোনীত করেছিলেন। মুফাসসিরগণ এদের নামও তাওরাতের বরাতে উল্লেখ করেছেন। এদের দায়িত্ব ছিল, স্বজাতিকে অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাগীদ করা এবং তাদের অবস্থাদির তত্ত্বাবধান করা।

হিজরতের পূর্বে (মদীনার) আনসারগণ যখন 'লাইলাতুল আকাবা'তে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে বায়'আত হয়েছিলেন, তখন তাদের মধ্য থেকেও বারজন প্রধান মনোনীত হয়েছিলেন এবং এই বার ব্যক্তিই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হাতে বায়আত হন।

জাবের ইবনে সামুরা (রা) বর্ণিত এক হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মতের যে বারজন খলীফার ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন, তাদের সখ্যাও বনী ইসরাঈল-প্রধানদের সংখ্যার সমান। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮২১) অধিকন্তু মুফাসসিরগণ তাওরাতের বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে বলেছিলেন, 'আমি তোমার বংশে বারজন সর্দার পয়দা করব।' সম্ভবত এই সেই বার ব্যক্তি, যাদের উল্লেখ জাবের ইবনে সামুরার হাদীসে রয়েছে।

২. এই সম্বোধন সম্ভবত বার সর্দারের প্রতি করা হয়েছে। অর্থ এই যে, তোমরা তোমাদের কর্তব্য পালন করে যাও, আমার সাহায্য-সহায়তা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। —অথবা সকল বনী ইসরাঈলের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। অর্থাৎ তোমরা কখনো আমাকে তোমাদের থেকে দূরে মনে করো না। যা কিছু কাজকর্ম তোমরা গোপনে বা প্রকাশ্যে করবে, তা সর্বত্র ও সর্বদা আমি দেখছি ও শুনছি। সুতরাং যা কিছু কর, সতর্ক হয়ে করবে।

৩. অর্থাৎ যে রাসূলগণ হযরত মূসা আলাইহিস সালামের পর আসতে থাকবেন, তোমরা তাঁদের বিশ্বাস করবে ও অন্তর দিয়ে ভক্তি করবে এবং সত্যের দুশমনদের মোকাবেলায় জান ও মাল উভয় দ্বারা তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতা করবে।

৪. আল্লাহকে ঋণ প্রদানের অর্থ- তাঁর দীনের খেদমত করা ও তাঁর পয়গম্বরদের সাহায্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করা।

যেভাবে টাকা ঋণদানকারী এই আশায় দেয় যে, সে টাকা ফেরত পাবে এবং ঋণী ব্যক্তি টাকা ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তেমনি আল্লাহরই প্রদত্ত যে জিনিস তার রাস্তায় ব্যয়

উত্তমরূপে[১]— তবে অবশ্যই আমি তোমাদের থেকে তোমাদের গোনাহ দূর করব এবং তোমাদের দাখিল করব জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত[২]। আর তার পরও তোমাদের মধ্যে যে কাফের হবে, নিশ্চয় সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হবে[৩]।

وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ⑫

১৩. অতএব ওরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে আমি ওদের লা'নত করলাম এবং ওদের অন্তর কঠিন করে দিলাম[৪]। ওরা (তাওরাতের)

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ

করা হবে, তা বিনষ্ট হবে না। আল্লাহ তাআলা— কোন দায়ে পড়ে নয়, বরং নিতান্তই স্বীয় ফযল ও রহমতে— সেই জিনিস বিরাট লাভের আকারে তোমাদের ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব নিজ যিম্মায় গ্রহণ করেছেন।

১. 'উত্তমরূপে' এর অর্থ এই যে, এখলাস ও আন্তরিকতার সাথে দেবে এবং নিজের প্রিয়, আকর্ষনীয় ও পাক-পবিত্র সম্পদ থেকে দেবে।

২. অর্থাৎ নেক কাজ-কর্ম যখন বেশি পরিমাণে হতে থাকে, তখন তা মন্দ কাজকর্মকে পরাভূত করে ফেলে। আর যখন মানুষ আল্লাহকে দেওয়া অঙ্গীকার পালনে নিয়োজিত থাকবে, তখন আল্লাহ তাআলা তার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে তাকে স্বীয় সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের স্থানে আশ্রয় দেবেন।

৩. অর্থাৎ এমন পরিষ্কার ও পরিপক্ক ওয়াদা-অঙ্গীকারের পরও যে ব্যক্তি আল্লাহর বিশ্বস্ত বান্দা না হয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, বুঝতে হবে, সে সফলতা ও মুক্তির সরলপথ হারিয়ে ফেলেছে। বলা যায় না, সে ধ্বংসের কোন গহ্বরে গিয়ে পতিত হবে।

বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে যেসব বিষয়ে অঙ্গীকার নেওয়ার কথা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে—সেগুলি হচ্ছে নামায, যাকাত, পয়গম্বরদের প্রতি ঈমান, এবং জান ও মালের দ্বারা তাঁদের সাহায্য করা। এ বিষয়গুলির প্রথমটি দৈহিক ইবাদত, দ্বিতীয়টি আর্থিক, তৃতীয়টি অন্তরের ও সেই সাথে মৌখিক এবং চতুর্থটি প্রকৃতপ্রস্তাবে তৃতীয়টিরই নৈতিক পরিপূর্ণতা। এ বিষয়গুলি উল্লেখ করে যেন ইঙ্গিত করে দেওয়া হল যে, জান ও মাল এবং দেহ ও অন্তর সব কিছুর দ্বারা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ কর।

কিন্তু বনী ইসরাঈল বেছে বেছে এক একটি অঙ্গীকারের বিরোধিতা করে; কোন অঙ্গীকারের উপরই স্থায়ী থাকেনি। এই প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের যে পরিণতি হল, তা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

৪. লানত এর অর্থ দূর করে দেওয়া। অর্থাৎ অঙ্গীকার ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আমি (আল্লাহ) আমার রহমত থেকে ওদের দূরে ঠেলে দিয়েছি এবং ওদের অন্তর কঠিন করে দিয়েছি।'

الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ؕ

বাক্যাবলী তার স্থান থেকে সরিয়ে দেয়[১] এবং ওদের যে নসীহত করা হয়েছিল ওরা তার (বড়) অংশই ভুলে গেল[২]। আর আপনি সর্বদা অবহিত হতে থাকেন ওদের কোন না কোন প্রতারণা সম্পর্কে[৩], ওদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ছাড়া[৪]। অতএব আপনি ওদের ক্ষমা করুন ও উপেক্ষা করুন।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ-দ্বারা এ কথা স্পষ্ট যে, ওদের অভিশপ্ত ও কঠিন-হৃদয় হওয়ার কারণ হচ্ছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, যা ওদেরই কর্ম। তবে কার্য-কারণ থেকে ফলাফল বের করা যেহেতু আল্লাহ তাআলারই কাজ, সেই হিসাবে جَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَاسِيَةً বলেছেন, অর্থাৎ ওদের অন্তর কঠিন করে দেওয়ার কাজকে নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন।

১. অর্থাৎ আল্লাহর কালামের মধ্যে বিকৃতি সাধন করে– কখনো তার শব্দাবলিতে, কখনো অর্থে, কখনো তেলাওয়াতে। 'তাহরীফ' (বা বিকৃতির) এই সব পদ্ধতি কুরআন শরীফে ও হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। এসব বিকৃতির কিছুটা স্বীকারোক্তি ইউরোপের কোন কোন খ্রিস্টান-পাদ্রিদেরও করতে হয়েছে।

২. অর্থাৎ ওদের কর্তব্য তো ছিল সেই সকল অমূল্য নসীহত থেকে উপকার লাভ করা, যা শেষ যমানার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন এবং অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ দীনী বিষয়ে ওদের কিতাবে বর্তমান ছিল। কিন্তু ওরা নিজেদের উদাসীনতা ও দুষ্কৃতির কারণে এসব ভুলে গেল। আর এখন সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ওদের যে উপদেশ ও নসিহত করা হয়, তারও কোন প্রভাব ওরা গ্রহণ করে না।

হাফেজ ইবনে রজব হাম্বলী (র) লিখেছেন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে ওদের মধ্যে দুটি জিনিস জন্মে– 'অভিশপ্ততা' ও 'অন্তরের কাঠিন্য'। এবং এ দুয়ের পরিণাম হিসাবে ওদের মধ্যে অন্য দুটো বিষয় দেখা দেয়– আল্লাহর কালামে বিকৃতি করা ও নসীহত থেকে উপকার গ্রহণ না করা। অর্থাৎ লানতের প্রতিক্রিয়ায় ওদের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে, এমন কি অত্যন্ত ধৃষ্টতা ও কু-বুদ্ধির ফলে আসমানী কিতাবসমূহ বিকৃত করতে উদ্বুদ্ধ হয়। অন্য দিকে যখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিশাপে অন্তর শক্ত হয়ে গেল, তখন সত্য গ্রহণের ও উপদেশে প্রভাবিত হওয়ার ক্ষমতা লোপ পেল। এভাবে 'ইলমী ও আমলী' অর্থাৎ জ্ঞানগত ও আমলগত উভয় প্রকারের শক্তি ওরা হারিয়ে ফেলল।

৩. অর্থাৎ ওদের প্রতারণা ও খেয়ানতের ধারা আজ পর্যন্ত চলে আসছে এবং ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। এ জন্যই সর্বদা ওদের কোন না কোন ধোঁকা ও প্রতারণা সম্পর্কে আপনি অবহিত হচ্ছেন।

৪. যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) প্রমুখ, যারা ইসলামে প্রবেশ করেছেন।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

নিশ্চয় আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালবাসেন[১]।

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۖ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ

১৪. যারা বলে, 'আমরা 'নাসারা',[২]' তাদের থেকেও আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। অতঃপর ওরা ওদের যে নসীহত করা হয়েছিল তার (বড়) অংশই ভুলে গেল[৩]। ফলে আমি ওদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিলাম[৪] কিয়ামত

---

১. অর্থাৎ যখন ওদের অভ্যাসই এ রকম, তখন আর এ ধরনের লোকদের সাথে প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিতর্ক করা এবং ওদের প্রত্যেক খেয়ানতের কথা প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। ওদের ছাড়ুন এবং উপেক্ষা করুন। আর ওদের দুষ্কৃতির জওয়াবে আপনি ওদের সাথে ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার করুন। সম্ভবত এতেই কিছুটা প্রভাবিত হবে।

প্রখ্যাত মুফাসসির হযরত কাতাদাহ (রা) প্রমুখ বলেছেন, এই আয়াতটি অপর আয়াত- قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الخ এর দ্বারা মনসুখ বা রহিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এমন বলার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, কেতাল বা জেহাদের বিধান সত্ত্বেও সময় ও ক্ষেত্র বুঝে কাফেরদের প্রতি ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করা এবং নম্র ব্যবহারের দ্বারা ওদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার বৈধতা ও অবকাশ এখনো আছে।

২. نصارى (নাসারা) শব্দটি نصر ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ সাহায্য করা। অথবা এটি ناصرة (নাসেরা) নামক স্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যা শাম দেশের একটি বসতি, যেখানে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম বসবাস করতেন। এ জন্যই তাঁকে 'মাসীহ নাসেরী' বলা হয়।

যারা নিজেদের 'নাসারা' বলত, ওরা যেন এই কথার দাবিদার ছিল যে, আমরা আল্লাহর সত্য ধর্ম ও পয়গম্বরদের সহযোগী, সাহায্যকারী ও হযরত মাসীহ নাসেরীর অনুসারী। এই মৌখিক দাবি ও উপাধিগত গৌরব সত্ত্বেও দীনের ব্যাপারে ওদের যে অবস্থা ছিল, তা সম্মুখে বর্ণিত হয়েছে।

৩. অর্থাৎ ইহুদীদের মত এদের থেকেও অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়, কিন্তু এরাও অঙ্গীকার ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতায় পূর্বসূরীদের চেয়ে কোন অংশে কম যায়নি। যেসব অমূল্য উপদেশের উপর চিরমুক্তি ও সাফল্য নির্ভরশীল ছিল, তা থেকে এরাও কোন ফায়দা হাসিল করেনি। বরং এরা 'বাইবেল'-এ উপদেশ-নসীহতের ওই মূল্যবান অংশ অবশিষ্ট রাখেনি যা ছিল প্রকৃতপ্রস্তাবে দীনের সার-নির্যাস।

৪. অর্থাৎ নাসারাদের নিজেদের মধ্যে অথবা ইহুদী ও নাসারাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঝগড়া-বিবাদ চিরদিনের জন্য কায়েম হয়ে গেল। আসমানী শিক্ষা বিনষ্ট করা ও তা ভুলে যাওয়ার যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হওয়ার ছিল, তাই হল। অর্থাৎ যখন ওহীর আলো ওদের নিকট রইল

দিবস পর্যন্ত[১]। আর শীঘ্রই আল্লাহ ওদের জানিয়ে দেবেন ওরা যা কিছু করত[২]।

يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١٤﴾

না, তখন কল্পনা ও প্রবৃত্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পরস্পর হানাহানি করতে লাগল। ধর্ম তো রইল না, কিন্তু ধর্মের নামে ঝগড়া-ফাসাদ রয়ে গেল। ওদের মধ্যে বিস্তর ফেরকা সৃষ্টি হওয়ায় একে অপরের সাথে হানাহানি শুরু করল। এই সাম্প্রদায়িক সংঘাতই শেষ পর্যন্ত পরস্পরের কঠিনতম শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষে পর্যবসিত হল।

এ কথা সত্য যে, বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যেও অসংখ্য মতভেদ এবং ধর্মীয় সংঘাত বর্তমান রয়েছে। কিন্তু যেহেতু আমাদের নিকট আল্লাহর ওহী ও আসমানী বিধান, আলহামদুলিল্লাহ, হুবহু সংরক্ষিত আছে, সেহেতু বিরোধ-মতভেদ থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের এক বিরাট জামাত সর্বদা সত্য ও সততার উপর কায়েম রয়েছে ও থাকবে। পক্ষান্তরে, ইহুদী ও নাসারাদের বিভেদ অথবা প্রটেষ্টান্ট ও রোমান ক্যাথলিক প্রভৃতি ফেরকার মতবিরোধের মধ্যে কোন একটি সম্প্রদায়ও আজ সত্য ও সততার রাজপথে প্রতিষ্ঠিত নেই এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতেও পারবে না। কেননা, যে ওহীর আলো ছাড়া কোন মানুষই আল্লাহ ও তাঁর বিধানের সঠিক পরিচয় হাসিল করতে পারে না, তা ওরা নিজেদের অনাচারের কারণে বিনষ্ট করে ফেলেছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা এই বিকৃত 'বাইবেল'কে ধরে থাকবে, ওদের পক্ষে কিয়ামত পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও শত্রুতার অন্ধকার থেকে বের হয়ে চিরমুক্তির রাজপথে উঠে আসা সম্ভব হবে না।

উল্লেখ্য যে, আজ যারা স্বয়ং ধর্মকে বিশেষ করে খ্রিস্টধর্মকে উপহাস করে, তবে খ্রিষ্টবাদ ও বর্তমান বাইবেলকে শুধু কতিপয় রাজনৈতিক প্রয়োজনে ধরে রেখেছে, সেই তথাকথিত নাসারাদের উল্লেখ এ আয়াতে করা হয়নি। আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, ওরাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, তবে ওদের পরস্পরের শত্রুতা, একের বিরুদ্ধে অন্যের গোপন ষড়যন্ত্র ও প্রকাশ্য যুদ্ধবিগ্রহ সচেতন মানুষের অজানা নয়।

১. অর্থাৎ যতদিন ওরা থাকবে, উক্ত মতভেদ, শত্রুতা ও বিদ্বেষও চলতে থাকবে।

এস্থলে 'কিয়ামত পর্যন্ত' শব্দটি এরূপ, যেমন বলা হল, 'অমুক ব্যক্তি তো কিয়ামত পর্যন্তও তার এ কাজ থেকে বিরত হবে না।' এর অর্থ এই নয় যে, সেই ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবে এবং এ কাজ করতে থাকবে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, যদি কিয়ামত পর্যন্তও জীবিত থাকে, তবে এ কাজ ছাড়বে না। অতএব আয়াতের মধ্যে إِلىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ শব্দ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, ইহুদী ও নাসরানীদের অস্তিত্ব কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, যেমন আমাদের কালের কোন কোন বাতিলপন্থী লোকেরা নিজেদের তাফসীরে লিখেছে।

২. অর্থাৎ আখেরাতে পূর্ণরূপে এবং দুনিয়াতেও কোন কোন ঘটনার মাধ্যমে ওরা নিজেদের ক্রিয়া-কর্মের পরিণতি জানতে পারবে।

১৫. হে কিতাবীরা! নিশ্চয় তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন, যিনি তোমাদের নিকট এমন বহু বিষয় প্রকাশ করেন যা তোমরা কিতাব থেকে গোপন করতে, আর বহু বিষয় তিনি এড়িয়ে যান[১]। নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে গেছে আলো ও এমন সুস্পষ্ট কিতাব–	يَاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۥ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۵﴾
১৬. যার দ্বারা আল্লাহ যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুগত হয় তাদের শান্তির পথসমূহ প্রদর্শন করেন, এবং নিজ হুকুমে তাদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদের সরল পথে পরিচালিত করেন[২]।	يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۶﴾
১৭. নিশ্চয়ই তারা কাফের হয়ে গেছে যারা বলেছে, 'আল্লাহ তো মাসীহ ইবনে	لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ

১. সকল ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের কিতাবের মধ্যে এতসব বিকৃতি সত্ত্বেও যে শেষ নবীর আগমনের সুসংবাদ কোন না কোন শিরোনামে বিদ্যমান রয়েছে, সেই নবী তশরীফ এনেছেন। তাঁর পবিত্র মুখে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কালাম প্রকাশ করেছেন এবং হযরত মাসীহ (আ) যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছিলেন, তিনি সেগুলির পূর্ণতা দান করেছেন। তাছাড়া, তাওরাত ও ইনজীলের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করেছিলে এবং রদবদল করে বর্ণনা করেছিলে, তার মধ্যে জরুরী বিষয়াদি এই শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ করে দেন, আর যেসব বিষয়ের এখন তেমন প্রয়োজন নেই তা এড়িয়ে যান।

২. সম্ভবত 'নূর' (আলো) দ্বারা স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর 'কিতাবে মুবীন' দ্বারা কুরআন শরীফ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ– যে ইহুদী ও খ্রিস্টানরা আল্লাহর ওহীর আলোকে নষ্ট করে প্রবৃত্তি ও বাসনার অন্ধকারে এবং পরস্পরের বিরোধ ও দ্বন্দ্বের আবর্তে পড়ে আছে, যা থেকে বর্তমান অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই– ওদের বলে দিন যে, আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ আলো এসে পড়েছে। যদি তোমরা চিরমুক্তির সঠিক পথে চলতে চাও, তবে এই আলোতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির পথে অগ্রসর হও, তাহলে শান্তির পথসমূহ উন্মুক্ত পাবে এবং অন্ধকার থেকে বের হয়ে আলোতে চলতে পারবে। আর এভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত হয়ে চলতে থাকলে তাঁরই সাহায্যে অনায়াসে মনযিলে মকসুদে পৌঁছে যাবে।

هُوَالْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۚ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

মারয়ামই[১]।' আপনি বলে দিন, (যদি তাই হয়) 'তবে কে আল্লাহর মোকাবেলায় কিছু করার ক্ষমতা রাখে যদি তিনি মাসীহ ইবনে মারয়াম, তাঁর মাতা এবং পৃথিবীতে যারা আছে তাদের সকলকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন[২]? আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ

১. অর্থাৎ আল্লাহ বলতে মাসীহ ছাড়া আর কিছু নেই। কথিত আছে, খ্রিস্টানদের মধ্যে 'ইয়াকুবিয়া' ফেরকার এই বিশ্বাস। এ ফেরকার মতে আল্লাহ মাসীহর দেহের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে আছেন (معاذ الله)— অথবা এমন বলা যায় যে, খ্রিস্টানরা যেহেতু হযরত মাসীহকে উপাস্য বলে দাবি করে এবং সেই সাথে আল্লাহ এক বলে তাওহীদেরও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়, সুতরাং এই উভয় দাবির ফল এই দাঁড়ায় যে, ওদের নিকট মাসীহ ছাড়া আল্লাহ আর কেউ নন।

যা হোক, এ দুটির যে কোনটি ধরা হোক, এ আকীদা যে স্পষ্ট কুফর তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

২. অর্থাৎ সর্বশক্তির অধিকারী মহা প্রতাপশালী আল্লাহ তাআলা হযরত মাসীহ ও মারয়াম এবং সমগ্র পৃথিবীর সকল বাসিন্দাদের একত্র করে সহসা ধ্বংস করে দিতে চাইলে তাঁকে বাধা দেওয়ার কে আছে? সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে যদি সমবেত করা হয় এবং আল্লাহ এক মুহূর্তের মধ্যে সকলকে ধ্বংস করে দেওয়ার (অর্থাৎ মেরে ফেলার) ইচ্ছা করেন, তবে তাদের সকলের সম্মিলিত শক্তিও আল্লাহর ইচ্ছাকে এক মুহূর্তের জন্য মুলতবি করে রাখতে পারবে না। কেননা, সৃষ্টিসমূহের ক্ষমতা আল্লাহরই দেওয়া, তাও আবার সীমিত, যা আল্লাহ তাআলার স্বকীয় ও অসীম শক্তির মোকাবেলায় কিছুই নয়। যাদের কথা খণ্ডনে এই আলোচনা হচ্ছে, স্বয়ং তারাও এ কথা স্বীকার করে থাকে। বরং যাকে এই লোকেরা খোদা বানাচ্ছে, সেই মাসীহ ইবনে মারয়ামের নিকটও এই স্বীকারোক্তি রয়েছে: 'হে পিতা, প্রত্যেক বস্তু তোমার ক্ষমতাধীন, তুমি আমার থেকে (মৃত্যুর) এই পেয়ালা সরিয়ে দাও– সেভাবে নয় যেভাবে আমি চাই, বরং সেভাবে যেভাবে তুমি চাও'।

অতএব যাঁকে তোমরা খোদা বল, অর্থাৎ হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম এবং তাঁর যে শ্রদ্ধেয়া মাতা তোমাদের ধারণায় খোদার মাতা, সেই সতী-সাধ্বী মারয়াম– যখন এঁরা উভয়ে পৃথিবীর সকল সৃষ্টজীবসহ খোদায়ী ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের সম্মুখে অক্ষম, তখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে দেখ যে, হযরত মাসীহ বা তাঁর মাতা অথবা অন্য কোনও সৃষ্টি সম্পর্কে খোদায়ী দাবি করা কত বড় ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতা?!

আয়াতে يهلك এর অর্থ

উল্লিখিত ব্যাখ্যায় আমরা 'هلاك'- কে মৃত্যুর অর্থে গ্রহণ করেছি, আর جميعا শব্দটির কিছুটা ব্যাখ্যা করে দিয়েছি। এই ব্যাখ্যা আরবী ভাষাবিদদের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝

দুয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সেসবের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন[১]। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান[২]।'

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰی نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ

১৮. ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, 'আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়জন[৩]।' আপনি বলুন, 'তবে কেন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে

তা ছাড়া এই সম্ভাবনাও আছে যে, আয়াতে 'হালাক' শব্দকে 'মৃত্যু' অর্থে নেওয়া হবে না, বরং ইমাম রাগেব (র) যেমন লিখেছেন, 'কোন বস্তুর সম্পূর্ণ ফানা ও লয় পাওয়া বা অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়া– এ অর্থ নেওয়া যেতে পারে। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে, যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা হযরত মাসীহ ও তাঁর মাতা এবং ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সকলকে একেবারে বিলুপ্ত ও সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বহীন করে দেওয়ার ইচ্ছা করে বসেন, তবে তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেওয়ার কে আছে? কবি বলেন–

اوست سلطان ہر چہ خواہد آں کند*عالمے را در دمے ویراں کند

(তিনি সম্রাট, যা ইচ্ছা তা-ই করেন। সারা বিশ্বকে তিনি এক নিমিষে ধ্বংস করে দিতে পারেন।)

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, আল্লাহ তাআলা ক্ষেত্রবিশেষে নবীগণের ব্যাপারে এমন ধরনের কথা বলে থাকেন, যাতে তাঁদের উম্মত তাঁদেরকে বান্দার আসন থেকে মা'বূদের আসনে উত্তোলন না করে। নতুবা আল্লাহর নিকট নবীদের যে মর্যাদা ও উচ্চাসন রয়েছে, তা সুবিদিত ও স্পষ্ট।

১. তিনি সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা এবং যেভাবে ইচ্ছা। যেমন, হযরত মাসীহকে পিতা ছাড়া, হযরত হাওয়াকে মা ছাড়া এবং হযরত আদম আলাইহিস সালামকে মাতা-পিতা ছাড়া পয়দা করেছেন।

২. তাঁর মোকাবেলায় কারো জোর চলতে পারে না। তাঁর ক্ষমতার কাছে সকল নেককার ও পুণ্যাত্মাও মজবূর বা অসহায়।

৩. সম্ভবত ওরা নিজেদেরকে সন্তান এজন্য বলে থাকে যে, ওদের (বিকৃত) বাইবেলে আল্লাহ তাআলা ইসরাঈল (ইয়াকূব আলাইহিস সালাম) কে নিজ পুত্র এবং নিজেকে তার পিতা বলেছেন। অপর দিকে খ্রিস্টানরা হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামকে 'ইবনুল্লাহ' (আল্লাহর পুত্র) বলে বিশ্বাস করে। অতএব (ইহুদীরা) ইসরাঈলের সন্তানসন্ততি এবং (নাসারারা) হযরত মাসীহর উম্মত হওয়ার কারণে ওরা নিজেদের সম্পর্কে أبناء الله শব্দটি ব্যবহার করে থাকবে।

এই সম্ভাবনাও আছে যে, ওদের উদ্দেশ্য হচ্ছে– আমরা আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা ও প্রিয়জন হওয়ার কারণে সন্তানেরই মত। এ হিসাবে أبناء শব্দটি أحبّاء (প্রিয়জনেরা) এর সমার্থক।

بِذُنُوۡبِكُمۡ ؕ بَلۡ اَنۡتُمۡ بَشَرٌ مِّمَّنۡ خَلَقَ ؕ يَغۡفِرُ لِمَنۡ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَاِلَيۡهِ الۡمَصِيۡرُ ﴿۱۸﴾

শাস্তি দেন[১]? তা নয়, বরং তোমরাও (অন্য মানুষের মতই) মানুষ[২], তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত।[☆] তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন[৩]। আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, সেসবের রাজত্ব আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে (সকলকে) ফিরে যেতে হবে[৪]।

يٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُوۡلُنَا

১৯. হে কিতাবীরা! তোমাদের নিকট আমার

---

১. যেহেতু কোন সৃষ্টজীবের পক্ষে 'আল্লাহর পুত্র' হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, তবে খোদার প্রিয়পাত্র হওয়া সম্ভব, যেমন, সূরা মায়েদাতে আছে يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ (আয়াত : ৫৪)– সেহেতু এ আয়াতে প্রথমত প্রিয়ভাজন হওয়ার দাবিকেই খণ্ডন করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে জাতি প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও কঠিন গোনাহর কারণে ইহজগতেও কয়েক রকমের লাঞ্ছনা ও শাস্তিতে ধৃত হয়েছে এবং পরজগতেও অনন্ত কালের শাস্তির যোগ্য, এমন বিদ্রোহী ও অপরাধী জাতি সম্পর্কে এক মুহূর্তের জন্যও কি কোন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই ধারণা করতে পারে যে, সেই জাতি আল্লাহর প্রিয় হবে? আল্লাহর সঙ্গে কারো বংশীয় সম্পর্ক থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। আর তার ভালবাসা ও মহব্বত কেবল আনুগত্য ও সৎকর্মের দ্বারাই হাসিল হতে পারে। সুতরাং কঠিন থেকে কঠিন শাস্তির যোগ্য এসব গোঁড়া অপরাধীদের পক্ষে আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়জন হওয়ার দাবি করতে লজ্জা করা উচিত। হযরত নূহ আ.-এর ছেলে হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তার সম্পর্কে বলেছেন- إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ (সূরা হূদ : ৪৬)

২. মূল আভিধানিক অর্থে بشر বলা হয় চামড়ার উপরিভাগকে; এর সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে বলে মানুষকেও بشر বলা হয়। এস্থলে এই শব্দ অবলম্বনে সম্ভবত এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পুত্র ও প্রিয়জন হওয়া তো দূরের কথা, তোমাদের পরিপূর্ণ ও বিশিষ্ট মানুষও বলা যায় না। শুধু بشرة - অর্থাৎ চামড়ার উপরিভাগ ও আকার-আকৃতির দিক থেকে আল্লাহর সৃষ্ট এক মামুলি মানুষ বলা যায়, যাদের জন্মও সাধারণ মানুষের মতই প্রচলিত পন্থায় হয়েছে। সুতরাং 'পুত্রত্বের' ধারণা করার অবকাশ কোথায়?

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তোমরা আল্লাহরই সৃষ্টি করা মামুলি মানুষ।'

৩. কেননা, তিনিই জানেন– কে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য এবং কে শাস্তির উপযুক্ত।

৪. অতএব যাকে তিনি স্বীয় হেকমত ও রহমতে মাফ করতে চান অথবা ন্যায় ও ইনসাফমত শাস্তি দিতে চান, তাতে কে বাধা দিতে পারে? আর কোনো পাপিষ্ঠের এই সুযোগ নেই যে, আল্লাহর পৃথিবী ও আকাশ-রাজ্যের সীমা ছেড়ে চলে যাবে এবং এই অবকাশও নেই যে, মৃত্যুর পর পরকালে অন্যত্র কোথাও পালিয়ে যাবে।

يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑲

রাসূল এমন সময় আগমন করেছেন যখন রাসূলদের (আগমনের) ধারা বন্ধ ছিল– যিনি তোমাদের নিকট (আল্লাহর বিধান) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন[১], যাতে তোমরা বলতে না পার, 'আমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আসেননি।' এখন তো তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসে গেছেন[২]। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান[৩]।

১. অর্থাৎ তিনি আমার হুকুম-আহকাম ও আইন-কানুন অত্যন্ত স্পষ্টতার সঙ্গে বয়ান করেন।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

বর্তমান রুকূর শুরু থেকে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বিভিন্ন রকমের দুষ্কৃতি ও নির্বুদ্ধিতা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন, 'এখন আমার রাসূল তোমাদের নিকট আগমন করেছেন, যিনি তোমাদের অপকর্ম প্রকাশ করে তোমাদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যেতে চান।' অতঃপর আল্লাহ পাক এ মর্মে সতর্ক করেছেন যে, হেদায়েতের আলোর দিকে গমন দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। **এক**– আল্লাহ তাআলার সঠিক মারেফত (পরিচয়) হাসিল করা এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাস না রাখা। আয়াত নং (১৭ ও ১৮) তে এই বিষয়েরই আলোচনা ছিল। **দুই**– শ্রেষ্ঠতম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা, যিনি পূর্ববর্তী নবীগণের গুণাবলির ধারক এবং আল্লাহ তাআলার শরী'য়তসমূহের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ ব্যাখ্যাকার। এই দ্বিতীয় বিষয়টির আলোচনা বর্তমান আয়াতের মধ্যে করা হয়েছে।

২. হযরত মাসীহ ঈসা আলাইহিস সালামের পর প্রায় ছয়শ বছরকাল নবীগণের আগমন-ধারা বন্ধ ছিল। বলতে গেলে, প্রায় সমগ্র দুনিয়া মূর্খতা, স্থবিরতা, সন্দেহ-সংশয় ও কুসংস্কারের অন্ধকারে ছিল নিমজ্জিত। হেদায়েতের আলো নিবে গিয়েছিল। জুলুম-অত্যাচার, বাড়াবাড়ি, ফেতনা-ফাসাদ ও ধর্মদ্রোহিতার কালো মেঘ চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এমন সময় সমগ্র জগতের সংশোধনের জন্য আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক, সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতাকে পাঠালেন, যিনি জাহেলদের উভয় জগতের কল্যাণের পথ দেখাবেন, গাফেলদের ভয়-ভীতির দ্বারা সজাগ করবেন এবং দুর্বলদের সুসংবাদ শুনিয়ে উৎসাহিত করবেন, কেউ মানুক বা না মানুক। এভাবে সমগ্র সৃষ্টির উপর আল্লাহর হুজ্জত (দলীল) সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এখন আর ওযর-আপত্তির অবকাশ রইল না।

৩. অর্থাৎ তোমরা যদি এই পয়গম্বরের কথা না মান, তবে আল্লাহর এই শক্তি রয়েছে যে, তিনি তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে দাঁড় করিয়ে দিবেন, যারা তাঁর পয়গামকে সম্পূর্ণরূপে কবুল করবে এবং পয়গম্বরের সহযোগিতা করবে। আল্লাহর কাজ কিছুমাত্র তোমাদের উপর নির্ভরশীল নয়।

[রুকূ - ৪]

২০. (স্মরণ কর), যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহর এই অনুগ্রহ স্মরণ কর[১] যে, তিনি তোমাদের মধ্যে নবীদের সৃষ্টি করেছেন[২] এবং তোমাদের করেছেন রাজত্বের মালিক[৩] আর

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّاٰتٰىكُمْ

১. তাফসীরে মূযেহুল কুরআনে আছে: হযরত ইবরাহীম (আ) পৈত্রিক দেশ ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হলেন এবং শামদেশে এসে বাস করতে লাগলেন। অনেক দিন পর্যন্ত তাঁর কোনো সন্তান হয়নি। তখন আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ দিলেন যে, তোমার সন্তানসন্ততি বেশি করে বিস্তার করব এবং শামদেশ তাদের করতলগত হবে এবং নবুওয়াত, দীন, কিতাব, ও রাজত্ব তাদের দান করব।

অতঃপর হযরত মূসা (আ) এর সময় উক্ত ওয়াদা পূরণ করা হয়। আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে ফেরাওনের বেগার খাটা থেকে মুক্ত করলেন এবং ফেরাওনকে পানিতে ডুবিয়ে দিলেন। আর তাদেরকে আমালিকা সম্প্রদায়ের সাথে জেহাদ করতে ও শামদেশ জয় করে নিতে হুকুম করলেন। আরো বললেন, 'শামদেশ সর্বদা তোমাদেরই আয়ত্তে থাকবে।'

সে মত হযরত মূসা (আ) যে বার ব্যক্তিকে বনী ইসরাঈলের বারটি সম্প্রদায়ের সর্দার নিযুক্ত করেছিলেন, তাদের ঐ দেশের খবর নিতে পাঠালেন। তারা খবর নিয়ে এসে শামদেশের অনেক সৌন্দর্য বর্ণনা করল এবং তথাকার শাসন-ক্ষমতার অধিকারী আমালিকা সম্প্রদায়ের শক্তি ও ক্ষমতার বর্ণনা দিল। হযরত মূসা (আ) তাদের বললেন যে, তোমরা স্বজাতির সামনে শামদেশের সৌন্দর্য বর্ণনা করো, কিন্তু শত্রুদের শক্তি-ক্ষমতার উল্লেখ করো না। এই বার সর্দারদের দু'জন হুকুম মানল, আর দশ জন অমান্য করল। লোকেরা ওদের শক্তির কথা শুনে ভয় পেয়ে গেল এবং পুনরায় মিসরে প্রত্যাবর্তন করতে চাইল।

এই অন্যায়ের কারণে বিজয়ে চল্লিশ বছর বিলম্ব হল এবং এই দীর্ঘকাল তারা মাঠে-ঘাটে ঘুরাফেরা করতে থাকে। অতঃপর তারা সকলে মরে গেল উক্ত দু'জন ছাড়া। দু জনই হযরত মূসার পর তাঁর খলীফা নিযুক্ত হন এবং তাদের হাতে শাম বিজয় হয়।

২. অর্থাৎ তোমাদের পিতামহ হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা বহু নবী তোমাদের মধ্যে পয়দা করেছেন, যেমন হযরত ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব, ইউসুফ এবং স্বয়ং মূসা ও হারূন আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম। অতঃপর তাঁদের পরও এই ধারা দীর্ঘ কাল পর্যন্ত তাদের মধ্যে কায়েম থাকে।

৩. অর্থাৎ ফেরাওনীদের চরম অপমানকর দাসত্ব থেকে মুক্তিদানের পর তোমাদের ধন-সম্পদ ও রাজত্বের অধিকারী করেন এবং এর পূর্বে তোমাদের মধ্য থেকেই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে মিসরের ধন-ভাণ্ডার ও রাজত্বের অধিকারী বানান। অতঃপর পরবর্তীকালেও হযরত

مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٠﴾

তোমাদের তা দিয়েছেন যা বিশ্বজগতের আর কাউকেই দেননি[১]।

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾

২১. 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন[২] এবং নিজেদের পিছনের দিকে ফিরে যেয়ো না, তা হলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে[৩]।'

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. ওরা বলল, 'হে মূসা! সেখানে অতি শক্তিধর এক সম্প্রদায় রয়েছে[৪] এবং আমরা সেখানে কিছুতেই প্রবেশ করব না যে পর্যন্ত না ওরা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। যদি ওরা সেখান থেকে বের হয়ে যায়, তবে আমরা

সুলায়মান প্রমুখ নবী ও বাদশাহ পয়দা করেন। এক কথায় দীন ও দুনিয়া উভয় জাহানের সেরা নে'য়ামতরাশি দ্বারা তোমাদের ধন্য করেন। কেননা, দীনি মর্যাদাসমূহের মধ্যে নবুওয়াত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা এবং পার্থিব গৌরবের সর্বশেষ ও চরম সীমা হচ্ছে স্বাধীনতা ও রাজত্ব, এই উভয়টি তোমাদের দান করা হয়।

১. অর্থাৎ যখন মূসা আলাইহিস সালামকে লক্ষ করে এ কথা বলা হচ্ছিল, সে সময় বনী ইসরাঈলকে সমগ্র জগতবাসী থেকে বেশি নে'য়ামত দান করা হয়েছিল। অতএব, لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ – কে সর্বকালের জন্য ধরে তা থেকে এ অর্থ বের করা যথাযথ হবে না যে, তাদেরকে সর্বকালে বেশি নেয়ামত দান করা হয়েছে! কারণ, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে খোদ কুরআন শরীফে 'সর্বোত্তম উম্মত' বলা হয়েছে- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (আলে ইমরান : ১১০) আরো বলা হয়েছে– وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ('এভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী উম্মত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হতে পার।' বাকারা, আয়াত ১৪৩)

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা পূর্বেই হযরত ইবরাহীম (আ) এর সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন যে, তাঁর বংশধরকে এ শামদেশ দান করবেন এবং সেই ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে; ভাগ্যবান হবে তারা, যাদের হাতে তা পূর্ণ হবে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জেহাদ করতে ভীরুতা ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করে দাসত্বের জীবন অবলম্বন করতে যেয়ো না।

৪. جبارين– অর্থাৎ অত্যন্ত শক্তিশালী, বলিষ্ঠ সম্প্রদায়।

অবশ্যই প্রবেশ করব[১]।'

২৩. যারা (আল্লাহকে) ভয় করে তাদের মধ্য থেকে দুজন ব্যক্তি– যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন– বলল[২], 'তোমরা ওদের উপর (আক্রমন করে শহরের) দ্বারে ঢুকে পড়। তোমরা যখন তাতে ঢুকে পড়বে, তখন তোমরাই জয়ী হবে[৩]। আর আল্লাহরই উপর নির্ভর কর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক[৪]।'

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۬ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۳﴾

২৪. ওরা বলল, 'হে মূসা! আমরা জীবনেও সেখানে প্রবেশ করব না যাবৎ ওরা সেখানে থাকবে। অতএব আপনি ও আপনার রব যান এবং আপনারা দুজনে যুদ্ধ করুন, আমরা তো এখানেই বসে আছি[৫]।'

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿۲۴﴾

---

১. অর্থাৎ মোকাবেলা করার সাহস আমাদের নেই। আমরা চাই যে, হাত-পা নাড়ানো ছাড়া অনায়াসে কাজ উদ্ধার হয়ে যাক! সুতরাং মুজেযার বলে আপনি ওদের বের করে দিন।

২. সেই দুই ব্যক্তি ছিলেন হযরত ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকান্না। তাঁরা খোদাভীরু ছিলেন বলে আমালিকা প্রমুখের কোনো ভয় তাঁদের ছিল না। কবি বলেন–

ہر کہ ترسید از حق و تقوی گزید ÷ ترسد از وے جن و انس و ہر کہ دید

'খোদার ভয়ে ভীত যেজন, তাক্ওয়া যার ধন,
মানব-দানব সবাই তাকে ডরায় অনুক্ষণ।'

৩. অর্থাৎ সাহস করে শহরের গেইট পর্যন্ত তো অগ্রসর হও, তার পর আল্লাহ তোমাদের জয়ী করবেন। আল্লাহ তাকেই সাহায্য করে থাকেন, যে নিজেও নিজের সাহায্য করে।

৪. (ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ –এর পর বলা হয়েছে- وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا –এ থেকে) বোঝা গেল, শরী'য়তসম্মত উপায়-উপকরণ বর্জন করার নাম তাওয়াক্কুল নয়, তাওয়াক্কুলের অর্থ হল, কোন সৎ উদ্দেশ্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম করার পরও তার সুফল ও শুভ পরিণতির জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করা, নিজ চেষ্টার উপর ভরসা ও অহংকার না করা। বলা বাহুল্য, শরী'য়তসম্মত উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করে শুধু আশা-আকাঙ্ক্ষা করার নাম তাওয়াক্কুল নয় বরং (تعطل) 'তাআত্তুল' তথা নিষ্ক্রিয়তা।

৫. এটি সেই জাতির বক্তব্য যারা দাবি করত, نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّٰهِ وَأَحِبَّاءُهٗ আমরা আল্লাহর পুত্র ও প্রিয়জন। কিন্তু ওদের মত চির উদ্ধত ও খোদা-দ্রোহী লোকদের পক্ষে এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা বলা কিছুমাত্র আশ্চর্যজনক নয়!

২৫. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমার কর্তৃত্ব কেবল আমার নিজ সত্তা ও আমার ভাইয়ের উপর[১]। অতএব আপনি আমাদের ও (এই) নাফরমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিন।☆'

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ لَاۤ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِیْ وَاَخِیْ فَافْرُقْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ۝

২৬. আল্লাহ বললেন, 'অতএব সেই ভূমি ওদের জন্য চল্লিশ বছর (পর্যন্ত) হারাম করা হল, ওরা যমীনে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে। অতএব আপনি (এমন) নাফরমান লোকদের জন্য দুঃখ করবেন না[২]।'

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَیْهِمْ اَرْبَعِیْنَ سَنَةً ۚ یَتِیْهُوْنَ فِی الْاَرْضِ ؕ فَلَا تَاْسَ عَلَی الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ۝

১. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই দো'য়া করেছিলেন। পুরো জাতির অবাধ্যতা ও ভীরুতাজনিত পাপাচার লক্ষ করে দো'য়াতে শুধু নিজের ও নিজ ভাই হারূন আলাইহিস সালাম এর উল্লেখ করলেন। হারূন (আ) তো নিষ্পাপ নবী ছিলেন। আর 'ইউশা' ও 'কালেব' এর উল্লেখ পরোক্ষভাবে মূসা (আ) ও হারূন (আ) এর অধীনেই রয়েছে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিন।'

২. অর্থাৎ বিচ্ছেদের দুআ বাহ্যত ও চাক্ষুষভাবে কবুল হল না বটে, তবে কার্যত এভাবে কবুল হল যে, সেই নাফরমানরা সকলে আল্লাহর আযাবে পতিত অবস্থায় দিশাহারা ও উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরছিল। পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ) পয়গম্বরসুলভ মানসিক শান্তিসহ পথপ্রদর্শন ও এসলাহের দায়িত্ব পালনে ছিলেন নিয়োজিত। যেমন, কোন লোকালয়ে মহামারি দেখা দিল আর হাজারো রোগাক্রান্ত মানুষের মধ্যে দু'চার জন সুস্থ ও সাহসী ব্যক্তি তাদের চিকিৎসা, খোঁজ-খবরের জন্য ব্যস্ত থাকল।

فَافْرُقْ بَیْنَنَا – এর দ্বিতীয় অর্থ

যদি فَافْرُقْ بَیْنَنَا এর তরজমা 'বিচ্ছেদ করে দিন' এর স্থলে 'ফয়সালা করে দিন' করা হত, তবে বক্তব্য অধিকতর স্পষ্ট হত।

বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলি বর্ণনার উদ্দেশ্য

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'কিতাবীদের এসব ঘটনা এই অর্থে শোনানো হচ্ছে যে, যদি তোমরা শেষ যমানার নবীর সহযোগিতা না কর, যেমন তোমাদের বাপ-দাদারা হযরত মূসা (আ)-এর সহযোগিতা ত্যাগ করেছিল এবং জেহাদ থেকে জান বাঁচিয়েছিল- তবে মনে রেখো! তোমাদের যেসব নেয়ামত দেওয়া হয়েছে তা অন্যের ভাগ্যে চলে যাবে।

উম্মতে মূসা (আ) বনাম উম্মতে মুহাম্মাদিয়া

বস্তুত হয়েও ছিল তাই। ক্ষণিকের জন্য বর্তমান পুরো রুকূর আলোচনা সামনে রেখে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন। তাদের উপর খোদার সেই নেয়ামতরাশি বর্ষিত হয়েছে যেগুলি পূর্বেও কোন উম্মতের উপর হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী পাঠিয়েছেন, তাদের মধ্যে এমন এমন আলেম ও ইমাম পয়দা করেছেন, যাঁরা নবী না হওয়া সত্ত্বেও নবীগণের দায়িত্ব ও মিশনকে অতি সুন্দর উপায়ে সম্পাদন করে গেছেন। নবী আলাইহিস সালামের পর এমন এমন খলীফা উম্মতের নেতা হয়েছেন, যারা সমগ্র পৃথিবীকে উত্তম চরিত্র, শাসন-নীতি ইত্যাদি শিক্ষা দিয়েছেন।

এই উম্মতকেও জেহাদের হুকুম দেওয়া হয়েছিল। শুধু আমালিকার বিরুদ্ধে নয়, বরং পৃথিবীর বুকে যত জাব্বার অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী–স্বৈরাচারী রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে। শুধু শামদেশ জয় করার জন্য নয় বরং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বত্র আল্লাহর আওয়াজ পৌঁছানোর এবং ফেতনা-ফাসাদের মূল উৎপাটনের জন্য। বনী ইসরাঈলের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা পবিত্র ভূমির ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু এই উম্মতের সঙ্গে কুরআনের ভাষায় নিম্নের ওয়াদা করলেন :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا . (نور:٥٥)

('তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আল্লাহ তাদের সঙ্গে এই ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করবেন, যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের রাজত্ব দান করেছিলেন এবং তাদের জন্য তাদের দীনকে সুদৃঢ় করে দেবেন, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে নিরাপত্তা দান করবেন।')

বনী ইসরাঈলকে যদি মূসা আলাইহিস সালাম জেহাদের ময়দানে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে নিষেধ করে থাকেন, তবে এই উম্মতকে লক্ষ করেও আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْأَدْبَارَ . (أنفال:١٥)

('হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের সম্মুখীন হও, তখন ওদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না।')

পরিণতি এই যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গী-সাথীরা তো সেই আমালিকার ভয়ে এতদূর পর্যন্ত বলে বসল- اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ 'আপনি ও আপনার প্রভু গিয়ে লড়াই করুন, আমরা এখানে বসে রইলাম।' কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বললেন, খোদার কসম, আপনি যদি আমাদের সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন, তবে আমরা তার মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্যে একজনও এর ব্যতিক্রম করবে না। আশা করি, আল্লাহ তাআলা আমাদের দিক থেকে

[রুকূ - ৫]

২৭. আপনি তাদের আদম (আ)-এর দু'পুত্রের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে পড়ে শোনান[১]- যখন	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ

আপনাকে এমন জিনিস দেখাবেন, যাতে আপনার চোখ শীতল হয়ে যাবে। আমরা স্বীয় পয়গম্বরের সাথী হয়ে তার ডানে, বামে, আগে ও পিছে-সর্বদিকে জেহাদ করব। আল্লাহর ফযলে আমরা ওদের মত নই, যারা মূসা আলাইহিস সালামকে বলে ফেলেছিল- اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ

এরই ফলে যতকাল ধরে বনী ইসরাঈল বিজয় থেকে বঞ্চিত হয়ে 'তীহ প্রান্তরে' উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরাফেরা করতে থাকে, তারও কম সময়ের মধ্যে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে দীন ও হেদায়েতের বিজয়-নিশান উড়িয়ে দেন। (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ، ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ)

১. অর্থাৎ আদম (আ) এর ঔরষজাত দুই পুত্র কাবীল ও হাবীলের কাহিনী তাদের শোনান। এই কাহিনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক ভাই আল্লাহর নিকট মকবূল এবং তার মধ্যে পরহেজগারী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ভাই হিংসা করে রাগে তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে ফেলে। তদুপরি এ অন্যায় হত্যার পরিণামের বর্ণনাও এ ঘটনায় রয়েছে।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

পূর্বের রুকুতে বলা হয়েছিল যে, বনী ইসরাঈলকে দুরন্ত ও অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হুকুম দেওয়া হলে ওরা ভয়ে পালাল। বর্তমান রুকূতে ভূমিকাস্বরূপ হাবীল ও কাবীলের ঘটনা শুনিয়ে সম্মুখে (আয়াত ৩২) বলা হচ্ছে যে, এই অভিশপ্ত বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় আল্লাহর মকবুল ও পরহেযগার বান্দাদের হত্যা করতে বরাবর সচেষ্ট ছিল। অথচ তা এক জঘন্যতম অপরাধ এবং ওদেরে কঠোরভাবে তা করতে নিষেধ করা হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও ওরা ওই অপরাধে খুবই তৎপর থেকেছে—পূর্বেও ওরা বহু নবী হত্যা করেছে, আর আজও আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বরের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষবশত বহুবিধ অভিসন্ধি আঁটছে। বস্তুত, জালেম ও দুষ্কৃতিকারীদের মোকাবেলা করতে পিছিয়ে থাকা এবং নিষ্পাপ মাসূম বান্দাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাদের বন্দী করার ষড়যন্ত্র করা ওদের চির অভ্যাস ও চরিত্র। তা সত্ত্বেও ওরা দাবি করে- نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ আমরা আল্লাহর পুত্র ও প্রিয়জন!!

এ আলোচনা অনুযায়ী, কাবীল ও হাবীলের ঘটনা, অতঃপর এরই ফলশ্রুতিতে প্রদত্ত বিধান অর্থাৎ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ الخ — এই সবকিছু মূলত ঐ বিষয়ের ভূমিকাস্বরূপ, যা সম্মুখে ৩২-৩৩নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে;

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ، إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ ...اِلٰى آخِرِ الْآيَةِ

قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ۖ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

তারা উভয়ে কিছু নযরানা পেশ করল এবং তাদের এক জনেরটি কবুল হল আর অন্য জনেরটা কবুল হল না[১]। সে (দ্বিতীয়জন) বলল, 'আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব[২]।' সে (প্রথমজন) বলল, 'আল্লাহ তো পরহেযগারদের থেকেই কবুল করেন[৩]।

لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَیَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِیْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ یَّدِیَ اِلَیْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّیْۤ

২৮. 'তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে নিজের হাত বাড়াও, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে আমার হাত বাড়াব না[৪]। আমি তো আল্লাহকে

---

১. ঘটনা এই যে, আদম আলাইহিস সালাম রীতি অনুসারে হাবীলের সঙ্গে যে কন্যাকে বিয়ে দিতে চাইলেন, কাবীল তার প্রার্থী হল। শেষপর্যন্ত হযরত আদমের ইশারায় উভয়ে খোদার জন্য কিছু নযরানা পেশ করল। কারণ, যার নযরানা কবুল হবে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হবে। খুব সম্ভব আদম আলাইহিস সালামের এই বিশ্বাস ছিল যে, হাবীলের নযরানাই কবুল হবে। বস্তুত হলও তাই। আসমানী আগুন আসল এবং হাবীলের নযরানা গ্রাস করে গেল। সে সময় এটিই আল্লাহর নিকট নযরানা কবুল হওয়ার আলামত ছিল।

২. হাবীলের নযরানাই কবুল হয়েছে দেখে কাবীল হিংসার আগুনে জ্বলতে লাগল। এবং আল্লাহর নিকট মকবূল (তথা প্রিয়) হওয়ার উপায় অবলম্বন করার পরিবর্তে রাগ ও ক্রোধে আপন ভাইকে হত্যার হুমকি দিতে শুরু করল।

৩. অর্থাৎ হাবীল বলল, এতে আমার কী দোষ? খোদার নিকট কারো জোর চলে না, বরং তাক্ওয়া দ্বারা কাজ হয়। অর্থাৎ তিনি ইঙ্গিত করলেন যে, আমার নযরানা কবুল হয়েছে তাক্ওয়ার কারণে। তুমিও যদি তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তবে (তোমার নযরানাও গৃহীত হবে), তোমার সঙ্গে আল্লাহর কোন বিদ্বেষ তো নেই।

৪. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) বলেন, 'কেউ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করতে উদ্যত হয় তবে তার জন্য জালেমকে হত্যা করার অনুমতি আছে। আর যদি ধৈর্য ধারণ করে তবে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করবে।'

তবে এ হুকুম নিজের মুসলমান ভাইয়ের মোকাবেলায়। নতুবা যে ক্ষেত্রে শরী'য়তের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিশোধ ও প্রতিরোধ করার মধ্যেই মঙ্গল, সেস্থলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা জায়েয নয়, যেমন কাফের ও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। এজন্যই ইরশাদ হয়েছে- وَالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُوْنَ (আর যারা এমন যে, তারা কখনো বিদ্রোহের সম্মুখীন হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। শূরা, আয়াত ৩৯)

اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ۝

ভয় করি, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক[১]।

اِنِّيْۤ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِيْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ۝

২৯. 'আমি চাই যে, তুমি আমার গোনাহ ও তোমার গোনাহ বহন করে নাও[২], অতঃপর জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আর এ-ই হচ্ছে জালেমদের শাস্তি[৩]।'

فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۝

৩০. অনন্তর ওর নফস ওকে নিজের ভাইকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকল,[৪] শেষ পর্যন্ত সে তাকে হত্যা করেই ফেলল, ফলে ও চরম ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল[৫]।

---

১. অর্থাৎ তোমার ভয়ে নয় বরং আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে আমি চাই যে, যতক্ষণ শরী'য়তের অবকাশ আছে, ভাইয়ের রক্তে আমার হাত রঙিন না করি।

(প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ) আইয়ুব সাখতিয়ানী (রা) বলতেন, 'উম্মতে মুহাম্মদিয়ার প্রথম ব্যক্তি, যিনি এ আয়াতের উপর আমল করে দেখিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন হযরত উছমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু। [ইবনে কাছীর] তিনি নিজের গলা পর্যন্ত কাটতে দিয়েছেন, কিন্তু নিজের ইচ্ছায় কোন মুসলমানের আঙুল পর্যন্ত কর্তিত হতে দেননি।

২. অর্থাৎ তুমি তোমার অন্যান্য গোনাহর সাথে আমাকে হত্যা করার গোনাহও কামাই করে নাও।

ইবনে জারীর (র) এ মর্মে মুফাস্সিরগণের ইজমা উদ্ধৃত করেছেন যে, بِاِثْمِيْ এর অর্থ এ-ই (অর্থাৎ, আমাকে হত্যার গোনাহ, 'আমার গেনাহ' নয়)। অবশ্য যারা লিখেছেন যে, কিয়ামতের দিন মজলুমদের গোনাহ জালেমদের উপর চাপানো হবে, তাদের এ কথাও সঠিক। তবে বিজ্ঞজনদের নিকট তা এ আয়াতের তাফসীর নয়।

এখন হাবীলের কথার সারার্থ এই দাঁড়াল যে, তুমি যদি এই প্রতিজ্ঞা করেই থাক যে, আমাকে হত্যা করে এই পাপের শাস্তি নিজের মাথায় তুলবে, তবে আমিও এই এরাদা করেছি যে, আমার দিক থেকে কোন প্রতিরোধ হবে না, যাতে আমাকে এই দোষারোপও না করা যায় যে, আমি 'আযীমতের' (আসল হুকুম) উপর আমল করিনি।

৩. অর্থাৎ তোমার সারা জীবনের গোনাহ তোমার উপর ঠিকই থাকুক, অধিকন্তু আমাকে হত্যা করার গোনাহ তোমার ঘাড়ে চাপুক, আর নির্যাতিত হওয়ার কারণে আমার গোনাহ নেমে যাক (মাফ হয়ে যাক)।

৪. সম্ভবত শুরুতে কিছুটা দ্বিধা হয়ে থাকবে। ক্রমান্বয়ে কুপ্রবৃত্তি ওর মনোভাবকে দৃঢ় করে তুলল। আর গোনাহর ইচ্ছা যখন জাগে, তখন শুরুতে সাধারণত এমনই হয়ে থাকে।

৫. পার্থিব ক্ষতি তো এই যে, সে এমন ভাইকে হারাল যে ওর হাতকে শক্তিশালী করত, এবং অবশেষে সে নিজে পাগল হয়ে মরল। হাদীস শরীফে আছে, 'জুলুম' ও 'রক্তের সম্পর্ক ছেদ

৩১. অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যে মাটি খুঁড়ছিল– ওকে এটা দেখানোর জন্য যে, সে তার ভাইয়ের লাশ কীভাবে গোপন করবে। সে বলল, 'হায় আফসোস! আমি কি এই কাকটির মতও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করতে পারি[১]?' অবশেষে ও অনুতপ্ত হল[২]।

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبۡحَثُ فِى الۡاَرۡضِ لِيُرِيَهٗ كَيۡفَ يُوَارِىۡ سَوۡءَةَ اَخِيۡهِ‌ؕ قَالَ يٰوَيۡلَتٰٓى اَعَجَزۡتُ اَنۡ اَكُوۡنَ مِثۡلَ هٰذَا الۡغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوۡءَةَ اَخِىۡ‌ۚ فَاَصۡبَحَ مِنَ النّٰدِمِيۡنَ ۛۚ

৩২. এ কারণেই, আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিলাম[৩]— যে কেউ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করল, অন্য কাউকে হত্যা অথবা যমীনে

مِنۡ اَجۡلِ ذٰلِكَ ۛۚ كَتَبۡنَا عَلٰى بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ اَنَّهٗ مَنۡ قَتَلَ نَفۡسًۢا بِغَيۡرِ

করা' এমনি দুটি পাপ, যেগুলোর শাস্তি পরকালের পূর্বে দুনিয়াতেও হয়ে থাকে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৬৬; জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৬৭৯) —আর পরকালীন ক্ষতি এই যে, জুলুম, রক্তসম্পর্ক ছেদন, ইচ্ছাজনিত হত্যা এবং অনিরাপত্তার দ্বার খুলে দেওয়ার কারণে কাবীল এই সব পাপের শাস্তির যোগ্য হল এবং ভবিষ্যতেও দুনিয়াতে এ ধরণের যত পাপ হতে থাকবে, স্থপতি হিসাবে সে এসব পাপের অংশীদার হবে। হাদীসে এ কথার পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৩৩৫)

১. যেহেতু ইতিপূর্বে কোন মানুষ মরেনি, সেহেতু ভাইকে হত্যা করার পর তার লাশকে কী করবে তা সে বুঝে উঠতে পারছিল না। এমন সময় সে দেখে কি, একটা কাক মাটি খুঁড়ছে অথবা দেখল, অন্য একটি মরা কাককে মাটি চাপা দিচ্ছে। এটা দেখে কিছুটা বুদ্ধি এল যে, আমিও নিজ ভাইয়ের লাশ দাফন করে দিই। আর এই ভেবে আক্ষেপও হল যে, আকল-বুদ্ধি ও ভাইয়ের প্রতি সমবেদনায় এ জন্তুটার চেয়েও আমি নিকৃষ্ট। সম্ভবত এ জন্যই আল্লাহ তাআলা একটা সামান্য জন্তুর দ্বারা তাকে সতর্ক করলেন, যাতে স্বীয় পাশবিকতা ও নির্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করে কিছুটা লজ্জিত হয়।

জীব-জন্তুর মধ্যে কাকের বৈশিষ্ট্য এই যে, সে স্বজাতির কারো লাশ উন্মুক্ত দেখলে উচ্চ রবে চেচামেচি শুরু করে।

২. সেই অনুতাপই লাভজনক, যার সাথে থাকে— গোনাহ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা, বিনয়, চিন্তা-ফিকির ও সংশোধনের মনোভাব। এ ক্ষেত্রে কাবীলের অনুতাপ আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে নয়, বরং ভাইয়ের হত্যাজনিত দুরবস্থার কারণে ছিল।

৩. অর্থাৎ অন্যায় হত্যার মধ্যে পার্থিব ও পারলৌকিক যে ক্ষতি রয়েছে এবং এতে যেসব কুফল অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়, এমনকি স্বয়ং হত্যাকারীও এই কর্মের পর অনেক সময় অনুতাপ করে এবং আক্ষেপে হাত কচলাতে থাকে- এসব কারণেই আমি বনী ইসরাঈলকে উক্ত হেদায়েত দান করলাম।

نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ۝

বিপর্যয় সৃষ্টি করার অপরাধ ছাড়া[১], সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে ফেলল। আর যে ব্যক্তি একটি প্রাণ রক্ষা করল, সে যেন সকল মানুষকে রক্ষা করল[২]। 'আর নিশ্চয়ই তাদের নিকট আমার রাসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশাবলি নিয়ে এসেছিলেন[৩]। কিন্তু তার পরও তাদের অনেকে যমীনে সীমালঙ্ঘন করে বেড়ায়[৪]।

---

১. যমীনের বুকে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার অনেক উপায় আছে, যেমনঃ সত্যপন্থীদের সত্যধর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখা, অথবা পয়গম্বরদের অমর্যাদা করা, অথবা (আল্লাহর পানাহ) মুরতাদ (ধর্মান্তরিত) হয়ে নিজের এই গর্হিত কর্ম দ্বারা অন্যদের ধর্মত্যাগে (মুরতাদ হতে) প্ররোচিত করা ইত্যাদি।

২. অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম বড় পাপ এই হল যে, কাবীল হাবীলকে হত্যা করল। এর পর মানবহত্যার ধারা চালু হয়। এ কারণেই তাওরাতে বলা হয়েছে, 'একজনকে হত্যা করে যেন সকলকে হত্যা করল' অর্থাৎ একজন অন্যায়ভাবে হত্যা করার ফলে অন্যরাও এ পাপের দুঃসাহস করে। অতএব এ হিসাবে, যে ব্যক্তি একজনকে হত্যা করে অনিরাপত্তার বীজ বপন করে, সে যেন সকল মানুষের হত্যা ও অনিরাপত্তার দ্বার খুলে দেয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন একজনকে রক্ষা করে, অর্থাৎ কোন জালেম হত্যাকারীর হত্যা থেকে বাঁচিয়ে দেয়, সে যেন স্বীয় কর্মের দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচানোর ও নিরাপদ করার আহ্বান জানায়।

৩. মুতারজিম (র) بينات এর অর্থ করেছেন 'সুস্পষ্ট নির্দেশাবলি'। তবে بينات এর অর্থ 'সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি' করা যায়। অর্থাৎ সেইসব নিদর্শনাবলি (তথা মু'জেযাত) যেগুলির দ্বারা কোন পয়গম্বরের সত্যতা প্রমাণিত হয় যে, তিনি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত।

৪. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের অনেকে এমনসব সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখে এবং এমন সুস্পষ্ট নির্দেশের কথা শুনেও নিজেদের অন্যায়, অবাধ্যতা ও বাড়াবাড়ি থেকে বিরত হয়নি। মাসূম নবীদের হত্যা করা এবং পরস্পরের মধ্যে অন্যায় হত্যা করা ওদের চিরাচরিত অভ্যাস। এবং আজও শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (আল্লাহর পানাহ!) হত্যা করার বা কষ্ট দেওয়ার এবং মুসলমানদের অপদস্থ করার জন্য সব রকমের কুচক্র ও ষড়যন্ত্র করে চলেছে।

আর এতটুকুও বুঝতে পারছে না যে, তাওরাতের বিধান অনুযায়ী কোন একজন মানুষকে অন্যায়ভাবে মেরে ফেলা যখন এত বড় গোনাহ যে, একজনের হত্যাকারী যেন দুনিয়ার সমগ্র মানুষের হত্যাকারী—তখন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম মানুষকে এবং মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাধিক মকবূল ও পবিত্র জামাতকে হত্যা করা ও কষ্ট দিতে তৎপর থাকা এবং তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই ও মোকাবেলার জন্য কোমর বাঁধা খোদার নিকট কত গুরুতর গোনাহ হবে! খোদার রাসূলগণের সঙ্গে লড়াই করা তো স্বয়ং খোদার সঙ্গেই লড়াই করার নামান্তর।

إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيۡنَ يُحَارِبُوۡنَ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ وَيَسۡعَوۡنَ فِى الۡاَرۡضِ فَسَادًا اَنۡ يُّقَتَّلُوۡۤا اَوۡ يُصَلَّبُوۡۤا اَوۡ تُقَطَّعَ اَيۡدِيۡهِمۡ وَاَرۡجُلُهُمۡ مِّنۡ خِلَافٍ اَوۡ يُنۡفَوۡا مِنَ الۡاَرۡضِؕ ذٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡىٌ فِى الدُّنۡيَا وَلَهُمۡ فِى الۡاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ ۝٣٣

৩৩. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং ফাসাদ করার জন্য যমীনে দৌড়-ঝাপ করে বেড়ায়[১]— ওদের শাস্তি কেবল এই যে, ওদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে ওদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে[২] অথবা দেশ থেকে ওদের নির্বাসিত করা হবে[৩]। এটা দুনিয়াতে ওদের লাঞ্ছনা, আর আখেরাতে ওদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি[৪]।

اِلَّا الَّذِيۡنَ تَابُوۡا مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ تَقۡدِرُوۡا

৩৪. তবে যারা তওবা করে নেবে তোমরা তাদের পাকড়াও করার পূর্বে– তো জেনে রাখ,

---

সম্ভবত এ জন্যই সামনের আয়াতে সেই লোকদের ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে, যারা আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে লড়াই করে অথবা দুনিয়ার মধ্যে নানা রকম ফেতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে مُسْرِفُوْنَ فِي الْأَرْضِ ('পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী) সাব্যস্ত হয়।'

১. অর্থাৎ অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য দৌড়-ঝাপ করে। অধিকাংশ মুফাসসির এর অর্থ 'রাহাজানি' ও 'ডাকাতি' করেছেন। কিন্তু يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا –এ শব্দাবলিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে বিষয়বস্তু অধিকতর প্রশস্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে আয়াতের যে শানে-নুযূল বর্ণিত হয়েছে, তারও দাবি হচ্ছে উক্ত শব্দাবলিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা । 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা' অথবা 'পৃথিবীতে ফাসাদ ও অশান্তি ছড়ানো'—এ দুটি কথা এমন যে, কাফেরদের আক্রমণ, ধর্মত্যাগের ফেতনা, রাহাজানী, ডাকাতি, অন্যায় কতল ও লুটতরাজ, দুরভিসন্ধি, বিভ্রান্তিকর প্রোপাগাণ্ডা– সবই তার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আর এগুলোর প্রত্যেকটি অপরাধই এমন যে, এর অপরাধী সম্মুখবর্তী চারটা শাস্তির কোন না কোনটির উপযুক্ত সাব্যস্ত হয়।

২. অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা।

৩. অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে ওদের বন্দী করে রাখা হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এর মাযহাব তা-ই।

৪. ডাকাতদের চার রকম অবস্থা হতে পারে; (১) হত্যা করেছে, কিন্তু ধন-সম্পদ নেওয়ার সুযোগ হয়নি; (২) হত্যাও করেছে এবং সম্পদও নিয়ে গেছে; (৩) সম্পদ কেড়ে নিয়েছে কিন্তু হত্যা করেনি; (৪) ধন-সম্পদও নিতে পারেনি, হত্যাও করতে পারেনি, ইচ্ছা ও প্রস্তুতি নেওয়ার পরই গ্রেফতার হয়ে গেছে। প্রত্যেক অবস্থায় যথাক্রমে উল্লিখিত চার শাস্তির একটা দেওয়া হবে (যেমন : ১ম অবস্থায় শুধু হত্যা, আর ৪র্থ অবস্থায় নির্বাসিত করা হবে- অনুবাদক)।

عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

[রুকূ - ৬]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ

৩৫. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তাঁর পর্যন্ত (পৌছার) 'ওসীলা' অন্বেষণ কর[২] এবং তাঁর পথে জেহাদ কর, যাতে

---

১. ধৃত হওয়ার পূর্বে তওবা করে নিলে উল্লিখিত শাস্তিগুলো যা আল্লাহর হক হিসাবে আরোপিত—মাফ হয়ে যাবে, বান্দার হক মাফ হবে না। যেমন, কারো ধন-সম্পদ চুরি-ডাকাতি করে থাকলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হত্যা করে থাকলে কেসাস নেওয়া হবে। তবে সম্পদের মালিক বা নিহত ব্যক্তির ওলী ক্ষমা করে দেওয়ার অধিকার রাখে।

বি. দ্র. উক্ত শাস্তি ছাড়া অন্যান্য শাস্তি (حُدُود), যথা যিনার শাস্তি, মদ্যপানের শাস্তি, চুরির শাস্তি, ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার শাস্তি শুধু তওবার দ্বারা মাফ হয় না।

২. الوسيلة– এর অর্থ

হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, আবু ওয়ায়েল, হাসান (র) প্রমুখ পূর্ববর্তী মনীষীগণ وسيلة শব্দের তাফসীর করেছেন قربت (নৈকট্য) দ্বারা। অতএব ওসীলা অন্বেষণ করার অর্থ হবে আল্লাহর নৈকট্য ও মিলন সন্ধান করা। বিখ্যাত মুফাস্‌সির কাতাদাহ বলেন- تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه ("আল্লাহর নৈকট্য হাসিল কর তাঁর আনুগত্য ও পছন্দনীয় আমলের মাধ্যমে।") একই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নের আরবী কবিতায়–

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا ÷ وعاد التصافي بيننا والوسائل

('যখন নিন্দুকেরা অমনোযোগী হয়, আমরা প্রত্যাবর্তন করি আমাদের পরস্পরের সান্নিধ্যে, এবং আমাদের আবেগ-ভালবাসা ও নৈকট্য-মিলন আবার আবর্তিত হয়।')

আর হাদীসে (সহীহ মুসলিম, ৩৮৪) যে এসেছে, বেহেশতের মধ্যে 'ওসীলা' নামে অত্যন্ত মর্যাদাশালী একটি মনযিল রয়েছে, যা দুনিয়ার একজন মাত্র বান্দাই লাভ করবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আযানের পর আল্লাহ তাআলার নিকট আমার জন্য সেই স্থানটি লাভের দো'য়া করতে থাক'—বস্তুত সেই স্থানটির নামও 'ওসীলা' এ জন্য রাখা হয়েছে যে, বেহেশতের সকল মনযিলের মধ্যে তা-ই আল্লাহ তাআলার আরশের সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্যের স্থানসমূহের মধ্যে তা-ই সর্বোচ্চে অবস্থিত।

যা হোক, আয়াতের প্রথমাংশে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহকে ভয় করতে থাক। তবে এই ভয় এমন নয়, যেমন মানুষ সাপ-বিচ্ছু বা বাঘ-সিংহকে ভয় করে দূরে ভেগে যায়। বরং আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করা, যেন তাঁর সন্তুষ্টি ও দয়া থেকে দূরে সরে না যায়। এ জন্যই اتَّقُوا اللّٰهَ এর পর ইরশাদ হয়েছে- وَابْتَغُوٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ অর্থাৎ তাঁর অসন্তুষ্টি ও (রহমত থেকে)

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

তোমরা সফলকাম হও[১]।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৩৬. যারা কাফের, ওদের নিকট যদি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই থাকে এবং তার সাথে আরো সমপরিমাণ থাকে, যাতে ওরা কিয়ামত-দিবসের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুক্তিপণরূপে তা দিতে পারে— তবুও ওদের থেকে তা কবুল করা হবে না। আর ওদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি[২]।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ۫ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

৩৭. ওরা আগুন থেকে বের হয়ে যেতে চাইবে, কিন্তু তা থেকে মোটেই বের হতে পারবে না। আর ওদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি[৩]।

দূরবর্তিতা ও বিচ্ছেদকে ভয় করে তাঁর নৈকট্য ও মিলন লাভের চেষ্টা কর। আর জানা কথা, আমরা কোন কিছুর নিকটবর্তী তখনি হতে পারি, যখন সেখান পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা অতিক্রম করে ফেলি। এজন্য বলা হয়েছে : وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ 'তাঁর পথে মোজাহাদা কর'। অর্থাৎ এ পথের উপর চলার যথাসাধ্য চেষ্টা কর, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ যাতে তোমরা তাঁর নৈকট্য লাভে সফল হতে পার।

১. পূর্বের রকূর শেষের দিকে সেই সব লোকের পার্থিব ও পারলৌকিক শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীর বুকে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। বর্তমান রুকূতে মুসলমানদেরকে উক্ত শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, পাপিষ্ঠ ও হতভাগা লোকেরা যখন আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরা তখন অল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ হয়ে জেহাদ কর। ওরা যদি যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তবে তোমরা নিজেদের চেষ্টা ও সৎকর্মের মাধ্যমে নিরাপত্তা ও শান্তি স্থাপনের ফিকির কর।

২. আগের আয়াতে বলা হয়েছিল, মানুষ আল্লাহ তাআলাকে ভয় করলে, তাঁর নৈকট্য হাসিল করলে এবং তাঁর পথে জেহাদ করলেই কল্যাণ ও সাফল্যের আশা করতে পারে। এ আয়াতে সতর্ক করে দেওয়া হল যে, যারা আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে, ওরা যদি পরকালে নাজাতের উদ্দেশ্যে ভূপৃষ্ঠের সমগ্র ধনভাণ্ডার বরং তার চেয়ে বেশিও খরচ করে ফেলে এবং মুক্তিপণ দিয়ে আল্লাহর শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায় তবে তা সম্ভব হবে না। মোটকথা, আখেরাতের সাফল্য হাসিল হয় 'তাকওয়া', নৈকট্য সন্ধান ও আল্লাহর পথে জেহাদ করার দ্বারা, উৎকোচ ও মুক্তিপণের দ্বারা নয়।

৩. অনেক হাদীস থেকে প্রমাণিত, বহু সংখ্যক পাপী মুমিনকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দোযখে রাখার পর সেখান থেকে বের করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহ ও রহমতে তাদের বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। এ আয়াত সেই সব হাদীসের খেলাফ নয়। কারণ,

৩৮. পুরুষ চোর ও নারী চোর— তোমরা ওদের হাত কেটে ফেল[১] ওদের কৃতকর্মের শাস্তি দেওয়ার জন্য, আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কীকরণস্বরূপ★[২]। আর আল্লাহ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۳۸﴾

এখানে শুরু থেকে কাফেরদের অবস্থাই বর্ণিত হয়েছে, মুমিন সম্পর্কে আয়াতে কোন কথাই নেই।

১. অর্থাৎ প্রথমবার চুরি করলে ডান হাত কব্জি পর্যন্ত কেটে ফেল। এ বিষয়ের অন্যান্য বিস্তারিত আলোচনা ফেকাহ শাস্ত্রে রয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

পূর্ববর্তী রুকূতে ডাকাতি ইত্যাদির শাস্তি বর্ণিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত মাঝখানে কিছু জরুরী বিষয়ে মুমিনদের নসীহত করা হয়েছে। এখন পুনরায় আগের বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত করা হচ্ছে। অর্থাৎ পূর্বে ডাকাতির শাস্তি বর্ণিত হয়েছিল। এখন চুরির শাস্তি কী, তা বাতলানো হচ্ছে।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ওদের কৃতকর্মের বদলে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিস্বরূপ'।

২. অর্থাৎ চোরকে যে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তা চুরিকৃত মালের বিনিময় নয়; বরং এটা তার 'চুরি' কর্মের শাস্তি, যাতে সে এবং অন্য চোরেরা সতর্ক হয়ে যায়।

চুরির শাস্তির তাৎপর্য ও ভ্রান্তি-নিরসন

বলা বাহুল্য, যেখানেই এ শাস্তি-ব্যবস্থা জারী হয়, দু এক জনকে এ শাস্তি প্রদানের পর চুরির দ্বার নিশ্চিতভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমান কালে 'সভ্যতার' দাবিদাররা এ ধরনের শাস্তি ও দণ্ডকে বর্বরতা বলে আখ্যায়িত করে থাকে। কিন্তু এ ব্যক্তিদের নিকট চুরি করা যদি কোন 'সুশীল' কাজ না হয়, তবে জানা দরকার যে, তাদের 'সুশীল শাস্তি' এই অপরাধ দমনে মোটেই সফল না। যদি একটু 'বর্বরতা' সয়ে নেওয়ার ফলে বহু সংখ্যক চোরকে সভ্য বানানো সম্ভব হয়, তবে সভ্যতার ধ্বজাধারীদের এই ভেবে খুশী হওয়া উচিত যে, এতে সভ্যতা নির্মাণেই সহযোগিতা করা হচ্ছে।

তথাকথিত কোন কোন মুফাসসিরও (??) এই অপচেষ্টায় লিপ্ত যে, 'হাত কর্তন' এর শাস্তিকে চুরির চরম (বা শেষ) শাস্তি সাব্যস্ত করবে। তাতে এ কথা বলার অবকাশ তৈরি হবে যে, চুরি-কর্ম 'চরম পর্যায়ে' না পৌছলে চোরকে উক্ত 'চরম' শাস্তি না দিয়ে বরং তার চেয়ে হালকা শাস্তি দেয়ার অনুমতি শরীয়তে আছে!! কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে, চুরির উল্লিখিত শাস্তির চেয়ে হালকা শাস্তির কথা না কুরআন করীমের কোথাও উল্লেখ আছে, না নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে বা সাহাবীদের আমলে এর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি কি এ দাবি করতে পারবে যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যত চোর ধৃত হয়েছিল এবং হাত কর্তনের শাস্তি পেয়েছিল- ওদের কেউই প্রাথমিক পর্যায়ের চোর ছিল না? যদি থেকে থাকে, তবে ওকে হালকা কোন শাস্তি দেওয়া যেতে পারত। এমন একজনকেও

পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[১]।

৩৯. আর যে ব্যক্তি নিজ অন্যায়ের পর তওবা করে এবং (নিজেকে) সংশোধন করে, আল্লাহ নিশ্চয় তার তওবা কবুল করেন[২]। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

৪০. তুমি কি জান না যে, আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই? তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান[৩]।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

প্রাথমিক ও হালকা শাস্তি দেওয়া হলে এর বৈধতা প্রমাণিত হয়ে যেত। কিন্তু এর একটি উদাহরণও দেখানো যাবে না।

অতীতে কোন কোন 'মুলহিদ' (বে-দীন) চুরির উক্ত শাস্তির উপর এই আপত্তি উত্থাপন করেছিল যে, শরী'য়তের বিধান মতেই যেখানে একটি হাতের 'দিয়ত' (অর্থাৎ কারো হাত বিনষ্ট করে দেওয়ার বিনিময়) পাঁচ শত দিনার সাব্যস্ত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে পাঁচ-দশ টাকা চুরি করায় এমন মূল্যবান হাত কেমন করে কাটা যেতে পারে? একজন বিজ্ঞ আলেম এর উত্তরে যথার্থই বলেছেন-

إنّها لَمّا كانت أَمينةً كانت ثَمينة فلَمّا خانتْ هانتْ

'সে হাত যতক্ষণ বিশ্বস্ত ছিল তা মূল্যবান ছিল; যখন (চুরি করে) বিশ্বাসঘাতক হল তখন সস্তা হয়ে গেল।'

১. যেহেতু তিনি পরাক্রমশালী, তাই যে কোন বিধান প্রবর্তন করার অধিকার তাঁর আছে, কেউ কোনোরূপ আপত্তি করতে পারে না। কিন্তু যেহেতু তিনি হেকমতওয়ালাও বটে, সেহেতু শুধু নিজ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বলে কোন বিধান অহেতুক প্রবর্তন করবেন, সে সম্ভাবনাও নেই। অনুরূপ, তিনি নিজ অক্ষম বান্দাদের ধন-সম্পত্তির হেফাজতের কোন বন্দোবস্ত করবেন না, এও তাঁর মর্যাদা ও ক্ষমতার পরিপন্থী। আর চোর-ডাকাতদের এমনিই স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেবেন– এও তাঁর হেকমতের পরিপন্থী।

২. অর্থাৎ তওবা যদি ঠিক ঠিক হয়। আর তওবা সঠিক হওয়ার জন্য এও জরুরী যে, চুরির মাল মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে, মাল নষ্ট (বা ব্যয়) হয়ে গিয়ে থাকলে বিনিময় দেবে, বিনিময় না দিতে পারলে ক্ষমা করিয়ে নেবে। অধিকন্তু স্বীয় কার্যে অনুতপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে এ থেকে বিরত থাকার সংকল্প করতে হবে। এমন তওবা করলে (দুনিয়ার শাস্তি মাফ না হলেও) আশা করা যায়, খোদা তাআলা তাকে আখেরাতের সেই আযাব থেকে নিষ্কৃতি দান করবেন, যার মোকাবেলায় দুনিয়ার আযাব কিছুই নয়।

৩. যখন প্রকৃত রাজত্ব ও সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তখন নিঃসন্দেহে তাঁর এই ক্ষমতা আছে যে, যাকে তিনি সমীচীন মনে করবেন ক্ষমা করে দেবেন এবং যাকে নিজ হেকমত ও সুবিচার অনুযায়ী

৪১. হে রাসূল! আপনি যেন তাদের কারণে দুঃখ না পান, যারা দ্রুতগতিতে কুফরীর মধ্যে গিয়ে পড়ে[১] অর্থাৎ যারা মুখে বলে, 'আমরা

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا

শাস্তি দিতে চাইবেন শাস্তি দেবেন। আর তাঁর ক্ষমা করার ও শাস্তি দেওয়ার সর্বময় ক্ষমতা রয়েছে শুধু তাই নয়, বরং এই ক্ষমতা ব্যবহারে তাঁকে বাধা দেওয়ারও কেউ নেই। কেননা, প্রত্যেক বিষয়ে তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে চুরি, ডাকাতি, ইত্যাদির শাস্তি বর্ণিত হয়েছিল। এখন এমন কিছু লোকদের অবস্থা বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহর শাস্তি-বিধানের মধ্যে বিকৃতি সাধন করে নিজেদের গুরুতর শাস্তির যোগ্য করেছে।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম বাগাবী (র) ওদের বিস্তারিত ঘটনা সম্পর্কে লেখেন (তাফসীরে বাগাবী ২/৩৭-৩৮):

খায়বার নামক স্থানে এক বিবাহিত ইহুদী পুরুষ ও মেয়ে ব্যভিচার করে। ওদের তাওরাতে এ অপরাধের শাস্তি রজম (বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু) নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও এই শাস্তি প্রয়োগে উভয়ের আভিজাত্য বাধার কারণ হয়। ফলে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল যে, 'ইয়াছরেব' অর্থাৎ মদীনাবাসী ঐ ব্যক্তি (অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ধর্মগ্রন্থে ব্যভিচারীর জন্য রজমের স্থলে বেত্রাঘাতের বিধান রয়েছে। অতএব তাঁর প্রতিবেশী ও তাঁর সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ 'বনী কুরায়জা' নামক ইহুদী সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তিকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে তাঁর অভিমত জানা হোক। সে মত একদল লোককে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই বলে পাঠাল যে, আপনার নিকট বিবাহিত লোকের ব্যভিচারের শাস্তি কী? তিনি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিলে তা গ্রহণ করো, আর রজমের বিধান দিলে তা গ্রহণ করবে না।

ওদের জিজ্ঞাসার উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি আমার বিচারে সম্মত হবে? ওরা স্বীকার করল। তখন আল্লাহর তরফ থেকে জিবরাঈল (আ) রজমের বিধান নিয়ে এলেন। কিন্তু ওরা নিজেদের স্বীকৃতি থেকে ফিরে গেল। অবশেষে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফদকের বাসিন্দা ইবনে সুরিয়া তোমাদের মধ্যে কেমন ব্যক্তি? সকলে বলল, বর্তমানে পৃথিবীর বুকে হযরত মূসা (আ)-এর শরী'য়ত সম্পর্কে তার চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ নেই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকালেন এবং অত্যন্ত কঠোর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাওরাতের মধ্যে এই পাপের শাস্তি কী? যদিও অন্যান্য ইহুদী এই বিধান লুকানোর সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করছিল, তবুও ওদের সকলের মান্যবর বিশ্বস্ত ইবনে সুরিয়া কোন না কোন কারণে স্বীকার করে ফেলল যে, তাওরাতে উক্ত পাপের শাস্তি অবশ্যই রজম উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া সে এ কথাও প্রকাশ করে দিল, কীভাবে ইহুদীরা ব্যভিচারের শাস্তি রজমের স্থলে ব্যভিচারীকে চাবুক মারা এবং মুখে কালি মেখে গাধার উপর উলটামুখ করে বসিয়ে ঘুরানো সাব্যস্ত করেছে।

ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ

ঈমান এনেছি', অথচ ওদের অন্তর মুমিন নয় এবং যারা ইহুদী[১]। (ওরা) মিথ্যা বলার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করে, (ওরা) অন্য দলের গুপ্তচর✯ যারা আপনার নিকট আসেনি[২]। ওরা (আল্লাহর) বাক্যাবলি যথাস্থান থেকে সরিয়ে ফেলে[৩]; ওরা বলে, 'যদি তোমাদের এই নির্দেশ প্রদান করা হয় তবে তা গ্রহণ করবে, আর যদি এই নির্দেশ না দেওয়া হয় তবে বিরত থাকবে[৪]। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, আপনি তার জন্য আল্লাহর মোকাবেলায় কিছুই করার ক্ষমতা

মোটকথা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দুই নর-নারীর প্রতি রজম তথা প্রস্তরাঘাতের শাস্তি জারী করলেন এবং বললেন, 'আয় আল্লাহ! তোমার বিধানকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার পর আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে দুনিয়াতে তা পুনর্জীবিত করল।'

১. অর্থাৎ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ – হচ্ছে মুনাফিক ও বনী কুরায়জা সম্প্রদায়ের ইহুদীরা।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ওরা খুব বেশী মিথ্যা শ্রবণকারী (ও তা গ্রহণকারী)। ওরা অন্য লোকদের কথা খুব বেশি শোনে (ও মানে)'।

২. سَمَّاعون এর অর্থ হচ্ছে বেশি শ্রবণকারী এবং যারা কান পেতে শোনে। এখন 'বেশি শোনা' বলতে কখনো গোয়েন্দাগিরি বোঝায় এবং কখনো এর উদ্দেশ্য হয় 'খুব বেশি গ্রহণ করা'। যেমন, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ এর মধ্যে سمع -এর অর্থ হচ্ছে গ্রহণ করা। মুতারজিম হযরত শায়খুল হিন্দ (র) এস্থলে প্রথম অর্থটি (গোয়েন্দাগিরি) নিয়েছেন।

কিন্তু ইবনে জারীর প্রমুখ তাফসীর বিশারদগণ দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন। সে মত سَمَّاعُوْنَ لِلْكَذِب এর অর্থ হচ্ছে, মিথ্যা ও বাতিলকে অতিমাত্রায় মান্যকারী ও গ্রহণকারী; سَمَّاعُوْنَ لِقَوْمٍ آخَرِيْنَ অর্থাৎ যে দ্বিতীয় দল ওদের পাঠিয়েছে, কিন্তু নিজেরা আপনার কাছে আসেনি, ওদের কথা খুব বেশি মান্যকারী।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আহকামের মধ্যে বিকৃতি সাধন করে; অথবা অর্থ হল, কোথাকার কথা কোথায় লাগিয়ে দেয় তার ঠিক নেই।

৪. অর্থাৎ যদি চাবুক মারার নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে কবুল করো; নতুবা কবুল করো না। এরা যেন আল্লাহ তাআলার শরীয়তকে নিজেদের প্রবৃত্তির অধীন করে রাখতে চাচ্ছিল।

রাখেন না[১]। ওরাই সেসব লোক, আল্লাহ যাদের অন্তর পবিত্র করতে চাননি[২]। ওদের

قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ

১. অর্থাৎ, হেদায়েত ও গোমরাহী, ভাল ও মন্দ কোন কিছুই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছাড়া অস্তিত্বে আসতে পারে না।

এ এমন একটি মৌলিক বিষয়, যা মেনে নেওয়া বরং সহজ; অস্বীকার করা খুবই কঠিন। ধরুন, এক ব্যক্তি চুরি করার ইচ্ছা করছে, কিন্তু খোদার ইচ্ছা এই যে, সে চুরি না করুক। এখন যদি সে নিজ ইচ্ছায় কৃতকার্য হয়, তবে বোঝা যাবে যে, খোদা তার মোকাবেলায় (মাআযাল্লাহ!) অক্ষম। আর যদি খোদার ইচ্ছাই বান্দার ইচ্ছার উপর জয়ী হতে থাকে, তবে বলতে হবে যে, দুনিয়াতে চুরি ইত্যাদি কোন মন্দেরই অস্তিত্ব থাকবে না। আর যদি আল্লাহ তাআলা ভাল ও মন্দ কোনটারই ইচ্ছা না করেন, তবে (মাআযাল্লাহ!) তাঁর নিষ্ক্রিয়তা, বা উদাসীনতা ও অজ্ঞতা প্রমাণিত হয়! অথচ আল্লাহ তাআলা সমস্ত ত্রুটি থেকে পাক-পবিত্র। এ সকল দিক বিবেচনা করলে এ কথা স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে, কোন কিছুই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না যতক্ষণ না আল্লাহ তা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন। (হেদায়েত ও গোমরাহীর বিষয়টিও এর ব্যতিক্রম নয়)।

এই বিষয়টি অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। আমাদের ইচ্ছা, এ ধরনের বিষয়াবলি সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা লিখে তাফসীরে সংযুক্ত করা। والله الموفق (আল্লাহই তাওফীক দাতা।)

২. প্রথমে মুনাফিক ও ইহুদীদের কর্মকাণ্ডের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এ কয়েকটি আমল বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে: (ক) সর্বদা মিথ্যা ও বাতিলের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, (খ) সত্যপন্থীদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করা, (গ) দুষ্ট প্রকৃতির ও দুষ্কৃতিকারী দলসমূহের সাহায্য করা, (ঘ) হেদায়েতের কথাসমূহ বিকৃত করে ফেলা, (ঙ) নিজেদের কামনা ও মর্যির খেলাফ কোন সত্যকে গ্রহণ না করা।

আল্লাহর পবিত্র করার ইচ্ছা না করা ওদেরই পাপের ফসল

যে জাতির এহেন চরিত্র, তার দৃষ্টান্ত ঐ রোগীর মত, যে ওষুধও ব্যবহার করে না, ক্ষতিকর ও মারাত্মক বস্তুও পরিহার করে না। উল্টা ডাক্তার ও চিকিৎসকদের প্রতি হাসি-ঠাট্টা করে, উপদেশদাতাদের গালি দেয়, ব্যবস্থাপত্র ছিঁড়ে ফেলে দেয় অথবা নিজ মতানুসারে এর অংশবিশেষ পরিবর্তন করে নেয় এবং সেই সাথে এই প্রতিজ্ঞাও করে বসে যে, যে ওষুধ তার ইচ্ছা ও রুচি বিরুদ্ধ হবে তা কখনো ব্যবহার করবে না।

এ অবস্থায় কোন ডাক্তার বা হেকিম, চাই তিনি তার পিতাই হোক না কেন, যদি তার চিকিৎসা না করে এই মনস্থ করে বসে যে, এমন রোগীর স্বীয় ভ্রান্ত-কর্ম, জিদ ও হঠকারিতার কষ্ট ভোগ করা উচিত, তবে এটা কি চিকিৎসকের নির্দয়তা ও উদাসীনতার পরিচায়ক হবে? না, বরং এক্ষেত্রে রোগীই দায়ী সাব্যস্ত হবে। সে নিজেই আত্মহননের পথ গ্রহণ করেছে। অতএব, এখন যদি রোগী এ রোগে মরে গেল, তবে চিকিৎসককে এই জন্য দোষ দেওয়া

فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾

জন্য দুনিয়াতে আছে লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে ওদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ

৪২. (ওরা) মিথ্যা বলার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করে, অতি বড় হারামখোর। অতএব ওরা যদি আপনার নিকট আসে, তবে ওদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন অথবা ওদের অগ্রাহ্য

যেতে পারে না যে, তিনি চিকিৎসা করলেন না। বরং এ রোগীরই দোষ যে, সে নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংস করেছে এবং নিজের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারকে সুযোগই দেয়নি।

অনুরূপ, এস্থলে ইহুদীদের পাপাচার, প্রবৃত্তি-পূজা, জিদ ও হঠকারিতা বয়ান করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন– وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ... الخ (যাকে আল্লাহ গোমরাহ করতে চান...), এবং اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ (এরাই তারা, যাদের অন্তর আল্লাহ তাআলা পবিত্র করতে চাননি)— এর তাৎপর্য এই-ই যে, খোদা ওদেরই অযোগ্যতা ও কুকর্মসমূহের কারণে ওদের উপর থেকে নিজ রহমত ও কৃপাদৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছেন। অতঃপর ওদের আর পথ পাওয়া ও সত্য গ্রহণের কোনই আশা রয়নি। (অতএব হে রাসূল!) আপনি ওদের চিন্তায় নিজেকে কষ্ট দেবেন না।

একটি প্রশ্নের উত্তর

তবে এস্থলে সন্দেহ হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তো ইচ্ছা করলে ওদের সকল দুষ্কৃতি ও ভ্রান্তি বলপূর্বক রোধ করতে পারতেন এবং ওদের জিদ ও হঠকারিতার পথও একেবারে বন্ধ করে দিতে পারতেন। তা কেন করলেন না?

এর জওয়াব এই যে, খোদায়ী শক্তির কাছে অবশ্যই তা কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না- وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا (তিনি ইচ্ছা করলে পৃথিবীর সকল মানুষই ঈমান এনে ফেলত), কিন্তু এই দুনিয়ার গোটা ব্যবস্থাপনাই এমন রাখা হয়েছে যে, ভাল বা মন্দ অর্জনের ব্যাপারে বান্দাদের বাধ্য করা হয়নি। সুপথ অবলম্বনে সকলকে বাধ্য করা হলে জগত সৃষ্টির হেকমত ও তাৎপর্য (যার অন্যতম- বান্দাদের পরীক্ষা করা) পূর্ণ হত না এবং আল্লাহ তাআলার এমন অনেক গুণ থেকে যেত, যা প্রকাশের ক্ষেত্র পেত না। যেমনঃ আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল, প্রতিশোধ গ্রহণকারী, কঠোর পাকড়াওকারী, সুবিচার প্রতিষ্ঠাতা, বিচার দিনের মালিক ইত্যাদি। অথচ জগত সৃষ্টির বিশেষ উদ্দেশ্যই হল, তাঁর সকল গুণের পূর্ণতম বিকাশ হওয়া। আল্লাহ তাআলাকে একচ্ছত্র কর্তা বলে স্বীকার করে এমন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশ্বসৃষ্টির এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য বলতে পারেনি। খোদ কুরআনেও রয়েছে– لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম- সূরা মুলক, আয়াত ২)।

কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে অধিকতর আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। বরং এতটুকুও আমাদের মূল উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয় থেকে অতিরিক্ত হয়ে গেছে।

يَضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ۚ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٤٢﴾

করবেন[১]। আপনি যদি ওদের অগ্রাহ্য করেন, তবে ওরা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি ফয়সালা করেন, তবে ওদের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন[২]।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. ওরা কীভাবে আপনাকে ফয়সালাকারী বানায়, অথচ ওদের নিকট তো রয়েছে তাওরাত যার মধ্যে আছে আল্লাহর বিধান, তার পর মুখ ফিরিয়ে নেয়? আর ওরা আদৌ ঈমানদার নয়[৩]।

---

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র), ইকরিমা (র) প্রমুখ সর্বজনমান্য বিশিষ্ট মুফাস্‌সিরগণ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইখতিয়ার ছিল। পরবর্তীতে যখন ইসলামের শক্তি ও অনুশাসন পূর্ণতম রূপ নিল, তখন (আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে) ইরশাদ হল– وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ –শরী'য়তের কানুন অনুসারে তাদের বিবাদ-বিসংবাদের বিচার-মীমাংসা করে দিন। অর্থাৎ মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ও পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

২. কোন ব্যক্তি যতই দুষ্কৃতিকারী, অত্যাচারী ও বদমাশ হোক না কেন, তার প্রতিও অবিচারের ছিটে-ফোঁটাও যেন আপনার (হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ন্যায়- বিচারের আঁচলে না লাগে। এ বিষয়ে কুরআন কারীম বারবার অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই ন্যায়বিচারই সেই রত্ন, যার গুণে আকাশ ও পৃথিবীর নেজাম (ব্যবস্থাপনা) কায়েম বা অটুট থাকতে পারে।

৩. অর্থাৎ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আপনাকে এরা বিচারক সাব্যস্ত করছে, অথচ যে তাওরাতকে আসমানী কিতাব বলে মানছে তার ফয়সালার উপরও এরা সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে কুরআন বা তাওরাত কোনটিরই উপর এদের ঈমান নেই।

সম্মুখের রুকুতে তাওরাত ও ইনজীলের প্রশংসাপূর্বক সতর্ক করা হয়েছে যে, কত উত্তম কিতাব ও হেদায়েতের আলো হওয়া সত্ত্বেও এই না-লায়েকরা সেগুলির এমনি অমর্যাদা করেছে এবং এমনভাবে বিনষ্ট করেছে যে, বর্তমানে মূল কিতাবের সন্ধান পাওয়াই অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

শেষপর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার রহমতে এমন কিতাব প্রেরণ করেছেন, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মৌলিক বিষয়াবলির সংরক্ষক ও সমর্থনকারী এবং যার অনন্তকালব্যাপী হেফাজতের ব্যবস্থা স্বয়ং প্রেরণকারী নিজ দায়িত্বে নিয়েছেন। فلله الحمد والمنة

[রুকূ - ৭]

৪৪. নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করেছি, যার মধ্যে রয়েছে হেদায়েত ও আলো[১]। সে অনুসারেই ইহুদীদের জন্য ফয়সালা করতেন নবীগণ, যারা ছিলেন (আল্লাহর) পূর্ণ অনুগত এবং (ফয়সালা করতেন) আল্লাহ-ওয়ালা ও আলেমগণ[২]। কেননা, তাদের আল্লাহর কিতাবকে সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তারা ছিলেন তার তত্ত্বাবধায়ক[৩]। অতএব তোমরা মানুষকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতগুলির বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না[৪]। আর যারা

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছতে যারা সচেষ্ট, তাদের জন্য তাওরাত হেদায়েত তথা পথের দিশারী। আর যারা দ্বিধা-সন্দেহ বা সমস্যা-জটিলতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, তাদের জন্য আলোদানকারী।

২. অর্থাৎ তাওরাতের মধ্যে এমন সুন্দর ও অমূল্য কর্মপন্থা ও হেদায়েতের আইন-কানুন ছিল যে, বহু সংখ্যক পয়গম্বর, আল্লাহওয়ালা ও আলেম সেই অনুসারেই হুকুম দিতেন এবং ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করতেন।

৩. অর্থাৎ তাওরাতের হেফাজতের যিম্মাদার তাদের বানানো হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা انا له لحافظون আয়াতে (সূরা হিযর : ৯) কুরআনে কারীমের হেফাজতের যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাওরাতের হেফাজতের এই রকম ওয়াদা তিনি করেননি। সে মত ইহুদী আলেম ও আহবার যতদিন নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, ততদিন তাওরাতের হেফাজত এবং সেই অনুসারে আমল হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত দুনিয়াপূজারী মন্দ আলেমদের হাতে তাওরাত বিকৃত হয়ে নষ্ট হয়ে গেল।

৪. অর্থাৎ মানুষের ভয়ে বা দুনিয়ার লোভে আসমানী কিতাবে পরিবর্তন ও বিকৃতি করো না, এর হুকুম-আহকাম ও খবর-বার্তা গোপন করো না। আল্লাহ তাআলার শাস্তি ও প্রতিশোধকে ভয় করে চলো।

এই সম্বোধন হয় ইহুদী আলেম ও সেই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রতি, যারা পবিত্র কুরআন অবতরণের সময় বর্তমান ছিল। কেননা, তারা রজম বা প্রস্তরাঘাতের বিধানকে অস্বীকার করেছিল এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ গোপন করত এবং তার অর্থে আশ্চর্য রকমের হেরফের করত। অথবা এখানে মুসলমানদের সম্বোধন করে নসীহত করা হচ্ছে যে, তোমরা অন্যান্য জাতির মত কারো ভয়ে অথবা ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মোহে পড়ে নিজেদের আসমানী কিতাবকে বিনষ্ট করো না। সে মত এই উম্মত (আলহামদুলিল্লাহ!) নিজেদের কিতাবের

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ۝

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা না করে, তারাই কাফের[১]।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ۝

৪৫. আর আমি ওদের প্রতি তাওরাতে লিখে দিয়েছিলাম— 'প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলা অনুরূপ যখম'☆[২]। তবে যে তা ক্ষমা করে দেবে (অর্থাৎ কেসাস না নেবে), তা তার জন্য কাফ্ফারা (পাপ মোচনকারী) হয়ে যাবে[৩]। আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে বিচার না করে, তারাই জালেম[৪]।

একটি হরফেরও হেরফের করেনি। তদুপরি তারা আজ পর্যন্ত এই কিতাবকে বিধর্মীদের হাতে কোন পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন থেকে রক্ষা করতে কৃতকার্য হয়েছে ও সর্বদা হবে।

১. 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে ফয়সালা না করার' অর্থ সম্ভবত এই যে, আল্লাহ তাআলার দেওয়া বিধানকে অস্বীকার করে সেস্থলে নিজ রায় ও মর্জি মোতাবেক অন্য বিধান রচনা করে নেওয়া, যেমন ইহুদীরা রজমের বিধান সম্পর্কে করেছিল।যারা এটা করবে তাদের কাফের হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকে না। আর যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে, আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত বিধানকে ঈমানগত দিক থেকে মানা সত্ত্বেও কার্যত অন্যথা করে, তবে কাফের অর্থ 'আমলী কাফের' বা কার্যগত কাফের– অর্থাৎ তার কার্যক্রম কাফেরদের মত।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যখমের ক্ষেত্রেও কেসাস (এর বিধান) প্রযোজ্য'।

২. মূসা (আ)-এর শরী'য়তে কেসাসের এই বিধান ছিল।— উসূলে ফিকহের বিশেষজ্ঞ বহু আলেম পরিষ্কার বলেছেন যে, পবিত্র কুরআন বা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী শরী'য়তসমূহের যেসব বিধান বর্ণনা করেছেন এবং কোথাও সেগুলি নাকচ বা সংস্কার করেননি, সেসব এই উম্মতের পক্ষেও পালনীয় হবে। মোটকথা, খণ্ডন ও সংস্কার ছাড়া সেগুলো শোনানোর অর্থই হচ্ছে, বিধানগুলি আমাদের পক্ষেও অনুসরনীয় ও গ্রহণীয়।

৩. অর্থাৎ যখমসমূহের কেসাস মাফ করে দেওয়ার দ্বারা আহত ব্যক্তির গোনাহর কাফফারা হয়ে যাবে। কোন কোন হাদীসে এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২২৭০১) আর কোন কোন মুফাসসির আয়াতটি আঘাতকারী ব্যক্তির পক্ষে রেখেছেন। অর্থাৎ আহত ব্যক্তি আঘাতকারীকে মাফ করে দিলে তার (আঘাতকারীর) গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। তবে প্রথমোক্ত তাফসীরই অগ্রগণ্য।

৪. ইহুদীরা কেসাসের বিধানেরও মোকাবেলায় নতুন রীতি চালু করেছিল– ওদের মধ্যে অধিকতর সম্মানী ও শক্তিশালী বনী নযীর সম্প্রদায় বনী কুরাইজা থেকে পূর্ণ দিয়ত

৪৬. আমি তাঁদের পরে ঈসা ইবনে মারয়ামকে পাঠিয়েছি[১] তাঁর পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং তাঁকে ইনজীল দিয়েছি, যার মধ্যে ছিল হেদায়েত ও আলো এবং যা ছিল তার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সমর্থনকারী এবং পরহেযগারদের জন্য পথপ্রদর্শক ও উপদেশ[২]।

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۪ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

(মুক্তিপণ) গ্রহণ করত আর নিজেদের দেওয়ার পালা এলে অর্ধেক দিয়ত প্রদান করত। বনী কুরাইজা নিজেদের দুর্বলতার কারণে ওদের সঙ্গে এ ধরনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিল।

ঘটনাক্রমে বনী কুরাইজার হাতে বনী নযীরের এক ব্যক্তি নিহত হয়। বনী নযীর পূর্ব রীতি অনুসারে ওদের নিকট পূর্ণ দিয়ত দাবি করলে বনী কুরাইজা উত্তর দিল, 'যাও, সেই দিন আর নেই। তখন তো তোমাদের ক্ষমতার বলে অপারক হয়ে আমরা তোমাদের জুলুম মেনে নিয়েছিলাম। এখন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় আগমন করেছেন। এখন তাঁর শাসনকাল। এ আর সম্ভব নয় যে, আমরা তোমাদের নিকট থেকে যে দিয়ত নিয়ে থাকি, তার দ্বিগুণ আমাদের থেকে তোমরা আদায় করবে।' (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২২১২) এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই ছিল যে, জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর বর্তমানে সবলের হাতে দুর্বল নিষ্পেষিত হবে– এ একেবারেই অসম্ভব। কেননা, সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি দুর্বল ও সবল– প্রত্যেকের সঙ্গে একই সুবিচার করে থাকেন এবং সবলদের জুলুম-অত্যাচারের মোকাবেলায় দুর্বলদের সাহায্য করেন।

শেষ পর্যন্ত মুকাদ্দমা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করা হল এবং তাঁর সুবিচার ও ইনসাফ সম্পর্কে বনী কুরাইজা যে ধারণা প্রকাশ করেছিল, তা সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হল।

কেসাসের বিধান বর্ণনার পর وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ الخ আয়াতে উক্ত ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। আর যেহেতু ওরা রজমের মত কেসাসকে শরী'য়তের বিধান হিসাবে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেনি বরং পরস্পর সমঝোতার মাধ্যমে শরী'য়তের বিধানের খেলাফ একটি রীতি চালু করেছিল মাত্র, সেহেতু এটা বিচারবিভাগীয় বিধানের বিশ্বাসগত নয়, বরং কর্মগত বিরোধিতা হল। তাই এ ক্ষেত্রে كافرون এর স্থলে ظالمون বলা হয়েছে। অর্থাৎ সবল থেকে কম এবং দুর্বল থেকে বেশি দিয়ত নেওয়া সুস্পষ্ট জুলুম।

১. অর্থাৎ তিনিও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতেন।

২. হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজ মুখে তাওরাতের সমর্থন করতেন এবং তাঁকে যে কিতাব দেওয়া হয়েছিল সেই ইনজীলও তাওরাতের সমর্থন করত। আর পথের দিশারী ও আলো হওয়ার দিক থেকে ইনজীলও তাওরাতের ন্যায় ছিল। হুকুম-আহকাম ও শরী'য়তের বিধি-বিধানের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম ছিল, যেমন- وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي

৪৭. সুতরাং ইনজীলধারীরা যেন আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে ফয়সালা করে। আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে বিচার করে না, তারাই নাফরমান[১]।

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۭ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

৪৮. আর আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব নাযিল করেছি তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ও সেগুলির (বিষয়বস্তুর) সংরক্ষকরূপে[২]। অতএব আপনি তাদের মাঝে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ আয়াতে (আলে ইমরান : ৫০) ইশারা করা হয়েছে। আর এ পার্থক্য তাওরাতের সমর্থনের পরিপন্থী নয়। যেমন: বর্তমানে কুরআনকে মান্য করা এবং শুধু এরই বিধানকে স্বীকার করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার রহমতে আমরা সকল আসমানী কিতাবকে (মূলের হিসাবে) আল্লাহ তাআলারই প্রেরিত বলে বিশ্বাস করি।

১. وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ.. – (আমাদের যুগের খ্রিস্টানদের নয়, বরং) ইনজীল নাযিল হওয়ার সময় যেসব খ্রিস্টান বর্তমান ছিল, তাদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তাই এখানে নকল করা হচ্ছে। অথবা এমনও হতে পারে যে, কুরআন অবতরণকালের খ্রিস্টানদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, ইনজীলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে ঠিক ঠিক ফয়সালা করবে। অর্থাৎ ইনজীলের মধ্যে শেষ যুগের নবী ও পবিত্র পারাক্লিত (ইবরানী ভাষায় 'মুহাম্মদ' রাসূলুল্লাহর নাম, যার আরবী তরজমা 'আহমাদ') সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ) এর মুখে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, সেগুলি গোপন করার অথবা বাজে, অর্থহীন ও চাতুর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা বিকৃত করার প্রচেষ্টা করবে না। যে মহান পথপ্রদর্শক ও মহাসংস্কারক সম্পর্কে হযরত মাসীহ বলেছেন, 'যখন সেই সত্য আত্মা আগমন করবেন তখন তিনি তোমাদের সত্যের সরল পথ বলে দেবেন'–তাঁকে অস্বীকার করার মাধ্যমে চিরতরে নিজেদের ধ্বংস সাধন করার পথ বেছে নেওয়া আল্লাহ তাআলার চরম অবাধ্যতা ছাড়া আর কী? পবিত্র মাসীহ ও তাঁর মহাপ্রভুর আনুগত্যের অর্থ কি এই?

২. مهيمن শব্দটির একাধিক অর্থ বর্ণিত হয়েছে– امين (আমানতদার), غالب (প্রবল), حاكم (বিচারক বা শাসক), مُحافظ (হেফাজতকারী) ও نگهبان (তত্ত্বাবধায়ক)। আর এই প্রত্যেকটি অর্থের দিক থেকেই কুরআন কারীম পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের জন্য مهيمن। আল্লাহ তাআলার যে আমানত তাওরাত, ইনজীল, ইত্যাদি আসমানী কিতাবে গচ্ছিত ছিল, তা আরো বেশি বিষয়সহ কুরআন করীমে রক্ষিত আছে, তাতে কোনই খেয়ানত হয়নি। আর সেই কিতাবগুলির যেসব শাখাগত বিষয় কেবল তখনকার লোকদের অবস্থার উপযোগী ছিল, তা কুরআন কারীম মনসূখ বা রহিত করে দিয়েছে। এবং যেসব বিষয় অপূর্ণ ছিল সেসবের পূর্ণতা সাধন করেছে।

وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً

ফয়সালা করুন[১] এবং আপনার নিকট যে সত্য এসেছে তা এড়িয়ে ওদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না[২]। আমি তোমাদের

---

১. **শানে নুযূল**

একবার ইহুদীদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা ঝগড়ার সৃষ্টি হয়েছিল। ওদের বড় বড় খ্যাতিমান আলেম ও নেতা যে দলে ছিল, সেই দল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে ঝগড়ার মীমাংসার জন্য আবেদন করল। সেই সাথে এও বলল, 'আপনি অবগত আছেন যে, ইহুদী সম্প্রদায়ের অধিকাংশই আমাদের প্রভাবাধীন। আপনি যদি আমাদের পক্ষে ফয়সালা দিয়ে দেন, তবে আমরা মুসলমান হয়ে যাব এবং আমাদের অনুসরণে অধিকাংশ ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করবে'। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের এহেন 'ঘুষের ইসলামগ্রহণ' কবুল করলেন না এবং ওদের কামনা-বাসনার অনুসরণের প্রস্তাব মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এ প্রসঙ্গে বর্তমান আয়াত নাযিল হয়। (ইবনে কাছীর)।

২. পূর্বের টীকায় এ আয়াতের যে শানে নুযূল লেখা হয়েছে, তা থেকে স্পষ্টই প্রকাশ পাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার পরই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, সত্যের উপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবিচলতার সমর্থন করা এবং ভবিষ্যতেও সত্যের উপর দৃঢ়তার এমনি শান অক্ষুণ্ন রাখার বিষয়ে তাকীদ করা।

এ জাতীয় আয়াত নবীজি (সা) এর নিষ্পাপতার পরিপন্থী নয়

যে সকল লোক এ ধরনের আয়াতকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'শানে ইস্‌মত' অর্থাৎ নিষ্পাপতার গুণের পরিপন্থী মনে করে, তারা নিতান্তই বুদ্ধির দীনতা ও ক্ষীণতার পরিচয় দিয়ে থাকে। কারণ, একে তো কোন বিষয় থেকে বারণ করলে এটা প্রমাণিত হয় না যে, যাকে বারণ করা হচ্ছে সে ঐ নিষিদ্ধ কাজটি করতে চায়। দ্বিতীয়ত, নবীদের নিষ্পাপতার অর্থ এই যে, তাঁদের দ্বারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা সংঘটিত হতে পারে না। অর্থাৎ কোন কাজ আল্লাহ তাআলার অপছন্দনীয়– এ কথা জানা থাকলে তাঁরা কখনো তা করতে পারেন না।

আর যদি ঘটনাক্রমে তাঁরা কোন সময় ভুলবশত অথবা নিজ এজতেহাদের ত্রুটির ফলে উত্তমটির স্থলে তুলনামূলক অনুত্তমটি অবলম্বন করে ফেলেন কিংবা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোন বিষয়কে সন্তুষ্টির অনুকূল মনে করে তদনুসারে আমল করে বসেন— তবে এ ধরনের ব্যাপার নিষ্পাপতার পরিপন্থী নয়। যেমন, হযরত আদম (আ) ও আরো কিছু নবীর বিভিন্ন ঘটনা এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

এ তত্ত্বটি বুঝে নেওয়ার পর وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ (আয়াত ৪৮), وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ (আয়াত ৪৯) এবং এমনি ধরনের অন্যান্য আয়াতের মর্ম বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। কেননা, এ আয়াতগুলিতে শুধু এ-ই বলা হয়েছে যে, উক্ত

প্রত্যেক (দল)-কে জীবনবিধান ও পথ-পদ্ধতি দান করেছি[১]। আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তোমাদের (সকলকে

وَّمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ

হতভাগা লোকগুলোর কথাবার্তায় আপনি মোটেই প্রভাবিত হবেন না এবং এমন কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করবেন না, যাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওদের কামনা-বাসনার অনুসরণের একটা বাহ্যিক রূপ পরিদৃষ্ট হতে পারে। যেমনঃ উল্লিখিত ঘটনায় ইহুদীরা কেমন ধূর্ত ও প্রতারণামূলক প্রস্তাব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করেছিল যে, যদি তিনি ওদের মনমত মীমাংসা করে দেন, তবে সকল ইহুদী মুসলমান হয়ে যাবে। ওরা জানত, তাঁর নিকট ইসলাম থেকে অধিকতর প্রিয় ও আকর্ষণীয় বিষয় দুনিয়াতে আর কিছু নেই। এমন ক্ষেত্রে পাহাড়ের মত অটল ব্যক্তির পক্ষেও প্রস্তাবটি মেনে নেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কেননা, ওদের নগণ্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে নেওয়ার মধ্যে এত বড় দীনী স্বার্থ হাসিলের আশা ছিল। এমনি আশঙ্কাপূর্ণ ও বিচ্যুতির সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কুরআন কারীম পয়গম্বর আলাইহিস সালামকে সতর্ক করে বলছে, 'দেখুন, ভুলেও এমন পথ গ্রহণ করবেন না, যা আপনার উচ্চ মর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়।'

উল্লেখ্য যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিপূর্ণ পরহেজগারী এবং অশেষ বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার গুণে এই অভিশপ্ত সম্প্রদায়ের ধোঁকা ও প্রতারণামূলক প্রস্তাবের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। কিন্তু ধরুন, যদি এমনটি না হত, তবেও আমাদের আলোচনা অনুযায়ী আয়াতটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষ্পাপতার পরিপন্থী আদৌ হত না (বরং তা এজতেহাদের ত্রুটি অথবা আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিষয়কে সন্তুষ্টির অনুকূল ভেবে তদনুসারে আমল বলে গণ্য হত, যা নিষ্পাপতার পরিপন্থী নয়— অনুবাদক)।

১. যে সব দীনি মূলনীতি ও মৌলিক বিষয়ের উপর পরকালীন নাজাত নির্ভরশীল, তাতে সকল নবী ও ঐশী ধর্ম পরস্পর এক ও অভিন্ন, তবে শাখা-প্রশাখাগত বিষয়াদিতে প্রত্যেক উম্মতকে আল্লাহ তাদের পরিবেশ-পরিস্থিতি ও যোগ্যতানুযায়ী পৃথক আইন-কানুন ও বিশেষ বিশেষ বিধান দান করেছেন। বর্তমান আয়াতে এই শাখা-প্রশাখাগত পার্থক্যের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে।

বুখারী শরীফের এক হাদীসে (৩৪৪৩) সকল নবীকে একই পিতার ঔরষে আর বিভিন্ন মাতার গর্ভে জন্মপ্রাপ্ত বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মত বলা হয়েছে। এর অর্থও এই যে, সকল নবীরই মৌল বিষয়াদিতে ঐক্য, কিন্তু শাখাসমূহে পার্থক্য রয়েছে। আর যেহেতু বাচ্চার জন্মদানে পিতা কর্তা ও দাতা এবং মাতা ক্ষেত্র ও গ্রহীতা হয়ে থাকে, সুতরাং দৃষ্টান্তটিতে এ সত্যের প্রতিও অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, বিভিন্ন শরী'য়তের আবির্ভাব বিভিন্ন যুগের মানবগোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা ও অবস্থার ভিত্তিতেই হয়েছে। নতুবা ধর্মের উৎসের মধ্যে কোনই পার্থক্য ও অনৈক্য নেই। সকল ঐশী শরী'য়ত ও দীনের উৎস একই অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তা ও তাঁর অনাদি জ্ঞান।

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۭ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

জীবনবিধানের দিক থেকে) একই উম্মত বানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি (তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত দিয়েছেন), যাতে তোমাদের যা দিয়েছেন সে বিষয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন[১]। সুতরাং তোমরা নেক কাজে প্রতিযোগিতা কর[২]। আল্লাহর নিকটেই তোমাদের সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদের সেসব বিষয় জানিয়ে দেবেন, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে[৩]।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۭ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ۝

৪৯. আর (তিনি এই নির্দেশ দিয়েছেন) যে, 'আপনি ওদের মধ্যে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং ওদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না এবং ওদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন– ওরা যেন আপনাকে কোন বিধান থেকে যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন, বিচ্যুত না করতে পারে[৪]। আর যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ এ-ই চান যে, ওদেরকে ওদের পাপের

---

১. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ব, অনন্ত জ্ঞান ও পরিপূর্ণ হেকমতে বিশ্বাস করত প্রত্যেকটি নতুন নির্দেশকে স্বতঃস্ফূর্ততা ও উৎসাহের সাথে গ্রহণ করে এবং একজন অনুগত দাসের মত প্রত্যেকটি নতুন হুকুমের সামনে মাথা নত করে দেয়— (তা পরীক্ষা করতে চান)।

২. অর্থাৎ শরী'য়তসমূহের বিভিন্নতা দেখে নানাবিধ প্রশ্ন ও বক্র তর্ক-বিতর্কে তোমরা অযথা সময় নষ্ট করো না। এর পরিবর্তে নেক কর্ম ও সাধনার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করা উচিত এবং আসমানী শরী'য়ত যে আকীদা-বিশ্বাস, আদব-আখলাক ও আমলাদি পেশ করছে, তা গ্রহণে আগ্রহী হওয়া উচিত।

৩. অতএব পরিণতির দিকে খেয়াল রেখে নেকী ও কল্যাণ অর্জনে সচেষ্ট হও। আখিরাতে সকল মতভেদের স্বরূপ প্রকাশ পেয়ে যাবে।

৪. অর্থাৎ পরস্পরের মতভেদে দুনিয়া যতই মত্ত থাকুক না কেন, আপনার প্রতি নির্দেশ এই যে, আপনি ما أنزل الله অর্থাৎ প্রভুর প্রত্যাদেশ অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা করবেন। অন্য কারো কথার কোনই পরোয়া করবেন না।

কারণে কিছু শাস্তি দেবেন*১। আর নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকে নাফরমান২।

৫০. তবে কি ওরা জাহেলিয়াতের বিধান চায়? আর বিশ্বাসী লোকদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা কে আছে৩?

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۵۰

[রুকূ - ৮]

৫১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বন্ধু বানিয়ো না৪। ওরা পরস্পর

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ

---

* দ্বিতীয় তরজমা– 'কতক পাপের কারণে শাস্তি দিবেন।'

১. পূর্ণ শাস্তি তো পরকালে হবে, কিন্তু ইহকালেও সামান্য কিছুটা শাস্তি দিয়ে অপরাধীকে বা অন্য দর্শকদের সতর্ক করা হয়।

২. অর্থাৎ আপনি ইহুদীদের নাফরমানী ও অবাধ্যতার কারণে বেশি ভারাক্রান্ত হবেন না। দুনিয়াতে আজ্ঞাবহ বান্দাদের সংখ্যা সর্বদা স্বল্পই হয়ে থাকে। যেমনঃ সূরা ইউসুফে ইরশাদ হয়েছে- وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ('অধিকাংশ লোক ঈমান আনার নয়, যদিও আপনি চান না কেন।' –আয়াত : ১০৩)

৩. অর্থাৎ যারা আল্লাহ তাআলার মহা ক্ষমতা, অপার দয়া ও অসীম জ্ঞানে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে, তাদের নিকট দুনিয়াতে আল্লাহর বিধানের সম্মুখে আর কারো বিধান ভ্রুক্ষেপযোগ্যই হতে পারে না। তা সত্ত্বেও ওরা কি আল্লাহ তাআলার বিধানের আলো এসে যাওয়ার পরও ধারণা-কল্পনা, কামনা-বাসনা এবং কুফর ও জাহেলিয়াতের অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হতে চায়?

৪. أولياء শব্দটি ولي -এর বহুবচন। বন্ধুকেও ولي বলা হয়, নিকটবর্তী ও সাহায্যকারীকেও বলা হয়। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানরা ইহুদী ও নাসারা বরং কাফেরকুলের কারো সাথে— যেমন, সূরা আলে ইমরানে (আয়াত ২৮) পরিষ্কার বলা হয়েছে— বন্ধুত্বপূর্ণ ও আন্তরিক সম্পর্ক করবে না।

এস্থলে স্মরণ রাখতে হবে যে, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, ভদ্রতা ও সদ্ব্যবহার, সন্ধি, উদারতা-সহিষ্ণুতা, আদল-ইনসাফ— এ সব ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। (সুতরাং এসবের হুকুমও ভিন্ন। সমভাবে সবগুলি নিষেধ– এমন নয়)। কল্যাণ মনে করলে মুসলমানরা যে কোন কাফেরের সাথে শরী'য়তসম্মতভাবে সন্ধি ও অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে পারে। যেমনঃ সূরা আনফালের ৬১ নং আয়াতে আছে— وَإِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ('ওরা যদি সন্ধির দিকে ঝোঁকে, তবে আপনিও তারই দিকে ঝুঁকুন এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করুন।') সুবিচার ও ইনসাফ করার হুকুম মুসলিম, কাফের সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যেমন বিগত আয়াতগুলি থেকে জানা গেছে। —ভদ্রতা ও সদ্ব্যবহার বা উদারতা-সহিষ্ণুতার আচরণ সেই কাফেরদের সাথে

وَالنَّصٰرٰٓى اَوۡلِيَآءَ ۘ بَعۡضُهُمۡ اَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍ ؕ وَمَنۡ يَّتَوَلَّهُمۡ مِّنۡكُمۡ فَاِنَّهٗ مِنۡهُمۡ

একে অন্যের বন্ধু[১]। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ ওদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে ওদেরই মধ্যে (গণ্য) হবে[২]। নিশ্চয় আল্লাহ

হতে পারে, যারা মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রদর্শন করে না, যেমন সূরা মুমতাহিনার মধ্যে (আয়াত ৮) এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

বাকী থাকল- مُوالاة তথা বন্ধুত্বপূর্ণ ও পরস্পর ভ্রাতৃসুলভ সাহায্য-সহযোগিতার সম্পর্ক, তো কোন মুসলমানই কোন অমুসলিমের সাথে এমন সম্পর্ক করার অধিকার রাখে না, এ সম্পূর্ণ নিষেধ। অবশ্য صوري موالاة যা إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰة -এর আওতায় পড়ে এবং যার দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে কোন বিরূপ প্রভাব না পড়ে— এমন সাধারণ সম্পর্ক রাখার অবকাশ আছে। খুলাফায়ে রাশেদীনের কেউ কেউ যে এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক কঠোরতা প্রদর্শন করেছেন বলে বর্ণিত আছে, তা মূলত পূর্ব-সতর্কতা অবলম্বন এবং অধিকতর সাবধানতার উদ্দেশ্যে ছিল বলেই প্রতীয়মান হয়।

১. অর্থাৎ ধর্মীয় বিভেদ এবং আভ্যন্তরীণ হিংসা ও শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও ওরা পরস্পর একে অন্যের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে। এক ইহুদী অন্য ইহুদীর, এক খ্রিস্টান অন্য খ্রিস্টানের বন্ধু হয়ে যেতে পারে এবং মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে সকল কাফেরই একে অন্যের বন্ধু ও সাহায্যকারী হয়ে যায়। কেননা, الكفر ملة واحدة (সকল কাফেরের একই ধর্ম এবং ওরা সকলে মিলে এক জাতিস্বরূপ)।

২. অর্থাৎ ওদেরই দলে পরিগণিত হবে।

এই আয়াতগুলি মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইহুদীদের সাথে ওর গাঢ় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ওর ধারণা ছিল, অঘটন ঘটে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাত (মুসলমান জাতি) পরাজিত হয়ে গেলে ইহুদীদের সাথে এই বন্ধুত্ব কাজে আসবে। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অতএব প্রকৃতপ্রস্তাবে, ইহুদীদের সাথে মুনাফিকদের বন্ধুত্বের মূল কারণ এই ছিল যে, ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধবাদী ও ইসলামের চরম শত্রু। তো, কোন ব্যক্তি যদি ইহুদী ও নাসারা বা যে কোন কাফের সম্প্রদায়ের সাথে এই কারণে বন্ধুত্ব করে যে, ওরা ইসলামের শত্রু, তবে সে ব্যক্তির কুফরের মধ্যে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। মুনাফিকদের মধ্যে আরো কিছু লোক ছিল, যারা উহুদ যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্তিত হতে দেখে বলা শুরু করেছিল যে, আমরা তো এখন অমুক ইহুদী, অমুক নাসরানীর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ব এবং প্রয়োজন দেখা দিলে তাদেরই ধর্ম অবলম্বন করে নেব। এ ধরনের লোকদের সম্বন্ধেও وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهٗ مِنْهُمْ আয়াতটির জাহেরী অর্থ স্পষ্টভাবে প্রযোজ্য।

তবে যে মুসলমানরা এ রকম নিয়ত ও কারণ ছাড়া ইহুদী ও নাসারাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়বে, তাদের সম্বন্ধেও এ আয়াত প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা, কাফেরদের সাথে সীমাতিরিক্ত মাখামাখি ও ওঠা-বসার কারণে ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত হয়ে ওদের ধর্ম অবলম্বন

জালেমদের হেদায়েত দান করেন না[১]।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

৫২. যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, অচিরেই আপনি ওদের দেখবেন যে, ওরা দৌড়ে গিয়ে তাদের (অর্থাৎ ইহুদী-খ্রিস্টানদের) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে✯, এই বলে যে, 'আমাদের আশঙ্কা হয়, না জানি আমাদের উপর কালচক্র (দুর্দিন) এসে পড়ে[২]।' কিন্তু ঐ

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا

করে ফেলতে পারে। আর তা না হলেও অন্তত কুফরের নিদর্শন ও শিরকের রীতি-নীতিতে যে ঘৃণা ও অসন্তুষ্টির মনোভাব থাকা অপরিহার্য, তাতে শৈথিল্য দেখা দিতে পারে। যদি এমনই ঘটে, তবে এহেন মুসলমানদের ক্ষেত্রেও فَإِنَّهُ مِنْهُمْ-এর প্রয়োগ হতে পারে। যেমন, হাদীসে এই বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে বলা হয়েছে: المرأ مع من أحبّ ('যে যাকে দুনিয়াতে ভালবাসে সে পরকালে তারই সাথে থাকবে।') (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬১৬৮)

১. অর্থাৎ যারা ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে নিজেদের প্রতি ও মুসলমানদের প্রতি অন্যায় করে এবং মুসলমান জাতির পরাজিত ও পরাভূত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে— এমন দুর্ভাগা, অবাধ্য ও ধোঁকাবাজ সম্প্রদায় সম্পর্কে এই আশা বৃথা যে, ওরা কখনো হেদায়ে[illegible] রাস্তায় আসবে।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'ওরা দ্রুত গতিতে ইহুদী-খ্রিস্টানদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে'।

২. এরা তারাই, যাদের অন্তরে সন্দেহ ও নেফাকের রোগ রয়েছে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা-অঙ্গীকারে যাদের বিশ্বাস নেই এবং মুসলমানদের সত্যতায় যাদের আস্থা নেই। এ জন্যই এরা দৌড়ে দৌড়ে কাফেরদের কোলে আশ্রয় নিতে চায়, যাতে নিজেদের ধারণাপ্রসূত বিজয়ের সময় তার সুফল ভোগ করতে পারে এবং নিজেদের কল্পনায় মুসলমানদের উপর যে বিপদাপদ আসার ছিল, সেগুলো থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

বস্তুত نَخْشٰى أَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ এর এই অর্থই ওদের অন্তরে ছিল (অর্থাৎ ওরা ভাবত যে, অচিরেই ইসলাম-বিরোধীদের বিজয় হবে এবং মুসলমানদের উপর دائرة তথা দুর্দিন আসবে)। কিন্তু ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার ওযর বয়ান করতে গিয়ে এই বাক্যই যখন মুনাফিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খাঁটি মুসলমানদের সামনে বলত- তখন এ দ্বারা এই অর্থ প্রকাশ করত যে, 'ইহুদীরা আমাদের মহাজন, আমরা তাদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকি। দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি কোন বিপদ এসে পড়লে এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে দুর্যোগের সময় আমরা উপকৃত হব।'

(সারকথা, دائرة দ্বারা ওদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের উপর আসন্ন বিপদ ও দুর্দিন। কিন্তু নবীজির সামনে তা এমনভাবে বলত, যাতে তিনি দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির বিপদ বোঝেন!) —সামনে ওদের এহেন ধারণা-কল্পনারই উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ۝

সময় সন্নিকটে যে, আল্লাহ (মুসলমানদের) বিজয় দান করবেন অথবা তাঁর পক্ষ থেকে (অন্য) কিছু ঘটাবেন, ফলে ওরা নিজেদের অন্তরে গোপনকৃত বিষয়ের জন্য অনুতাপ করতে থাকবে[১]।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

৫৩. আর (তখন) মুমিনগণ বলবে, 'এরাই কি তারা, যারা আল্লাহর নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করে বলত যে, আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে আছি?' (আল্লাহ বলেন), ওদের আমলগুলি বিনষ্ট হয়ে গেছে, সুতরাং ওরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ

৫৪. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজ ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, তো আল্লাহ শীঘ্রই এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন, যাদের আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে, যারা হবে মুসলমানদের প্রতি কোমলহৃদয়, কাফেরদের প্রতি অতি কঠোর, যারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে

---

১. অর্থাৎ সেই সময় অতি নিকটবর্তী, যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিপূর্ণ বিজয় ও প্রাবল্য দান করবেন এবং সমগ্র আরবের কেন্দ্র মক্কা শরীফে তাঁকে বিজয়ীরূপে প্রবেশ করাবেন। অথবা নিজ কুদরত ও হুকুমে এমন আরো বিষয়ের প্রকাশ ঘটাবেন, যা দেখে ওই মুনাফিকদের সকল মিথ্যা আশা-ভরসা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং ওদের সম্মুখে এই সত্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে যে, ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্বের পরিণতি পার্থিব অপমান ও লাঞ্ছনা এবং পরকালীন ভয়াবহ শাস্তি ছাড়া আর কিছু নয়। আর তখন অনুশোচনা ও হায়-আফসোস ছাড়া ওদের আর কিছুই করার থাকবে না। বস্তুত ওদের তাই হয়েছিল।

ইসলামের সার্বিক প্রাবল্য ও মক্কা-বিজয় ইত্যাদি দেখে ইসলামের সকল শত্রুর কোমর ভেঙ্গে গেল। বহু ইহুদী নিহত হল। অনেকে দেশান্তরিত হল এবং মুনাফিকদের সকল আশা-ভরসা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। মুসলমানদের নিকট ওরা স্পষ্টরূপে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হল। ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্বের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হল এবং পার্থিব ক্ষতি ও চিরকালীন ধ্বংস ওদের গলার বেড়ি হল। সম্মুখের আয়াতে এই বিষয়ই আলোচিত হচ্ছে।

ذٰلِكَ فَضۡلُ اللّٰهِ يُؤۡتِيۡهِ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۵۴﴾

না[১]। এ আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি তা যাকে ইচ্ছা দান করবেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, পরিজ্ঞাতা[২]।

---

১. এই আয়াতে ইসলামের চির অক্ষয়তা ও অবিনশ্বরতা সম্পর্কে মহা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কেননা, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের ফলে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রকাশ্যভাবে ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যেমন: وَمَنۡ يَّتَوَلَّهُمۡ مِّنۡكُمۡ فَاِنَّهٗ مِنۡهُمۡ আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে। —এস্থলে কুরআন কারীম অত্যন্ত স্পষ্টতা ও জোরের সাথে ঘোষণা করছে যে, ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে এহেন লোকেরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। ইসলামের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা মুর্তাদদের স্থলে বা ওদের বিরুদ্ধে এমন জাতির আবির্ভাব ঘটাবেন, যারা আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসবে এবং আল্লাহ তাআলা তাদের ভালবাসবেন। তারা মুসলমানদের প্রতি দয়াদ্র ও মেহেরবান হবে এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর ও শক্তিশালী হবে।

কুরআনী ভবিষ্যদ্বানীর যথার্থতা

এ ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ তাআলার শক্তি ও কুদরতে যুগে যুগে বাস্তবায়িত হয়ে এসেছে। এরতেদাদ বা ইসলাম ত্যাগের সব চেয়ে বড় ফেতনা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের পর (প্রথম খলীফা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)এর আমলে ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক ধরনের মুর্তাদ বা ধর্মত্যাগী ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু সিদ্দীকে আকবরের ঈমানী বল, সুউচ্চ বিচক্ষণতা এবং ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ খাঁটি মুসলমানদের সাহসিকতা ও আত্মোৎসর্গ— উক্ত আগুন নিভিয়ে দিল এবং সমগ্র আরববাসীকে একত্র করে নতুন করে এখলাস ও ঈমানী পথের পথিক বানিয়ে দিল।

আজো আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি যে, যখন কিছু সংখ্যক মূর্খ ও স্বার্থান্বেষী লোক ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হতে শুরু করে, তখনি ওদের চেয়ে বেশি সংখ্যক এবং ওদের চেয়ে বেশি শিক্ষিত ও বিজ্ঞ অমুসলিমকে ইসলাম তার স্বভাবগত আকর্ষণী শক্তি দ্বারা নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। আর ইসলামত্যাগীদের শাস্তির জন্য আল্লাহ তাআলা এমন বিশ্বস্ত ও নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানদের দাঁড় করিয়ে দেন, যারা আল্লাহ তাআলার পথে কারো সমালোচনা ও ভর্ৎসনার পরোয়া করেন না।

২. এটি মানুষের অতি বড় সৌভাগ্য এবং তার উপর আল্লাহ তাআলার বিরাট অনুগ্রহ যে, সে ফেতনার সময় নিজে সত্যের পথে দৃঢ় থেকে অন্যদের ধ্বংস থেকে বাঁচানোর চিন্তা-ভাবনা করবে। আল্লাহ যেসব বান্দাকে ইচ্ছা, এই শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য ও মহা অনুগ্রহ থেকে বিরাট অংশ দান করেন। তাঁর অনুগ্রহ অপরিসীম এবং তিনিই ভাল জানেন, কোন বান্দা এর যোগ্য ও উপযুক্ত।

৫৫. তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও সেই মুমিনগণ, যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং তারা বিনয়ী[১]।

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ۝٥٥

৫৬. আর যে কেউ বন্ধু বানাবে– আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদের, তো আল্লাহর জামাতই (সকলের উপর) বিজয়ী[২]।

وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَٰلِبُونَ ۝٥٦

[রুকূ - ৯]

৫৭. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে (ইহুদী ও খ্রিস্টান) তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে তামাশা ও খেলার বস্তু বানায়, তাদের ও (অন্য) কাফেরদের[৩] বন্ধু বানিয়ো না। আর আল্লাহকে

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ

---

১. পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে ইহুদী ও নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব ও তাদের সাহচর্য গ্রহণ করতে মুসলমানদের নিষেধ করা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, তা হলে মুসলমানদের ভালবাসা ও বন্ধুত্ব কাদের সঙ্গে হওয়া উচিত? তাই বর্তমান আয়াতে বলা হচ্ছে যে, তাদের আসল বন্ধু আল্লাহ তাআলা, পয়গম্বর আলাইহিস সালাম ও খাঁটি মুসলমানগণ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

২. কাফেরদের সংখ্যাধিক্য ও মুসলমানদের সংখ্যালঘুতা দেখে কোন দুর্বলমনা ও স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন মুসলমান ভাবতে পারে যে, সমগ্র দুনিয়া থেকে বন্ধুত্ব ছিন্ন করে গোটা কয়েক মুসলমানের বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করলে জয়ী হওয়া তো দূরের কথা, কাফেরদের আক্রমণ থেকে জীবন ও অস্তিত্ব রক্ষাই দুরূহ হবে। এমন লোকদের আশ্বস্ত করার জন্যই বলা হচ্ছে যে, মুসলমানদের সংখ্যালঘুতা এবং বাহ্যিক সম্বলহীনতার প্রতি লক্ষ করো না। যেদিকে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল ও খাঁটি বিশ্বস্ত মুসলমানগণ রয়েছে, সেই পক্ষই বিজয়ী হবে।

এই আয়াতগুলি বিশেষ করে হযরত উবাদা বিন সামেত রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইহুদীগোত্র বনী কায়নুকা'র সাথে তাঁর খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের বন্ধুত্ব এবং মুসলমানদের সাহচর্যের বিনিময়ে তিনি তাঁর এসব সম্পর্ক বিসর্জন দিয়ে দিলেন। (তাফসীরে তবারী ৮/৫২৯-৫৩০)

৩. 'কাফেরদের' বলতে এখানে মুশরিকদের বোঝানো হয়েছে। কারণ, كُفَّار এর عطف হয়েছে اَلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ -এর উপর। এতে বোঝা যায় যে, এস্থলে كُفَّار বলে কিতাবীরা ছাড়া অন্য কাফেররা অর্থাৎ মুশরিকরা উদ্দেশ্য।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۝

ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক[১]।

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ۝

৫৮. তোমরা যখন নামাযের জন্য আহ্বান কর, ওরা তাকে তামাশা ও খেলার বস্তু বানায়। এটা এজন্য যে, ওরা নির্বোধ লোক[২]।

---

১. পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছিল। বর্তমান আয়াতে মুমিনদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে– এমন ভাষায় উক্ত নিষেধাজ্ঞারই তাকীদ করা হয়েছে এবং এহেন বন্ধুত্বের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়েছে।

একজন মুমিনের দৃষ্টিতে তার দীনের চেয়ে আর কোনো বস্তু বেশি মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে পারে না। এই পটভূমিতে তাদের বলা হচ্ছে যে, ইহুদী, নাসারা ও মুশরিকরা তোমাদের ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং আল্লাহ তাআলার দীনের প্রতীকসমূহ যথা, আযান ইত্যাদি নিয়ে হাসি-তামাশা করে থাকে। আর ওদের মধ্যে যারা নীরব রয়েছে, তারাও এই ঘৃণ্য ক্রিয়া-কলাপের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ না করে বরং তাতে আনন্দিত। কাফেরদের এই হীন আচরণ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর কোন মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে, যার অন্তরে খোদা-ভীতি ও ঈমানী চেতনার কিছুমাত্র অংশ রয়েছে, ওদের সাথে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা সম্ভব হবে কি? ওদের কুফর, শত্রুতা ও ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের কথা বাদ দিলেও শাশ্বত সত্য ধর্মের প্রতি ওদের এহেন হাসি-ঠাট্টাই ওদের সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন করার জন্য যথেষ্ট।

২. অর্থাৎ যখন তোমরা 'আযান' দাও, তখন ওরা জ্বলতে থাকে ও ঠাট্টা করে। এ ওদের চরম বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আযানের শব্দাবলির মধ্যে তো রয়েছে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার প্রকাশ, তাওহীদ বা একত্ববাদের ঘোষণা, পূর্ববর্তী সকল নবী ও আসমানী কিতাবের সমর্থনকারী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের স্বীকৃতি। তাছাড়া দাসত্ব প্রকাশের যত ধরন-ধারণ আছে, সেই সবের সমন্বয়কারী ও বন্দেগীর চরম পর্যায়ের পরিচায়ক যে নামায আযান হল তার প্রতি আহ্বান, সর্বোপরি ইহ-পরকালের সাফল্য ও পরম সফলতা লাভের প্রতি আহ্বান।

এসব বিষয় ছাড়া আযানে আর কী আছে? এতে এমন কী আছে, যা হাসি-ঠাট্টার উপযুক্ত? এমন পুণ্য ও সত্যের ডাকের প্রতি বিদ্রূপ করা একমাত্র সেই লোকের কাজ হতে পারে, যার মস্তিষ্ক নিতান্তই বিবেকশূন্য এবং যার মধ্যে ভাল ও মন্দের পার্থক্যকরণের সকল শক্তি লোপ পেয়েছে।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, মদীনার এক খ্রিস্টান যখন আযানে أشهد أن محمدا رسول الله শুনত, তখন বলত- قد حرق الكاذب (মিথ্যাবাদী পুড়ে গিয়েছে বা পুড়ে যাক)। এ বাক্য দ্বারা ওর নিয়ত যাই হোক, কিন্তু বাক্যটি ওর অবস্থার নিতান্ত উপযোগী ছিল। কেননা, এ খবীছ মিথ্যাবাদী ছিল এবং ইসলামের উত্থান ও প্রসার দেখে হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ছিল।

৫৯. আপনি বলুন, 'হে কিতাবীরা! তোমরা আমাদের প্রতি কেবল এ কারণেই জেদ পোষণ কর যে☆, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং তার প্রতি, যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে এবং তারও প্রতি, যা পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল। এবং (জেদ পোষণ কর) এ কারণে যে, তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান[১]।'

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

ঘটনাক্রমে এক রাতে কোন বালিকা আগুন নিয়ে ওর ঘরে এল। সে স্বীয় পরিবার-পরিজনসহ ঘুমাচ্ছিল। বালিকার হাত থেকে অজ্ঞাতসারে একটুখানি অঙ্গার পড়ে গেল। তাতে ঘুমন্ত ব্যক্তিদের সহ সমস্ত ঘর পুড়ে গেল।—এভাবে আল্লাহ তাআলা দেখিয়ে দিলেন, মিথ্যাবাদীরা দোযখের আগুনে জ্বলার পূর্বেই কীভাবে দুনিয়ার আগুনে পুড়ে মরে। (তাফসীরে তবারী ৮/৫৩৬)

আযান নিয়ে বিদ্রূপ করার আরও একটি ঘটনা সহীহ রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হোনায়ন' এর যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। পথিমধ্যে হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু আযান দিলেন। কয়েকটি বালক ঠাট্টার ছলে আযানের নকল করতে লাগল। তাদের মধ্যে আবু মাহযূরাও ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকলকে ধরে আনতে বললেন। শেষ ফল এই হল যে, আবু মাহযূরার অন্তরে আল্লাহ তাআলা ইসলামের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করে দিলেন। পরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মক্কা শরীফের মুয়াযযিন নির্ধারণ করে দিলেন। এভাবে আল্লাহর কুদরতে আযানের নকলকারী প্রকৃত মুয়াযযিনের মর্যাদা লাভ করল। (সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৬৩২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ১৬৮০)

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'আমাদের মধ্যে কেবল এ দোষই দেখতে পাও যে,...'

১. কোন কাজে দোষারোপ বা হাসি-ঠাট্টা করা যেতে পারে দুটি কারণে– হয়তো সেই কাজটিই ঠাট্টার যোগ্য, অথবা কাজটির সম্পাদনকারী হাসির পাত্র। আগের আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, আযান এমন কোন বিষয় নয়, যা নিয়ে নিতান্ত নির্বোধ ছাড়া কোন মানুষ নিন্দা বা ঠাট্টা করতে পারে। বর্তমান আয়াতে আযানদাতাদের (বা মুসলমানদের) পবিত্র গুণাবলি সম্পর্কে প্রশ্নের ভঙ্গিতে সতর্ক করা হয়েছে।

আয়াতের অর্থ হল, ঠাট্টাকারীরা, যারা মাশাআল্লাহ নিজেদের কিতাবধারী ও শরী'য়তের পণ্ডিত বলে দাবি করে থাকে- ওরা একটু চিন্তা করে ইনসাফের সঙ্গে বলুক, আমাদের মুসলমানদের সঙ্গে ওদের এত শত্রুতা কেন এবং এমন কী দোষ আমাদের মধ্যে দেখে, যা ওদের ধারণায় হাসির যোগ্য? বস্তুত, তা এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, আমরা লা-শরীক এক আল্লাহর প্রতি, তাঁর অবতীর্ণ সকল কিতাবের প্রতি ও তাঁর প্রেরিত সকল নবীর প্রতি খাঁটি

৬০. আপনি বলুন, 'আমি কি তোমাদের সেই পথ সম্পর্কে অবহিত করব, যা এই পথ থেকে (যা তোমাদের ধারণায় নিকৃষ্ট) প্রতিফলের হিসাবে আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতর? (তা) সেই সব লোকের (পথ), যাদের আল্লাহ লা'নত করেছেন, যাদের উপর তিনি গযব নাযিল করেছেন, যাদের মধ্যে কতককে বানর ও কতককে শূকর বানিয়ে দিয়েছেন এবং যারা 'তাগুতের' (শয়তানের) উপাসনা করেছে। এরাই স্থানের দিক থেকে নিকৃষ্টতম ও সরল পথ থেকে চরম ভ্রষ্ট[১]।

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ۚ أُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٦٠﴾

৬১. আর যখন ওরা তোমাদের নিকট আসে, তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'; অথচ ওরা কুফর নিয়েই এসেছিল এবং কুফর নিয়েই চলে গেছে। আর আল্লাহ উত্তমরূপে জানেন, ওরা কী গোপন করছিল[২]।

وَإِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ۚ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ﴿٦١﴾

দিলে ঈমান রাখি। আর ঠাট্টাকারীদের অবস্থা এই যে, ওরা আল্লাহর সত্য ও সঠিক একত্ববাদের উপরও কায়েম নয় এবং সকল নবী-রাসূলকেও বিশ্বাস ও ভক্তি করে না।—এখন তোমরাই ইনসাফের সঙ্গে বল, যারা চরম নাফরমান, ওরা কোন্ অধিকারে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের দোষারোপ ও সমালোচনা করতে পারে?

১. অর্থাৎ 'আল্লাহর প্রতি ঈমান' এর উপর দৃঢ় থাকা এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি খাঁটি অন্তরে বিশ্বাস রাখাই যদি তোমাদের ধারণায় মুসলমানদের সবচেয়ে বড় অন্যায় ও দোষ হয়ে থাকে এবং এ কারণেই তোমরা তাদের বিদ্রূপ ও সমালোচনার পাত্র বানিয়ে থাক, তবে আস— আমি তোমাদের এমন এক জাতির সংবাদ বলি, যারা নিজেদের কুকর্ম ও অপবিত্রতার কারণে সৃষ্টির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট, যাদের প্রতি আল্লাহর লানত ও গযবের প্রতিক্রিয়া আজো স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, যাদের অনেককে স্বীয় প্রতারণা, নির্লজ্জতা ও পার্থিব লোভ-লালসার শাস্তিস্বরূপ বানর ও শূকর বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং যারা আল্লাহর বন্দেগী ছেড়ে শয়তানের দাসত্ব অবলম্বন করেছিল। যদি ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখা হয়, তবে এমন সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি ও পথভ্রষ্ট জাতিই যথার্থরূপে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র হতে পারে আর সেই জাতি স্বয়ং তোমরাই।

২. এখানে সেই ঠাট্টাকারীদেরই বিশেষ কয়েকজনের কথা বলা হচ্ছে, যারা অগোচরে ইসলাম ধর্মের সমালোচনা করত এবং মুসলমানদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত; কিন্তু যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা খাঁটি মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হত, তখন মুনাফিকী

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৬২. আপনি ওদের অনেককে ধাবমান দেখবেন পাপ, জুলুম ও হারাম ভক্ষণের প্রতি। ওরা যা করছে তা খুবই নিকৃষ্ট[১]।

لَوْلَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝

৬৩. দরবেশ ও আলেমরা কেন ওদের নিষেধ করে না পাপের কথা বলতে ও হারাম খেতে? ওরা যা করছে তা খুবই নিকৃষ্ট[২]!

করে নিজেদের মুসলমান বলে প্রকাশ করত। অথচ আগাগোড়া এক মুহূর্তের জন্যও ইসলামের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক হয়নি। নবী আলাইহিস সালামের ওয়াজ-নসীহতেরও কোন প্রভাব ওরা অন্তরে গ্রহণ করেনি।

তো, মুখে ঈমান ও ইসলামের শব্দ বলে কি ওরা আল্লাহ তাআলাকে ধোঁকা দিতে পারবে? সব রকম গোপন ভেদ ও মনের কল্পনা সম্পর্কে যিনি অবহিত, সেই 'আলেমুল গায়ব' আল্লাহর ব্যাপারে যদি ওদের এ ধারণা থাকে যে, শুধু মৌখিক ঈমানের দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করে ফেলবে, তবে এর চেয়ে বেশি হাসি ও বিদ্রূপের বিষয় আর কী হতে পারে?

বর্তমান আয়াতে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সেই সব হাস্যকর ক্রিয়া-কলাপ ও আচরণের বর্ণনা আরম্ভ হল, যেগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর মুসলমানদের বিদ্রূপ করার পরিবর্তে ওদের নিজেদেরই বিদ্রূপ করা উচিত। পরবর্তী আয়াতেও এই বিষয়েরই অবশিষ্ট আলোচনা রয়েছে।

১. 'إِثْم' বলতে খুব সম্ভব لازي গোনাহ উদ্দেশ্য, যা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমিত থাকে এবং 'عُدوان' দ্বারা متعدي গোনাহ অর্থাৎ যা অন্যকেও আক্রান্ত করে, তা উদ্দেশ্য।

যাদের চারিত্রিক অবস্থা এই পর্যন্ত গিয়ে পৌছে এবং হারামখোরী যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়, তাদের দুষ্কৃতিতে কারো সন্দেহ হতে পারে কি? এটা তো ওদের সাধারণের অবস্থা। সামনে ওদের বিশেষ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে।

২. আল্লাহ তাআলা যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, তখন তাদের সাধারণ লোকেরা গোনাহ ও নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে আর বিশেষ ব্যক্তিরা অর্থাৎ দরবেশ ও পণ্ডিতেরা বোবা শয়তানে পরিণত হয়। বনী ইসরাঈলের অবস্থা এই-ই হয়েছিল যে, সাধারণ লোকেরা পার্থিব আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনায় মত্ত হয়ে আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য এবং তাঁর আইন-কানুন ও বিধান ভুলে বসেছিল। আর তাদের তথাকথিত উলামা-মাশায়েখ أمر بالمعروف ونهي عن المنكر অর্থাৎ সৎ কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদানের দায়িত্ব পরিহার করেছিল। কারণ, দুনিয়ার লোভ ও কামনা-বাসনার অনুসরণে ওরা সাধারণের আগেভাগে ছিল। মানুষের ভয় ও দুনিয়ার লালসা ওদের জন্য সত্যের আওয়াজ বুলন্দ করার পথে অন্তরায় হত।

৬৪. ইহুদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত রুদ্ধ[১]।' وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ

এহেন মৌনতা ও তোষামোদহেতু পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে। এ জন্যই কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্থানে উম্মতে মুহাম্মদীকে এ মর্মে শক্ত তাকীদ ও ভীতি প্রদান করা হয়েছে যে, কোন সময় এবং কারো মোকাবেলায় উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে যেন তারা উদাসীনতা প্রদর্শন না করে।

১. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের যুগে কিতাবীদের অন্তর নিজেদের দুষ্কৃতি, কুফরী, অবাধ্যতা, ব্যভিচার, হারামখোরী ইত্যাদির কারণে এতই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, বিশ্বপ্রভুর শানে বেয়াদবী করতেও ওরা কোন ভয় পেত না। আল্লাহ পাকের মর্যাদা ওদের নিকট একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। আল্লাহ তাআলার শানে নির্দ্বিধায় এমন আজে-বাজে শব্দাবলি বলে ফেলত, যা শুনে মানুষমাত্র শিউরে ওঠার কথা। কখনো বলত— إن الله فقير ونحن أغنياء (আল্লাহ গরীব এবং আমরা ধনী)! আবার কখনো এই বাক্য পর্যন্ত বলে বসত যে- يد الله مَغْلُوْلَة (আল্লাহর হস্ত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে)! এর অর্থ হয়ত তাই হবে, যা إن الله فقير দ্বারা বোঝাত। অর্থাৎ আল্লাহ (معاذ الله) রিক্তহস্ত হয়ে গেছেন, তাঁর ভাণ্ডারে আর কিছু রয়নি। অথবা এর দ্বারা রূপক অর্থে কার্পণ্য বোঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ রিক্তহস্ত তো নন, কিন্তু আজকাল বখিলী করছেন। আল্লাহর পানাহ!

ইহুদীদের উক্ত কথার আসল রহস্য

উভয় অর্থের যে কোনটাই গ্রহণ করা হোক, ওদের এই কুফরী কথা-বার্তার রহস্য এই ছিল যে, যখন বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার ফলে আল্লাহ তাআলা এই অভিশপ্ত সম্প্রদায়ের উপর লাঞ্ছনা, দৈন্য, দারিদ্র্য, দুরাবস্থা ইত্যাদির বোঝা চাপিয়ে দিলেন, তখন নিজেদের দুষ্কৃতি ও কুকর্ম সম্পর্কে সতর্ক ও অনুতপ্ত হওয়ার স্থলে উলটা আল্লাহ তাআলার শানে বেয়াদবী করা শুরু করে দিল। সম্ভবত ভেবে থাকবে যে– আমরা তো পয়গম্বরদের সন্তান বরং আল্লাহ তাআলার পুত্র ও তাঁর প্রিয়জন ছিলাম। কিন্তু এটা কী শুরু হল যে, হযরত ইসমাঈল বংশীয়রা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ছে, পার্থিব বিজয়-সাফল্য ও আসমানী বরকতসমূহের দ্বার তাদের উপর উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে? পক্ষান্তরে, আমরা ইসরাঈলের বংশধর। আমরা যারা আল্লাহর ছিলাম এবং আল্লাহ একমাত্র আমাদের ছিলেন– বর্তমানে এভাবে অপমানিত, পরাজিত ও দুরাবস্থায় পতিত হয়ে দ্বারে-দ্বারে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অথচ আমরা তো পূর্বের মত আজও হযরত ইসরাঈলের সন্তান এবং আল্লাহর পুত্র ও প্রিয়জনই আছি। কিন্তু মনে হয়, আমরা যে আল্লাহর সন্তানসন্ততি ও প্রিয়জন ছিলাম (আল্লাহর পানাহ!), তাঁর ভাণ্ডারে অভাব দেখা দিয়েছে অথবা বর্তমানে কৃপণতা ও বখিলী তাঁর হাত রুদ্ধ করে দিয়েছে।

বোকারা এতটুকু বুঝল না যে, আল্লাহ তাআলার ভাণ্ডার তো অসীম এবং তাঁর গুণাবলি অফুরন্ত ও অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ তাআলার পানাহ! যদি তাঁর ভাণ্ডারে কিছু না থাকে অথবা সৃষ্টির প্রতিপালন ও সাহায্যকরণ থেকে তিনি হাত গুটিয়ে নিয়ে থাকেন, তবে বিশ্বরাজ্যের

ওদেরই হাত রুদ্ধ হয়ে যাক[১] এবং ওরা যা বলেছে তার কারণে ওদের প্রতি লা'নত বর্ষিত হোক। বরং আল্লাহর উভয় হাত প্রসারিত[২], তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন[১]।	غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ

ব্যবস্থাপনা কেমন করে কায়েম আছে এবং পয়গম্বর আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের যে ক্রমবর্ধমান উত্থান ও উন্নতি তোমরা স্বচক্ষে দেখছ, তা কার ভাণ্ডার ও হাতের দান?

অতএব তোমাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, তাঁর হাত বন্ধ হয়নি। হাঁ, বেয়াদবী ও দুষ্কৃতির ফলে আল্লাহ তাআলার যে অভিশাপ তোমাদের উপর আপতিত হয়েছে, তা আল্লাহর সুপ্রশস্ত পৃথিবী-পৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য সংকীর্ণ করে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো সংকীর্ণ করে দেবে। নিজেদের করুন অবস্থার কারণ খোদার হস্তের সংকীর্ণ হওয়াকে সাব্যস্ত করা তোমাদের চরম নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়।

১. এতে বদ দো'য়ার আকারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, অথবা ওদের বাস্তব অবস্থার সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, কৃপণতা ও ভীরুতা ওদের হাতকে একেবারে রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

২. যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার জন্য হাত, পা, চোখ ইত্যাদি সাব্যস্ত করা হয়েছে তাতে ভুলেও এ ধারণা করা যাবে না যে, (আল্লাহর পানাহ) সৃষ্টিজীবের মত তাঁরও শরীর ও শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। বরং আল্লাহর সত্তা, অস্তিত্ব, জীবন, জ্ঞান ইত্যাদি সকল গুণের যেমন কোনই নজীর, উদাহরণ ও সাদৃশ্য নেই , কবির ভাষায়—

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم ÷ وز ہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم

دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر ÷ ما ہمچناں در اول وصف تو ماندہ ایم

'হে সেই সত্তা! যিনি ধারণা, কিয়াস, কল্পনা ও অনুমানের উর্ধ্বে; এবং যে যা বলেছে, যা শুনেছি ও পড়েছি তারও উর্ধ্বে তিনি। খাতাপত্র শেষ হয়ে গেছে, জীবন সমাপ্তিতে পৌঁছে গেছে, কিন্তু আমরা এখনো রয়ে গেছি তোমার প্রথম গুণেরই কীর্তনে, তাতেই পড়েছি ক্লান্ত হয়ে।'

তদ্রুপ, তাঁর উক্ত গুণাবলিও (হাত, চোখ...) দৃষ্টান্ত ও সাদৃশ্যহীন।

মোটকথা, আল্লাহ তাআলার সত্তা যেমন তুলনাহীন ও সাদৃশ্যবিহীন, তেমনি তাঁর শ্রবণ, দর্শন, হাত ইত্যাদি গুণাবলির অর্থও তাঁর পবিত্র সত্তা ও মর্যাদার উপযোগী এবং আমাদের ধারণা ও কল্পনা, ব্যাখ্যা ও বর্ণনার সম্পূর্ণ অতীত। সূরা শূরার দ্বিতীয় রুকূতে (আয়াত ১১) ইরশাদ হচ্ছে— لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (তাঁর ন্যায় কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বশ্রেষ্ঠ)।

হযরত শাহ আবদুল কাদের (র) এস্থলে দু'হাত বলতে 'মেহের' ও 'কহর' এর হাত উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ আজকাল খোদার মেহের বা বদান্যতার হাত উম্মতে মুহাম্মদিয়ার প্রতি

আর আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, নিশ্চয় তা ওদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর আরো বাড়িয়ে দেবে[২]। এবং আমি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ওদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছি[৩]। যখনই ওরা যুদ্ধের আগুন

يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَآ أَوْقَدُوا نَارًا

এবং কহর বা ক্রোধের হাত বনী ইসরাঈলের প্রতি উন্মুক্ত, প্রসারিত। সামনের আয়াতসমূহে এ কথাই ইরশাদ হচ্ছে।

১. অর্থাৎ তিনিই ভাল জানেন—কখন, কার জন্য, কী পরিমাণ, ব্যয় করতে হবে। তিনি কখনো একজন অনুগত বান্দাকে পরীক্ষা বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে অভাব-অনটনে পতিত করেন। আবার কখনো তার আনুগত্যের প্রতিদানস্বরূপ পরকালের নে'য়ামতরাশির পূর্বে ইহকালের বরকতরাজির দ্বারও তার জন্য খুলে দেন। পক্ষান্তরে, একজন পাপী-অবাধ্য বান্দাকে কখনো আখেরাতের শাস্তির পূর্বে সংকীর্ণ অবস্থা, অভাব-অনটন ও পার্থিব বিপদাপদে পতিত করেন। আবার কখনো পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্য দান করে ওকে অধিকতর সুযোগ দেন যে, হয় আল্লাহর অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়ে সে নিজ অন্যায় ও দুষ্কৃতির ব্যাপারে লজ্জিত হোক, অন্যথায় নিজ দুর্ভাগ্যের পাত্র পূর্ণ করে নিয়ে চরম শাস্তির উপযুক্ত হবে।

উক্ত বিভিন্ন অবস্থা ও নানা রকম হেকমতের বর্তমানে, কে 'মকবূল' (আল্লাহর প্রিয়), আর কে মারদুদ (বিতাড়িত)—তার ফয়সালা হবে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক অবহিত করার মাধ্যমে, অথবা বাহ্যিক আলামত ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাদির ভিত্তিতে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চোরের হাত কাটা হল, আর বিজ্ঞ সার্জনের হাতে একজন রোগীর হাত কাটা গেল—এমন ক্ষেত্রে বাহ্যিক অবস্থা ও আলামত দ্বারা আমরা বুঝে নিই যে, একজনের হাত শাস্তিস্বরূপ, আর অপরজনের হাত চিকিৎসাস্বরূপ কাটা হয়েছে।

২. ইতিপূর্বে ওদের বেয়াদবী বা ধৃষ্টতার উত্তর প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের এমন হেকমতপূর্ণ উত্তরে এই অবাধ্য ও নির্বোধদের সন্তুষ্টি হবে না, বরং আল্লাহর বাণী শুনে ওরা দুষ্কৃতি ও অস্বীকৃতিতে আরো বেশি উন্নতি করবে। উল্লেখ্য, পুষ্টিকর খাদ্য যদি রোগী বিশেষের পেটে গিয়ে তার রোগ বৃদ্ধির কারণ হয় তবে তা খাদ্যের দোষ নয়, বরং রোগীর স্বাস্থ্যের সমস্যা।

৩. যদিও একটু পূর্বে শুধু ইহুদীদের উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ألقينا بينهم দ্বারা খুব সম্ভব ইহুদী ও ওদের ভাই-বেরাদরের সকলকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদী ও নাসারা সকল কিতাবধারীর অবস্থা এতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন: পূর্বেও এই সূরাতেই (আয়াত ১৪) সকলের কথা বলা হয়েছে এবং সম্মুখের আয়াতেও সকল কিতাবধারীকে সম্বোধন করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, ওদের দুষ্কৃতি ও অস্বীকৃতি যতই বাড়তে থাকবে, ততই ওরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকবে এবং যুদ্ধের আগুন জ্বালাবার জন্য

لِلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٤﴾

প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ তা নিবিয়ে দেন। আর ওরা যমীনে ফাসাদ করার উদ্দেশ্যে দৌড়-ঝাঁপ করে। অথচ আল্লাহ ফাসাদকারীদের পছন্দ করেন না[১]।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٥﴾

৬৫. আর যদি কিতাবীরা ঈমান আনত ও (আল্লাহকে) ভয় করত, তবে আমি অবশ্যই ওদের থেকে ওদের গোনাহগুলি দূর করে দিতাম এবং অবশ্যই ওদের দাখিল করতাম নে'য়ামতসমৃদ্ধ জান্নাতসমূহে[২]।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ

৬৬. ওরা যদি তাওরাত, ইনজীল এবং ওদের প্রতি ওদের রবের পক্ষ থেকে (এখন) যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে তা কায়েম করত[৩]

প্রস্তুত হবে। কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যা কখনই মিটতে পারে না। এই কারণেই ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বিরুদ্ধে ওদের সামরিক আয়োজন কৃতকার্য হয়নি।

১. এ থেকে জানা গেল যে, মুসলমানদের মধ্যে যতদিন পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় থাকবে এবং তারা সত্য ও হেদায়েতের পথে অটল-অবিচল থেকে ফেতনা-ফাসাদ পরিহার করে চলবে, যেমন: সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম ছিলেন—ততদিন তাদের বিরুদ্ধে আহলে কিতাবের সকল চেষ্টা-তদবীর ব্যর্থ প্রমাণিত হবে।

২. অর্থাৎ এমন কঠিন অপরাধ ও জঘন্য দুষ্কর্ম সত্ত্বেও, যদি আহলে কিতাব নিজেদের মতাদর্শ থেকে প্রত্যাবর্তন করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরআনের প্রতি ঈমান আনত এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করত, তাহলে তওবার দ্বার তো বন্ধ হয়নি। আল্লাহ তাআলা অসীম কৃপা ও রহমতে ইহ ও পরকালীন নে'য়ামতরাশি দ্বারা ওদের ধন্য করতেন। যত বড় পাপীই হোক না কেন, যখন সে লজ্জিত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহর রহমত তাকেও নিরাশ করে না।

৩. مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ –বলতে কুরআন উদ্দেশ্য, যা তাওরাত ও ইন্জীলের পর ওদেরকে সতর্ক করা ও হেদায়েত দানের জন্য নাযিল হয়েছে। ওদের জন্য উচিৎ এ কুরআন কায়েম (বা প্রতিষ্ঠিত) করা। কেননা, কুরআন মান্য করা ছাড়া তাওরাত ও ইনজীলও সঠিক অর্থে কায়েম করা হয় না। বরং এখন তাওরাত, ইন্জীল ও সমস্ত আসমানী গ্রন্থের প্রতিষ্ঠার অর্থ—পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থাবলির ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রেরিত কুরআন ও শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রহণ করে নেওয়া, এ ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং যেন, তাওরাত ও ইনজীলের প্রতিষ্ঠার কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি ওরা কুরআনকে গ্রহণ না করল, তাহলে এর অর্থ হল, ওরা নিজেদের কিতাবসমূহ গ্রহণেও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল।

(যথাযথভাবে অনুসরণ করত), তবে নিশ্চয় ওরা নিজেদের উপর ও পদতল থেকে আহার লাভ করত[১]। ওদের মধ্যে একটি দল এমন, যারা সরল পথে রয়েছে[২]। কিন্তু ওদের অনেকেই এমন, যাদের কার্যকলাপ অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ۝٦٦

[রুকূ - ১০]

৬৭. হে রাসূল! আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তা (মানুষের কাছে) পৌছে দিন। আর যদি তা না করলেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম মোটেই পৌছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের (অনিষ্ট) থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না[৩]।

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝٦٧

---

১. অর্থাৎ ওরা আকাশ ও পৃথিবীর সকল বরকত দ্বারা উপকৃত হত এবং ওদেরই গোনাহ ও অবাধ্যতার কারণে ওদেরকে অপমান, দুরবস্থা ও দরিদ্রতার যে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করত।

২. এরা সেই কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষ, যাঁরা স্বভাবগত সৌভাগ্যহেতু ভারসাম্যের পথ অবলম্বন করেছিলেন এবং সত্যের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। যেমন: আবদুল্লাহ বিন সালাম, হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী প্রমুখ, রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম।

৩. **পূর্বা-পর সম্পর্ক ও আয়াতের মর্ম**

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিতাবীদের শয়তানী, কুফরী ও দুষ্কৃতির উল্লেখপূর্বক তাওরাত, ইনজীল, কুরআন, অর্থাৎ সমস্ত আসমানী কিতাবের প্রতিষ্ঠার জন্য ওদের উৎসাহিত করা হয়েছিল। আর সামনের আয়াত قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ– এ কিতাবীদের সকলকে সম্বোধন করে এই ঘোষণা প্রদান করা হবে যে, উক্ত 'প্রতিষ্ঠা' ছাড়া তোমাদের ধর্মীয় জীবন একেবারে বৃথা ও অর্থহীন। বর্তমান আয়াতে এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, আপনার প্রতি রবের তরফ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয়, বিশেষ করে এ ধরনের চরম ঘোষণা, তা আপনি নির্ভয়ে ও দ্বিধাহীনভাবে পৌছাতে থাকুন। অসম্ভব হলেও ধরে নেওয়া যাক, কোন একটি বিষয়ের তাবলীগেও যদি আপনার দ্বারা ত্রুটি হয়ে গেল, তবে আল্লাহর রাসূল হিসাবে আল্লাহর বাণী পৌছানোর যে মহান দায়িত্ব আপনার উপর অর্পিত হয়েছে, তার হক আপনি কিছুই আদায় করেননি বলে ধরা হবে।

আয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

নিঃসন্দেহে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাবলীগের গুরুদায়িত্ব সম্পাদনে সমধিক অটল রাখার জন্য এর চেয়ে অধিক ক্রিয়াশীল আর কোন ভাষা হতে পারে না। নবীজীবনের বিশ-বাইশ বছর ধরে তিনি যে অতুলনীয় দৃঢ়তা, সাহসিকতা, ধৈর্যশীলতাসহ নিবেদিতপ্রাণে অবিরাম রেসালাত ও তাবলীগের গুরু দায়িত্ব সম্পাদনে চেষ্টা-তদবীর ও দুঃখ-কষ্ট করে গিয়েছেন, তা এই সত্যেরই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, দুনিয়াতে রেসালাত ও তাবলীগের মহান দায়িত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি সর্বাধিক সচেতন ছিলেন। যেখানে এই দায়িত্ব সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপলব্ধি এত প্রকট এবং তা সম্পাদনে তিনি প্রাণপণে সচেষ্ট, এরূপ অবস্থায় তাবলীগের দায়িত্বে অটল-অবিচল থাকার বিষয়ে আরো বেশি তাকীদ প্রদানের জন্য সবচেয়ে বলিষ্ঠ ভাষা এ-ই হতে পারত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ দ্বারা সম্বোধন করে শুধু এতটুকু বলা হবে যে, অসম্ভব হলেও ধরে নেওয়া যাক, যদি (আপনার দ্বারা) তাবলীগের মধ্যে সামান্যতম ত্রুটিও হল তবে বুঝে নেবেন যে, আপনি আপনার মহান দায়িত্ব সম্পদনে কামিয়াব হননি। বলা বাহুল্য, তাঁর সকল প্রচেষ্টা ও ত্যাগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সম্মুখে রেসালাতের দায়িত্ব সম্পাদনে শ্রেষ্ঠতম সফলতা অর্জন করা। সুতরাং এ আদৌ সম্ভবই নয় যে, তিনি কোন একটি বাণীও পৌঁছাতে সামান্যতম ত্রুটি করবেন।

সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে, মানুষ কয়েকটি কারণে তাবলীগের দায়িত্ব সম্পাদনে ত্রুটি করে থাকে। **এক,** স্বীয় দায়িত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট উপলব্ধি ও আকর্ষণের অভাব হলে। **দুই,** মানুষের বিরোধিতার ফলে ভীষণ ক্ষতি হওয়ার বা কমপক্ষে কিছু স্বার্থ নষ্ট হওয়ার ভয় থাকলে। **তিন,** যাদের দীনের দাওয়াত দেওয়া হবে, তাদের অবাধ্যতা ও ধৃষ্টতা লক্ষ্য করে তাবলীগের ফলাফল লাভে নৈরাশ্য হলে। বর্তমান আয়াতে এই কারণ তিনটির অপনোদন যথাক্রমে করা হয়েছে। প্রথমটির يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ থেকে فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ এর মধ্যে, দ্বিতীয়টির وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ এর মধ্যে, আর তৃতীয়টির إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ এর মধ্যে। অর্থাৎ আপনি স্বীয় দায়িত্ব পালন করে যান, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রাণ ও মান-সম্মান রক্ষাকারী। সমগ্র পৃথিবীর শত্রুরা মিলেও আপনার মোকাবেলায় সফল হতে পারবে না। আর হেদায়েত ও গোমরাহী আল্লাহরই হাতে। যারা কুফর ও অস্বীকৃতিতেই কোমর বেঁধে লেগেছে, ওরা সঠিক পথে না আসলে আপনি চিন্তিতও হবেন না এবং নিরাশ হয়েও স্বীয় কর্তব্য ত্যাগ করবেন না।

নবীজির (সা) 'শানে-তাবলীগ'

আল্লাহ তাআলার এ হেদায়েত ও আসমানী নির্দেশ অনুসারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতের কাছে ছোট-বড় প্রত্যেক বিষয়ের তাবলীগ করেছেন। মানব জাতির সাধারণ ও বিশেষ– এ উভয় শ্রেণীর মধ্যে যার জন্য যে বিষয়টি উপযোগী এবং তার

৬৮. আপনি বলে দিন, 'হে কিতাবীরা! যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত, ইনজীল ও যা তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে তা কায়েম করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কোন পথেই নও[১]। আর আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা নিশ্চয় ওদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর আরো বাড়িয়ে দেবে। অতএব আপনি (এমন) কাফের সম্প্রদায়ের জন্য আফসোস করবেন না[২]।

قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৬৯. যারা মুসলমান ও যারা ইহুদী এবং সাবী ও নাসারাগণ— (এদের মধ্যে) যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে এবং নেককাজ করেছে, তাদের কোন ভয়ও নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না[৩]।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

যোগ্যতার মোতাবেক ছিল, তা তিনি হুবহু এবং নির্ভয় ও নির্দ্বিধায় পৌঁছিয়ে দিয়ে বান্দাদের উপর আল্লাহর হুজ্জত (দলীল) পূর্ণ করে দিয়েছেন। মৃত্যুর দুই আড়াই মাস পূর্বে বিদায় হজ উপলক্ষে চল্লিশ হাজারেরও বেশি ইসলামের নিবেদিতপ্রাণ খাদেম ও ভক্ত-প্রেমিকদের মহাসমাবেশ ছিল। তিনি সর্বসমক্ষে ঘোষণা করে বললেন, 'আয় আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, আমি তোমার আমানত পৌঁছিয়ে দিয়েছি।'

১. এতে مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ –দ্বারা সকল আসমানী কিতাব বোঝানো হয়েছে, যেগুলির মধ্যে সর্বশেষ ও সবগুলির সংরক্ষণকারী হচ্ছে কুরআন কারীম। পূর্ববর্তী রুকুতে (আয়াত ৬৪) এ আয়াতের তাফসীর লেখা হয়েছে।

২. অর্থাৎ এই দুঃখ ও আফসোসে পড়ে মনকে সংকীর্ণ করবেন না, শান্ত ও সুস্থ মনে স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাকুন।

৩. অর্থাৎ মুসলমান জাতি বলে যারা অভিহিত, অথবা যারা ইহুদী বা নাসারা বা সাবী (অথবা অন্য কিছু হোক, এখানে উদাহরণস্বরূপ বিখ্যাত কয়েকটি ধর্মের উল্লেখ হল মাত্র)— কোন ব্যক্তিই এ সকল নামের ফলে অথবা বংশ, বর্ণ, পেশা, দেশ ইত্যাদি অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের বলে প্রকৃত কল্যাণ ও চির সফলতা লাভ করতে পারবে না। সফলতা ও নাজাত লাভের একমাত্র (উপায় বা) মানদণ্ড হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। সফল হওয়া বা আল্লাহর প্রিয় হওয়ার দাবি যাদের রয়েছে, তারা এ কষ্টিপাথরে নিজেদের যাচাই করে দেখুক। যদি এতে উতরে যায় তবে তারা সকল ভয় ও আশঙ্কামুক্ত এবং সফল ও কৃতকার্য, নতুবা নিজেদেরকে আল্লাহর গযব ও রোষের অধীন মনে করতে হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে শুধু আহলে কিতাবকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান আয়াতে সমগ্র জাতি ও সকল ধর্মাবলম্বীর সামনে নিরপেক্ষভাবে এমন অপূর্ব, চমৎকার, যুক্তিপূর্ণ ও ইনসাফপূর্ণ নীতিমালা পেশ করা হয়েছে, যার পর কোন সুস্থ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের নিকট ইসলামের সত্যনিষ্ঠ ও সর্বজনীন হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে না। একজন মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি (অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব ও একত্ব এবং তাঁর গুণাবলি ও কুদরতের নিদর্শন, তাঁর বিধান ও আইন, তাঁর প্রতিনিধি ও দূতদের প্রতি) এবং কিয়ামত-দিবসের প্রতি ঈমান না আনবে এবং নেককাজ অবলম্বন না করবে– ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি-বিবেকের আলোকে এহেন ব্যক্তি কি অবিনশ্বর নেঁয়ামতরাশি, আল্লাহর সন্তুষ্টি, চির সুখ-শান্তির কোন পরশ পেতে পারে?

اٰمَنَ بِاللّٰهِ -এর মর্ম

কোন সরকারের রাষ্ট্রদূতের অসম্মান এবং তার সুস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় সনদের অস্বীকৃতি কি সেই সরকারের অমর্যাদা ও অস্বীকৃতি নয়? তদ্রূপ বুঝে নিন, যে ব্যক্তি কোন একজন সত্য নবীকে মিথ্যা বলে এবং অস্বীকার করে, সে বস্তুত আল্লাহর সেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণকে মিথ্যা বলছে, যেগুলি তিনি নবুওয়াতের সত্যতার পক্ষে অবতীর্ণ করেছেন। সূরা আনআমের ৪র্থ রুকূতে (আয়াত ৩৩) ইরশাদ হয়েছে- فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ('আসলে ওরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং এই জালেমরা তো আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে।') আর আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য প্রমাণাদিকে মিথ্যা বলার পরও কি إيمان بالله (আল্লাহর প্রতি ঈমান) -এর দাবি করা যেতে পারে? সারকথা, ' আল্লাহর প্রতি ঈমান' এর মধ্যে তাঁর প্রেরিত 'রাসূলের প্রতি ঈমান'ও অন্তর্ভুক্ত। 'আল্লাহর প্রতি ঈমান ও নেক আমল' –এটি একটি সংক্ষিপ্ত (তবে ব্যাপক ও বিপুল অর্থপূর্ণ) শিরোনাম মাত্র। এর দ্বারা আয়াতে যেসব বিস্তারিত বিষয়াবলির প্রতি ইশরা করা হয়েছে, তার বিশদ বর্ণনা কুরআনের অন্যত্র রয়েছে।

'সাবী' কারা?

আমার মতে 'সাবেয়ীন' সম্পর্কে অধিক বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী কথা এই যে, ওরা ইরাকের একটি ফেরকাবিশেষ ছিল। এদের অধিকাংশ ধর্মীয় নীতিমালা فلاسفه ও حكماء اشراقيين طبيعيين এর নীতিমালা থেকে আহরিত ছিল। এরা আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে খুবই বাড়াবাড়ি করত বরং তার পূজা করত। ওদের ধারণা ছিল, দেহমুক্ত রূহ বা আত্মাসমূহ ও নক্ষত্ররাজি প্রভৃতির সাহায্য-সহায়তা নিয়েই সকল প্রভুর প্রভু (বা বড় উপাস্য) পর্যন্ত পৌছা যেতে পারে। সুতরাং কষ্টকর কঠোর সাধনা ও কামপ্রবৃত্তির সংযম দ্বারা স্বীয় রূহের মধ্যে বৈরাগ্যের ভাব ও নিষ্কলুষতা সৃষ্টি করে 'আত্মাসমূহের জগত' এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। অতঃপর ওদের সন্তুষ্টি ও সাহায্যে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা সম্ভব। নবীদের আনুগত্য নিষ্প্রয়োজন। নক্ষত্ররাজির ব্যবস্থাপক রূহসমূহ (ওদের ধারণায়) ও এরূপ অন্যান্য আত্মিক শক্তিগুলোকে নিজেদের প্রতি সন্তুষ্ট রাখার জন্য ওরা মূর্তি বানাত এবং সেই সব রূহের নিমিত্ত নামায, রোযা, কুরবানী ইত্যাদি ইবাদত করত।

لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ۟

৭০. নিশ্চয় আমি বনী ইসরাঈল থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম[১] এবং ওদের নিকট রাসূলদের পাঠিয়েছিলাম। যখনই কোন রাসূল ওদের নিকট এমন বিধান নিয়ে এসেছেন যা ওদের মনঃপূত নয়, তখন ওরা (রাসূলগণের) এক দলকে অস্বীকার করেছে আর এক দলকে তো হত্যাই করে ফেলত[২]।

وَحَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا

৭১. আর ওরা মনে করেছিল যে, (এতে ওদের) কোন অনিষ্ট হবে না, ফলে ওরা অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। তার পর আল্লাহ ওদের প্রতি সদয় হলেন (তওবার তাওফীক দিলেন), অতঃপর আবারো ওদের অনেকে অন্ধ ও বধির হল[৩]।

মোটকথা, আল্লাহর একত্ববাদী ও একনিষ্ঠদের মোকাবেলায় ছিল এই সাবী সম্প্রদায়, যাদের সর্বাপেক্ষা বড় বিরোধিতা ছিল নবুওয়াত ও এর আনুষঙ্গিক বিষয়াদির সাথে। একত্ববাদী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আমলে নমরূদের দল সাবীদের আকীদায় বিশ্বাসী ছিল, যাদের বিরুদ্ধে খলীলুল্লাহ হযরত ইবরাহীম প্রাণপণে সংগ্রাম করেছিলেন।

১. পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহর নিকট মকবুল হওয়ার মানদণ্ড- 'ঈমান ও সৎকর্ম' এর বর্ণনা ছিল। ইহুদীরা এই মানদণ্ডে কতদূর উতরাতে পারে, এখানে তাই দেখানো উদ্দেশ্য।

২. অথচ যা করতে মন চায় না, প্রভুর আদেশে তা করে ফেলা এবং নিজ রায় বা ইচ্ছাকে প্রভুর মর্যির অধীন করে নেওয়ার মধ্যেই দাসের সফলতা ও কৃতিত্ব। নতুবা শুধু মর্যি ও ইচ্ছার অনুকূল বিষয়াবলি মেনে নেওয়ায় কী আর কৃতিত্ব?

৩. অর্থাৎ পাকা ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আল্লাহর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাঁর দূতগণের কিছু সংখ্যককে মিথ্যা বলেছে, কিছু সংখ্যককে হত্যা করেছে। এ তো ছিল আল্লাহর প্রতি ওদের ঈমান ও নেক আমলের অবস্থা। 'কিয়ামত দিবসের প্রতি ওদের ঈমান কতটুকু– তা এ থেকেই পরিমেয় যে, এরূপ মারাত্মক দুরাচার ও অবাধ্যতাপূর্ণ অপরাধ করেও একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে রইল। যেন এসব অন্যায়-অপরাধের শাস্তি কখনোই ভোগ করতে হবে না এবং জুলুম ও অবাধ্যতার ফলে কোন কঠিন পরিণতির মুখোমুখি আদৌ হতে হবে না! এ ধারণা করে আল্লাহর নিদর্শনাদি ও তাঁর কালামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির হয়ে বসে এবং ভয়াবহ গর্হিত ক্রিয়াকলাপ করতে থাকে। এমনকী, কিছু সংখ্যক নবীকে হত্যা করে এবং কিছু সংখ্যককে বন্দী করে।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা ওদের উপর বুখ্‌তে নাস্‌সার (বাদশাহ)-কে প্রবল করে দিলেন। অতঃপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলে এক পারস্য সম্রাট ওদের বুখ্‌তে নাস্‌সারের লাঞ্ছনাপূর্ণ ও অপমানকর দাসত্ব থেকে মুক্ত করে বেবিলন থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে ফেরত পাঠায়। তখন

كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝

আর ওরা যা কিছু করে, আল্লাহ তা ভাল করেই দেখেন[১]।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ۚ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝

৭২. নিশ্চয় তারা কাফের হয়ে গেছে যারা বলেছে, 'আল্লাহ তো মাসীহ ইবনে মারয়াম-ই', অথচ মাসীহ বলেছিলেন, 'হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব। যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করবে, নিশ্চয় আল্লাহ ওর জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং ওর বাসস্থান জাহান্নাম। আর অপরাধীদের কোন সাহায্যকারী নেই[২]।'

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ

৭৩. নিশ্চয় তারা কাফের হয়ে গেছে যারা বলেছে, 'আল্লাহ তো তিনের একজন[৩]।' অথচ এক

ওরা তওবা করে এবং আত্মসংশোধনের প্রতি মনোযোগী হয়। আল্লাহ তাআলা তওবা কবুল করলেন।—কিন্তু কিছুকাল পরে ওরা পুনরায় সেই সব দুষ্কৃতির প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং একেবারে অন্ধ ও বধির হয়ে হযরত যাকারিয়া (আ) ও হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ) কে হত্যার দুঃসাহস করল এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকেও হত্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

১. অর্থাৎ ওরা আল্লাহর গযব ও কহরের বিষয়ে অন্ধ হয়ে গেলেও আল্লাহ ওদের সকল ক্রিয়াকলাপ সর্বদা লক্ষ করেন। সে মত এখন তিনি উম্মতে মুহাম্মদিয়ার হাতে উক্ত ক্রিয়াকলাপের শাস্তি প্রদান করছেন।

২. 'আল্লাহর প্রতি ঈমান' এর ক্ষেত্রে নাসারাদের অবস্থা কী এবং সত্যের এই মানদণ্ডে ওরা কতটুকু উতরেছিল, এখান থেকে তা দেখানো হয়েছে।

ওদের 'আল্লাহর প্রতি ঈমান' এর অবস্থা এই যে, ওরা আকল-বুদ্ধির বিপরীত, সুস্থ স্বভাবের পরিপন্থী এবং স্বয়ং হযরত মাসীহর স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বক্তব্যের বিরোধী এই মতবাদ গড়েছে যে, মারয়ামপুত্র মাসীহ হচ্ছেন খোদা। 'একে তিন ও তিনে এক' এই গোলক ধাঁধাঁ তো শুধু নামেমাত্র, প্রকৃতপ্রস্তাবে ওরা সব শক্তি ও ক্ষমতা ব্যয় করেছে একমাত্র হযরত মাসীহর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করার পিছনে। অথচ স্বয়ং হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলাই রব এবং অপরাপর মানুষের মতই তিনি নিজে তাঁর দাসমাত্র। আর যে শিরকের মধ্যে তাঁর উম্মত পতিত হয়েছিল, তার অনিষ্টতা ও কদর্যতা তিনি অত্যন্ত জোরে-শোরে বয়ান করেছেন। এতদসত্ত্বেও এই অন্ধদের (চোখ ফুটছে না), শিক্ষা হচ্ছে না।

৩. অর্থাৎ হযরত মাসীহ, রূহুল কুদ্স, আল্লাহ– এ তিনজন; অথবা মাসীহ, মারয়াম ও আল্লাহ– এ তিনজন খোদা (আল্লাহর পানাহ!)। (সে মত) আল্লাহ হলেন এই তিনজনের এক অংশীদার। অতঃপর উক্ত তিনে এক ও সেই একে তিন!!! খ্রিস্টানদের সাধারণ বিশ্বাস

ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّاۤ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

মা'বূদ ছাড়া কোনই মা'বূদ নেই। আর ওরা যদি ঐ উক্তি থেকে বিরত না হয় যা ওরা বলে, তবে ওদের মধ্যে যারা কাফের (অর্থাৎ যারা কুফরের মধ্যে অবিচল থাকবে), তাদের অবশ্যই যাতনাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে।

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৭৪. ওরা কেন আল্লাহর কাছে তওবা করে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে না? আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝

৭৫. মাসীহ ইবনে মারয়াম কেবল একজন রাসূলই, যাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন[২] এবং তাঁর মাতা একজন 'সিদ্দীকাহ্' (বা কামেল ওলী)[৩]। তাঁরা উভয়ে খাদ্য গ্রহণ করতেন। আপনি লক্ষ করুন, আমি কীভাবে ওদের জন্য প্রমাণাদি বর্ণনা করছি, অতঃপর এও লক্ষ করুন, ওরা কীভাবে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে!![৪]।

এটাই, এবং আকল-বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞানের পরিপন্থী এই বিশ্বাসকে ওরা বিস্ময়কর জটিলতাপূর্ণ ও ঘুরানো-পেচানো শব্দাবলিতে প্রকাশ করে থাকে এবং কারো বুঝে না আসলে জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত তত্ত্ব বলে আখ্যায়িত করে। বড়ই সত্য কথা– لن يصلح العطار ما أفسده الدهر (কালের গতিতে যা পঁচে গেছে, আতরের সুগন্ধিতে তা শুদ্ধ হয় না')।

১. এটি একমাত্র সেই ক্ষমাশীল দয়াময়েরই শান যে, এমন এমন অবাধ্য ও ধৃষ্টতাপূর্ণ পাপীও যখন লজ্জিত হয়ে এবং সংশোধনের সংকল্প নিয়ে দরবারে হাযির হয়, তখন তিনি এক মুহূর্তের মধ্যে সারা জীবনের গোনাহ মাফ করে দেন।

২. অর্থাৎ তিনিও এই পবিত্র ও নিষ্পাপ জামাতেরই একজন। তাঁকে আল্লাহ বানিয়ে নেওয়া তোমাদের মূর্খতা।

৩. উম্মতের আলেমদের গবেষণালব্ধ রায় এটাই যে, নারী জাতির কেউই নবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করেনি। এ মর্যাদা পুরুষদেরই জন্য বিশেষিত রয়েছে। وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيْ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ('আমি আপনার পূর্বে পুরুষগণকেই প্রেরণ করেছি যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম এবং যারা বিভিন্ন জনপদের অধিবাসী ছিল।' সূরা ইউসুফ, আয়াত ১০৯)

কুমারী মারয়ামও একজন মহিলা ওলী ছিলেন, নবী নন।

৪. চিন্তা করলে বুঝে আসে, যে ব্যক্তি খাদ্য ও পানীয়ের মুখাপেক্ষী, সে দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেক বস্তুরই মুখাপেক্ষী। মাটি, বায়ু, পানি, সূর্য, জীবজন্তু এমন কি ময়লা ও সারের প্রতিও সে

৭৬. আপনি বলে দিন, 'তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর, যা তোমাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না?' আর আল্লাহই সর্বশ্রোতা, পরিজ্ঞাতা[১]।

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

৭৭. আপনি বলুন, 'হে কিতাবীরা! তোমরা তোমাদের ধর্মের বিষয়ে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না[২] এবং এমন লোকদের খেয়াল-খুশির

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ

অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। লক্ষ করুন, খাদ্য পেটে পৌছা ও হজম হওয়ার জন্য কত কিছুর প্রয়োজন হয়। অতঃপর খাওয়ার কারণে কত প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল যে সৃষ্টি হতে থাকে, তার কোন শেষ নেই।

পরমুখাপেক্ষিতা ও পরনির্ভরতার এই সুদীর্ঘ ধারা সামনে রেখে আমরা মাসীহ ও মারয়ামের ঈশ্বরত্ব খণ্ডনের প্রমাণস্বরূপ বলতে পারি যে, মাসীহ ও মারয়াম পানাহার ও সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনাদির মুখাপেক্ষী ছিলেন। তাঁরা উভয়ে পানাহার করতেন– এই ধ্রুব সত্য সাধারণ অভিজ্ঞতা ও সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত। আর যে ব্যক্তি খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়, সে দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রতিই অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। এমতাবস্থায় তোমরাই (খ্রিস্টানরাই) বল, যে সত্তা অন্য সকল মানুষের মত নিজ অস্তিত্বের জন্য জীবন ধারণের সকল মাধ্যমের মুখাপেক্ষী, (অর্থাৎ এসব মাধ্যম ছাড়া যিনি নিজ প্রাণ রক্ষা করতে পারেন না) তিনি কেমন করে খোদা হতে পারেন?

এ এমনি সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী প্রমাণ, যা শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলেই সহজে বুঝতে পারে। মোটকথা, পানাহার করা ঈশ্বরত্বের পরিপন্থী। অবশ্য খাদ্য গ্রহণ না করাটা ঈশ্বরত্বের প্রমাণ নয়, তা হলে সকল ফেরেশতাই খোদা হয়ে যেতেন!

১. অর্থাৎ মাসীহকে খোদা বললে তাঁকে মাবূদও বলতে হয়। কিন্তু মাবূদ কেবল সেই সত্তাই হতে পারে, যে সর্বপ্রকার লাভ ও ক্ষতির মালিক এবং পরিপূর্ণ ইখতিয়ারের অধিপতি। কেননা, ইবাদত হচ্ছে চরম নতি ও বিনয়ের নাম। আর চরম মিনতি একমাত্র তাঁরই সম্মুখে অবলম্বন করা যেতে পারে, যিনি পরম মর্যাদা ও শক্তির অধিকারী, সদা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজ্ঞ। (বলা বাহুল্য, হযরত মাসীহ এমন নন)। এ আয়াত দ্বারা ত্রিত্ববাদের শিরকী মতবাদের সঙ্গে মুশরিকদের সকল শিরকি আকীদাগুলির অসারতা প্রমাণিত হয়ে যায়।

২. আকীদা-বিশ্বাসের বাড়াবাড়ি এই যে, একজন মানব-সন্তানকে ওরা খোদা বানিয়ে দিল। আর আমলের মধ্যে বাড়াবাড়ি হচ্ছে রাহবানিয়্যত বা সন্ন্যাসব্রত। ইরশাদ হয়েছে– وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ ('এবং বৈরাগ্য, যা ওরা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছিল; আমি তা ওদের উপর ফরয করিনি।' সূরা হাদীদ, আয়াত ২৭)

ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ۝

অনুসরণ করো না, যারা পূর্বেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে[১]।

[রুকূ - ১১]

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ۝

৭৮. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদের প্রতি দাউদ ও ঈসা ইবনে মারয়ামের যবানীতে লা'নত করা হয়েছে। এটা এজন্য যে, ওরা নাফরমানী করেছিল এবং ওরা সীমালঙ্ঘন করত[২]।

(ইতিপূর্বে) ইহুদীদের যেসব দোষের কথা বর্ণিত হয়েছে তাতে প্রকাশ পায় যে, দুনিয়া পূজায় লিপ্ত হওয়ার কারণে ওদের কাছে দীন ও দীনদারদের কোনই মর্যাদা ও সম্মান ছিল না। এমনকি, নবীদের হত্যা ও অপদস্থ করা ওদের বিশেষ চরিত্র ছিল। পক্ষান্তরে, নাসারারা নবীদের মর্যাদা দানে এমনি বাড়াবাড়ি করল যে, তাঁদের কয়েকজনকে ওরা খোদা বা খোদাপুত্র বলতে লাগল এবং দুনিয়া বিসর্জন দিয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করল।

১. অর্থাৎ আসল ইনজীল ও অন্যান্য আসমানী কিতাবে কোথাও এই শিরকী মতবাদের অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তীকালে গ্রীক মূর্তিপূজকদের অনুসরণে সেন্ট পল তা তৈরি করে এবং সকলে একেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করে এর উপর জমে থাকে। এহেন অন্ধ বিশ্বাস ও অনুসরণ দ্বারা নাজাত পাওয়া যাবে–এমন আশা করা কোন বুদ্ধিমানের পক্ষে শোভনীয় নয়।

২. সকল আসমানী কিতাবেই কাফেরদের প্রতি অভিশাপ করা হয়েছে, কিন্তু বনী ইসরাঈলের কাফেররা যখন অপরাধ ও অবাধ্যতার ক্ষেত্রে এমনই সীমা ছড়িয়ে গেল যে, অপরাধী কোনক্রমেই অপরাধ করা থেকে বিরত হত না, নিরপরাধরাও অপরাধীকে বাধা দিত না, বরং সকলে দুধ-চিনির মত একে অন্যের পরম বন্ধু ও খাঁটি সহযোগী হয়ে গেল, দুষ্কর্ম ও নির্লজ্জতায় লিপ্ত অপরাধীদের প্রতি বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ও ঘৃণাবোধও প্রকাশ করা হত না- তখন আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জবানীতে ওদের উপর লানত করলেন। পাপাচারের ক্ষেত্রে যেমন ওদের দুঃসাহস সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তেমনি এই অভিশাপও, যা অতি মর্যাদাবান নবীদের মাধ্যমে করা হয়েছিল, ভয়াবহ ধ্বংসকর প্রমাণিত হয়েছে।

খুব সম্ভব এহেন অভিশাপেরই দরুন ওদের অনেকে দৈহিক ও আত্মিক দিক থেকে বিকৃত হয়ে বানর ও শূকরে পরিণত হয়। আর আত্মিক বিকৃতি এতই বিস্তৃত রূপ ধারণ করে যে, ওদের বহু লোক আজো মুসলমানদের বিরোধিতায় মূর্তিপূজায় লিপ্ত ও নবুওয়াত ইত্যাদি সম্পর্কে চরম অজ্ঞতায় নিমজ্জিত মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে। অথচ মুসলমানেরা খোদার সকল আসমানী কিতাবের, সকল নবীদের সমর্থন ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করে থাকে। যদি খোদার প্রতি, নবীর প্রতি ও আল্লাহর ওহীর প্রতি এই কিতাবীদের প্রকৃত বিশ্বাস থাকত,

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۗ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

৭৯. ওরা যে মন্দকর্ম করছিল, তা থেকে একে অপরকে বারণ করত না[১]। ওরা যা করত, তা কতই না নিকৃষ্ট!

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ۝

৮০. আপনি ওদের অনেককে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখছেন[২]। কতই না নিকৃষ্ট সেই বস্তু, যা ওরা নিজেরা নিজেদের জন্য অগ্রে পাঠিয়েছে– তা হচ্ছে ওদের প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টি। আর ওরা আযাবে চিরকাল থাকবে[৩]।

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِىِّ وَمَآ

৮১. ওরা যদি আল্লাহ ও নবীর প্রতি এবং যা নবীর প্রতি নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান

তবে যে জাতি এসব বিষয়ের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান রাখে তাদের বিরুদ্ধে কি মূর্তিপূজারীদের সাথে আঁতাত করতে পারত? এই কুরুচি ও অনুভূতিহীনতা এবং আল্লাহ-ওয়ালাদের ছেড়ে মূর্তিপূজারীদের সাথে বন্ধুত—মূলত সেই অভিশাপ ও লানতেরই প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফল।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে ওদের অতীত কুফরী ও পাপাচারের কাহিনী বর্ণনা করে ওদেরকে বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, যাতে ওরা নিজেদের অভিশপ্ত ক্রিয়াকর্ম থেকে তওবা করে সত্য ও সরল পথ অবলম্বনের চেষ্টা করে। এই রুকূতে ওদের বর্তমান হাল-অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, দাউদ ও মাসীহ (আলাইহিমাস সালাম) এর জবানীতে যে অভিশাপ হয়েছিল, তার ক্রিয়া অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহওয়ালা ও ঈমানদারদের প্রতি ঘৃণা ও তাঁদের সঙ্গে শত্রুতা এবং জাহেল মুশরিকদের সাথে ভালবাসা– এ এই সত্যেরই উজ্জ্বল প্রমাণ যে, খোদায়ী লানতের ফলে ওদের অন্তর সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে গেছে। যদি এখনো ওরা নিজেদের অবস্থার সংশোধন না করে এবং সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন না করে, তবে ওরা ওই কঠোর অভিশাপের উপযুক্ত হয়ে যাবে, যা আল্লাহ তাআলা নবীকুল শিরোমনি ও শেষ নবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানীতে ওদের প্রতি প্রেরণ করবেন।

১. لايتناهون এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক, 'বিরত হত না', যেমন তফসীরে 'রুহুল মাআনী'তে আছে। দুই, 'একে অন্যকে বারণ করত না', এটাই অধিক প্রসিদ্ধ অর্থ। —যখন কোন জাতির মধ্যে দুরাচার বিস্তার লাভ করে এবং কেউ বাধা দেওয়ারও না থাকে, তখন ব্যাপক আযাবের আশঙ্কা দেখা দেয়।

২. কাফের বলতে মুশরিক উদ্দেশ্য। আর এ আয়াতগুলিতে মদীনার ইহুদীদের কথা বলা হয়েছে, যারা মক্কার কাফেরদের সাথে আঁতাত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেছিল।

৩. অর্থাৎ ওরা মৃত্যুর পূর্বে পরকালের জন্য যে আমলাদি পাঠাচ্ছে, তা ওদের আল্লাহর গযব ও চিরকালীন শাস্তির যোগ্য বানাচ্ছে।

أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨١﴾

রাখত, তবে কাফেরদের বন্ধু বানাত না[১]; কিন্তু ওদের অনেকেই নাফরমান[২]।

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّا نَصٰرٰى ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. নিশ্চয়ই আপনি মানুষের মধ্যে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু পাবেন ইহুদী ও মুশরিকদের এবং ভালোবাসায় মুসলমানদের সবচেয়ে নিকটবর্তী পাবেন তাদের, যারা বলে- 'আমরা নাসারা। এর কারণ এই যে, নাসারাদের মধ্যে আলেম ও দরবেশগণ রয়েছে এবং তারা অহংকার করে না।

পারা - ৭

وَإِذَا سَمِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى أَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. আর যখন তারা সেই কালাম শোনে যা রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তখন আপনি দেখবেন যে, তাদের চোখ থেকে অঝোরে অশ্রু বইছে- কারণ, তারা সত্য উপলব্ধি করেছে। তারা বলে ওঠে, 'হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আমাদের নাম (সত্য)- স্বীকারকারীদের সঙ্গে লিখে নিন।

---

১. النبي দ্বারা মুফাসসিরদের কেউ কেউ হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে, আর কেউ কেউ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থ এই দাঁড়াল যে, যদি হযরত মূসা (আ) এর সত্যতা ও শিক্ষার প্রতি এই ইহুদীদের সত্যিকার বিশ্বাস থাকত, তবে যে শেষনবীর সুসংবাদ স্বয়ং মূসা (আ) দিয়েছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করত না। অথবা অর্থ এই যে, যদি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি খাঁটি ঈমান আনত, তবে ইসলামের শত্রুদের সাথে আঁতাত করার মত কাজ ওদের দ্বারা সম্ভব হত না। এই দ্বিতীয় অর্থ হলে আয়াতে ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা মুনাফিক তারা উদ্দেশ্য।

২. আল্লাহর এবং নিজেদের স্বীকৃত পয়গম্বরের নাফরমানী করতে করতে ওদের হালত এই হয়ে গেছে যে, এখন তাওহীদবাদীদের অপেক্ষা মুশরিকদের শ্রেয় মনে করে।

দুঃখের বিষয়, বর্তমানে আমরা নামধারী অনেক মুসলমানদের দেখছি, মুসলমান ও কাফেরদের মোকাবেলার সময় তারা কাফেরদের বন্ধু বানায়, ওদেরই সমর্থন করে এবং ওদের পক্ষে ওকালতী করে থাকে। اللّٰهُمَّ احفظنا من شرور أنفسنا و من سيآت أعمالنا

৮৪. 'আর আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ও আমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তার প্রতি ঈমান আনব না– আর আশা করব যে, আমাদের রব আমাদেরকে নেককার লোকদের মধ্যে দাখিল করবেন?'

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫. অতএব আল্লাহ তাদের এ কথার বিনিময়ে তাদের দান করেছেন এমন উদ্যানরাজি, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, যাতে তারা অনন্তকাল বাস করবে। এ-ই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান।

فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬. আর যারা কাফের হয়েছে এবং আমার আয়াতগুলিকে অস্বীকার করেছে, তারা জাহান্নামী[১]।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٨٦﴾

---

১. এই আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে যে, শুধু ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণেই মুশরিকদের সাথে ইহুদীদের বন্ধুত্ব। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেশির ভাগ যেসব জাতির সম্মুখীন হতে হত, তাদের মধ্যে এই ইহুদী ও মুশরিক জাতি দুটো পর্যায়ক্রমে ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোর শত্রু ছিল। মক্কার মুশরিকদের হাতে মুসলমানদের যে কষ্ট ও দুর্ভোগ পোহাতে হত, তা তো দিবালোকের মত স্পষ্ট। কিন্তু অভিশপ্ত ইহুদীরাও মুসলমাদের সঙ্গে জঘন্য থেকে জঘন্যতর আচরণ করতে ত্রুটি করেনি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অজান্তে পাথরখণ্ড ফেলে তাঁকে শহীদ পর্যন্ত করতে চেয়েছে। খাদ্যে বিষ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। যাদু-টোনা করেছে। মোটকথা, ওরা স্বীয় কর্মের মাধ্যমে গযবের উপর গযব ও অভিশাপের উপর অভিশাপ কুড়িয়েছে ।

পক্ষান্তরে (তখনকার) খ্রিস্টানরা যদিও কুফরীতে লিপ্ত ছিল, ইসলামের উন্নতির কারণে তারাও জ্বলত এবং মুসলমানদের উন্নতি মোটেই সহ্য করতে পারত না, তবুও সত্য গ্রহণ করার যোগ্যতা তাদের মধ্যে উক্ত দুটি সম্প্রদায় থেকে অধিক ছিল। তাদের অন্তর ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার প্রতি তুলনামূলকভাবে দ্রুত আগ্রহী হত। —এর কারণ এই ছিল যে, তখন পর্যন্ত খ্রিস্টানদের মধ্যে দীনি ইলমের চর্চা অন্যান্য জাতির চেয়ে বেশি ছিল। এবং নিজেদের তরীকা অনুযায়ী সংসার-ত্যাগ ও বৈরাগ্যময় জীবন অবলম্বনকারী তাদের মধ্যে অধিক মাত্রায় পাওয়া যেত। অন্তরের নম্রতা ও বিনয় তাদের বিশেষ গুণ ছিল। যে জাতির মধ্যে এই গুণাবলি অধিক পরিমাণে পাওয়া যাবে, অন্যান্য জাতির তুলনায় তাদের মধ্যে সত্য গ্রহণের শক্তি অধিক থাকাটাই স্বাভাবিক। কেননা, সত্য গ্রহণে সাধারণত তিনটি বিষয় বাধার কারণ হয়ে থাকে– অজ্ঞতা, দুনিয়ার মহব্বত ও হিংসা-গর্ব ইত্যাদি। নাসারাদের মধ্যে আলেমদের প্রভাবে অজ্ঞতা দূরীভূত হত এবং দরবেশদের আধিক্য দুনিয়ার ভালবাসাকে এবং অন্তরের নম্রতা ও বিনয় গর্ব ও অহমিকা ইত্যাদিকে খর্ব করত।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঠানো চিঠি ও পয়গামের প্রতি রোমের সম্রাট কাইসার, মিশর-সম্রাট মুকাওকিস ও হাবশা-রাজ নাজ্জাশী যে সভ্য ও নম্র আচরণ প্রদর্শন করেছিল, তা এই কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, সেই সময় খ্রিস্টানদের মধ্যে সত্য গ্রহণ ও মুসলমানদের প্রতি ভালবাসার যোগ্যতা অন্যান্য জাতির তুলনায় অধিক ছিল।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

মক্কার মুশরিকদের জুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের একটি দল হাবশায় হিজরত করলে মুশরিকরা হাবশা-রাজ্যের দরবার পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করেছিল। ফলে একদিন বাদশাহ মুসলমানদের ডেকে কিছু প্রশ্ন করলেন এবং হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তাঁদের আকীদা-বিশ্বাস কী, তা জানতে চাইলেন। উত্তরে হযরত জা'ফর (রা) সূরা মারয়ামের কিছু আয়াত পাঠ করলেন এবং নিজ আকীদার কথা পরিষ্কার বলে দিলেন। এতে বাদশাহ অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে স্বীকার করেছিলেন যে, হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে কুরআন যে আকীদা প্রকাশ করেছে তা সম্পূর্ণ সত্য। তখন তিনি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সুসংবাদ অনুযায়ী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী বলে স্বীকার করলেন। এমনকি তিনি হিজরতের কয়েক বছর পর খ্রিস্টবাদ থেকে ইসলামে দীক্ষিত সত্তরজন নও মুসলিমের একটি দলকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খেদমতে পাঠালেন। তারা মদীনায় পৌঁছে কুরআন করীমের তেলাওয়াতের স্বাদ পেয়ে ও আল্লাহর কালাম শুনে অশ্রুভারাক্রান্ত হলেন। তখন তাঁদের চোখে অশ্রু ও মুখে- ربنا آمنا الخ বাক্যাবলি জারী ছিল।

ভ্রান্তি নিরসন

এ আয়াতগুলিতে উক্ত দলেরই অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এখানে এ সংবাদ দেওয়া হয়নি যে, কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে খ্রিস্টান এবং ইহুদী ও মুশরিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সম্পর্ক তেমনই থাকবে, যেমন এখানে বর্ণিত হল। বর্তমানে যারা খ্রিস্টান নামে আখ্যায়িত, তাদের মধ্যে ক'জন قسيسين ও رُهبان (অর্থাৎ আলেম ও দরবেশ) এবং বিনয়ী ও নম্র স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি আছে? এবং এমন কয়জন আছে যাদের চোখ থেকে আল্লাহর বাণী শুনে অশ্রু ঝরে পড়ে? أقربهم مودة বা ভালবাসায় সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ– নাসরানীদের মধ্যে আলেম ও দরবেশ রয়েছে। আর এই কারণটিই যেখানে অবর্তমান, সেখানে এর সুফল অর্থাৎ 'ভালবাসায় নিকটবর্তিতা' পাওয়া যাবে কিভাবে?

যা হোক, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে খ্রিস্টান, ইহুদী ও মুশরিকদের যে গুণাবলির কথা বলা হয়েছে, সেই গুণাবলি যখনই ও যেখানেই যে পরিমানে বিদ্যমান থাকবে, সেই অনুপাতেই ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে ওদের ভালবাসা বা শত্রুতার সম্পর্ক হবে।

[রুকূ - ১২]

৮৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা (নিজেদের জন্য) সেসব পবিত্র বস্তু হারাম করো না যা আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

৮৮. আর আল্লাহ তোমাদের যা দান করেছেন, তা থেকে হালাল, পবিত্র বস্তু খাও এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাঁর প্রতি তোমরা ঈমান রাখ[১]।

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝

---

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

এ সূরার প্রথমাংশে ওয়াদা-অঙ্গীকার রক্ষায় গুরুত্বারোপের পর হালাল ও হারামের আলোচনা শুরু হয়েছিল। অতঃপর বিশেষ বিশেষ সামঞ্জস্যহেতু অন্যান্য উপাদেয় বিষয়েরও আলোচনা এসে গেছে। সকল প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পূর্ণ করে আয়াত ৮৭ থেকে পুনরায় আসল আলোচ্য বিষয়ের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে।

আর এও উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী রুকূতে আলোচিত বিষয়ের সঙ্গে বর্তমান রুকূর বিষয়ের সামঞ্জস্য রয়েছে। কারণ, পূর্ব রুকূতে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের যেসব দোষ বর্ণিত হয়েছে, তার সারবস্তু ছিল দুটি। এক, দুনিয়ার কামনা-বাসনা ও হারামখোরীতে ইহুদীদের লিপ্ততা, যা ওদের জন্য দীন-ধর্ম থেকে উদাসীনতার কারণ হয়। দুই, ধর্মের ব্যাপারে খ্রিস্টানদের বাড়াবাড়ি, যা পরিণতিতে বৈরাগ্য ইত্যাদির কারণ হয়।

নিয়ত ও আসল উদ্দেশ্যের দিক থেকে বৈরাগ্য এক হিসাবে প্রশংসনীয় হতে পারত এবং এ জন্যই ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا কে প্রশংসার স্থলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় বৈরাগ্যকে দীনদারী বা রূহানিয়্যাত (আধ্যাত্মিকতা) এর মারাত্মক বদহজমি বলা উচিত। কেননা, এ ধরনের বৈরাগ্য ও সংসার-ত্যাগ সেই মহান উদ্দেশ্য ও কুদরতী নিয়মের পথে বাধা, যা বিশ্বস্রষ্টা জগত সৃষ্টির মধ্যে নিহিত রেখেছেন। এ জন্য যে স্বভাবজাত ও সার্বজনীন ধর্ম সকল যুগের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সংশোধন ও ইহ-পরকালীন সাফল্য বহন করে নিয়ে এসেছে, সে ধর্মের মধ্যে ইবাদতের এহেন বেদআতী পন্থার জোরদার সমালোচনা থাকা অত্যাবশ্যক ছিল। (বর্তমান আয়াতেও এ পন্থার খণ্ডন করা হয়েছে এবং হালালকে হারাম করতে নিষেধ করা হয়েছে)

আয়াতের সারমর্ম

আজ পর্যন্ত কোন আসমানী কিতাব মানব সভ্যতার প্রত্যেক বিভাগ সম্পর্কে এমন সার্বজনীন, ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা পেশ করতে পারেনি, যা কুরআন কারীম এ দুটি আয়াতে পেশ করেছে।

৮৯. আল্লাহ তোমাদের নিরর্থক কসমের কারণে তোমাদের পাকড়াও করেন না[১], কিন্তু সেসব কসমের কারণে তোমাদের ধরেন, যা তোমরা শক্তভাবে সম্পন্ন কর। সুতরাং তার কাফফারা

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْۤ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ

আয়াত দুটিতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের পরিষ্কারভাবে বারণ করে দিয়েছেন, তারা যেন কোন হালাল ও পবিত্র দ্রব্যকে বিশ্বাসগতভাবে বা কার্যত নিজেদের জন্য হারাম সাব্যস্ত না করে। শুধু তাই নয়, বরং আল্লাহর সৃষ্ট হালাল, পবিত্র নে'য়ামতরাজি তাদের উপভোগ করতে উৎসাহিত করেছেন। তবে নেতি ও ইতিবাচক দুটি শর্তসাপেক্ষে। **এক**, সীমালঙ্ঘন করবে না; **দুই**, তাক্ওয়া অবলম্বন করবে। সীমালঙ্ঘণের দুই অর্থ হতে পারে– হালাল বস্তুসমূহকে হারাম দ্রব্যাদির মত মনে করা এবং খ্রিস্টানদের ন্যায় বৈরাগ্যে লিপ্ত হয়ে যাওয়া; অথবা হালাল ও পবিত্র দ্রব্যাদি উপভোগ করতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ভোগ্য ও কাম্য বস্তু-সামগ্রীতে লিপ্ত হয়ে ইহুদীদের মত পার্থিব জীবনকেই নিজেদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নেওয়া। মোটকথা, বাড়াবাড়ি ও ঔদাসীন্যের মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণ পথই অবলম্বন করা উচিত– পার্থিব ভোগবাদে নিমজ্জিত হওয়ারও অনুমতি নেই, বৈরাগ্যহেতু মুবাহ ও পবিত্র দ্রব্যাদি বর্জনেরও অনুমতি নেই।

'বৈরাগ্যহেতু' শর্তটি এ জন্য যে, কোন সময় শারীরিক চিকিৎসার খাতিরে কোন মুবাহ দ্রব্য থেকে সাময়িকভাবে বিরত থাকা উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুরূপ, মুসলমান তাক্ওয়া অবলম্বনে আদিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে নিষিদ্ধ বস্তু-সামগ্রী থেকে বিরত থাকতে হবে। অভিজ্ঞতা বলে যে, কোন কোন মুবাহ দ্রব্যের ব্যবহার কোন কোন সময় হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ করার প্রতি আকৃষ্ট করে। এমন মুবাহ বস্তুকে কসম ও মানত করে বা ইবাদতরূপে নয়, বরং মুবাহ হওয়ার আকীদা রাখা সত্ত্বেও সতর্কতাহেতু যদি বর্জন করে তবে তা বৈরাগ্য নয়; বরং তাক্ওয়া-পরহেজগারীর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে রয়েছে-

لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا مما به باس (ترمذي)

অর্থাৎ 'কোনো বান্দা মুত্তাকীর স্তরে পৌঁছবে না, যাবৎ না সে ক্ষতিকর বিষয়ে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে এমন বিষয়ও বর্জন করে চলবে, যার মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই।' (জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৬১৯)

মোদ্দাকথা, সীমালঙ্ঘন না করার ও তাক্ওয়া অবলম্বন করার শর্ত অক্ষুণ্ন রেখে মুমিন ব্যক্তি সব রকমের পবিত্র বস্তু উপভোগ করতে পারে।

১. অর্থাৎ এমন কসম ভঙ্গ করলে দুনিয়ায় কোন কাফ্ফারা নেই, যেমন 'মুন'আকিদাহ' (ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করার ইচ্ছাকৃত কসম) এর ক্ষেত্রে কাফ্ফারা ওয়াজিব। নিরর্থক কসমের তাফসীর ২য় পারার শেষের দিকে (সূরা বাকারা, আয়াত ২২৫) আলোচিত হয়েছে।

পূর্বে যেহেতু পবিত্র দ্রব্যাদি হারাম করা সম্পর্কে আলোচনা ছিল এবং হারাম করণের একটি উপায় কসমও বটে, সেহেতু এস্থলে কসমের বিধান বর্ণিত হচ্ছে।

الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗۤ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَاحْفَظُوْۤا اَيْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

হচ্ছে- দশজন অভাবীকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দেওয়া[১] যা তোমরা নিজেদের পরিবারবর্গকে খেতে দিয়ে থাক, অথবা দশজন অভাবীকে পোশাক দেওয়া[২], অথবা একজন দাস মুক্ত করা[৩]। তবে যে ব্যক্তি (এসব বস্তুর কোনটি) না পাবে (অর্থাৎ যার সামর্থ্য নেই), তাকে তিন দিন রোযা রাখতে হবে[৪]। এ তোমাদের কসমের কাফফারা, যখন তোমরা কসম করে বস (এবং তা ভঙ্গ কর)। আর তোমরা নিজেদের কসমের হেফাজত কর[৫]। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বিধি-বিধান বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা শোকর কর[৬]।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

৯০. হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, পূজার বস্তু ও জুয়ার তীর[৭]– (এ সবই) অপবিত্র, শয়তানের কাজ। অতএব এসব থেকে দূরে

---

১. অর্থাৎ কসম ভঙ্গ করলে এ কাফ্ফারা দিতে হবে। খাদ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে ইখতিয়ার আছে- চাই দশজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে, অথবা প্রত্যেক মিসকীনকে 'সদকায়ে ফিতর'-এর সমান খাদ্যশস্য বা তার মূল্য দিয়ে দেবে।

২. শরীরের অধিকাংশ ঢেকে যায়, এ পরিমাণ কাপড় দিবে। যেমন, এক জোড়া জামা ও পায়জামা, বা লুঙ্গি ও চাদর।

৩. অর্থাৎ একটি দাস মুক্ত করতে হবে। তার মুমিন হওয়া শর্ত নয়।

৪. অর্থাৎ অনবরত তিন দিন রোযা রাখবে। আর সামর্থ্য না হওয়ার অর্থ এই যে, সে নেসাব পরিমান সম্পদের মালিক নয় – রূহুল মাআনী।

৫. কসমের হেফাজতের অর্থ এই যে, প্রয়োজন ছাড়া কথায় কথায় কসম খাবে না; এ অভ্যাস ভাল নয়। আর কসম খেলে তা যথাসাধ্য পূর্ণ করবে এবং কোন কারণে ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দেবে। এ সবই 'কসমের হেফাজত'–এর অন্তর্ভুক্ত।

৬. তাঁর কত বড় অনুগ্রহ যে, আমরা পবিত্র দ্রব্যাদি পরিহার করতে গেলাম, আর তিনি তা করতে নিষেধ করে দিলেন। এবং কেউ ভুলে পবিত্র দ্রব্যাদি নিজের জন্য হারাম সাব্যস্ত করে ফেললে, তাকে কসমের হেফাজতের সাথে তা থেকে হালাল হওয়ার পন্থাও শিখিয়ে দিলেন।

৭. أنصاب ও أزلام এর তাফসীর এই সূরারই প্রথম দিকে ৩নং আয়াতের অধীনে করা হয়েছে। তা দ্রষ্টব্য।

الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হও[১]।

১. মদ সম্পর্কে এই আয়াতের পূর্বেও কিছু আয়াত নাযিল হয়েছিল। সর্বপ্রথম যে আয়াত নাযিল হয় তা হচ্ছে—

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

('লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়ার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, 'এ উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহা পাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও। আর এগুলোর গোনাহ এগুলোর উপকার থেকে অনেক বড়।' –সূরা বাকারা, আয়াত ২১৯)। যদিও এ আয়াতে ভবিষ্যতে মদ হারাম করার প্রতি খুবই স্পষ্ট ইঙ্গিত বোঝা যাচ্ছিল, কিন্তু যেহেতু এতে পরিষ্কারভাবে তা বর্জনের আদেশ ছিল না, তাই হযরত উমর (রা) বললেন : اَللّٰهُمَّ بين لنا بيانا شافيا 'আয় আল্লাহ! আমাদের জন্য সান্ত্বনা-দানকারী বর্ণনা অবতীর্ণ করুন'।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হল : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٰى ('হে ঈমানদারগণ! তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না নেশাগ্রস্ত অবস্থায়।' –সূরা নিসা, আয়াত ৪৩) এতেও মদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্টতা ছিল না, যদিও নেশার অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়। তবে এই লক্ষণ ছিল যে, খুব সম্ভব অচিরেই এ বস্তু সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু যেহেতু আরব দেশে মদ্যপানের রীতি চরমে পৌছে গিয়েছিল এবং তা হঠাৎ করে ছাড়ানো মদ্যপায়ীদের অবস্থা বিবেচনায় সহজ ব্যাপার ছিল না, সে জন্য অত্যন্ত হেকমতের সাথে সর্বাগ্রে তাদের অন্তরে এর প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং ধীরে ধীরে এর অবৈধতার বিধান তাদের অন্তরে অন্তরঙ্গ করে তোলা হয়েছে। এই দ্বিতীয় আয়াত শুনে হযরত উমর (রা) পুনরায় সেই শব্দাবলিই বললেন- اَللّٰهُمَّ بين لنا بيانا شافيًا।

পরিশেষে সূরা 'মায়েদা'র এই আয়াতগুলি يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا থেকে فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ পর্যন্ত অবতীর্ণ হল, যার মধ্যে পরিষ্কারভাবে মূর্তিপূজার ন্যায় এই নোংরা জিনিস থেকেও বেঁচে থাকার নির্দেশ দান করা হয়। সে মত হযরত উমর (রা) فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ শোনামাত্রই উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, انتهينا انتهينا (আমরা বিরত হলাম, আমরা বিরত হলাম– তিরমিযী, হাদীস ৩০৫০)। —লোকেরা মদের পাত্রগুলি ভেঙ্গে ফেলল, মদের দোকান-পাট ধ্বংস করে দিল; মদীনার অলি-গলিতে মদ,পানির মত প্রবাহিত হতে থাকল। সমগ্র আরবভূমি এ অপবিত্র মদ বর্জন করে আল্লাহর মারেফত এবং নবী-প্রেম ও আনুগত্যের 'পবিত্র শরাব' পান করে মাতোয়ারা হয়ে গেল। আর সকল ভ্রষ্টতার উৎস মদের মোকাবেলায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই জেহাদ এমনি সফল হল, যার নজীর ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

আল্লাহর কুদরত লক্ষ করুন, কুরআন কারীম বহুকাল পূর্বে যে জিনিস এত কঠোরভাবে নিষেধ করেছিল, আজ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মদ্যপায়ী দেশ আমেরিকা প্রভৃতিও এ মদের ভয়াবহ অপকারিতা ও ক্ষতি হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছে। فلله الحمد والمنة

৯১. শয়তান তো এ-ই চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখবে। অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে?[১]

إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ
فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۝٩١

৯২. তোমরা আল্লাহর আদেশ মান্য কর ও রাসূলের আদেশ মান্য কর এবং (তাঁদের অবাধ্যতা থেকে) বেঁচে থাক। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ, আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া[২]।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا
عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝٩٢

৯৩. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা (পূর্বে) কিছু খেয়ে থাকলে তাতে তাদের কোনো গোনাহ নেই, যদি তারা (ভবিষ্যতে আল্লাহকে) ভয় করে চলে এবং ঈমান আনে ও নেক আমল করে, অতঃপর ভয় করে চলে ও ঈমান আনে, পুনরায় ভয় করে চলে ও সৎকর্ম করে। আর আল্লাহ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا
اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ
اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ

---

১. মদ্যপানে বুদ্ধি লোপ পেলে অনেক সময় মদ্যপায়ীরা পাগল হয়ে পরস্পর হানাহানি শুরু করে দেয়। এমনকি, নেশা চলে যাওয়ার পরও কোন কোন সময় হানাহানির প্রতিক্রিয়া বাকী থাকায় পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা স্থায়ী হয়ে যায়। জুয়ার ক্ষেত্রেও ঠিক একই বরং আরো বেশি মারাত্মক অবস্থা হয়। এতে হার-জিতের ফলে দারুণ ঝগড়া-বিবাদ ও ফাসাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, যাতে শয়তানের গোলমাল পাকানোর বড় সুযোগ হাতে আসে। —এ তো হল জাহেরী খারাবী। আর এ সবের বাতেনী ক্ষতি এই যে, এগুলোতে লিপ্ত হয়ে মানুষ আল্লাহ তাআলার স্মরণ ও তাঁর ইবাদত থেকে একেবারে গাফেল হয়ে পড়ে। অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনই এর প্রমাণ। এসব জিনিস বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় দিক থেকে এত ক্ষতিকর হওয়ার কথা শুনেও কি একজন মুসলমান তা থেকে ফিরে না এসে পারে?

২. যদি তোমরা কোন জিনিসের লাভালাভ ও ক্ষয়-ক্ষতি উপলব্ধি করতে নাও পার, তবুও আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের হুকুম-আহকাম মেনে চল এবং তাঁদের আইনের অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাক। যদি না বেঁচে চল, তবে মনে রেখো, আমার নবী আল্লাহর আইন ও বিধানের কথা তোমাদের পরিষ্কারভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এখন অবাধ্যতার পরিণতি কী হবে তা তোমরা নিজেরাই বুঝে নাও।

সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন[১]।	يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ۝

১. **শানে নুযূল**

অত্যন্ত সহীহ ও শক্তিশালী হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, মদ হারাম হওয়ার আয়াতগুলি নাযিল হলে সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! সেই মুসলমানদের কী অবস্থা হবে, যারা মদ হারাম হওয়ার বিধান আগমনের পূর্বে মদ পান করেছিল এবং সেই অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে? যেমন, কতক সাহাবী মদ পান করে উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন এবং পেটে মদ থাকা অবস্থায়ই শহীদ হয়েছেন।—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বর্তমান আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তিরমিযী, হাদীস ৩০৫১; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৩৫০)

আয়াতের মর্ম

শব্দাবলির ব্যাপকতা ও অন্যান্য রেওয়ায়েত দৃষ্টে এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, জীবিত হোক বা মৃত- যারা ঈমান রাখে ও নেক আমল করে, তাদের জন্য কোন মুবাহ দ্রব্য, মুবাহ থাকাকালীন খাওয়ায় কোন দোষ নেই। বিশেষত যখন তারা সকল অবস্থায় তাক্‌ওয়া ও ঈমানের গুণাবলিতে গুণান্বিত হয়, অতঃপর এই গুণাবলিতে সর্বদা উন্নতি করতে থাকে। এমনকি, তাক্‌ওয়া ও ঈমানের স্তরসমূহে উন্নতি করতে করতে তারা 'এহসানের' স্তরে গিয়ে পৌঁছে, যা একজন মুমিনের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির শেষ 'মাকাম', যেখানে পৌঁছার পর আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দার সাথে খাছ মহব্বত করে থাকেন। হাদীসে জিবরাঈলে রয়েছে- الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ('এহসান' হচ্ছে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ)। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩০৫২)

সুতরাং যে পাক-পবিত্র সাহাবীগণ ঈমান ও তাক্‌ওয়ার মধ্যে জীবন কাটিয়ে এবং এহসানের স্তর হাসিল করে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গিয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে এ ধরনের সংশয় ও দ্বিধা-সন্দেহ করার মোটেই অবকাশ নেই যে, তাঁরা এমন একটা দ্রব্য ব্যবহার করাবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, যা তখন হারাম না হলেও পরে হারাম হয়েছে।

আয়াতে اتقوا ও آمنوا একাধিকবার উল্লেখের তাৎপর্য

মুহাক্কিক ব্যক্তিগণ লিখেছেন, তাক্‌ওয়ার (অর্থাৎ দীনী বিবেচনায় ক্ষতিকর বিষয়াবলি থেকে বেঁচে থাকার) কয়েকটি স্তর রয়েছে। আর ঈমান ও বিশ্বাসের স্তরসমূহও শক্তি ও দুর্বলতার দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন। অভিজ্ঞতা ও কুরআন-হাদীসের আলোকে এ সত্য প্রমাণিত যে, মানুষ (আল্লাহর) যিকর-ফিকির, নেক আমল ও আল্লাহর পথে জেহাদের মধ্যে যে পরিমাণ উন্নতি লাভ করতে থাকে, ঠিক সেই পরিমাণ আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ঈমান ও প্রত্যয় দৃঢ় ও অটল হতে থাকে। আলোচ্য আয়াতে যে ঈমান ও তাক্‌ওয়ার একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে- (ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا...), এর দ্বারা (سير إلى الله) তথা আল্লাহ-অভিমুখে যাত্রার স্তরসমূহের এই উন্নতি ও উত্থানেরই দিকে ইশারা করা হয়েছে, সাথে সাথে এই অভিযাত্রার সর্বশেষ মাকাম 'এহসান' ও তার সুফল সম্পর্কেও জ্ঞাত করা হয়েছে।

আর কতক সাহাবী সম্পর্কে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার উত্তর একটি ব্যাপক মূলনীতি বর্ণনাপূর্বক এমন ভাষায় দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা তাদের ফজীলত ও মর্যাদার প্রতিও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত হয়ে গেছে।

[রুকূ - ১৩]

৯৪. হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের | يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ

বি. দ্র.

সহীহ হাদীস-ভাণ্ডারে দুটি স্থান এমন পাওয়া যায়, যেখানে সাহাবীগণ এ রকমের প্রশ্ন করেছেন। একটি তো হচ্ছে 'মদ' হারাম হওয়ার ব্যাপারে। আর দ্বিতীয়টি কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা কেবলা পরিবর্তনের হুকুমের পূর্বে মারা গিয়েছেন এবং কাবার দিকে মুখ করে এক ওয়াক্ত নামাযও পড়ে যেতে পারেননি, তাদের নামাযের কী হবে?' এরই উত্তরে নাযিল হয়– وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম দয়ালু, অতি মেহেরবান।' –সূরা বাকারা, আয়াত ১৪৩) [মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২৭৭৫; তিরমিযী, হাদীস ২৯৬৪]

গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়– এ দুটি বিষয়ই (মদের অবৈধতা ও কেবলা পরিবর্তন) এমন ছিল যে, এদের সম্পর্কে পরিষ্কার মীমাংসাকারী হুকুম আগমনের পূর্বেই এমন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও লক্ষণাদি বর্তমান ছিল, যার প্রতি লক্ষ করে সাহাবীগণ প্রতি মুহূর্তে স্পষ্ট বিধান আগমনের অপেক্ষা করছিলেন। মদ সম্পর্কে তো একটু আগেই এমন হাদীসসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে আমাদের বক্তব্যের পক্ষে প্রয়োজনেরও বেশি প্রমাণ পাওয়া যায়। আর কেবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে দ্বিতীয় পারার শুরুতে রয়েছে- قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ('নিশ্চয় আমি বার বার আপনার মুখ আকাশের দিকে উঠতে দেখছি। সুতরাং আমি অবশ্যই আপনাকে এমন কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা আপনি পছন্দ করেন।' বাকারা :১৪৪) এতে জানা গেল যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা অপেক্ষায় ছিলেন যে, কখন কেবলা পরিবর্তনের হুকুম নাযিল হবে। বলা বাহুল্য, এমন পরিষ্কার অবস্থা সাহাবীদের নিকট গোপন থাকতে পারে না। এ জন্যই কেবলা পরিবর্তনের হুকুম আসার পর এক ব্যক্তি যখন এক মহল্লার মসজিদে গিয়ে তা শোনালেন, তখন নামাযরত সকলে এক ব্যক্তির সংবাদেই বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে কাবার দিকে ফিরে গেলেন। অথচ বাইতুল মুকাদ্দাস অকাট্যভাবে কেবলা ছিল। আর এক ব্যক্তির সংবাদ ظني হওয়ায় তা অকাট্য বিষয়ের জন্য ناسخ হতে পারে না। তাই উসূলুল ফিকহের আলেমগণ বিষয়টাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে– সত্যতার বিভিন্ন পূর্ব লক্ষণাদি থাকার কারণে এই একক সংবাদই অকাট্য বলে গৃহীত হয়।

সুতরাং যেসব লক্ষণ ও ইঙ্গিত পরিষ্কারভাবে জানান দিচ্ছিল যে, আজ-কালের মধ্যেই 'মদের অবৈধতা' ও 'কেবলা পরিবর্তন' এর হুকুম এসে যাবে, তা যেন স্পষ্ট হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বেই সাহাবীদেরকে আল্লাহর মর্যি সম্পর্কে মোটামুটিভাবে জ্ঞাত করছিল। এ জন্যই এ দুটি বিষয়ে হুকুম আগমনের পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা অবান্তর নয়, বিশেষত মদ সম্পর্কে, যার অবৈধতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ইত্যাদিতে বর্তমান ছিল।

مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

পরীক্ষা করবেন একটি বস্তু অর্থাৎ ঐ শিকার দ্বারা, যা পর্যন্ত তোমাদের হাত ও তোমাদের বর্শা পৌছে[১], যাতে আল্লাহ জেনে নেন- কে তাঁকে না দেখে ভয় করে। এর পরও যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি[২]।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا

৯৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা এহরাম অবস্থায় শিকার হত্যা করো না[৩]। তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করবে[৪], (তার উপর

---

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

পূর্বের রুকূতে আল্লাহ তাআলা পবিত্র দ্রব্যাদি হারাম করতে ও সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন এবং এমন কয়েকটি জিনিস বর্জন করার আদেশ দিয়েছেন যা সর্বদার জন্য হারাম। বর্তমান রুকূতে এমন কতক কাজ করতে নিষেধ করা হচ্ছে, যা সর্বদার জন্য হারাম নয়, বরং বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতিতে হারাম। যেমন, এহরামের অবস্থায় শিকার করা। আয়াতের মর্ম হল- অনুগত ও আজ্ঞাবহ বান্দাদের জন্য খোদার তরফ থেকে পরীক্ষা এই যে, এহরামের হালতে যখন শিকার তাদের সামনে পড়ে এবং সহজেই তা মারা বা ধরার সামর্থ্য হয়, তখন এমন কে আছে, যে আল্লাহ তাআলাকে না দেখেও তাঁর ভয়ে তাঁর হুকুম পালন করে এবং শিকার হত্যা না করে?

সূরা বাকারার মধ্যে اصحاب سبت এর ঘটনা বিবৃত হয়েছে (আয়াত : ৬৫-৬৬ দ্রষ্টব্য)। আল্লাহ তাআলা ওদের শুধু শনিবার দিনে মাছ শিকার করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু ওরা চালাকী ও কৌশল করে এই নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করে ও সীমালঙ্ঘন করে। ফলে আল্লাহ ওদের উপর খুবই অপমানকর আযাব নাযিল করলেন। অনুরূপ, আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মদিয়ার একটু পরীক্ষা নিলেন যে, তারা এহরামের অবস্থায় শিকার না করুক। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন এ হুকুম অবতীর্ণ হয়, তখন শিকার এত বেশি ও নিকটবর্তী ছিল যে, হাতে ও বর্শায় তা মারা যেত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীগণ প্রমাণ করে দেখালেন যে, আল্লাহর পরীক্ষায় পৃথিবীর আর কোন জাতি তাঁদের মত কৃতকার্য হতে পারেনি।

২. لِيَعْلَمَ اللّٰهُ শব্দ দ্বারা সন্দেহ হয়, তাহলে কি আল্লাহ তাআলার ইলম حادث (যা এক সময় ছিল না, পরে অর্জিত হয়েছে)? এর নিরসনের জন্য দ্বিতীয় পারার শুরুতে إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ (বাকারা, আয়াত ১৪৩) এর তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৩. এ বিষয়ে কিছু আলোচনা সূরা মায়েদার শুরুতে (আয়াত ১) অতিবাহিত হয়েছে।

৪. مُتَعَمِّدًا (ইচ্ছাকৃতভাবে) মারার অর্থ এই যে, সে যে মুহরিম তা তার স্মরণ আছে এবং এও জানা আছে যে, এহরাম অবস্থায় শিকার করা জায়েয নয়; তারপরও শিকার করল।

فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۹۵﴾

ওয়াজিব হবে) বিনিময় অর্থাৎ সে যা হত্যা করেছে তার অনুরূপ গৃহপালিত পশু; যা নির্ণয় করবে তোমাদের মধ্যকার দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এবং যা 'হাদি'রূপে কা'বায় (তথা হেরেমে) পৌছবে। অথবা (তার উপর ওয়াজিব হবে) কাফফারা —কয়েকজন অভাবীকে খাওয়ানো অথবা তার সমপরিমাণ রোযা[১]। (এ বিধান এ জন্য), যাতে সে স্বকর্মের শাস্তি ভোগ করে। যা পূর্বে হয়েছে, আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন[২]। আর যে কেউ পুনরায় (তা) করবে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, শাস্তি প্রদানকারী[৩]।

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا

৯৬. তোমাদের জন্য দরিয়ার শিকার ও তার খাদ্যবস্তু হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও

এখানে শুধু مُتَعَمِّد (স্বেচ্ছায় শিকারকারী) এর হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার উপর বিনিময় বা কাফফারা ওয়াজিব। বাকী থাকল আল্লাহর শাস্তি, তা তো আপন জায়গায় রয়েছেই। যেমন ইরশাদ হয়েছে- ('যে কেউ পুনরায় তা করবে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন।')— আর ভুলে শিকার করলে হুকুম একই থাকবে, অর্থাৎ 'হাদি' বা 'খাদ্য' প্রদান করা অথবা 'রোযা' রাখা। তবে আল্লাহ শাস্তি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেবেন।

১. হানাফী মাযহাবে মাসলা এই যে, এহরাম অবস্থায় শিকার ধরলে তা ছেড়ে দেওয়া ফরয। মেরে ফেললে বিশ্বস্ত মানুষের মধ্য থেকে দুজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই জন্তুর মূল্য নির্ধারণ করবে, এবং এ পরিমাণ দামের একটি গবাদি পশু (যেমন ছাগল, গরু, উট ইত্যাদি) কাবার নিকট অর্থাৎ হেরেমের সীমার ভিতর যবেহ করবে এবং নিজে তা থেকে খাবে না। অথবা ঐ মূল্যের খাদ্যশস্য অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করবে এবং প্রত্যেককে সদকা ফিতরের সমপরিমাণ দেবে। অথবা যে সংখ্যক অভাবীকে তা দেওয়া যেত, তত দিনের রোযা রাখতে হবে।

২. অর্থাৎ উক্ত বিধান অবতরণের পূর্বে বা ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতের আমলে কেউ এমন কাজ করে থাকলে এখন আল্লাহ তাআলা তার কারণে পাকড়াও করবেন না, যদিও ইসলামপূর্ব কালেও এহরাম অবস্থায় শিকার করাকে আরববাসীরা খুবই খারাপ জানত। এ জন্য পাকড়াও করলে তা অসমীচীন হত না। কারণ তার অর্থ হত– যে বিষয় তোমাদেরই কাছে পাপ বলে বিবেচিত হত, তা করলে কেন?

৩. অর্থাৎ কোন পাপী তাঁর পাকড়াও থেকে পালাতে পারবে না এবং সুবিচার ও হেকমতের দাবি অনুযায়ী যে পাপ শাস্তিযোগ্য, তা আল্লাহ মাফও করবেন না।

لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٩٦﴾

(সকল) সফরকারীর উপকারার্থে। এবং তোমাদের জন্য স্থলের শিকার হারাম করা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এহরাম অবস্থায় থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাঁর নিকট তোমাদের সমবেত করা হবে[১]।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ۗ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ

৯৭. আল্লাহ সম্মানিত ঘর কা'বাকে মানব জাতির স্থিতি বানিয়েছেন, এবং সম্মানিত মাস, হেরেমে প্রেরিত কুরবানীর পশু এবং গলায় মালাপরানো পশুগুলিকেও[২]। এটা এ জন্য,

---

১. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, এহরাম অবস্থায় পানির শিকার অর্থাৎ মাছ হালাল এবং পানির খাদ্য অর্থাৎ যে মাছ পানি থেকে পৃথক হয়ে আপনিই মরে গেছে, সে ধরেনি, তাও হালাল। আল্লাহ তাআলা বলেন যে, তোমাদের উপকারার্থে এ অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কেউ যেন মনে না করে, তা হজের বদৌলতে হালাল হয়েছে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা وللسيارة অর্থাৎ 'সকল সফরকারীর উপকারার্থে' কথাটি বলেছেন।

উল্লেখ্য, মাছ পুকুরে থাকলেও তা صيد البحر হিসাবে গণ্য হবে। এহরাম অবস্থায় শিকারের বিধান হচ্ছে এই, যা বর্ণিত হল। আর এহরাম অবস্থায় মূল লক্ষ্য থাকে মক্কা। এই মক্কা শহর ও আশপাশের শিকার বধ করা বরং তাকে ভয় দেখানো সর্বদার জন্য হারাম।

২. কাবা শরীফ ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় দিক থেকেই মানবজাতির স্থিতির কারণ। হজ ও উমরা তো এমন ইবাদত, যার সম্পাদন সরাসরি কাবারই সঙ্গে সম্পর্কিত। আর নামাযের জন্যও কেবলামুখী হওয়া শর্ত। এভাবে কাবা মানবজাতির দীনী ইবাদতের স্থিতির কারণ হল। তদুপরি হজ ইত্যাদি উপলক্ষে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের লাখ লাখ মুসলমান সেখানে সমবেত হওয়ায় অসংখ্য বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উপকার হাসিল হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা এ স্থানকে حرم آمن (বা নিরাপত্তাদানকারী হেরেম শরীফ) বানিয়েছেন। তাই শুধু মানুষই নয়, বরং অনেক জীবজন্তু পর্যন্ত সেখানে নিরাপত্তা লাভ করে। যখন জুলুম-অত্যাচার, হানাহানি ও ফেতনা-ফাসাদ মামুলি ব্যাপার ছিল, সেই জাহেলিয়াতের যুগেও হেরেম শরীফে একজন মানুষ স্বীয় পিতার হত্যাকারীকে পর্যন্ত কিছু করতে পারত না।

বস্তুগত দিক থেকেও এটা লক্ষ করে হতবাক হতে হয় যে, এই মরুভূমির বুকে কোথা থেকে খাওয়া-পরার উপকরণ ও উত্তম ধরনের ফলমূল এত প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়?! এ সব কিছুই قِيٰمًا لِّلنَّاسِ এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

সবচেয়ে বড় কথা এই যে, আল্লাহ তাআলার জ্ঞানে প্রথমেই সাব্যস্ত হয়েছিল যে, মানবজাতির জন্য এ স্থান থেকেই বিশ্বজনীন ও চিরন্তন হেদায়েতের উৎস প্রবাহিত হবে এবং

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٩٧﴾

যাতে তোমরা জানতে পার যে, যা কিছু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে রয়েছে আল্লাহ তা জানেন এবং আল্লাহ প্রত্যেক জিনিস সম্বন্ধে সম্যক অবহিত[১]।

সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক, নিখিল বিশ্বের সরদার মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় জন্মস্থান ও বাসস্থান হওয়ার মর্যাদাও সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এই পবিত্র স্থানটি লাভ করবে। এসব কারণেও কাবাকে قِيَامًا لِّلنَّاسِ বলা যেতে পারে। কেননা, কাবা সমগ্র পৃথিবীর মানবজাতির জন্য চরিত্রের পরিশোধন, আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতা বিধান ও হেদায়েতের উলূমের কেন্দ্রভূমি। আর কোন কিছুরই স্থিতি স্বীয় কেন্দ্র ছাড়া হতে পারে না।

এ ছাড়া বিজ্ঞ আলেমদের নিকট قِيَامًا لِّلنَّاسِ এর অর্থ এও যে, কাবা শরীফের বরকতময় অস্তিত্ব সারা বিশ্বের স্থিতি ও স্থায়িত্বের কারণ। দুনিয়ার বসতি ততদিন থাকবে, যতদিন কাবাগৃহ ও তার মর্যাদারক্ষাকারী মানুষ বর্তমান থাকবে। পৃথিবী নামক এই মহাকর্মশালা যখন বিলোপ করে দেওয়ার ইচ্ছা আল্লাহ তাআলার হবে, তখন সর্বাগ্রে 'বাইতুল্লাহ শরীফ' নামের মুবারক ঘরটিই উঠিয়ে নেওয়া হবে। সৃষ্টির সময় পৃথিবীর বুকে সর্বাগ্রে এ ঘরটিই বানানো হয়েছিল। বুখারী শরীফের হাদীসে আছে, এক কৃষ্ণকায় হাবশী কাবা গৃহের এক একটি পাথর খুলে ফেলবে । (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৫৯১, ১৫৯৬)

এই বিশ্বের ব্যবস্থাপনা যতদিন আল্লাহ তাআলার কায়েম রাখার ইচ্ছা, ততদিন যত শক্তিশালী জাতিই হোক না কেন, এই কাবাকে ধ্বংস করতে পারবে না। 'আসহাবে ফীল' (অর্থাৎ আবরাহা বাদশার হস্তিবাহিনী) এর ঘটনা সকলে শুনেছে। কিন্তু ওদের পরও যুগে যুগে কত জাতি ও ব্যাক্তি এই কুমতলব এঁটেছে এবং আঁটছে। এ একমাত্র আল্লাহর হেফাজত ও ইসলামের সত্যতার বিরাট নিদর্শন যে, আজ পর্যন্ত কেউ এই শয়তানী অভিসন্ধিতে কামিয়াব হতে পারেনি এবং পারবেও না।

আর যখন আল্লাহর তরফ থেকে কাবা ঘরের বিলুপ্তি সাধনে কোন বাধা থাকবে না, তখন বুঝতে হবে যে, গোটা বিশ্বের বিলুপ্তির হুকুম এসে গেছে। দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলি নিজেদের রাজধানী ও রাজপ্রাসাদের হেফাজতের জন্য লাখো সৈন্য বিসর্জন দিয়ে থাকে। কিন্তু কখনো কোন কল্যাণার্থে যদি নিজেরাই রাজপ্রাসাদকে পরিবর্তন বা সংস্কার করতে চায়, তবে মামুলি মজুরদের দিয়ে তা ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়। (তদ্রূপ আল্লাহর যখন ইচ্ছা হবে, একজন মামুলি হাবশীর হাতে কাবা শরীফ বিলুপ্ত হবে—অনুবাদক)

যা হোক, এহরামধারীর বিধান বর্ণনার পর আলোচ্য আয়াতে কাবা শরীফের মর্যাদা ও পবিত্রতা বয়ান করা উদ্দেশ্য। অতঃপর 'কাবা' ও 'এহরাম' এর সাথে সামঞ্জস্য থাকায় شهر حرام ও هدى এবং قلائد এরও আলোচনা করা হল।

১. অর্থাৎ কাবা ইত্যাদিকে قِيَامًا لِّلنَّاسِ বানানোর মাঝে আল্লাহ যেসব ধর্মীয় ও পার্থিব কল্যাণ বিবেচনায় রেখেছেন এবং বাহ্যত সম্পূর্ণ ধারণা-কল্পনা বহির্ভূত যে বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী কাবা

৯৮. তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা এবং আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٩٨

৯৯. রাসূলের দায়িত্ব কেবল পৌঁছিয়ে দেওয়া। আর আল্লাহ জানেন- যা তোমরা প্রকাশ্যে কর ও যা গোপনে কর[২]।

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ۝٩٩

১০০. আপনি বলে দিন, 'অপবিত্র ও পবিত্র সমান হতে পারে না', যদিও অপবিত্রের আধিক্য আপনাকে আশ্চর্যান্বিত করে। অতএব হে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা! আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হও[৩]।

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝١٠٠

সম্পর্কে করা হয়েছে, এসব এ সত্যেরই প্রমাণ যে, আকাশ ও পৃথিবী রাজ্যের কোন বস্তুই আল্লাহ তাআলার অসীম জ্ঞানের বাইরে নয়।

১. অর্থাৎ এহরামের অবস্থা বা কাবা ইত্যাদির মর্যাদা সম্পর্কে যে বিধান দেওয়া হল, যদি স্বেচ্ছায় তোমরা এর বিরোধিতা কর তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন। আর যদি ভুলক্রমে কিছু ত্রুটি হয়ে যায় এবং তারপর কাফ্ফারা ইত্যাদির দ্বারা ক্ষতিপূরণ করে নাও, তবে তিনি অতি ক্ষমাশীল ও মেহেরবানও বটে।

২. পয়গম্বর আলাইহিস সালাম আল্লাহর বিধান ও বাণী পৌঁছিয়ে দিয়ে নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করে ফেলেছেন এবং বান্দাদের উপর আল্লাহর হুজ্জত (দলীল) সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন প্রকাশ্যে ও গোপনে যেমন আমল করবে,তা সবই আল্লাহর সামনে রয়েছে। হিসাব ও প্রতিফলের দিন তার অনুপরমাণু তোমাদের সামনে উপস্থিত করা হবে।

৩. আগের রুকূতে বলা হয়েছিল, পবিত্র দ্রব্যাদিকে হারাম সাব্যস্ত না করে বরং ভারসাম্য রক্ষা করে সেসব উপভোগ করতে থাক। অতঃপর মদ ইত্যাদি কতিপয় নাপাক ও ঘৃন্য দ্রব্যের অবৈধতা বয়ান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গেই এহরামধারী ব্যক্তির শিকারকে হারাম করা হয়েছে, অর্থাৎ মদ, মৃত জন্তু ইত্যাদি দ্রব্য যেমন নাপাক, তেমনি মুহরিমের শিকারকে মনে কর। মুহরিম ব্যক্তির সঙ্গে মিল রেখে আরো কয়েকটি জিনিসের আলোচনার পর এখন ইরশাদ হচ্ছে যে, পবিত্র ও অপবিত্র দ্রব্য সমান হতে পারে না। স্বল্প জিনিস যদি পাক ও হালাল হয়, তা অনেক নাপাক ও হারাম দ্রব্য থেকে উত্তম। বুদ্ধিমানদের উচিত, সর্বদা পবিত্র ও হালাল বস্তু গ্রহণ করা এবং অপবিত্র ও মন্দ দ্রব্য দেখায় যতই বেশি হোক ও চমৎকার মনে হোক, তার প্রতি দৃষ্টি না দেওয়া।

[রুকূ - ১৪]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ

১০১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমনসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হলে তোমাদের অপছন্দ হবে। আর যদি তোমরা এসব বিষয়ে এমন সময়ে প্রশ্ন কর যখন কুরআন নাযিল করা হচ্ছে, তাহলে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেওয়া হবে[১]।

১. পূর্বের দুই রুকূর সারকথা ছিল ধর্মীয় বিধানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে বিরত থাকা। অর্থাৎ যেসব পবিত্র দ্রব্য আল্লাহ তাআলা হালাল করেছেন তা নিজেরা হারাম সাব্যস্ত না করা; আর যেসব বস্তু হারাম ও ঘৃণ্য, তা থেকে বিরত থাকা।—বর্তমান আয়াতসমূহে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, যেসব বিষয় আল্লাহ স্পষ্টভাবে বয়ান করেননি, সেসব সম্পর্কে অযথা ও নিরর্থক প্রশ্নাদি না করা। হালাল ও হারাম সম্পর্কে বিধানদাতার স্পষ্ট বর্ণনা দান যেমন বান্দার জন্য হেদায়েত ও জ্ঞান-তত্ত্বের কারণ, তেমনি (কোন কোন বিষয়ে) তাঁর মৌনতাও রহমত ও আসানীর কারণ। আল্লাহ তাআলা যে বস্তুকে পরিপূর্ণ হেকমত ও ইনসাফের দ্বারা হালাল বা হারাম করে দিয়েছেন, তা হালাল বা হারাম হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যে বিষয়ে নীরব থেকেছেন, তার মধ্যে অবকাশ ও প্রশস্ততা আছে। (ফলে) মুজতাহিদদের জন্য ইজতেহাদের সুযোগ হল। আমলকারীরা তা করা না করার মধ্যে স্বাধীন রইল।

এখন যদি এমন সব জিনিস সম্পর্কে খামাখা জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রশ্নের দ্বার খোলা হয়, তাও আবার এমন অবস্থায় যে, কুরআন শরীফ নাযিল হচ্ছে এবং শরী'য়তের বিধান অবতরণের দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে—তবে এই প্রশ্নাদির উত্তরে এমন কিছু বিধান অবতীর্ণ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে, যার পর তোমাদের উক্ত স্বাধীনতা ও অবকাশ আর থাকবে না। তখন নিজেদের চেয়ে নেওয়া বিধানের উপর আমল করে উঠতে না পারলে অত্যন্ত লজ্জার কথা হবে।

আল্লাহ তাআলার চিরন্তন নীতি এমন মনে হয় যে, যখন কোন বিষয়ে মানুষের পক্ষ থেকে বেশি বেশি প্রশ্ন ও খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং অযথা বিভিন্ন সম্ভাবনা বের করা হয়, তখন তাঁর দিক থেকে কঠোরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ, এ ধরনের প্রশ্নে প্রকাশ পায় যে, প্রশ্নকারীদের নিজেদের উপর আস্থা রয়েছে এবং যে বিধানই আসুক, তা মাথা পেতে নিতে তারা সর্বতোভাবে প্রস্তুত আছে। বান্দার দুর্বলতা ও মুখাপেক্ষিতা দৃষ্টে এ ধরনের দাবি অশোভন। এরূপ দাবি তাকে আল্লাহর দিক থেকে কিছুটা কঠোরতা আরোপের উপযুক্ত বানিয়ে দেয় এবং এমন প্রশ্ন করে সে নিজেকে যতখানি যোগ্য বলে প্রকাশ করে, সে অনুপাতে পরীক্ষাও কঠিন হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, বনী ইসরাঈলের 'গাভী যবেহ' করার ঘটনায় এমনই হয়েছিল।

عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

আল্লাহ সেসব ক্ষমা করে দিয়েছেন[১]। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, সহনশীল।

قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ

১০২. তোমাদের পূর্বে এক দল মানুষ এমনসব প্রশ্ন করেছিল। অতঃপর তারা সেসবের (অর্থাৎ প্রশ্নের উত্তরে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল,

---

সংশ্লিষ্ট কিছু বর্ণনা

হাদীসে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'হে লোকেরা! আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর হজ ফরয করেছেন।' এক ব্যক্তি বলে উঠল, 'প্রত্যেক বছর কি, ইয়া রাসূলাল্লাহ?' উত্তরে বললেন, 'যদি আমি হাঁ বলে দিতাম তবে প্রত্যেক বছরেই জরুরী হয়ে পড়ত এবং পরে তোমরা তা আদায় করতে পারতে না। যে বিষয়ে আমি তোমাদের স্বাধীনতা দান করি, সে সম্পর্কে তোমরাও আমাকে ছেড়ে দিয়ো (অর্থাৎ জিজ্ঞাসাবাদ করো না)' (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৩৩৭)।—অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন, 'মুসলমানদের মধ্যে সে ব্যক্তি অতি বড় অন্যায়কারী, যার প্রশ্নের কারণে এমন জিনিস হারাম করা হল যা হারাম ছিল না।' (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৭২৮৯)

যা হোক, আয়াতখানি শরী'য়তের বিধি-বিধান বিষয়ে এ ধরনের নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন প্রশ্নের দ্বার বন্ধ করে দিচ্ছে। অবশ্য কোন কোন হাদীসে যে আছে, কিছু লোক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছোট-খাট বিষয় সম্পর্কে অযথা প্রশ্ন করত, ফলে তা থেকে তাদের নিবৃত্ত করা হয়— সেসব হাদীস আমাদের এই কথার পরিপন্থী নয়। আমরা لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ এর أشياء শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে রাখছি, যাতে ছোট-খাট বিষয় ও বিধি-বিধান সবই এর আওতায় এসে পড়ে। অনুরূপ, تَسُؤْكُمْ শব্দটিকেও– যার অর্থ, খারাপ লাগা– ব্যাপক অর্থে রাখা হচ্ছে। সারকথা এই হবে যে, বিধানগত ব্যাপারেও অযথা প্রশ্ন করো না, ছোট ছোট বিষয়েও না। কেননা, সম্ভাবনা রয়েছে, যে উত্তর আসবে তা তোমাদের জন্য কঠিন হবে। যেমন, কোন কঠিন নির্দেশ এল, অথবা কোন শর্ত বর্ধিত হল, অথবা এমন বিষয় প্রকাশ পেল যাতে তোমাদের অপমান হয়, অথবা বেহুদা প্রশ্নের জন্য ধমকি শোনানো হল, এ সব অবস্থা تَسُؤْكُمْ এর আওতাধীন। —অবশ্য জরুরী বিষয় জিজ্ঞাসা করায় অথবা প্রমাণভিত্তিক সন্দেহ নিরসন কল্পে প্রশ্ন করায় কোন ক্ষতি নেই।

১. এর অর্থ হয়তো এই যে, সেসব বিষয়ে তিনি ছাড় দিয়ে দিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেসব বিষয়ে কোনো বিধান দেননি, সেসব সম্পর্কে মানুষ স্বাধীন। আল্লাহ তাআলা এসব বিষয়ে ধরপাকড় করবেন না।—এ থেকেই 'উসূলে ফিকহের' কোন কোন ইমাম এ মাসলা বের করেছেন যে, বস্তুনিচয়ের ক্ষেত্রে আসল হচ্ছে ইবাহাত অর্থাৎ বৈধতা, যে পর্যন্ত না শরীয়ত কোন কিছুকে অবৈধ ঘোষনা করে।

অথবা (আয়াতাংশের) অর্থ এই যে, ইতিপূর্বে যেসব অহেতুক প্রশ্ন করেছ, সেসব আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিলেন, ভবিষ্যতে সতর্ক থেকো।

তার) প্রত্যাখ্যানকারী হয়ে গেছে[১]।

১০৩. আল্লাহ 'বাহিরা', 'সায়েবা', 'ওয়াসীলা' ও 'হামী' স্থির করেননি, কিন্তু কাফেররা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে। আর ওদের অধিকাংশেরই বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই[২]।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

১০৪. যখন ওদের বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে আস', তখন ওরা বলে, 'আমরা আমাদের

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا

১. সহীহ হাদীসে আছে, পূর্ববর্তী অনেক জাতি বেশি বেশি প্রশ্ন এবং নবীগণের সঙ্গে মতবিরোধ করার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৩৩৭)

২. 'বাহীরা', 'সায়েবা', 'ওয়াসীলা' ও 'হামী'– এসব জাহেলি যুগের রীতি-নীতি ও নিদর্শন সংশ্লিষ্ট বিষয়। এগুলোর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের মধ্যে বহু মতভেদ রয়েছে। সম্ভাবনা আছে যে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি শব্দের প্রয়োগ বিভিন্ন অবস্থার উপর করা হত। আমরা বুখারী শরীফ (হাদীস ৪৬২৩) থেকে শুধু সাঈদ বিন মুসাইয়্যিবের তাফসীর এখানে নকল করছি :

'বাহীরা'– যে জন্তুর দুধ দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করা হত, কেউ তা নিজ কাজে ব্যবহার করত না। **'সায়েবা'**– বর্তমান কালের ষাড়ের মত যে জন্তুকে দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেওয়া হত। **'ওয়াসীলা'**– যে উটনী পর পর মাদী বাচ্চা জন্ম দিল, মধ্যখানে নর বাচ্চা পয়দা হল না, তাও দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দিত। **'হামী'**– যে পুরুষ উট এক বিশেষ সংখ্যক উটনীর সাথে সংগম করেছে, তাকেও দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দিত।

একে তো এসব ছিল শিরকের নিদর্শন। তাছাড়া, যে জন্তুর গোশ্‌ত বা দুধ খাওয়াকে বা যার উপর আরোহণ ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়াকে আল্লাহ তাআলা জায়েয করেছেন, তার বৈধতা-অবৈধতার বিষয়ে নিজের তরফ থেকে শর্তাবলি আরোপ করা হচ্ছে; যেন নিজেকে 'বিধানদাতার' মর্যাদায় সমাসীন করা। এই রীতি-নীতি আল্লাহ নির্ধারণ করেননি– বরং ওদের পূর্বপুরুষেরা আল্লাহর প্রতি এসব মিথ্যা আরোপ করেছে এবং অধিকাংশ নির্বোধ সাধারণ লোকেরা তা গ্রহণ করে নিয়েছে।

মোটকথা, এখানে এ মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, অযথা ও অনর্থক প্রশ্ন করে শরী'য়তের বিধানে সংকীর্ণতা ও কঠোরতা আনয়ন করা যেমন অন্যায়, তদ্রূপ বিধানদাতার নির্দেশ ছাড়া শুধু নিজ মতের ভিত্তিতে ও কামনার বশবর্তী হয়ে হালাল-হারাম সাব্যস্ত করা তার চেয়ে অনেক বড় অপরাধ।

عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ۝

বাপ-দাদাদের যাতে পেয়েছি, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' আচ্ছা! যদি ওদের বাপ-দাদারা কিছুই না জেনে থাকে এবং সুপথও না পেয়ে থাকে, (তবুও কি ওরা এমনই করবে)[১]?

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ

১০৫. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের ফিকির করা। যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না যদি তোমরা সুপথে থাক[২]। তোমাদের সকলকে

---

১. জাহেলদের সবচেয়ে বড় হুজ্জত এটাই হয়ে থাকে যে, যে কাজ বাপদাদারা করে এসেছে, তার অন্যথা কীভাবে করবে। (উত্তরে) ওদের বলা হয়েছে যে, যদি তোমাদের পূর্বপুরুষেরা নির্বুদ্ধিতা বা পথভ্রষ্টতার কারণে ধ্বংসের গহ্বরে পতিত হয়ে থাকে, তবুও কি তোমরা ওদেরই পথ অনুসরণ করবে?

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'বাপের হাল যদি জানা থাকে যে, তিনি সত্যের অনুসারী ও সুস্থ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তবে তার পথ অবলম্বন করবে, নতুবা তা অমূলক।' অর্থাৎ নিজ খুশীমত যে কারো অন্ধ অনুসরণ জায়েয নয়।

২. অর্থাৎ এতসব উপদেশ ও পথ-নির্দেশের পরও যদি কাফেররা শিরকী রীতি-নীতি ও বাপদাদাদের অন্ধ অনুকরণ থেকে বিরত না হয়, তবে তোমরা বেশি চিন্তা করো না। কারো গোমরাহীর কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না, যদি তোমরা সরল পথের অনুসারী হয়ে থাক। আর সরল পথ এ-ই যে, মানুষ ঈমান ও তাক্ওয়া অবলম্বন করবে, নিজে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং অন্যদের বিরত রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। এর পরও যদি কেউ তা থেকে বিরত না হয়, তবে এতে (তোমাদের) কোনো ক্ষতি নেই।

এই আয়াত থেকে এ কথা বুঝে নেওয়া মারাত্মক ভুল যে, কোন ব্যক্তি যখন নিজ নামায-রোযা ঠিক করে নেয়, তখন 'আমর বিল মা'রূফ' বা 'অন্যকে নেক কাজের আদেশ দান' ছেড়ে দিলে কোন ক্ষতি নেই। এটা ভুল। কারণ, اِذَا اهْتَدَيْتُمْ এর শর্ত যুক্ত করা হয়েছে, আর اهتداء এর মধ্যে 'আমর বিল মা'রূফ' এবং হেদায়েতের অন্য সব সংশ্লিষ্ট কাজ শামিল।

আয়াতটিতে বাহ্যত মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এতে সেই কাফেরদেরও সতর্ক করা উদ্দেশ্য, যারা বাপদাদার অন্ধ অনুসরণে এঁটে বসেছিল। অর্থাৎ— তোমাদের বাপদাদারা যদি সত্য পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তোমরা জেনেশুনে কেন ওদের অনুসরণ করে নিজেদের ধ্বংস করছ? ওদের ছেড়ে তোমরা নিজেদের পরিণাম চিন্তা কর এবং লাভ ও ক্ষতি বোঝার চেষ্টা কর। বাপদাদারা যদি পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে এবং সন্তানরা

إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ⑩

আল্লাহরই নিকট ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন, যা তোমরা করতে[১]।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ؕ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ

১০৬. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসিয়ত করার সময় তোমাদের মাঝে সাক্ষী হবে তোমাদের মধ্যকার[২] নির্ভরযোগ্য দু'ব্যক্তি[৩] অথবা তোমাদের ছাড়া অন্যদের থেকে দু'ব্যক্তি[৪] যদি তোমরা যমীনে সফরে গিয়ে থাক আর তখন তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় মৃত্যুর মুসিবত। তোমরা সেই দু'জনকে নামাযের পর থামাবে[৫] এবং তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তারা আল্লাহর নামে কসম করবে যে, আমরা কসমের বিনিময়ে কোন অর্থ গ্রহণ করি না, যদিও সে (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) আমাদের আত্মীয়

তাদের বিরোধিতায় সত্য পথ অনুসরণ করে, তবে বাপদাদাদের এই বিরোধিতা সন্তানদের পক্ষে মোটেই ক্ষতিকর নয়। কোন অবস্থাতেই মানুষ বাপদাদার পথের বাইরে পা রাখবে না, রাখলে নাক-কান কাটা যাবে– এ রকম চিন্তাধারা নিতান্তই মূর্খতাপ্রসূত। বুদ্ধিমানদের পক্ষে পরিণতি চিন্তা করা কর্তব্য। আর আগের-পিছের সকলেই যখন একত্রে আল্লাহ তাআলার সম্মুখীন হবে, তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমল ও পরিণতি দেখতে পাবে।

১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট রইল এবং যে সৎপথ অনুসরণ করল– সকলেরই নেক ও বদ আমল এবং সে সবের প্রতিফল সামনে পেশ করে দেওয়া হবে।

২. অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্য থেকে।

৩. এটা উত্তম। তবে যদি দুজন না হয় অথবা বিশ্বস্ত না হয়, তবুও 'ওসী' (وصي) বানাতে পারে। আর সাক্ষী দ্বারা এক্ষেত্রে ওসী উদ্দেশ্য এবং তার স্বীকারোক্তি ও তা প্রকাশ করাকে সাক্ষ্য বলা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ অমুসলিম দু'ব্যক্তি।

৫. অর্থাৎ আসরের নামাযের পর। কারণ, আসরের নামাযে লোক সমাগম বেশি হয়, আর তা দো'য়া কবুল হওয়ার সময়। ফলে তারা হয়ত ভয়ে মিথ্যা কসম খাবে না।—অথবা যে কোন নামাযের পর, আর ওসী ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলে ওদের প্রার্থনার পর।

اللّٰهِ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِیْنَ ﴿۱۰۶﴾

হয়, এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করি না। এরূপ করলে আমরা অবশ্যই গোনাহগারদের মধ্যে গণ্য হব[১]।

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰۤی اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ یَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِیْنَ اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْاَوْلَیٰنِ فَیُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَیْنَاۤ ۖ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۱۰۷﴾

১০৭. অতঃপর যদি জানা যায় যে, তারা দু'জন (ওয়ারিসদের হক গোপন করার) গোনাহতে লিপ্ত হয়েছে, তবে এ দু'জনের স্থানে যাদের হক গোপন করা হয়েছে তাদের মধ্য থেকে অন্য দু'জন দাঁড়াবে[২] যে দু'জন (মৃতের) সবচেয়ে নিকটবর্তী। এবং তারা আল্লাহর নামে শপথ করবে যে, 'আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই প্রথম দু'জনের সাক্ষ্য থেকে অধিক সত্য এবং আমরা সীমালঙ্ঘন করিনি। এরূপ করলে আমরা অবশ্যই জালেমদের মধ্যে গণ্য হব[৩]।'

---

১. যেহেতু সকলকে আল্লাহ তাআলার নিকট যেতে হবে, সুতরাং যাওয়ার পূর্বে সকল বিষয় ঠিক করে নেওয়া চাই। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে প্রয়োজনীয় বিষয়ের ওসিয়ত এবং এর আনুষঙ্গিক কাজকাম।

বর্তমান আয়াতগুলিতে উক্ত ওসিয়তের উত্তম পন্থা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ— মুসলমান ব্যক্তি মৃত্যুর সময় যদি কারো নিকট নিজ ধন-সম্পদ সোপর্দ করতে চায়, তবে উত্তম উপায় এই যে, দুজন মুসলমানকে সাক্ষী অর্থাৎ ওসী বানাবে। সফর ইত্যাদির অবস্থায় মুসলমান না পাওয়া গেলে দুজন অমুসলিমকেই ওসী বানাবে। অতঃপর ওসীরা কোন মাল গোপন করে ফেলেছে বলে যদি ওয়ারিসদের সন্দেহ হয় এবং ওয়ারিসরা তার জন্য বাদী হয়, কিন্তু দাবির পক্ষে তাদের সাক্ষী না থাকে, তবে ওসীদ্বয় কসম করে বলবে, 'আমরা কিছু গোপন করিনি এবং আমরা কোন লোভে বা আত্মীয়তার কারণে মিথ্যা বলতে পারি না। যদি বলি তবে আমরা পাপী।'

২. একজন হলেও ক্ষতি নেই।

৩. অর্থাৎ আলামত ও লক্ষণাদি দ্বারা যদি বোঝা যায় যে, ওসীরা মিথ্যা কসম করেছে এবং তারা শরী'য়তসম্মত সাক্ষ্য দ্বারা নিজেদের সত্যতা প্রমাণ করতে না পারে, তবে মৃতের ওয়ারিসরা কসম খেয়ে বলবে যে, 'ওসীদের কথার সত্যতার কোন ইলম আমাদের নেই এবং আমাদের সাক্ষ্য ওসীদের সাক্ষ্যের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য'।

শানে-নুযূল

এই আয়াতগুলির শানে-নুযূল এই যে, 'বুদাইল' নামে জনৈক মুসলিম 'তামীম' ও 'আদী' নামে (তখনও নাসারা) দুই ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় যান। সেখানে পৌছার

১০৮. এ (বিধান) নিকটতম পন্থা– তাদের সঠিকভাবে সাক্ষ্য দেওয়ার অথবা এ ভয় করার যে, (মিথ্যা বললে) তাদের কসমের পর (ওয়ারিসদের থেকে) কসম নেওয়া হবে[১]। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক ও শুনে রাখ। আল্লাহ নাফরমানদের সরল পথে পরিচালিত করেন না[২]।

ذٰلِكَ اَدۡنٰۤی اَنۡ یَّاۡتُوۡا بِالشَّهَادَۃِ عَلٰی وَجۡهِهَاۤ اَوۡ یَخَافُوۡۤا اَنۡ تُرَدَّ اَیۡمَانٌۢ بَعۡدَ اَیۡمَانِهِمۡ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسۡمَعُوۡا ؕ وَاللّٰهُ لَا یَهۡدِی الۡقَوۡمَ الۡفٰسِقِیۡنَ ﴿۱۰۸﴾

পর বুদাইল অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি তখন নিজ মালামালের একটি তালিকা লিখে সঙ্গীদ্বয়কে না জানিয়ে আসবাবের মধ্যে রেখে দেন। রোগ বৃদ্ধি পেলে তিনি নাসরানী সঙ্গীদ্বয়কে ওসিয়ত করলেন, তার সকল ধন-সম্পদ ওয়ারিসদের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে। ওরা আসবাবপত্র সবই ওয়ারিসদের হাতে সোপর্দ করল, কিন্তু সোনার কারুকার্য খচিত একটি রূপার পেয়ালা নিজেদের কাছে রেখে দিল। ওয়ারিসরা আসবাবের তালিকাটি পেয়ে ওসীদের জিজ্ঞাসা করে যে, মৃত ব্যক্তি কোন মালবিক্রি করেছিল কিনা অথবা বেশি অসুস্থ থাকায় চিকিৎসা ইত্যাদিতে কিছু খরচ হয়েছিল কিনা? উত্তরে ওরা দুজন 'না' বলে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদালতে পেশ করা হয়। (এখানে ওয়ারিসগন খেয়ানতের দাবিদার আর ওসীরা তা অস্বীকারকারী ছিল।) ওয়ারিসদের পক্ষে সাক্ষী না থাকায় খ্রিস্টান দু ব্যক্তিকে কসম করে বলতে বলা হল যে, 'আমরা মৃতের মালের মধ্যে কোন রকম খেয়ানত করিনি এবং তার কোন বস্তু গোপন করিনি।' তারপর কসমের ভিত্তিতে ওদের পক্ষে রায় দেওয়া হয়।

কিছু দিন পর জানা গেল, ওরা দুজনে উক্ত পেয়ালাটি মক্কার এক স্বর্ণকারের নিকট বিক্রি করে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলে ওরা বলল, আমরা তা মৃতের নিকট থেকে কিনেছিলাম। কিন্তু বেচাকেনার সাক্ষ্য না থাকায় এর উল্লেখ আমরা করিনি। মৃতের ওয়ারিসরা তখন পুনরায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বিচারপ্রার্থী হল। এবার প্রথমবারের উলটা ব্যাপার দাড়াল যে, ওসীরা কেনার দাবিদার আর ওয়ারিসরা এ দাবি অস্বীকারকারী। দাবিদারের পক্ষে সাক্ষী না থাকায় ওয়ারিসদের মধ্য থেকে মৃতের ঘনিষ্টতম দু'জন কসম করে বলল যে, পেয়ালাটি মৃতের মালিকানায় ছিল। আর এ দুই নাসরানী (আমাদের জানা মতে) নিজেদের কসমে মিথ্যাবাদী। সুতরাং যে এক হাজার দেরহাম মূল্যে ওরা পেয়ালাটি বিক্রয় করেছিল, তা ওয়ারিসদের দেওয়ানো হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ২৭৮০; জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩০১১-৩০১২; ফাতহুল বারী : ৫/৪১০)

১. অর্থাৎ ওয়ারিসদের সন্দেহ হলে ওসীদের থেকে কসম নেওয়ার বিধান রয়েছে, যেন কসমের ভয়ে তারা মিথ্যাচার না করে। অতঃপর যদি তাদের কথা মিথ্যা বলে প্রকাশ পায়, তবে ওয়ারিসরা কসম খাবে। এ-ও এ জন্যই যে, তারা (ওসীরা) যেন মিথ্যা কসম না করে। কারণ, তারা ভাববে যে, পরিশেষে আমাদের বিরুদ্ধে ওয়ারিসগণ থেকে কসম নেওয়া হবে। (মুযিহুল কুরআন)

২. আল্লাহর নাফরমানেরা পরিশেষে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকে, প্রকৃত সফলতার চেহারা দেখতে পায় না।

[রুকূ - ১৫]

১০৯. (ভয় কর সেই দিনকে), যেদিন আল্লাহ পয়গম্বরদের সমবেত করবেন, তার পর বলবেন, 'তোমাদের কী উত্তর দেওয়া হয়েছিল[১]?' তাঁরা বলবেন, 'আমাদের কিছু জানা নেই[২]। নিশ্চয় আপনিই গোপন বিষয়াদির পরিজ্ঞাতা।'

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَا ذَآ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝

১. হাশরের ময়দানে সমস্ত উম্মতের সম্মুখে পয়গম্বরদের এ প্রশ্ন করা হবে যে, দুনিয়াতে যখন তোমরা সত্যের পয়গাম নিয়ে তাদের নিকট গিয়েছিল, তখন তারা কী উত্তর দিয়েছিল এবং আল্লাহ তাআলার ডাকে কতটুকু সাড়া দিয়েছিল?

পূর্বা-পর সম্পর্ক

পূর্বের রুকূতে বলা হয়েছিল, আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে ওসিয়ত ইত্যাদির মাধ্যমে এখানকার (দুনিয়ার) ব্যবস্থাপনা ঠিক-ঠাক করে নাও। এখন সতর্ক করা হচ্ছে যে, সেখানকার (আখেরাতের) উত্তর দানের জন্য প্রস্তুত থাক।

২. হাশরের ভয়াবহ দিনে যখন পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার শানে-জালাল' এর চরম প্রকাশ ঘটবে, বড় বড় ও মর্যাদাশালী ব্যক্তিরও হুঁশ ঠিক থাকবে না এবং 'উলুল আয্‌ম' পয়গম্বরগণ 'নাফসী' 'নাফসী' (আমার কী হবে!) করতে থাকবেন– তখন অশেষ ভয়-ভীতির কারণে আল্লাহ তাআলার প্রশ্নের জওয়াবে নবীগণ لا علم لنا (আমাদের কিছু জানা নাই) ছাড়া আর কিছু বলতে পারবেন না। অতঃপর যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (দোয়ার) ওসিলায় সকলের প্রতি আল্লাহ তাআলার দয়া ও রহমতের দৃষ্টি পড়বে, তখন তাঁরা কিছু আরয করার সাহস পাবেন। হযরত হাসান, মুজাহিদ (রা.) প্রমুখ তাফসীরকারগণ থেকে এ-ই বর্ণিত আছে।

কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর নিকট لا علم لنا এর অর্থ– আয় আল্লাহ! তোমার পরিপূর্ণ ও সর্বব্যাপী ইলমের সম্মুখে আমাদের ইলম কিছুই নয়। অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহ তাআলার প্রতি আদবহেতু এ কথা বলবেন। ইবনে জুরাইজের নিকট لا علم لنا এর অর্থ- আমাদের জানা নেই, আমাদের পরে তারা কী সব করেছে। যেসব ক্রিয়াকাণ্ড ও অবস্থা আমাদের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে সংঘঠিত হয়েছিল, আমরা কেবল তাই জানতে পারি, গোপন বিষয়াদি ও অন্তরের ভেদসমূহের জ্ঞান শুধু علام الغيوب (অদৃশ্যের জ্ঞাতা) -এরই রয়েছে। পরবর্তী রুকূতে (আয়াত ১১৭) বর্ণিত হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের মৌখিক জওয়াব– وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ দ্বারা শেষোক্ত অর্থের সমর্থন মেলে। সহীহ হাদীসে আছে, হাউযে কাউছারের পাড়ে আগত কতক লোক সম্পর্কে যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাবেন– هؤلاء أصحابي (এরা তো আমার সাহাবা), তখন উত্তর দেওয়া হবে- لاتدري ما أحدثوا بعدك অর্থাৎ আপনার জানা নেই, তারা আপনার পরে কী সব কাজ করেছে।

১১০. যখন আল্লাহ বলবেন[১], 'হে ঈসা ইবনে মারয়াম! তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর[২]— যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার (অর্থাৎ জিবরাঈলের) মাধ্যমে সাহায্য করেছিলাম। তুমি কোলে থাকাবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে। এবং যখন তোমাকে কিতাব, প্রজ্ঞা, তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দিয়েছিলাম; এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে আমার হুকুমে পাখি সদৃশ আকৃতি তৈরি করতে, অতঃপর তাতে ফুঁ দিতে, ফলে আমার হুকুমে তা পাখি হয়ে যেত। আর তুমি আমার হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করতে; এবং যখন তুমি আমার হুকুমে মৃতদের (কবর থেকে) জীবিতরূপে বের করে আনতে[৩]; এবং যখন

إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ إِذْ أَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۙ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيْلَ ۚ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا ۢ بِإِذْنِيْ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِيْ ۚ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِإِذْنِيْ ۚ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

---

১. খুব সম্ভব এ পূর্ণ রুকূটি পরবর্তী রুকূর ভূমিকাস্বরূপ। এখানে অনুগ্রহগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়ে পরবর্তী রুকূতে (আয়াত ১১৬) বর্ণিত প্রশ্নটি করা হবে।

২. **হযরত মারয়ামের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ**

প্রথমত, সন্তানের প্রতি অনুগ্রহ এক হিসাবে মায়ের প্রতিও অনুগ্রহ বটে। দ্বিতীয়ত, জালেম লোকেরা হযরত মারয়ামের উপর যখন মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর নির্দোষিতা ও পবিত্রতার পক্ষে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে উজ্জ্বল প্রমাণ বানিয়ে দেন। এছাড়া মাসীহ (আ) এর জন্মের পূর্বে হযরত মারয়ামকে দুর্লভ ও বিস্ময়কর নিদর্শনাদি দেখান, যেগুলি তাঁর জন্য শক্তি ও সান্ত্বনার কারণ হয়। এসব অনুগ্রহ সরাসরি তাঁরই উপর করা হয়েছিল।

৩. মায়ের কোলে তিনি যে কথা বলেছিলেন, তার উল্লেখ সূরা মারয়ামে (আয়াত ৩০-৩৩) আসবে— إِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ الخ (আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন।) আশ্চর্যের বিষয়, খ্রিস্টানরা হযরত মাসীহর কোলে কথা বলার বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেনি। অবশ্য এতটুকু লিখেছে যে, বার বছর বয়সে ইহুদীদের সামনে তিনি এমন সব বিজ্ঞতাপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শন বয়ান করেন, যাতে সকল আলেম হাক্কা-বাক্কা খেয়ে যায় এবং শ্রোতারা বাহ্‌বা বাহ্‌বা করতে থাকে।

হযরত ঈসার সঙ্গে হযরত জিবরাঈলের বিশেষ সম্পর্ক এবং এর ক্রিয়া-প্রভাব

এমনিতে তো স্ব স্ব মর্যাদানুপাতে সকল নবীরই, বরং কোন কোন মুমিনের পর্যন্ত 'রূহুল কুদুস' দ্বারা সাহায্য-সমর্থন হয়ে থাকে। কিন্তু যেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের

অস্তিত্বই জিবরাঈল (আ)-এর ফুৎকারে হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে জিবরাঈলের বিশেষ ধরনের স্বভাবগত সম্পর্ক ও সাহায্য-সমর্থন ছিল। বিভিন্ন নবীদের যে শ্রেষ্ঠত্ব-বিশেষত্ব প্রদান করা হয়েছিল, তার আলোচনায়ও এর উল্লেখ করা হয়েছে–

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ। (সূরা বাকারা, ২৫৩ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)

বস্তুজগতে বিদ্যুতশক্তির কেন্দ্র যেমন, রূহের জগতে 'রূহুল কুদুস' এর উদাহরণ তেমনি বুঝে নিন। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপক যখন নিয়মানুসারে বিদ্যুত চালনা করে এবং যেসব জিনিসে বৈদ্যুতিক তার সংযোজিত আছে সে সবে সংযোগ দেয়, তৎক্ষণাৎ নির্বাক ও স্থির মেশিনগুলি অতি দ্রুত ঘুরতে শুরু করে। কোন রোগীকে বিদ্যুতের হিট দেওয়া হলে তার পঙ্গু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অনুভূতিহীন শিরা-উপশিরায় চেতনা ও অনুভূতির সঞ্চার হয়। কোন কোন সময় বাকশক্তিরহিত রোগীর গলায় বিদ্যুতশক্তির সংযোজনে বাকশক্তি ফিরিয়ে আনা হয়। এমনকি, কতক অতিরঞ্জনকারী ডাক্তারের দাবি এই যে, সর্বপ্রকার রোগের চিকিৎসাই বিদ্যুত-শক্তি দ্বারা করা যেতে পারে। (ফরীদ ওয়াজদীর 'দায়িরাতুল মা'আরেফ' -دائرة المعارف– দ্রষ্টব্য।)

যখন বস্তুজগতের বিদ্যুতের অবস্থা এই, তখন আত্মার জগতের বিদ্যুৎ যার কেন্দ্র হচ্ছে رُوْحُ الْقدس, তাতে কী রকম শক্তি থাকতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ তাআলা روح القدس এর সঙ্গে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মহান সত্তার সম্পর্ক এমন বিশেষভাবে ও বিশেষ নিয়মে স্থাপন করেছেন, যার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছিল সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিকতার প্রাবল্য, বৈরাগ্য ও জীবনের বিশেষ লক্ষণ আকারে। روح الله নামে তাঁর আখ্যায়িত হওয়া; শৈশবে, যৌবনে ও বার্ধক্যে সমভাবে কথা বলা, আল্লাহর হুকুমে জীবন সঞ্চারের উপযোগী মাটির জীবাকৃতি তৈরি করা, তাতে আল্লাহ তাআলার হুকুমে জীবনের রূহ ফুঁকে দেওয়া; দুরারোগ্য রোগীদের আল্লাহর হুকুমে সাধারণ উপায়-উপকরণের মাধ্যম ছাড়াই কর্মক্ষম ও সুস্থ করে দেওয়া, এমনকি মৃত লাশে আল্লাহ তাআলার হুকুমে পুনরায় জীবাত্মা ফিরিয়ে আনা, বনী ইসরাঈলের নাপাক পরিকল্পনা-ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়ে তাঁকে আকাশে তুলে নেওয়া, তাঁর পবিত্র জীবনে এত দীর্ঘায়ুর কোন প্রতিক্রিয়া না হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি— এ সব বিষয়গুলো ঐ বিশেষ সম্পর্কের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল, যা মহাপ্রভু কোন বিশেষ ধরন ও নিয়মে হযরত ঈসা ও 'রূহুল কুদুস' এর মধ্যে কায়েম করেন।

শাখাগত শ্রেষ্ঠত্ব সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ নয়

প্রত্যেক নবীর সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কিছু স্বতন্ত্র আচার-ব্যবহার হয়ে থাকে। এ সবের কারণ ও রহস্য একমাত্র আলেমুল গায়ব আল্লাহই জানেন। এ ধরনের স্বতন্ত্র আচার-ব্যবহার আলেমদের পরিভাষায় فضائل جزئية (শাখাগত শ্রেষ্ঠত্ব) নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এগুলির দ্বারা كلى فضيلت (বা সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব) প্রমাণিত হয় না, ঈশ্বরত্ব তো দূরের কথা।

فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝١١٠

আমি বনী ইসরাঈলকে তোমার থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম, যখন তুমি ওদের নিকট নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছিলে আর ওদের মধ্যে যারা কাফের ছিল তারা বলেছিল, 'এ তো পরিষ্কার যাদু ছাড়া আর কিছু নয়'[১]।

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ۝١١١

১১১. এবং যখন আমি হাওয়ারীদের অন্তরে এ কথা ঢেলে দিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন।' (ফলে) তারা বলে উঠল, 'আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা পূর্ণ অনুগত।'

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا

১১২. (স্মরণ করুন), যখন হাওয়ারীরা বলল, 'হে ঈসা ইবনে মারয়াম! আপনার রব কি এ ক্ষমতা রাখেন[২] যে, আমাদের প্রতি

وإذ تخلق –মাসীহ (আ) এর জন্য শব্দটি নিতান্ত বাহ্যিক ও কৃত্রিম দিক থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। নতুবা প্রকৃত স্রষ্টা তো أحسن الخالقين (বা সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা) ছাড়া কেউ নয়। এ জন্যই بإذني (অর্থাৎ আমার হুকুমে) শব্দের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং সূরা 'আলে ইমরানে' (আয়াতে ৪৯) হযরত মাসীহর যবানীতে بإذن الله শব্দ বারবার বলানো হয়েছে।

মুজেযা অস্বীকার করার ভয়াবহতা

যা হোক, যেসব অলৌকিক বিষয়কে বর্তমান আয়াতগুলিতে এবং ইতিপূর্বে সূরা 'আলে ইমরানে' হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, তার অস্বীকৃতি বা বিকৃতি (অপব্যাখ্যা) একমাত্র সেই বে-দীনের কাজ হতে পারে, যে আল্লাহর নিদর্শনাদিকে নিজের ব্যক্তি-বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করতে চায়। আর যারা "قانونِ قدرت" শিরোনামের আড়ালে معجزات ও خوارق অর্থাৎ অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনাবলিকে অস্বীকার করতে চায়, তাদের জবাব একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আমরা দিয়েছি। তা পাঠে ইনশাআল্লাহ সমস্ত সন্দেহ ও সমস্যার নিরসন হয়ে যাবে।

১. ওরা মুজেযা ও অস্বাভাবিক ঘটনাকে যাদু বলতে শুরু করে এবং পরিশেষে হযরত মাসীহ (আ) কে কতল করতে উদ্যত হয়। আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া ও কৃপায় হযরত মাসীহকে আসমানে তুলে নেন। এভাবে ইহুদীদের সমস্ত নাপাক অভিসন্ধি অকৃতকার্য করে দেন।

২. 'আপনার রব কি এ ক্ষমতা রাখেন?'– এজন্য বলেছিল যে, ঈসা (আ) এর দো'য়ার বরকতে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা অলৌকিকভাবে এমনটি করবেন কি না, তা তাদের

مَآىِٕدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿۱۱۲﴾

আসমান থেকে খাদ্য-ভরতি খাঞ্চা অবতীর্ণ করবেন?'[১] তিনি বললেন, 'আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা ঈমানদার হও[২]।'

قَالُوۡا نُرِيۡدُ اَنۡ نَّاۡكُلَ مِنۡهَا وَتَطۡمَٮِٕنَّ قُلُوۡبُنَا وَنَعۡلَمَ اَنۡ قَدۡ صَدَقۡتَنَا وَنَكُوۡنَ عَلَيۡهَا مِنَ الشّٰهِدِيۡنَ ﴿۱۱۳﴾

১১৩. তারা বলল, 'আমরা চাই যে, তা থেকে খাব এবং আমাদের অন্তর প্রশান্ত হয়ে যাবে, আর আমরা জেনে নেব যে, আপনি আমাদের সত্য বলেছেন এবং আমরা তার সাক্ষী থাকব[৩]'।

জানা ছিল না। (সুতরাং তাদের উদ্দেশ্য হল, তিনি এমন করবেন কি? তাঁর ক্ষমতা ও কুদরতের ব্যাপারে তাদের কোন সংশয় ছিল না—অনুবাদক)।

১. অর্থাৎ এমন করতে পারেন কি যে, বিনা পরিশ্রমে আসমান থেকে জীবিকা পৌঁছতে থাকবে? সেই খাঞ্চা বেহেশতেরই হতে হবে এমনটি জরুরী নয়।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে যতই মেহেরবানী প্রকাশ পাক না কেন, ঈমানদার বান্দার পক্ষে এমনসব অস্বাভাবিক ফরমায়েশ দ্বারা তাঁকে পরীক্ষা করা মোটেই শোভনীয় নয়। জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে যেসব উপায়-উপকরণ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলির মাধ্যমেই জীবিকা অন্বেষণ করা উচিত। আর বান্দা যখন তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং তাঁরই উপরে ঈমান ও ভরসা রাখে, তখন তিনি তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করেন, যেখান থেকে পাওয়ার ধারণা-কল্পনাও ছিল না— وَمَنۡ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجۡعَلۡ لَّهٗ مَخۡرَجًا وَّيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُ الخ ('আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে চলবে, তিনি তার জন্য বের হওয়ার পথ তৈরি করে দেবেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দেবেন যা সে ধারণাও করবে না।' –সূরা তালাক, আয়াত ২-১)

৩. অর্থাৎ আমরা আল্লাহকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে নয় বরং বরকতের আশায় তা চাই, যেন পরিশ্রম ছাড়া গায়ব থেকে রিযিক আসতে থাকে, যাতে শান্ত ও একাগ্র মনে ইবাদতে লেগে থাকতে পারি। এবং বেহেশতের নে'য়ামতরাশি ইত্যাদি গায়বের বিষয় সম্পর্কে আপনি যেসব খবর দিয়েছেন, একটি ছোট নিদর্শন দেখে সেই সবের উপরেও পূর্ণ বিশ্বাস হাসিল হয়ে যায় এবং প্রত্যক্ষ্যদর্শী সাক্ষী হিসাবে আমরা এর সাক্ষ্য দিতে থাকি, যাতে এ মুজেযাটি সর্বদার জন্য খ্যাত হয়ে থাকে।

কোন কোন মুফাসসির লিখেছেন যে, হযরত মাসীহ (আ) বলেছিলেন, 'তোমরা আল্লাহর জন্য ত্রিশ দিনের রোযা রেখে যা কিছু প্রার্থনা করবে, তাই দেওয়া হবে। সে মত হাওয়ারীরা রোযা রেখে 'মায়েদা' প্রার্থনা করল– وَنَعۡلَمَ اَنۡ قَدۡ صَدَقۡتَنَا দ্বারা এ-ই উদ্দেশ্য। والله اعلم

১১৪. ঈসা ইবনে মারয়াম বললেন, 'হে আল্লাহ, আমাদের রব! আমাদের প্রতি আসমান থেকে খাদ্য- ভরতি খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন, যা (অবতীর্ণ হওয়ার দিনটি) আমাদের জন্য তথা আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য ঈদ হবে[১] এবং যা হবে আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন☆[২]। আর আমাদের রিযিক দান করুন, আপনিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা'[৩]।

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ۝

১১৫. আল্লাহ বললেন, 'আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি খাঞ্চা অবতীর্ণ করব। কিন্তু তার পর তোমাদের মধ্যে যে কেউ অকৃতজ্ঞতা করবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব যা বিশ্বজগতের আর কাউকে দেব না'[৪]।

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ۝

---

১. যেদিন আসমান থেকে 'মায়েদা' নাযিল হবে, সেই দিনটি আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের জন্য ঈদ হয়ে থাকবে, যাতে আমাদের জাতি এই দিনটিকে স্মারক হিসাবে উৎসবের দিনরূপে পালন করে।

এ ব্যাখ্যা অনুসারে تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا এর প্রয়োগ এমন হল, যেমন اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতটি সম্পর্কে বুখারী শরীফে ইহুদীদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, إِنَّكُمْ تَقْرَؤُون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا —অর্থাৎ ওরা হযরত ওমর রা.-কে বলল, আপনারা এমন একটি আয়াত পাঠ করেন, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হলে তাকে আমরা ঈদরূপে গ্রহণ করতাম। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৬০৬) এখানে যেমন আয়াতকে ঈদ বানানোর অর্থ হচ্ছে তার অবতরণের দিনকে ঈদ বানানো, তদ্রূপ 'মায়েদার' ঈদ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল তা অবতীর্ণ হওয়ার দিনটি ঈদের দিন হওয়া।

বলা হয় যে, খাঞ্চা অবতীর্ণ হয়েছিল রবিবার দিন, যে দিনটি খ্রিস্টানদের নিকট মুসলমানদের শুক্রবার দিনের মত সাপ্তাহিক ঈদ (বা খুশীর দিন)।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যা হবে আমাদের জন্য তথা আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য আনন্দ-উৎসবের কারণ এবং আপনার পক্ষ থেকে এক নির্দশন।

২. অর্থাৎ আপনার কুদরতের এবং আমার নবুওয়াত ও সত্যতার নিদর্শন।

৩. অর্থাৎ কষ্ট ও উপার্জন ছাড়া আমাদের জীবিকা দান করুন। আপনার ভাণ্ডারে তো কোন কিছুর অভাব নেই, জটিলতাও নেই।

৪. যখন নে'য়ামত অসাধারণ ও অভিনব হয়, তখন তার কৃতজ্ঞতার গুরুত্ব সাধারণ অবস্থা থেকে অনেক বেড়ে যায়। আর অকৃতজ্ঞ হলে শাস্তিও অসাধারণ হয়।

[রুকূ - ১৬]

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ

১১৬. আর (স্মরণ কর), যখন আল্লাহ বলবেন, 'হে ঈসা ইবনে মারয়াম! তুমি কি লোকদের বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকেও মা'বূদ সাব্যস্ত করে নাও'[১]? তিনি বলবেন, 'আপনি পবিত্র! আমার জন্য এমন কথা বলা আদৌ উচিত

'মুযেহুল কুরআনে' রয়েছে, 'কেউ কেউ বলেন, সেই খাঞ্চা চল্লিশ দিন পর্যন্ত নাযিল করা হয়েছিল। অতঃপর কেউ কেউ নাশোকরী করল। অর্থাৎ হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তা থেকে শুধু অভাবী ও অসুস্থ লোকেরা খাবে, (কিন্তু) ধনী ও সুস্থ লোকেরাও খেতে শুরু করে। ফলে প্রায় আশি ব্যক্তি শূকর ও বানর হয়ে গেল। আর কেউ কেউ বলেন যে, খাঞ্চা অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহর উক্ত ধমকি শুনে, যারা খাঞ্চা চেয়েছিল তারা ভীত হয়ে আর চায়নি। কিন্তু পয়গম্বরের দো'য়া নিরর্থক হতে পারে না। সম্ভবত এই দো'য়ারই ফলে হযরত ঈসা (আ)-এর উম্মতের মধ্যে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য সর্বদা রয়েছে। আর তাদের মধ্যে যে অকৃতজ্ঞতা করবে অর্থাৎ শান্ত মনে ইবাদতে মশগুল না হয়ে পাপ কাজে তা ব্যয় করবে—সম্ভবত সে আখেরাতে সবচেয়ে বেশি শাস্তি পাবে।

এ আয়াতে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যে, তারা যেন অস্বাভাবিক দাবি-দাওয়া না করে। কারণ, এর কৃতজ্ঞতা বড়ই কঠিন। বরং বাহ্যিক উপায়-উপকরণের উপর সন্তুষ্ট থাকাই উত্তম।

এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর দরবারে পক্ষপাতিত্বের কোন জায়গা নেই।

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

পূর্ববর্তী রুকূ প্রকৃতপ্রস্তাবে বর্তমান রুকূর ভূমিকাস্বরূপ ছিল। সেই রুকূর শুরুতে আল্লাহ তাআলা يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ الخ বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কিয়ামতের দিন সকল নবী-রাসূলের সঙ্গে তাঁদের উম্মতদের সামনে সওয়াল-জওয়াব হবে। অতঃপর এস্থলে তাঁদের মধ্য থেকে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের কথা—যাকে বহু মানুষ খোদার মর্যাদা দিয়ে রেখেছে—উল্লেখ করেছেন যে, এই বাতিল মতবাদ সম্পর্কে বিশেষভাবে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে। কিন্তু এর পূর্বে তাঁর প্রতি ও তাঁর সম্মানিত মায়ের প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত মহান ও অসাধারণ অনুগ্রহ ও নেয়ামতরাশির কথা তাঁকে স্মরণ করানো হবে (পূর্বের রুকূতে সেসবেরই উল্লেখ ছিল)। তারপর ইরশাদ হবে- ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِي الخ 'তুমি কি লোকদের বলেছিলে যে, আমাকে ও আমার মাতাকেও আল্লাহ ছাড়া মা'বূদরূপে গ্রহণ কর'? এই প্রশ্নে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম কেঁপে উঠবেন এবং তা-ই নিবেদন করবেন যা সামনে আসছে। পরিশেষে ইরশাদ হবে- هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ । هذا বলে يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ এর يوم এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

যা হোক, এ সমস্ত ঘটনা কিয়ামতের দিনে ঘটবে। সুনিশ্চিতভাবে অবশ্যই ঘটবে বলে কুরআন-হাদীসে এর জন্য অতীত কালের ক্রিয়া (قال) ব্যবহার করা হয়েছে।

بِحَقٍّ ۚ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ وَلَاۤ اَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ۝

ছিল না, যার অধিকার আমার নেই। আমি যদি তা বলে থাকি, তবে অবশ্যই আপনি তা জেনে থাকবেন। আমার অন্তরে যা আছে তা আপনি জানেন, আর আপনার অন্তরে যা আছে তা আমি জানি না। নিশ্চয় আপনিই গোপন বিষয়াদির পরিজ্ঞাতা[১]।

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَاۤ اَمَرْتَنِیْ بِهٖۤ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیْدًا مَّا دُمْتُ فِیْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْهِمْ ؕ وَاَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ۝

১১৭. 'আমি তাদের তা-ই বলেছি যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন, অর্থাৎ– তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার ও তোমাদের রব[২]; আর আমি তাদের সম্পর্কে ততদিন অবহিত ছিলাম যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। তারপর যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন, তখন আপনিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আর আপনি প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত✯[৩]।

---

১. অর্থাৎ আমি এমন ন্যাক্কারজনক কথা কী করে বলতে পারি! ঈশ্বরত্ব ও অন্য গুণাবলিতে কেও আপনার শরীক হবে—এ থেকে আপনার সত্তা পবিত্র। আর যাকে আপনি নবুওয়াতের মহান মর্যাদা দান করেছেন তার শান এই নয় যে, তিনি মুখ থেকে কোন অন্যায় কথা বের করেন। সুতরাং আপনার পবিত্রতা ও আমার নিষ্পাপতা উভয়ের দাবি এই যে, আমি যেন এমন নাপাক কথা কস্মিনকালেও না বলি।

আর অন্য সমস্ত প্রমাণ ছাড়াও শেষ কথা এই যে, আপনার সর্বব্যাপী জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই হতে পারে না। যদি সত্যিই এমনটি আমি বলে থাকতাম, তবে আপনার জ্ঞানে তা অবশ্যই বর্তমান থাকত। আপনি স্বয়ং জানেন যে, আমি গোপনে বা প্রকাশ্যে এমন কোনো হরফ মুখ থেকে বের করিনি। বরং আমার অন্তরে এমন ধরনের নাপাক খেয়ালের উদয়ই হয়নি। আমার বা কারো অন্তরের ধারণা-কল্পনাও আপনার থেকে গোপন নয়।

২. আমি আপনার আদেশের সীমা এক বিন্দুও অতিক্রম করিনি। অতএব নিজ ঈশ্বরত্বের শিক্ষা কী করে দিতে পারতাম? এর উলটা আমি বরং তাদেরকে আপনার দাসত্বের দিকে ডেকেছিলাম এবং অতি পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছিলাম যে, আমার ও তোমাদের সকলের প্রভু-পরওয়ারদেগার হচ্ছেন সেই এক খোদা, যিনি এককভাবে ইবাদতের যোগ্য।

সে মত আজও বাইবেলে এ বিষয়ে বহু সংখ্যক সুস্পষ্ট বাণী বর্তমান রয়েছে।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আপনি সব কিছুর সাক্ষী'।

৩. শুধু এতটুকুই নয় যে, আমি সকল মানুষকে আপনার একত্ববাদ ও দাসত্বের প্রতি দাওয়াত দিয়েছি, বরং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, সর্বদা তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছি, যাতে তারা কোন ভ্রান্ত মতবাদ বা অশোভন ধারণা কায়েম করতে না পারে।—অবশ্য

১১৮. 'আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি তাদের ক্ষমা করে দেন তবে আপনিই তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[১]।'

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾

আপনার জ্ঞানে তাদের মাঝে আমার যতদিন থাকা নির্ধারিত ছিল, তা পূর্ণ করার পর আপনি যখন আমাকে তাদের মাঝ থেকে তুলে নিলেন, তার পরবর্তী সময়ে একমাত্র আপনিই তাদের অবস্থার পর্যবেক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন– সেই সম্পর্কে আমি কিছুই আরয করতে পারি না।

বি. দ্র. হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের মৃত্যু বা আকাশে উত্তোলন ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা সূরা আলে-ইমরানের আয়াত (৫৫)– إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ এর টীকায় দ্রষ্টব্য। মুতারজিম (হযরত শাইখুল হিন্দ (র)) এখানে فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي এর যে তরজমা করেছেন– 'আপনি আমাকে তুলে নিলেন', সাধারণ ব্যবহার অনুযায়ী এর উদ্দেশ্য 'মৃত্যু' ও 'আকাশে উত্তোলন'- উভয়ই হতে পারে। যেন ইঙ্গিত করলেন যে, না توفي শব্দটির জন্য মৃত্যু জরুরী, আর না আলোচ্য বিষয়ে মৃত্যু অর্থে توفي এর কোন ভূমিকা আছে।

একটি ভ্রান্তি নিরসণ

হাদীস শরীফে (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৬২৬) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কতক লোক সম্পর্কে কিয়ামতের দিন আমি তেমনই বলব, যেমন নেক বান্দা (অর্থাৎ ঈসা (আ) বলেছেন- وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ — এ ধরণের উপমা থেকে এ কথা বের করা যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত মাসীহর وفاة সকল দিক দিয়ে এক ধরনের হতে হবে– এটা আরবী ভাষা সম্পর্কে নিতান্ত অজ্ঞতারই প্রমাণ। মক্কার মুশরিকরা (ذات انماط নামে) একটি গাছের উপর অস্ত্রসস্ত্র লটকিয়ে রাখত। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওদের মত আমাদের জন্যও ذات انماط নির্ধারণ করে দিন। তদুত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- هٰذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ موسى : اجْعَلْ لَنَا إِلٰـهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ (জামে তিরমিযী, হাদীস : ২০৮০) এ তো এমন হল, যেমন মূসার জাতি দরখাস্ত করেছিল– (ঐ মূর্তিপূজকদের যেমন মাবূদ আছে আমাদের জন্যও তেমন মা'বূদ নির্ধারণ করে দিন।) এ উপমা শুনে কোন মুসলমান এ ধারণা করতে পারে কি যে, সাহাবীগণ (আল্লাহর পানাহ!) মূর্তিপূজার দরখাস্ত করেছিলেন?

(কক্ষনো না!) এ ধরনের উপমা-দৃষ্টান্ত থেকে কুরআন-হাদীসের অকাট্য বিধান ও উম্মতের ইজমা' বা সর্বসম্মত রায়ের বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস আহরণ করা একমাত্র ঐ দলেরই কাজ হতে পারে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ (آل عمران ٩)

('অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা গোমরাহী বিস্তার করার উদ্দেশ্যে এবং অর্থ জানার জন্য মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের পিছনে পড়ে থাকে।')

১. অর্থাৎ আপনি নিজ বান্দাদের উপর জুলুম ও অযথা কঠোরতা করতে পারেন না, তাই তাদের শাস্তি দিলে তা পূর্ণ ন্যায়বিচার ও হেকমতের ভিত্তিতেই হবে। আর ধরে নেওয়া

১১৯. আল্লাহ বলবেন, 'এ এমন দিন, যেদিন সত্যবাদীদের উপকারে আসবে তাদের সত্যবাদিতা[১]। তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানরাজি, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত; যাতে তারা অনন্তকাল বসবাস করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এ-ই মহাসাফল্য[২]।

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১২০. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তার রাজত্ব আল্লাহরই। আর তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান[৩]।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ؕ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

যাক, যদি ক্ষমা করে দেন, তবে এই ক্ষমাও অক্ষমতা ও নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত হবে না (বরং হেকমতপূর্ণ হবে)।

যেহেতু আল্লাহ হচ্ছেন عزيز (প্রবল ও পরাক্রমশালী), অতএব কোন অপরাধীই তাঁর মুঠি থেকে বের হয়ে পলায়ন করতে পারবে না যে, তার উপর তাঁর ক্ষমতাই না চলে। তা ছাড়া তিনি হচ্ছেন حكيم (হেকমতওয়ালা), সুতরাং এও সম্ভব নয় যে, তিনি কোন অপরাধীকে অহেতুক ছেড়ে দেবেন। যা হোক, এই অপরাধীদের ব্যাপারে যে ফয়সালাই তিনি করবেন, তা সম্পূর্ণ পরাক্রমসুলভ ও হেকমতপূর্ণ হবে।

হযরত মাসীহ (আ) এর এ কথা যেহেতু হাশরের মাঠে হবে, যেখানে কাফেরদের জন্য কোন সুপারিশ ও দয়া-মায়ার কোন দরখাস্ত হতে পারে না, সে জন্যই হযরত মাসীহ عزيز حكيم এর স্থলে غفور رحيم ইত্যাদি গুণাবলি উল্লেখ করেননি। পক্ষান্তরে, দুনিয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ) নিজ প্রভুর কাছে আরয করেছিলেন- رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ('আয় পরওয়ারদেগার! এই দেবদেবীরা অনেক মানুষকে গোমরাহ করে দিয়েছে। অতএব এদের মধ্য থেকে যে আমার অনুগত হয়েছে সে আমার লোক, আর যে আমার নাফরমানী করেছে, তো আপনি হচ্ছেন غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (ক্ষমাশীল, মেহেরবান।)'

১. যারা আকীদা-বিশ্বাস এবং কথা ও কাজ– এসব দিক থেকে সত্যপরায়ণ থেকেছে, তাদের সত্য পরায়ণতার সুফল আজ তারা লাভ করবে।

২. আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিই বিরাট সাফল্য। আর জান্নাতও এ জন্যই কাম্য যে, তা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির স্থান।

৩. অর্থাৎ অনুগত ও অবাধ্য– প্রত্যেকের সঙ্গে সেই আচরণ করবেন, যা নিরঙ্কুশ রাজাধিরাজের সম্মান ও মর্যাদার যথাযোগ্য হবে।

সূরা আন'আম[১]

سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৬ । ১৬৫ আয়াত । ২০ রুকূ । মক্কী

اٰيَاتُهَا ١٦٥، رُكُوْعَاتُهَا ٢٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۬ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝١

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং বানিয়েছেন অন্ধকার ও আলো। তবুও কাফেররা স্বীয় রবের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে[২]।

---

১. এ সূরাটি মক্কী। কোন কোন আলেমের মতে কয়েকটি আয়াত এর ব্যতিক্রম। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, পূর্ণ সূরাটি একত্রে অসংখ্য ফেরেশতার সমভিব্যাহারে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইবনে সালাহ (র) স্বীয় 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে সূরাটির এক সাথে অবতরণসংক্রান্ত রেওয়ায়েতগুলি সহীহ নয় বলেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

আবু ইসহাক ইসফারাঈনী (র) বলেন, তাওহীদের সমস্ত মৌলবিষয় ও নিয়ম-নীতি এই সূরায় আলোচিত হয়েছে।

২. 'অগ্নিপূজকরা' বিশ্বের জন্য দুই স্রষ্টা স্থির করে– একজন ভালোর স্রষ্টা, যার নাম 'ইয়াযদান'; দ্বিতীয়জন মন্দের স্রষ্টা, তার নাম 'আহরামান'; এবং উভয়কে নূর ও জুলমত বা আলো ও আঁধার বলে আখ্যায়িত করে থাকে। ভারতের মুশরিকরা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীতে বিশ্বাস করে। আর্য সমাজ একত্ববাদের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও 'ধাতু' ও আত্মাকে খোদার মত সৃষ্ট নয় ও অনাদি বলে থাকে। এবং সৃষ্টিকার্য ও বিশ্ব পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহকে এই উভয়ের মুখাপেক্ষী মনে করে। পিতাপুত্রের ভারসাম্য ও পরস্পরের সম্পর্ক কায়েম রাখার জন্য খ্রিস্টানদের শেষ পর্যন্ত 'তিনে এক ও একে তিন' এর মত কুখ্যাত মতবাদ অবলম্বন করতে হয়েছে। ইহুদীরা খোদা তাআলার জন্য এমন গুণাবলি সাব্যস্ত করেছে যে, সে হিসাবে একজন সাধারণ মানুষও তাঁর সমতুল্যই নয় বরং তাঁর চেয়ে বড়ও হতে পারে। আরবের মুশরিকরা তো ঈশ্বরত্বের বণ্টনে এত উদারতার পরিচয় দিয়েছে যে, ওদের নিকট পাহাড়ের প্রতিটি পাথর মানবজাতির উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে। মোটকথা, আগুন, পানি, সূর্য, তারকা, গাছ, পাথর, জন্তু কোন কিছুই এমন নয়, যাকে ওরা ঈশ্বরত্বের কিছু অংশ না দিয়েছে এবং উপাসনা, সাহায্য প্রার্থনা ইত্যাদির সময় তাকে খোদার মর্যাদায় সমাসীন না করেছে।

অথচ যিনি সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণের ধারক ও সর্বপ্রকার সৌন্দর্যের উৎস হওয়ার কারণে একচ্ছত্রভাবে সকল প্রশংসা এবং হর রকমের হাম্‌দ ও ছানার অধিকারী, যিনি আসমান ও

২. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর (প্রত্যেকের মৃত্যুর) একটি সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর আরেকটি নির্ধারিত সময় রয়েছে তাঁরই নিকট। এর পরও তোমরা সন্দেহ কর[১]!

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ۝

৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ[২] (একক মা'বুদ)। তিনি তোমাদের গোপন বিষয় ও তোমাদের প্রকাশ্য বিষয় জানেন

وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا

পৃথিবী অর্থাৎ উর্ধ্বজগত ও নিম্নজগতের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং রাত ও দিন, আঁধার ও আলো, ইলম ও মূর্খতা, হেদায়েত ও গোমরাহী, মৃত্যু ও জীবন– মোদ্দাকথা, পরস্পর বিরোধী বিষয় ও অবস্থাসমূহ বানিয়েছেন ও তা প্রকাশ করেছেন— সেই পবিত্র সত্তার স্বীয় ক্রিয়াকর্মে কোন অংশীদার বা সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে না। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিরও প্রয়োজন নেই। মা'বূদ হওয়ার ব্যাপারে কেউ তাঁর শরীক হতে পারে না। তাঁর ইচ্ছার উপর কেউ বিজয়ী হতে পারে না এবং তাঁর উপর কারো জোর-শক্তিও চলতে পারে না। আশ্চর্য, এসব বাস্তবতা বোঝার পরও কী করে মানুষ কোন কিছুকে আল্লাহর মর্যাদা দিয়ে থাকে!

১. আগের আয়াতে 'আলমে কবীর' (বা বিশ্বজগত) এর সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা ছিল, এখানে 'আলমে সগীর' (বা মানব) সৃষ্টির বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা শুরুতে নির্জীব মাটি থেকে আদম আলাইহিস সালামের দেহ বানিয়েছেন। তারপর দেখ, কেমনে তাকে জীবন ও মানবীয় গুণাবলি দান করেছেন। এবং আজ পর্যন্ত মাটি থেকে খাদ্য-সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে। অতঃপর খাদ্য থেকে বীর্য এবং বীর্য থেকে মানব সৃষ্টি হচ্ছে। মোটকথা, এভাবে তোমাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন এবং তারপর প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর একটি সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যখন সে আবার সেই মাটিতে গিয়ে মিশে যায়, যে মাটি দিয়ে তাকে পয়দা করা হয়েছিল।

এ থেকেই বুঝে নেওয়া যায় যে, 'বিশ্বজগত' এর বিলুপ্তিরও একটি সময় নির্ধারিত আছে, যাকে 'কিয়ামতে কুবরা' (বা মহাপ্রলয়) বলা হয়। 'কিয়ামতে সুগ্‌রা' বা ব্যক্তির মৃত্যু অহরহ সংঘটিত হচ্ছে বলে এ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানও রয়েছে। কিন্তু 'কিয়ামতে কুবরা' বা মহাপ্রলয়ের সঠিক সময়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলারই কাছে আছে। আশ্চর্যের বিষয়, 'আলমে সগীর' বা মানবজাতির মধ্যে জীবন ও মৃত্যুর যে অবিরাম প্রবাহ চলছে, তা দেখেও 'আলমে কবীর' বা বিশ্বজগতের ফানা ও প্রলয়ে কি কোন মানুষ সন্দেহ করতে পারে?

২. অর্থাৎ সমস্ত আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে তিনিই মা'বূদ, মালিক, বাদশাহ, সর্বময় কর্তা ও ব্যবস্থাপক। এ বরকতময় নাম (الله)ও একমাত্র তাঁরই সুমহান গুণাবলিবিশিষ্ট সত্তার জন্য নির্ধারিত। অতএব অন্যদের মা'বূদ হওয়ার অধিকার কোথা থেকে আসল?

تَكْسِبُوْنَ ۝

এবং জানেন যা কিছু তোমরা কর[১]।

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝

৪. ওদের নিকট ওদের রবের নিদর্শনাদি থেকে যে নিদর্শনই আসে, ওরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়[২]।

فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

৫. ওরা তো সত্যকে অস্বীকার করেছে যখন তা ওদের নিকট এসেছে। সুতরাং শীঘ্রই ওদের নিকট সেই বিষয়ের (যথার্থ) সংবাদাদি পৌঁছে যাবে, যা নিয়ে ওরা হাসি-ঠাট্টা করত[৩]।

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ

৬. ওরা কি দেখে না, আমি ওদের পূর্বে কত সম্প্রদায় ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের পৃথিবীতে এমন শক্তি-সক্ষমতা দান করেছিলাম যা

---

১. যখন সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁরই রাজত্ব চলছে এবং তিনি সরাসরি প্রত্যেক গোপন ও প্রকাশ্য বস্তু এবং মানুষের জাহেরী-বাতেনী ও ছোট-বড় আমল সম্পর্কে অবগত রয়েছেন, তখন ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনা ইত্যাদিতে আল্লাহ ছাড়া কাউকে শরীক করার কোনই প্রয়োজন নেই। এর দ্বারা মুশরিক ও ওদের সমমনা-সতীর্থদের কথা– مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى (আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি যে, তারা আমাদের আল্লাহর নিকট পৌঁছিয়ে দেবে,) –এর জওয়াব হয়ে গেলে।

আর পূর্বে وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ বলে কিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছিল, এখানে প্রতিদান-প্রতিফল সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন যে, মানুষের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল নেক ও বদ আমল তাঁর জ্ঞানে রয়েছে। অতএব তাদের ছেড়ে দেওয়ার কোনই কারণ নেই। বরং কিয়ামত-দিবসে প্রত্যেকে তার কর্মের প্রতিফল পাবে।

২. آيات বলতে تكويني آيات অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিগত নিদর্শনাদি উদ্দেশ্য; অথবা تنزيلي آيات অর্থাৎ কুরআনে নাযিলকৃত আয়াতসমূহ উদ্দেশ্য।

৩. 'সত্য' বলতে খুব সম্ভব কুরআন করীম উদ্দেশ্য, যে কুরআন আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনসমূহের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শনকারীদের মন্দ পরিণতি এবং তাদের ইহ ও পরকালীন শাস্তির কথা বয়ান করে থাকে। অস্বীকারকারীরা এসবকে মিথ্যা বলত এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। ওদের জানিয়ে দেওয়া হল যে, যে বিষয় নিয়ে তোমরা হাসি-ঠাট্টা করছ এবং হৈচৈ করছ, তা বাস্তবরূপ নিয়ে শীঘ্রই তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে।

পরবর্তী আয়াতের মধ্যে সেই সব জাতির উল্লেখ হয়েছে, আল্লাহর নিদর্শনাদিকে অস্বীকার ও বিদ্রুপ করার কারণে এবং (অন্যান্য) অপকর্মের ফলে যাদের ধ্বংস করা হয়েছিল।

لَكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ۝

তোমাদের দেইনি। আর ওদের উপর আসমানকে অবিরাম বর্ষণরত করেছিলাম* এবং ওদের পাদদেশে প্রবহমান করে দিয়েছিলাম নদ-নদী। অতঃপর আমি ওদের পাপের কারণে ওদের ধ্বংস করে দিয়েছি এবং ওদের পর অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি[১]।

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ۝

৭. আমি যদি আপনার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করি, তারপর ওরা নিজেদের হাত দিয়ে তা স্পর্শও করে, তবুও কাফেররা অবশ্যই বলবে, 'এ স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়[২]।'

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا

৮. আর ওরা বলে, 'তাঁর প্রতি কোন ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হল না কেন[৩]?' অথচ আমি যদি ফেরেশতা অবতীর্ণ করি, তবে গোটা বিষয়েরই

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ওদের উপর আসমান থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম'।

১. অর্থাৎ আদ, ছামূদ প্রভৃতি (জাতি)– যাদের তোমাদের চেয়ে অধিক শক্তি ও সাজ-সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছিল, বৃষ্টি ও নদ-নদীর মাধ্যমে ওদের বাগ-বাগিচা ও ক্ষেত-খামার শস্য-শ্যামল ছিল, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ-সম্ভোগের রাজত্ব ছিল। যখন ওরা বিদ্রোহ ও অস্বীকৃতি প্রদর্শনে মেতে উঠল এবং (আমার) কুদরতের নিদর্শনাদির প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগল, তখন অন্যায়-অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আমি ওদের এমন ধরাই ধরলাম যে, ওদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিলাম। আর ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়গুলোর পর পুনরায় অন্যান্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করলাম। অর্থাৎ এ ধারাই চলতে থাকে– অপরাধীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকে, কিন্তু দুনিয়ার আবাদিতে কোনই ভাঙ্গন আসেনি।

২. মক্কার কোন কোন মুশরিক বলেছিল, যদি আপনি আসমান থেকে একটি লিখিত কিতাব নিয়ে আসেন এবং সেই সাথে এমন চারজন ফেরেশতাও থাকেন, যাঁরা আমাদের সামনে সাক্ষ্য দেবেন যে, সত্যিই এই কিতাব আল্লাহর প্রেরিত– তবে আমরা ঈমান আনব। এর উত্তরে বলা হচ্ছে যে, যারা বর্তমানে কুরআনকে যাদু এবং তার আনয়নকারীকে যাদুকর বলে থাকে, ওদের প্রতি আমি যদি কাগজে লেখা কিতাবও আসমান থেকে অবতীর্ণ করি আর ওরা স্বহস্তে স্পর্শ করে জেনে নেয় যে, এ কোন ভেলকি নয়, তবুও ওরা এটাই বলবে যে, এ তো স্পষ্ট যাদু। যে কপালপোড়ার ভাগ্যে হেদায়েত না থাকে, ওর সন্দেহ কখনো ঘোচে না।

৩. অর্থাৎ যিনি আমাদের সামনে এসে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিবেন।

يُنْظَرُوْنَ۝

মীমাংসা হয়ে যাবে, তারপর ওদের কোন অবকাশ দেওয়া হবে না[১]।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ۝

৯. আর আমি যদি রাসূল বানাতাম কোন ফেরেশতাকে, তবে সেই ফেরেশতাকে মানবই বানাতাম (অর্থাৎ তাকে মানবাকৃতিতেই পাঠাতাম) এবং ওদের সেই সন্দেহেই ফেলে দিতাম, যাতে ওরা নিজেরা (নিজেদের) ফেলছে[★২]।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ۝

১০. নিশ্চয় আপনার পূর্বেও রাসূলদের সঙ্গে উপহাস করা হয়েছে। পরিণামে, যারা তাঁদের সঙ্গে উপহাস করেছিল ওদের সেই বস্তু (শাস্তি) পরিবেষ্টন করে নেয়, যা নিয়ে ওরা উপহাস করত[৩]।

---

১. এর দুই অর্থ হতে পারে। **এক**, ফেরেশতা যদি তাঁর আসল আকৃতি নিয়ে আসেন, তবে এই লোকেরা এক মুহূর্তের জন্যও তা সয়ে উঠতে পারবে না, ভয়-ভীতিতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে যাবে। ফেরেশতার আসল আকৃতি- দর্শন সইতে পারা একমাত্র নবীদেরই পক্ষে সম্ভব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে দুবার হযরত জিবরাঈলকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছেন। অন্য কোন নবী সম্পর্কে একবার দেখারও প্রমাণ নেই।

দুই, এই লোকদের উক্ত বিরাট দাবি যদি পূর্ণ করা হয় এবং তার পরও ওরা না মানে, তবে আল্লাহর চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী ওদের আর অবকাশ দেওয়া হবে না বরং এমন আযাব আসবে, যা সেই দাবিদারদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেবে। —এ হিসাবে এ ধরনের দাবিদাওয়া পূর্ণ না করার মধ্যেও যথার্থ রহমত রয়েছে বলে মনে করতে হবে।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'এবং (তখনও) ওদের সন্দেহে ফেলতাম, যেরূপ (এখন) ওরা নিজেরা (নিজেদের) সন্দেহে ফেলছে'।

২. ফেরেশতাকে তাঁর আসল আকৃতিতে না পাঠানোর কারণ পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় সম্ভাবনার উত্তর দেওয়া হচ্ছে। আর তা হচ্ছে, মানুষের আকৃতিতে ফেরেশতা প্রেরণ। মানবাকারে ফেরেশতা প্রেরিত হলে আকৃতিগত সাদৃশ্যের ফলে লোকেরা তার আদর্শ ও শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে, কিন্তু এতেও অস্বীকারকারীদের দ্বিধা-সন্দেহ দূর হবে না। কারণ, রাসূল মানুষ হওয়ায় ওরা যেসব দ্বিধা-সন্দেহ এখন করছে, মানুষের আকৃতিতে ফেরেশতা এলেও অনুরূপ দ্বিধা-সন্দেহ করতে থাকবে।

৩. অবাধ্যদের দাবিদাওয়ার উত্তর প্রদানের পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, ওদের হাসি-ঠাট্টা ও উপহাসের কারণে আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। কারণ এ কোন নতুন কথা নয়, পূর্ববর্তী নবীগণকেও এসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

[রুকূ - ২]

১১. আপনি বলে দিন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, তার পর দেখ– অস্বীকারকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল[১]?'

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ⑪

১২. আপনি জিজ্ঞাসা করুন, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কার?' বলে দিন, 'আল্লাহর'। তিনি নিজের উপর মেহেরবানী আবশ্যকীয় করে নিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের কিয়ামতের দিন একত্র করবেন, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা নিজেদের ক্ষতিতে ফেলেছে, তারাই ঈমান আনে না[২]।

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑫

১৩. রাতে ও দিনে যা কিছু বিশ্রাম গ্রহণ করে, তা আল্লাহরই; এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑬

১৪. আপনি বলে দিন, 'আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক বানাব, যে আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা[৩] এবং তিনি

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا

অতঃপর তাঁদের অস্বীকারকারী ও দুশমনদের যে পরিণতি হয়েছিল, তা সকলের জানা আছে। পূর্ববর্তী অপরাধীদের যে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল, এদেরও আল্লাহ তাআলা অনুরূপ শাস্তি দিতে পারেন।

১. অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টি ও মানসিকতা নিয়ে যদি দেশ-বিদেশে ভ্রমন কর এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর ধ্বংসাবশেষ দেখ, তবে নবীগণকে অস্বীকারকারীদের পরিণতি দুনিয়াতে কী ঘটেছে তা পরিষ্কার দেখতে পাবে। এ থেকেই বুঝে নিতে পারবে, ওদের যখন এই পরিণতি হল তখন বর্তমানের উপহাসকারীদের কী পরিণতি হবে।

২. সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীতে যখন আল্লাহরই রাজত্ব বিদ্যমান, যা মুশরিকরাও স্বীকার করত, তখন মিথ্যাচারী ও হাসি-ঠাট্টাকারীরা তাৎক্ষণিক শাস্তি থেকে কী করে রক্ষা পেতে পারে? তবে এটা তাঁরই সর্বব্যাপী রহমত যে, তিনি অন্যায়-অপরাধ দেখেও তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন না। আর কিয়ামত দিবসেও শুধু সেই হতভাগাদেরই শাস্তি প্রদান করবেন, যারা জেনেশুনে ও স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে ক্ষতি ও ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে।

৩. قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ এর মধ্যে স্থানের ব্যাপকতা বোঝানো হয়েছে, আর لَه مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ এর মধ্যে কালের দিক থেকে ব্যাপকতা। অর্থাৎ, সর্বত্র

يُطْعَمُ ۗ قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

(সকলকে) খাওয়ান, আর তাঁকে কেউ খাওয়ায় না[১]?' আপনি বলে দিন, 'আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন সর্বপ্রথম আনুগত্যকারী হই[২] এবং (আরো বলা হয়েছে,) 'আপনি কখনই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।'

قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

১৫. আপনি বলুন, 'আমি যদি স্বীয় রবের অবাধ্যতা করি, তবে আমি এক মহা দিবসের আযাবকে ভয় করি[৩]।'

ও সর্বদা তাঁরই রাজত্ব, অধিকার ও কর্তৃত্ব রয়েছে। রাতে বা দিনে যা কিছু আরামে জীবন যাপন করে এবং জানা-অজানা কত দুশমন থেকে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ থাকে, এ একমাত্র তাঁরই অসীম রহমত। সূরা 'আম্বিয়া'তে (আয়াত ৪২) এরশাদ হচ্ছে- قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ('আপনি বলুন, 'কে তোমাদের রহমান থেকে রক্ষা করে রাতে ও দিনে?')

তিনিই সেই সত্তা, যিনি দিনের কোলাহল এবং রাতের অন্ধকার ও নীরবতার মধ্যে প্রত্যেকের ডাক শুনে থাকেন এবং সকলের প্রয়োজনাদি ও অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত আছেন। এখন তোমরাই বল, এমন পরওয়ারদেগারকে ছেড়ে অন্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা কতটুকু সমীচীন?

১. 'খাওয়ানো' দ্বারা জীবন ধারণের উপায়-উপকরণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ সৃষ্টি করা ও বাঁচিয়ে রাখা- উভয় ব্যাপারে সকলে তাঁরই মুখাপেক্ষী। পক্ষান্তরে, তিনি সামান্য থেকে সামান্যতর বিষয়েও আমাদের মুখাপেক্ষী নন। এর পরও তাঁকে ছেড়ে অন্য কাউকে অভিভাবক বানানো নিতান্ত বোকামী ছাড়া আর কী হতে পারে?

২. যাঁর গুণাবলি উল্লেখ করা হল, সেই প্রতিপালকেরই বিধানের সামনে শরীকহীনভাবে মাথা নত করে দেওয়া সকল বান্দার উচিত ও অবশ্য কর্তব্য, আর কারো সামনে নয়। আর সর্বাগ্রে সেই সর্বোত্তম বান্দাকেই চরম আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যিনি সমগ্র দুনিয়ার জন্য আনুগত্য ও দাসত্বের আদর্শ প্রতীক হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন অর্থাৎ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৩. এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে আর সকলকে শোনানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ অসম্ভব হলেও বিষয়টি উত্তমরূপে বোঝার জন্য ধরে নেওয়া যাক, যদি আল্লাহর নিষ্পাপ ও মনোনীত বান্দা দ্বারাও কোন প্রকার অপরাধ হয়ে যায়, তবু আল্লাহর শাস্তির আশঙ্কা রয়েছে। তাহলে- শিরক, কুফর ও আল্লাহর নবীদের অস্বীকার করা ইত্যাদি হাজারো অপরাধে লিপ্ত যারা, তাদের জন্য কি আল্লাহর শাস্তি থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা শোভন হবে?

مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ⑯

১৬. সেদিন যার থেকে সেই আযাব সরিয়ে দেওয়া হল*, তার প্রতি আল্লাহ দয়া করলেন। আর এ-ই সুস্পষ্ট সাফল্য[১]।

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑰

১৭. আল্লাহ যদি তোমাকে কোন কষ্টে ফেলেন, তবে তিনি ছাড়া তা অপসারণকারী কেউ নেই। আর যদি তোমাকে কোন কল্যাণ দান করেন, তবে তিনি তো সর্ব-বিষয়ে শক্তিমান।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ⑱

১৮. আর তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান, পূর্ণ অবগত[২]।

قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۟ شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۟ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا

১৯. আপনি জিজ্ঞাসা করুন, 'কোন্ জিনিস সব চেয়ে বড় সাক্ষী?' বলে দিন, 'আল্লাহ'। (তিনি) আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী[৩]।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'সেদিন যাকেই সেই আযাব থেকে রক্ষা করা হল...'

১. বেহেশত ও আল্লাহর সন্তুষ্টির সর্বোচ্চ স্তরসমূহ হাসিল করা তো বহু উচ্চ মাকাম। যদি মানুষের উপর থেকে কিয়ামত দিবসের আযাবের আশঙ্কাটা চলে যায়, তবে একেই বিরাট সাফল্য মনে করতে হবে। যেমন, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, كَفَافًا لَا لِيْ وَلَا عَلَيَّ (অর্থাৎ আমি যদি কোনো পুরস্কার না পাই এবং শাস্তিও ভোগ না করি, এই আমার জন্য যথেষ্ট।) [সহীহ বুখারী, বর্ণনা ৭২১৮]

২. দুনিয়া বা আখেরাতে যে কোন কষ্ট বা সুখ আল্লাহ যদি কাউকে দিতে চান, তবে কেউ বিরোধিতা করে তা প্রতিহতও করতে পারে না এবং সে তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধীনতা থেকে বের হয়ে ভাগতেও পারে না। আর তিনিই সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন যে, কোন্ বান্দার কী অবস্থা এবং সেই অবস্থার হিসাবে তার সাথে কোন্ প্রকার আচরণ হেকমতপূর্ণ হবে।

৩. যখন জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলাই সব লাভ ও ক্ষতির মালিক, সকল বান্দার উপর প্রবল ও ক্ষমতাবান এবং ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিষয়েও জ্ঞাত, তখন তাঁর সাক্ষ্যের চেয়ে বড় ও নির্ভেজাল সাক্ষ্য আর কার হতে পারে? অতএব আমিও আমার ও তোমাদের মধ্যে তাঁকেই সাক্ষী সাব্যস্ত করছি। কেননা, আমি নবুওয়াতের দাবি করে তাঁর যা কিছু বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছাচ্ছি এবং এর উত্তরে তোমরা আমার সঙ্গে ও স্বয়ং আল্লাহ তাআলার বাণীর সাথে যা আচরণ করেছ, তা সবই তাঁর দৃষ্টির সামনে রয়েছে। তিনি নিজে তাঁর সর্বব্যাপী ইলম অনুযায়ী আমার ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন।

الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِىْ بَرِىْۤءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹﴾

আর আমার প্রতি এ কুরআন প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে আমি এর দ্বারা তোমাদের এবং যার নিকট এটি পৌছে তাকে সতর্ক করি। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সঙ্গে অন্যান্য মা'বূদ আছে? আপনি বলে দিন, 'আমি তো (এই) সাক্ষ্য দেব না।' আপনি আরো বলুন, 'তিনি তো একক মা'বূদ এবং তোমরা যে শিরক কর, আমি তা থেকে সম্পর্কহীন[১]।'

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۲۰﴾

২০. আমি যাদের কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে) তদ্রূপ চেনে যেরূপ চেনে নিজেদের ছেলেদের। যারা নিজেদের ক্ষতিতে ফেলে দিয়েছে, তারাই ঈমান আনে না[২]।

---

১. অর্থাৎ তোমাদের বুঝ-বুদ্ধি থাকলে নিজেরাই অনুধাবন করতে পারবে যে, আমার সত্যতার পক্ষে আল্লাহর অকাট্য ও সুস্পষ্ট সাক্ষীরূপে এই কুরআন বর্তমান রয়েছে, যা আল্লাহর বাণী হওয়ার ব্যাপারে নিজেই নিজের প্রমাণ, যেমন সূর্য নিজেই নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ। আমার কর্তব্য হচ্ছে তোমাদের এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে যার নিকট এই বাণী পৌঁছে, খোদায়ী পয়গাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া। এই বাণীর মধ্যে তাওহীদ, পুনরুত্থান, ইত্যাদি দীনের সকল মূলনীতির দিকনির্দেশনা রয়েছে।

এই পরিমাণ দলীল-প্রমাণের পর এবং এমন অকাট্য ও সুস্পষ্ট তাওহীদের পয়গাম শোনার পরও কি তোমরা বলতে থাকবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মা'বূদও রয়েছে? তোমাদের ইখতিয়ার আছে– যা ইচ্ছা বল। আমি তো কখনো এমন হরফ মুখে আনতে পারি না, বরং পরিষ্কার ঘোষণা করছি যে, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সেই একক খোদা-ই। বাকী তোমরা যা কিছু শিরক কর, আমি তার প্রতি অবশ্য অবশ্যই অসন্তুষ্টি ও ঘৃণা প্রকাশ করছি।

জ্ঞাতব্য : وَمَنْ بَلَغَ শব্দ এ কথা ঘোষণা করছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত জিন ও মানব এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য– সবার জন্য।

২. অর্থাৎ আমার সত্যতার পক্ষে আল্লাহ তাআলা সাক্ষী এবং কুরআন করীমও এর শক্তিশালী সাক্ষ্যপ্রদানকারী। এ ছাড়া তোমরা আসমানী কিতাবের আলেম মনে করে আমার ব্যাপারে যে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টানদের শরণাপন্ন হয়ে থাক, ওরাও নিজেদের অন্তরে বিশ্বাস রাখে যে, আমি নিঃসন্দেহে সেই শেষ নবী, যার সুসংবাদ পূর্ববর্তী নবীগণ স্ব স্ব যুগে দিয়েছেন।

[রুকূ - ৩]

২১. ওর চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, অথবা তাঁর আয়াতগুলি অস্বীকার করে? নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম হয় না[১]।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۚ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢١﴾

২২. (স্মরণ কর), যেদিন আমি ওদের সকলকে সমবেত করব, তার পর যারা শিরক করেছিল তাদের বলব, 'কোথায় তোমাদের শরীকরা, যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবি করতে[২]?'

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٢٢﴾

বহু শিশুর মধ্য থেকে নিজ সন্তানকে চিনে নিতে যেমন কোনই অসুবিধা হয় না, তেমনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতার বিষয়ে আহলে কিতাবের কোনই সন্দেহ হয় না। কিন্তু হিংসা, অহংকার, বাপদাদার অন্ধানুকরণ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদের মোহ ইত্যাদি ওদের বাধা দিয়ে রেখেছে, ফলে ওরা ঈমান আনছে না।

১. অর্থাৎ নবী না হয়েও আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলে যে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করে; অথবা সত্য নবীর নিকট থেকে আল্লাহর বাণী শুনে যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে– এই উভয় ব্যক্তির চেয়ে অধিক জালেম আর কেউ হতে পারে না। আর আল্লাহর চিরন্তন নীতি এই যে, পরিণতিতে জালেমের ভাগ্যে সফলতা ও কল্যাণ জোটে না।

অতএব যদি ধরে নাও যে, আমি মিথ্যা রচনাকারী, তবে কিছুতেই আমি কৃতকার্য হব না। পক্ষান্তরে, তোমরা যদি আল্লাহ তাআলার নিদর্শনকে অস্বীকারকারী হয়ে থাক, যেমন প্রমাণাদি দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে, তবে তোমাদের কল্যাণ নেই। অতএব গভীরভাবে পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা কর এবং ঐ দিনকে ভয় কর, যার আলোচনা সামনে আসছে।

প্রখ্যাত তফসীরকার ইবনে কাছীর (র) আয়াতের এ মর্মই গ্রহণ করেছেন (এ হিসাবে اِفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ এর অর্থ– নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করা)। আর কোন কোন তফসীরকার اِفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ দ্বারা মুশরিকদের শিরক উদ্দেশ্য করেছেন, যেমন সামনে وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ এর মধ্যে এ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে (কারণ, مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ দ্বারা তাদের শিরকই উদ্দেশ্য)। والله أعلم

২. অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবি ছিল যে, তারা আল্লাহর অংশীদার এবং দুঃখ-কষ্টে তোমাদের সুপারিশকারী ও সাহায্যকারী– আজ তোমাদের এমন দুর্ভাগ্য ও বিপদের সময় তারা কোথায় চলে গেল? কই, তারা তো তোমাদের কোনই উপকারে আসছে না?

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. অতঃপর ওদের এ ছাড়া আর কোন ফন্দি থাকবে না* যে, ওরা বলবে, 'কসম আল্লাহর যিনি আমাদের রব, আমরা শির্ককারী ছিলাম না'[১]

اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. দেখ, ওরা নিজেদের সম্বন্ধে কেমন মিথ্যা বলল! আর ওরা যা কিছু মিথ্যা রচনা করত, তা ওদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে[২]।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ

২৫. ওদের মধ্যে কতক এমন, যারা আপনার দিকে কান পেতে রাখে। কিন্তু আমি ওদের অন্তরের উপর পর্দা ফেলে রেখেছি, যাতে তা (আল্লাহর কালাম) বুঝতে না পারে এবং ওদের কানে সৃষ্টি করে দিয়েছি বধিরতা। আর ওরা যদি সমস্ত নিদর্শনও দেখে নেয়, তবুও সেসবের প্রতি ঈমান আনবে না[৩]।

---

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আর কোন জবাব থাকবে না...'

১. অর্থাৎ তখন (ওদের দ্বারা) সত্য বিষয়াদির অস্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই হয়ে উঠবে না। বাতিল মাবূদদের যে ভক্তি ও মহব্বতে ওরা বিমোহিত ছিল, তার ফলাফল শুধু এই হবে যে, সারা জীবনের ভক্তি-বিশ্বাস ও সম্পর্ক পর্যন্ত অস্বীকার করে বসবে।

২. অর্থাৎ উক্ত ডাহা মিথ্যা দ্বারা মুশরিকদের চরম দিশাহারা অবস্থা এবং ওদের শরীকদের চূড়ান্ত অক্ষমতা প্রকাশ পাবে। আফসোস, যদি মুশরিকরা এই অপমানকর পরিণাম দুনিয়াতেই বুঝে নিতে পারত!

৩. এটা সেই লোকদের আলোচনা, যারা কুরআন করীম ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার প্রতি কান দিত শুধুমাত্র বিরোধিতা ও দোষান্বেষণের উদ্দেশ্যে, হেদায়েতের দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং সত্যকে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নয়। নসীহত ও হেদায়েতের প্রতি ওদের অব্যাহত অবজ্ঞা ও বিবেকের অনবরত অপব্যবহারের স্বাভাবিক ফল এই হল যে, শেষ পর্যন্ত সত্য গ্রহণের সকল মাধ্যম ও ক্ষমতা অকেজো হয়ে গেল, সত্যের উপলব্ধি থেকে ওদের অন্তরকে বঞ্চিত করে দেওয়া হল, আল্লাহর পয়গাম শ্রবণ ওদের কানে ভারী মনে হতে লাগল এবং ওদের চোখ শিক্ষামূলক দৃষ্টি থেকে এমনি শূন্য হয়ে গেল যে, সর্বপ্রকার নিদর্শন দেখেও ঈমান আনার তাওফীক হল না।

অধিকন্তু আজব ব্যাপার এই যে, এহেন মৃত্যুবৎ অবস্থার প্রতি ওরা সন্তুষ্ট ও আনন্দিত ছিল, বরং গর্বভরে এর ঘোষণাও করত। সূরা 'হা-মীম-সেজদা'য় (আয়াত ৪-৫) আছে-

يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ۝

এমন কি, যখন ওরা আপনার সঙ্গে বিতর্ক করার জন্য আপনার কাছে আসে, তখন (এই) কাফেররা বলে, 'এ (কুরআন) পূর্ববর্তীদের উপাখ্যান ছাড়া আর কিছু নয়।'

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ۝

২৬. আর ওরা তাতে বাধা দেয় এবং নিজেরা তা থেকে বিরত থাকে। বস্তুত ওরা নিজেদেরই ধ্বংস করছে, কিন্তু ওরা উপলব্ধি করে না[১]।

فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ۝ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ

('কিন্তু ওদের অধিকাংশ এ কিতাব থেকে বিমুখ রয়েছে, ফলে ওরা তা শোনে না। বলে, আমাদের অন্তর ঐ বিষয় থেকে গিলাফে আবৃত, যার দিকে তুমি আমাদের আহ্বান কর, আমাদের কানে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মাঝে রয়েছে পর্দা। অতএব আপনি আপনার কাজ করুন, আমরা আমাদের কাজ করি।') এখান থেকে জানা গেল, কুরআনের আয়াতসমূহ শুনে উপকৃত না হওয়া এবং অন্তরের উপর পর্দা পড়ে যাওয়া স্বয়ং ওদেরই সত্য-বিমুখতার ফসল ছিল এবং এই সত্য-বিমুখতাই এহেন অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হয়েছে। সূরা 'লুকমান' এর মধ্যে (আয়াত ৭) রয়েছে- وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ('আর যখন ওকে আমার আয়াতগুলি পড়ে শোনানো হয়, তখন দম্ভভরে পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়, যেন সে সেগুলি শুনেইনি, যেন ওর দুটা কানই বধির।')

তবে যেহেতু কারণের ভিত্তিতে কার্য ঘটানো মহান স্রষ্টারই কাজ, তাই বর্তমান আয়াতে অন্তরের উপর পর্দা ইত্যাদি ফেলার কাজকে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বলা হয়েছে– وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً..الخ

১. অর্থাৎ ওদের মধ্যে বুঝশক্তিও রয়নি, বিচারশক্তিও থাকেনি, ঈমান আনা ও আল্লাহর হেদায়েত দ্বারা উপকৃত হওয়া তো দূরের কথা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ওদের আসার উদ্দেশ্যই হয় বাদানুবাদ ও পরিহাস করা। এ কারণেই ওরা কুরআনের জ্ঞানগর্ভ ও অতি বাস্তবসম্মত বক্তব্য-বর্ণনাকে أساطير الأوّلين বলে থাকে। আর তাকে মিথ্যা বলে এবং বাদানুবাদ ও হাসি-ঠাট্টা করেই ক্ষান্ত হয়নি, অধিকন্তু ওদের প্রচেষ্টা হচ্ছে অন্যদের পর্যন্ত নিজদের রোগের সংক্রমন ঘটানো। সে মত ওরা লোকদের সত্য গ্রহণে বাধা দিয়ে থাকে এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে পলায়ন করে, যাতে ওদের দেখাদেখি অন্যরাও সত্য গ্রহণে ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! এসব নাপাক চেষ্টা-তদবিরে সত্য ধর্মের কোনই ক্ষতি হতে পারে না– সত্য ধর্ম বিজয়ী হবেই হবে। আর এসব অপচেষ্টায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁর নিষ্পাপতা ও মর্যাদা

২৭. আপনি (বড় ভয়ানক দৃশ্য দেখবেন) যদি (ওদের) তখন দেখেন, যখন ওদের আগুনের সামনে দাঁড় করানো হবে! আর ওরা বলবে, 'হায়! যদি আমাদের আবার (দুনিয়ায়) পাঠানো হত! তা হলে আমরা আমাদের রবের আয়াতগুলি অস্বীকার করতাম না এবং আমরা ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম[১]।'

وَلَوْ تَرٰۤى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৮. (তা নয়), বরং ওদের সম্মুখে ঐ জিনিস (আযাব) প্রকাশ পেয়ে গেছে, যাকে ইতিপূর্বে ওরা গোপন করত (অর্থাৎ অস্বীকার করত)[২]। আর যদি ওদের আবারো পাঠানো হয়, তবে অবশ্যই আবারো সেই কাজই করবে যা করতে ওদের নিষেধ করা হয়েছিল, আর ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী[৩]।

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٢٨﴾

রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন। হাঁ, এই বোকারা বরং নিজেদের জন্য চিরধ্বংসের ব্যবস্থা করছে। অথচ বুঝছেও না যে, ওরা নিজেদের হাতে নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করছে।

১. অর্থাৎ আল্লাহর আয়াতগুলিকে মিথ্যা বলা, সেগুলি নিয়ে হাসিঠাট্টা করা ইত্যাদি সমস্ত তর্জন-গর্জন ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ আল্লাহর শাস্তির ভয়ঙ্কর দৃশ্য চোখের আড়ালে রয়েছে। যখন দোযখের একটুখানি আঁচও লেগে যাবে, তখন সকল আস্ফালন মাটি হয়ে যাবে এবং হাজারো অনুনয়ের সাথে দরখাস্ত করে বলবে, আমাদের দুনিয়াতে পুনর্বার পাঠিয়ে দেওয়া হোক, যাতে ভবিষ্যতে কখনো আমরা রবের আয়াতসমূহকে মিথ্যা না বলি এবং পাক্কা ঈমানদার হয়ে থাকি।

২. অর্থাৎ তখনো দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সদিচ্ছা, ঈমানী আকর্ষণ ও নেক উৎসাহের কারণে হবে না; বরং যখন প্রতিফল ও প্রতিদানের সেই দৃশ্য সম্মুখে এসে যাবে যাকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও অস্বীকৃতির পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখত, আল্লাহর আযাবকে চোখে দেখে ফেলবে, যেসব কুকর্ম লুকিয়ে লুকিয়ে করে যাচ্ছিল সেসবের রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে, এইমাত্র যে وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ বলেছিল এই মিথ্যারও অসারতা প্রকাশ পেয়ে যাবে; মোটকথা, যখন এই দূরাত্মারা দেখবে যে, ওদের যাবতীয় দুষ্কৃতি ও কুকর্মের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া নির্মম শাস্তির আকার ধারণ করে সামনে এসে গেছে, তখন শুধু জান বাঁচানোর জন্য পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে।

৩. অর্থাৎ এখনো ওরা মিথ্যা বলছে যে, আমরা দুনিয়ায় ফিরে গিয়ে পাক্কা ঈমানদার হয়ে যাব এবং কিছুতেই আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলব না। এ হতভাগাদের যদি দুনিয়ায় ফিরিয়ে

২৯. ওরা বলে, 'আমাদের এই পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই এবং আমাদের পুনর্জীবিত হতে হবে না[১]।'

وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝

৩০. আর আপনি (বড় ভয়ানক দৃশ্য দেখবেন) যদি (ওদের) তখন দেখেন, যখন ওদের দাঁড় করানো হবে স্বীয় রবের সামনে! তিনি বলবেন, 'এ কি সত্য নয়?' ওরা বলবে, 'কেন নয়, আমাদের রবের কসম' (অবশ্যই সত্য)। তিনি বলবেন, 'সুতরাং তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর। কারণ, তোমরা অবিশ্বাস করতে'[২]।

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

[রুকূ - ৪]

৩১. নিশ্চয় ওরা ধ্বংস হয়েছে, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে। অবশেষে যখন কিয়ামত ওদের নিকট সহসা এসে পড়বে, তখন বলবে, 'হায় আফেসোস! আমরা এর বিষয়ে কত অবহেলা করেছি!' আর ওরা নিজেদের পিঠের উপর নিজেদের বোঝা বহন করবে। শোন, ওরা যা বহন করবে তা অতি মন্দ বোঝা[৩]!

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا۟ يَٰحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ۝

দেওয়া হয়, তবে মন্দ ও দুষ্কৃতির যে শক্তি ওদের মধ্যে নিহিত আছে তাকে পুনরায় সক্রিয় করে তুলবে এবং যে আযাবের কারণে ভীত হয়ে দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করছে, তা স্বপ্ন ও কল্পনার মত ভুলে যাবে। যেমন: কোন কোন সময় পার্থিব বিপদ-আপদে পড়ে মানুষ তওবা করে এবং আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সে সবই ভুলে যায়।

১. অর্থাৎ খুব আনন্দ-ফূর্তি করে নাও, অযথা পরকালের চিন্তায় দুনিয়ার আনন্দ-উল্লাসের জীবন মাটি করো না। আধুনিক পাশ্চাত্যের বস্তুবাদীদেরও ঠিক এই অবস্থাই হয়েছে।

২. অর্থাৎ বাস্তব সত্য যখন চোখের সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে এবং পুনরুত্থান ইত্যাদিকে স্বীকার না করে পারবে না, তখন ওদের বলা হবে- 'বাস্তব সত্যের অস্বীকৃতি ও পরকালকে অবিশ্বাস করার স্বাদ গ্রহণ কর।'

৩. আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎকে অস্বীকার করা এবং জীবনের এই মহোত্তম উদ্দেশ্যকে মিথ্যা বলা মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় দুর্ভাগ্য ও অভিশাপ। অবশেষে, যখন মৃত্যু বা কিয়ামত এসে মাথার

৩২. দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। পক্ষান্তরে, আখেরাতের ঘরই পরহেযগারদের জন্য উত্তম। তোমরা কি বোঝ না[১]?

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۚ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝٣٢

৩৩. আমি ভাল করেই জানি, ওরা যা বলে তা আপনাকে দুঃখ দেয়; আসলে ওরা আপনাকে অস্বীকার করে না, বরং (এ) জালেমরা তো আল্লাহর আয়াতগুলি অস্বীকার করে।

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝٣٣

৩৪. আর নিশ্চয় আপনার পূর্বেও রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের যে মিথ্যাবাদী বলা হল ও কষ্ট দেওয়া হল, তাতে তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেছেন। অবশেষে তাঁদের নিকট এসেছে আমার সাহায্য। আল্লাহর কথাগুলি পরিবর্তন করে- এমন কেউ নেই। আর নিশ্চয়ই রাসূলদের কিছু হাল-অবস্থা আপনার নিকট পৌঁছেছে[২]।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ۝٣٤

উপর দাঁড়াবে, তখন ওরা অযথা আফসোস করে বলতে থাকবে, হায়! আমরা আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণে কী অপূরণীয় ত্রুটিই না করলাম! কিন্তু তখন আফসোস ও আক্ষেপ করে কোনই ফল হবে না। অন্যায় ও দুষ্কৃতির যে বোঝা ওরা আপন পিঠে তুলে নিয়েছে, এই অসময়ের দুঃখ ও আক্ষেপে তা কিছুমাত্র হালকা হবে না।

১. কাফেররা তো বলত, পার্থিব জীবন ছাড়া কোন জীবনই নেই। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, পরকালীন জীবনের মোকাবেলায় এই নশ্বর ও পঙ্কিল জীবন অতি নগন্য ও অসার। পার্থিব জীবনের কেবল সেই মুহূর্তগুলিকেই প্রকৃত জীবন বলা যায়, যেগুলি পরকালের পাথেয় সংগ্রহে ব্যয় করা হয়। অবশিষ্ট সমস্ত সময় যা আখেরাতের ফিকির ও প্রস্তুতি থেকে শূন্য থাকে, তা একজন পরিণামদর্শীর নিকট ক্রিড়া-কৌতুকের বিষয় থেকে বেশি মূল্য রাখে না। পরহেজগার ও বুদ্ধিমান লোকেরা জানে, পরকালের ঘরই তাদের আসল ঘর এবং পরকালের জীবনই তাদের প্রকৃত জীবন।

২. সৃষ্টিজগতের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া-মায়া ও সহানুভূতি বিশ্বের আর সকলের চেয়ে বেশি। তাই এ হতভাগাদের অস্বীকৃতি, সত্যবিমুখতা এবং শিরকী ও বে-দীনী কথাবার্তায় তিনি দারুণ দুঃখ ও কষ্ট অনুভব করতেন। এই আয়াতগুলিতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এবং দুর্ভাগাদের ভীতিপ্রদর্শন করে বলা

৩৫. আর যদি ওদের বিমুখতা আপনার কাছে দুঃসহ লাগে, তবে আপনি যদি ভূগর্ভে (যাওয়ার) কোনো সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে (আরোহণ করার) কোন সিঁড়ি খুঁজে বের করতে পারেন, অতঃপর ওদের নিকট কোন (ফরমায়েশী) মু'জেযা আনতে পারেন– (তবে তাই করুন)। আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে অবশ্যই ওদের সকলকে সরল পথে সমবেত করে দিতেন। অতএব আপনি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না[১]।

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

হয়েছে যে, আপনি ওদের অস্বীকৃতি ও সত্যবিমুখতায় এত মনঃক্ষুণ্ন ও অস্থির হবেন না। ওরা যে অস্বীকার করছে তা প্রকৃতপ্রস্তাবে আপনাকে নয়। কেননা, আপনাকে তো প্রথম থেকেই সর্বসম্মতভাবে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত (أمين ও صادق) মনে করা হয়। ওরা বরং আল্লাহর যেসব আয়াত ও নিদর্শন পয়গম্বর আলাইহিস সালামের সত্যতার পক্ষে পাঠানো হয়েছে, সেসবকে জেনেশুনে অস্বীকার করছে। সুতরাং আপনিও এই জালেমদের ব্যাপার আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দিয়ে শান্ত হয়ে যান। তিনি নিজেই ওদের অত্যাচারের প্রতিফল ও আপনার ধৈর্যের প্রতিদান দেবেন।

পূর্ববর্তী নবীগণের সঙ্গেও, যাঁদের কিছু হাল-অবস্থা আপনাকে শোনানো হয়েছে, তাঁদের জাতি অস্বীকৃতি ও নির্যাতনমূলক আচরণ করেছিল। তখন আল্লাহর মাসূম পয়গম্বরগণ অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে ধৈর্যধারণ করেছিলেন, যাবৎ না ওয়াদা অনুযায়ী আল্লাহর সাহায্য পৌঁছেছে এবং বিরাট ক্ষমতাশালী ও অহংকারীদের মোকাবেলায় তাঁরা সফল ও বিজয়ী হয়েছেন। আপনার সঙ্গেও সাহায্য ও বিজয়ের যে ওয়াদা করা হয়েছে, তা একে একে পূর্ণ হতে থাকবে। পাহাড় স্বীয় স্থান থেকে সরে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহর ওয়াদা টলতে পারে না। আল্লাহর কথা পরিবর্তন করে ফেলে এমন কে আছে, অর্থাৎ তিনি যা বলেছেন তা বাস্তবায়িত হতে বাধা দেয়– এমন কে আছে?

অস্বীকারকারীদের মনে রাখা উচিত, ওদের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নয়, বরং মুহাম্মদের প্রভুর সঙ্গে, যিনি তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বাণীবাহক বানিয়ে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদিসহ পাঠিয়েছেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করার অর্থ তাঁর প্রভুর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করা।

১. কাফেরদের দাবি ছিল, তিনি নবী হলে তাঁর সঙ্গে সর্বদা এমন নিদর্শন থাকা উচিত যা দেখে যে কেউ বিশ্বাস করতে ও ঈমান আনতে বাধ্য হয়ে পড়ে। এদিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা দুনিয়ার হেদায়েতের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাই সম্ভবত তাঁর ইচ্ছা হয়ে থাকবে যে, উক্ত দাবি পূরণ করে দেওয়া হোক।

৩৬. (আপনার আহ্বানে) তারাই সাড়া দেয় যারা শ্রবণ করে। আর মৃতদের আল্লাহ পুনর্জীবিত করবেন, অতঃপর তাঁরই কাছে তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে[১]।

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝

৩৭. ওরা বলে, 'তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয় না কেন[২]?'

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ

এ জন্য আল্লাহ তাআলা সতর্ক করছেন যে, সৃষ্টিগত বিষয়াদিতে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত থাক। আর সৃষ্টিজগতে আল্লাহর যে নিয়ম-কানুন কার্যকর, তার দাবি এই নয় যে, সমগ্র দুনিয়াকে ঈমান গ্রহণে বাধ্য করা হবে। নতুবা আল্লাহ তো পয়গম্বর ও নিদর্শনের মাধ্যম ছাড়াই প্রথম থেকেই সকলকে সরল পথে সমবেত করে দিতে সক্ষম ছিলেন। তো যখন আল্লাহর হেকমত এমন বাধ্যকর মুজেযা ও ফরমায়েশী নিদর্শন দেখানোর পক্ষে নয়, তখন আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার এই শক্তি আছে যে, ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ বা আকাশে সিঁড়ি সংযোগ করে এমন ফরমায়েশী ও বাধ্যকর অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়ে দেবে? খোদার হেকমতের বিরুদ্ধে কোন কিছু সংঘটিত হওয়ার আশা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

১. অর্থাৎ সকলে মানবে, এ আশা করবেন না। যাদের অন্তরের কান বধির হয়ে গেছে তারা শোনেই না। অতএব মানবে কেমন করে? তবে হাঁ, এই কাফেররা, যারা আত্মিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে মৃতদের মত, কিয়ামত দেখে ঈমান আনবে এবং যেসব বিষয় অস্বীকার করত তা স্বীকার করে নেবে!

২. অর্থাৎ ওরা যেসব নিদর্শনের ফরমায়েশ করত, সেগুলোর কোন একটি কেন অবতীর্ণ হল না? যেমন, সূরা 'বনী ইসরাঈল' এর দশম রুকূতে (আয়াত ৯০-৯৩) আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا، أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا ، أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلا ، أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلا بَشَرًا رَسُولا

অর্থ– ওরা বলে, 'আমরা আপনার কথায় ঈমান আনব না, যতক্ষণ না আপনি আমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎসারণ করে দেবেন একটি ঝরনা, অথবা আপনার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান হয়ে যাবে, অতঃপর আপনি তার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র নহর প্রবাহিত করবেন, অথবা আমাদের উপর আকাশকে খন্ড-বিখন্ড করে পতিত করে দেবেন যেমন আপনি বলে থাকেন, অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে (আমাদের) সামনে নিয়ে আসবেন, অথবা আপনার জন্য হয়ে যাবে একটি সোনার ঘর অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন, আর

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ নিদর্শন অবতীর্ণ করতে অবশ্যই সক্ষম। কিন্তু ওদের অধিকাংশই জানে না[১]।'

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ۝

৩৮. পৃথিবীতে বিচরণশীল যত জীব আছে এবং যত পাখি আছে যারা নিজ ডানার সাহায্যে উড়ে বেড়ায়, তারা তোমাদের মত এক একটি দল। আমি কিতাবে (লওহে মাহফূজে) কোন কিছু বাদ দেইনি। তার পর সকলকেই আপন রবের সামনে একত্র করা হবে[২]।

আপনার আরোহণকে আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আপনি আমাদের উপর এমন একখানা কিতাব অবতীর্ণ করবেন, যা আমরা পাঠ করব।' আপনি বলুন, 'সুবহানাল্লাহ! আমি তো একজন মানুষ বৈ আর কেউ নই, যাকে প্রেরণ করা হয়েছে।'

(বর্তমান আয়াতে এ জাতীয় ফরমায়েশী নির্দশনের কথা বলা হয়েছে) নতুবা তাঁর প্রতি তো অসংখ্য ইলমী ও আমলী মুজেযা ও নিদর্শন বৃষ্টির মত অবতীর্ণ হতে থাকত।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ফরমায়েশী মুজেযা দেখাতে অক্ষম নন; কিন্তু তাঁর হেকমত ও রহমতের যেসব আইন-কানুনের উপর মহাবিশ্বের ভিত্তি, তা তোমাদের অধিকাংশ লোকেরা বুঝতে অক্ষম। আর সেসব আইন-কানুনের দাবি হচ্ছে, ফরমায়েশী মুজেযা না দেখানো।

২. এ আয়াতে ফরমায়েশী নিদর্শন না দেখানোর কিছু হেকমত সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ– সকল জীবজন্তু, চাই ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করুক বা আকাশে উড়ুক, তারাও মানুষের মত এক একটি উম্মত (বা প্রজাতি)। তাদের মধ্যে প্রত্যেক প্রজাতিকে আল্লাহ তাআলা এক বিশেষ আকৃতি ও প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা তার নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া-কর্মের সীমার মধ্যে সক্রিয় রয়েছে। (জীবজগতের) প্রত্যেক প্রজাতির জন্য তার স্বভাব ও যোগ্যতা হিসাবে ক্রিয়া-কর্ম ও চাল-চলনের যে সীমিত পরিমণ্ডল আল্লাহ চিহ্নিত করে দিয়েছেন– তার বাইরে সে এক কদমও যেতে পারে না। এ জন্যই সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোন প্রজাতিই তার জন্য নির্ধারিত কর্মক্ষেত্রের পরিসীমায় কোন প্রকার উন্নতি করতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ তাআলার অনাদি জ্ঞানে ও লওহে মাহফূজে জীবজগতের সকল শ্রেণী ও প্রজাতির পরিচালন ও লালনপালনের নীতিমালা সুনির্দিষ্টরূপে নির্ধারিত রয়েছে, কোন জীব ইহজীবনে ও মৃত্যুর পরে কোথাও উক্ত পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার বাইরে যেতে পারে না।

মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং ফরমায়েশী নির্দশন না দেখানোর তাৎপর্য

জীবজগতে মানুষ একটি ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ও উন্নয়নশীল জীব (বা প্রজাতি)। তার একটি বিশেষ গুণ বা যোগ্যতা অর্থাৎ ইচ্ছা-শক্তি এবং উন্নত বুদ্ধি ও বিবেকের উপস্থিতি তার সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনা ও জীবন-প্রণালীকে আর সকল প্রাণী থেকে এতই উন্নত ও স্বতন্ত্র করে

৩৯. যারা আমার আয়াতগুলি অস্বীকার করে তারা বধির ও বোবা, অন্ধকারপুঞ্জে (পতিত)[১]। আল্লাহ যাকে চান গোমরাহ করেন এবং যাকে চান সরল পথে স্থাপন করেন[২]।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৪০. আপনি বলুন, 'বল দেখি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব নেমে আসে অথবা তোমাদের উপরে কিয়ামত এসে পড়ে, তবে তখন কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাকবে? (বল), যদি সত্যবাদী হও।'

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

দিয়েছে যে, এখন তাকে প্রাণী (বা জন্তু) বলতেও সংকোচ লাগে। সে অন্য জীবজন্তুর বিপরীতে দেখা-শোনা ও জিজ্ঞাসার সাহায্যে নতুন নতুন জ্ঞান হাসিল করে এবং চিন্তা-শক্তি দ্বারা তা বিন্যস্ত করে নব জীবনের দিকে উন্নতি করতে থাকে। সে ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে, হিতকর ও অহিতকর বস্তু চিনতে, ভবিষ্যত-পরিণাম বুঝতে সক্ষম এবং কোন একটি কাজ করা না করায় সম্পূর্ণ স্বাধীন।

এ জন্যই তাকে খোদার তরফ থেকে এমন নিদর্শন দেখানো হয়, যাতে তার চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ থাকে এবং যা চিন্তা ও কর্মের স্বভাবজাত স্বাধীনতাকে হরণ না করে। আর সে যদি আল্লাহপ্রদত্ত বুদ্ধিশক্তির সাহায্যে ওই নিদর্শন নিয়ে সঠিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সত্য ও মিথ্যা এবং ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে তাকে একটুও বেগ পেতে হয় না। সুতরাং এমন ফরমায়েশী মুজেযা ও নিদর্শনের দরখাস্ত করা, যা সর্বতোভাবে মানুষকে ঈমান গ্রহণে বাধ্য করে দেয়, এর অর্থ– মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও তার সৃষ্টিগত নিয়ম ধ্বংস করে দেওয়া; বরং মানুষকে আর সকল জীবজন্তুর কাতারে নামিয়ে দেওয়া। আর যদি ফরমায়েশী নিদর্শন সর্বতোভাবে ঈমান আনতে বাধ্যই না করে, তবে তা দেখানো নিরর্থক। কেননা, তা দেখানোর পরও এমন সব প্রমাণহীন দ্বিধা ও সন্দেহ সৃষ্টি করা হবে, যা হাজারো ফরমায়েশহীন নিদর্শনের ক্ষেত্রে করা হয়েছে।

১. অর্থাৎ অন্যে বললে তার কথা শোনে না, নিজেরাও অন্যকে জিজ্ঞাসা করে না এবং অন্ধকারে পতিত বলে কিছু দেখতেও পায় না। যখন এভাবে নিজেদের অমিতাচার দ্বারা সকল শক্তিকে অকেজো করে ফেলেছে, তখন আর সত্যকে স্বীকার ও গ্রহণ করার উপায় কী?

২. গোমরাহ তাকেই করতে চান, যে নিজেই হেদায়েতের উপায়-উপকরণ নিজের জন্য বন্ধ করে ফেলে। সূরা 'আরাফ' এর ২২ রুকূতে (আয়াত : ১৭৬) আছে- وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَ لٰكِنَّهٗ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ (আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে ঐ আয়াতগুলির বদৌলতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারতাম। কিন্তু সে তো দুনিয়ার হয়ে গেল (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ল) এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করল।'

৪১. বরং (বিপদের সময়) তোমরা তাঁকেই ডাক, অতঃপর তিনি ইচ্ছা করলে তা দূর করে দেন যার জন্য তোমরা তাঁকে ডাক; আর তোমরা যাদের শরীক করতে তাদের ভুলে যাও[১]।

بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ۝

[রুকূ - ৫]

৪২. নিশ্চয়ই আমি আপনার পূর্বে বহু উম্মতের নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর আমি ওদের পাকড়াও করেছি অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে, যাতে ওরা কাকুতি- মিনতি করে।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ۝

৪৩. তো, যখন ওদের উপর আমার আযাব এল, তখন কাকুতি-মিনতি করল না কেন? অধিকন্তু ওদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল এবং শয়তান ওদের দৃষ্টিতে ওরা যা কিছু করত তা শোভন করে তুলল।

فَلَوْ لَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৪৪. অতঃপর ওরা যখন ওদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তা ভুলে গেল, তখন আমি ওদের জন্য (ভোগ-বিলাসের) সকল বস্তুর দ্বার খুলে

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۭ حَتّٰٓى اِذَا

---

১. যেহেতু অন্ধ, বধির ও বোবা হয়ে তোমরা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বললে এবং গোমরাহীর গভীর গর্তে গিয়ে পতিত হলে, সুতরাং দুনিয়ায় বা কিয়ামতে যদি খোদার কঠোর আযাব নাযিল হয়, তবে সত্য করে বল দেখি, আল্লাহ ছাড়া তখন কাকে ডাকবে? দুনিয়ার ছোট ছোট বিপদে যখন বেষ্টিত হয়ে পড়, তখন বাধ্য হয়ে সেই একক খোদাকেই ডেকে থাক এবং সকল শরীককে ভুলে যাও। যেমন, অন্যত্র বলা হয়েছে- فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ('যখন ওরা নৌযানে আরোহণ করে, তখন আল্লাহকে ডাকতে থাকে একমাত্র তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস স্থাপন করে।' –সূরা আনকাবূত, আয়াত ৬৫)। ফলে ইচ্ছা হলে আল্লাহ সেই মুসীবত দূরও করে দেন।

এ থেকেই অনুমান করে নাও যে, আযাবের অবতরণ বা কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কে তোমাদের বাঁচাতে পারে? এর পরও আল্লাহর বড়ত্ব ও পরাক্রমকে ভুলে গিয়ে তাঁর নাযিলকৃত আয়াতগুলিকে অস্বীকার করা এবং ফরমায়েশী নিদর্শনের দাবি করা– কত বড় বোকামী ও অন্ধতা!

فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ

দিলাম। অবশেষে ওরা যখন ওদের যা কিছু দেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে উল্লসিত হয়ে উঠল, তখন আমি ওদের সহসা পাকড়াও করলাম। আর তখনি ওরা হতাশ হয়ে পড়ল[১]।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

৪৫. অতঃপর জালেম লোকদের মূলোচ্ছেদ করা হল। আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক[২]।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ

৪৬. আপনি বলুন, 'বল তো, যদি আল্লাহ তোমাদের কান ও চোখগুলি ছিনিয়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরে মোহর করে দেন[৩], তবে আল্লাহ ছাড়া এমন মাবূদ আর কে আছে, যে তোমাদের এসব এনে দেবে?[৪] দেখুন, আমি

---

১. পূর্বের আয়াতে আযাব আসার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল। এখন স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, পূর্বকালে এ ধরনের আযাব এসেছিল। অধিকন্তু এ মর্মে সতর্ক করা হচ্ছে যে, যখন অপরাধীকে প্রাথমিকভাবে হালকা শাস্তি দ্বারা সতর্ক করা হয়, তখনি তার আল্লাহ-অভিমুখী হওয়া উচিত। অন্তরের বক্রতা ও শয়তানের প্ররোচনায় এ শাস্তিকে হালকা মনে না করা উচিত।

তাফসীরে 'মূযেহুল কুরআনে' আছে, পাপীকে আল্লাহ তাআলা প্রথমে সামান্য পাকড়াও করেন। তাতে যদি সে বিনীত হল এবং তওবা করল, তবে বেঁচে গেল। আর যদি এতটুকু ধরপাকড়ে সতর্ক না হয়, তবে তাকে ধোঁকায় ফেলা হয় এবং তার জন্য জীবিকার প্রাচুর্যের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর যখন নে'য়ামতরাশির শোকর-গুজারী না করে এবং তা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে উলটা পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন বিনা নোটিশে আকস্মিকভাবে তাকে ধরা হয়। –এতে এই শিক্ষা রয়েছে যে, মানুষকে গোনাহর জন্য প্রাথমিক সতর্ক করা হলে শীঘ্র তওবা করা উচিত। তা না করে 'বেশি শাস্তি এলে বিশ্বাস করব'– এই পথ অবলম্বন করা উচিত নয়।

২. জালেমদের মূলোচ্ছেদও আল্লাহ তাআলার সার্বজনীন প্রতিপালনের ফল এবং গোটা জগতের জন্য বিরাট রহমত। এ জন্যই এখানে তার কারণে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে।

৩. যাতে তোমরা শুনতেও না পার, দেখতেও না পার এবং অন্তরের দ্বারা বুঝতেও না পার।

৪. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) বলেন, 'তওবা করতে দেরি করা উচিত নয়। যে কান, চোখ ও অন্তর বর্তমানে আছে, পুনরায় হয়ত তা পাওয়া যাবে না; ফলে তওবা ও এসতেগফারে সমর্থ হয়ে উঠবে না।'

نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ۝

কিরূপে নানাভাবে আয়াতসমূহ বর্ণনা করি। তারপরও ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ۝

৪৭. আপনি বলুন, 'বল তো, যদি তোমাদের উপরে আল্লাহর শাস্তি অকস্মাৎ বা প্রকাশ্যে আসে[১], তবে জালেম লোকদের ছাড়া আর কাউকে ধ্বংস করা হবে কি[২]?'

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۝

৪৮. আমি রাসূলগণকে শুধু সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি। অতঃপর যারা ঈমান আনে ও (নিজেদের) সংশোধন করে, তাদের কোন ভয়ও নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ۝

৪৯. আর যারা আমার আয়াতগুলি অস্বীকার করে, ওদের উপরে আপতিত হবে শাস্তি, কেননা ওরা নাফরমানি করত[৩]।

---

১. 'অকস্মাৎ'– অর্থাৎ যে আযাবের কোন আলামত পূর্বে প্রকাশ না পায়। অতএব 'প্রকাশ্যে' বলতে সেই আযাব উদ্দেশ্য হবে, যার আগমনের পূর্বেই আলামত প্রকাশ পেতে শুরু করে।

২. অর্থাৎ তওবা করতে দেরি করা উচিত নয়। হতে পারে, এই দেরির অবকাশে আযাব এসে পড়বে– যে আযাবের খেসারত শুধু জালেমদেরই পোহাতে হবে। আর যারা পূর্বেই জুলুম ও সীমালজ্ঘন থেকে তওবা করে থাকবে, শুধু তারাই শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে।

৩. অর্থাৎ তোমরা যে আল্লাহর আযাব সম্বন্ধে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে অনর্থক ফরমায়েশ ও নিরর্থক প্রশ্ন করে করে পয়গম্বর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে বিব্রত করছ এবং তাঁর সত্যতা প্রমাণের জন্য মনগড়া মানদণ্ড বের করছ, ভালভাবে বুঝে নাও যে, তোমাদের এসব আজে-বাজে ফরমায়েশ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে নবীদের পাঠানো হয়নি। তাঁদের পাঠানোর উদ্দেশ্য শুধু সুসংবাদ প্রদান ও ভয় প্রদর্শন এবং সত্যের প্রচার-প্রসার করা।' আজ্ঞাবহদের সুসংবাদ শোনানো এবং অবাধ্যদের মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সতর্কীকরণের জন্যই আল্লাহর তরফ থেকে তাঁরা প্রেরিত হয়ে থাকেন।

অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কর্মের ফল ভোগ করবে– যে কেউ নবীদের কথায় বিশ্বাস করল এবং আকীদা ও আমল উভয় দিক থেকে নিজের অবস্থা শোধরাল, প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা তারই ভাগ্যে জুটবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে তাঁর হেদায়েত থেকে ঘাড় ফিরিয়ে রাখল, সে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের কারণে ধ্বংস ও মহাশাস্তির যোগ্য হল। (আল্লাহ রক্ষা করুন!)

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِیْ خَزَآىِٕنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّیْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا یُوْحٰۤی اِلَیَّ ؕ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۟

৫০. আপনি বলুন, 'আমি তোমাদের বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে, আর আমি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানও রাখি না এবং আমি তোমাদের এ কথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা[১]। আমি তো কেবল তার অনুসরণ করি, যা (আল্লাহর পক্ষ হতে) আমার নিকট পাঠানো হয়।' আপনি বলে দিন, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কখনো সমান হতে পারে কি? অতএব তোমরা কি গভীরভাবে চিন্তা কর না[২]?'

---

১. এই আয়াতে রেসালাত-নবুওয়াতের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থাৎ যিনি নবুওয়াতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, তাঁর দাবি এ হয় না যে, আল্লাহ তাআলার সকল শক্তির ভাণ্ডার তাঁর অধিকারে– যখনই তাঁর নিকট কোন কাজের ফরমায়েশ করা হবে, তখন তিনি অবশ্যই তা করে দেখাবেন। তদ্রূপ (তাঁর দাবি এও হয় না যে,) দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বিষয়ের ইলম, তা রেসালাতের দায়িত্ব-কর্তব্যের সাথে সম্পর্কিত হোক বা না হোক, তাঁকে দান করা হয়েছে। ফলে যা কিছু তোমরা জিজ্ঞাসা করবে, তৎক্ষণাৎ তিনি তার উত্তর দিয়ে দেবেন। আর (তাঁর দাবি এও হয় না যে,) তিনি মানব শ্রেণী থেকে ভিন্ন কোন অতিমানব, যিনি মানবীয় দুর্বলতা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে পবিত্র।

তিনি যখন এসব বিষয়ের কোনটিরই দাবিদার নন, তখন তাঁর নিকট ফরমায়েশী মুজেযা চাওয়া, অথবা শত্রুতা করতে গিয়ে এ ধরনের প্রশ্ন করা যে, 'কিয়ামত কখন আসবে?' অথবা এ কথা বলা যে, 'ইনি কেমন রাসূল, যিনি খাদ্য গ্রহণ করেন এবং বেচাকেনার উদ্দেশ্যে বাজারে যান'?—এসব কতটুকু সঠিক হতে পারে?

২. অর্থাৎ পয়গম্বর যদিও মানবশ্রেণী থেকে ভিন্ন কোন শ্রেণীর নন, কিন্তু তাঁর ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

মানবীয় শক্তি-সামর্থ্য দুই প্রকারের– ইলমী ও আমলী (বা জ্ঞানগতশক্তি ও কর্মগত শক্তি)। ইলমী শক্তির দিক দিয়ে নবী ও গায়র-নবীর মধ্যকার পার্থক্য, অন্ধ ও চক্ষুষ্মানের পার্থক্যের মত। নবীর অন্তর্চক্ষু সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও 'তাজাল্লী' দেখার জন্য উন্মুক্ত থাকে। অন্যান্য মানুষ তা সরাসরি দেখা থেকে বঞ্চিত। আর আমলী শক্তির দিক থেকে পার্থক্য এই যে, পয়গম্বর স্বীয় কথা ও কর্মে এবং প্রত্যেক আচরণে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও নির্দেশের পূর্ণ অনুগত ও বাধ্য হয়ে থাকেন। আসমানী ওহী ও আল্লাহর বিধানের খেলাফ কিছুতেই তিনি করেন না। তাঁর পবিত্র সত্তা, আখলাক ও আমল এবং গোটা জীবন আল্লাহর শিক্ষা ও সন্তুষ্টির উজ্জ্বল চিত্র হয়ে থাকে, যা দেখে চিন্তাশীল লোকদের জন্য তাঁর সত্যতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

[রুকূ - ৬]

৫১. আর আপনি এ (কুরআন) দ্বারা তাদের সতর্ক করে দিন যাদের এ ভয় আছে যে, তাদেরকে তাদের রবের সামনে এ অবস্থায় সমবেত করা হবে যে, তিনি ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারীও হবে না এবং কোন সুপারিশকারীও না[১]; (সতর্ক করুন) যাতে তারা বেঁচে থাকে[২]।

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ۝

৫২. আপনি তাদের দূরে সরিয়ে দেবেন না, যারা আপন রবকে সকাল-সন্ধ্যায় ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায়[৩]। তাদের হিসাবের কিছুই আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাবেরও কিছু তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদের দূরে সরিয়ে দেবেন। তা করলে আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন[৪]।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ۝

---

১. অর্থাৎ যারা ফরমায়েশী মুজেযা দেখা ছাড়া ঈমান আনবে না, তাদের উপেক্ষা করুন। কেননা (আপনার পক্ষ থেকে) তাবলীগের দায়িত্ব পালিত হয়েছে এবং তাদের সত্য পথ অবলম্বনের আশা আর নেই। এখন আল্লাহর ওহী বা কুরআনের দ্বারা বিশেষভাবে সেই লোকদের সতর্ক করুন, যাদের অন্তরে হাশরের ভয় এবং পরিণামের চিন্তা আছে। কেননা, এমন লোকেরাই নসীহত দ্বারা প্রভাবিত ও কুরআনী হেদায়েত দ্বারা উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়।

২. অর্থাৎ গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকে।

৩. অর্থাৎ তারা রাতদিন আল্লাহর এবাদতে নেক নিয়ত ও এখলাসের সাথে মশগুল থাকে।

৪. অর্থাৎ যখন তাদের বাহ্যিক অবস্থা এই যে, তারা রাতদিন আল্লাহর ইবাদত ও সন্তুষ্টি অর্জনে রত রয়েছে, অতএব এই গুণ অনুযায়ীই তাদের সঙ্গে ব্যবহার করুন। তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কী, বা শেষ পরিণতি কী হবে– এই হিসাব-নিকাশের পিছনে পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। আপনার হিসাব যেমন তাদের দায়িত্বে নয়, তাদের হিসাবও আপনার দায়িত্বে নয়। অতএব ধরে নেওয়া হোক, আপনি যদি ধনী লোকদের হেদায়েতের লোভে এই গরীব মুখলেস মুসলমানদের নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে শুরু করেন, তবে এ অবিচার হবে।

শানে-নুযূল

'মুযেহুল কুরআন'-এ আছে, 'কাফেরদের কতক প্রধান ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিল, 'আমাদের অন্তর আপনার কথা শুনতে চায়, কিন্তু আপনার কাছে

৫৩. আর এভাবেই আমি তাদের এক দলকে অপর দলের দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি, যাতে ওরা (অর্থাৎ প্রথম দল, দ্বিতীয় দল সম্পর্কে) বলে, 'আমাদের সকলের মধ্যে এদের প্রতিই কি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন?' আল্লাহ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে (ওদের চেয়ে) বেশি অবহিত নন[১]?

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ۭ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪. আমার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাসীরা যখন আপনার নিকট আসে, তখন আপনি বলে দিন, 'তোমাদের প্রতি সালাম, তোমাদের রব নিজের উপর মেহেরবানীকে আবশ্যকীয় করে নিয়েছেন– যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ নির্বুদ্ধিতাবশত মন্দ কাজ করে ফেলবে, এর পর সে তওবা করে নেবে এবং (নিজের) সংশোধন করবে, তো কথা এই যে, তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান।'

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥٤﴾

৫৫. এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত- ভাবে বর্ণনা করি, (যাতে সরল পথ স্পষ্ট হয়ে যায়) এবং যাতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে পাপীদের পথ[২]।

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٥﴾

ছোট লোকেরা বসে। আমরা তাদের সঙ্গে বসতে পারি না।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, বর্ণনা ৪১২৭; তাফসীরে তবারী ৯/২৫৯-২৬০) এতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী ব্যক্তিরা যদি গরীবও হয়, তাদের বিবেচনাই অগ্রগণ্য।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা গরীবদের দ্বারা ধনীদের এভাবে পরীক্ষা করেন যে, ধনীরা গরীবদের হেয় মনে করে এবং বিস্মিত হয়ে বলে, এরা আবার আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের যোগ্য নাকি? অথচ আল্লাহ তো গরীবদের অন্তরের অবস্থা জানেন যে, তারা আন্তরিকভাবেই তাঁর শোকরগোজার বান্দা। সুতরাং তারাই আল্লাহর অনুগ্রহের যোগ্য।

২. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

পূর্বে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বরদের আগমনের উদ্দেশ্য সুসংবাদদান ও সতর্কীকরণ। সে মত এই রুকূর শুরুতে وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الخ আয়াতে সতর্কীকরণের কথা বর্ণিত হয়েছিল। এখন মুমিনদের জন্য সুসংবাদ শোনানো হচ্ছে।

অর্থাৎ— মুমিনদের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা, রহমত ও মাগফেরাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন, যাতে এই গরীবরা উৎসাহিত হয় এবং ধনবান অহংকারীদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অপমানকর

[রুকূ - ৭]

৫৬. আপনি বলে দিন, 'আমাকে তো তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা ডাক'। আপনি বলুন, 'আমি তোমাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করি না। তা হলে নিশ্চয় আমি বিপথগামী হয়ে যাব এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না[১]।'

قُلْ اِنِّیْ نُهِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِیْنَ ۝

৫৭. আপনি বলে দিন, 'নিশ্চয় আমার নিকট রয়েছে আমার রবের পক্ষ থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ, অথচ তোমরা তা অস্বীকার করেছ[২]।

قُلْ اِنِّیْ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّیْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِیْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ

আচরণে তাদের মন ভেঙ্গে না যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন যে, এ জন্যই আমি আহকাম ও আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি। তাছাড়া উদ্দেশ্য এও যে, মুমিনদের বিপরীতে গোনাহগারদের পথও যেন পরিষ্কার হয়ে যায়।

বি. দ্র. এই যে এরশাদ হল, مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًۢا بِجَهَالَةٍ 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ নির্বুদ্ধিতাবশত মন্দ কাজ করবে'– এ দ্বারা সম্ভবত উদ্দেশ্য এই যে, মুমেন ব্যক্তি যে কোন গোনাহ করে, না জেনে হোক বা জেনে-শুনে হোক, সে প্রকৃতপ্রস্তাবে গোনাহর পরিণতি সম্পর্কে এক পর্যায়ের অসচেতন ও অসতর্ক হয়েই করে থাকে। যদি গোনাহর ধ্বংসকর ফলাফলের সম্যক ধারণা ও তার চিত্র মনে উপস্থিত থাকে, তবে কোনো মুমিন ব্যক্তি কি এরূপ কাজ করার দুঃসাহস করবে?

১. পূর্ববর্তী আয়াতে সেসব বিষয়ের বর্ণনা ছিল, যা মুমিনদেরকে বলা দরকার। বর্তমান আয়াতে এমন সব বিষয়ের আলোচনা রয়েছে, যা গোনাহগার ও যারা সত্যকে মিথ্যা বলে তাদের বলা প্রয়োজন। অর্থাৎ আপনি বলে দিন যে, আমার মন, আমার স্বভাব, আমার বুদ্ধি, আমার অন্তর্দৃষ্টি ও আমার প্রতি অবতারিত আল্লাহর ওহী– এ সব কিছুই আমাকে বাধা প্রদান করে– পরিপূর্ণ একত্ববাদের পথ থেকে বিন্দুমাত্র পদস্খলন থেকে। তোমরা যতই কৌশল ও তদবীর কর না কেন, আমি কখনই তোমাদের খুশী ও খাহেশের অনুসরণ করতে পারি না। অসম্ভব হলেও ধরা হোক, যদি পয়গম্বর কোন বিষয়ে আল্লাহর ওহী পরিত্যাগ করে সর্বসাধারণের অনুসরণ করতে শুরু করে, তবে আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শক বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন তিনিই স্বয়ং পথচ্যুত হয়ে গেলেন (আল্লাহর পানাহ!)।

২. অর্থাৎ আমার নিকট আল্লাহর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন সাক্ষ্য ও সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ এসে গেছে, যা মেনে নিতে আমি কিছুমাত্র অন্যথা করতে পারি না। কিন্তু তোমরা একে মিথ্যা বলছ। অতএব এর পরিণতি কী হবে, তা ভেবে দেখ।

بِهٖ ؕ اِنِ الۡحُکۡمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ یَقُصُّ الۡحَقَّ وَهُوَ خَیۡرُ الۡفٰصِلِیۡنَ ﴿۵۷﴾

যে জিনিস তোমরা সত্বর চাচ্ছ, তা আমার নিকট নেই[১]।' হুকুম* একমাত্র আল্লাহর। তিনি 'সত্য' বর্ণনা করেন এবং তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

قُلۡ لَّوۡ اَنَّ عِنۡدِیۡ مَا تَسۡتَعۡجِلُوۡنَ بِهٖ لَقُضِیَ الۡاَمۡرُ بَیۡنِیۡ وَ بَیۡنَکُمۡ ؕ وَاللّٰهُ اَعۡلَمُ بِالظّٰلِمِیۡنَ ﴿۵۸﴾

৫৮. আপনি বলুন, 'তোমরা যে জিনিস সত্বর চাচ্ছ তা যদি আমার কাছে থাকত, তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেত[২]। আর আল্লাহ জালেমদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

وَعِنۡدَهٗ مَفَاتِحُ الۡغَیۡبِ لَا یَعۡلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَیَعۡلَمُ مَا فِی الۡبَرِّ وَالۡبَحۡرِ ؕ وَمَا تَسۡقُطُ مِنۡ وَّرَقَۃٍ اِلَّا یَعۡلَمُهَا

৫৯. তাঁরই নিকট রয়েছে গায়বের (তথা অদৃশ্য বিষয়াদির) চাবিসমূহ। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। এবং তিনি জানেন- যা কিছু রয়েছে স্থলে ও জলে। আর এমন কোন

---

১. অর্থাৎ আল্লাহর শাস্তি। যেমন কাফেররা বলত–

اللّٰهُمَّ اِنۡ کَانَ هٰذَا هُوَ الۡحَقَّ مِنۡ عِنۡدِكَ فَاَمۡطِرۡ عَلَیۡنَا حِجَارَۃً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائۡتِنَا بِعَذَابٍ اَلِیۡمٍ ﴿۳۲﴾

অর্থ : (আয় আল্লাহ! আমরা যা অস্বীকার করছি তা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করুন অথবা আমাদের প্রতি অন্য কোন কঠোর শাস্তি পাঠিয়ে দিন– আনফাল : ৩২)

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আদেশ করার (ইখতিয়ার)'

২. অর্থাৎ যার উপর ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা এবং যে প্রকারের আযাব ইচ্ছা– তা পাঠানো অথবা না পাঠিয়ে তওবার তাওফীক দান করা– এ সবই আল্লাহর মুঠিতে রয়েছে। তিনি ছাড়া কারো হুকুম ও ক্ষমতা চলে না। তিনি দলীল ও প্রমাণসহ সত্য বর্ণনা করে দেন। অতঃপর যারা না মানবে, তাদের সম্পর্কে উত্তম ফয়সালাকারী তিনিই।

যদি এমন কাফেরদের বিষয়ে ফয়সালা করা বা ওদের শাস্তি দেওয়া আমার ক্ষমতাধীন হত এবং শাস্তি অবতরণের ব্যাপারে তাড়াহুড়াকারীরা আমার নিকট শাস্তি তলব করত, তবে এখন পর্যন্ত সকল বিবাদের চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত (অর্থাৎ আযাব অবতরণ করে ওদের সকলকে ধ্বংস করে দিতাম)। এ তো একমাত্র আল্লাহ তাআলার অসীম ধৈর্য, অনন্ত হেকমত যে, শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি অগণিত কল্যাণ ও হেকমত বিবেচনা করে জালেমদের উপর তৎক্ষণাৎ আযাব নাযিল করেন না।

পরবর্তী আয়াতসমূহে তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও পরিপূর্ণ শক্তির উল্লেখ রয়েছে, যাতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, তৎক্ষণাৎ শাস্তি না আসার কারণ অজ্ঞতা বা অক্ষমতা নয়।

وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

পাতা ঝরে না, যার সম্পর্কে তিনি জানেন না। এবং যমীনের অন্ধকারে এমন কোন দানা পতিত হয় না, না কোন আর্দ্র ও শুষ্ক বস্তু– যা এক সুস্পষ্ট কিতাবে নেই[১]।

وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ

৬০. আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি রাতে তোমাদের কব্জ করে নেন[২] এবং দিনে তোমরা যা কিছু করেছ, তা জানেন[৩]। অতঃপর তিনি তোমাদের দিনে জাগ্রত করে দেন, যাতে

---

১. অর্থাৎ সবই লওহে মাহফূজে রয়েছে। আর লওহে মাহফূজে কোন জিনিস থাকার অর্থই হল– পূর্বেই তা আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে। এই হিসাবে আয়াতের মর্ম এই দাঁড়াল যে, গায়ব (বা অদৃশ্য) ও দৃশ্য জগতের কোন শুষ্ক ও সিক্ত এবং ছোট-বড় কোন জিনিস আল্লাহ তাআলার অনাদি ও সর্বব্যাপী জ্ঞানের বহির্ভূত হতে পারে না। অতএব জালেমদের জাহেরী ও বাতেনী হাল-অবস্থা এবং ওদের শাস্তি প্রদানের সঠিক সময় ও স্থানের পুরাপুরি জ্ঞান তাঁর অবশ্যই রয়েছে।

مفاتح الغيب – এর ব্যাখ্যা

যে আলেমগণ مفاتح কে مَفْتَح (মীমে যবর) এর বহুবচন ধরেছেন, তাঁরা مفاتح الغيب এর তরজমা করেছেন, 'গায়বের ভাণ্ডারসমূহ'। আর যাঁদের মতে তা مِفْتَح (মীমে যের) এর বহুবচন, তাঁরা مفاتح الغيب এর তরজমা 'গায়বের চাবিসমূহ' করেন। –অর্থ এই যে, গায়বের ভাণ্ডারসমূহ এবং সেসবের চাবিসমূহ একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে, তিনিই সেসব থেকে যে কোন ভাণ্ডার যে কোন সময়, যে পরিমাণ ইচ্ছা– কারো জন্য খুলতে পারেন। কারো এই শক্তি নেই যে, স্বীয় ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা গায়বের জ্ঞান-ভাণ্ডার পর্যন্ত পৌঁছবে, অথবা যতটুকু গায়বের খবর তার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে, নিজ তরফ থেকে তার অধিক জানবে। কেননা, গায়ব বা অদৃশ্য জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি তার হাতে দেওয়া হয়নি। হতে পারে, কোন বান্দাকে বিপুল পরিমাণে গায়বের শাখা বিষয়সমূহ জানানো হয়েছে। কিন্তু مفاتح الغيب তথা গায়বের মৌলিক বিষয়সমূহ ও সামগ্রিক জ্ঞানকে আল্লাহ তাআলা নিজের জন্যই নির্ধারিত করে রেখেছেন।

২. রাতে ঘুমের সময় বাহ্যিক অনুভূতি ও বোধশক্তি অবশিষ্ট থাকে না। ঘুমন্ত ব্যক্তি নিজের আশপাশের বরং নিজ শরীরের অবস্থাদি সম্পর্কেও অসচেতন হয়ে পড়ে। বলতে গেলে, তখন এই শক্তিসমূহ তার থেকে নিয়ে নেওয়া হয়।

৩. অর্থাৎ দিনের বেলায় চলাফেরা, আচার-ব্যবহার ও কামাই-রোজগার– যা কিছু হয়ে থাকে তার বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহর জ্ঞানে আছে।

নির্ধারিত কাল পূর্ণ করা হয়[১]। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, আর তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যা কিছু তোমরা করতে[২]।

مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

[রুকূ - ৮]

৬১. তিনিই আপন বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনি তোমাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী (ফেরেশতাদের) প্রেরণ করেন[৩]। অবশেষে যখন তোমাদের কারো কাছে মৃত্যু এসে পড়ে, তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা[৪] তার (প্রাণ) কব্জ করে নেয় এবং তারা কোন ত্রুটি করে না[৫]।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾

৬২. অতঃপর তাদেরকে তাদের প্রকৃত মালিক আল্লাহর নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। শুনে রাখ, হুকুম তাঁরই এবং তিনি অতিদ্রুত হিসাবগ্রহণকারী[৬]।

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٦٢﴾

৬৩. আপনি বলুন, 'কে তোমাদেরকে স্থলের ও জলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে, যখন

قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ

---

১. অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের নিদ্রা চিরনিদ্রা হয়ে যেত। কিন্তু মৃত্যুর কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক নিদ্রার পর তিনি তোমাদের জাগ্রত করে থাকেন।

২. দিনের বেলায় কায়-কারবার করে রাতে নিদ্রায় যাওয়া, নিদ্রার পর আবার জাগ্রত হওয়া– এই দৈনন্দিন কার্যধারা, দুনিয়ার জীবনের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানেরই একটি ছোট নমুনা। এ জন্যই নিদ্রা ও জাগরণের আলোচনার সঙ্গে পুনরুত্থান সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

৩. অর্থাৎ সেই ফেরেশতাগণ, যাঁরা তোমাদের ও তোমাদের আমলসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন।

৪. অর্থাৎ যে ফেরেশতাগণ জান কবজ করার জন্য প্রেরিত হয়ে থাকেন।

৫. অর্থাৎ যখন ও যেভাবে জান বের করার হুকুম হয়, তাতে তাঁরা কোন রকমের ত্রুটি করেন না।

৬. অর্থাৎ তিনি এক মুহূর্তে মানুষের আজীবনের ভাল-মন্দের হিসাব গ্রহণ করতে পারেন।

وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾

তোমরা তাঁকে কাকুতি-মিনতি করে ও চুপে চুপে ডাক (আর বল), 'যদি এই বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব?'

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. আপনি বলে দিন, 'আল্লাহই তোমাদের তা থেকে এবং সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে উদ্ধার করেন, তার পরও তোমরা শির্ক কর[১]।'

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ۭ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. আপনি বলুন, 'তিনিই এতে সক্ষম যে, তোমাদের উপরে তোমাদের উর্ধ্বদেশ বা তলদেশ থেকে আযাব প্রেরণ করেন[২], অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেন এবং এক দলকে অন্য দলের লড়াইয়ের স্বাদ আস্বাদন করান[৩]।' দেখুন, কতভাবে আমি আয়াতগুলি বর্ণনা করি, যাতে তারা বোঝে[১]।

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার উল্লিখিত সর্বব্যাপী জ্ঞান ও পরিপূর্ণ শক্তি সত্ত্বেও তোমাদের বদ আমল ও দুষ্কৃতির শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে দেন না। বরং যখন বালা-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্টের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে তাঁকে কাকুতি-মিনতি করে ডাক এবং পাক্কা ওয়াদা কর যে, এই মুসিবত থেকে রেহাই পাওয়ার পর আর কখনো দুষ্কৃতি করবে না এবং সর্বদা তাঁর অনুগ্রহ স্মরণ রাখবে— তখন কখনো কখনো তিনি তোমাদের সাহায্য করেন এবং উক্ত ধ্বংসকর পরিস্থিতি ও সব রকমের দুঃখ-কষ্ট থেকে নাজাত দিয়ে দেন। কিন্তু তোমরা এর পরও নিজেদের ওয়াদার উপর কায়েম থাক না এবং মুসীবত থেকে মুক্ত হয়েই অবাধ্যতা শুরু করে দাও।

২. অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া অবকাশ ও মার্জনা দেখে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। তিনি যেমন দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে নাজাত দিতে পারেন, তেমনি তোমাদের উপর যে কোন ধরনের আযাব নাযিল করার শক্তিও তাঁর রয়েছে।

৩. এ আয়াতে তিন রকমের আযাব বর্ণিত হয়েছে– প্রথম, যা উপর থেকে আসে। যেমন, পাথর-বর্ষণ বা ঝড়ো বাতাস ও বৃষ্টি। দ্বিতীয়, যা পায়ের তলদেশ থেকে আসে। যেমন, ভূমিকম্প বা বন্যা ইত্যাদি। এ দুই প্রকার বহির্গত আযাব পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর পাঠানো হয়েছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো'য়ার বরকতে এ উম্মতকে এ ধরনের ব্যাপক আযাবে ধ্বংস করা থেকে নিরাপদ করা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মত এই উম্মতকে ধ্বংস করে দেয়– এমন আযাব নাযিল হবে না। খণ্ডিত ও বিশেষ ঘটনা

৬৬. আর আপনার সম্প্রদায় তাকে (অর্থাৎ সেই আযাবকে) অস্বীকার করেছে, অথচ তা সত্য। আপনি বলে দিন, 'আমি তোমাদের যিম্মাদার নই'।

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۭ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۞

৬৭. প্রত্যেক সংবাদের (সংঘটনের) নির্ধারিত সময় আছে এবং সত্বরই তোমরা জানতে পারবে[২]।

لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۡ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۞

৬৮. তুমি যখন তাদের দেখবে যারা আমার আয়াতসমূহ সম্পর্কে আজে-বাজে কথা বলে,* তখন ওদের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে, যে পর্যন্ত না ওরা অন্য কোন কথায় মশগুল হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ۭ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى

ঘটতে বাধা নেই। হাঁ, তৃতীয় রকমের আযাব, যাকে আভ্যন্তরীণ আযাব বলা উচিত, তা এই উম্মতের উপরও আসবে এবং তা হচ্ছে দলাদলি, নিজেদের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও পরস্পর রক্তপাতের আযাব।

'মূযেহুল কুরআনে' রয়েছে, কুরআন শরীফে প্রায়ই কাফেরদের উপর আযাব প্রেরণের ওয়াদা করা হয়েছে। এখানে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর আসমান থেকে বা যমীন থেকে আগত আযাবও যেমন আযাব, তেমনি মানুষদের পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত করা এবং একের দ্বারা অপরকে হত্যা বা বন্দী বা অপদস্থ করাও আযাব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ উম্মতের ক্ষেত্রে এই তৃতীয়টিই ঘটবে। অধিকাংশ স্থলে عذاب اليم ও عذاب شديد দ্বারা এসবকেই বোঝানো হয়েছে এবং যারা কাফের অবস্থায় মারা যাবে তাদের জন্য পরকালের আযাবকেও বোঝানো হয়েছে।

১. অর্থাৎ যাতে কুরআন বুঝে। অথবা অর্থ এই যে, যাতে বোঝে যে, আযাব আসতে পারে, এ মোটেই অসম্ভব নয়। ওরা মনে করত যে, এসব মিথ্যা ধমকিমাত্র, আযাব ইত্যাদি কিছুই আসে না।

২. অর্থাৎ আমার এই দায়িত্ব নয় যে, তোমরা আযাবকে অস্বীকার করার কারণে আমি নিজেই তা নাযিল করব; অথবা তার সময়, ধরন ইত্যাদির বিবরণ বলে দেব। আমার কর্তব্য শুধু সতর্ক ও সাবধান করে দেওয়া। বাকী আল্লাহর ইলমে প্রত্যেক বস্তু সংঘটিত হওয়ার একটি সময় নির্ধারিত আছে। যখন সময় এসে যাবে, তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে যে, আমি যে জিনিস সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করতাম তা কতটুকু সত্য।

★ **দ্বিতীয় তরজমা– 'আমার আয়াতগুলিকে অস্বীকার ও উপহাস করে ...'**

مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ۝

ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে আর বসো না[১]।

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ۝

৬৯. ওদের (অর্থাৎ বিতর্ককারীদের) হিসাবের কোন কিছু পরহেযগারদের দায়িত্বে নয়। তবে (তাঁদের দায়িত্ব) নসীহত করা[২], যাতে ওরা ভয় করে।

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ

৭০. আপনি তাদের পরিত্যাগ করুন যারা নিজেদের দীনকে খেল-তামাশা বানিয়ে রেখেছে[৩] এবং পার্থিব জীবন তাদের ধোঁকা দিয়েছে[৪]। আর কুরআনের দ্বারা (ওদের) নসীহত করুন, যাতে কোন ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের ফলে এভাবে ধৃত

---

১. অর্থাৎ যারা আল্লাহ তাআলার আয়াতের সমালোচনা ও বিদ্রূপ করে এবং অযথা ছিদ্রান্বেষণে লিপ্ত হয়ে নিজেদের শাস্তির যোগ্য বানাচ্ছে, তাদের সাথে তোমরা ওঠা-বসা করো না। হয়ত তোমরাও ওদের দলভুক্ত হয়ে শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে। যেমন: অন্যত্র এরশাদ হয়েছে إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ (তা হলে তোমরাও ওদের মত হয়ে যাবে। -নিসা, আয়াত ১৪০)

একজন মুমিনের দীনী গাইরতের দাবি এই যে, সে এহেন বৈঠকের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রদর্শন করবে এবং কখনো ভুলে তাতে শরীক হয়ে গেলে স্মরণ হওয়ামাত্র সরে পড়বে। এতেই নিজ পরিণামের কল্যাণ, দীনের নিরাপত্তা এবং সমালোচনা ও বিদ্রূপকারীদের জন্য বাস্তব নসীহত ও সতর্কতা নিহিত।

২. এ আয়াতের দুই অর্থ হতে পারে। (১) যদি পরহেজগার লোকেরা বিদ্রূপকারী ও দুর্নাম রটনাকারীদের বৈঠক থেকে উঠে চলে আসে, তবে এদের গোমরাহীতে পড়ে থাকার কোন ক্ষতি বা দায়িত্ব মুত্তাকীদের উপর বর্তাবে না। হাঁ, সামর্থ্য অনুযায়ী ও সুযোগ মত নসীহত করার দায়িত্ব তাদের রয়েছে। হতে পারে, সেই বদবখতরা নসীহত শুনে নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়বে। (২) অথবা অর্থ এই যে, পরহেজগার লোকদের যদি কোন দীনী বা সংগত পার্থিব প্রয়োজনে এমন বৈঠকে যোগদান করতেই হয়, তবে তাদের কাঁধে সমালোচকদের গোনাহ ও হিসাবের কোন অংশ চাপানো হবে না। হাঁ, সামর্থ্য সাপেক্ষে নসীহত করার দায়িত্ব তাদের রয়েছে। কোন সময় ওদের উপর নসীহতের সুফল হতেও পারে।

৩. অর্থাৎ নিজেদের সেই ধর্মকে, যা গ্রহণ করা ওদের উপর ফরয ছিল। আর তা হচ্ছে ইসলাম ধর্ম।

৪. অর্থাৎ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মেতে পরকালকে ভুলে গেছে।

لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۟

না হয়ে যায়* যে, আল্লাহ ছাড়া ওর জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না[১] এবং কোন সুপারিশকারীও না। আর সে যদি সকল বিনিময়ও প্রদান করে, তবুও তার থেকে তা গৃহীত হবে না। এরাই তারা, যারা নিজেদের কৃতকর্মের ফলে ধৃত হয়েছে*। তাদের জন্য রয়েছে পান করার ফুটন্ত পানি ও যাতনাদায়ক শাস্তি। কারণ, তারা কুফর করত[২]।

[রুকূ - ৯]

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۖ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى

৭১. আপনি বলে দিন, 'আমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ডাকব যারা আমাদের উপকারও করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না? আর আল্লাহ আমাদের সরল পথ দেখানোর পরও কি আমরা আমাদের পিছনের দিকে যাব– সেই ব্যক্তির ন্যায়, যাকে জিনেরা বিরান ভূমিতে এমনভাবে পথ ভুলিয়ে দিয়েছে যে, সে দিশাহারা?* তার

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ধ্বংসের সম্মুখীন না হয় ...'

১. অর্থাৎ যারা মিথ্যা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে ধৃত হয়ে যাবে, তাদের কোন সাহায্যকারী হবে না, যে সাহায্য করে জোরপূর্বক আল্লাহ তাআলার আযাব থেকে ছাড়িয়ে নেবে। আর না কোন সুপারিশকারী হবে, যে চেষ্টা ও সুপারিশ দ্বারা কার্য সম্পাদন করবে। আর না কোন প্রকারের মুক্তিপণ ও বিনিময় গৃহীত হবে। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, একজন পাপী দুনিয়াভর্তি বিনিময় দিয়ে মুক্ত হতে চায়, তবুও মুক্ত হতে পারবে না।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে'।

২. পূর্ববর্তী আয়াতে সেই মজলিস থেকে সরে থাকার বিশেষ নির্দেশ ছিল, যেখানে আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ সম্পর্কে সমালোচনা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও মিথ্যা বাদানুবাদ করা হয়। বর্তমান আয়াতে এহেন লোকদের সাথে সর্বপ্রকার ওঠা-বসা ও সংস্পর্শ বর্জন করার নির্দেশ রয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আদেশ হচ্ছে, ওদের নসীহত করে যাও, যাতে ওরা নিজেদের কৃতকর্মের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যায়।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যাকে দুষ্ট জিনেরা ধোঁকা দিয়ে বিরান ভূমিতে নিয়ে গেছে যে, সে দিশাহারা'।

الْهُدَى ائْتِنَا ۭ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۭ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

সঙ্গী-সাথী আছে, যারা তাকে এই বলে পথের দিকে ডাকছে যে, 'আমাদের কাছে চলে আস[১]।' আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ-প্রদর্শিত পথই সরল পথ[২]। আর আমাদের আদেশ করা হয়েছে, আমরা যেন সমগ্র বিশ্বের রবের অনুগত থাকি।

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ۭ وَهُوَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

৭২. 'এবং এই (আদেশ করা হয়েছে) যে, নামায কায়েম কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর তিনিই সেই সত্তা, যাঁর নিকট তোমাদের সমবেত করা হবে'।

---

১. অর্থাৎ মুসলমানের শান এই যে, সে পথভ্রষ্টদের নসীহত করে সরল পথে আনবে এবং যারা খোদাবিমুখ হয়ে গাইরুল্লাহর সামনে মাথা নত করে রয়েছে, তাদেরকে আল্লাহর সামনে সেজদাবনত করার চিন্তা-ভাবনা করবে। মুসলমান থেকে এ আশা বৃথা যে, সে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন সত্তার সামনে মাথা নত করবে যার হাতে লাভও নেই, ক্ষতিও নেই; অথবা বাতিলপন্থীদের দলে ভিড়ে তাওহীদ ও ঈমানের উজ্জ্বল পথ পরিত্যাগ করবে এবং শিরকের কুটিল রাস্তার দিকে ফিরে যাবে।

এমন হলে তার উদাহরণ সেই মুসাফিরের ন্যায় হবে, যে এমন সাথীদের সঙ্গে সফর করছিল যারা পথ চেনে। এমন সময় হঠাৎ জনশূন্য প্রান্তরের দুষ্ট জিনেরা তাকে বিভ্রান্ত করে পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। আর সে চতুর্দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরাফেরা করছে এবং তার সাথীরা তার হিতার্থে তাকে ডেকে বলছে, 'এদিকে আস, রাস্তা এদিকে'। কিন্তু সে হয়রান ও দিশাহারা বা জ্ঞানহারা হয়ে কিছু বুঝছেও না, এদিকে আসছেও না।

তদ্রূপ বুঝে নাও, আখেরাতের মুসাফিরের জন্য সরল পথ হচ্ছে ইসলাম ও তাওহীদ। আর যাদের সংসর্গে এ সফর হচ্ছে, তারা হচ্ছেন পয়গম্বর ও তাঁর অনুসারীগণ। যখন হতভাগা (অর্থাৎ ইসলাম পরিত্যাগকারী) ব্যক্তি শয়তানদের ও পথভ্রষ্টকারীদের ফাঁদে পড়ে গোমরাহীর প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়, তখন ওর পথপ্রদর্শক ও সাথীরা সহানুভূতিস্বরূপ সত্য-পথের দিকে ডাকে। কিন্তু সে কিছু শুনেও না, বুঝেও না। অতএব হে দুষ্কর্মকারীদের দল! তোমাদের কি এই মতলব যে, মুমিনরা নিজেদের এহেন দৃষ্টান্তে পরিণত করুক!

এ আয়াত সেই মুশরিকদের জওয়াবে অবতীর্ণ হয়, যারা মুসলমানদেরকে ইসলাম বর্জনের প্রস্তাব করেছিল।

২. অতএব আমাদের থেকে এই আশা করো না যে, এ পথ ছেড়ে আমরা শয়তানের বাতানো পথের অনুসরণ করব।

৭৩. এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং যেদিন তিনি বলবেন, 'হও'[১], তৎক্ষণাৎ হয়ে যাবে। তাঁর কথা সত্য। আর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, সেদিন (সকল) রাজত্ব হবে তাঁরই[২]। (তিনি) অদৃশ্য ও দৃশ্য (সব কিছুর) পরিজ্ঞাতা; এবং তিনিই প্রজ্ঞাবান, সবিশেষ অবহিত[৩]।

وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَیَوْمَ یَقُوْلُ كُنْ فَیَكُوْنُ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَلَهُ الْمُلْكُ یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ ۝

৭৪. (স্মরণ কর), যখন ইবরাহীম স্বীয় পিতা আযরকে[৪] বললেন[৫], 'আপনি কি মূর্তিগুলিকে মাবুদ বানাচ্ছেন? আমি তো আপনাকে ও

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِیْمُ لِاَبِیْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّیْۤ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ

---

১. অর্থাৎ হাশর হয়ে যা।

২. অর্থাৎ সেদিন জাহেরী ও রূপকভাবেও আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারো রাজত্ব থাকবে না। لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ {('সেদিন জিজ্ঞাসা করা হবে,) কার রাজত্ব আজ? এক পরাক্রমশালী আল্লাহরই।'}

৩. ৭২-৭৩ নং আয়াতে বর্ণিত গুণাবলির অধিকারী যেই আল্লাহ তাআলা, তিনিই এর যোগ্য যে, আমরা তাঁর আদেশের অনুগত হই, তাঁর সম্মুখে চরম দাসত্ব অবলম্বন করি এবং প্রতি মুহূর্তে তাঁকে ভয় করে চলি। এরই হুকুম আমাদের করা হয়েছে। আমরা কোন অবস্থাতেই এ থেকে মুখ ফেরাতে পারি না।

৪. কুলজি বিশারদগণ হযরত ইবরাহীম (আ)এর পিতার নাম 'তারাখ' লিখেছেন। সম্ভবত তারাখ তার নাম এবং 'আযর' তার উপাধি। প্রখ্যাত তাফসীরকার ইবনে কাছীর হযরত মুজাহিদ প্রমুখ থেকে নকল করেছেন, 'আযর' মূর্তির নাম ছিল। হয়ত সেই মূর্তির খেদমতে বেশি থাকার কারণে তার উপাধি 'আযর' হয়ে যায়।

৫. পূর্বের আয়াতগুলিতে তাওহীদের তাকীদ ও শিরকের খণ্ডন করা হয়েছে এবং মুসলমানদের ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়ে মুশরিকদের আশাহত করা হয়েছে। বর্তমান আয়াতে একত্ববাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস্সালামের ঘটনা বর্ণনা করে তারই তাকীদ উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গত মুসলমানদের এও বোঝানো উদ্দেশ্য যে, সত্যকে অস্বীকারকারী ও তার বিরুদ্ধাচরণকারীদের কীভাবে নসীহত ও হেদায়েত করা চাই, কীভাবে ওদের থেকে আলাদা হওয়া ও ওদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা উচিত এবং কীভাবে একজন অনুগত মুমিনকে একমাত্র আল্লাহরই উপর ভরসা রাখা, তাঁকেই ভয় করা এবং তাঁরই আজ্ঞাবহ হয়ে থাকা চাই।

فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ۝

আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট গোমরাহীতে দেখছি[১]!

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ۝

৭৫. আর এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বিস্ময়কর বিষয়াবলী দেখিয়েছি, (যাতে তিনি আল্লাহর মাহাত্ম্যের নিদর্শনাদি অবলোকন করেন) এবং যাতে তিনি পূর্ণ বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান[২]।

---

১. এর চেয়ে স্পষ্ট ও পরিষ্কার গোমরাহী আর কী হবে যে, সর্বাধিক সম্মানিত সৃষ্টি মানুষ নিজ হাতের তৈরী পাথরকে খোদার মর্যাদা দিয়ে তার সামনে সেজদাবনত হয়ে যায় এবং তারই নিকট নিজ কামনা-বাসনা পূরণের জন্য প্রার্থনা শুরু করে দেয়।

২. অর্থাৎ যেভাবে আমি মূর্তিপূজার কদর্যতা ও ঘৃণ্যতা ইবরাহীমের সামনে প্রকাশ করে তাঁর জাতিকে লা-জওয়াব করেছিলাম, সেভাবেই উর্ধ্বজগত ও নিম্নজগতের অত্যন্ত পরিপক্ক, বিস্ময়কর ও অতি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করলাম, যাতে তা দেখে তিনি খোদা তাআলার অস্তিত্ব, একত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে এবং আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিসমূহের অধীনতাসুলভ অক্ষমতা ও দুর্বলতা সম্বন্ধে প্রমাণ পেশ করতে পারেন এবং স্বজাতির নক্ষত্রপূজা ও পৌত্তলিকতার আকীদা-বিশ্বাসকে পরিপূর্ণভাবে ও পারদর্শিতার সাথে খণ্ডন করতে পারেন এবং নিজেও দৃঢ় প্রত্যয়ের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারেন।

নিঃসন্দেহে বিশ্বজগতের এ পরিপূর্ণ ও পরিপক্ক এবং উত্তম ব্যবস্থাপনাই এমন জিনিস, যা দেখে স্বতঃই স্বীকার করতে হয় যে, এই আজিমুশ শান মেশিনের স্রষ্টা ও চালক, এর সুসমঞ্জস, সুব্যবস্থিত ও সুনিপুণভাবে স্থাপিত যন্ত্রাংশসমূহের সংযোজক এবং হাজারো-লাখো বছর ধরে একই নিয়মে যিনি এর সংরক্ষণ করে চলেছেন– তিনি অতি মহান বিজ্ঞ ও শক্তিশালী শিল্পী; যার হেকমতপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন, শক্তি ও কর্তৃত্বের বাইরে যেতে পারে না মেশিনের ছোটবড় কোন অংশই। আর এ কাজ এমনি এমনি ও ঘটনাচক্রে অথবা অচেতন প্রকৃতি বা অন্ধ জড়পদার্থ থেকে উৎসারিত হতে পারে না।

ইউরোপের প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক নিউটন বলেন, নক্ষত্রমালার (ও গ্রহরাজির) বর্তমান গতিপ্রক্রিয়া শুধু সাধারণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফল হওয়া সম্ভব নয়। এ আকর্ষণশক্তি তো নক্ষত্রমালাকে সূর্যের দিকে ধাক্কা দেয় বা টেনে নেয়। সে জন্য সূর্যের চতুর্দিকে নক্ষত্ররাজিকে গতিবান করার জন্য কোন খোদায়ী হাতের প্রয়োজন, যা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাধারণ আকর্ষণ সত্ত্বেও এদের নিজ নিজ কক্ষপথে স্থির (বা ধরে) রাখতে পারে। এমন কোনো প্রাকৃতিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, যা সমগ্র নক্ষত্রকে মহাশূন্যে দৃঢ়বন্ধনে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে, যার ফলে এরা সূর্যের চারদিকে ঘুরার সময় সর্বদা নির্দিষ্ট কক্ষসমূহে এবং ঠিক একই দিকে চলতে থাকে এবং তাতে কোন ব্যতিক্রম হয় না। তদুপরি নক্ষত্ররাজির (সৌর গ্রহরাজির) গতিবিধি ও

গতিবেগের বিভিন্নতায় তাদের ও সূর্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব রক্ষা করে যে সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য ও গভীর ভারসাম্য স্থাপন করা হয়েছে, এমন কোন প্রাকৃতিক কারণ নেই যা দিয়ে আমরা এ সুশৃঙ্খল ও সুরক্ষিত রহস্যের ব্যাখ্যা করতে পারি।

অগত্যা স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয় যে, এ সমগ্র ব্যবস্থাপনা এমন এক মহা বিজ্ঞানময় ও সর্বজ্ঞ সত্তার নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে, যিনি আকাশ-মণ্ডলের বস্তু-সামগ্রী অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্ররাজির উপাদান এবং এদের পরিমাণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। তিনি জানেন, কোন উপাদানে কী পরিমাণ থেকে কতটুকু আকর্ষণ শক্তি উৎপন্ন হবে। তিনিই স্বীয় পরিমাপ দ্বারা নক্ষত্ররাজি ও সূর্যের মধ্যে বিভিন্ন দূরত্ব ও গতির বিভিন্ন স্তর স্থির করেছেন, যেন পরস্পরে একের সঙ্গে অন্যের সংঘর্ষ না হয় এবং বিশ্বজগত ধ্বংস না হয়ে যায়। প্রত্যেকটি ছোট-বড় তারকা অত্যন্ত মজবুত ব্যবস্থাপনার অধীনে নির্ধারিত সময়ে উদয় ও অস্ত যায়। যখন কোন তারকা অস্তমিত হয়ে দুনিয়াকে তার সেই উপকার ও প্রতিক্রিয়া থেকে বঞ্চিত করে, যা তার উদয়ের সময় বর্তমান ছিল, তখন তার বা অন্য কোন সৃষ্টির এ শক্তি বা সাধ্য নেই যে, তাকে এক মুহূর্তের জন্য ফিরিয়ে নিয়ে আসে অথবা অস্ত যেতে বাধা দিয়ে রাখে। এ একমাত্র বিশ্বপ্রভুরই কুদরত যে, তিনি কোন সময়েই কোন প্রকার উপকার সাধনে অক্ষম নন।

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ، لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ .

অর্থ : সূর্য ভ্রমণ করছে তার নির্ধারিত পথে। এ নির্ধারণ করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ সত্তা। আর চাঁদের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনজিল, অবশেষে তা খেজুর গাছের পুরাতন ডালের ন্যায় হয়ে যায়। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া, আর রাতও দিনকে অতিক্রম করতে পারে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। [সূরা য়া-সীন, রুকু ৩]

এ হচ্ছে উর্ধ্বজগতের অবস্থা। এ থেকে অধঃজগতের অবস্থা বুঝে নিন।

সৃষ্টিজগত বা আকাশ ও পৃথিবী রাজ্যের এ মহাবিস্ময় দেখেই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়েছিল : لَا أُحِبُّ الْآفِلِيْنَ ('আমি অস্তগামীদের পছন্দ করি না।') এবং إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ الخ ('আমি একনিষ্ঠ হয়ে আমার মুখ তাঁরই দিকে ফিরিয়ে নিলাম, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন।') পরবর্তী আয়াতে এরই উল্লেখ আছে এবং فلمّا جنّ এর ف অব্যয় দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

[উপরোক্ত ব্যাখ্যা সম্পর্কে অনুবাদকের বন্ধু এক পদার্থ বিজ্ঞানীর পাদটীকা :]

সারা বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে বিচিত্র, অলৌকিক ও অনন্যসাধারণ বৈজ্ঞানিক নীতিমালার মাধ্যমে, বিশ্বচরাচরে বিচরণশীল অগণিত জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি করে তাদের যার

যার সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত অবস্থায় মহাশূন্যে সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপন করেছেন, তা মানব-মস্তিষ্কের সকল মেধা-শক্তিকে অবলীলাক্রমে হার মানিয়ে তাকে মহাপ্রভুর সমীপে অনতিবিলম্বে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ ও আত্মবিলুপ্ত করতে বাধ্য করে।

আমাদের এ পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ, যা সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহের সাথে মহাশূন্যে সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে অবিরত সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক সৃষ্ট মহাশূন্যে উড্ডীয়মান অতিকায় বিশাল বিশাল নক্ষত্রের তুলনায় সূর্য একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র। সূর্যের তুলনায় তাকে প্রদক্ষিণরত গ্রহসমূহ অনেক ক্ষুদ্র। বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের করুণায় বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইজাক নিউটন কর্তৃক প্রতিপাদিত ও প্রকাশিত গতি সূত্রসমূহের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রদ্বয় থেকে প্রাপ্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী, একটি বৃহত্তর বস্তুকে (এক্ষেত্রে সূর্যকে) কেন্দ্র করে তার চতুর্দিকে একটি ক্ষুদ্রতর বস্তুর সুসমন্বিত কার্যকারণ গ্রহরাজিকে কক্ষপথে থাকতে বাধ্য করে, তারা হল 'সেন্ট্রি-পিটাল' শক্তি (ঘূর্ণায়মান বস্তুকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে) ও 'সেন্ট্রি-ফিউগাল' শক্তি (ঘূর্ণায়মান বস্তুকে কেন্দ্রের বিপরীত দিকে ঠেলে দেয়)। এ দুটি শক্তি উৎপত্তির মৌলিক শর্ত হল বস্তুটি একটি কেন্দ্রের চতুর্দিকে অবিরত ঘূর্ণায়মান থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, যদি কোন কারণে ঘূর্ণায়মান গতিটি লোপ পায়, তাহলে সে মুহূর্তেই 'সেন্ট্রি-পিটাল' শক্তি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গেই 'সেন্ট্রি-ফিউগাল' শক্তি বিলুপ্ত হবে। এ অবস্থায়, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব অনুযায়ী উক্ত জ্যোতিষ্কটি গতি হারিয়ে কক্ষপথের কেন্দ্রস্থিত বৃহত্তর জ্যোতিষ্কটির উপর এসে লুটিয়ে পড়বে।

উপরোল্লিখিত যুক্তি অনুযায়ী প্রতিটি জ্যোতিষ্ককে মহাশূন্যে স্বীয় অবস্থানে টিকে থাকতে হলে তাকে অন্য কোন বৃহত্তর জ্যোতিষ্কের চতুর্দিকে একটি নির্দিষ্ট গতিতে ও কক্ষপথে অবিরত ঘুরতে থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেককে কোন একটি বৃহত্তর জ্যোতিষ্ককে প্রদক্ষিণ করতে থাকতে হবে।

সৌরমণ্ডলে গ্রহরাজি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার মাধ্যমে মহাশূন্যে টিকে আছে। আর সূর্যকে মহাশূন্যের দিকে থাকার জন্য তার সমস্ত সৌরমণ্ডল নিয়ে অন্য একটি বৃহত্তর জ্যোতিষ্কের চতুর্দিকে নির্দিষ্ট গতিতে ও কক্ষপথে সেই বৃহত্তর-জ্যোতিষ্ককে প্রদক্ষিণ করতে থাকতে হবে। আবার বৃহত্তর জ্যোতিষ্কটিকে মহাশূন্যে টিকে থাকার জন্য তার সমস্ত মণ্ডল ও পরিমণ্ডল নিয়ে অন্য একটি আরো বৃহত্তর জ্যোতিষ্কের চতুর্দিকে নির্দিষ্ট গতিতে ও কক্ষপথে সেই জ্যোতিষ্ককে প্রদক্ষিণ করতে থাকতে হবে। এমনি করে প্রমাণিত হয় যে, মহাশূন্যে স্বীয় অবস্থানে টিকে থাকার জন্য অগণিত জ্যোতিষ্করাজির প্রত্যেকটিকে স্বীয় মণ্ডল ও পরিমণ্ডল (তা যত বিশাল বা বড়ই হোক না কেন) নিয়ে অপর একটি তার চেয়ে বড় জ্যোতিষ্ককে অবিরত প্রদক্ষিণ করতে থাকতে হবে। অর্থাৎ মহাশূন্যে কোন জ্যোতিষ্কই স্থির নেই, প্রত্যেকেই কেন্দ্রে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত একটি বৃহত্তর জ্যোতিষ্কের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত অবস্থায় রয়েছে। এ হল এ যাবত কাল অবধি প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক সূত্র ও যুক্তির ভিত্তিতে মহাশূন্যে উড্ডীয়মান অগণিত জ্যোতিষ্করাজির সুশৃঙ্খল অবস্থান, আচরণ, গতিবিধি ও ব্যবস্থাপনার ব্যাখ্যা।

এস্থলে উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ করতে এর ব্যাখ্যাকারী ও সম্পাদক পদার্থ বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুল আউয়াল বলেন, বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, 'বৃহত্তর জ্যোতিষ্কের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত' অবস্থার যুক্তিটির প্রয়োগক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে বাড়াতে বাড়াতে মহাশূন্যে অস্তিত্বমান সমস্ত জ্যোতিষ্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা শেষ হয়ে গেলেও প্রক্রিয়াটি কিন্তু শেষ হচ্ছে না এবং ব্যাখ্যাটি

৭৬. তো, যখন রাত তাঁকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করল, তিনি একটি নক্ষত্র দেখতে পেলেন। বললেন, 'এ আমার রব'। তার পর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তিনি বললেন, 'যারা অস্তমিত হয়ে যায়, আমি তাদের পছন্দ করি না'[১]।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَا كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ۝

৭৭. অতঃপর যখন তিনি চন্দ্রকে সমুজ্জ্বলরূপে দেখলেন, তখন বললেন, 'এ আমার

فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ

অসম্পূর্ণই থেকে যাচ্ছে। কারণ প্রত্যেকেই প্রদক্ষিণরত থাকার প্রক্রিয়াটি শেষ ও সম্পূর্ণ করতে হলে সর্বশেষে অবশ্যই একটি 'সব চেয়ে বড় স্থির-বস্তু' থাকতে হবে, যার চতুর্দিকে সার্বিকভাবে 'সমস্ত জ্যোতিষ্ক মণ্ডল ও পরিমণ্ডল'-কে প্রদক্ষিণ করতে থাকতে হবে। উক্ত 'সব চেয়ে বড় স্থির-বস্তু'টি কী তার উত্তর বিজ্ঞান আজও দিতে পারেনি। এই উত্তরটিই আমি দিচ্ছি।

উক্ত 'সর্বাপেক্ষা বৃহৎ স্থির-বস্তু'টি হল রাব্বুল আলামীনের 'আরশে আযীম', যা আল্লাহ তাআলার কুদরতী মহিমায় মহাশূন্যে স্থির অবস্থায় রয়েছে, যার চতুর্দিকে সমস্ত সৃষ্টি অবিরত প্রদক্ষিণরত (তওয়াফরত) অবস্থায় রয়েছে এবং অনন্তকাল ধরে এই তওয়াফ চলতেই থাকবে। মহামহিম রাব্বুল আলামীনের 'মহান আরশ' এর চতুর্দিকে তওয়াফ করতে করতে সমস্ত সৃষ্টজীব ও পদার্থ সার্বিক ও সামগ্রিকভাবে প্রতিনিয়ত মহাপ্রভুর মহিমা ঘোষণা করে চলেছে। يسبح لله مافي السموات والارض (আসমানসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তার সবই আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করছে।) سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

[পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুল আউয়াল।]

---

১. অর্থাৎ তাদের স্বীয় রব বানাতে পছন্দ করি না। কোন অক্ষম বন্দী ও ভৃত্যকে কেউ সম্রাটের সিংহাসনে বসাতে পছন্দ করতে পারে কি?

তবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উক্তি- هذا ربي – এটা হয় অস্বীকারজনিত জিজ্ঞাসার সুরে বলে থাকবেন, অর্থাৎ 'এই কি আমার রব?' অথবা কাফেরদের আকিদা-বিশ্বাসের অসারতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এটা বলে থাকবেন, অর্থাৎ 'তোমাদের বিশ্বাস ও কল্পনা অনুযায়ী এ হল আমার রব'!! যেমন, মূসা আলাইহিস সালাম বলেছেন-

وَانْظُرْ إِلٰى إِلٰـهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا أَيْ عَلٰى زَعْمِكَ

{'আর দেখ তোমার উপাস্যকে, (অর্থাৎ তোমার ধারণা অনুযায়ী), যার কাছে তুমি সারা দিন স্থির বসে থাকতে,'।}

এতদ্ব্যতীত তফসীরকারগণের আরো ব্যাখ্যা রয়েছে। তবে আমাদের মতে এ-ই উত্তম। আল্লাহই ভাল জানেন।

فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنۡ لَّمۡ یَهۡدِنِیۡ رَبِّیۡ لَاَکُوۡنَنَّ مِنَ الۡقَوۡمِ الضَّآلِّیۡنَ ﴿۷۷﴾

রব'। তার পর যখন তাও অদৃশ্য হয়ে গেল, তিনি বললেন, 'যদি আমার রব আমাকে হেদায়াত দান না করেন, তবে নিশ্চয় আমি পথভ্রষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব'[১]।

فَلَمَّا رَاَ الشَّمۡسَ بَازِغَۃً قَالَ هٰذَا رَبِّیۡ هٰذَاۤ اَکۡبَرُ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَتۡ قَالَ یٰقَوۡمِ اِنِّیۡ بَرِیۡٓءٌ مِّمَّا تُشۡرِکُوۡنَ ﴿۷۸﴾

৭৮. অতঃপর যখন তিনি সূর্যকে সমুজ্জ্বলরূপে দেখলেন, তখন বললেন, 'এ আমার রব, এ সবচেয়ে বড়'[২]। তার পর যখন তাও অদৃশ্য হয়ে গেল, তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাদের শরীক কর, ওদের থেকে আমি সম্পর্কহীন[৩]।

اِنِّیۡ وَجَّهۡتُ وَجۡهِیَ لِلَّذِیۡ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ حَنِیۡفًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ ﴿۷۹﴾

৭৯. 'আমি তো একনিষ্ঠ হয়ে স্বীয় মুখ তাঁরই অভিমুখী করলাম, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই'[৪]।

وَحَآجَّهٗ قَوۡمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوۡٓنِّیۡ فِی اللّٰهِ وَقَدۡ هَدٰىنِ ؕ وَلَاۤ اَخَافُ مَا تُشۡرِکُوۡنَ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ یَّشَآءَ

৮০. তাঁর সম্প্রদায় তাঁর সঙ্গে বিতর্ক করল। তিনি বললেন, 'তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিতর্ক কর? অথচ তিনি আমাকে হেদায়াত দান করেছেন[৫]। আর আমি তাদের

---

১. যেহেতু চন্দ্র খুবই সুন্দর ও সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, তাই আল্লাহ তাআলা সাহায্য না করলে (এবং হেদায়েত না দিলে) নিশ্চয় মানুষ এরই সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে থাকবে।

২. অর্থাৎ পৃথিবী থেকে আকাশরাজ্যে দৃশ্যমান এটাই সবচেয়ে বড় ও উপকারী জ্যোতিষ্ক। সম্ভবত সৌরমণ্ডলের কোন কিছুই সূর্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপকার থেকে অমুখাপেক্ষী নয়।

৩. এরা সবাই তো খোদার স্পষ্ট চাকর-বাকর, যারা নির্দিষ্ট সময়ে আসে ও চলে যায়, এক মিনিট আগে-পরে করতে সমর্থ নয়। এর পরও আল্লাহর সাথে এদের শরীক করা কী পরিমাণ ধৃষ্টতা ও ঘৃণার কাজ!

৪. অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি থেকে পৃথক হয়ে একমাত্র মহান স্রষ্টার অভিমুখী হয়েছি এবং তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করেছি, যাঁর ক্ষমতা ও আয়ত্তাধীনে রয়েছে ঊর্ধ্বজগৎ ও নিম্নজগতের সব কিছু।

৫. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর বিস্ময়বলী নিরীক্ষণ করিয়েছেন, তার থেকে কি এই আশা কর যে, তিনি তোমাদের অনর্থক ও অযথা বিতর্কের ফলে বিভ্রান্ত হয়ে যাবেন? কখনই নয়।

رَبِّيْ شَيْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۸۰﴾

ভয় করি না, তোমরা যাদের তাঁর শরীক সাব্যস্ত কর। তবে আমার রবই (কোন কষ্ট দিতে) চাইলে (ভিন্ন কথা)। আমার রবের জ্ঞান সকল বস্তুকে বেষ্টন করে রেখেছে। তোমরা কি চিন্তা কর না[১]?

وَكَيْفَ اَخَافُ مَاۤ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۱﴾

৮১. 'আর আমি কীভাবে তোমাদের শরীকদের ভয় করতে পারি? অথচ তোমরা এটাকে ভয় কর না যে, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর শরীক কর যাদের (শরীক হওয়ার) ব্যাপারে তিনি তোমাদের প্রতি কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি[২]। অতএব দু'দলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপত্তার বেশি হকদার? (বল), যদি তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখ।'

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْۤا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۸۲﴾

৮২. যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিজেদের বিশ্বাসে কোনো ত্রুটি মিশ্রিত করেনি*, তাদেরই জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সুপথপ্রাপ্ত[৩]।

---

১. হযরত ইবরাহীম (আ) এর জাতি বলত, তুমি যে আমাদের উপাস্যদের অবমাননা কর, এতে ভয় করো। কি জানি এর শাস্তিতে তুমি (আল্লাহর পানাহ!) উন্মাদ ও পাগল হয়ে যাও কি না, অথবা অন্য কোনো বিপদে পতিত হও কি না।

এর জওয়াবে তিনি বললেন, আমি কেন ওদের ভয় করব, যাদের হাতে লাভ ও ক্ষতি, সুখ ও দুঃখ কিছুই নেই? হাঁ, আমার প্রতিপালক আমাকে কোন কষ্ট দিতে চাইলে দুনিয়াতে কে-ই বা তার ব্যতিক্রম আছে? তিনিই তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানের মাধ্যমে জানেন, কাকে কী অবস্থায় রাখা সংগত হবে।

২. অর্থাৎ আমি তোমাদের উপাস্যদের ভয় করব কেন, যেখানে ওরা কোন লাভ-ক্ষতির মালিক নয় এবং তাওহীদ অবলম্বন করাতে কোন গোনাহও নেই, যাতে আশঙ্কা হবে। পক্ষান্তরে তোমরা খোদার অবাধ্য ও পাপী এবং আল্লাহ লাভ ও ক্ষতির মালিক, সুতরাং তোমাদেরই নিজেদের পাপাচারের জন্য শাস্তির ভয় করা উচিত।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যারা ঈমান এনেছে ও স্বীয় ঈমানে শিরক-মিশ্রিত করেনি..'।

৩. সহীহ হাদীসসমূহে (সহীহ বুখারী ৩৩৬০, সহীহ মুসলিম ১২৪) বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে ظُلم শব্দের তফসীর করেছেন شرك দ্বারা, যেমন সূরা

[রুকূ - ১০]

৮৩. আর তা আমার যুক্তি-প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তাঁর জাতির মোকাবেলায় দান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা বহু মর্যাদায় উন্নীত করি। নিশ্চয় আপনার রব প্রজ্ঞাবান, মহাজ্ঞানী[১]।

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٨٣﴾

৮৪. আর আমি ইবরাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব। তাঁদের সকলকে আমি হেদায়াত দান করেছিলাম[২]। আর (এঁদের)

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ

লুকমানে আছে, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ বলা যায় ظلم-এর মধ্যে যে تنوين (বা দুই যের) রয়েছে, তা দ্বারা 'গুরুতর' বোঝানো হয়েছে। অতএব, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হচ্ছে, নিরাপদ ও হেদায়েতপ্রাপ্ত তারাই হতে পারে, যারা এরূপ ঈমান এনেছে যে, তাতে শিরকের মিশ্রণ মোটেই নেই। যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পরও শিরক না ছাড়ে, তবে তা শরী'য়তসম্মত ঈমান নয় এবং তার ফলে নিরাপত্তা ও হেদায়েতও লাভ হতে পারে না। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন- وَ مَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَ هُمْ مُّشْرِكُوْنَ ('আর তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, কিন্তু এভাবে যে, (তাঁর সঙ্গে) শিরকও করে। –ইউসুফ, আয়াত ১০৬)

যেহেতু ঈমান ও শিরকের একত্র সমাবেশ বাহ্যত ধারণাতীত, সে জন্য বিজ্ঞ মুতারজিম (র) সহজবোধ্যতার জন্য آمنوا এর তরজমা 'বিশ্বাস স্থাপন করা' এবং ظُلْمٌ এর তরজমা 'ত্রুটি' করেছেন, যা আরবী ভাষার সম্পূর্ণ মোতাবেক। যেমনঃ আল্লাহ তাআলার কালামে রয়েছে- لم تظلم منه شيئا ('তাতে কোন ত্রুটি করেনি' –কাহাফ, আয়াত ৩৩)। আর (বর্তমান আয়াতে) এই 'ত্রুটি' দ্বারা উদ্দেশ্য শিরকই, যেমনঃ হাদীসসমূহে এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। এবং খোদ لبس শব্দটিও ইদিকে ইঙ্গিত করে, যেমন মুতারজিম ভূমিকায় এর ব্যাখ্যা করেছেন।

১. অর্থাৎ ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এমন শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ দিয়ে তাঁর জাতির উপর বিজয়ী করা এবং দুনিয়া ও আখেরাতে মাথা উঁচিয়ে দাঁড় করানো– একমাত্র সেই عليم ও حليم -এর কাজ, যিনি প্রত্যেকের যোগ্যতা ও কার্যক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞাত এবং যিনি নিজ হেকমত দ্বারা প্রত্যেক বিষয়কে যথাস্থানে স্থাপন করেন।

২. অর্থাৎ ইবরাহীমকে আমি নিজস্ব এলেম ও মহত্ব দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলাম– শুধু তা নয়, বরং তাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসহাকের মত ছেলে ও ইয়াকূবের মত নাতি দান করেছিলাম।

ইয়াকূব হচ্ছেন সেই 'ইসরাঈল', যাঁর সঙ্গে দুনিয়ার এক বিরাট জাতি বনী ইসরাঈল সংশ্লিষ্ট, যাদের মধ্যে হাজারো নবীর আবির্ভাব হয়। বরং কুরআনের বর্ণনা মত ইবরাহীম

دَاوٗدَ وَسُلَیۡمٰنَ وَاَیُّوۡبَ وَیُوۡسُفَ وَمُوۡسٰی وَهٰرُوۡنَ ؕ وَکَذٰلِکَ نَجۡزِی الۡمُحۡسِنِیۡنَ ﴿۸۴﴾

পূর্বে নূহকেও হেদায়াত দান করেছিলাম[১] এবং তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদ ও সুলায়মানকে, আইউব ও ইউসুফকে এবং মূসা ও হারূনকেও[২]। আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

وَزَکَرِیَّا وَیَحۡیٰی وَعِیۡسٰی وَاِلۡیَاسَ ؕ کُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۸۵﴾

৮৫. এবং (হেদায়াত দান করেছিলাম) যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকেও– সকলেই নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।

وَاِسۡمٰعِیۡلَ وَالۡیَسَعَ وَیُوۡنُسَ وَلُوۡطًا ؕ وَکُلًّا فَضَّلۡنَا عَلَی الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۸۶﴾

৮৬. এবং ইসমাঈল, আল ইয়াসা', ইউনুস ও লূতকেও। আর সকলকে আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম সমগ্র বিশ্ববাসীর উপরে[৩];

وَمِنۡ اٰبَآئِهِمۡ وَذُرِّیّٰتِهِمۡ وَاِخۡوَانِهِمۡ ۚ وَاجۡتَبَیۡنٰهُمۡ وَهَدَیۡنٰهُمۡ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ ﴿۸۷﴾

৮৭. এবং তাদের বাপদাদা, সন্তান-সন্ততি ও ভাই-বেরাদারের মধ্যেও কতককে (হেদায়াত দান করেছিলাম) এবং তাদের মনোনীত করেছিলাম ও সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম।

(আ) এর পর আল্লাহ তাআলা সর্বকালের জন্য তাঁরই বংশে নবুওয়াত ও পয়গম্বরীর ধারা জারী করে দেন।

১. প্রথমে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কতক বংশধরের উল্লেখ হয়েছে। এখন কিছু পিতৃপুরুষের আলোচনা হচ্ছে। কেননা, নূহ আলাইহিস সালাম হযরত ইবরাহীম (আ)এর পূর্বপুরুষদের অন্তর্ভুক্ত এবং ইবরাহীমের পর যেমন নবুওয়াত ও (আসমানী) কিতাব তাঁর সন্তানসন্ততির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি নূহ (আ)-এর পর মানবজাতি তাঁর বংশধরে সীমিত থাকে। বলতে গেলে, মহাপ্লাবনের পর তিনি হলেন দ্বিতীয় আদম : وجعلنا ذريته هم الباقين (আমি তাঁর সন্তানসন্ততিই অবশিষ্ট রাখি। –সাফফাত, আয়াত ৭৭)

২. বাহ্যিক রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের দিক দিয়ে নবীগণের মধ্যে দাউদ (আ) ও সুলায়মান (আ) সদৃশ এবং বিপদাপদ ও রোগ-শোকে ধৈর্যধারণের দিক থেকে আইয়ূব (আ) ও ইউসুফ (আ)এর মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। আর মূসা (আ) ও হারূন (আ)এর নিকট-সম্পর্ক সম্বন্ধে তো কিছু বলার প্রয়োজন নেই। স্বয়ং হযরত মূসা (আ), হারূন (আ)কে স্বীয় উজীররূপে আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন।

হযরত মুতারজিম (র) তাঁদের মধ্য থেকে প্রত্যেক দুই নামের শেষে کو সংযোজন করে সম্ভবত এ ধরনের সূক্ষ্ম তাৎপর্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। والله أعلم

৩. অর্থাৎ স্ব-স্ব কালের বিশ্ববাসীর উপর।

৮৮. এ আল্লাহর হেদায়াত, এর দ্বারা তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা সুপথে পরিচালিত করেন[১]। আর তাঁরা যদি শির্‌ক করতেন, তবে যা কিছু তাঁরা করেছিলেন নিশ্চয় তা তাদের পক্ষে বিনষ্ট হয়ে যেত[২]।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৮৯. এঁরাই তাঁরা, যাদের আমি কিতাব, শরী'য়ত ও নবুওয়াত দান করেছিলাম। এখন যদি এরা (মক্কাবাসীরা) এসব বিষয় অস্বীকার করে, তবে আমি তার জন্য এমন লোকদের নির্বাচিত করেছি যারা তা অস্বীকারকারী নয়[৩]।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ۝

৯০. এঁরাই তাঁরা, যাঁদের আল্লাহ হেদায়াত দান করেছিলেন। অতএব আপনি তাঁদেরই পথের অনুসরণ করুন[৪]। আপনি বলে দিন, 'আমি

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ

১. অর্থাৎ খাঁটি তাওহীদ, আল্লাহর মারেফত ও আনুগত্যের পথই হচ্ছে সেই পথ, যার উপর আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া ও মেহেরবানীতে মকবূল বান্দাদের পরিচালিত করেন। অতঃপর প্রতিদানরূপে যোগ্যতা অনুসারে তাঁদের দর্জা বুলন্দ করেন।

২. এখানে আমাদের এ কথা শোনানো উদ্দেশ্য যে, শিরক মানুষের সমস্ত আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। অন্যের তো কথাই নেই, অসম্ভব হলেও ধরুন, যদি নবীগণ ও নৈকট্যপ্রাপ্তদের দ্বারা (আল্লাহর পানাহ!) এমন কর্ম হয়ে যায়, তবে (তাঁদেরও) সমস্ত কৃতকর্ম ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩. যদি মক্কার কাফেররা কিংবা অন্য অমান্যকারীরা এসব বিষয় (অর্থাৎ কিতাব, শরী'য়ত ও নবুওয়াত) অস্বীকার করে, তবে আল্লাহর দীন ওদের উপর নির্ভরশীল নয়। আমি অপর জাতি অর্থাৎ মুহাজের ও আনসার এবং তাদের অনুসারীদেরকে এই বিষয়গুলি মনে-প্রাণে স্বীকার করা এবং তা সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারের জন্য নিযুক্ত করে দিয়েছি, আর তারা আমার কোন বিষয় থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার নয়।

৪. আকীদা-বিশ্বাস, দীনের উসূল (বা মৌলিক বিষয়াদি) ও বুনিয়াদি উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সমগ্র নবী আলাইহিমুস সালাম এক ও অভিন্ন। সকলেরই বুনিয়াদী দস্তুর এক, প্রত্যেক নবীকে তার উপর চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপনিও এ সুদৃঢ় সরলপথে চলতে থাকার জন্য আদিষ্ট হয়েছেন।

সারকথা, বর্তমান আয়াতে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, মৌলিকভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ পূর্ববর্তী নবীগণের পথ থেকে ভিন্ন নয়। আর শাখাগত ব্যাপারে যে (এখতেলাফ বা) ভিন্নতা রয়েছে, তা প্রত্যেক জমানার অবস্থা ও যোগ্যতা অনুযায়ী পূর্বেও ছিল, সুতরাং এখনো তা থাকলে কোন ক্ষতি নেই।

هُوَ اِلَّا ذِكۡرٰى لِلۡعٰلَمِيۡنَ ۟

এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চাই না। এ (কুরআন) তো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশমাত্র[১]।'

[রুকূ - ১১]

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدۡرِهٖۤ اِذۡ قَالُوۡا مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنۡ شَیۡءٍ ؕ قُلۡ مَنۡ اَنۡزَلَ الۡكِتٰبَ الَّذِیۡ جَآءَ بِهٖ مُوۡسٰی نُوۡرًا وَّهُدًی لِّلنَّاسِ تَجۡعَلُوۡنَهٗ قَرَاطِیۡسَ تُبۡدُوۡنَهَا وَتُخۡفُوۡنَ كَثِیۡرًا ۚ وَعُلِّمۡتُمۡ مَّا

৯১. ওরা আল্লাহর মর্যাদা যথাযোগ্যভাবে অনুধাবন করেনি যখন ওরা বলেছে, 'আল্লাহ কোনো মানুষের প্রতি কোনো কিছু অবতীর্ণ করেননি[২]।' আপনি জিজ্ঞাসা করুন, 'কে সেই কিতাব অবতীর্ণ করেছে যা নিয়ে এসেছিলেন মূসা? যা ছিল মানুষের জন্য আলো ও হেদায়াত, যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় সংকলন

বি. দ্র. 'উসূলুল ফিক্বহের' বিজ্ঞ আলিমগণ এই আয়াতের (عموم) সামগ্রিকতা থেকে এই মাসলা বের করেছেন যে, যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যাপারে পূর্ববর্তী শরী'য়তসমূহের কথা উল্লেখ করেন, তবে তা এই উম্মতের জন্যও সনদরূপে পরিগণিত হবে, যদি (شارع) শরী'য়তদাতা সামগ্রিক বা আংশিকভাবে তা রদ না করে থাকেন।

১. অর্থাৎ তোমরা না মানলে আমার কোন স্বার্থহানি ঘটবে না। কারণ, আমি তোমাদের নিকট কোন রকম পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর কাছে প্রাপ্য। হাঁ, তোমরা নসীহত থেকে বিমুখ হলে স্বয়ং নিজেদেরই ক্ষতি করবে। সমগ্র জগতের মধ্যে একজন না মানলে অন্য জনে নসীহত কবূল করবে। তাই যে অস্বীকার করবে, তার উচিত নিজ মাহরূমী ও হতভাগ্যের জন্য রোদন করা।

২. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

পূর্ববর্তী রুকূতে নবুওয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদা এবং অনেক নবী (আ) সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এরও উল্লেখ ছিল যে, তাওহীদ ও মারেফতের যে 'সীরাতে মুসতাকীম' বা সরলপথে পূর্ববর্তী নবীগণ পরিচালিত হয়েছিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার উপর চলতে আদিষ্ট হয়েছেন। আর আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির হেদায়েতের জন্য পয়গম্বর পাঠানো, এ তাঁর চিরন্তন নীতি।

বর্তমান আয়াতগুলিতে সেই জাহেল ও শত্রুদের মতের খণ্ডন করা হয়েছে, যারা কুবুদ্ধি, অজ্ঞতা অথবা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে শত্রুতাহেতু উত্তেজনা ও ক্রোধে বেসামাল হয়ে বলে যে, আল্লাহ কোন মানুষকে স্বীয় ওহী দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করেননি। বস্তুত, এটা হচ্ছে আসমানী কিতাবের অবতারণ এবং নবী-রাসূল প্রেরণের গোটা বিষয়টাকেই অস্বীকার করে বসা!

لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ ﴿۹۱﴾

করে সেগুলি (মানুষের সামনে) প্রকাশ কর এবং (তার) অনেক বিষয় গোপন কর। আর (তার মাধ্যমে) তোমাদের এমনসব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, যা তোমরাও জানতে না এবং তোমাদের বাপদাদারাও না[১]।' আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ (অবতীর্ণ করেছেন)'। অতঃপর ওদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিন, ওরা নিজেদের অসার কথাবার্তায় ক্রিড়ারত থাকুক[২]।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰی وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ

৯২. আর এ (কুরআন) এমন কিতাব, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, যা বরকতময় এবং তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থনকারী[৩]। আর (তা এজন্য অবতীর্ণ করেছি)– যাতে আপনি মক্কাবাসী ও তার পার্শ্ববর্তী লোকদের সতর্ক

---

১. অর্থাৎ সত্যিই যদি আল্লাহ তাআলা কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু অবতীর্ণ না করে থাকেন, তবে 'পবিত্র তাওরাত' এর মত মহা মর্যাদাশালী কিতাব, যা আল্লাহর আহকাম ও সন্তুষ্টি সম্পর্কে বান্দাদের অবহিত করত, যা হেদায়েতের দুর্লভ ও বিস্ময়কর আলো নিজের মধ্যে বহন করত এবং যা তোমাদের এমনসব বিষয়ের ইলম দান করত, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা, বরং গোটা মানবজাতি পর্যন্ত আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান ছাড়া নিছক স্বীয় বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানতে পারতে না– তা কোথা থেকে আসল এবং কে-ই বা তা মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ করল? স্বীকার করি যে, আজ তোমরা সে কিতাবকে বিভিন্ন পত্রখণ্ডে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছ, যা থেকে লোকদেরকে নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী দেখাও এবং তার বহু সংবাদ ও বিধান গোপন কর। আর এভাবে তার আসল আলো তোমরা অক্ষুণ্ন রাখনি। তা সত্ত্বেও যতটুকু অংশ আজ অবশিষ্ট রয়েছে তা দ্বারাই আঁচ করা যায়, এটা যে অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, তা স্বীয় উন্নতির কালে কেমন মহিমান্বিতই না ছিল।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কার নিকট থেকে এমন নূর ও হেদায়েত আসতে পারে? এমন পরিষ্কার ও উজ্জ্বল বস্তুকেও ওরা না মানলে আপনি প্রচার ও সতর্ক করে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যান এবং ওদের ছেড়ে দিন। ওরা নিজেদের বাজে ক্রিয়াকর্মে ও খেল-তামাশায় লিপ্ত থাকুক। যখন সময় আসবে তখন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ওদের মজাটা বুঝিয়ে দেবেন।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কোন কিছুই অবতীর্ণ না করে থাকলে 'কুরআন' নামের এই বরকতময় কিতাব কোথা থেকে আসল, যা পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের বিষয়াবলির সমর্থনকারী? যদি এটি আসমানী কিতাব না হয়ে থাকে তবে বল, এ কার রচনা, যার দৃষ্টান্ত আনয়নে মানব ও জিন জাতি অক্ষম? একে একজন নিরক্ষর মানুষের রচনা বলা যেতে পারে কি?

بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩٢﴾

করেন[১]। যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে, তারা এর প্রতি ঈমান আনে এবং তারা তাদের নামাযের পূর্ণ হেফাজত করে[২]।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ

৯৩. ওর চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে, 'আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছে' অথচ ওর প্রতি কোনই ওহী অবতীর্ণ করা হয়নি; এবং যে বলে, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, আমিও সত্বর তার অনুরূপ অবতীর্ণ করব'[৩]। আপনি (বড় করুণ দৃশ্য দেখবেন) যদি

---

১. (ام القرى) 'উম্মুল কুরা' বলে জনপদসমূহের আসল ও কেন্দ্রস্থলকে। 'মক্কা মুআজ্জমা' সমগ্র আরবের দীনী ও পার্থিব কেন্দ্র ছিল। আর ভৌগলিক দিক থেকেও তা প্রাচীন পৃথিবীর মধ্যভাগে কেন্দ্রস্থলরূপে অবস্থিত এবং নতুন পৃথিবী (আমেরিকা) এর নীচে (অর্থাৎ অপর পৃষ্ঠে) অবস্থিত। আর হাদীসের বর্ণনা মতে পৃথিবীর সৃষ্টির সময় প্রথমে এই স্থানটিই প্রকাশ পায়। (তাফসীরে ইবনে আবি হাতিম, বর্ণনা ৭৬১৫, মাক্তু' বর্ণনা) এসব কারণে মক্কাকে 'উম্মুল কুরা' বলা হয়েছে।

আর পার্শ্ববর্তী লোকদের বলতে হয় আরববাসী উদ্দেশ্য, কেননা দুনিয়াতে কুরআনের সর্বপ্রথম সম্বোধন ছিল তাদেরই প্রতি, তাদের মাধ্যমে অবশিষ্ট দুনিয়াবাসীকে কুরআনের বাণী পৌছানো হয়। অথবা এর দ্বারা সমস্ত মানুষ উদ্দেশ্য, যেমন: অন্যত্র বলা হয়েছে- ليكون للعالمين نذيرا [সূরা ফুরকান, আয়াত ১]

২. যার পরকালের জীবনের প্রতি বিশ্বাস ও মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থার কথা মনে থাকবে, সেই ব্যক্তিই হেদায়েত ও মুক্তিপথের সন্ধান করবে। সে আল্লাহ তাআলার পয়গাম গ্রহণ করবে এবং নামায ইত্যাদি ইবাদতের হেফাজত করবে।

৩. আল্লাহ তাআলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করার অর্থ সম্ভবত এই যে, তাঁর সঙ্গে সেই সব বিষয়কে সম্পর্কিত করা যা তাঁর উচ্চশানের উপযোগী নয়। যেমন: কাউকে তাঁর শরীক নির্ধারণ করা, অথবা তাঁর জন্য স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করা, অথবা এরূপ বলা যে, ما أنزل الله على بشر من شيء (অর্থাৎ আল্লাহ বান্দাদের হেদায়েতের কোন ব্যবস্থা করেননি।) এমন কথা যে বলে, সে অতি বড় জালেম।

অনুরূপ, যে ব্যক্তি নবুওয়াত ও পয়গম্বরীর মিথ্যা দাবি করে, অথবা গর্বভরে এ কথা বলে যে, আল্লাহর কালামের মত কালাম আমিও রচনা করতে পারি, যেমন: কোন কোন মুশরিক বলত, لو نشاء لقلنا مثل هذا ('আমরাও ইচ্ছা করলে এরূপ বলতে পারি।')— এসব উক্তি গুরুতর অন্যায় ও চরম ধৃষ্টতা।

(জালেমদের) তখন দেখেন, যখন জালেমরা মৃত্যুর কষ্ট-যাতনায় থাকে[১] আর ফেরেশতারা তাঁদের হাত বাড়িয়ে (বলে), 'তোমরা নিজেদের প্রাণ বের কর[২]। আজ প্রতিফলস্বরূপ তোমাদের অপমানকর শাস্তি দেওয়া হবে[৩], কারণ তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অসত্য কথা বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে'[☆৪]।

وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

৯৪. নিশ্চয় তোমরা আমার কাছে এসেছ একা একা (অর্থাৎ নিঃসঙ্গ অবস্থায়), যেমন আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। আর আমি তোমাদের যা কিছু (ধন-সম্পদ) দিয়েছিলাম, তা তোমরা তোমাদের পিছনে ফেলে এসেছ[৫] এবং আমি তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদের দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমরা দাবি করতে, তারা তোমাদের বিষয়ে (আল্লাহর) শরীক। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যেসব দাবি করতে তা তোমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে[৬]।

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ؕ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝

১. অর্থাৎ মৃত্যুর আভ্যন্তরীণ ও আত্মিক কষ্ট-যাতনার মধ্যে।

২. অর্থাৎ জান কব্জ করতে এবং শাস্তি দিতে হাত বাড়ান, অধিকন্তু কঠোরতা ও ক্রোধ প্রকাশার্থে বলতে থাকেন, 'বের কর নিজেদের প্রাণ'।

৩. অর্থাৎ কঠিন কষ্ট-যাতনার সাথে অপমান ও লাঞ্ছনাও হবে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'অহংকারবশত তাঁর আয়াতগুলি (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থাকতে'।

৪. অর্থাৎ গর্বভরে আল্লাহ তাআলার আয়াতগুলিকে মিথ্যা বলতে।

৫. অর্থাৎ মাথায় না আছে টুপি, পায়ে না আছে জুতা! শূন্য হাতে চলে এসেছ এবং যেসব সামগ্রী ও আসবাবপত্রের কারণে অহংকার ও গৌরব ছিল তা সঙ্গে আননি, পিছনে কোথাও ফেলে এসেছ।

৬. অর্থাৎ যাদের তোমরা মনে করতে যে, দুঃসময়ে কাজে আসবে এবং বিপদের সময় সঙ্গী হবে, তারা কোথায় চলে গেল? আজ আমি তোমাদের সুপারিশ ও সাহায্যার্থে তাদের দেখছি

[রুকূ - ১২]

৯৫. আল্লাহ শস্যবীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী। তিনিই মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং তিনিই জীবিত থেকে মৃতকে নির্গতকারী। ইনিই তো আল্লাহ, সুতরাং তোমরা (মুখ ফিরিয়ে নিয়ে) কোথায় চলে যাচ্ছ[১]?

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ۝

৯৬. (তিনি) ভোরের উন্মেষকারী[২] এবং তিনি রাতকে বানিয়েছেন আরামের সময় এবং সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন এক বিশেষ হিসাবের অধীন। এ পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ[৩]।

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

৯৭. আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের সাহায্যে স্থলের ও জলের অন্ধকারে পথ চিনতে পার[৪]। নিশ্চয় আমি জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

না। সাহায্য ও সহযোগিতার সব সম্পর্ক আজ ছিন্ন হয়ে গেছে এবং যেসব বড় বড় দাবি তোমরা করতে তা সবই উধাও হয়ে গেছে।

১. অর্থাৎ মাটিতে প্রোথিত হওয়ার পর শস্যবীজ ও আঁটি ফেড়ে (তা থেকে) সবুজ চারা অঙ্কুরিত করা, অথবা মৃত থেকে জীবন্তকে এবং জীবন্ত থেকে মৃতকে বের করা (যেমন, মানুষকে বীর্য থেকে এবং বীর্যকে মানুষ থেকে সৃষ্টি করা)– একমাত্র আল্লাহরই কাজ। অতএব তাঁকে ছেড়ে তোমরা কোন্ দিকে চলে যাচ্ছ? আর কোনো সত্তা এমন আছে কি, যে এসব কাজ করতে পারে?

২. অর্থাৎ রাতের অন্ধকার ভেদ করে যে সুবহে সাদেক উদিত হয়, তার উদয়ও তিনিই ঘটান।

৩. রাত-দিন ও চাঁদ-সুরুজের যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা এবং এদের গতিধারার যে পরিমাপ তিনি স্থির করে দিয়েছেন, তাতে একটুও ব্যতিক্রম বা কমবেশি হয় না।

৪. অর্থাৎ সরাসরি ওদের দ্বারা রাস্তা চিনতে পার, অথবা ওদের সূত্রে অন্য কিছুর মাধ্যমে- যেমন দিকদর্শন যন্ত্রের মাধ্যমে।

৯৮. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি থেকে[১]। অতঃপর (তোমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে) দীর্ঘকালীন আবাসস্থল ও স্বল্পকাল অবস্থানের জায়গা[★২]। নিশ্চয় আমি বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শনগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।

وَهُوَ الَّذِیْۤ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّفْقَهُوْنَ ۝

৯৯. এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর আমি তার দ্বারা সব রকমের উদ্ভিদ (এর অঙ্কুর) উদ্গত করি[৩]। তারপর তা থেকে উদ্গত করি সবুজ গাছ, যা থেকে উদ্গত করি ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা– আর খেজুর গাছের মাথি থেকে নির্গত হয় ঝুলন্ত কাঁদি[৪]– এবং (উদ্গত করি) আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন ও আনার— পরস্পর সদৃশ ও অসদৃশ[৫]। তোমরা লক্ষ

وَهُوَ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَیْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّیْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَیْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ اُنْظُرُوْۤا اِلٰی ثَمَرِهٖۤ

১. অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে।

★ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'প্রত্যেকের জন্য রয়েছে অবস্থানস্থল ও সমর্পিত হওয়ার স্থান'।

২. مستقر -বাস করার স্থান, আবাসস্থল। আর مستودع বলে সোপর্দ করার ও আমানত রাখার স্থানকে। এ তো হল আভিধানিক অর্থ। কিন্তু আয়াতে শব্দ দুটির উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ণয়ে তাফসীরকারগণের মধ্যে এখতেলাফ রয়েছে।

'মূযেহুল কুরআন'-এ হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) যা লিখেছেন, তা আমাদের নিকট অগ্রগণ্য। অর্থাৎ তোমাদের প্রথমে সোপর্দ করা হয় মায়ের পেটে, যাতে একটু একটু করে দুনিয়ার আলো-বাতাসে অভ্যস্ত হতে থাক। অতঃপর দুনিয়াতে এসে অবস্থান কর। তারপর সোপর্দ করা হবে কবরে, যাতে ক্রমে ক্রমে আখেরাতের পরিবেশে অভ্যস্ত হও। অতঃপর গিয়ে বসবাস করবে বেহেশতে বা দোযখে। [তো مُسْتَوْدَعٌ হচ্ছে– মায়ের পেট ও কবর। আর مُسْتَقَرٌّ হলো– (প্রথমতঃ) দুনিয়া, অতঃপর– বেহেশত বা দোযখ।]

৩. অর্থাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যা উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন হওয়ার কারণ।

৪. অর্থাৎ ভারী হওয়ার কারণে নীচের দিকে ঝুলে থাকে।

৫. অর্থাৎ আকার-আকৃতি, পরিমাণ, রং, গন্ধ ও স্বাদের দিক থেকে কোন কোন ফল একে অন্যের সদৃশ; কোন কোনটা তেমন নয়।

কর প্রত্যেক গাছের ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি[১]। নিশ্চয় এ সবের মধ্যে ঈমানদার লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে[২]।

إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

১. অর্থাৎ প্রথমে যখন ফল ধরে, তখন তা কাঁচা, বিস্বাদ ও খাওয়ার অযোগ্য থাকে। তারপর যখন পাকে তখন কেমন মিষ্টি, সুস্বাদু ও কাজের হয়। এসব আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ।

২. **বর্তমান রুকূতে আলোচিত বিষয়বস্তুর ফলাফল ও গভীর ইশারা**

এই রুকূতে আল্লাহ তাআলার যেসব কর্ম ও গুণ এবং কুদরতের নিদর্শন বর্ণিত হল, তাতে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব এবং তাঁর সর্বোত্তম গুণাবলির অধিকারী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ তো রয়েছেই, গভীরভাবে চিন্তা করলে এতে ওহী ও নবুওয়াতসম্পর্কিত প্রশ্নেরও সমাধান অনেকাংশে পাওয়া যায়। কেননা, যখন আল্লাহ তাআলা নিজ রহমত ও ফযলে আমাদের পার্থিব জীবনের সুব্যবস্থা এবং বস্তুগত প্রয়োজনের সমাধানের জন্য মাটি ও আকাশ থেকে এই পরিমাণ বস্তুসামগ্রী দান করলেন, তখন এ কথা বলা কতই না অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত হবে যে, আমাদের পরকালীন জীবন ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনাদির সমাধানে তিনি কোনই ব্যবস্থা করেননি!!

যে দয়াময় প্রভু আমাদের দৈহিক খাদ্যাবলীর বিকাশের জন্য আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন, নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের রূহানী খোরাকের জন্যও নবুওয়াতের মেঘমালা থেকে ওহী ও এলহামের বৃষ্টিধারা নাযিল করেছেন। তিনি যখন স্থলের ও সাগরের অন্ধকারে নক্ষত্রসমূহের সাহায্যে জাহেরী পথপ্রদর্শন করে থাকেন, তখন এ কেমন করে সম্ভব যে, বাতেনী পথপ্রদর্শনের জন্য তিনি রূহানী জগতে একটি নক্ষত্রও আলোকোজ্জ্বল করবেন না? রাতের অন্ধকারের পর তিনি সুবহে সাদেকের উদয় করেন এবং মানুষকে সুযোগ দেন, সে যেন নিজ পার্থিব কায়কারবারে চন্দ্র ও সূর্যের আলোর সাহায্যে উপকৃত ও লাভবান হয়। অতএব কেমন করে বলা যায় যে, কুফর ও শিরক, অন্যায় ও অবিচার এবং দুষ্কৃতি ও পাপাচারের অন্ধকার রাতে তাঁর তরফ থেকে কোন (আধ্যাত্মিক) চন্দ্রও চমকায়নি, রাতের অবসানে কোন সূর্যও উদিত হয়নি? (তবে কি) আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিকে চিরকালের জন্য মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতার পুঞ্জীভূত অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতে দেওয়া হল?

দয়াময় আল্লাহ গমের বীজ ও খেজুরের আঁটি ফেড়ে তরুতাজা গাছ উদ্গত করেন। আর মানবাত্মায় রাব্বানী মারেফতের যে বীজ স্বভাবগতভাবে বপন করে রাখা হয়েছিল, তা কি এমনিতেই অকারণে বিনষ্ট করে দেওয়া হল– যার ফলে তা থেকে গাছও উদ্গত হল না, পল্লবিতও হল না, ফলও হল না, ফল পাকলও না, তা থেকে উপকৃত হওয়া গেল না?!

যখন দৈহিক দিক থেকে দুনিয়ায় জীবন ও মৃত্যুর ধারা কায়েম রয়েছে– আল্লাহ জীবিত থেকে মৃতকে এবং মৃত থেকে জীবিতকে বের করে চলেছেন, তখন রূহানী জগতে খোদার এই কার্যধারা কেন অস্বীকার করা হবে? রূহানীভাবেও নিঃসন্দেহে তিনি জীবন্ত জাতি থেকে মৃত এবং মৃত জাতি থেকে প্রাণবন্ত ব্যক্তিদের সৃষ্টি করে থাকেন। আর যেভাবে তিনি আমাদের

১০০. ওরা জিনদের আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে অথচ তাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন[১]। এবং অজ্ঞতাবশত তাঁর জন্য উদ্ভাবন করে পুত্র-কন্যা[২]। তিনি পবিত্র এবং ওরা যা বলে তা

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ

পার্থিব জীবনের مستقر ও مستودع (মায়ের গর্ভ ও দুনিয়া) এর ব্যবস্থাপনা করেছেন, তেমনি পরকালীন জীবনের مستقر ও مستودع (কবর ও বেহেশত/ দোযখ) এর ব্যবস্থাপনা তা থেকে বেশি ছাড়া কম করেননি। فله الحمد والمنة وبه الثقة والعصمة ।

এতে এও বুঝে আসে যে, যেভাবে আমরা আল্লাহ তাআলাকে তাঁর কাজকর্ম দ্বারা চিনে থাকি, অর্থাৎ তিনি নিজ অসীম কুদরতের দ্বারা যে কাজ করেন, কোন সৃষ্টির সাধ্য নেই তেমনটি করা; ঠিক তেমনিভাবে তাঁর কালামকেও আমরা উক্ত মানদণ্ডে যাচাই করতে পারি যে, আল্লাহর কালাম তাই হতে পারে যার অনুরূপ সমগ্র সৃষ্টি মিলেও রচনা করতে সক্ষম হবে না। এ সত্ত্বেও سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ('আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, আমিও সত্বর তার অনুরূপ অবতীর্ণ করব।' –সূরা আনআম, আয়াত ৯৩) এর দাবি কতটুকু সত্য হতে পারে?

বলতে গেলে, বর্তমান রুকুতে আল্লাহর গুণাবলি ও ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা করার মাধ্যমে সেসব বিষয়ের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়া হয়েছে, বিগত রুকুতে যেসবের খণ্ডন করা হয়েছিল।

১. 'জিন' দ্বারা এখানে হয় شياطين উদ্দেশ্য– কেননা, কুফর ও শিরক শয়তানের প্ররোচনায় হয়ে থাকে । অতএব ওর প্ররোচনা ও বিভ্রান্তির ফলে গাইরুল্লাহর উপাসনা করাটা যেন ওরই পূজা হল; ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মূর্তিপূজা খণ্ডন করতে গিয়ে পিতাকে বলেছিলেন- يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ (হে পিতা! শয়তানের উপাসনা করবেন না –মারয়াম, আয়াত ৪৪), অন্যত্র এরশাদ হয়েছে- أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ(হে বনী আদম! আমি কি তোমাদের শয়তানের উপাসনা করতে নিষেধ করিনি? –সূরা য়া-সীন, আয়াত ৬০)। ফেরেশতাগণ কিয়ামতের দিন বলবেন- سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ('আপনার সত্তা পবিত্র, আমাদের সম্পর্ক আপনার সঙ্গে, ওদের সাথে নয়। বরং ওরা জিনদের পূজা করত, এদের অধিকাংশ ওদেরই প্রতি বিশ্বাসী ছিল।' –সাবা, আয়াত ৪১)

অথবা 'জিন' বলতে জিনজাতি উদ্দেশ্য, যাদের কতক সরদারের নিকট জাহেলী যুগের লোকেরা সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করত– وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ('আর কিছু মানুষ কতক জিনের আশ্রয় গ্রহণ করত, ফলে তারা জিনদের দাম্ভিকতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।' –জিন, আয়াত ৬)

যা হোক, জিনেরা আমাদের মত আল্লাহর অক্ষম সৃষ্টি। সুতরাং সৃষ্টি হয়ে তারা স্রষ্টার শরীক কীরূপে হতে পারে!

২. নাসারারা হযরত মাসীহকে এবং কতক ইহুদী হযরত উযায়রকে আল্লাহর পুত্র বলত। আর মুশরিকরা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলত।

سُبۡحٰنَهٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا یَصِفُوۡنَ ۝

থেকে বহু উর্ধ্বে[১]।

[রুকূ - ১৩]

بَدِیۡعُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ اَنّٰی یَکُوۡنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمۡ تَکُنۡ لَّهٗ صَاحِبَۃٌ ؕ وَخَلَقَ کُلَّ شَیۡءٍ ۚ وَهُوَ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ ۝

১০১. (তিনি) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর উদ্ভাবক[২]। তাঁর সন্তান হবে কী করে, অথচ তাঁর কোন স্ত্রী নেই? তিনি তো প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত[৩]।

ذٰلِکُمُ اللّٰهُ رَبُّکُمۡ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ کُلِّ شَیۡءٍ فَاعۡبُدُوۡهُ ۚ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ وَّکِیۡلٌ ۝

১০২. এ আল্লাহই তোমাদের রব[★], তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। (তিনি) প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা। অতএব তোমরা তাঁরই এবাদত কর। আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর কর্মবিধায়ক[৪]।

---

১. অর্থাৎ অংশীদারিত্ব থেকে পবিত্র এবং তাঁর সত্তা সংযোজন ও বিয়োজন থেকে বহু উর্ধ্বে। সুতরাং এস্থলে পিতা-পুত্রের কল্পনা কেমনে হতে পারে?

২. যিনি একা কোন নমুনা ও হাতিয়ার ইত্যাদির মাধ্যম ছাড়া এমন বিচিত্র ধরনের আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করে দিলেন, আজ তাঁর জন্য শরীকদের সাহায্য এবং নাতি-পুত্রের উপর নির্ভরতা সন্ধানের কী প্রয়োজন?

৩. অর্থাৎ, যখন তোমরা কোন সৃষ্টিকে প্রকৃতই আল্লাহর সন্তানসন্ততি সাব্যস্ত কর, তখন এ সন্তানের মা কাকে নির্ধারণ করবে এবং আল্লাহর সঙ্গে এ মায়ের সম্পর্ক কী ধরনের হবে? খ্রিস্টানরা হযরত মাসীহকে খোদাপুত্র বলে থাকে। কিন্তু এই দুঃসাহস তারাও করতে পারেনি যে, (আল্লাহর পানাহ!) সতীসাধ্বী মারয়ামকে খোদার স্ত্রী সাব্যস্ত করে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের প্রবক্তা হয়ে যাবে। যখন এমন নয়, তখন মারয়ামের গর্ভজাত সন্তান আল্লাহর পুত্র কিরূপে হয়ে গেল? দুনিয়ায় অন্য বাচ্চাদেরও আল্লাহ তাআলা মাতৃগর্ভ থেকে পয়দা করে থাকেন এবং তাদেরকে আল্লাহর বংশোদ্ভূত সন্তানসন্ততি বলা হয় না। কোন বাচ্চাকে সাধারণ কার্য-কারণের মাধ্যম ছাড়া শুধু হযরত জিবরাঈলের ফুঁকে পয়দা করে দেওয়া, আর অন্যদের সাধারণ কার্য-কারণের ধারায় সৃষ্টি করা– এ পার্থক্য পিতৃত্ব ও পুত্রত্বের ব্যাপারে কোনই প্রভাব ফেলতে পারে না। কার্য-কারণ হোক, বা অসাধারণ ঘটনা হোক– সব কিছু আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই জানেন, কোন বস্তুকে কখন ও কীভাবে সৃষ্টি করা কল্যাণকর ও হেকমতপূর্ণ।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ইনিই আল্লাহ– তোমাদের রব'।

৪. তাঁর ইবাদত এজন্য করা উচিত যে, উল্লিখিত গুণাবলির কারণে তিনিই মা'বূদ হওয়ার অধিকার রাখেন এবং এ জন্যও যে, সমস্ত সৃষ্টির কর্মবিধায়ক তিনি।

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

১০৩. দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না, কিন্তু তিনি সকল দৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। আর তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সম্যক অবহিত[১]।

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾

১০৪. তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে প্রজ্ঞাপূর্ণ নিদর্শনাবলি এসে গেছে। অতএব যে ব্যক্তি দেখে নিল (অর্থাৎ সত্যকে উপলব্ধি করল), তো নিজের (উপকারের) জন্যই (তা করল); আর যে অন্ধ রইল, নিজের ক্ষতির জন্যই (অন্ধ থাকল)। আর আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই[২]।

وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. এভাবেই আমি আয়াতগুলি নানাভাবে বর্ণনা করি (যাতে আপনি সকলের কাছে তা পৌছে দেন) এবং যাতে অস্বীকার-কারীরা বলে যে, তুমি (কারো নিকট) পড়েছ এবং যাতে আমি তা স্পষ্ট করে দিই জ্ঞান-

---

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) لاتدركه الأبصار এর অর্থ এই করেছেন যে, আল্লাহ তাআলাকে দেখার মত শক্তি চোখের নেই। হাঁ, স্বয়ং তিনি দয়া ও মেহেরবানীপূর্বক নিজেকে দেখাতে চাইলে চোখে তেমন শক্তিও পয়দা করে দেবেন। যেমন, আখেরাতে মুমিনগণ নিজ নিজ মর্যাদানুসারে আল্লাহর দীদার লাভ করবেন– কুরআন ও হাদীসে এ সত্য স্পষ্টভাবে প্রমাণিত রয়েছে। আর কোন কোন বর্ণনা মতে হুজূর সা. মেরাজে দীদার লাভ করেছিলেন (তবে এ সর্ববাদী মত নয়)। এ ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে যেহেতু কুরআন-হাদীস দ্বারা দীদার প্রমাণিত নয়, তাই অন্যান্য ক্ষেত্রে দীদারের আকীদা রাখা যাবে না।

পূর্ববর্তী তাফসীরকারদের মধ্যে কেউ কেউ ادراك এর অর্থ করেছেন পরিবেষ্টন বা আয়ত্ত করা, অর্থাৎ চোখসমূহ কখনো তাঁকে পূর্ণ আয়ত্তে আনতে পারে না। আখেরাতে দীদার হবে বটে, কিন্তু সেখানেও পরিবেষ্টন করা সম্ভব হবে না। হাঁ, তাঁর শান এই যে, তিনি সমস্ত দর্শনেন্দ্রিয় ও দৃশ্যমান বস্তু-সামগ্রী পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। এ মতে لطيف এর সম্পর্ক لاتدركه এর সাথে এবং خبير এর সম্পর্ক وهو يدرك এর সাথে হবে।

২. অর্থাৎ যদিও আল্লাহ তাআলা আমাদের দেখা দেন না, কিন্তু তাঁকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার মত নিদর্শনাদি ও প্রমাণাদি আমাদের সম্মুখে রয়েছে। যে চোখ খুলে দেখবে, সে আল্লাহকে পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে অন্ধ হয়ে গেছে, সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করেছে। আর কাউকে দেখতে বাধ্য করা আমার দায়িত্ব নয়।

বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য[১]।

১০৬. আপনার নিকট আপনার রবের কাছ থেকে যে বিধান পাঠানো হয়, আপনি তার অনুসরণ করুন– তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই –এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন[২]।

اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِیْنَ ۝

১০৭. যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে ওরা শিরক করত না[৩]। আর আমি আপনাকে ওদের পর্যবেক্ষক বানাইনি এবং আপনি ওদের যিম্মাদার নন[৪]।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ۗ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَیْهِمْ حَفِیْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیْلٍ ۝

১০৮. ওরা আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা করে তোমরা তাদের গালি দিয়ো না, অন্যথায় ওরাও অজ্ঞতাবশত সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহকে

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَیَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًۢا بِغَیْرِ عِلْمٍ ؕ

---

১. অর্থাৎ আমি নিজ আয়াতগুলি বিভিন্নভাবে এবং চমৎকার ও বিচিত্র উপায়ে এ জন্য বুঝিয়ে থাকি, যাতে আপনি তা সকল লোককে পৌঁছিয়ে দেন এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন যোগ্যতা ও অবস্থাভেদে দু'দল হয়ে যায়– জেদী ও দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা তো এই বলবে যে, এমন সব ইলম ও মাআরেফ (তত্ত্বজ্ঞান) এবং মর্মস্পর্শী বিষয়াদি বর্ণনা করা একজন নিরক্ষর মানুষ দ্বারা কিরূপে সম্ভব হয়? নিশ্চয়ই তিনি বিভিন্ন সময়ে কারো নিকট শিখে থাকবেন, অতঃপর তা আমাদের সামনে উপস্থিত করে দিয়েছেন। কিন্তু সমঝদার ও নিরপেক্ষ লোকদের কাছে সত্য প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং শয়তানী দ্বিধা-সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যাবে।

২. আপনি এক আল্লাহর উপর ভরসা করে তাঁর হুকুমের অনুসরণ করে চলুন। মুশরিকদের অজ্ঞতা ও শত্রুতার প্রতি লক্ষ করবেন না, যারা এমন উজ্জ্বল প্রমাণাদি ও বর্ণনাদি শোনার পরও সত্য পথে আসেনি।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিসম্পর্কিত হেকমতের দাবি এই নয় যে, তিনি সমগ্র দুনিয়াবাসীকে জবরদস্তি করে মুমিন বানিয়ে দেন। অবশ্য তিনি ইচ্ছা করলে ভূপৃষ্ঠে একজন মুশরিককেও অবশিষ্ট রাখতেন না। কিন্তু শুরু থেকে মানবস্বভাবের অবস্থা তিনি এমন রেখেছেন যে, মানুষ চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই হেদায়েত গ্রহণ করতে পারে– তবে গ্রহণ করতে সে যেন সম্পূর্ণ বাধ্য না হয়।

৪. আপনার দায়িত্ব হচ্ছে তবলীগ ও আল্লাহ তাআলার আহকামের অনুসরণ করা। ওদের কাজকামের যিম্মাদার ও জওয়াবদাতা আপনি নন।

كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۠ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

গালি দিতে শুরু করবে[১]। এভাবেই আমি প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে শোভন করে দিয়েছি। অতঃপর তাদের সকলকে নিজ রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তাদের জানিয়ে দেবেন যা কিছু তারা করত[২]।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ

১০৯. ওরা আল্লাহর নামে দৃঢ়ভাবে কসম খেয়ে (বলে), ওদের নিকট কোন নিদর্শন আসলে ওরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে[৩]। আপনি বলে দিন, 'নিদর্শনাবলি তো আল্লাহর কাছে আছে'। আর (হে মুসলমানগণ!) তোমরা কীভাবে জানলে

---

১. অর্থাৎ তোমরা তবলীগ ও নসীহত করে নিজ দায়িত্ব পূর্ণ করেছ। এখন ওরা কুফরী ও শিরক করলে তার জন্য দায়ী ওরা নিজেরাই– তোমাদের উপর তার কোনই দায়িত্ব নেই।

হাঁ, তোমরা নিজ তরফ থেকে নিষ্প্রয়োজনে ওদের অধিকতর কুফর ও জেদের কারণ হয়ো না। যেমনঃ মনে কর, ওদের ধর্মের খণ্ডনে অথবা তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে তোমরা রাগান্বিত হয়ে ওদের উপাস্য ও অনুসরণীয় ব্যক্তিদের গালাগালি শুরু করে দিলে। এর ফল এই হবে যে, ওরা উত্তরে তোমাদের সত্য মাবূদ ও সম্মানিত বুযুর্গদের সম্পর্কে বেআদবী করবে এবং মূর্খতাবশত তাঁদের গালি দেবে। এমতাবস্থায় নিজেদের মান্যবর মাবূদ ও সম্মানিত বুযুর্গদের মানহানির কারণ তোমরা নিজেরা হবে। অতএব এ থেকে সর্বদা বিরত থাকা উচিত।

যুক্তিসঙ্গত উপায়ে কোন ধর্মের মৌলিক ও শাখাগত বিষয়ের ভ্রান্তি প্রকাশ করা অথবা প্রামাণ্য পদ্ধতিতে তার দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্ক করা ভিন্ন জিনিস। কিন্তু মানহানির উদ্দেশ্যে কোন জাতির পুরোহিত ও উপাস্যদের সম্পর্কে মনোকষ্টকর শব্দাবলী ব্যবহার করাকে পবিত্র কুরআন কখনই জায়েয রাখেনি।

২. অর্থাৎ দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষার স্থল, সেহেতু এর ব্যবস্থাপনা আমি এরূপ রেখেছি এবং এমন উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছি যে, এখানে প্রত্যেক জাতি নিজেদের কার্যকলাপ ও মতাদর্শ নিয়ে গৌরব বোধ করে। মানবীয় মস্তিষ্কের গঠন আমি এমন করিনি যে, সে কেবল সত্যকে গ্রহণ ও পছন্দ করতে বাধ্য হবে, ভ্রান্তির প্রতি অগ্রসর হওয়ার অবকাশ থাকবে না। হাঁ, আল্লাহর কাছে যাওয়ার পর যখন সকল সত্য সম্মুখে সমুপস্থিত থাকবে, তখন বুঝবে– যেসব কাজ ওরা দুনিয়াতে করত, তা কেমন ছিল।

৩. অর্থাৎ কোন ফরমায়েশী নিদর্শন। যেমন 'সাফা' পাহাড় খাঁটি সোনার হয়ে যাওয়া।

যে, যখন নিদর্শনাবলি আসবে তখন ওরা ঈমান আনবেই[১]?'

أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

১১০. আমি তো ওদের অন্তর ও চোখগুলো উলটিয়ে দেব, যেমন ওরা প্রথমবার তার (অর্থাৎ নিদর্শনাবলির) প্রতি ঈমান আনেনি। আর আমি ওদেরকে উদভ্রান্ত অবস্থায় স্বীয় অবাধ্যতায় পড়ে থাকতে দেব[২]।

وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

পারা - ৮ [রুকূ - ১৪]

১১১. আমি যদি ওদের প্রতি ফেরেশতা অবতীর্ণ করতাম এবং মৃতরা ওদের সাথে কথা বলত এবং আমি সকল বস্তুকে (জীবিত করে) ওদের চোখের সামনে সমবেত করে দিতাম, তবুও ওরা মোটেই ঈমান আনত না, তবে আল্লাহ চাইলে (ভিন্ন কথা); কিন্তু ওদের অধিকাংশই অজ্ঞ[৩]।

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوٓا إِلَّآ أَن يَشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ۝

---

১. কতক মুসলমানের এ ধারণা হয়েছিল যে, যদি ওদের এ দাবিও পূরণ করে দেওয়া হয় তবে ভালই হয়। –এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তোমাদের কি এই খবর আছে যে, এই অবাধ্য জিদ্দী লোকেরা ফরমায়েশী নিদর্শন দেখেও ঈমান আনবে না? ফলে আল্লাহ তাআলার নিয়ম অনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে ওরা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার যোগ্য হবে! এই সূরারই প্রথম দিকে আমরা এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি।

২. অর্থাৎ যখন কুফর ও অবাধ্যতার মধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবে, তখন ফল এই হবে যে, আমি ওদের অন্তর ও চোখ উলটিয়ে দেব, তখন সত্যকে বোঝা ও দেখার তাওফীক আর হবে না। 'মূযেহুল কুরআন' এ আছে– 'আল্লাহ তাআলা যাদের হেদায়েত দান করেন, তারা প্রথমেই সত্যকে শুনে ইনসাফের সঙ্গে কবূল করে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি প্রথমেই হঠকারিতা করল, সে নিদর্শনাদি দেখলেও কোন না কোন হিলা (বাহানা) বানিয়ে নেয়।'

৩. অর্থাৎ যদি ওদের ফরমায়েশ অনুযায়ী, আকাশ থেকে ফেরেশতা অবতরণ করে আপনার সমর্থন করে, মৃতরা কবর থেকে উঠে এসে ওদের সাথে কথা বলতে শুরু করে এবং ইতিপূর্বে অতিবাহিত সকল উম্মতকে পুনর্বার জীবিত করে এনে ওদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, তবুও নিজেদের একগুঁয়েমি ও শত্রুতার কারণে এই ফরমায়েশী মুজেযাগুলি দেখেও ওরা সত্য মানবে না।

১১২. এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়েছি[১] দুষ্ট মানুষ ও জিনদের, যারা একে অন্যকে সাজানো কথাবার্তা শেখায়- (লোকদের) ধোঁকা দেওয়ার জন্য। আর যদি আপনার রব চাইতেন, তবে ওরা এ কাজ করত না। অতএব আপনি ওদেরকে ওদের মিথ্যা নিয়েই থাকতে দিন[২]।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۭ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ۝

১১৩. এবং (সাজানো কথাবার্তা এ জন্যও শেখায়), যাতে আখেরাতে যাদের বিশ্বাস নেই, তাদের অন্তর তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তারা তা পছন্দও করে নেয় এবং যে অপকর্মে তারা লিপ্ত তা করে যায়[৩]।

وَلِتَصْغٰۤى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ۝

অবশ্য যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে জবরদস্তি করে মানাতে পারেন, কিন্তু এমন ইচ্ছা করা তাঁর হেকমত ও সৃষ্টি-জগতে কার্যকর নিয়মের পরিপন্থী। তবে ওদের অধিকাংশ লোক নিজেদের অজ্ঞতার কারণে এ বিষয় বোঝে না।

১. অর্থাৎ আমি শত্রু সৃষ্টি করে দিয়েছি।

২. সৃষ্টিজগতে কার্যকর আল্লাহ তাআলার নিয়ম ও পরিপূর্ণ হেকমতের দাবি এই যে, যতদিন বিশ্বের ব্যবস্থাপনা অক্ষুণ্ন রাখা তাঁর ইচ্ছা, তত দিন ভাল ও মন্দের শক্তিগুলির মধ্যে কোন শক্তিই যেন সম্পূর্ণ দুর্বল ও নিঃশেষ না হয়। এ জন্য নেকী ও বদী এবং হেদায়েত ও পথভ্রষ্টতার প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সংগ্রাম সর্বদাই চলে এসেছে। আজ এই মুশরিক ও অবাধ্য লোকগুলো যেভাবে আপনাকে অর্থহীন ফরমায়েশ দ্বারা উত্যক্ত করছে এবং বহু রকমের ফন্দি ও প্রতারণার দ্বারা লোকদেরকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে চাচ্ছে, ঠিক সেভাবে প্রত্যেক পয়গম্বরের পবিত্র উদ্দেশ্যকে (আল্লাহর সৃষ্টিকে হেদায়েত করা) অকৃতকার্য করার জন্য তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে শয়তানী শক্তিসমূহ কাজ করে গেছে। এই হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য মানুষ ও জিন উভয় সম্প্রদায়ের শয়তানেরা পরস্পর সহযোগিতা করে থাকে এবং একে অন্যকে মনগড়া, সাজানো, আপাতমধুর, মুখরোচক কথাবার্তা শিখিয়ে থাকে। আর এদের এই সাময়িক স্বাধীনতাটা সেই সার্বিক হেকমত ও সৃষ্টিসম্পর্কিত নীতির অধীন, যা আল্লাহ তাআলা গোটা সৃষ্টির মধ্যে নিহিত রেখেছেন।

এ জন্য আপনি (হে রাসূল!) আল্লাহর শত্রুদের ফেতনাবাজি ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণার কারণে বেশি চিন্তা-ভাবনায় পড়বেন না, (বরং) ওদের মিথ্যা ও অপবাদ উপেক্ষা করে ব্যাপারটা আল্লাহর সোপর্দ করে দিন।

৩. অর্থাৎ শয়তানেরা একে অন্যকে বানানো-সাজানো প্রতারণামূলক কথাবার্তা এ জন্য শেখায় যে, যারা দুনিয়ার জীবনে মেতে আছে এবং পরকালের জীবনে বিশ্বাস রাখে না, তারা যেন

১১৪. (আপনি বলুন,) 'তবে কি আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ফয়সালাকারী চাইব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন সুস্পষ্ট কিতাব?' আর যাদের আমি কিতাব দান করেছি তারা জানে, এ আপনার রবের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে নাযিলকৃত। অতএব আপনি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾

১১৫. আপনার রবের কথা সম্পূর্ণ সত্য ও ইনসাফপূর্ণ। তাঁর কথাগুলির কোন পরিবর্তনকারী নেই এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[১]।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾

১১৬. আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মান্য করেন, তবে ওরা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেবে। ওরা কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

উক্ত কথাবার্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং অন্তর দিয়ে তা পছন্দ করতে শুরু করে এবং যেন আর কখনো নিজেদের মন্দ কাজ এবং কুফর ও অবাধ্যতা থেকে ফিরে না আসে।

১. অর্থাৎ মানব ও জিন উভয় সম্প্রদায়ের শয়তানদের প্রবঞ্চনাকর ও সাজানো কথার প্রতি কান লাগাতে পারে একমাত্র বেঈমান ও জাহেলরাই। একজন পয়গম্বর বা তাঁর অনুসারীরা, যারা প্রত্যেক বিষয়ে এক খোদাকেই বিচারক মেনে নিয়েছে– তাদের দ্বারা এটা আদৌ সম্ভব নয় যে, তাঁরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কারো মুখরোচক কথাবার্তার প্রতি কান দেবে অথবা গাইরুল্লাহর ফয়সালার সামনে মাথা নত করে দেবে। কেননা তাঁদের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে এমন অলৌকিক ও পরিপূর্ণ কিতাব আগমন করেছে, যার মধ্যে সকল মৌলিক বিষয়ের জরুরী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বিদ্যমান রয়েছে।

এ কিতাব সম্পর্কে কিতাবীদের আলেমরাও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলির সুসংবাদের ভিত্তিতে ভাল করেই জানে যে, এটি নিশ্চিতরূপে আসমানী কিতাব, যার সকল সংবাদ সত্য এবং যার সমস্ত বিধান ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়সংগত। এতে কোনো পরিবর্তন ও বিকৃতি করার সাধ্য কারো নেই।

এমন কিতাব এবং সংরক্ষিত ও পরিপূর্ণ বিধানের বর্তমানে কোন মুসলমান কী করে ওয়াসওয়াসা ও ধারনা-কল্পনা অথবা বিভ্রান্তিকর প্রতারণার শিকার হতে পারে, যখন সে জানে যে, আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকটি কথা শুনছেন এবং প্রত্যেক ধরনের অবস্থা এবং তার উপযোগী আহকাম সম্পর্কে পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন।

وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ

ওরা কেবল অনুমানের ঘোড়া ছোটায়[১]।

১১৭. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

নিশ্চয় আপনার রবই ভাল জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত হয় এবং তিনিই বেশি জানেন পথপ্রাপ্তদের।

১১৮. فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ

অতএব তোমরা সেই পশু থেকে খাও যার উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, যদি তাঁর বিধি-বিধানের প্রতি তোমাদের ঈমান থাকে[২]।

---

১. অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস বলে যে, দুনিয়ায় সর্বদা বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও নীতিবান মানুষের সংখ্যা কমই রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদেরই থাকে যারা শুধু কাল্পনিক, অসার ও অনুমানভিত্তিক কথাবার্তার অনুসারী হয়। আপনি যদি এই সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের কথা মানতে শুরু করেন এবং অমূলক কথার উপর চলতে আরম্ভ করে দেন, তবে আল্লাহর প্রদর্শিত সরল পথ থেকে নিশ্চয়ই বিচ্যুত হয়ে যাবেন। –আয়াতে এ বিষয়টি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দিয়ে অন্যদের শোনানো উদ্দেশ্য।

মূর্খ লোকদের অমূলক, আনুমানিক কথাবার্তার মধ্যে একটি এই ছিল যে, যবেহকৃত জীব-জন্তুসম্পর্কিত (খোদায়ী) বিধানের প্রতি দোষারোপ করতে গিয়ে ওরা বলেছিল, যে জন্তু স্বাভাবিকভাবে মরে যায় (অর্থাৎ যবেহ করা ছাড়া), মুসলমানরা তাকে হারাম বলে; অথচ তা আল্লাহ মেরেছেন। আর যা তারা নিজেদের হাতে মারে তাকে হালাল মনে করে– এটি আশ্চর্যের বিষয়! তাদের এ কথার জওয়াব সম্মুখবর্তী আয়াতগুলিতে (১১৮-১২১) দেওয়া হয়েছে।

'মূযেহুল কুরআনে' হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) বলেন, 'এ আয়াত ক'টি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই ছিল যে, কাফেররা বলতে শুরু করল, 'মুসলমানরা নিজ হাতের মারা জন্তু খায়, অথচ আল্লাহর মারা জন্তু খায় না।' –এমন প্রতারণাপূর্ণ, সাজানো কথা মানুষকে সন্দেহের মধ্যে ফেলার জন্য শয়তান শিখিয়ে থাকে। ভালভাবে বুঝে নেওয়া উচিত, হালাল ও হারাম ইত্যাদি বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর হুকুম ক্রিয়াশীল। এখানে মানবীয় বিচার-বুদ্ধির কোন মূল্য নেই। সম্মুখে আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে, সকলকেই মারেন আল্লাহ, কিন্তু তার নামের মধ্যে বরকত রয়েছে— যা তাঁর নামে যবেহ হয়েছে তা হালাল, যা অন্যভাবে মরেছে তা মৃত।'

২. সঠিক দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও কুরআন করীমের সত্যতা স্বীকার করেছ এবং সামগ্রিকভাবে আল্লাহর আহকামের প্রতি ঈমান এনেছ, তখন শাখাগত ও ছোট-খাট বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করাও অবশ্যকর্তব্য। যদি প্রত্যেকটি মৌলিক ও শাখাগত বিষয় এবং সামগ্রিক ও ছোটখাট

১১৯. আর তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা সেই পশু থেকে খাও না, যার উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে? অথচ তিনি তোমাদের জন্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, কী কী (খাওয়া) তোমাদের জন্য হারাম– তবে যা খেতে তোমরা বাধ্য হয়ে পড় (তার কথা ভিন্ন)[১]। আর বহু লোক কোন জ্ঞান ছাড়া নিজেদের খেয়াল-খুশি মত (অন্যদের) বিভ্রান্ত করে বেড়ায়। নিশ্চয় আপনার রবই উত্তমরূপে জানেন সীমালঙ্ঘনকারীদের[২]।

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

১২০. তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সকল গোনাহ ছেড়ে দাও[৩]। যারা গোনাহ করে, শীঘ্রই

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ

ব্যাপার গ্রহণ করা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দাজ-অনুমানের উপরই নির্ভরশীল হয়, তবে আর ওহী ও নবুওয়াতের প্রয়োজন কিসের?

১. অর্থাৎ বাধ্য ও নিরুপায় হয়ে পড়লে ভিন্ন বিষয়; তা ছাড়া সাধারণ অবস্থায় যেসব বস্তু হারাম, তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে সেই হালাল জন্তুর কথা নেই, যা আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়। সুতরাং এ না খাওয়ার কী কারণ?

২. মুসলমানের আকীদা এই যে, সব কিছু সরাসরি বা পরোক্ষভাবে আল্লাহই সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহই মৃত্যু ঘটান। আর তাঁর সৃষ্ট বস্তু-সামগ্রীর মধ্যে যেমন দুই প্রকার– কোনটা খাওয়া আমাদের নিকট আকর্ষনীয় ও উপকারী, যেমন আপেল, আঙ্গুর ইত্যাদি, আর কোন কোনটা আমাদের নিকট ঘৃণ্য ও ক্ষতিকর, যেমন নাপাক, ময়লা দ্রব্য ও বিষাক্ত বস্তু ইত্যাদি।

ঠিক সেভাবে আল্লাহর মারা জীব-জন্তুও দুই প্রকার। এক, যেগুলো সুস্থ স্বভাবের মানুষের নিকট ঘৃণ্য; অথবা যেগুলো খাওয়া আমাদের দৈহিক বা রূহানী স্বাস্থ্যের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষতিকর– যেমন, সেই সব রক্তওয়ালা জন্তু, যেগুলো স্বাভাবিকভাবে যবেহ ছাড়া মারা যায় এবং সেগুলোর রক্ত ইত্যাদি গোশতের মধ্যে শোষিত হয়ে যায়। **দুই**, সেই সব হালাল ও পবিত্র জন্তু, যা নিয়মানুসারে আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়। এও আল্লাহরই মারা জন্তু– মুসলমানের ছুরির মাধ্যমে তিনি এর উপর মৃত্যু দান করলেন। কিন্তু যবেহ করার কারণে ও আল্লাহর নামের বরকতে এর গোশত পাক-পবিত্র হয়ে গেল।

সুতরাং যে ব্যক্তি এ উভয় প্রকারকে এক করতে চায়, সে সীমালঙ্ঘনকারী। আয়াতের শেষে এদের কথাই বলা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ কাফেরদের প্ররোচনায় প্রকাশ্যেও কোন আমল করো না, অন্তরেও কোন সন্দেহ রেখো না।

بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ۝

ওদেরকে ওদের কৃত গোনাহর কারণে শাস্তি দেওয়া হবে।

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓـئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ۝

১২১. আর সেই পশু থেকে খেয়ো না যার উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি[১], তা খাওয়া তো গোনাহ। নিশ্চয় শয়তানরা নিজ বন্ধুদের প্ররোচনা দেয়, যাতে ওরা তোমাদের সঙ্গে বিতর্ক করে। আর তোমরা যদি ওদের কথা মেনে নাও, তবে নিশ্চয়ই তোমরাও মুশরিক হয়ে গেলে[২]।

[রুকূ - ১৫]

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۝

১২২. আচ্ছা, যে ব্যক্তি ছিল মৃত, তারপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে দিয়েছি একটি আলো, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে– সে কি ঐ ব্যক্তির সমান হতে পারে, যার অবস্থা এই যে, সে অন্ধকারপুঞ্জে পতিত, তা থেকে সে বের হতে পারে না? এভাবেই কাফেরদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেওয়া হয়েছে ওদের কাজকর্ম[৩]।

---

১. অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই নাম নেয়নি। হানাফী আলেমগণের মত এই যে, কেউ ভুলে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করল না (কিন্তু তার অন্তরে আল্লাহর নাম আছে), তা হলে তা পরোক্ষভাবে নাম নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. অর্থাৎ শিরক শুধু গাইরুল্লাহর পূজা করাই নয়, বরং কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করার ব্যাপারে শরঈ দলীল-প্রমাণের পরিবর্তে কেবল মনগড়া মতামত ও খেয়াল-খুশীর অনুসারী হওয়াও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন– اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ আয়াতের তাফসীরে মারফূ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আহলে কিতাব আল্লাহর ওহী পরিত্যাগ করে কেবল 'আহবার' ও 'রুহবান' (অর্থাৎ ওদের ধর্মগুরু ও পণ্ডিতদের) উপরই হালাল ও হারাম সাব্যস্ত করার ক্ষমতা ন্যস্ত করেছিল। (কুরআন একেই শিরক সাব্যস্ত করেছে)

৩. পূর্বে বলা হয়েছে, শয়তানরা আপন বন্ধুদের প্ররোচিত করে, ওরা যেন মুসলমানদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক, বাদানুবাদ করে বরং তাদের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে ও ওয়াসওয়াসা দিয়ে তাদের সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে।

১২৩. এভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে পয়দা করেছি পাপীদের সরদারদের, যাতে ওরা সেখানে চক্রান্ত করতে থাকে। আর ওরা নিজেদেরই বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, কিন্তু ওরা উপলব্ধি করে না[১]।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

১২৪. আর যখন ওদের নিকট কোন নিদর্শন আসে, তখন বলে, 'আমরা কখনো ঈমান আনব না যতক্ষণ না আমাদের সে রকম বস্তু দেওয়া হবে যা আল্লাহর রাসূলদের দেওয়া হয়েছে।' আল্লাহই ভাল জানেন, তিনি নিজ পয়গাম কোথায় পাঠাবেন। শীঘ্রই পাপীদের উপর আল্লাহর কাছে আপতিত হবে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি– কারণ, ওরা চক্রান্ত করত[২]।

وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ۝

কিন্তু ওদের এহেন দুরভিসন্ধি সফল হবে না। কারণ, যে ব্যক্তি বা দল অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে ডুবে ছিল, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঈমান ও মারেফতের আলো দ্বারা জীবিত করেছেন এবং কুরআনের আলো দান করেছেন, যা নিয়ে তারা মানুষের সমাবেশে অনায়াসে সত্য পথে চলছে– তারা কি শয়তানী প্ররোচনা গ্রহণ করতে পারে? এবং তাদের অবস্থা কি শয়তানের সেই বন্ধুদের মত হতে পারে যারা অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, যা থেকে বের হওয়ার কোন পথ ওরা পাচ্ছে না? কখনই না।

১. অর্থাৎ শুধু বর্তমানের মক্কার সরদার-প্রধানরাই নয়, বরং সর্বযুগে কাফের-সরদাররা প্রতারণা-অপকৌশল করে গেছে, যাতে জনসাধারণ পয়গম্বরদের অনুগত না হতে পারে। যেমন, ফেরাওন (নবীর) মুজেযা দেখে চাতুরী করে বলল, মূসা যাদুর জোরে রাজত্ব নিতে চায়।

কিন্তু ওদের এ সকল প্রবঞ্চনা ও কলা-কৌশল আল্লাহর রহমতে পাক্কা ঈমানদারদের উপর কার্যকর হয় না, বরং প্রবঞ্চনাকারীরা নিজেদের পরিণাম নষ্ট করে নিজেদেরই ক্ষতি করে থাকে। কিন্তু এর অনুভূতি ওদের হয় না।

২. কাফের-সরদারদের প্রতারণা ও অপকৌশলের একটি উদাহরণ এই যে, ওরা যখন নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) এর সত্যতার কোন নিদর্শন দেখত, তখন বলত, আমরা এসব প্রমাণ ও নিদর্শন মানি না। আমরা তখন বিশ্বাস করতে পারি যখন আমাদের প্রতি ফেরেশতা নাযিল হবে এবং পয়গম্বরদের মত আমাদেরও খোদার পয়গাম শোনাবে অথবা স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যাবেন। যেমন এরশাদ হয়েছে : وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا

১২৫. যাকে আল্লাহ হেদায়াত দান করতে চান, তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য খুলে দেন, আর যাকে গোমরাহ করতে চান, তার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন– যেন সে জোর করে আকাশে আরোহন করছে[১]। এভাবেই আল্লাহ তাদের উপর শাস্তি আপতিত করেন যারা ঈমান আনে না[২]।

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ ۭ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٥﴾

يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ('যারা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে না, ওরা বলে, 'আমাদের প্রতি ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয় না কেন অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখি না কেন?' ওরা নিজেদের অন্তরে খুব অহংকার পোষণ করে এবং ওরা মারাত্মক অবাধ্যতায় (লিপ্ত হয়ে) সকল সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে।' –ফুরকান, আয়াত ২১)

যা হোক, এ তো খোদাই জানেন, কোন্ ব্যক্তি এর যোগ্য যে, তার উপর নবুওয়াতের দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায় এবং তিনি এই বিরাট খোদায়ী আমানতের পাত্র হতে পারেন। নবুওয়াত অর্জন করার বস্তু নয় যে, দো'য়া বা 'রিয়াজত' (সাধনা) অথবা পার্থিব পদ ও ধন ইত্যাদি দ্বারা হাসিল হতে পারে। আর যে কাউকে এমন বিরাট মর্যাদাপূর্ণ ও স্পর্শকাতর দায়িত্বে সমাসীন করা যেতে পারে না।

হাঁ, এসব উদ্ধত, গর্বিত ও কৌশলী প্রতারকের জানা থাকা উচিত যে, অচিরেই কঠোর অপমান ও কঠিন শাস্তিরূপে ওদেরকে এ সম্মানিত পদ চাওয়ার উচিত উত্তর দেওয়া হবে।

১. অর্থাৎ জোর খাটিয়ে আকাশে আরোহণ করতে চায়, কিন্তু আরোহণ করতে পারে না– এ জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণহৃদয় হয় এবং অসহায় বোধ করে।

২. যারা ঈমান আনার ইচ্ছা রাখে না, তাদের উপর এভাবে শাস্তি ও ধ্বংস পতিত করা হয় যে, ক্রমান্বয়ে তাদের বক্ষ সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়। তখন আর তাতে সত্য প্রবেশের মোটেই অবকাশ থাকে না। –বস্তুত বক্ষের এই সংকীর্ণতাই হচ্ছে শাস্তি, যা কিয়ামতের দিন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে সম্মুখে এসে যাবে।

বিজ্ঞ মুতারজিম (র) رجس শব্দের তরজমা করেছেন 'শাস্তি', সে অনুযায়ীই এ তফসীর করা হয়েছে। হযরত আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম رجس এর এ অর্থই করেছেন।

কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) এস্থলে رجس এর অর্থ করেছেন 'শয়তান'– কারণ, رجس বলে নাপাককে। শয়তান অপেক্ষা বড় নাপাক (অপবিত্র) আর কে হতে পারে? –যা হোক, (হযরত ইবনে আব্বাসের) এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতের মর্ম এই হবে যে, আল্লাহ তাআলা যেমন ঈমান থেকে পরাম্মুখীদের বক্ষ সংকীর্ণ করে দেন, তদ্রূপ বে-ঈমানীর

১২৬. এ আপনার রবের সরল পথ। নিশ্চয় আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি চিন্তাশীল লোকদের জন্য☆।

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ

১২৭. তাদেরই জন্য আপন রবের নিকট রয়েছে শান্তি-নিরাপত্তার ঘর এবং তিনি তাদের সাহায্যকারী, তারা যেসব আমল করত তার কারণে[১]।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

১২৮. যেদিন তিনি ওদের সকলকে সমবেত করবেন, (তিনি বলবেন,) 'হে জিনের দল! তোমরা মানবজাতির অনেককে পথভ্রষ্ট করেছিলে[২]। আর মানবজাতির মধ্যে ওদের বন্ধুরা বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদের

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا

কারণে ওদের উপর শয়তানকে চড়াও করে দেওয়া হয়, যাতে সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনের আর সামর্থ্য না থাকে।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) বলেন, '(আল্লাহ) ইতিপূর্বে (১০৯ নম্বর আয়াতে) বলেছিলেন যে, কাফেররা কসম করে বলে, আমরা নিদর্শন দেখলে অবশ্যই বিশ্বাস করব। এখন আল্লাহ বলছেন যে, 'আমি তাওফীক না দিলে ঈমান কেমন করে আনবে?' তাছাড়া নিজ জিদ না ছাড়া এবং প্রমাণ-নিদর্শন দেখেও হিলা-বাহানা করা– এ গোমরাহীরই লক্ষণ। পক্ষান্তরে, ইনসাফ করা ও হুকুম মান্য করা– হেদায়েতের লক্ষণ। তো, এই কাফেরদের মধ্যে গোমরাহীর লক্ষণাদি রয়েছে, ওদের উপর কোন নিদর্শনই আছর করবে না।'

রইল হেদায়েত ও গোমরাহীর ইচ্ছাকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা– এ সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে আমরা আলোচনা করেছি এবং সুযোগ মত আরো করব। তবে বিষয়টি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ও মত-পার্থক্যপূর্ণ হওয়ায় আমাদের ইচ্ছা– এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করে এই তফসীরের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'তাদের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ করে'।

১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম ও আনুগত্যের সরল পথে চলবে, সে-ই শান্তির ঘরে পৌছবে এবং আল্লাহ তার ওলী ও সাহায্যকারী হবেন।

এই অবস্থা তো তাদের, যাদের ওলী হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা (অর্থাৎ এটি أولياء الرحمن এর অবস্থা); সামনে أولياء الشيطان (তথা শয়তানের দোস্তদের) অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে।

২. অর্থাৎ হে জিন জাতির শয়তানেরা! তোমরা বহুসংখ্যক হতভাগা মানুষকে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলে এবং তোমাদের পথের অনুসারী করে নিয়েছিলে।

اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ

একে অন্যের দ্বারা উপকৃত হয়েছে এবং আমরা আমাদের সেই সময়ে উপনীত হয়েছি, যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন'[১]। আল্লাহ বলবেন, 'জাহান্নাম তোমাদের বাসস্থান, যার মধ্যে তোমরা চিরকাল থাকবে- তবে যখন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন[২]। নিশ্চয় আপনার রব প্রজ্ঞাবান, সম্যক অবহিত[৩]।

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

১২৯. আর এভাবেই আমি পাপীদের কতককে কতকের সঙ্গী বানাব, ওদের কৃতকর্মের কারণে[৪]।

---

১. দুনিয়াতে যারা মূর্তি ইত্যাদির পূজা করে থাকে, তা প্রকৃতপক্ষে খবীছ জিনদেরই (শয়তানদেরই) পূজা। ওরা জিনদের নামে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে শিন্নী ইত্যাদি দিয়ে থাকে যে, জিনরা ওদের উপকারে আসবে। তাছাড়া জাহেলী যুগের অনেক লোক দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার সময় জিনদের নিকট সাহায্য চাইত। যেমন: সূরা জিন-এ (আয়াত ৬) ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং ইবনে কাছীর প্রমুখ তাফসীরকার (এ মর্মে) হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন।

যখন আখেরাতে জিন ও মানুষের মধ্যকার শয়তানরা সমভাবে ধৃত হবে এবং সকল সত্য প্রকাশ পাবে, তখন অংশীবাদী লোকেরা ওযর-আপত্তি করে বলবে, হে আমাদের রব! আমরা পূজা করিনি, তবে পরস্পরের মধ্যে সাময়িকভাবে বন্ধুত্ব করেছিলাম এবং মৃত্যু আসার আগে-ভাগে পার্থিব কাজ-কর্মে আমরা একে অন্যের দ্বারা উপকৃত হয়েছিলাম, জিনদের উপাসনা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

২. 'তবে যখন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন'– এ জন্য বলা হয়েছে যে, তিনি ইচ্ছা করেছেন বলেই দোযখের আযাব অনন্তকাল হতে থাকবে। তিনি চাইলে মওকূফ করে দিতে সক্ষম, কিন্তু তিনি অনন্তকালের আযাবের ইচ্ছা করে ফেলেছেন এবং পয়গম্বরদের মুখে তার সংবাদ দেওয়া হয়েছে, এখন আর এর ব্যতিক্রম হবে না।

৩. অর্থাৎ তিনি পাপীদের পাপ সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত আছেন এবং পরিপূর্ণ হেকমতের সাথে প্রত্যেক পাপের সংগত শাস্তি দিয়ে থাকেন।

৪. তোমরা যেমন জিন জাতির শয়তানদের এবং তাদের মানববন্ধুদের অবস্থা শুনলে, তেমনি সমস্ত জালেম ও পাপীদেরকে আমি জুলুম ও পাপ অনুসারে দোযখে একে অন্যের নিকটবর্তী করে দেব এবং যে যেই শ্রেণীর জালেম ও পাপী হবে, তাকে তারই সমশ্রেণীর পাপীদের সাথে মিলিয়ে দেব।

[রুকূ - ১৬]

১৩০. (আমি ওদের বলব), 'হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি তোমাদেরই মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেননি, যাঁরা তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাতেন* এবং তোমাদের সতর্ক করতেন এ দিনের সাক্ষাত সম্বন্ধে?'[১] ওরা বলবে, 'আমরা

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى

★ দ্বিতীয় তরজমা– 'যারা তোমাদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করতেন'।

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

পূর্বে জিন ও মানুষের দুষ্কর্ম ও শাস্তির বর্ণনা ছিল। অধিকন্তু أولياء الجن অর্থাৎ জিনদের মানববন্ধু যারা, ওদের ওযর-আপত্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল। এখন বলা হচ্ছে, ওদের কোন ওযরই যুক্তিসংগত ও শোনার যোগ্য নয়। দুনিয়াতে আল্লাহর হুজ্জত (দলীল-প্রমাণ) সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, যার স্বীকারোক্তি স্বয়ং ওদেরও করতে হবে।

একটি সংশয়ের নিরসন

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ –এই সম্বোধন কিয়ামতের দিনে করা হবে এবং এর দ্বারা জিন ও মানুষ উভয় জাতিকে একত্রে সম্বোধন করা হবে। পৃথকভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে সম্বোধন করা হবে না। সুতরাং এখানে এই প্রশ্নই ওঠে না যে, রাসূল তো সর্বদা মানবজাতির মধ্য থেকে আগমন করেছেন– জিন জাতির মধ্য থেকে কোন পয়গম্বর আসেননি। অতএব মানুষের সাথে জিনদেরও رسل منكم (তোমাদেরই মধ্যকার রাসূল) বলা কীভাবে শুদ্ধ হল? সম্মিলিতভাবে যাদের সম্বোধন করা হচ্ছে, তাদের মধ্যকার কোন এক জাতির প্রতি যদি রাসূলের আগমন সাব্যস্ত হয়ে যায়– যার উদ্দেশ্য ছিল জাতি-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল সম্বোধিত ব্যক্তিদেরই উপকার পৌছানো, তবে সমষ্টির প্রতি এহেন সম্বোধনে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

যেমন ধরুন, কেউ যদি বলে, ' হে আরব ও অনারবের বাসিন্দারা! অথবা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা! তোমাদের মধ্য থেকে কি আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত পরিপূর্ণ মানুষকে সৃষ্টি করেননি?' তবে এই বাক্যের অর্থ কারো নিকটই এটা হতে পারে না যে, এক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো আরবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনারবে।

ঠিক এভাবে এখানেও বুঝতে হবে যে, يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ الخ বাক্যের অর্থ শুধু এতটুকু যে, জিন ও মানুষের সমষ্টি থেকে পয়গম্বরগণ প্রেরিত হয়েছেন। বাকী প্রত্যেক

نِجেদের বিরুদ্ধে (অপরাধ) স্বীকার করলাম।' আর পার্থিব জীবন ওদের ধোঁকায় ফেলেছিল[১] এবং ওরা নিজেদের বিরুদ্ধে এ কথা স্বীকার করবে যে, ওরা ছিল কাফের[২]।

أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كٰفِرِيْنَ۝

সম্প্রদায়ে পৃথক পৃথক পয়গম্বর আগমন করেছেন কি না, অথবা প্রত্যেক পয়গম্বর সমগ্র জিন ও মানব জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছেন কি না– বর্তমান আয়াত এ বিষয়ে নীরব।

কোন জিনকে স্বতন্ত্র নবী বানানো হয়নি

অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের আলোকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণের অভিমত এই যে, প্রত্যেক পয়গম্বরকে সকলের প্রতি প্রেরণ করা হয়নি এবং কোন জিনকেও আল্লাহ তাআলা স্বতন্ত্র নবী করে পাঠাননি, (বরং) পার্থিব ও আধ্যাত্মিক অধিকাংশ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা জিনদের মানবজাতির অধীন করে রেখেছেন। সূরা জিনের আয়াতসমূহ ও বহু হাদীস ইত্যাদি এর প্রমাণ বহন করে। আল্লাহর নিয়ম এই নয় যে, সৃষ্টির প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য সেই শ্রেণীরই কোন ব্যক্তিকে রাসূল হতে হবে।

অবশ্য কুরআনের বিভিন্ন স্থানে যে বলা হয়েছে, ফেরেশতা মানুষের জন্য রাসূল হতে পারে না– তার আসল কারণ এই যে, সাধারণ মানুষ আসল অবস্থায় ফেরেশতা-দর্শন সহ্য করতে পারে না এবং অত্যন্ত ভয়-ভীতির কারণে তাঁর থেকে উপকার লাভ করতে পারে না। আর ফেরেশতা মানব-আকৃতিতে প্রেরিত হলে অযথা জটিলতা, দ্বিধা-বিভ্রান্তি থেকে যায়। –এ থেকে এও বুঝে নিন যে, যদি জিন জাতির মধ্যে নবুওয়াতের দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা থাকত, তবুও তারা মানুষের জন্য প্রেরিত হতে পারত না। কেননা, তাতেও এ জটিলতা দেখা দিত।

হাঁ, জিনদের প্রতি মনুষ্য-রাসূল প্রেরণে অসুবিধা নেই। কারণ, জিনদের পক্ষে মানবদর্শন অসহনীয় নয় এবং মানুষের আকৃতিজনিত ভয়-ভীতিও তাদের জন্য উপকার লাভে বাধা হতে পারে না। এদিকে পয়গম্বরকে আল্লাহ তাআলা এমন আত্মিক শক্তি দান করে দেন যে, জিনদের মত ভয়ঙ্কর সৃষ্টির ভীতিও তাঁকে প্রভাবিত করে না।

১. অর্থাৎ দুনিয়ার আনন্দ-উপভোগ ও কামনা-বাসনা আখেরাত সম্পর্কে ওদের উদাসীন করে দিয়েছিল। কখনো চিন্তাও আসেনি যে, একদিন সেই মহাবিচারকের সামনে যেতে হবে, যিনি কড়ায়-ক্রান্তিতে সকল কিছুর হিসাব নেবেন।

২. এই সূরাতেই পূর্বে (আয়াত ২৩) উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা প্রথমে নিজেদের কুফরী অস্বীকার করবে। বর্তমান আয়াতের অর্থ হলো, পরে তারা তা স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

১৩১. তা (অর্থাৎ রাসূলদের প্রেরণ) এজন্য যে, আপনার রব জনপদসমূহকে অপরাধের কারণে এমতাবস্থায় ধ্বংস করেন না যে, তার অধিবাসীগণ বেখবর।

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ۝

১৩২. সকলের জন্য রয়েছে তাদের আমল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্তর এবং আপনার রব তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন[১]।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۭ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৩৩. আপনার রব অমুখাপেক্ষী, দয়ালু। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অপসারিত করে দেবেন এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, যেমন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন অন্য লোকদের সন্তানসন্ততি থেকে।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۭ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاۗءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۝

১৩৪. তোমাদের সাথে যে জিনিসের ওয়াদা করা হয়, তা অবশ্যই আসবে। আর তোমরা (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না[২]।

اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ম এই নয় যে, সাবধান ও অবহিত করা ছাড়া কাউকে তার জুলুম ও পাপের কারণে দুনিয়া বা আখেরাতে পাকড়াও ও ধ্বংস করে দেন। এ জন্যই তিনি রাসূল ও সতর্ককারী পাঠিয়েছেন, যাতে তারা অত্যন্ত পরিষ্কার করে সকল জিন ও মানুষকে তাদের ভাল-মন্দ এবং পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত করে দেন। অতঃপর যার যে রকম আমল হবে, তার সঙ্গে আল্লাহ তাআলা সেই রকম আচরণ করবেন।

২. আল্লাহ তাআলা রাসূল পাঠিয়ে তাঁর হুজ্জত (দলীল-প্রমাণ) পূর্ণ করে দিয়েছেন। এখন যদি তোমরা না মান এবং সরল পথে না চল, তবে তিনি অমুখাপেক্ষী– তাঁর তোমাদের কোন পরোয়া নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অনতিবিলম্বে অপসারিত করে নিজ রহমতে অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করে দিতে পারেন, যারা আল্লাহর অনুগত ও আজ্ঞাবহ হবে। আর তোমাদের অপসারিত করে অন্য জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়– আজ তোমরা তোমাদের যে পূর্বপুরুষদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছ, তাদের সরিয়ে আল্লাহই তোমাদের দুনিয়ায় স্থান দিয়েছেন।

যা হোক, আল্লাহর কাজ ব্যাহত হতে পারে না। তোমরা আনুগত্য না করলে অন্যদের খাড়া করে দেওয়া হবে। আর জেনে রাখ, এই অবাধ্যতা ও দুষ্কর্ম যদি চলতে থাকে, তবে আল্লাহর শাস্তি অটল। তোমরা যদি মনে কর যে, ভেগে গিয়ে অথবা কারো আশ্রয় নিয়ে

১৩৫. আপনি বলে দিন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব জায়গায় থেকে আমল করতে থাক, আমিও আমল করছি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কে লাভ করে দুনিয়ার (শুভ) পরিণাম। নিশ্চয় জালেমরা সফল হবে না'[১]।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

১৩৬. ওরা আল্লাহর জন্য তাঁরই সৃষ্ট ফসল ও গবাদি পশু থেকে এক অংশ নির্দিষ্ট করে, অতঃপর নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'এ অংশ আল্লাহর এবং এ অংশ আমাদের শরীকদের'। তো, যে অংশ ওদের শরীকদের তা তো আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, আর যা আল্লাহর তা ওদের শরীকদের কাছে পৌঁছে যায়। ওরা যে ফয়সালা করে তা কত নিকৃষ্ট[২]!

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে, তবে এ নিতান্তই বোকামি। সমগ্র সৃষ্টি একত্র হয়েও আল্লাহকে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নে অক্ষম করতে পারে না।

১. অর্থাৎ আমি সকল ভাল ও মন্দ এবং লাভ ও ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করেছি। এরপরও যদি তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত না হও, তবে তোমরাই দায়ী। তোমরা তোমাদের কাজ করে যাও, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। অচিরেই প্রকাশ পেয়ে যাবে– শেষ পরিণাম কার ভাল হয়? নিঃসন্দেহে জালেমদের পরিণাম ভাল হতে পারে না।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

সামনে ওদের কতিপয় বিশ্বাসগত ও কর্মগত (আমলী) জুলুমের কথা বর্ণিত হচ্ছে। ওদের মধ্যে এগুলোর প্রচলন ছিল। আর সব চেয়ে বড় জুলুম শিরক। যেমন এরশাদ হয়েছে : ان الشرك لظلم عظيم (নিশ্চয় শিরক করা ভয়াবহ জুলুম। –লুকমান, আয়াত ১৩)

২. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) বলেন, 'কাফেররা নিজ ফসল ও গবাদি পশুর বাচ্চা আল্লাহর জন্যও এবং দেবদেবীর জন্যও উৎসর্গ করত। অতঃপর কখনো যদি এমন হতো যে, আল্লাহর নামে মানত করা পশুটি বেশি ভাল, দেবদেবীর নামেরটা মন্দ– তবে রদবদল করে আল্লাহর নামেরটা দেবদেবীর জন্য উৎসর্গ করত; কিন্তু দেবদেবীর নামেরটা উত্তম হলে আল্লাহর দিকে দিত না। তদ্রূপ, শস্য-দানার মধ্যে দেবদেবীরটা ঘটনাক্রমে আল্লাহর অংশে মিশে গেলে তা পৃথক করে দেবদেবীর দিকে ফিরিয়ে দিত; কিন্তু আল্লাহর নামেরটি দেবদেবীর অংশে মিশে গেলে তা ফেরত দিত না। বাহানা এই করত যে, আল্লাহ

১৩৭. আর এভাবেই অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে ওদের শরীকরা আপন সন্তানদের হত্যাকে শোভন করে দিয়েছে, যাতে ওই শরীকরা মুশরিকদের ধ্বংস করে দিতে পারে এবং ওদের নিকট ওদের ধর্মকে ঘোলা (অস্পষ্ট) করে দিতে পারে[১]। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে ওরা এ কাজ করত না। অতএব আপনি ওদেরকে ওদের মিথ্যা নিয়েই থাকতে দিন[২]।

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ

তো ধনী, তাঁর কম হলে ক্ষতি কী, কিন্তু দেবদেবীর ব্যাপার ভিন্ন, তারা তো তেমন নয়। মজার ব্যাপার এই যে, তা সত্ত্বেও লজ্জা হত না যে, যারা এমন মুখাপেক্ষী, তাদেরকে উপাস্য ও সাহায্যস্থল সাব্যস্ত করা কোন্ বুদ্ধিমত্তার কাজ?

যা হোক, বর্তমান আয়াতে سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ বলে মুশরিকদের উক্ত বণ্টনের অসারতা ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ খোদার সৃষ্ট ফসল, গবাদি পশু ইত্যাদি থেকে তাঁর মোকাবেলায় গাইরুল্লাহর জন্য অংশ স্থির করা এবং মন্দ ও অসম্পূর্ণ বস্তুকে আল্লাহর জন্য রাখা ভয়াবহ জুলুম ও অবিচার!

১. (প্রখ্যাত তাফসীরকার) মুজাহিদ (র) এখানে شركاء এর তাফসীর করেছেন شياطين। মুশরিকদের চরম মূর্খতা ও নিষ্ঠুরতার একটি নমুনা এই যে, ওদের কেউ কেউ শ্বশুর হওয়ার ভয়ে আপন মেয়েকে এবং কেউ কেউ দারিদ্র্যের আশঙ্কায় নিজ সন্তানদের হত্যা করে ফেলত। কোন কোন সময় মানত করত যে, এতগুলি ছেলে হলে অথবা অমুক উদ্দেশ্য হাসিল হলে এক ছেলেকে অমুক দেবতার নামে বলী দেব। তদুপরি এই জুলুম ও নিষ্ঠুরতাকে ওরা অতি বড় উপাসনা ও নৈকট্য মনে করত। বস্তুত শয়তানরা ওদের বুঝিয়ে থাকবে যে, এ হচ্ছে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর সুন্নত (বা আদর্শ)। —ইহুদীদের মধ্যেও সন্তান হত্যার রীতি দীর্ঘদিন যাবৎ একটি ইবাদত ও নৈকট্য হিসাবে প্রচলিত ছিল, যার খণ্ডন করেছিলেন বনী ইসরাঈলের নবীগণ অত্যন্ত কঠোর ও জোরদারভাবে।

যা হোক, এ আয়াতে সন্তান হত্যার সেসব অবস্থাকে খণ্ডন করা হয়েছে, যা যাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল। আয়াতের অর্থ এই যে, শয়তানরা মুশরিকদের এ জন্য সন্তান হত্যার সবক দেয় এবং একে সুশোভিত করে থাকে, যাতে এভাবে ওদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে ধ্বংস ও সর্বস্বান্ত করতে পারে, এবং যে কাজটি হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের মিল্লাতের সম্পূর্ণ বিরোধী ও পরিপন্থী, তাকে একটি ধর্মীয় কাজ এবং নৈকট্য ও ইবাদত বলে বিশ্বাস করিয়ে ধর্মের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দিতে পারে। আল্লাহর পানাহ! কোথায় ইবরাহীম (আ) এর সুন্নত আর কোথায় এই মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা!

২. এ ধরনের আয়াত এই ৮ম পারারই শুরুতে (আয়াত ১১২) অতিক্রম হয়েছে। তার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

وَقَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

১৩৮. এবং ওরা স্বীয় ধারণা অনুযায়ী বলে, 'এগুলি নিষিদ্ধ গবাদি পশু ও ফসল; আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ছাড়া অন্য কেউ এসব খেতে পারবে না।' এবং কতক গবাদি পশু আছে, যার পৃষ্ঠে (আরোহন করাকে) হারাম করা হয়েছে এবং কতক গবাদি পশু আছে, যার উপর (অর্থাৎ যা যবেহ করার সময়) ওরা আল্লাহর নাম নেয় না। (ওরা এসব বলে) আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার জন্য। অচিরেই তিনি ওদেরকে অপবাদ আরোপ করার কারণে শাস্তি দেবেন[১]।

وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝

১৩৯. ওরা আরো বলে, 'এসব গবাদি পশুর গর্ভে যে (বাচ্চা) আছে, তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং তা আমাদের স্ত্রীদের জন্য হারাম। আর যদি তা মৃত হয়, তবে তাতে সকলেই অংশীদার। শীঘ্রই তিনি ওদেরকে ওদের এসব উক্তির শাস্তি দেবেন । নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান, সম্যক অবহিত[২]।

---

১. 'অপবাদ'– যেমন ওরা বলত, পুরুষরা খাবে, নারীরা খাবে না, অথবা যারা মন্দিরের পুরোহিত তারা খেতে পারবে।
এই শর্তাবলী ওরা নিজ খেয়াল-খুশী অনুযায়ী এমন গবাদি পশু ও ফসল সম্পর্কে আরোপ করে রেখেছিল, যা দেবদেবীর নামে উৎসর্গ করা হত। কতক জন্তুর পিঠে আরোহণ করা ও বোঝা বহন করাকে হারাম মনে করত। কতক জন্তু সম্পর্কে ওরা সাব্যস্ত করেছিল যে, এসব যবেহ করতে বা এতে আরোহণ করতে বা এ থেকে দুধ দোহন করতে আল্লাহর নাম নেওয়া যাবে না। কি জানি, এতে দেবদেবীর জিনিসে আল্লাহর অংশীদারী এসে যায় কিনা। –আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ওরা এসব ন্যাক্কারজনক কথা ও মূর্খতাকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত করত, যেন তিনিই (আল্লাহর পানাহ!) এসব বিধান দিয়েছেন এবং এ পথেই তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল করা যেতে পারে!! এহেন মিথ্যা ও অপবাদের শাস্তি ওদের অচিরেই পেতে হবে।

২. একটি রীতি এই ছিল যে, 'বাহীরা, ও 'সায়েবা' যবেহ করে যদি তার পেটে জীবিত বাচ্চা পাওয়া গেল তবে তা পুরুষেরা খাবে, মেয়েরা খেতে পারবে না। আর তা মৃত হলে সকলেই খেতে পারবে। এ রকম সনদহীন, মনগড়া রীতি-নীতি যারা তৈরি করে তাদের

১৪০. নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নির্বুদ্ধিতার কারণে অজ্ঞতাবশত নিজেদের সন্তানদের হত্যা করেছে এবং আল্লাহ ওদের যে রিযিক দিয়েছেন, আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে তা হারাম করে নিয়েছে। ওরা অবশ্যই গোমরাহ হয়েছে এবং ওরা পথপ্রাপ্ত হয়নি[১]।

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا ۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ؕ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿۱۴۰﴾

[রুকূ - ১৭]

১৪১. তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন এমনসব উদ্যান, যার কতক মাচার উপর চড়ানো হয় এবং কতক মাচার উপর চড়ানো হয় না[২]। এবং (সৃষ্টি করেছেন) খেজুর গাছ ও শস্য, যেসবের ফল বিভিন্ন রকম এবং যয়তুন ও আনার, যার একটি অন্যটির সদৃশ এবং অসদৃশও[৩]। তোমরা এসবের ফল থেকে খাও যখন তা ফলবান হয়। এবং এসবের হক আদায় কর তা কাটার দিন। আর অপচয় করো না, নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না[৪]।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۱۴۱﴾

সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন। তিনি নিজ হেকমত অনুযায়ী সঠিক সময়ে ওদেরকে সঠিক শাস্তি প্রদান করবেন।

১. এর চেয়ে মারাত্মক গোমরাহী ও সর্বনাশ আর কী হবে যে, ওরা অযথা-অকারণে দুনিয়াতে নিজেদের সন্তানাদি ও ধন-সম্পদ থেকে মাহরূম রইল এবং নিষ্ঠুর, চরিত্রহীন ও মূর্খ হিসেবে খ্যাত হল এবং আখেরাতের ভয়ঙ্কর শাস্তি মাথায় নিল। আকল-বুদ্ধিও কাজে খাটাল না, শরী'য়তকেও চিনল না। সুতরাং সরল পথে ওরা কেমন করে আসবে?

২. যেগুলি মাচার উপর চড়ানো হয়– যেমন, আঙ্গুর ইত্যাদি। যেগুলি চড়ানো হয় না– যেমন, খেজুর, আম ইত্যাদি কাণ্ডবিশিষ্ট গাছ, অথবা তরমুজ ইত্যাদি লতানো গাছ, যা কোন কিছুর উপর ভর ছাড়াই মাটির উপর ছড়িয়ে যায়।

৩. অর্থাৎ আকার-আকৃতিতে সদৃশ, স্বাদে ভিন্ন ভিন্ন।

৪. অর্থাৎ যেসব শস্য ও ফল আল্লাহ তাআলা পয়দা করেছেন, সেগুলি খাওয়া থেকে বিরত হয়ো না এবং বিনা দলীলে তা হারাম করো না। হাঁ, দুটি বিষয় খেয়াল রাখবে। এক, শস্য

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

১৪২. এবং গবাদি পশুর মধ্যে (সৃষ্টি করেছেন) কিছু ভারবহনকারী ও কিছু খর্বাকৃতির পশু[১]। আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন, তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু[২]।

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

১৪৩. (সৃষ্টি করেছেন) আটটি নর-মাদি: ভেড়ার দুটি[৩] এবং ছাগলের দুটি। আপনি জিজ্ঞাসা করুন, 'আল্লাহ কি নর দুটি হারাম করেছেন, না মাদি দুটি, না যে বাচ্চা মাদি দুটির গর্ভাশয়ে আছে তা?' তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও[৪]।

কাটার ও ফল পাড়ার সাথে সাথে ওতে আল্লাহর যে হক রয়েছে তা আদায় করে দাও। দ্বিতীয়, অযথা ও অপাত্রে তা ব্যয় করো না।

আল্লাহর হক বলতে এখানে কী অর্থ, তাতে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। ইবনে কাছীর (র) এর মত এই মনে হয় যে, প্রথমদিকে মক্কা শরীফে খেত-খামার ও বাগানে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্য থেকে কিছু অংশ গরীব-মিসকীনদের দেওয়া ওয়াজিব ছিল। آتوا حقه দ্বারা এ-ই উদ্দেশ্য। মদীনা শরীফে পৌছার পর দ্বিতীয় হিজরীতে বিস্তারিতভাবে তার পরিমাণ ইত্যাদি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, অর্থাৎ বৃষ্টির (পানিতে) উৎপন্ন দ্রব্যের এক দশমাংশ, যদি তা খেরাজী জমি না হয়। আর সেচের পানির জমিনে উৎপন্ন দ্রব্যের বিশ ভাগের এক ভাগ গরীব-মিসকীনকে দেওয়া ওয়াজিব।

১. ভারবহনকারী, যেমন উট ইত্যাদি; আর খর্বাকৃতির জন্তু, যেমন মেষ ও ছাগল।

২. আল্লাহর দেওয়া নে'য়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণের অর্থ– শরী'য়তসম্মত প্রমাণ ছাড়া তা হারাম করা অথবা শিরক ও মূর্তিপূজার মাধ্যম বানানো। শয়তানের বড় শত্রুতা এই যে, সে এসব নে'য়ামত থেকে তোমাদের দুনিয়াতে মাহরূম রাখল এবং আখেরাতের শাস্তি তো ভিন্ন আছেই।

৩. অর্থাৎ একটি নর, একটি মাদী– এভাবে প্রত্যেক শ্রেণীতে দু'টি করে হল এবং (ভেড়া, ছাগল, উট ও গরু –প্রত্যেকের দু'টি করে) মোট আটটি হল।

৪. অর্থাৎ কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম করা একমাত্র আল্লাহর কাজ। অতএব এসব পশু থেকে নর বা মাদীকে অথবা মাদীর পেটে যে বাচ্চা আছে তাকে যদি তোমরা সকল মানুষের বা কতক মানুষের পক্ষে হারাম বল, যেমনঃ পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে বর্ণিত

১৪৪. এবং (সৃষ্টি করেছেন) উটের দুটি ও গরুর দুটি। আপনি জিজ্ঞাসা করুন, 'তিনি কি নর দুটি হারাম করেছেন, না মাদি দুটি, না যে বাচ্চা মাদি দুটির গর্ভাশয়ে আছে তা?' তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছিলেন? সুতরাং ওর চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে কোন জ্ঞান ছাড়া মানুষকে গোমরাহ করার জন্য আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়াত দান করেন না[১]।

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾

[রুকূ - ১৮]

১৪৫. আপনি বলে দিন, 'আমার প্রতি যে ওহী পাঠানো হয়েছে, তাতে আমি এমন কোন জিনিস পাই না যা আহারকারীর জন্য

قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ

হয়েছে— তবে তার প্রমাণ তোমাদের নিকট কী আছে? যখন খোদায়ী হুকুম হওয়ার কোন প্রমাণ তোমাদের কাছে নেই, তখন শুধু নিজ খেয়াল-খুশী ও কামনা-বাসনার ভিত্তিতে আল্লাহর সৃষ্ট দ্রব্যাদিকে হালাল বা হারাম বলার অর্থ এই যে, (আল্লাহর পানাহ!) তোমরা খোদায়ী মর্যাদা নিজেদের জন্য সাব্যস্ত করছ অথবা জেনেশুনে তোমরা আল্লাহর প্রতি অপবাদ দিচ্ছ। আর এ উভয় বিষয়ই মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক বটে।

১. কোন বস্তু হালাল বা হারাম একমাত্র আল্লাহর হুকুমেই হতে পারে। আর আল্লাহর হুকুম হয় নবীদের মাধ্যমে পৌঁছে অথবা আল্লাহ তাআলা সরাসরি কাউকে জানালে সে জানতে পারে। –এখানে বলা হচ্ছে যে, মুশরিকদের ক্ষেত্রে এই উভয়টি অনুপস্থিত। نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ (তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বল) এর দ্বারা প্রথম সম্ভাবনার অনুপস্থিতি এবং أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ الخ (তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন আল্লাহ তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছিলেন?) এর দ্বারা দ্বিতীয়টির অনুপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। অতএব মুশরিকদের কাছে অপবাদ আরোপ ও গোমরাহ করা ছাড়া আর কী অবশিষ্ট রইল? নিঃসন্দেহে তার চেয়ে বড় জালেম কেউই হতে পারে না, যে খোদার প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং ইলম থেকে শূন্যহস্ত হওয়া সত্ত্বেও বাতিল ও ভুল কথা বলে লোকদের গোমরাহ করে বেড়ায়। আর যে ব্যক্তি এরূপ ধৃষ্টতা দেখাল এবং এত বড় জুলুম করতে উদ্যত হল, তার হেদায়েতের আশা করা যায় না।

دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

হারাম, যে তা আহার করে। কিন্তু তা যদি হয় মৃত জন্তু বা প্রবাহিত রক্ত কিংবা শূকরের গোশত (তবে ভিন্ন কথা), কেননা তা অপবিত্র। অথবা (তা যদি হয়) হারাম পশু, যার উপর (অর্থাৎ যা যবেহ করার সময়) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। এখন কেউ যদি (ক্ষুধায়) নিরুপায় হয়ে যায়– আর সে নাফরমান ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তবে আপনার রব তো বড়ই ক্ষমাশীল, অতি মেহেরবান[১]।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۚ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝

১৪৬. আর ইহুদীদের জন্য আমি প্রত্যেক নখযুক্ত জন্তু হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগল থেকে তাদের জন্য হারাম করেছিলাম এদের চর্বি। তবে সেই চর্বি নয়, যা লেগে থাকে এদের পিঠে বা নাড়িভুঁড়িতে অথবা যা সংযুক্ত থাকে হাড়ের সাথে। এ শাস্তি আমি ওদের দিয়েছিলাম ওদের অবাধ্যতার কারণে। আর নিশ্চয় আমি সত্যবাদী[২]।

---

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) বলেন, 'আয়াতের মর্ম এই যে, যেসব জন্তু খাওয়ার প্রচলন রয়েছে সেসবের মধ্যে এগুলোই হারাম।' (আর এসব ব্যতীত আরো যে সকল পশু হারাম, তা তো খাওয়ার প্রচলনই ছিল না। সে জন্য তা উল্লেখ করা হয়নি। –অনুবাদক)

বর্তমান আয়াতে কাফেরদের এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, ইতিপূর্বে (আয়াত ১৩৬ ও ১৩৮-১৪০ এবং ১৪৩-১৪৪) যে জিনিসগুলির উল্লেখ হয়েছে সেগুলি হালাল ছিল, কিন্তু তোমরা সেগুলিকে হারাম করেছ। এখন সেই সব জিনিসের কথা বলা হচ্ছে, যেগুলো প্রকৃতই হারাম কিন্তু তোমরা সেগুলিকে হালাল মনে করছ।

আয়াতের অন্যান্য বিষয়ের ব্যাখ্যা ও তাফসীর সূরা মায়েদার (আয়াত ৩) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ এর অধীনে দ্রষ্টব্য।

২. অর্থাৎ আসল হারাম তো হচ্ছে সেসব জিনিস, যা উল্লেখ করা হল। অবশ্য পূর্বকালে যুগের হিতার্থে কোন কোন জিনিস সাময়িকভাবে কোন কোন জাতির জন্য হারাম করা হয়েছিল। যেমন, দুষ্কৃতির শাস্তিরূপে ইহুদীদের জন্য প্রত্যেক নখ (ক্ষুর) বিশিষ্ট জন্তু, যার আঙ্গুলগুলো

১৪৭. তারপরও যদি ওরা আপনাকে অস্বীকার করে তবে আপনি বলে দিন, 'তোমাদের রব অতি ব্যাপক দয়ার মালিক, আর অপরাধী লোকদের থেকে তাঁর শাস্তি টলানো যাবে না'[১]।

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

১৪৮. অচিরেই মুশরিকরা বলবে, 'যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে আমরা ও আমাদের বাপদাদারা শির্‌ক করতাম না এবং আমরা কোন জিনিস হারামও করতাম না।' এভাবেই ওদের পূর্ববর্তীরা (নবীদের) অস্বীকার করেছিল, অবশেষে ওরা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। আপনি বলুন, 'তোমাদের নিকট কি কোন ইলম আছে যে, আমাদের সামনে তা প্রকাশ করতে পার? তোমরা তো কেবল ধারণার অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমানই কর।'

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۭ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَأْسَنَا ۭ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ۭ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ۝

১৪৯. আপনি বলে দিন, 'পরিপূর্ণ যুক্তি-প্রমাণ কেবল আল্লাহরই আছে। অতএব তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের সকলকে হেদায়াত দান করতেন'[২]।

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

বিচ্ছিন্ন নয়– যেমন উট, উটপাখি, হাঁস ইত্যাদি, হারাম করা হয়েছিল। তেমনি গরু-ছাগলের যে চর্বি পিঠ বা নাড়িভুঁড়ির সঙ্গে জড়িত নয় অথবা হাড়ের সঙ্গে মিশ্রিত নয়, তা ওদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছিল– যেমন, গুর্দার চর্বি।

বনী ইসরাঈলের এ দাবি মিথ্যা যে, এসব জিনিস হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত নূহ (আ)-এর আমল থেকেই বরাবর হারাম চলে আসছে। সত্য কথা এই যে, এগুলির মধ্যে কোন জিনিসই ইবরাহীম (আ)-এর কালে হারাম ছিল না, ইহুদীদের নাফরমানী ও দুষ্কৃতির কারণে এসব হারাম হয়। যে কেউ এর ব্যতিক্রম দাবি করবে, সে মিথ্যাবাদী। যেমন, ৪র্থ পারার শুরুতে قُلْ فَأْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ আয়াতে (আলে ইমরান ৯৩) এই দাবিদারদের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

১. অর্থাৎ আল্লাহর দয়ার ব্যাপকতার কারণে তোমরা এখনো বেঁচে আছ। নতুবা মনে করো না যে, আযাব উঠে গেছে।

২. পূর্ববর্তী রুকূতে মুশরিকদের বলা হয়েছিল যে, তোমরা যেসব বৈধ ও পবিত্র জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করে নিয়েছ এবং সেই হারামকরণকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত করছ, তার

দলীল ও প্রমাণ আন। এর জবাবে ওরা যে প্রমাণ পেশ করত, বর্তমান আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এই হারামকরণ থেকে বরং সকল শিরকী কর্ম ও কথা থেকে বিরত রাখতে পারতেন। সে ক্ষমতা তো তাঁর ছিল। যেহেতু তিনি বিরত রাখেননি এবং এ রকমই চলতে দিয়েছেন, সুতরাং প্রমাণিত হল যে, তাঁর নিকট আমাদের এসব কর্মই পছন্দ! অপছন্দনীয় হলে তিনি তা করতে দেবেন কেন?

উক্ত প্রমাণের অসারতা

অথচ বোঝার বিষয় এই যে, একটি বিজ্ঞ সরকার সরকারবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীকে প্রথম দিনেই ধরে ফাঁসি দিয়ে দেয় না। বরং সরকার তার কর্মকাণ্ডের প্রতি লক্ষ রাখে, কখনো রীতি-নীতি সঠিক করতে উপদেশ দেয় এবং সুযোগ দান করে, যেন এহেন কর্মকাণ্ডের পরিণাম চিন্তা করে নিজেই সতর্ক হয়ে যায়। আবার কখনো সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তাকে ঢিল দিয়ে দেয়, যাতে তার বিদ্রোহের উপকরণাদি বাড়তে থাকে, তারপর তার চরম বিশ্বাসঘাতকতা আইনগত দিক থেকে সর্বসমক্ষে প্রমাণিত হয়ে যায়। –এরূপ অবস্থায় অপরাধকারীর লাগাম ঢিল দেওয়া এবং সাথে সাথে শাস্তি না দেওয়া কি এটাই প্রমাণ করে যে, সরকারের দৃষ্টিতে এসব কর্ম অপরাধ ও বিদ্রোহ নয়? সরকারের দৃষ্টিতে এ কর্মকাণ্ড যে অপরাধ, তা তো তার প্রকাশিত আইন-কানুন থেকেই সুস্পষ্ট। দ্বিতীয়ত, অবকাশের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর যখন এই অপরাধীকে আদালতের কাঠগড়ায় আনা হবে এবং দস্তুর মত অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর সে ফাঁসি বা আজীবন কারাদণ্ডের শাস্তি ভোগ করবে, তখন চর্মচোখেই দেখা যাবে যে, সরকারের দৃষ্টিতে এসব কত বড় অপরাধ ছিল।

যা হোক, জানা ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন কল্যাণ বিবেচনায় কোন অপরাধের তাৎক্ষণিক শাস্তি জারী না করায় প্রমাণিত হয় না যে, সরকার অপরাধকে অপরাধ মনে করে না। এ থেকেই বুঝে নিন যে, মহাবিচারক আল্লাহ তাআলা মানব সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর সত্যবাদী ও পবিত্রাত্মা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে সর্বপ্রকার আইন-কানুন ও হুকুম-আহকাম সম্পর্কে বান্দাদের অবহিত করেছেন এবং অতি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কোন্ বিষয় তার নিকট পছন্দ এবং কোন্টা অপছন্দ। কখনো বিরতিহীনভাবে এবং কখনো অল্প অল্প বিরতি দিয়ে এ আহকাম ও হেদায়েতগুলি পুনর্বার স্মরণও করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে অমান্যকারীদের প্রতি একটা সময় পর্যন্ত উদারতা প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে সময় সময় কিছু কিছু সতর্কও করা হয়েছে। আর যারা ছিল চরম দুর্ভাগা, ওদের ঢিল দেওয়া হয়েছে, যাতে ওরা প্রকাশ্যভাবে নিজেদেরকে আল্লাহর চরম শাস্তির যোগ্য সাব্যস্ত করে নেয়। সে মত বহু জাতি নিজেদের অপরাধসমূহের প্রতিফল কিছু কিছু দুনিয়াতেই ভোগ করেছে। –অতএব কোন জাতি যদি অপরাধ-অপকর্মে লিপ্ত হয় আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের উপর আযাব না আসে, তাহলে এর দ্বারা এই প্রমাণ পেশ করা যায় না যে, সেই অপরাধগুলি আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়!!

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

বাকী থাকল এই প্রশ্ন যে, আল্লাহ তাআলা প্রথম থেকে মানুষের গঠন-প্রকৃতিকেই কেন এমন তৈরি করলেন না, যাতে সে আদৌ মন্দের প্রতি অগ্রসর হতে না পারে এবং সৃষ্টিগতভাবেই সে নেকী ও ভালাই ছাড়া আর কিছু অবলম্বন না করতে পারে?— গভীরভাবে চিন্তা করলে এই প্রশ্নের অর্থ এই হয় যে, মানুষকে কেন এমন পয়দা করা হল না, যাতে সে মানুষই না থাকত? হয় সে একেবারে বোধশক্তি ও অনুভূতিহীন এবং ইচ্ছা ও ইখতিয়ারশূন্য ইট-পাথরের মত হয়ে যেত। অথবা আংশিক ইচ্ছা ও অনুভূতিশীল পশু-গরু-গাধার মত হত, যা সর্বদা নিজেদের ধরাবাঁধা কাজকর্ম ও হাল-অবস্থার সীমারেখার মধ্যে ঘুরতে থাকে। –অথবা তাকে খুব মর্যাদা দান করে ফেরেশতাদের কাতারে বসিয়ে দেওয়া হত, যাঁরা শুধু আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগী করতেই বাধ্য ও সে জন্যই সৃষ্ট। মোদ্দাকথা, বিপুল জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা-অনুভূতির ধারক এবং বিরাট ইচ্ছা ও কর্মশক্তিসম্পন্ন এই উন্নত জীবটিকেই (মানুষ) যদি ধরাপৃষ্ঠে আনা না হত!

আমি মনে করি, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষই এমনটা চাইতে পারে না।

আর যদি দুনিয়াতে মানবজাতির অস্তিত্ব স্ব রূপে অর্থাৎ ইখতিয়ার ও ইচ্ছার স্বাধীনতাসহ জরুরী হয়, তাহলে এই স্বাধীনতার ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া মেনে নেওয়া জরুরী। আর তা এই যে, দুনিয়াতে মানুষ ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের কাজ করতে পারবে। সুতরাং কোন কাজ সংঘটিত হতে পারাটাই এর প্রমাণ নয় যে, তা আল্লাহর পছন্দনীয়! দেখুন– দুনিয়াতে বিভিন্ন ও বিপরীতমুখী কাজ-কর্ম সংঘটিত হয়। এখন যদি সংঘটিত হতে পারাই আল্লাহর পছন্দনীয় হওয়ার প্রমাণ হয়, তাহলে বলতে হবে যে– ঈমান আনাও তাঁর পছন্দনীয়, না আনাও! তাওহীদও পছন্দনীয়, শিরকও! সদ্ব্যবহারও তার পছন্দ, অসদ্ব্যবহারও!! নিঃসন্দেহে এ বাতিল।

এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, মুশরিকদের কথা– لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكْنَا الخ নিতান্তই অসার ও অযৌক্তিক। আসলে ওদের নিকট এমন কোন ইলমী (জ্ঞানজ্ঞত) উসূল ও মূলনীতি নেই, যা ওরা জ্ঞানীদের সম্মুখে পেশ করতে পারে। যা আছে তা কেবল আন্দাজ-অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা, যা আল্লাহর অকাট্য হুজ্জতের (দলীল-প্রমাণের) সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হয়ে যায়।

فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِيْنَ (অতএব তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের সকলকে হেদায়েত দান করতেন), অর্থাৎ মানুষের ফিতরত (প্রকৃতি) এমন বানানো হয়নি যে, সকলেই হেদায়েতের পথ অনুসরণ করবে। আল্লাহ তাআলা তো তাকে ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের স্বাধীনতা দান করেছেন। আর এই স্বাধীনতার ব্যবহারকালে পথ বিভিন্ন হওয়াই অবশ্যম্ভাবী– কেউ সৎপথ অবলম্বন করবে, কেউ অসৎ পথ; কেউ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও রহমতের প্রকাশস্থল হবে, কেউ অসন্তুষ্টির। এভাবে জগতসৃষ্টি দ্বারা আল্লাহ যে চূড়ান্ত এরাদা করেছেন, তা পূর্ণ হবে। لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করে দেখেন যে, তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম।)

১৫০. আপনি বলুন, 'তোমরা নিজেদের সাক্ষী নিয়ে আস যারা এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ এসব (জিনিস) হারাম করেছেন'। যদি ওরা সাক্ষ্য দেয়ও, তবুও আপনি ওদের সাথে সাক্ষ্য দেবেন না এবং সেসব লোকের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না যারা আমার বিধি-বিধানকে অস্বীকার করেছে এবং যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, আর ওরা আপন রবের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে[১]।

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝

বি.দ্র.

এ পর্যন্ত যা কিছু আমরা বললাম, তা এই ভিত্তিতে যে, لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا দ্বারা মুশরিকদের উদ্দেশ্য হল, নিজেদের শিরক, কুফর ও কুকর্মের বৈধতা প্রমাণ করা। –আর যদি উল্লিখিত উক্তি দ্বারা ওদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে শুধু ওযর প্রদর্শন, অর্থাৎ যা কিছু আল্লাহর ইচ্ছা, তা-ই তিনি আমাদের দ্বারা করান। ভাল হোক বা মন্দ হোক, উভয়ই তাঁর ইচ্ছায় হয়ে থাকে, সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নবী ও রাসূলগণ কেন আমাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন?

এর উত্তর এই যে, যেই আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা এসব গর্হিত ক্রিয়া-কর্ম করছ, তাঁরই ইচ্ছায় নবী ও রাসূলগণ তোমাদের বাধা দিচ্ছেন। আর আল্লাহর ইচ্ছাই তোমাদের দুষ্কৃতির সমীচীন শাস্তি পাঠিয়ে থাকে। যেভাবে আল্লাহর কুদরত সাপ সৃষ্টি করেছে এবং এই কুদরতই দংশিত ব্যক্তির মাঝে ধ্বংসের ক্রিয়া করে থাকে– তদ্রূপ তোমাদের শিরক ও কুফরের মধ্যে চিরস্থায়ী ধ্বংসের আর ঈমান ও সৎকর্মের মধ্যে চিরকালীন মুক্তির ক্রিয়া রেখে দেওয়াও সেই আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছারই প্রতিফল– আর এই কুদরতই সমস্ত কার্যকারণ ও ঘটনাবলি সৃষ্টির উৎস।

সুতরাং তোমরা যদি নিজেদের শিরকী রীতি-নীতি থেকে বিরত না হওয়ার পক্ষে আল্লাহর ইচ্ছা দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে পার, তবে নবী-রাসূল প্রেরণ ও শাস্তির অবতারণ ইত্যাদিকেও তাঁর ইচ্ছারই প্রতিফলন মনে কর। অবশ্য আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে সত্য পথের অনুসারী করে দিতে পারতেন, কিন্তু তোমাদের অযোগ্যতার কারণেই তিনি এমন ইচ্ছা করেননি।

১. অর্থাৎ دليل عقلي তথা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণের অবস্থা উপরে জানা গেল। এখন যদি তোমাদের নিকট উক্ত মনগড়া হারামকরণের পক্ষে কোন (دليل نقلي) তথা ধর্মীয় প্রমাণ থাকে, তবে তা পেশ কর। আছে কি তোমাদের নিকট এমনসব সাক্ষী, যারা সাক্ষ্য দেবে যে, তাদের সম্মুখে আল্লাহ তাআলা এসব জিনিস হারাম করেছিলেন? বলা বাহুল্য, এমন সাক্ষী কেমন করে পাওয়া যেতে পারে? যদি দুই চারজন ধৃষ্ট, মিথ্যাবাদী, নির্লজ্জ লোক এ

[রুকূ - ১৯]

১৫১. আপনি বলুন, 'আস, আমি (তোমাদের) তা পড়ে শোনাই যা তোমাদের রব তোমাদের জন্য হারাম করেছেন: (তা এই) যে, 'তোমরা তাঁর সঙ্গে কোন কিছু শরীক করো না, পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, দারিদ্র্যের কারণে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করো না, আমি তোমাদের ও তাদের রিযিক দান করি[১]। এবং নির্লজ্জ কাজকর্মের কাছেও যেয়ো না– তন্মধ্যে যা প্রকাশ্য এবং যা গোপন (কোনটির কাছেই না)[২]। আর

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ

সাক্ষ্যই দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়, তবে এমন লোকদের কথার প্রতি কান দেবেন না এবং ওদের কামনা-বাসনারও কোন পরোয়া করবেন না।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

এ পর্যন্ত সেসব জিনিসের বর্ণনা দেওয়া হল, যা মুশরিকরা কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশি মত হারাম সাব্যস্ত করে রেখেছিল। সম্মুখে সেই সব জিনিস বর্ণিত হচ্ছে, যা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন এবং যা সর্বদাই হারাম, কিন্তু মুশরিকরা সেসবে লিপ্ত আছে!!

১. আরবরা দারিদ্র্যের কারণে কোন কোন সময় সন্তান হত্যা করে ফেলত। ওরা ভাবত, নিজেদেরই খাবার নেই সন্তানকে খাওয়াব কোথা থেকে? এ জন্যই বলা হয়েছে, রিযিকদাতা তো আল্লাহই, যিনি তোমাদেরও এবং তোমাদের সন্তানদেরও খাওয়ান।

কুরআনের অন্যত্র من إملاق এর স্থলে خشية إملاق বলা হয়েছে– (বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩১)। অর্থাৎ দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করে ফেলত। এটা তাদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকবে, যারা বর্তমানে দরিদ্র নয় কিন্তু এই আশঙ্কা করে যে, যখন সন্তানাদি বেশি হবে তখন খাওয়াব কোথা থেকে?

(উক্ত দুই দলের) প্রথম দল যেহেতু সন্তানাদির পূর্বে নিজ রুটির চিন্তায় পীড়িত ছিল, আর দ্বিতীয় দল সন্তানদের চিন্তায় অস্থির ছিল, সম্ভবত এ জন্যই বর্তমান আয়াতে من إملاق এর সাথে نرزقكم وإيّاهم আর ঐ আয়াতে خشية إملاق এর সাথে نرزقهم وإيّاكم এরশাদ করেছেন।

২. 'কাছে যেয়ো না' বলে সম্ভবত উদ্দেশ্য এই যে, যা দ্বারা এমন কাজকামের সূচনা হয় এবং যা কিছু এসবের মাধ্যম হয়, তা থেকেও বাঁচা উচিত। যেমন, ব্যভিচারের মতই কুনজর থেকেও বেঁচে থাকা জরুরী।

সেই প্রাণকে হত্যা করো না যার হত্যা আল্লাহ হারাম করেছেন, তবে যথাযথ কারণে (হত্যা করলে ভিন্ন কথা)[১]।' এ নির্দেশ তিনি তোমাদের দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুধাবন কর[২]।

اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ۝

১৫২. 'আর এতীমের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো না, তবে শুধু এমন পন্থায় (যেতে পারবে) যা উত্তম– যে পর্যন্ত সে পরিপক্ক বয়সে না পৌঁছে[৩]। এবং মাপ ও ওজন ইনসাফের সাথে পূর্ণ করে দাও। আমি কারো উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না[৪]। আর যখন কথা বল, ন্যায্য কথা বল, যদিও সে (অর্থাৎ কথা যার বিষয়ে) আত্মীয়ই হোক[৫]; এবং আল্লাহর (সঙ্গে কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ কর[৬]। এ নির্দেশ তিনি তোমাদের দিয়েছেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۝

---

১. إلا بالحق দ্বারা ব্যতিক্রমের ক্ষেত্র উল্লেখ করা হয়েছে। স্বেচ্ছায় হত্যাকারী, বিবাহিত ব্যভিচারী ও ইসলাম পরিত্যাগকারীর হত্যা এই ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। সহীহ হাদীসে এসবের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে এবং মুজতাহিদ ইমামগণ এ বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন।

২. বর্তমান আয়াত দ্বারা নিম্ন বিষয়গুলোর হারাম হওয়া প্রমাণিত হল : (১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, (২) পিতামাতার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করা, (৩) সন্তান হত্যা করা, (৪) ব্যভিচার ইত্যাদির মত সকল অশ্লীল কাজ এবং (৫) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা।

৩. এতীমের সম্পদ অযথা খরচ করা হারাম। অবশ্য এতীমের অভিভাবক সতর্কতার সাথে, উত্তম ও শরীয়তসম্মতভাবে তার সম্পদ খরচ করতে পারে। এতীম যখন যৌবনপ্রাপ্ত হয় এবং নিজ দায়-দায়িত্ব সামলাতে পারে, তখন তার ধন-সম্পদ তার দায়িত্বে দিয়ে দেবে।

৪. অর্থাৎ নিজ সাধ্যমত এই হুকুমগুলি পালনে সচেষ্ট থাক। তোমরা এতটুকু করতেই 'মুকাল্লাফ' বা বাধ্য। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতীত কিছু করতে বাধ্য করেন না।

৫. অর্থাৎ হক ও ইনসাফের কথা বলতে কারো আত্মীয়তা ও ভালবাসা বাধা হওয়া উচিত নয়।

৬. অর্থাৎ তাঁর হুকুম-আহকাম ও আদেশ-নিষেধ পূর্ণভাবে মেনে চলবে। তদ্রূপ আল্লাহর নামে যে মানত বা কসম কর, তা শরী'য়তবিরুদ্ধ না হলে পূর্ণ করবে।

১৫৩. এবং এই (নির্দেশ দিয়েছেন) যে, এটা আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এর অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না, তা হলে সেগুলো তোমাদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে[১]। এ নির্দেশ তিনি তোমাদের দিয়েছেন, যাতে তোমরা (গোমরাহীর পথ থেকে) বেঁচে থাক।

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪. অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম– প্রত্যেক সেই ব্যক্তির প্রতি (নে'য়ামত) পূর্ণ করার জন্য, যে সৎকর্ম করে, এবং প্রত্যেক জিনিসের বিস্তারিত বিবরণের জন্য এবং হেদায়াত ও রহমতের জন্য, যাতে তারা স্বীয় রবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈমান আনে[২]।

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٤﴾

[রুকূ - ২০]

১৫৫. আর এটি এমন এক কিতাব, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, যা বরকতময়। অতএব এর অনুসরণ কর এবং (আল্লাহকে) ভয় করতে থাক, যাতে তোমাদের প্রতি

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٥٥﴾

---

১. অর্থাৎ উল্লিখিত হুকুমগুলি পালন করা এবং আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা– এ-ই হচ্চে صراط مستقيم (সরল পথ)। সূরা ফাতেহার মধ্যে এরই প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তোমাদের এ পথ দেখিয়ে দেওয়া হল– এখন অনুসরণ করা তোমাদের কাজ। যে কেউ এ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করল, সে খোদার পথ থেকে বিচ্যুত হল।

২. (এ আয়াত দ্বারা) বোঝা যায় যে, (১৫১-১৫২) আয়াতে যেসব হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলি সর্বদা প্রচলিত ছিল। সেগুলি সম্পর্কে সকল নবী ও শরী'য়তের ঐক্যমত ছিল। –অতঃপর আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত অবতীর্ণ করলেন, যার মধ্যে শরী'য়তের আহকাম আরো সবিস্তারে লিপিবদ্ধ ছিল। তাওরাত প্রদান করে সেই যমানার সৎকর্মশীলদের প্রতি আল্লাহ স্বীয় নে'য়ামত পূর্ণ করে দিলেন, বিশদ ব্যাখ্যাসহ প্রত্যেক জরুরী বিষয় বয়ান করে দিলেন এবং হেদায়েত ও রহমতের দ্বারসমূহ খুলে দিলেন– যাতে তা উপলব্ধি করে লোকেরা এ মর্মে পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করে যে, তাদেরকে স্বীয় রবের কাছে যেতে হবে।

মেহেরবানী করা হয়[১];

১৫৬. (তা এজন্য অবতীর্ণ করেছি), যাতে তোমরা এ কথা না বল যে, 'কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্ববর্তী দুটি সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ করা হয়েছিল; আর আমরা তাদের পঠন-পাঠন সম্পর্কে বেখবরই ছিলাম'[২]।

اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۖ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ۝

১. অর্থাৎ তাওরাত তো যেমন ছিল– ছিলই, কিন্তু এটি (কুরআন করীম) হচ্ছে সেই কিতাব, যা স্বীয় উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট সৌন্দর্যসহ তোমাদের সম্মুখে রয়েছে। এর সৌন্দর্য-মাধুর্য ও পরিপূর্ণতা সম্পর্কে কী বলব! آفتاب آمد دلیل آفتاب (সূর্যের প্রমাণ সূর্য নিজেই)। কুরআনের প্রকাশ্য ও আভ্যন্তরীণ বরকত-মহিমা এবং বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত গুণ-গরিমা লক্ষ করে স্বতঃই বলতে হয় :

بہار عالم حسنش دل وجاں تازہ میدارد
برنگ اِصحاب صورت رابہ بو ار باب معنیٰ را

"কুরআনের বসন্ত-সৌন্দর্য মন ও প্রাণ সঞ্জীবিত করে, তার রূপ-রস সৌন্দর্য-ভক্তদের পুলকিত করে এবং তার সুরভি মননশীলদের মোহিত করে।"

এখন আর এদিক- সেদিক দেখার প্রয়োজন নেই। যদি আল্লাহর রহমতের পেয়ালা পান করতে চাও, তবে এ আখেরী ও পরিপূর্ণ কিতাবের অনুসরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যেন এ কিতাবের কোন অংশেরই অবাধ্যতা না হতে পারে।

২. অর্থাৎ এই বরকতময় কিতাব (কুরআন করীম) নাযিল হওয়ার পর আরব-নিরক্ষরদের জন্য এ কথা বলার আর সুযোগ থাকেনি যে, পূর্বে যে সকল আসমানী কিতাব আল্লাহর বিধান নিয়ে অবতরণ করেছিল, তা তো দু'টিমাত্র সম্প্রদায় (ইহুদী ও খ্রিস্টান) এর প্রতি এসেছিল। তারা নিজেদের মধ্যে তা পড়ত ও পড়াত এবং কেউ কেউ, যেমন ওরাকা বিন নওফাল প্রমুখ, আরবীতে তার তরজমাও করতেন, কিন্তু তাদের শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক ছিল না।

ইহুদী ও খ্রিস্টানরা যা কিছুর পঠন-পাঠন করত, তা কতদূর অক্ষত-অবিকৃত ছিল এস্থলে তা আলোচ্য নয়। শুধু এতটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, সেই শরী'য়ত ও কিতাব কেবল বনী ইসরাঈলের প্রতি তাদেরই খাস ফায়দার জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং তার পঠন-পাঠনের সঙ্গে যদি অন্যান্য জাতি, বিশেষত আরবদের মত মর্যাদাবোধসম্পন্ন ও বৈশিষ্ট্যধারী জাতির কোন সম্পর্ক না হয়, তবে তা মোটেই অস্বভাবিক নয়। –এ কারণেই কুরআন অবতীর্ণ না হলে তারা বলতে পারত যে, আমাদের প্রতি কোন আসমানী কিতাব ও শরী'য়ত আসেনি। আর যা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য এসেছিল, তার সঙ্গে আমাদের কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং তা পরিহারের জন্য আমরা ধৃত হব কেন?

১৫৭. অথবা এ কথা বলতে না পার যে, 'যদি আমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হত, তবে আমরা অবশ্যই তাদের চেয়ে সুপথের অধিক অনুসারী হতাম।' সুতরাং তোমাদের নিকট তো তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়াত ও রহমত এসে গেছে[১]। অতএব ওর চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, শীঘ্রই আমি তাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দেব– তারা মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে[২]।

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ أَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِأٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ أٰيٰتِنَا سُوٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮. ওরা কি কেবল এরই প্রতীক্ষা করছে যে, ওদের নিকট ফেরেশতারা আসবে অথবা আপনার রব আসবেন অথবা আসবে আপনার রবের কোন নিদর্শন? যেদিন আপনার রবের কোন নির্দশন আসবে,

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ أٰيٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ أٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ

কিন্তু এখন আর ওদের জন্য এমন হিলা-বাহানার সুযোগ রইল না। আল্লাহর প্রমাণ, তাঁর উজ্জ্বল কিতাব এবং সার্বিক হেদায়েত ও রহমতের বিশেষ বারিধারা ওদের ঘরে ঘরে বর্ষিত হয়েছে, যাতে সর্বাগ্রে ওরা এর দ্বারা উপকৃত হয় এবং পরবর্তীতে আল্লাহর এই আমানতকে সতর্কতার সাথে সাদা-কালো, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্বিশেষে সমগ্র মানবগোষ্ঠী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, এ কিতাব কোন বিশেষ জাতি ও দেশের জন্য অবতীর্ণ করা হয়নি– সমগ্র বিশ্ববাসীই এর সম্বোধন-পাত্র। সে মত আল্লাহর দয়া ও তাওফীকে আরবদের মাধ্যমে তাঁর এই বিশ্বজনীন ও সর্বশেষ পয়গাম আজ বিশ্বের কোনায় কোনায় পৌঁছে গেছে।

১. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা শুনে হয়ত তোমাদের আকাঙ্ক্ষা হত এবং অন্তরে উৎসাহ জাগত যে, আমাদের নিকট যদি আল্লাহর কিতাব আসত, তবে আমরা অন্যদের চেয়ে বেশি আমল করে দেখাতাম। সেজন্য ওদের চেয়ে উত্তম কিতাব তোমাদের দেওয়া হয়েছে। এখন দেখা যাবে, কে কেমন আমল করে দেখায়!

২. এখন এমন অতুলনীয় উজ্জ্বল কিতাব আগমনের পর যদি কেউ আল্লাহর আয়াতগুলিকে মিথ্যা বলে এবং তাঁর আহকাম কবুল করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় বা অন্যদের বারণ করে, তবে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে?

বি. দ্র. صدف عنها এর দুই অর্থ সালাফ থেকে বর্ণিত আছে –১. বাধা দেওয়া ২. মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। শাইখুল হিন্দ (র) দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন।

نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۝	সেদিন সেই ব্যক্তির ঈমান-আনয়ন তার উপকারে আসবে না, যে পূর্বে ঈমান আনেনি অথবা যে নিজ ঈমানে কোন পুণ্য অর্জন করেনি। আপনি বলে দিন, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করছি'[১]।

১. অর্থাৎ আল্লাহর দিক থেকে হেদায়েতের যে সীমা ছিল, তা পূর্ণ হয়ে গেছে। নবীগণ তশরীফ এনেছেন ও শরী'য়তসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। সকল আসমানী কিতাব এসেছে, এমন কি আল্লাহর সর্বশেষ কিতাবও এসে গেছে। তাতেও যদি ওরা না মানে, তবে এখন ওরা যেন এর অপেক্ষা করছে যে, আল্লাহ নিজে আসবেন অথবা ফেরেশতাগণ আসবেন অথবা কুদরতের কোন বিরাট নিদর্শন (যেমন কিয়ামতের কোন বড় আলামত) প্রকাশ পাবে। –যদি তা-ই হয়, তাহলে স্মরণ রাখবে, কিয়ামতের নিদর্শনাদির মধ্যে একটি নিদর্শন এমন, যা প্রকাশ পাওয়ার পর না কাফেরের ঈমান গ্রহণ করা হবে, না গোনাহগারের তওবা।

সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহ

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসসমূহে রয়েছে, এই নিদর্শনটি হচ্ছে পশ্চিম থেকে সূর্যোদয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৬৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৫৭) অর্থাৎ যখন আল্লাহর ইচ্ছা হবে দুনিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটানো এবং বিশ্বের বর্তমান ব্যবস্থাপনা ধ্বংস করে দেওয়া, তখন বর্তমান প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের বিপরীত অনেক বড় বড় দুর্ঘটনা সংঘটিত হবে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, সূর্য পূর্বদিকের স্থলে পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবে।

এর দ্বারা সম্ভবত এই দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য হবে যে, কুদরতের যে নিয়ম-নীতি ও প্রাকৃতিক আইন-কানুন বিশ্বের বর্তমান ব্যবস্থাপনার মধ্যে কার্যকর ছিল, তার আয়ু শেষ হওয়ার এবং সৌরজগতের নিয়মে উলট-পালট হওয়ার সময় এসে গেছে। অর্থাৎ তখন থেকে মহাবিশ্বের অন্তিম সময় আরম্ভ হচ্ছে। এবং যেভাবে 'আলমে সগীর' অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুর সময় ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় নয়; কেননা, তা বাস্তবে এখতেয়ারী (স্বতঃস্ফূর্ত) হয় না, তেমনি পশ্চিম থেকে সূর্যোদয়ের পর সমগ্র জগতের পক্ষে এই হুকুম হবে যে, কারো ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় হবে না।

কোন কোন হাদীসে পশ্চিম থেকে সূর্যোদয় ছাড়া আরও কিছু নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে, যেমন দাজ্জালের আবির্ভাব ও এক বিশেষ প্রকার জন্তুর আবির্ভাব ইত্যাদি। এই হাদীসসমূহের অর্থ সম্ভবত এই যে, যখন এই নিদর্শনগুলির সবগুলি প্রকাশ পেয়ে যাবে– যার মধ্যে পশ্চিম থেকে সূর্যোদয়ও রয়েছে- তখন তওবার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

সংশয় নিরসন

বর্তমান কালের মুলহিদ ও বেদীন লোকদের মধ্যে যারা যে কোন অস্বাভাবিক ঘটনাকে রূপক অর্থে নিতে অভ্যস্ত, তারা পশ্চিম থেকে সূর্যোদয়কেও রূপকের রঙে রঞ্জিত করার ফিকিরে আছে! সম্ভবত তাদের নিকট কিয়ামতের আগমনও এক ধরনের রূপক হিসাবেই পরিগণিত!!

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. যারা নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করেছে এবং বহু দলে বিভক্ত হয়েছে, ওদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। ওদের বিষয় আল্লাহরই কাছে ন্যস্ত। অতঃপর তিনিই ওদের জানিয়ে দেবেন যা কিছু ওরা করত[১]।

বি. দ্র. এই যে বলা হয়েছে, 'ফেরেশতাগণ আসবেন অথবা আপনার প্রভু আসবেন'– এর তাফসীর (বাকারা, আয়াত ২১০) هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام এর অধীনে গত হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

আর لم تكن آمنت من قبل -এর উপর عطف হয়েছে– أو كسبت في إيمانها خيرا বাক্যটি এবং ইবনুল মুনীর প্রমুখ তাফসীরকারের নিকট এখানে মূল পাঠ এরূপ : لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمنت مِنْ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَكُنْ كسبت فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا أَوْ كَسْبُهَا خَيْرًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি, তখন তার ঈমান উপকারী হবে না এবং যে ব্যক্তি পূর্বে নেকি অর্জন করেনি তার নেকী অর্জন উপকারী হবে না। (অর্থাৎ তওবা কবূল হবে না)।

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

পূর্বের রুকূতে ১৫১- ১৫২ আয়াতদ্বয়ে বিবিধ হুকুম বয়ান করার পর এরশাদ হয়েছিল– وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ অর্থাৎ সিরাতে মুসতাকীম (সরল পথ) চিরকাল ধরে অভিন্ন রয়েছে, তা থেকে সরে গেলে গোমরাহীর রাস্তা অনেক। সকল নবী ও রাসূল মৌলিকভাবে সেই একই পথে চলেছেন এবং মানুষকে সে দিকেই ডেকেছেন। সূরা শূরায় (আয়াত ১৩) আছে- شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ (তিনি তোমাদের জন্য দীনের ক্ষেত্রে তা-ই নির্ধারণ করেছেন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন নূহকে এবং যার নির্দেশ আমি পাঠিয়েছি আপনার প্রতি এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে– তা এই যে, তোমরা দীন কায়েম কর এবং তাতে মতভেদ সৃষ্টি করো না।)

দীনের মৌলিক বিষয়াদিতে তাঁদের মধ্যে পরস্পর কোন পার্থক্য নেই। কাল, স্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভেদে শরী'য়তের শাখা বিষয়াদিতে যে তারতম্য হয়েছে, তা বিভেদ নয়, বরং প্রত্যেক যুগের উপযোগী রঙে একই ও অভিন্ন উদ্দেশ্য হাসিলের উপায়-উপকরণ মাত্র। পূর্ববর্তী নবীগণ যে দীন নিয়ে এসেছিলেন, মূসা আলাইহিস সালামের কিতাব তার বিরোধিতার জন্য নয়, বরং তার পূর্ণতা সাধন ও বিশদ ব্যাখ্যা দানের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করা হয়। সর্বশেষে কুরআনের আগমন হল, যা পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের পূর্ণতা সাধনকারী, সমর্থনকারী ও সেগুলির উলূম ও মাআরেফের (জ্ঞানমালার) সংরক্ষণকারী।

এসব কিতাব ও শরী'য়ত থেকে যারা বিমুখ হবে, মাঝে তাদের পরিণতি বর্ণনার পর বর্তমান আয়াত إن الذين فرقوا دينهم থেকে পুনরায় আসল বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর সরল পথ (সিরাতে মুসতাকীম) এক। যারা দীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে বিভিন্ন পথ বের করে এবং ফের্কাবাজির অভিশাপে লিপ্ত হয়, তারা ইহুদী হোক

১৬০. যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, তার জন্য রয়েছে তার দশগুণ (ছওয়াব)। আর যে কেউ মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, তাকে তার সমপরিমাণ শাস্তিই দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না[১]।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

১৬১. আপনি বলে দিন, 'নিশ্চয় আমার রব আমাকে সরলপথ প্রদর্শন করেছেন, যা বিশুদ্ধ ধর্ম, ইবরাহীমের দীন, যিনি ছিলেন (আল্লাহতে) একনিষ্ঠ[২] এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না'[৩]।

قُلْ اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

বা খ্রিস্টান অথবা ইসলামের সেই দাবিদাররা হোক, যারা ভবিষ্যতে ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের চাদর ফেড়ে টুকরা টুকরা করবে— এদের কারও সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। এরা সকলেই فتفرق بكم عن سبيله (তা হলে সেগুলো তোমাদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে) এর অন্তর্ভুক্ত। আপনি ওদের প্রতি অসন্তুষ্টি ও নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করে খোদার একক রাস্তা (صراط مستقيم) এর উপর দৃঢ় থাকুন এবং ওদের পরিণতি আল্লাহর নিকট সোপর্দ করুন।

তিনি দুনিয়া বা আখেরাতে ওদের জানিয়ে দেবেন, দীনের ব্যাপারে ওরা কী কী কুকীর্তি করত!

فرقوادينهم -এর ব্যাখ্যায় হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব বলেন– যেসব বিষয় আকীদাসম্পর্কিত, তাতে মতবিরোধ করতে নেই। আর যেগুলো কর্মগত তথা শাখা বিষয়াদি, তাতে মত বিভিন্ন হলে দোষ নেই।

১. ثُمّ ينبئهم بما كانوا يفعلون এর মধ্যে অন্যায়-অপকর্মের প্রতিফল সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল। এ আয়াতে প্রত্যেক নেক কাজ ও মন্দ কাজের প্রতিদান-বিষয়ে সাধারণ নীতি বলে দেওয়া হল যে, সৎকর্মের প্রতিদান কমপক্ষে দশগুণ এবং অসৎকর্মের প্রতিফল বেশির চেয়ে বেশি তার সমান। অর্থাৎ যে ব্যক্তি একটি নেকী করল, সে কমপক্ষে দশটি ছওয়াব পাবে। বেশির কোন সীমা নেই। والله يُضاعف لمن يشاء (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন।) পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ করল, সে ঐ কাজের যে পরিমাণ শাস্তি নির্ধারিত আছে তা পাবে। এর অধিক আল্লাহ দেবেন না। হালকা করে দেওয়া বা একেবারে ক্ষমা করে দেওয়া– এ তাঁর এখতিয়ার। আর যখন তাঁর অবারিত রহমতের এই অবস্থা, তখন তাঁর পক্ষ থেকে জুলুম বা অবিচারের সম্ভাবনা কোথায়?

২. حنيفًا -অর্থাৎ এক আল্লাহরই প্রতি নিবেদিত ছিলেন।

৩. অর্থাৎ তোমরা ধর্মের মধ্যে যত ইচ্ছা পথ বের কর এবং যত সংখ্যক ইচ্ছা মা'বূদ স্থির কর। কিন্তু আমাকে তো আমার রব সিরাতে মুসতাকীম বাতলিয়ে দিয়েছেন। তা-ই খাঁটি তাওহীদ

১৬২. আপনি বলুন, 'আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহরই জন্য, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক–

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۶۲﴾

১৬৩. তাঁর কোন শরীক নেই[১]। এরই আদেশ আমাকে করা হয়েছে এবং আমিই সর্বাগ্রে (অথবা : সর্বপ্রথম) আনুগত্যকারী[২]।

لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۱۶۳﴾

১৬৪. আপনি বলুন, 'আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো রব অন্বেষণ করব? অথচ তিনি প্রত্যেক বস্তুর রব[৩]। আর প্রত্যেক (গোনাহগার) ব্যক্তি নিজ দায়িত্বেই গোনাহ করে (অর্থাৎ তার গোনাহ,

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ

ও পূর্ণ তাফবীয (বা আত্মসমর্পণ) ও তাওয়াক্কুলের রাস্তা, যা নবীদের পিতা, সর্বশ্রেষ্ঠ তাওহীদবাদী ইবরাহীম খলীলুল্লাহ অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অনুসরণ করেছেন।

১. এ আয়াতের মধ্যে তাওহীদ ও তাফবীজ (আত্মসমর্পন)এর সর্বোচ্চ মাকামের সন্ধান দেওয়া হয়েছে, যার উপর আমাদের সর্দার ও মনিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আর নামায ও কুরবানীর উল্লেখ বিশেষভাবে করার দ্বারা মুশরিকরা যে গাইরুল্লাহর জন্য শারীরিক ইবাদত ও কুরবানী করতই স্পষ্টভাবে তার খণ্ডন হয়ে গেল।

২. সাধারণত তাফসীরকারগণ وأنا أوّل الْمُسلمين এর এই অর্থ করে থাকেন যে, এই উম্মতে মুহাম্মদিয়ার মধ্যে তিনি أوّل الْمُسلمين (সর্বপ্রথম মুসলমান)। কিন্তু তিরমিযী শরীফের হাদীস অনুযায়ী– كُنْت نبيا وآدم بين الروح والجسد (আমি তখন নবী ছিলাম, যখন আদম ছিলেন দেহ ও রূহের মাঝামাঝি), (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩৯৩৬; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২০৫৯৬) অর্থাৎ হুযূর (সা.) সর্বপ্রথম নবী। সুতরাং তাঁর সামগ্রিকভাবেই أوّل الْمُسلمين হওয়ার মধ্যে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না।

তা ছাড়া এ সম্ভাবনাও আছে যে, এখানে কালের দিক থেকে নয়, বরং মর্যাদার দিক থেকে প্রথম হওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আমি সারা বিশ্বের ফরমাবরদারদের সারিতে প্রথম নম্বরে ও সকলের আগে রয়েছি। সম্ভবত বিজ্ঞ মুতারজিম (র) سب سے پہلا فرماں بردار ہوں ('সর্বপ্রথম আজ্ঞাবহ') এর স্থলে سب سے پہلے فرماں بردار ہوں ('সর্বাগ্রে আজ্ঞাবহ') বলে এ দিকেই ইশারা করেছেন। কেননা, এই প্রকাশভঙ্গি মর্যাদায় 'অগ্রবর্তী' হওয়াকে বেশি প্রকাশ করে।

৩. পূর্বে توحيد في الألوهية -এর উল্লেখ ছিল। এখন توحيد في الربوبية -এর বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া যেমন কোন মা'বূদ (উপাস্য) নেই, তেমনি তিনি ছাড়া আর কেউ সাহায্য-প্রার্থনার স্থলও হতে পারে না। কেননা সাহায্য-প্রার্থনার স্থল তিনিই হতে পারেন, যিনি সকলের রব। আর সবার রব তো তিনিই।

مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ﴿١٦٤﴾

তার উপরেই বর্তাবে)। এবং কোন বোঝা-বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। অবশেষে তোমাদের সকলকে তোমাদের রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের সেসব বিষয়ে অবহিত করবেন যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে[১]।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰىكُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴿١٦٥﴾

১৬৫. আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন[২] এবং তোমাদের কতকের মর্যাদা কতকের উপর উন্নীত করেছেন[৩], যাতে তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন। নিশ্চয় আপনার রব দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, অতি মেহেরবান[৪]।

---

১. কাফেররা মুসলমানদের সঙ্গে তাওহীদ প্রভৃতি বিষয়ে বিবাদ করত ও বলত, তোমরা তাওহীদের পথ ছেড়ে আমাদের পথে এসে পড়, এতে কোন গোনাহ হলে তা আমাদের উপর বর্তাবে। সূরা আনকাবূতে (আয়াত ১২-এ) এরশাদ হচ্ছে– وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم (কাফেররা ঈমানদারদের বলে থাকে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের গোনাহ বহন করব।) –এখানে তার উত্তর দেওয়া হচ্ছে যে, প্রত্যেকের গোনাহ তারই মাথায় বর্তে– কোনো ব্যক্তি অন্যের পাপের ভার বহন করতে পারে না। বাকী আল্লাহর কাছে যাওয়ার পর তোমাদের কলহ-বিবাদ ও মতভেদের মীমাংসা হয়ে যাবে। এই দুনিয়া মীমাংসার স্থল নয়, বরং পরীক্ষা ও যাচাই এর ঘর, যেমন সামনের আয়াতে আল্লাহ তাআলা অবহিত করেছেন।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে তোমাদের স্বীয় প্রতিনিধি বানিয়েছেন, এ (পরীক্ষার) জন্য যে, তোমরা তাঁর প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কী রকম আচরণ কর। অথবা অর্থ এই যে, তোমাদের পরস্পরকে একে অন্যের প্রতিনিধি বানিয়েছেন, যাতে এক জাতির প্রস্থানের পর অপর জাতি তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

৩. অর্থাৎ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদাসমূহের অনেক পার্থক্য রেখেছেন। যেমন আকার-আকৃতি, রূপ-সৌন্দর্য, কণ্ঠ, স্বর, স্বভাব-চরিত্র, মেধা-বুদ্ধি, দোষ-ত্রুটি, রিযক, সম্পদ, সম্মান, প্রভাব ইত্যাদিতে মানুষের অসংখ্য স্তর রয়েছে।

৪. لِيَبْلُوَكُمْ فِيْمَآ اٰتٰىكُمْ — অর্থাৎ যাতে প্রকাশ পেয়ে যায় যে, উক্ত সকল অবস্থায় কোন্ ব্যক্তি কতটুকু খোদার হুকুম মেনে চলে।

প্রখ্যাত তাফসীরকার ইবনে কাছীর (র) এর মতে فيما آتاكم –এর দ্বারা উদ্দেশ্য সেই সব বিভিন্ন অবস্থা ও স্তর, যেগুলি মানুষের মধ্যে রয়েছে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে পরীক্ষার সারাসার এই হবে যে, (উদাহরণস্বরূপ) ধনী ধনাঢ্য অবস্থায় থেকে কতটুকু শোকর করে এবং দরিদ্র দারিদ্র্যাবস্থায় কতদূর সবরের প্রমাণ পেশ করে। এভাবে (অন্যদের অবস্থা) বুঝে নিন।

যা হোক, এই পরীক্ষায় যে ব্যক্তি একেবারে অযোগ্য প্রমাণিত হবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য سريع العقاب এবং যার দ্বারা কিছু ত্রুটি হয়ে যাবে, তার পক্ষে তিনি غفور এবং যে ব্যক্তি পূর্ণ সফলকাম হবে তার জন্য তিনি رحيم (পরম দয়ালু)।

সূরা আ'রাফ

سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৭ । ২০৬ আয়াত । ২৪ রুকূ । মক্কী

اٰيَاتُهَا ٢٠٦، رُكُوْعَاتُهَا ٢٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

الٓمّٓصٓ ①

১. আলিফ, লা-ম, মী-ম, সোয়া-দ।

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ②

২. (এ) এক কিতাব, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে- অতএব তা পৌছে দিতে আপনার মনে যেন কোন সংকীর্ণতা সৃষ্টি না হয়[১]- যাতে আপনি তার মাধ্যমে সতর্ক করেন এবং তা নসীহত হয় ঈমানদারদের জন্য[২]।

---

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) حرج শব্দের তাফসীর করেছেন 'সন্দেহ'। এ অর্থে فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ আয়াতাংশটি فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ এর সমার্থক হবে। অর্থাৎ -যে পয়গম্বরের প্রতি আল্লাহ তাআলা স্বীয় কিতাব নাযিল করেছেন, তাঁর শান এমন হতে পারে না যে, তাঁর অন্তরে সেই কিতাবের আহকাম ও খবরাদি সম্পর্কে সামান্যও খটকা বা দ্বিধা-সন্দেহ উদয় হবে।

অন্যান্য মুফাসসির শব্দটির জাহেরী অর্থ গ্রহণ করেছেন, যেমনটি বিজ্ঞ মুতারজিমও (র) অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ -সমগ্র সৃষ্টির মধ্য থেকে বাছাই করে যাঁর প্রতি আল্লাহ নিজ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তাঁর পক্ষে নির্বোধ ও অবাধ্যদের উপহাস বা বেহুদা প্রশ্নাদিতে প্রভাবিত হয়ে এই কিতাবের কোন অংশের প্রচার বা প্রসারে সংকুচিত ও কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। সূরা 'হূদ' এর দ্বিতীয় রুকূতে (আয়াত ১২) আছে- فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ (এমন কি হতে পারে যে, আপনি তার কোন অংশ ছেড়ে বসবেন যা আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং তাতে আপনার মন সংকুচিত হবে, এ জন্য যে ওরা বলে, 'তাঁর প্রতি ধন-ভাণ্ডার অবতীর্ণ হল না কেন অথবা তাঁর সঙ্গে ফেরেশতা আসল না কেন?')

অসম্ভব হলেও ধরা যাক, যদি স্বয়ং পয়গম্বরের অন্তরই কিতাব ও এর ভবিষ্যত সম্পর্কে পরিপূর্ণ আস্থাশীল না হয়, তবে তিনি সতর্ক করা ও উৎসাহ প্রদানের দায়িত্ব ভালভাবে আদায় করবেন কীরূপে?

২. অর্থাৎ কিতাব অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য এই যে, আপনি সমগ্র মানুষকে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবহিত করে দিন এবং মন্দের পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করুন। আর ঈমান গ্রহণকারীদের জন্য যেন কুরআন একটি ফলপ্রসূ নসীহত-বাণীরূপে প্রমাণিত হয়।

৩. তোমরা তারই অনুসরণ কর যা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য বন্ধুদের অনুসরণ করো না। তোমরা খুবই কম চিন্তা কর☆১।

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝

৪. আমি কত জনপদ এভাবে ধ্বংস করে দিয়েছি যে, তার (অধিবাসীদের) উপর আমার আযাব এসেছে রাতের বেলায় অথবা এ অবস্থায় যে, ওরা দুপুরে বিশ্রাম করছিল।

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ۝

৫. যখন ওদের উপর আমার আযাব পতিত হল, তখন ওদের ডাক শুধু এ-ই ছিল যে, ওরা বলতে লাগল, 'নিশ্চয় আমরাই ছিলাম অপরাধী'২।

فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'উপদেশ গ্রহণ কর'।

১. মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার প্রতিপালন, নিজের জন্ম ও পরিণতি এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার ফলাফল সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে, তবে তার পক্ষে আপন দয়াময় প্রতিপালকের নাযিলকৃত হেদায়েত ছেড়ে মানুষ-শয়তান ও জিন-শয়তানদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও ওদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার দুঃসাহস কখনো হবে না।

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে যারা আল্লাহর কিতাব ও পয়গম্বরদের বিরোধিতায় উক্ত কাজ করেছিল, তাদের যে পার্থিব শাস্তি হয়েছিল তার বিবরণ সামনে আসছে।

২. অর্থাৎ যখন ওদের জুলুম-অত্যাচার ও কুফর-পাপাচার চরমে পৌছল, তখন ওরা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে এবং খোদার আযাব থেকে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে সুখ-নিদ্রার স্বাদ আস্বাদন করতে শুরু করল। এ অবস্থায় হঠাৎ আমার আযাব এসে হানা দিল। অতঃপর আযাবের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ও ধর-পাকড়ের জাঁতাকলে পড়ে সকল লম্ফঝম্ফ ভুলে গেল। চারদিক থেকে إِنَّا كُنَّا ظَالِمِين এর চিৎকার ও আহাজারী ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। বলতে গেলে, তখন ওদের স্বীকার করতে হল যে, আল্লাহ কারো উপর জুলুম করেন না, আমরা নিজেরাই বরং নিজেদের জানের উপর জুলুম করেছি।

বি. দ্র. فجاءها بأسنا এর ف অব্যয় সম্পর্কে মুফাসসিরদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। বিজ্ঞ মুতারজিম (র) খুব সম্ভব বাক্যটিকে أهلكناها এর তাফসীর ও ব্যাখ্যা ধরেছেন। যেমন বলা হয়- توضأ فغسل وجهه وذراعيه (অমুক ব্যক্তি ওযু করেছে যে, সে চেহারা ও হাত ইত্যাদি ধুয়েছে)। এই উদাহরণে হাত-মুখ ধোয়া ওযু করারই ব্যাখ্যা ও তাফসীর। তদ্রূপ এখানে فجاءها بأسنا-এর দ্বারা أهلكناها-এর ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে।

৬. অতএব আমি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসা করব যাদের প্রতি (রাসূল) পাঠানো হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব রাসূলদের[১]।	فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝
৭. তার পর আমি অবশ্যই ওদের সামনে নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে (ওদের হাল-অবস্থা) বর্ণনা করব। আর আমি অনুপস্থিত ছিলাম না[২]।	فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ۝
৮. সেদিন হবে সঠিক ওজন। অতঃপর যাদের (নেকির) পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম[৩]।	وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ۣالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

১. যাদের প্রতি পয়গম্বরগণ প্রেরিত হয়েছেন, তাদের প্রশ্ন করা হবে– ماذا أجبتم المرسلين (তোমরা আমার পয়গম্বরদের দাওয়াত কতদূর গ্রহণ করেছিলে?) আর পয়গম্বরদের জিজ্ঞাসা করা হবে– ماذا أُجبتم (উম্মতের দিক থেকে তোমরা কী উত্তর পেয়েছিলে?)

২. অর্থাৎ তোমাদের কোন মহৎ ও নগণ্য এবং স্বল্প ও বেশি আমল অথবা প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা— কিছুই আমার অজানা নয়। আমি অন্যের মাধ্যম ছাড়াই অণু-পরমাণু ও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বস্তু সম্পর্কে অবগত আছি। নিজের এই সর্বব্যাপী, অনাদি ইলম অনুযায়ী পূর্বাপর সকল অবস্থা তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেব। –আল্লাহর ফেরেশতা কর্তৃক লিখিত আমলনামাও আল্লাহর জ্ঞানের বিন্দুমাত্র খেলাফ হতে পারে না। ফেরেশতাদের মাধ্যমে লেখানো নিয়ম রক্ষা ও শাসনব্যবস্থার প্রকাশ মাত্র, নতুবা আল্লাহ তাআলা স্বীয় জ্ঞানে এসব মাধ্যমের মুখাপেক্ষী আদৌ নন।

৩. কিয়ামতের দিন সকল মানুষের আমল ওজন করা হবে। যাদের আমল— চাই তার সম্পর্ক অন্তরের সাথে হোক বা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে— ওজনে ভারী হবে, তারা সফলকাম, আর যাদের আমলের ওজন হালকা হবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

আমল ওজন করার ব্যাখ্যা

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) বলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তির আমল ওজন অনুযায়ী লেখা হয়। একই কাজ যদি এখলাস ও মহব্বতের সাথে শরী'য়তসম্মতভাবে করল এবং যথাসময়ে করল, তবে এর ওজন বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি লোক দেখানোর জন্য অথবা ঈর্ষাতাড়িত হয়ে করল, কিংবা শরী'য়তসম্মতভাবে করল না অথবা যথাস্থানে করল না, তবে ওজন কমে যায়। আখেরাতে আমলনামা ওযন করা হবে। যার নেক কাজ ভারী হবে, তার মন্দ কর্মগুলি মাফ করে দেওয়া হবে। আর তা হালকা হলে সে ধৃত হবে।

কোন কোন আলেমের মতে, দুনিয়ায় আমলসমূহ যদিও বিমূর্ত অবস্থায় থাকে, তবে তা আখিরাতে মূর্তিমান করে দেওয়া হবে এবং খোদ আমলগুলিই মাপা হবে।

৯. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই এমন, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে, কারণ তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি অবিচার করত[১]।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ۝

একটি সংশয়ের উত্তর

বলা হয়, আমাদের আমল তো পরনির্ভর অশরীরী বস্তু, যার প্রতিটি অংশ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে লয় হয়ে যেতে থাকে। সুতরাং এগুলি ওজন করার অর্থ কী? উত্তরে বলব, বর্তমানে গ্রামোফোনে দীর্ঘ বক্তৃতা সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। এ বক্তৃতা কি অশরীরী বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়, যার এক একটি হরফ আমাদের মুখে তখনই উচ্চারিত হতে পারে, যখন এর পূর্ববর্তী হরফটি বের হয়ে বিলীন হয়ে যায়? এই বক্তৃতার সমষ্টি গ্রামোফোনে কী করে জমা হয়ে গেল? –এ থেকেই বুঝে নিন, যে আল্লাহ গ্রামোফোনের আবিষ্কারকেরও স্রষ্টা, তাঁর পক্ষে আমাদের সকল আমলের সম্পূর্ণ রেকর্ড তৈরি করে রাখা, যা থেকে একটি বিন্দুও গায়েব হতে পারে না— মোটেই অসম্ভব নয়।

ওজন করার স্বরূপ

এখন রইল আমলসমূহ ওজন করার স্বরূপ, এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীস থেকে যা কিছু জানা যায়, তা এই যে, ওজন এমন তুলাদণ্ড দ্বারা হবে, যাতে দু'টি পাল্লা, কাঁটা ইত্যাদি থাকবে। কিন্তু সেই তুলাদণ্ড ও এর পাল্লা দুটি কী রকম হবে এবং তা দ্বারা ওজন করার পদ্ধতি কী হবে– এসব বিষয় আমাদের আকল-বুদ্ধির নাগালের বাইরে। এজন্যই এগুলি জানার দায়িত্ব আমাদের উপর চাপানো হয়নি। শুধু তুলাদণ্ড কেন? বরং সেই জগতের যত জিনিস আছে, তার নাম শুনে নেওয়া এবং কুরআন-হাদীসে তার যে মোটামুটি বর্ণনা রয়েছে তাতে বিশ্বাস করে নেওয়া জরুরী। এর অধিক জানা আমাদের শক্তিসীমার বাইরে। কেননা, সে জগতের স্বরূপ ও ব্যবস্থাপনা আমরা এ জগতে থেকে কিছুই উপলব্ধি করতে পারি না।

এ দুনিয়ারই মাপযন্ত্রগুলি দেখুন, তা কত রকমের! একটি মাপযন্ত্র দ্বারা সোনা-রূপা বা মুক্তা মাপা হয়, একটি মাপযন্ত্রে শস্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র ওজন করা হয়। আর এক মাপযন্ত্র সকল রেলষ্টেশনে থাকে, যার দ্বারা যাত্রীদের মালপত্র মাপা হয়। এ ছাড়া আরো মাপার যন্ত্র রয়েছে, যার দ্বারা বায়ু, তাপ ইত্যাদির মাত্রা জানা যায়। থার্মোমিটারের সাহায্যে আমাদের শরীরের ভিতরকার তাপ, যা অশরীরী ও পরনির্ভর, মেপে বলে দেওয়া হয় যে, এখন আমাদের শরীরে এত ডিগ্রি তাপ রয়েছে। —দুনিয়াতেই যখন আমরা বিভিন্ন রকমের মাপযন্ত্র দেখতে পাই, যাদের সাহায্যে শরীরী ও অশরীরী জিনিসের ওজন ও মাত্রা জানা যায়, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষে এমন একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মাপযন্ত্র কায়েম করে দেওয়া, যা দিয়ে আমাদের আমলের ওজন বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে প্রকাশ পেতে পারে– মোটেই কঠিন নয়।

১. আয়াতগুলি অস্বীকার করাই হচ্ছে সেগুলির প্রতি অবিচার করা, যা يظلمون শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

১০. নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিষ্ঠা দান করেছি এবং এতে তোমাদের জন্য জীবিকার উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছি। তোমরা খুবই কম শোকর কর[১]।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

[রুকূ - ২]

১১. আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের আকৃতি বানিয়েছি, তারপর ফেরেশতাদের হুকুম করেছি, 'আদমকে সেজদা কর।' তখন তারা (সকলে) সেজদা করল- ইবলীস ছাড়া, সে সেজদাকারীদের মধ্যে ছিল না।

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۝

১২. আল্লাহ বললেন, 'যখন আমি তোকে আদেশ করলাম, তখন কোন্ জিনিস তোকে সেজদা করা থেকে বিরত রাখল?' সে বলল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেয়। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে'।

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۭ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ۝

১৩. তিনি বললেন, 'তুই এখান থেকে নেমে যা[২]। তোর কোনই অধিকার নেই যে, তুই এখানে

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ

১. এখান থেকে বিশ্বজগতে বিদ্যমান আল্লাহর বহুবিধ নিদর্শনাবলীর বর্ণনা শুরু হচ্ছে। এসব দ্বারা একদিকে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। অন্যদিকে নবুওয়াতের আবশ্যকতা, নবীদের আগমন, তাঁদের জীবন-চরিত, তাঁদের অনুসারীদের ও বিরোধীদের পরিণাম- ইত্যাদি বিষয় বয়ানের উদ্দেশ্যে ভূমিকাস্বরূপ এ নিদর্শনগুলি প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের সৃষ্টি করার পূর্বে তোমাদের জন্য বসবাস ও পানাহারের ব্যবস্থা করলেন। তারপর তোমাদের মূল উপাদান সৃষ্টি করেন। অতঃপর এ উপাদানকে এমন মনোমুগ্ধকর ও সুন্দর আকৃতি দান করলেন, যা দ্বিতীয় কোন সৃষ্টিকে দান করা হয়নি। এরপর মাটির এ পুতুলে সেই আত্মা ও 'রূহ' দান করা হল, যার বদৌলতে তোমাদের আদিপিতা আদম আলাইহিস সালাম, 'আল্লাহর খলীফা' ও 'ফেরেশতাদের সেজদাস্থল' হলেন, আর তখন সেজদা করতে যে অস্বীকার করল সে চির-বিতাড়িত সাব্যস্ত হল। পক্ষান্তরে আল্লাহর ফেরেশতাগণ, যাঁরা আদমের ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব ও রূহানী গুণ-গরিমা সম্পর্কে ইতিপূর্বে অবহিত হয়েছিলেন, তাঁরা আল্লাহর হুকুম শোনামাত্র সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং এভাবে আল্লাহর খলীফার সম্মুখে স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের প্রমাণ দিলেন।

فِيۡهَا فَاخۡرُجۡ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيۡنَ۝

অহংকার করবি। সুতরাং বের হয়ে যা, তুই লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত[১]।'

অভিশপ্ত ইবলীস মূল উপাদানের দিক থেকে ছিল আগুনের তৈরী জিন জাতীয়; কিন্তু অধিক ইবাদত ইত্যাদির ফলে সে ফেরেশতা-দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তার মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করল। ওর দৃষ্টি- نفخت فيه من روحي (আদমের মধ্যে আমি আপন রূহ ফুঁকে দিলাম) এর রহস্য ও তাৎপর্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। সেজন্যই আল্লাহর প্রকাশ্য নির্দেশের মোকাবেলায় নিজ শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে শুরু করল। অবশেষে এ অমান্যতা ও অহংকার, নিজ রায় ও প্রবৃত্তির বশে অকাট্য খোদায়ী নির্দেশের অস্বীকৃতি এবং আল্লাহর সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে অবতরণের ফলে নৈকট্যের মর্যাদা থেকে চিরতরে অধঃপতিত ও আল্লাহর রহমত থেকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হল।

বস্তুত আগুনের সৃষ্টি বলে ওর যে অহংকার ছিল, তাই ওর চিরধ্বংসের কারণ হল। আগুনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লঘুতা ও তীব্রতা, ক্রোধ ও ক্ষিপ্রতা, উর্ধ্বগামিতা ও নাশকতা। পক্ষান্তরে, মাটির মধ্যে ধীরতা, স্থিরতা, বিনয়সুলভ সহনশীলতা ও অবিচলতার স্বভাব রয়েছে। অগ্নি-উপাদানবিশিষ্ট ইবলীস সেজদার হুকুম শোনামাত্র অগ্নিমূর্তি ধারণ করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষীপ্র ও তেজোদীপ্ত হয়ে উঠল। পরিশেষে গর্ব ও অহংকারের ফলে হিংসাগ্নিতে পতিত হয়ে দোযখের আগুনে গিয়ে পড়ল। -পক্ষান্তরে, আদম আলাইহিস সালামের দ্বারা যখন ভুল হল, তখন মাটির উপাদান তাঁকে আল্লাহর সামনে বিনয়, নম্রতা, আনুগত্য ও দাসত্বের পথ প্রদর্শন করাল। এবং স্থিরতা ও তওবাসুলভ মনোভাবের কারণে তিনি- ثُمَّ اجۡتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيۡهِ وَهَدٰى (অতঃপর তাঁর রব তাঁকে মনোনীত করলেন, তারপর তাঁর প্রতি সুদৃষ্টি দান করলেন এবং পথে আনয়ন করলেন-তোয়াহা : ১২৩) এর মর্যাদায় আসীন হলেন।

এ জন্যই বলা যেতে পারে যে, অভিশপ্ত ইবলীস মূল উপাদানগত দিক থেকে নিজ শ্রেষ্ঠত্বের যে দাবি করে বসেছিল, তা ছিল অমূলক; যেমন, হাফেজ শামসুদ্দীন ইবনুল ক্বাইয়িম بدائع الفوائد এর মধ্যে পনেরটি কারণে আগুন অপেক্ষা মাটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। কেউ ইচ্ছা করলে তা দেখতে পারেন।

১. অর্থাৎ বেহেশতে বা আসমানসমূহে আল্লাহর সেই সৃষ্টিই থাকতে পারে, যে তাঁর পূর্ণ অনুগত ও আজ্ঞাবহ। নাফরমান অহংকারীদের জন্য সেখানে থাকার অবকাশ নেই। -যা হোক, অভিশপ্ত ইবলীস অধিক ইবাদত ইত্যাদির কারণে তখন পর্যন্ত সম্মানের যে আসনে সমাসীন ছিল, অহংকারের কারণে সে তা থেকে নীচে নিক্ষিপ্ত হল।

বি. দ্র. ইবলীস দীর্ঘকাল পর্যন্ত ফেরেশতাদের দলে শামিল থাকার দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা কারো, এমন কি শয়তানেরও ফিৎরত (স্বভাব-প্রকৃতি) এমন বানাননি যে, সে কেবল মন্দের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্যই বাধ্য, বরং খবীছ থেকে খবীছতর লোকও আসল ফিৎরতের (প্রকৃতির) দিক থেকে এ যোগ্যতা রাখে যে, নিজ সাধনা ও এখতিয়ারের দ্বারা নেকী ও পরহেজগারীতে চরম উন্নতি করে ফেরেশতাদের দলে গিয়ে মিলিত হতে পারে (যেমন ইবলীস হয়েছিল)।

১৪. সে বলল, 'আমাকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন যেদিন লোকদের (কবর থেকে) ওঠানো হবে।'	قَالَ اَنْظِرْنِیْۤ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ۝
১৫. আল্লাহ বললেন, 'তোকে অবকাশ দেওয়া হল[১]।'	قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ۝

১. অর্থাৎ তুই যখন এই দরখাস্ত করলি তখন জেনে নে, প্রথম থেকেই আল্লাহর জ্ঞানে সাব্যস্ত হয়ে আছে যে, তোকে অবকাশ দেওয়া হবে।

আদম- ইবলীসের উক্ত ঘটনার তাৎপর্য এবং ইবলীসকে অবকাশ দেওয়ার কারণ

যখন আল্লাহ তাআলা –যিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান এবং যাঁর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন কাজ হেকমত-শূন্য নয়– ইচ্ছা করলেন যে, তিনি তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলি, মহামহিমান্বিত শান ও ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাবেন, তখন তিনি বিশ্বজগত সৃষ্টি করলেন। সূরা তালাকের দ্বিতীয় রুকূতে (আয়াত ১২) আছে-

اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

(আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে। এগুলির মাঝে তাঁর নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণ সক্ষম এবং আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।)

অর্থাৎ যমীন ও আসমানের সৃষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ আল্লাহর মহাশক্তি, সর্বব্যাপী জ্ঞান ও অন্যান্য গুণের পরিচয় লাভ করুক। কোন কোন সালাফের ব্যাখ্যানুযায়ী مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ.. اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ আয়াতে এই মারেফতকেই ليعبدون শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, বিশ্বসৃষ্টির এই উদ্দেশ্য পরিপূর্ণরূপে তখনই সাধিত হতে পারে, যখন আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে তাঁর সর্বপ্রকার গুণের প্রকাশ ঘটবে। আর এটা তখনই হতে পারে, যখন জগতে অনুগত ও আজ্ঞাবহ এবং বিদ্রোহী ও অপরাধী সব ধরনের লোক থাকবে। এবং আল্লাহ তাআলার শত্রুদেরকে স্বীয় শক্তি প্রদর্শন এবং আপন এখতিয়ার ও ক্ষমতা প্রয়োগ করার পূর্ণ অবকাশ ও স্বাধীনতা দেওয়া হবে। পরিশেষে আল্লাহর সৈন্যরা বিজয়ী হবে, দুশমনরা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি লাভ করবে এবং পরীক্ষার পর সর্বশেষ কামিয়াবী আল্লাহর বন্ধুদের হাতে থাকবে। এ ছাড়া তাঁর সকল গুণের প্রকাশ পাওয়ার কোনই উপায় নেই।

অতএব ভাল ও মন্দ এবং এদের উৎস সৃষ্টি করার পিছনে কারণ এটাই যে, বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্থাৎ 'আল্লাহর গুণরাজির প্রকাশ' এ ছাড়া হতে পারত না। সূরা হূদের দশম রুকূতে (আয়াত ১১৮) ইরশাদ হয়েছে-

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۔

১৬. সে বলল, 'তা, আপনি যেহেতু আমাকে গোমরাহ করেছেন, সুতরাং আমিও অবশ্যই তাদের জন্য আপনার সরল পথের উপর (ওঁৎ পেতে) বসব'[১]।

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۟ۙ

(যদি আপনার রব ইচ্ছা করতেন, তবে সমস্ত মানুষকে একই পথের অনুসারী করে দিতেন। (তিনি এমন ইচ্ছা করেননি বলে) তারা সর্বদা মতভেদের মধ্যেই রয়েছে, তবে তাদের ছাড়া, যাদের প্রতি আপনার রব দয়া করেছেন। আর এ জন্যই তাদের সৃষ্টি করেছেন।)

অতএব উক্ত কারণে সকল মন্দের উৎস অভিশপ্ত শয়তানকে পূর্ণ অবকাশ দেওয়া আবশ্যক ছিল, যাতে সে কিয়ামত পর্যন্ত নিজের সকল ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রাণভরে ব্যবহার করে নিতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট কথা যে, শয়তানের জন্য সর্বব্যাপী ও সর্বক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তাআলার সরাসরি মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না। তাই আল্লাহর তরফ থেকে প্রতিনিধিরূপে এমন এক সৃষ্টিকে ওর মোকাবেলায় আনা আবশ্যক হল, যার সঙ্গে অভিশপ্ত ইবলীস আযাদীর সাথে সংগ্রাম করার সুযোগ পাবে। সূরা বনী ইসরাঈলের সপ্তম রুকূতে (আয়াত ৬৪) বলা হচ্ছে-

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا .

('আর হে ইবলীস! তুই তাদের মধ্যে যাকে পারিস, তোর ডাকের দ্বারা বিভ্রান্ত কর, ওদের উপর তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী চড়াও কর, ওদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে শরীক হয়ে যা এবং ওদের প্রতিশ্রুতি দে।' শয়তান ওদের প্রতারণা ছাড়া আর কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না।)

আর যাবৎ সেই সৃষ্টি আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের হক ও খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে থাকবে, তাবৎ বিশেষ রাজকীয় ফৌজ (তথা ফেরেশতাদের) দ্বারা তাকে সাহায্য করা হবে এবং দুর্বলতা ও সংখ্যা-স্বল্পতা সত্ত্বেও আল্লাহর ফযল ও রহমতে পরিশেষে তাকেই দুশমনদের মোকাবেলায় বিজয়ী ও কৃতকার্য করা হবে।

সারকথা, এই পৃথিবী হচ্ছে ইবলীস ও আদমের রণক্ষেত্র। আর প্রাণপণে মোকাবেলা তখনি হতে পারে, যখন উভয় পক্ষ একে অন্যের বিদ্বেষী ও শত্রু হবে। এজন্য কুদরতিভাবেই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হল, যার ফলে প্রত্যেকের অন্তরে অন্যের প্রতি ক্ষোভ পয়দা হল। আদম (আ)কে সেজদা না করার কারণে ইবলীস নীচে নিক্ষিপ্ত হল এবং ইবলীসের ওয়াসওয়াসায় পড়ে আদম আলাইহিস সালামকে বেহেশত থেকে আলাদা হতে হল। -এসব ঘটনা থেকে প্রত্যেকের অন্তরে অন্যের প্রতি শত্রুতার বীজ রোপিত হল। অতঃপর যুদ্ধক্ষেত্র গরম হয়ে উঠল।

১. অর্থাৎ ডাকাতদের মত আমি তাদের ঈমানের উপর আক্রমণ করব, কেননা তাদের কারণেই আমাকে এই দুর্দিন দেখতে হল।

১৭. অতঃপর অবশ্যই তাদের উপর আক্রমন চালাব– তাদের সামনে থেকে, পিছন থেকে, ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে[১]। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না[২]।'

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ۝

১৮. আল্লাহ বললেন, 'তুই এখান থেকে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যা। তাদের মধ্যে যে কেউ তোর পথে চলবে, (মনে রাখিস) আমি অবশ্যই তোদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম ভরব[৩]।

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ۝

১৯. আর 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেখান থেকে ইচ্ছা খাও, আর এই গাছের নিকটেও যেয়ো না, তা হলে তোমরা গোনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে[৪]।'

وَيٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ۝

---

১. অর্থাৎ সর্বদিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ চালাব। চার দিকের উল্লেখ দ্বারা সকল দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য।

২. এটা অভিশপ্ত ইবলীসের কল্পনা ছিল, যা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (ইবলীস ওদের ক্ষেত্রে আপন ধারণা সত্যে পরিণত করল, ফলে সকলেই ওর অনুসরণ করল কিছু সংখ্যক ঈমানদার লোক ব্যতীত। –সূরা সাবা, আয়াত ২০)

৩. অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞ হলে তাতে আমার ক্ষতি কী? পরিণামে সেই স্বল্প সংখ্যক বিশ্বস্তরাই কামিয়াবী ও সাফল্য লাভ করবে এবং অকৃতজ্ঞদের আধিক্য দোযখের খোরাক হবে। –আর এভাবে স্পষ্ট করে দেওয়া হবে যে, শয়তানের সৈন্যদের সংখ্যাধিক্যও 'আল্লাহর খলীফা' ও তাঁর সংখ্যালঘু লস্করকে পরাজিত করতে পারেনি।

৪. আদম (আ) ও হাওয়া (আ)এর জন্য অনুমতি ছিল একটি নির্ধারিত বৃক্ষ ছাড়া জান্নাতে অবাধে যা ইচ্ছা তা পানাহার করার। এই বৃক্ষের ফল খাওয়া তাঁদের বেহেশতী জীবন ও যোগ্যতার অনুকূল ছিল না। তাই আল্লাহ বলে দিলেন যে, তার নিকট যেয়ো না, অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আমার নিকট এখানে فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ এর তরজমা এরূপ করা হলে বেশি ভাল হত– 'তা হলে তোমরা হয়ে যাবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত'। ظلم এর এক অর্থ হচ্ছে 'ক্ষতি' ও 'ত্রুটি',

২০. অতঃপর শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল, যাতে তাদের পরস্পরের সামনে সেই জিনিস প্রকাশ করে দিতে পারে যা তাদের (দৃষ্টি) থেকে গোপন রাখা হয়েছে– অর্থাৎ তাদের লজ্জাস্থান। এবং সে বলল, 'আপনাদের রব আপনাদের এ বৃক্ষের কাছে যেতে কেবল এ জন্যই নিষেধ করেছেন যে, পাছে আপনারা ফেরেশতা হয়ে যান অথবা হয়ে যান চিরস্থায়ীদের অন্তর্ভুক্ত'।

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَاوٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ۝

২১. আর সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল, 'আমি অবশ্যই আপনাদের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী'[১]।

وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ۝

যেমন সূরা কাহাফে (আয়াত ৩৩) আছে– وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا (এবং কোনটি তা থেকে কিছুই হ্রাস করত না।)

১. আদম (আ) ও হাওয়া (আ) শয়তানের কসমে প্রভাবিত হলেন। কেননা তাঁদের কল্পনাতেও ছিল না যে, আল্লাহর নাম নিয়ে কেউ মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা করতে পারে।

সম্ভবত তাঁরা মনে করেছিলেন, ঐ বৃক্ষের ফল খেলে সত্যিই তারা ফেরেশতা হয়ে যাবেন, অথবা আর কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। আর আল্লাহ তাআলা যে নিষেধ করেছিলেন, হয়ত তার কোন কারণ বা ব্যাখ্যা তাঁরা বের করে থাকবেন।

বাকি থাকল (আল্লাহর সতর্ক বাণী-) فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (অন্যথায় তোমরা অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে) এবং اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ('হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন তোমাদেরকে বেহেশ্‌ত থেকে বের করে না দেয়, তা হলে তুমি কষ্টে পতিত হবে।) –খুব সম্ভব তারা এসব ভুলে গিয়েছিলেন। অধিকন্তু এও মনে ছিল না যে, তিনি (আদম) যখন ফেরেশতাদের সেজদাপ্রাপ্ত হয়েছেন, অতএব তার আর ফেরেশতা হওয়ার কী প্রয়োজন? সূরা 'তা-হা' এর ষষ্ঠ রুকূতে (আয়াত ১১৫) ইরশাদ হয়েছে- فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا

প্রকাশ থাকে যে, আদেশ ও নিষেধ কখনো শরী'য়তের বিধানরূপে হয়ে থাকে এবং কখনো স্নেহ-মমতার্থে হয়ে থাকে। যেমন ধরুন, রেলগাড়িতে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞাটি আইনের মর্যাদা রাখে, যা অমান্য করলে রেল-কোম্পানীর লোকসান হয়। অপর দিকে গাড়িতে যে লেখা থাকে, 'থুথু ফেলবে না, কারণ এতে রোগ ছড়ায়'। এই নিষেধাজ্ঞাটির উদ্দেশ্য কল্যাণকামিতা। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধের কিছু শরী'য়তের বিধানগত মর্যাদা রাখে। এগুলির অমান্যকারী আইনগত অপরাধী হিসাবে পরিগণিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে সেসব আদেশ-নিষেধ, যেগুলির উদ্দেশ্য শরঈ বিধান প্রবর্তন করা নয়, বরং তার মূলে রয়েছে স্নেহ-মমতার প্রকাশ, যেমন: নবী কারীম সাল্লাল্লাহু

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادٰىهُمَا

২২. এভাবে সে ধোঁকা দিয়ে তাদেরকে (বৃক্ষ খাওয়ার প্রতি) আকৃষ্ট করে ফেলল। তার পর তারা যখন বৃক্ষটি আস্বাদন করলেন, তখন তাদের সম্মুখে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ল[১] এবং তারা নিজেদের

আলাইহি ওয়াসালামের চিকিৎসা বিষয়ক হাদীসসমূহের ব্যাখ্যায় আলেমগণ পরিষ্কারভাবে বয়ান করেছেন।

সম্ভবত আদম আলাইহিস সালাম বৃক্ষ আস্বাদনের নিষেধাজ্ঞাকে কেবল স্নেহ-মমতাসুলভ নিষেধ মনে করেছিলেন। সেজন্যই শয়তানের ওয়াসওয়াসার পর উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্যথা করাকে খুব গুরুতর কিছু মনে করেননি। কিন্তু যেহেতু নবীগণের সামান্য ত্রুটিও তাঁদের মর্যাদা হিসাবে বিরাট ও গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়, সেজন্য আদম (আ) নিজ ত্রুটির বাহ্যিক খেসারত পোহানো ছাড়াও দীর্ঘকাল যাবৎ তওবা-এস্তেগফারে মশগুল থাকেন ও কান্নাকাটি করতে থাকেন। পরিশেষে তিনি ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى এর ফলাফল লাভে ধন্য হলেন। কবি বলেন :

بود آدم دیدہ نور قدیم ÷ موئے در دیدہ بود کوہ عظیم

অর্থ : আদম ছিলেন অনাদি নূরের চক্ষুস্বরূপ– আর চোখের ভিতর একটা চুল পড়লেও তা পাহাড় মনে হয়।

১. অর্থাৎ হুকুম অমান্য করিয়ে শয়তান তাঁদের শরীর থেকে বেহেশতী লেবাস খসিয়ে দিল। কেননা, বেহেশতী লেবাস বস্তুত 'তাক্ওয়ার লেবাসে'রই একটি মূর্তরূপ। কোন নিষিদ্ধ কাজ করার ফলে 'তাকওয়ার লেবাসে'র যে পরিমাণ ক্ষতি হবে, বেহেশতী লেবাস থেকে সে পরিমাণই বঞ্চিত হতে হবে।

এ আমার খেয়াল। কিন্তু হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) পোশাকের অপসারণকে বৃক্ষ আস্বাদনের একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ধরেছেন। তিনি (তাফসীরে মূযেহুল কুরআনে) লেখেন, 'বেহেশতে এসতেঞ্জার প্রয়োজন ও কামভাব ছিল না। আর তাঁদের গায়ে এমন কাপড় ছিল যা কখনো খুলত না। কারণ, খোলার দরকারই হত না। অতএব আদম (আ) ও হাওয়া (আ) নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। যখন উক্ত বৃক্ষ খেলেন, তখন মানবীয় চাহিদা সৃষ্টি হল। তাঁরা নিজেদের মানবীয় প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত হলেন এবং স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখতে পেলেন। অর্থাৎ উক্ত বৃক্ষ আস্বাদনের ফলে মানবীয় দুর্বলতার এত দিনকার আবরণ অপসারিত হয়ে গেল।

سَوْأَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। হাবিল ও কাবিলের ঘটনায় আছে : سَوْأَةَ اَخِيْهِ (মায়েদা : ৩১) আর এক হাদীসে اِحْدٰى سَوءَتِكَ يَا مقداد আছে (মুসলিম, হাদীস : ২০৫৫)

رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾

উপর জান্নাতের পাতা জড়াতে লাগলেন[১]। আর তাদের রব তাদের ডেকে বললেন, 'আমি কি তোমাদের এ বৃক্ষ থেকে নিবৃত্ত করিনি এবং তোমাদের বলে দেইনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?'

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তারা উভয়ে বললেন, 'হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। এখন আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা অবশ্যই চরম ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৪. তিনি বললেন, 'তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু হবে[২]। আর পৃথিবীতে তোমাদের জন্য রয়েছে একটা সময় পর্যন্ত বাসস্থান ও জীবনোপভোগ।'

এতদিন পর্যন্ত আদম (আ) এর দৃষ্টিতে ছিল শুধু নিজ সরলতা ও নিষ্পাপতা এবং ইবলীসের দৃষ্টিতে ছিল শুধু তাঁর সৃষ্টিগত দুর্বলতা, কিন্তু বৃক্ষ আস্বাদনের পর আদম (আ) স্বীয় দুর্বলতা দেখতে পেলেন। আর এ ভুলের পর যখন তাঁরা তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পথ অবলম্বন করলেন, তখন তাঁদের মহান মর্যাদা এবং পরম ভদ্রতা ও আভিজাত্য অভিশপ্ত ইবলীসের দৃষ্টিতে এল। সে বুঝে নিল, এ সৃষ্টি হোঁচট খেয়েও আমার হাতে পরাস্ত হওয়ার নয়। যেমন, ইরশাদ হয়েছে : إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان (নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোর কোন আধিপত্য নেই –হিজর : ৪২) সম্ভবত এই কারণেই المعارف রচয়িতা ইবনে কুতাইবার বর্ণনা অনুযায়ী তাওরাতে উক্ত বৃক্ষকে شجرة علم الخير والشر (ভাল ও মন্দের জ্ঞান-বৃক্ষ) নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। والله أعلم

১. অর্থাৎ উলঙ্গ হয়ে যাওয়ায় লজ্জিত হলেন এবং পাতা-পল্লব দ্বারা শরীর ঢাকতে লাগলেন।

এ থেকে বোঝা যায়, যদিও মানুষ জন্মের সময় উলঙ্গ থাকে, কিন্তু তার স্বভাবগত লজ্জা উলঙ্গ থাকতে বাধা দান করে।

২. মুফাসসিরগণের মতে এ সম্বোধন আদম (আ), হাওয়া (আ) ও অভিশপ্ত ইবলীস– সকলেরই প্রতি। কারণ, আসল শত্রুতা হচ্ছে আদম ও ইবলীসের মধ্যে এবং এই শত্রুতার রণক্ষেত্র বানানো হয়েছে আমাদের পৃথিবীকে, যার খেলাফত আদম (আ) কে সোপর্দ করা হয়েছিল।

২৫. তিনি (আরো) বললেন, 'সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে[১], সেখানেই মৃত্যু বরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের বের করা হবে।'

قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٥﴾

[রুকূ - ৩]

২৬. হে আদম-সন্তানেরা! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং (অবতীর্ণ করেছি) সাজ-সজ্জার বস্তু[২]। আর 'তাকওয়ার লেবাস', তা-ই সর্বোত্তম[৩]। এ আল্লাহর (কুদরতের)

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ

---

১. অর্থাৎ সাধারণভাবে এই পৃথিবীই তোমাদের আসল বাসস্থান।

যদি কখনো অস্বাভাবিকরূপে কোন মানুষকে একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য পৃথিবী থেকে উপরে তুলে নেওয়া হয়, যেমন হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামকে তুলে নেওয়া হয়েছে, তবে তা এই আয়াতের পরিপন্থী নয়। যেমন, যে ব্যক্তি কয়েক দিন বা কয়েক ঘণ্টার জন্য পৃথিবী থেকে পৃথক হয়ে উড়োজাহাজের যাত্রী হয় অথবা মনে করুন, সেখানেই যদি মারা যায়, তবে কি তা فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ এর বিপরীত হবে। কুরআনের অন্যত্র (তা-হা : ৫৫) ইরশাদ হয়েছে–مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ যেসব মৃত মাটিতে কবরস্থ হয় না, তাদের ক্ষেত্রে فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ কীভাবে প্রযোজ্য হবে? বোঝা গেল, এ ধরনের কথা সার্বিক নিয়ম হিসাবে উল্লিখিত হয়নি।

২. অবতীর্ণ করার অর্থ তার উপাদান ইত্যাদি পয়দা করা এবং তা প্রস্তুত করার কৌশল শিক্ষা দেওয়া।

যদিও 'অবতীর্ণ করা' শব্দটি সাধারণত ঐ স্থলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেখানে একটি জিনিস উপর থেকে নীচে আনা হয়, তবু অনেক সময় তা দ্বারা স্থানগত উপর ও নীচ উদ্দেশ্য হয় না, বরং মর্যাদার দিক দিয়ে যিনি উঁচু, তার তরফ থেকে কোন জিনিস নিম্নস্থানীয় লোকদের দেওয়া হলে এস্থলেও উক্ত শব্দ ('অবতীর্ণ করা') প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যেমনঃ ইরশাদ হয়েছে- وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاج (আর তিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু থেকে আট নর-মাদী সৃষ্টি করেছেন। –যুমার, আয়াত ৬) অথবা– وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيد (এবং আমি নাযিল করেছি লৌহ, তাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি। –হাদীদ, আয়াত ২৬)

৩. অর্থাৎ এই বাহ্যিক পোশাক দ্বারা তো শুধু শরীর আবৃত বা সজ্জিত হয়। তা ছাড়া এক আভ্যন্তরীণ পোশাকও আছে, যা দ্বারা মানুষের ভিতরের দুর্বলতা গুপ্ত থাকে, তা কার্যত প্রকাশিত হতে পারে না, (অথচ) প্রকাশ করার সক্ষমতা মানুষের মধ্যে বর্তমান আছে। আর

لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝

নিদর্শনসমূহের একটি, যাতে তারা গভীরভাবে চিন্তা করে*[১]।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ

২৭. হে আদম-সন্তানেরা! শয়তান যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে ফেলে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে এমতাবস্থায় বের করেছিল যে, তাদের (দেহ) থেকে তাদের বস্ত্র অপসারিত করে দিয়েছিল– তাদের লজ্জাস্থান তাদের দেখানোর জন্য[২]। সে নিজে ও তার জাতি তোমাদের এমন স্থান থেকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা ওদের দেখতে পাও না[৩]।

এই আভ্যন্তরীণ পোশাকই, যাকে কুরআন لباس التقوى বলেছে, ভিতরকার সৌন্দর্য ও সজ্জার উপকরণ হয়ে থাকে। বরং গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, বাহ্যিক ও শারীরিক লেবাসও আভ্যন্তরীণ লেবাসে সজ্জিত হওয়ার জন্যই শরী'য়তের দৃষ্টিতে কাম্য।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'শত্রু তোমাদের শরীর থেকে বেহেশতের কাপড় খসিয়েছে। অতঃপর আমি তোমাদের দুনিয়াতে লেবাস তৈরি করার কৌশল শিক্ষা দান করেছি। এখন সেই লেবাসই পরিধান কর, যার মধ্যে পরহেজগারী আছে। অর্থাৎ পুরুষ রেশমের তৈরী লেবাস পরবে না, আঁচল (বা নীচের অংশ) লম্বা রাখবে না এবং যেসব বিষয় নিষিদ্ধ তা করবে না। আর নারী এমন পাতলা কাপড় পরবে না, যাতে লোকেরা শরীর দেখতে পায়। আর তারা নিজ সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'উপদেশ গ্রহণ করে'।

১. অর্থাৎ তারা এসব নিদর্শনের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করে আল্লাহ তাআলার কুদরতী নেয়ামতরাজির কথা স্বীকার করবে এবং তাঁর শোকর আদায় করবে।

২. বেহেশত থেকে বের করা ও কাপড় খসানোর ব্যাপারটাকে এর 'কারণে'র সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে, অর্থাৎ আদম ও হাওয়াকে বেহেশত থেকে বের করা এবং তাদের কাপড় খসানোর কারণ সেই শয়তান। অতএব তোমরা ওর ধোঁকায় পড়ো না এবং ওর প্রাতরণা থেকে সতর্ক থেকো।

৩. যে শত্রু আমাদের দেখছে, অথচ আমাদের দৃষ্টি ওর উপর পড়ে না, ওর আক্রমণ অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং প্রতিরোধ খুবই কঠিন। সে জন্য তোমাদের খুব সচেষ্ট ও সজাগ থাকা উচিত। এমন শত্রুর এলাজ (বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা) একমাত্র এ-ই যে, আমরা এমন কোন সত্তার আশ্রয় গ্রহণ করি, যিনি ওকে দেখেন কিন্তু সে তাঁকে দেখে না– لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ (চোখসমূহ তাঁকে আয়ত্তে আনতে

আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু বানিয়েছি যারা ঈমান আনে না[১]।

إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮. ওরা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন বলে, 'আমরা আমাদের বাপদাদাদের এর উপরই পেয়েছি (অর্থাৎ এরূপই করতে দেখেছি) এবং আল্লাহও আমাদের এর আদেশ করেছেন।' আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ অশ্লীল কাজের আদেশ করেন না। তোমরা কি আল্লাহর প্রতি এমনসব কথা আরোপ কর, যা তোমাদের জানা নেই[২]?'

وَإِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ أَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ؕ أَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾

পারে না, কিন্তু তিনি চোখসমূহকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। আর তিনি অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও সম্যক পরিজ্ঞাত। -আনআম, আয়াত ১০৪)

বি. দ্র. إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ– এটা একটা সাধারণ নীতি, কিন্তু সর্বদার জন্য নয়। অর্থাৎ অনেক সময় ওরা আমাদের দেখে, তবে আমরা ওদের দেখি না। তাই বলে এটা জরুরী নয় যে, কেউ কখনই কোনো অবস্থায় ওদের দেখতে পারবে না। অতএব আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণ করা যে, জিনদের একেবারেই দেখা যায় না– এ নিতান্তই সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিচায়ক।

১. অর্থাৎ কাফেররা যেহেতু বেঈমানীর কারণে নিজেরাই শয়তানদের বন্ধুত্বকে নিজেদের জন্য পছন্দ করে নিয়েছে– যেমন, সম্মুখে (আয়াত : ৩০) আসছে- إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ অতএব আমিও ওদের এ কাজে বাধার সৃষ্টি করিনি। যাকে ওরা নিজ বন্ধু বানাতে চেয়েছে তাকেই বন্ধু বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. বর্তমান আয়াতে 'অশ্লীল কাজ' বলতে উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা উদ্দেশ্য। আয়াতের মর্ম হচ্ছে– নারী-পুরুষের উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করার মত মন্দ ও নির্লজ্জ কর্ম, যা সুস্থ বুদ্ধি ও সঠিক স্বভাবের নিকট ঘৃণিত– তার শিক্ষাদান আল্লাহ পাকের শানের পরিপন্থী। তিনি তো পবিত্রতা ও লাজুকতার উৎস,অপবিত্র ও অশ্লীল কাজকর্মের নির্দেশ তিনি দিতে পারেন না। বস্তুত নির্লজ্জতা ও মন্দের শিক্ষাদানকারী হচ্ছে সেই শয়তানেরা, যাদের ওরা নিজেদের বন্ধু বানিয়ে রেখেছে।

দেখ, তোমাদের আদি পিতামাতাকে শয়তান ধোঁকা দিয়ে বিবস্ত্র করল, কিন্তু তারা লজ্জাশরমে গাছের পাতা-পল্লব শরীরে জড়াতে লাগলেন। বোঝা গেল, উলঙ্গতা শয়তানের পক্ষ থেকে আর আচ্ছাদনের প্রচেষ্টা তোমাদের পিতার পক্ষ থেকে হয়েছে। এ অবস্থায় উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করার ব্যাপারে বাপ-দাদার সনদ পেশ করা কেমন করে ঠিক হতে পারে?

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۗ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ كَمَا بَدَاَكُمْ

২৯. আপনি বলে দিন, 'আমার রব ইনসাফের (বা ভারসাম্য বজায় রাখার) আদেশ করেছেন[১]। আর তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় নিজেদের চেহারা সোজা কর[২] এবং তাঁকে ডাক তাঁর ইবাদতে একনিষ্ঠ হয়ে। তিনি যেমন তোমাদের প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তোমরা আবার

শাহ (আঃ কাদের) সাহেব বলেন– আদি পিতা শয়তানের ধোঁকায় পড়েছিলেন। অতএব (সর্বক্ষেত্রে) পিতার সনদ কীভাবে পেশ কর? যে কাজ শয়তানের হুকুমে হচ্ছে, তার ব্যাপারে বলা যে, আল্লাহ এর নির্দেশ দিয়েছেন– এটা কত বড় নির্লজ্জতা!

১. তাফসীরে 'রূহুল মাআনী'তে আছে- القسط على ما قال غير واحد: العدل، وهو الوسط من كل شيء المتجافي عن طرفي الافراط والتفريط (অর্থাৎ কিস্‌ত অর্থ 'আদল'। আর আদল হল সব কিছুর মধ্যবর্তী অবস্থা, যা 'বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি'-এর দোষমুক্ত (অর্থাৎ ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা)।

আয়াতের সারার্থ হল, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কাজে মধ্যবর্তিতা ও ভারসাম্য অবলম্বন করার এবং এফরাত ও তাফরীত অর্থাৎ বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা থেকে বেঁচে থাকার আদেশ করেছেন। এরূপ অবস্থায় তিনি কী করে অশ্লীল কাজের হুকুম দিতে পারেন?

২. বিজ্ঞ মুতারজিম (র) খুব সম্ভব مسجد শব্দটিকে مصدر ميمي (মিমযুক্ত মাসদার–ক্রিয়ামূল) ধরেছেন। এ হিসাবে তার অর্থ সেজদা করা। তবে রূপক অর্থ নিয়ে তরজমা করেছেন 'নামায' এবং وجوه (চেহারা) শব্দটিকে তার বাহ্যিক অর্থে ধরেছেন, সারার্থ দাড়াল– নামায পড়ার সময় নিজ চেহারা সোজা (কাবার দিকে) রাখবে।

কিন্তু অপর কোন কোন মুফাসসির বলেন– أقيموا وجوهكم দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর ইবাদতের প্রতি সর্বদা আন্তরিকভাবে মনোযোগী থাক। ইবনে কাছীরের নিকট এর অর্থ এই যে, নিজেদের ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে সোজা-সরল পথে থাক। পয়গম্বর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যে পথ, তা ছেড়ে তেরছা-বাঁকা পথে চলো না।

ইবাদতের মকবুলিয়ত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এক, তা একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া চাই, যা সম্মুখে وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ আয়াতাংশে বলে দিয়েছেন। দুই, তা শরী'য়তসম্মত পথ অনুসারে হতে হবে, যা নবী ও রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) অনুমোদন করেছেন। أقيموا وجوهكم আয়াতাংশে এরই কথা বলা হয়েছে।

যা হোক, বর্তমান আয়াতে শরী'য়তের হুকুম-আহকামের সকল বিভাগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে যেগুলি বান্দাদের দেনাপাওনা, আচার-ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত, তা সবই قسط শব্দের মধ্যে এসে গেছে। আর যেসবের সম্পর্ক আল্লাহর সঙ্গে, সেসবের মধ্যে যা শরীরগত, তা وأقيموا وجوهكم এর মধ্যে এবং যার সম্পর্ক অন্তরের সাথে তা وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

تَعُوْدُوْنَ ۟ (তাঁর কাছে) প্রত্যাবর্তন করবে[১]।

فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۟

৩০. এক দলকে তিনি হেদায়েত দান করেছেন, আর এক দলের জন্য অবধারিত হয়ে গেছে গোমরাহী। ওরা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদের বন্ধু বানিয়েছে আর ওরা মনে করে, ওরা সঠিক পথের উপর রয়েছে[২]।'

---

১. অর্থাৎ ভারসাম্য, দৃঢ়তা ও এখলাসের পথে এ জন্য চলা প্রয়োজন যে, মৃত্যুর মাধ্যমে অন্য জীবনের সম্মুখীন হতে হবে, যেখানে পার্থিব জীবনের ফলাফল সম্মুখে আসবে। অতএব তার চিন্তা এখন থেকেই হওয়া উচিত : وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ (প্রত্যেক ব্যক্তির ভেবে দেখা উচিত– আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। –হাশর, আয়াত ১৮)

২. অর্থাৎ যাদের জন্য গোমরাহী নির্ধারিত হয়ে গেছে, তারা হচ্ছে সেই সব লোক, যারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে আপন দোস্ত ও বন্ধু নির্ধারণ করে নিয়েছে। আর মজার ব্যাপার এই যে, এই প্রকাশ্য গোমরাহী সত্ত্বেও ওরা মনে করে যে, আমরা সঠিক পথে আছি এবং ধর্মীয় দিক থেকে যে পথ ও কর্মপন্থা আমরা অবলম্বন করে নিয়েছি তাই ঠিক। যেমন, সূরা কাহাফের ১০৪নং আয়াতে বলা হয়েছে– اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا (ওরা সেসব লোক, যাদের সাধনা দুনিয়ার জীবনে বিনষ্ট হয়েছে, আর ওরা মনে করতে থেকেছে, ওরা খুব ভাল কাজ করছে।)

বি. দ্র. এই আয়াতের ব্যাপকতা থেকে প্রমাণিত হয়, অবাধ্য ও হঠকারী কাফেরের মত সেই কাফেরও فَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ এর অন্তর্ভুক্ত, যে আসলেই ভুল বুঝের কারণে বাতিলকে সত্য মনে করেছে। বুঝের এই ভুল–চিন্তা-ফিকির না করার কারণে হোক, অথবা এ কারণে যে, যদিও সে বাহ্যত চিন্তা-ফিকিরে পূর্ণ শক্তি ব্যায় করেছে, কিন্তু এমন সুস্পষ্ট বিষয় না বোঝা এর আলামত যে, সে চিন্তাশক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগায়নি।

মোটকথা, নাজাতের জন্য যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা জরুরী, সেসব এতই সমুজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট যে, একমাত্র হঠকারিতা বা চিন্তা-ফিকিরের ত্রুটি ছাড়া সেসবের অস্বীকৃতির আর কোনই কারণ নেই।

যা হোক, 'কুফর' এমন এক মারাত্মক বিষ যে, তা জেনেশুনে বা ভুল বুঝে, যেভাবেই খাওয়া হোক, মানুষকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। আহলে-সুন্নত ওয়াল-জামাতের অভিমত এটাই।

আর তাফসীরে 'রূহুল মাআনী'তে এ বিষয়ে যাদের মতবিরোধ উল্লেখিত হয়েছে, তারা হচ্ছে 'জাহেজ' ও 'আমবরী', এরা আহলে-সুন্নত ওয়াল-জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তারা 'মুতাযিলা' হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং মুতাযিলারা তাদের ইসলাম সম্পর্কে আপত্তি করে থাকে।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ۝

৩১. হে আদম-সন্তানেরা! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় নিজেদের শোভা অবলম্বন কর (অর্থাৎ পোশাক পরে নাও), এবং খাও ও পান কর আর অপব্যয় করো না। নিশ্চয় আল্লাহ অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না[১]।

[রুকূ - ৪]

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۭ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ

৩২. আপনি বলুন, 'কে হারাম করেছে আল্লাহর সৌন্দর্য (অর্থাৎ তাঁর সৃষ্ট সাজ-সজ্জার উপকরণসমূহ), যা তিনি আপন বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং (কে হারাম করেছে) খাওয়ার পাক-পবিত্র দ্রব্যাদি?' আপনি বলুন, 'এসব নে'য়ামত দুনিয়ার জীবনে (প্রকৃতপক্ষে) ঈমানদারদের জন্য, কিয়ামতের দিন একমাত্র তাদেরই জন্য'। এভাবেই আমি আয়াতসমূহ

---

১. এ আয়াতগুলি সেই লোকদের বিরুদ্ধে নাযিল হয়েছে, যারা উলঙ্গ হয়ে কাবা শরীফের তওয়াফ করত এবং তাকে বড়ই নৈকট্যের কাজ ও পরহেজগারী মনে করত। তাছাড়া জাহেলী যুগের কেউ কেউ হজের দিনগুলিতে যেটুকু দ্বারা প্রাণ বাঁচে, তার চেয়ে অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ এবং ঘি-চর্বি ইত্যাদির ব্যবহার বর্জন করত। কতক লোক ছাগলের দুধ ও গোশত থেকে বিরত থাকত।

এসব সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এসব কোন নেকী ও তাক্ওয়ার বিষয় নয়। আল্লাহর দেওয়া যে পোশাকের দ্বারা তোমাদের শরীরের আচ্ছাদন ও সাজসজ্জা হয়, তা তাঁর ইবাদতের সময় অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি ব্যবহারযোগ্য, যাতে বান্দারা আপন প্রতিপালকের দরবারে তাঁর নে'য়ামতরাজির নিদর্শন নিয়ে হাযির হয়। আর আল্লাহ যা কিছু পরিধান ও পানাহার করতে দিয়েছেন, সেগুলি দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। তবে শর্ত এই যে, অপচয় যেন না হয়।

إسراف এর অর্থ 'সীমা লঙ্ঘন করা'। এর কয়েকটি অবস্থা হতে পারে– যেমন:

(ক) হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করে নেওয়া, (খ) হালাল অতিক্রম করে হারাম বস্তুও উপভোগ করতে শুরু করা, (গ) অন্ধের মত বাছবিচার না করে লোভে পড়ে খাওয়ায় লেগে যাওয়া, (ঘ) ক্ষুধা ছাড়াই খেতে শুরু করা, (ঙ) অসময়ে খাওয়া, (চ) এত কম খাওয়া, যা শরীর-স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি রক্ষা করতে যথেষ্ট নয়, (ছ) স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর দ্রব্যাদি ব্যবহার করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

اسراف শব্দটি উক্ত সব বিষয়কেই শামিল করে। অপব্যয় করাও এর অন্যতম শাখা। শব্দটির এই ব্যাপকতার কারণেই কোন এক পূর্ববর্তী বুযুর্গ বলেছেন- جمع الله الطب كله في نصف آية

كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

তাদের জন্য সবিস্তারে বর্ণনা করি, যারা জানে (ও বোঝে)[১]।

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

৩৩. আপনি বলুন, 'আমার রব তো হারাম করেছেন শুধু অশ্লীল বিষয়াদি– তার মধ্যে যা প্রকাশ্য তাও এবং যা গোপন তাও; এবং (হারাম করেছেন) পাপ[২], অন্যায় বাড়াবাড়ি

১. বিশ্বের সমস্ত জিনিস এ জন্যই পয়দা করা হয়েছে, যেন মানুষ সংগতভাবে সেসবের দ্বারা উপকৃত হয়ে মহামহিম স্রষ্টার ইবাদত, আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতায় রত হয়। এ হিসাবে দুনিয়ায় সমগ্র নে'য়ামত আসলে মুমিন ও অনুগতদের জন্যই পয়দা হয়েছে। অবশ্য কাফেরদেরও এসব থেকে বাধা দেওয়া হয়নি, ওরাও নিজেদের কর্ম ও চেষ্টা দ্বারা পার্থিব লাভালাভ হাসিল করতে থাকে। বরং ঈমানদারগণ যখন ঈমানী শক্তি ও তাক্ওয়ায় দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন এসব জবরদখলকারীকে নিজেদের কর্ম-প্রচেষ্টায় বাহ্যত বেশি সফল মনে হয়। একে কিছুটা তো কাফেরদের অস্থায়ী কাজকর্মের ফল মনে করা উচিত, আর কিছুটা মুমিনদের জন্য সতর্কতা ও ভর্ৎসনাস্বরূপ দেখা উচিত। ইরশাদ হচ্ছে–

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(যারা দুনিয়ার জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করবে, আমি দুনিয়াতে তাদেরকে নিজ আমলের পূর্ণ ফল দান করব এবং এখানে তাদের কম দেওয়া হবে না। এরাই তারা, যাদের জন্য আখেরাতে আগুন ছাড়া কিছু নেই এবং যা কিছু তারা এখানে করেছে, তা বরবাদ হবে এবং যা তারা অর্জন করেছে, তা নিষ্ফল হবে। –হুদ, আয়াত ১৫-১৬)

বাকি রইল আখেরাতের নে'য়ামতসমূহ– সেগুলি একমাত্র ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত।

কোন কোন আলেম خالصة يوم القيامة এর এই অর্থ করেছেন যে, পার্থিব নে'য়ামত নির্ভেজাল নয়। কারণ, সেগুলির সাথে অনেক চিন্তা-ফিকির ও দুঃখ-কষ্টও সহ্য করতে হয়। পক্ষান্তরে, আখেরাতের নে'য়ামতসমূহ হর রকমের ভেজালমুক্ত হবে।

আর الدر المنثور গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণিত হয়েছে : পার্থিব নে'য়ামতরাজি পরকালে বিপদ না হওয়াটা একমাত্র মুমিনদের জন্যই। পক্ষান্তরে, এখানকার ভোগবিলাস কুফর ও অকৃতজ্ঞতার কারণে কাফেরদের পক্ষে শাস্তি ও বিপদ হয়ে দাঁড়াবে।

২. إِثْم দ্বারা সমস্ত গোনাহ উদ্দেশ্য। আর বিশেষ কতক গোনাহ স্থানোপযোগী হিসাবে বা গুরুত্বের জন্য আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর কারো কারো নিকট إِثْم বলতে শুধু সেই গোনাহ উদ্দেশ্য, যার সম্পর্ক গোনাহগার ছাড়া অন্য লোকদের সাথে নয়। والله أعلم

وَاَنۡ تُشۡرِكُوۡا بِاللّٰهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهٖ سُلۡطٰنًا وَّاَنۡ تَقُوۡلُوۡا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۳۳﴾

এবং আল্লাহর সঙ্গে এমন জিনিসকে শরীক করা, যার বিষয়ে কোন সনদ তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং (হারাম করেছেন) আল্লাহর প্রতি এমন সব কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না[১]।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمۡ لَا يَسۡتَاۡخِرُوۡنَ سَاعَةً وَّلَا يَسۡتَقۡدِمُوۡنَ ﴿۳۴﴾

৩৪. প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে একটি নির্ধারিত সময়। অতঃপর যখন তাদের সেই নির্ধারিত সময় এসে পড়বে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পেছাতে পারবে এবং না আগে যেতে পারবে[২]।

---

১. যেমন অশ্লীল বিষয়াদি সম্পর্কে ওরা বলত– والله أمرنا بها ('আল্লাহ তাআলাই আমাদের এসব করতে হুকুম করেছেন।')

২. এস্থলে সন্দেহ হতে পারে যে, নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়ে যাওয়ার পর বিলম্ব হওয়া সম্ভব, তাই তা নাকচ করা জরুরী ছিল। কিন্তু সময় উপস্থিত হওয়ার পর তার পূর্বে যাওয়া তো আদৌ সম্ভবই নয়। সুতরাং তা নাকচ করার কী ফায়দা?

এই সন্দেহের কারণেই মুফাসসিরদের কেউ কেউ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ কে عطف (সম্পৃক্ত) করেছেন (পূর্ববর্তী) বাক্য إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ এর সাথে। আর কেউ কেউ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ এর অর্থ করেছেন– 'যখন সেই সময় নিকটবর্তী হবে'।

আমার নিকট এসব 'তাকাল্লুফাত' (অর্থাৎ কষ্টকল্পনা) করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, কোন কোন বিষয়ের দু'টি বিপরীতমুখী দিক থাকে, যার মধ্যে একটি সম্ভব, আর অপরটি অসম্ভব। তবে বিষয়টিকে জোরদারভাবে উপস্থাপন করার জন্য সম্ভাব্য দিকটি নাকচ করার সাথে সাথে যে দিকটি আগে থেকেই অসম্ভব তাও নাকচ করা হয়, যদিও অসম্ভব হওয়ায় এর প্রয়োজন নেই। যেমন, পন্যের দর জানার পর ক্রেতা জিজ্ঞাসা করে, কিছু 'কমবেশি' হবে কিনা? এবং দোকানদারও বলে দেয়, 'কমবেশি' হবে না। উদ্দেশ্য হল– কম হবে না। তবে মূল্য সুনির্ধারিত, এ কথা জোরদারভাবে বলার জন্য 'কম'কে নাকচ করার সাথে সাথে 'বেশি'কেও নাকচ করা হয়।

তদ্রূপ এখানেও উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর ওয়াদা (বা মৃত্যুসময়) যখন উপস্থিত হবে, তখন তা অটল থাকবে– এ কথা জোরালোভাবে বলার উদ্দেশ্য বিলম্ব করাকে নাকচ করার সাথে সাথে আগে যাওয়াকেও নাকচ করা হয়েছে।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহর উপর মিথ্যারোপকারী এবং তাঁর নামে হারামকে হালাল সাব্যস্তকারীরা আল্লাহর দেওয়া অবকাশ দেখে নিশ্চিন্ত যেন না হয়। প্রত্যেক উম্মত ও প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে একটি নির্ধারিত সময়সীমা রয়েছে। যখন শাস্তির সেই মুহূর্ত এসে উপস্থিত হবে, তখন আর কোন অন্যথা হতে পারবে না।

৩৫. হে আদম-সন্তানেরা! যদি তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য থেকে রাসূলগণ আগমন করেন, যাঁরা তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবেন– তবে তখন যারা ভয় করবে ও (নিজেদের) সংশোধন করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।	يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝
৩৬. আর যারা আমার আয়াতগুলি অস্বীকার করবে এবং অহংকারবশত তা (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থাকবে তারা হবে জাহান্নামী, তারা তাতে চিরকাল থাকবে[১]।	وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

১. ইবনে জারীর, আবু ইয়াসার সুলামী থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, يَابَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ –এই যে 'সম্বোধন', তা 'আলমে আরওয়াহ'তে সমগ্র আদম-সন্তানদের প্রতি করা হয়েছিল। সূরা বাকারার আয়াত– قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى (–বাকারা, আয়াত ৩৮)– থেকে এদিকে ইঙ্গিত হয়।

আর কোন কোন বিজ্ঞ আলেম বলেন, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতিকে সম্বোধন করে উক্ত কথা বলা হয়েছে। বর্তমান আয়াতে তারই বর্ণনা রয়েছে।

আমার মতে বক্ষমান আয়াতসমূহের সারমর্ম এই যে, আসল নিবাস বেহেশত থেকে আদম ও হাওয়াকে যখন সাময়িকভাবে মাহরূম করে দেওয়া হল, তখন তাঁদের খাঁটি তওবা ও অনুশোচনার প্রতি লক্ষ করে মুনাসিব মনে হল যে, এই নিবাস ফেরত পাওয়ার নিমিত্ত কিছু উপদেশ দান করা হোক। সে মত يَا بَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا الخ থেকে শুরু করে তিন চার রুকূ পর্যন্ত এসব উপদেশই দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান (৩৫-৩৬) আয়াতগুলিতে সমস্ত আদম-সন্তানকে বর্তমান ও উপস্থিত ধরে নিয়ে তাদের প্রতি সাধারণ সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদের সকলের উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলা বলছেন— বেহেশত থেকে বের হওয়ার পর আমি তোমাদের জন্য বেহেশতী লেবাস ও খাদ্যের স্থলে পার্থিব লেবাস ও খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এবং সর্বপ্রকার আরাম-আয়েশের উপকরণ দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ তোমাদের দিয়েছি, যাতে তোমরা এখানে শান্তির সাথে থেকে নিজেদের আসল ও পৈতৃক উত্তরাধিকার (বেহেশত) ফেরত পাওয়ার চেষ্টা-তদবীর করতে পার।

তোমাদের উচিত অভিশপ্ত শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা সম্বন্ধে সতর্ক থাকা, যাতে সে তোমাদের চিরতরে সেই আসল নিবাস থেকে বঞ্চিত করে দিতে না পারে। অশ্লীলতা, পাপাচার ও অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থেকো, এখলাস ও দাসত্বের পথ অবলম্বন করো। আর আল্লাহর নে'য়ামতসমূহ উপভোগ করো, তবে প্রকৃত মালিক যেসব সীমা নির্ধারণ করে

৩৭. অতএব ওর চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতগুলি অস্বীকার করে[১]? এমন লোকদের কাছে তাদের অংশ পৌঁছে যাবে যা (তাদের জন্য) লিখিত আছে[২]। অবশেষে যখন ওদের নিকট আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ পৌঁছবে ওদের জান কব্জ করতে, তখন ফেরেশতারা

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا

দিয়েছেন সেগুলি অতিক্রম করো না। তারপর দেখো, প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ নির্ধারিত সময়কাল পূর্ণ করে কীভাবে নিজ ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছে।

আর দেখো, এ অন্তরবর্তী সময়ে যদি আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য থেকে নিজ পয়গম্বরদের প্রেরণ করেন, যাঁরা তোমাদের আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবেন, যেগুলির দ্বারা তোমরা তোমাদের আদি পিতার আসল উত্তরাধিকার (বেহেশত) হাসিল করার জন্য উৎসাহ ও উপদেশ পাবে এবং প্রকৃত মালিকের সন্তুষ্টির পথসমূহ জানতে পারবে –তবে তোমরা তাঁদের আনুগত্য ও সাহায্য করো; আল্লাহকে ভয় করে অপকর্ম বর্জন করো এবং সৎকর্ম অবলম্বন করো।

এসব করলে তোমাদের ভবিষ্যত সম্পূর্ণ নির্ভয় ও নিরাপদ হবে। তোমরা এমন স্থানে পৌঁছে যাবে যেখানে সুখ, নিরাপত্তা, ও শান্তি ছাড়া অন্য কোনো জিনিস নেই। আর যদি আমার আয়াতগুলিকে মিথ্যা বল এবং অহংকারবশত তদনুসারে আমল না কর, তবে আসল নিবাস ও পৈতৃক উত্তরাধিকার থেকে চিরবঞ্চিত এবং অনন্ত শাস্তি ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

যা হোক, যারা খতমে-নবুওয়াত সম্পর্কিত অকাট্য আয়াত ও হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ করে আলোচ্য আয়াত দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য নবী-রাসূলের আগমনের দ্বার উন্মুক্ত হওয়াকে প্রমাণ করতে চায়, তাদের জন্য এস্থলে স্বীয় মতলব হাসিলের কোন অবকাশ নেই।

১. অর্থাৎ যে সত্য নবীগণ সত্যই আল্লাহর আয়াত শুনিয়ে থাকেন, তাঁদের প্রতি ঈমান আনা ও তাঁদের সমর্থন করা জরুরী। আর যে ব্যক্তি নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করে ও মিথ্যা আয়াত রচনা করে অথবা যে ব্যক্তি কোন সত্য নবীকে ও তাঁর আনীত আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা বলে, এই উভয় থেকে বড় জালেম আর কেউ নেই।

২. অর্থাৎ দুনিয়াতে বয়স ও রিযিক ইত্যাদি যতটুকু নির্ধারিত আছে তা তারা পাবে। অথবা অর্থ এই যে, এখানকার লাঞ্ছনা ও অপমান যা ওদের জন্য লিখিত আছে, তা জুটবে। অতঃপর মৃত্যুর সময় ও মৃত্যুর পর যে অবস্থা হবে, তার আলোচনা সামনে আসছে।

আর যদি نصيبهم من الكتاب দ্বারা দুনিয়ার না হয়ে পরকালের শাস্তি উদ্দেশ্য হয়, তবে حتّٰى إذا جاءتهم দ্বারা এদিকে ইশারা করা উদ্দেশ্য হবে যে, পরকালীন শাস্তির সিলসিলা পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্তগুলিতে শুরু হয়ে যায়।

বলবে, 'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকতে তারা কোথায়?' ওরা বলবে, 'তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে'। এবং ওরা নিজেদের ব্যাপারে স্বীকার করবে যে, ওরা ছিল কাফের[১]।

ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ۝

৩৮. আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা জিন ও মানুষের (কাফের) দলগুলোর সাথে— যেগুলো তোমাদের পূর্বে গত হয়েছিল— দোযখে প্রবেশ কর'[২]। যখনই কোন দল (তাতে) প্রবেশ করবে, তারা অন্য দলকে লা'নত করবে[৩]। অবশেষে যখন এক এক করে গিয়ে সকলে তাতে একত্র হবে, তখন ওদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, 'হে আমাদের রব! এরাই আমাদের গোমরাহ করেছিল। অতএব তুমি এদেরকে আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি দাও'। তিনি বলবেন, 'সকলের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ

---

১. অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যখন অতি কঠোরতার সাথে ওদের জান কবজ করে নিয়ে যান, তখন ওদের জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা ডাকতে তারা কোথায় গেল যে, এখন তোমাদের উপকারে আসছে না? তাদের ডাক, যাতে তোমাদের এ বিপদ থেকে মুক্ত করে দেয়। —তখন কাফেররা এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, আমরা মহাভ্রান্তিতে পতিত হয়ে এমন সব জিনিসকে মা'বূদ ও সাহায্যকারী বানিয়েছিলাম, যারা এর যোগ্য ছিল না। আর আমাদের এ মুসীবতের সময় তাদের কোনো পাত্তা নেই।

কিন্তু এ অসময়ের স্বীকারোক্তি ও অনুশোচনায় ওদের কী লাভ হতে পারে?

তবে কোন কোন আয়াতে যে এসেছে– ওরা নিজেদের কুফর ও শিরককে অস্বীকার করবে, তো তা বর্তমান আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা কিয়ামতের স্থান ও অবস্থা বিভিন্ন হবে এবং শ্রেনীও অসংখ্য হবে। কোথাও এক স্থান বা এক শ্রেণীর উল্লেখ আছে আর কোথাও অন্যটির।

২. অর্থাৎ সকল কাফেরকে দোযখেই প্রবেশ করতে হবে।

৩. অর্থাৎ এ বিপদে পরস্পর সহানুভূতি তো দূরের কথা, দোযখীরা একে অন্যকে অভিশাপ ও ভর্ৎসনা করবে। সম্ভবত অনুসারীরা নিজেদের সরদারদের বলবে, 'তোমাদের উপর আল্লাহর লানত হোক, তোমরা নিজেদের সাথে আমাদের নিয়ে ডুবলে'। আর সরদাররা অনুসারীদের বলবে, 'হে অভিশপ্তরা! আমরা গর্তে পড়ে থাকলে তোমরা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলে কেন?' ইত্যাদি

وَلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ۝

শাস্তি, কিন্তু তোমরা জান না[১]।'

وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝

৩৯. আর ওদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের বলবে, 'অতএব আমাদের উপর তোমাদের কোনই শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এখন শাস্তি আস্বাদন কর নিজেদের কৃতকর্মের কারণে'[২]।

[রুকূ - ৫]

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ

৪০. যারা আমার আয়াতগুলি অস্বীকার করেছে এবং অহংকারবশত: তা (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থেকেছে, তাদের জন্য আকাশের দ্বারসমূহ আদৌ উন্মুক্ত করা হবে না[৩] এবং

---

১. অর্থাৎ এক হিসাবে পূর্ববর্তীদের গোনাহ দ্বিগুণ। কারণ, নিজেরা গোমরাহ হয়েছে এবং পরবর্তীদের জন্য পথ তৈরি করেছে। আর এক হিসাবে পরবর্তীদের গোনাহও দ্বিগুণ। কারণ, নিজেরা বিভ্রান্ত হয়েছে এবং পূর্ববর্তীদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি (অতএব সকলের শাস্তিও দ্বিগুণ)।

অথবা যেহেতু প্রত্যেক দোযখীর শাস্তি নিজ নিজ স্তর অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে, এ জন্য বলা হয়েছে, প্রত্যেকের শাস্তি দ্বিগুণ হতে থাকবে। আর পূর্ববর্তীদের শাস্তি দ্বিগুণ করায় পরবর্তীদের কোন আরাম ও শান্তি লাভ হবে না।

এই ব্যাখ্যা তখন প্রযোজ্য, যখন لكل দ্বারা উভয় দল উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু ইবনে কাছীর (র)-এর মতে (لكل-দ্বারা পূর্ববর্তীদের প্রত্যেকে উদ্দেশ্য, সুতরাং) এ আয়াতের অর্থ এই যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তীদের প্রত্যেকের জন্য তার পাপানুসারে দ্বিগুণ শাস্তির ব্যবস্থাই রেখেছেন। যেমন, অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ (যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে, আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করে দেব। -নাহল, আয়াত ৮৮) এবং وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ (অবশ্যই ওরা বহন করবে নিজেদের বোঝা এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরো অনেক বোঝা। -আনকাবূত, আয়াত ১৩) -এবং وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ (এবং তাদেরও বোঝার একটা অংশ বহন করবে, যাদের ওরা পথভ্রষ্ট করেছে- নাহল : ২৫)।

২. অর্থাৎ আমাদের শাস্তি বৃদ্ধির দরখাস্ত করে তোমাদের কী লাভ হল? তোমাদের শাস্তি কি কমল? তা নয়, বরং তোমাদেরও নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে।

৩. অর্থাৎ না এ জীবনে ওদের আমলের জন্য আসমানী স্বীকৃতি ও মর্যাদা আছে, আর না মৃত্যুর পর ওদের রূহগুলো আসমানের উপর ওঠার অনুমতি পাবে। সহীহ হাদীসে রয়েছে, মৃত্যুর পর কাফেরদের রূহকে আসমানের দিক থেকে ধাক্কা মেরে সিজ্জীনের দিকে পাঠিয়ে

حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ۝

তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না– যে পর্যন্ত না উট সুচের ছিদ্রে ঢুকে যায়[১]। এভাবেই আমি অপরাধীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।

৪১. لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ۝

ওদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের বিছানা এবং ওদের উপর থেকে রয়েছে (আগুণের) আচ্ছাদন[২]। এভাবেই আমি জালেমদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।

৪২. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে– আমি কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার অর্পণ করি না– তারা জান্নাতবাসী, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে[৩]।

৪৩. وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ

আর তাদের অন্তরে যা কিছু ক্ষোভ ছিল, আমি তা বের করে দেব[৪]। তাদের তলদেশে

দেওয়া হয় এবং মুমিনের রূহ সপ্তম আসমান পর্যন্ত আরোহন করে থাকে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৮৫৩৪; শুআবুল ঈমান, হাদীস : ৩৯০) –বিস্তারিত অবস্থা হাদীসের কিতাবসমূহে দ্রষ্টব্য।

১. এ হচ্ছে– تعليق بالمحال , অর্থাৎ কোন বস্তুকে একটি অসম্ভব বিষয়ের সঙ্গে শর্তযুক্ত করে বোঝানো যে, এ আদৌ সম্ভব নয়। প্রত্যেক ভাষাতেই এর উদাহরণ বর্তমান রয়েছে।

এস্থলে বলা হচ্ছে, উটের পক্ষে তার বিরাট দেহ নিয়ে যেমন সুচের সংকীর্ণ ও ছোট্ট ছিদ্রে প্রবেশ করা অসম্ভব, তেমনি অস্বীকারকারী ও অহংকারীদের পক্ষে বেহেশতে প্রবেশ করাও অসম্ভব। কেননা, আল্লাহ তাআলা ওদের চিরজাহান্নামী হওয়ার সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর জ্ঞানে ওদের জন্য শাস্তিই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। অতএব তাঁর ইলম ও সংবাদের পরিপন্থী কিছু আর ঘটতে পারে না।

২. অর্থাৎ সর্বদিক থেকে আগুন ওদের ঘিরে রাখবে– কোনো পাশেই আরাম পাবে না।

৩. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا বাক্যটি মূল কথার মাঝে একটি ভিন্ন কথা, যা দ্বারা (একটি মূলনীতি সম্পর্কে) অবহিত করা হয়েছে। তা এই যে, যে ঈমান ও সৎকর্মের প্রতিদান এত আজীমুশ শান, তা এমন কোন কঠিন জিনিস নয়, যা মানুষের সাধ্যাতীত।

অথবা অর্থ এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে ততটুকু কাম্য, যতটুকু তার সামর্থ্যে রয়েছে। এর বেশি তার কাছে দাবি করা হচ্ছে না।

৪. نَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ এর অর্থ এই যে, বেহেশতের নেয়ামতসমূহ নিয়ে বেহেশতবাসীদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না, প্রত্যেকেই নিজেকে

تَجۡرِيۡ مِنۡ تَحۡتِهِمُ الۡاَنۡهٰرُ ۚ وَقَالُوا الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِيۡ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۟ وَمَا كُنَّا لِنَهۡتَدِيَ لَوۡ لَاۤ اَنۡ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدۡ جَآءَتۡ رُسُلُ رَبِّنَا بِالۡحَقِّ ؕ وَنُوۡدُوۡۤا اَنۡ تِلۡكُمُ الۡجَنَّةُ اُوۡرِثۡتُمُوۡهَا بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۴۳﴾

প্রবাহিত হবে নহরমালা এবং তারা বলবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়েছেন। যদি আল্লাহ আমাদের না পৌঁছাতেন, তবে আমরা পৌঁছতে পারতাম না। নিশ্চয় আমাদের রবের রাসূলগণ (আমাদের নিকট) সত্যবাণী নিয়ে এসেছিলেন[১]। আর তাদের ডেকে বলা হবে, 'এ হচ্ছে জান্নাত, তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী বানানো হল— সেসব আমলের কারণে যা তোমরা করতে'[২]।

নিয়ে ও অপর ভাই যে মর্যাদায় সমাসীন আছে, তাকে সেখানে দেখে আনন্দিত হবে। পক্ষান্তরে দোযখীরা বিপদের সময় একে অন্যকে অভিশাপ ও ভর্ৎসনা করবে। ইতিপূর্বে এর আলোচনা হয়েছে।

অথবা অর্থ এই যে, নেক বান্দাদের মধ্যেও দুনিয়ায় কখনো কোন বিষয়ে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হয়ে যায় এবং একের ক্ষেত্রে অন্যের অস্বস্তির সম্মুখীন হতে হয়। বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে এ সবই অন্তর থেকে বের করে দেওয়া হবে। সেখানে সকলে একে অন্যের প্রতি নির্মলচিত্ত হবে। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেছেন, 'আমার আশা– উছমান, তালহা, যুবাইর ও আমি এমন লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত হব।'

বিজ্ঞ মুতারজিম (قدس الله روحه) এই দ্বিতীয় মর্ম হিসাবেই (আয়াতাংশের) তরজমা করেছেন।

১. অর্থাৎ খোদার সাহায্যে এবং রাসূলদের সঠিক পথপ্রদর্শনের ফলেই এই সর্বোচ্চ মাকামে পৌঁছার সৌভাগ্য হল। নতুবা আমরা কোথায়, আর এই মর্যাদা কোথায়!

২. এ কথা আল্লাহর তরফ থেকে কোনো ফেরেশতা ঘোষণা করবেন। অর্থাৎ আজ সব চেষ্টা-সাধনা সার্থক হল এবং তোমরা আল্লাহর ফযলে চেষ্টা করে নিজেদের আদি পিতা আদমের মীরাছ (বেহেশত) চিরকালের জন্য হাসিল করে নিলে।

হাদীসে আছে, 'কোন ব্যক্তির আমল কখনো তাকে বেহেশতে দাখিল করবে না।' এর অর্থ এই যে, আমল বেহেশতে প্রবেশের প্রকৃত ওসীলা নয়; শুধু বাহ্যিক কারণ। বেহেশতে প্রবেশের প্রকৃত ওসীলা হচ্ছে আল্লাহর অসামান্য রহমত, যেমন উক্ত হাদীসেরই শব্দাবলী– إلاّ أن يتغمّدني الله برحمته (যদি আল্লাহ নিজ রহমতে আমাকে ঢেকে না নেন) থেকে সুস্পষ্ট। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৬৭৩) হাঁ, বান্দার উপর আল্লাহর রহমত সেই পরিমাণই অবতীর্ণ হয়ে থাকে, যতটুকু আমলের রূহ তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

মুতারজিম হযরত শাইখুল হিন্দ (র) বলতেন, গাড়ি তো আল্লাহর রহমতের জোরেই চলে, তবে আমল হচ্ছে সেই ঝাণ্ডা (বা পতাকা), যার ইঙ্গিতে গাড়ি (ট্রেন) চলে ও থামে।

৪৪. আর জান্নাতবাসীরা জাহান্নামীদের ডেকে বলবে, 'আমাদের রব আমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছিলেন, আমরা তা সত্য পেয়েছি। তোমরাও কি তোমাদের রব যে ওয়াদা করেছিলেন, তা সত্য পেয়েছ?' ওরা বলবে, 'হাঁ'। অতঃপর এক ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে, 'আল্লাহর লা'নত জালেমদের উপরে–

وَنَادٰۤى اَصۡحٰبُ الۡجَنَّةِ اَصۡحٰبَ النَّارِ اَنۡ قَدۡ وَجَدۡنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلۡ وَجَدۡتُّمۡ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمۡ حَقًّا ؕ قَالُوۡا نَعَمۡ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيۡنَهُمۡ اَنۡ لَّعۡنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيۡنَ ۝

৪৫. 'যারা (লোকদের) আল্লাহর পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করত। আর ওরা ছিল আখেরাতে অবিশ্বাসী[১]।'

الَّذِيۡنَ يَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَيَبۡغُوۡنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمۡ بِالۡاٰخِرَةِ كٰفِرُوۡنَ ۝

৪৬. আর উভয় দলের মাঝে থাকবে একটি প্রাচীর[২]। এবং আ'রাফের উপর কিছু লোক

وَبَيۡنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الۡاَعۡرَافِ

---

১. এ আয়াতগুলিতে (৪৪-৫০) সেসব সংলাপের উল্লেখ রয়েছে, যা জান্নাতবাসী ও দোযখীদের মধ্যে অথবা এ উভয় ও আ'রাফবাসীদের মধ্যে সংঘটিত হবে।

জান্নাতবাসী ও দোযখবাসীদের মধ্যে সংঘটিত প্রথম সংলাপ (যা এ আয়াতে বিবৃত হয়েছে) ও শেষ কথোপকথনটি (যা ৫০ নং আয়াতে আসছে)— পরিষ্কার প্রকাশ করছে যে, এই সংলাপ বেহেশত-দোযখে প্রবেশের পরবর্তী সময়ের। এজন্য আ'রাফবাসীদের সাথেও তাদের কথাবার্তা তার পরেই হবে বলে ধরতে হবে।

যা হোক, বেহেশতীরা বেহেশতে পৌঁছে নিজেদের আনন্দ প্রকাশার্থে এবং দোযখীদের কটাক্ষ ও তিরস্কার করার জন্য বলবে, আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরদের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যেসব ওয়াদা করেছিলেন অর্থাৎ ঈমান আনয়নকারীরা শ্বাশত নে'য়ামতসমূহ লাভ করবে– আমরা তো সেসব সত্য পেয়েছি। হে দোযখবাসীরা! তোমরা বল তো, তোমাদের কুফর ও পাপাচার সম্পর্কে যেসব ভয় ও ধমক দেওয়া হয়েছিল, তোমরাও কি সেসব সত্য পেয়েছ?

বলা বাহুল্য, উত্তরে ওরা 'হাঁ' ছাড়া আর কী বলতে পারে? ঐ সময় আল্লাহর এক ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করবেন যে, (এমনি তো পাপী বহু রয়েছে, তবে) আল্লাহর কঠিন অভিশাপ হোক সেই জালেমদের উপর, যারা নিজেরা তো গোমরাহ হয়েছেই, তদুপরি আখেরাতের পরিণাম সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে অন্যদেরও সত্য পথে বাধা দিয়েছে এবং নিজেদের বক্র যুক্তি-তর্ক দ্বারা পরিষ্কার ও সরল পথকে সর্বদা বাঁকা প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছে।

২. 'حجاب' এর অর্থ পর্দা বা আচ্ছাদন। এখানে পর্দা বলে প্রাচীর বোঝানো উদ্দেশ্য। সূরা হাদীদে (আয়াত ১৩) আরো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে- فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ (অতঃপর তাদের মাঝখানে দরজাবিশিষ্ট একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে।)

رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمٰىهُمْ ۚ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۟ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ۝

থাকবে, যারা প্রত্যেক (দল)কে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনে নেবে এবং তারা জান্নাতবাসীদের ডেকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম'। তারা তখনো জান্নাতে প্রবেশ করেনি, তবে তারা (এর) আশাবাদী হবে[১]।

উক্ত প্রাচীরের কারণে বেহেশতের ভোগ-বিলাস দোযখ পর্যন্ত এবং দোযখের দুঃখ-কষ্ট বেহেশত পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। তবে এর বিস্তারিত অবস্থা আমাদের জানা নেই।

১. উক্ত মধ্যবর্তী প্রাচীরের উপর যে স্থান, তাকে আ'রাফ বলে।

আ'রাফবাসী কারা?

এ সম্পর্কে (বিশিষ্ট মুফাসসির) কুরতুবী বারটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে আমাদের নিকট বেশি গ্রহণযোগ্য উক্তি তা-ই, যা হযরত হুযায়ফা, ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমের মত অত্যন্ত মর্যাদাশালী সাহাবা এবং অধিকাংশ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মনীষী থেকে বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে, আমলের ওজন হওয়ার পর যাদের সৎকর্ম ভারী হবে তারা বেহেশতী এবং যাদের দুষ্কর্ম অধিক হবে তারা দোযখী। আর যাদের সৎকর্ম ও অসৎকর্ম একেবারে সমান সমান হবে তারা হচ্ছে আ'রাফবাসী।

হাদীস থেকে বোঝা যায়, শেষ পর্যন্ত আ'রাফবাসীরা বেহেশতে যাবে। (তাফসীরে তবারী ১০/২২১-২২২) আর এটা এমনিতেও সুস্পষ্ট, যেহেতু ঈমানদারদের মধ্যে সেইসব পাপী, যাদের অসৎকর্ম অধিক ছিল, তারাও শেষপর্যন্ত জাহান্নাম থেকে বের হয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে। সুতরাং আ'রাফবাসীরা, যাদের সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সমান, তাদের তো পাপী ঈমানদারদের পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করার কথা।

আসহাবে আরাফকে أصحاب اليمين (অর্থাৎ ডানদিকের দল) এর একটি দুর্বল শ্রেণী বোঝা উচিত। ঠিক যেমন سابقين مقربين বস্তুত أصحاب اليمين-এর এমন একটি শ্রেণী, যারা নিজেদের উন্নততর আমলের বদৌলতে সাধারণ أصحاب يمين এর চেয়ে কিছুটা অগ্রবর্তী হয়ে গিয়েছেন, পক্ষান্তরে أصحاب أعراف হচ্ছে পশ্চাদ্বর্তী শ্রেণী, যারা আমলের পরিমাণ কম হওয়ায় সাধারণ বেহেশতীদের থেকে কিছুটা পিছনে রয়ে গেছে।

এরা জাহান্নামী ও বেহেশতীদের মধ্যস্থলে হওয়ার কারণে উভয় শ্রেণীর লোকদেরকে তাদের বিশেষ বিশেষ চিহ্নের দ্বারা চিনতে পারবে– বেহেশতীদেরকে তাদের সাদা ও সমুজ্জ্বল চেহারা দ্বারা এবং দোযখীদেরকে ওদের বিবর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন চেহারা দ্বারা।

যা হোক, আ'রাফবাসীরা বেহেশতবাসীদের দেখে মুবারকবাদস্বরূপ সালাম করবে এবং নিজেরা এখনো বেহেশতে প্রবেশ করতে পারেনি বলে তার আশা ও কামনা করবে, যা শেষ পর্যন্ত পূরণ করা হবে।

৪৭. আর যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের দিকে ফেরানো হবে, তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদের পাপী লোকদের সাথে রেখো না☆১।'

وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۟

[রুকূ - ৬]

৪৮. আর আ'রাফবাসীরা কিছু লোককে ডাকবে, যাদেরকে তারা ওদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পারবে[২], (এবং ডেকে) বলবে, 'তোমাদের দল ও যে অহংকার তোমরা করতে তা তোমাদের কোন উপকারে আসেনি[৩]।'

وَنَادٰۤى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَاۤ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ۟

৪৯. (অতঃপর জান্নাতবাসীদের দেখিয়ে বলবে), এরাই কি তারা, যাদের সম্বন্ধে তোমরা কসম খেয়ে বলেছিলে, 'আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করবেন না'? (তাদের তো বলা হয়েছে,) 'তোমরা জান্নাতে চলে যাও, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না'[৪]।

اَهٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ؕ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۟

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'পাপী লোকদের সাথী করো না'।

১. বেহেশত ও দোযখের মধ্যস্থলে হওয়ার কারণে তাদের অবস্থা হবে ভয় ও আশার মধ্যবর্তী– এদিকে দৃষ্টিপাত করে আশা করবে, আর সেদিকে লক্ষ করে ভীত হবে এবং আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে যে, আমাদের এই দোযখীদের দলে শামিল করবেন না।

২. অর্থাৎ দোযখীদের চেহারায় দোযখী হওয়ার চিহ্ন সুস্পষ্ট থাকবে। তা দ্বারা তাদের আ'রাফবাসীরা চিনতে পারবে। অথবা অর্থ এই যে, তারা এমন লোক হবে, যাদের আরাফবাসীরা দুনিয়াতে দেখে থাকবে। সেজন্য সেখানে আকৃতি দেখে চিনে ফেলবে।

৩. অর্থাৎ এই বিপদের সময় তোমাদের দলবল কোথায় গেল এবং দুনিয়াতে যে তোমরা অহংকার ও আস্ফালন করতে তার এখন কী অবস্থা?

৪. আ'রাফবাসীরা বেহেশতবাসীদের প্রতি ইশারা করে দোযখীদের বলবে, এরাই কি সেই দুর্দশাগ্রস্ত মিসকীন ও দুর্বল লোক নয়, যাদের তোমরা তুচ্ছ মনে করে বলতে, اَهٰۤؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا 'আর সকলকে বাদ দিয়ে এদের মত মানুষের উপর খোদার মেহেরবানী হতে পারে কি'? অথচ তাদের তো আজ বলে দেওয়া হয়েছে, 'নির্ভয় ও নিশ্চিন্তে জান্নাতে চলে যাও', আর তোমরা এ আযাবে রয়েছ।

৫০. আর জাহান্নামীরা জান্নাতবাসীদের ডেকে বলবে, 'আমাদের উপর কিছু পানিই ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দান করেছেন তা থেকে কিছু'। জান্নাতবাসীরা বলবে, 'আল্লাহ এ উভয়টি হারাম করে দিয়েছেন কাফেরদের জন্য–

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۵۰﴾

৫১. 'যারা নিজেদের দীনকে তামাশা ও খেলার বস্তু বানিয়েছিল এবং পার্থিব জীবন ওদের ধোঁকায় ফেলেছিল'। অতএব আজ আমি ওদের ভুলে যাব, যেমন ওরা এদিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন ওরা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত[১]।

الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿۵۱﴾

৫২. আর আমি তো ওদের নিকট এমন এক কিতাব পৌঁছিয়েছি, যা আমি জ্ঞানের ভিত্তিতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি, (এবং) যা পথপ্রদর্শক ও রহমত ঈমানদারদের জন্য[২]।

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۵۲﴾

৫৩. ওরা কি কেবল এর (অর্থাৎ এই কিতাবে বর্ণিত) পরিণামের প্রতীক্ষা করছে? যেদিন এর পরিণাম প্রকাশ পাবে, সেদিন যারা পূর্বে

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ

১. দোযখীরা পেরেশান ও অস্থির হয়ে বেহেশতবাসীদের কাছে প্রার্থনা করে বলবে, 'আমরা জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছি। আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা যেসব নে'য়ামত আল্লাহ তোমাদের দিয়ে রেখেছেন তা থেকে আমাদেরও কিছু দাও।'

উত্তরে বলা হবে, 'কাফেরদের জন্য এসব জিনিস নিষিদ্ধ। এসব কাফের তো তারাই, যারা ধর্মকে খেল-তামাশা বানাত এবং দুনিয়ার ভোগবিলাসে মত্ত থাকত।' অতএব, দুনিয়ার আনন্দে মেতে ওরা যেমন আখেরাতের চিন্তা কখনো করেনি, আজ আমিও (আল্লাহ) ওদের প্রতি কোন খেয়াল করব না এবং যেভাবে ওরা আমার আয়াতগুলি অস্বীকার করেছিল, আজ আমি ওদের প্রার্থনা মঞ্জুর করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছি।

২. কুরআন এমন এক মহাগ্রন্থ, যার মধ্যে প্রয়োজনীয় সব বিষয়ের জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা রয়েছে এবং প্রত্যেক বিষয় পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে স্পষ্টভাবে বয়ান করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এর দ্বারা ঈমানদাররা অত্যন্ত উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু আজব বিষয় এই যে, এই অহংকারী অবাধ্যরা নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে কিছুই চিন্তা করল না। সুতরাং এখন আফসোস করে কী লাভ?

তা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, 'নিশ্চয় আমাদের রবের রাসূলগণ (আমাদের নিকট) সত্যবাণী নিয়ে এসেছিলেন। এখন আমাদের জন্য এমন সুপারিশকারীগণ আছে কি, যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে? অথবা আমাদের ফেরত পাঠানো যেতে পারে কি, তা হলে আমরা যা করতাম, (এখন) তার বিপরীত আমল করতে পারতাম?' নিশ্চয় ওরা নিজেদের চরম ক্ষতি করেছে এবং ওরা যে মিথ্যা রচনা করত, তা ওদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে[১]।	قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

[রুকূ - ৭]

৫৪. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ[২], যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয়	اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى

---

১. অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে বহুবার আযাবের হুঁশিয়ারি শোনানো হয়েছে। তো, ওরা কি এ অপেক্ষায় আছে যে, যখন তা বাস্তব হয়ে চোখের সামনে উপস্থিত হবে, তখন সত্যকে কবুল করবে? অথচ যখন আযাব উপস্থিত হবে এবং ওরা খোদায়ী শাস্তিতে ধৃত হবে, তখন সত্যকে কবুল করায় কোন ফল হবে না। তখন তো সুপারিশকারীদের অন্বেষন করা হবে, যারা সুপারিশ করে আল্লাহর শাস্তি মাফ করিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু যেহেতু কাফেরদের জন্য এমন সুপারিশকারীও মিলবে না, তাই ওরা কামনা করবে, আমাদের পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে পরীক্ষা করা হোক যে, আমরা এবার নিজেদের অন্যায়-অপরাধের বিপরীতে কেমন নেকী ও পরহেজগারীর কাজ করি?

কিন্তু যেহেতু ইতিপূর্বে ওরা নিজেদেরই হাতে নিজেদের ধ্বংস করেছে এবং যেসব মিথ্যা কল্পনা ওরা করেছিল তা সবই অন্তর্হিত হয়ে গেছে, সেহেতু এখন এসব কামনা করে কী লাভ?

২. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

পূর্ববর্তী আয়াতে আখেরাতের আলোচনা ছিল। বর্তমান রুকূতে দুনিয়ার শুরু কীভাবে হয়েছে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেখানে قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ আয়াতাংশে এ মর্মে সতর্ক করা হয়েছিল যে, যারা দুনিয়াতে নবী-রাসূলদের অবজ্ঞা করত, তারাও কিয়ামতের দিন পয়গম্বরদের সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। এখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আল্লাহর হুকুমতের কথা স্মরণ করানো হয়েছে এবং নবী-রাসূলগণের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অতঃপর কয়েকজন বিখ্যাত পয়গম্বরের অবস্থা ও ঘটনা আলোচনা করে স্পষ্ট করা

দিনে[১]। অতঃপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন[২]। তিনি দিনকে ঢেকে দেন রাতের	عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

হয়েছে, আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই তাঁদের সমর্থনকারী ও অস্বীকারকারীদের কী পরিণতি হয়েছিল। এক কথায়, বর্তমান রুকূ পরবর্তী কয়েকটি রুকূর ভূমিকাস্বরূপ।

১. অর্থাৎ এতটা সময়ে সৃষ্টি করেছেন যা ছয় দিনের সমান ছিল। (আক্ষরিক অর্থে ছয় দিন উদ্দেশ্য নয়।) কেননা, আমাদের পরিচিত দিন ও রাত তো সূর্যের উদয় ও অস্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তখন যেহেতু সূর্যই পয়দা হয়নি, সুতরাং রাত ও দিন কী করে হত?

অথবা বলা যায় যে, এখানে এই দৃশ্যজগতের দিনরাত নয় বরং অদৃশ্য জগতের দিনরাত উদ্দেশ্য। জনৈক আরেফ বলেন-

غیب راابرے وآبے دیگراست ÷ آسمان وآفتابے دیگراست

(অদৃশ্য জগতের মেঘ ও পানি অন্য রকম, তার আসমান ও যমীনও ভিন্ন রকম।)

যদি প্রথম অর্থই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আবার আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, এস্থলে ছয়দিনের দ্বারা আমাদের ছয়দিন উদ্দেশ্য, নাকি হাজার বছরে এক দিন– এমন ছয়দিন উদ্দেশ্য? যেমন ইরশাদ হয়েছে : وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدّون (আর আপনার রবের নিকট একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান। –হজ, আয়াত ৪৭) আমার নিকট এই শেষোক্ত কথাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

যা হোক, বোঝা গেল, আকাশ ও পৃথিবীকে হঠাৎই মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং সম্ভবত আল্লাহ তাআলা প্রথমে এগুলির মূল তৈরি করেছেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন করতে থেকেছেন। শেষ পর্যন্ত ছয়দিন (ছয় হাজার বছর পরিমান) সময়ে আকাশ ও পৃথিবী সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুসহ বর্তমান আকারে এসে দাঁড়িয়েছে; যেমন, আজো মানুষ এবং সমগ্র প্রাণী ও উদ্ভিদ ইত্যাদির জন্ম পর্যায়ক্রমিকভাবে হয়ে থাকে।

আর এটা তাঁর كُنْ فَيَكُوْن শানের পরিপন্থী নয়। কেননা, كُنْ فَيَكُوْن এর অর্থ তো শুধু এতটুকু যে, আল্লাহ যে বস্তুকে অস্তিত্বের যে স্তরে আনয়ন করতে চান, তাঁর ইচ্ছা হওয়ামাত্রই তা সেই স্তরে এসে যায়। এ অর্থ নয় যে, আল্লাহ কোন বস্তুকে অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত করান না।

২. **আল্লাহর গুণাবলি প্রকাশক শব্দ-বাক্য সম্পর্কে একটি জ্ঞাতব্য বিষয়**

আল্লাহ তাআলার গুণাবলি ও কার্যাবলি সম্পর্কে এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁর গুণাবলি বর্ণনা করার জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয় তার অধিকাংশই এমন, যেগুলি সৃষ্টজীবের গুণাবলি প্রকাশের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আল্লাহকে حَيّ (জীবিত), سميع (শ্রবণকারী), بصير (দ্রষ্টা) ও متكلم (বক্তা) বলা হয়েছে, আবার মানুষের ক্ষেত্রেও এ শব্দাবলির প্রয়োগ হয়েছে। তবে উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহারের ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কোন সৃষ্টজীবকে سميع ও بصير বলার অর্থ এই যে, শোনার জন্য তার নিকট কান ও দেখার জন্য চোখ রয়েছে। অতএব এস্থলে দুটি জিনিস পাওয়া গেল। এক- সেই ইন্দ্রিয়বিশেষ, যাকে 'চোখ' বলা হয় এবং যা দেখার উৎস ও মাধ্যম হয়ে থাকে। দুই, এর ফল ও উদ্দেশ্য–দেখা, অর্থাৎ সেই বিশেষ জ্ঞান, যা দর্শনইন্দ্রিয় দ্বারা হাসিল হয়। সৃষ্টজীবকে যখন بصير বলা হয়, তখন এর উৎস 'চোখ' ও ফলাফল (দেখা) উভয়ই উদ্দেশ্য হয় এবং উভয়েরই স্বরূপ আমাদের জানা আছে। কিন্তু এই শব্দই যখন আল্লাহ সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়, তখন অবশ্যই সেসব দৈহিক অবস্থা উদ্দেশ্য হতে পারে না, যা সৃষ্টজীবের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং যা থেকে আল্লাহ তাআলা অবশ্য অবশ্যই পাক-পবিত্র। তবে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, দেখার 'উৎস ও মাধ্যম' তাঁর পবিত্র সত্তার মধ্যে বর্তমান আছে এবং এর ফল অর্থাৎ সেই জ্ঞান যা দেখার দ্বারা হাসিল হতে পারে, তা পূর্ণ মাত্রায় তাঁর হাসিল রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, (তাঁর দেখার) সেই 'উৎসে'র স্বরূপ এবং তাঁর দেখাই বা কেমন? এ সম্পর্কে আমরা এ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না যে, তাঁর দেখা সৃষ্টজীবের দেখার মত নয়– ليس كمثله شئ وهو السميع البصير (কোনো কিছুই তাঁর মত নয়। আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।))।

শুধু শ্রবণ ও দর্শনই নয়, বরং তাঁর সকল গুণের ক্ষেত্রে এই কথা যে, (তাঁর) গুণের আসল উৎস ও উদ্দেশ্য প্রমাণিত আছে, কিন্তু এর স্বরূপ বর্ণনা করা যেতে পারে না। আর আসমানী শরী'য়তও মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধির অতীত এ ধরনের তাত্ত্বিক বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে পেরেশান হতে নির্দেশ দেয়নি। (সূরা মায়েদার আয়াত ৬৪ : وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللهِ مَغْلُوْلَةٌ এর তাফসীরও দ্রষ্টব্য)।

اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ–এর ব্যাখ্যা

اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ কেও উক্ত নিয়মে বুঝে নিন। عرش এর অর্থ সিংহাসন ও উচ্চাসন। استوى এর অর্থ অধিকাংশ বিজ্ঞ তাফসীকার করেছেন– استقرار ও تمكن (স্থির হওয়া ও আসন গ্রহণ করা), যা মুতারজিম (র) قرار پکڑنا দ্বারা প্রকাশ করেছেন। এ শব্দটি রাজ-সিংহাসনের উপর এমন অধিকার প্রকাশ করে, যাতে এর কোন অংশ ও দিক তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাবহির্ভূত না থাকে এবং একচ্ছত্র শাসন ও আধিপত্যের মধ্যে কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ও বিশৃঙ্খলা না পাওয়া যায়, বরং সকল কাজ ও ব্যবস্থাপনা সঠিক ও সুশৃঙ্খল হয়।

দুনিয়াতে রাজা-বাদশাহদের সিংহাসনে আরোহনের মধ্যে দু'টি জিনিস রয়েছে : এক –এর বাহ্যরূপ। দুই –এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, অর্থাৎ পুরো সাম্রাজ্যের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব খাটানোর ক্ষমতা অর্জিত হওয়া।

আল্লাহ তাআলার اَسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ–এর মধ্যে এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী (তথা সমস্ত উর্ধ্ব ও অধঃলোক) সৃষ্টি করার পর এ সবের উপর বাধা-বিপত্তিহীনভাবে একচ্ছত্র অধিকার ও আধিপত্য এবং হর রকমের মালিকানা ও প্রভুত্ব

وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

দ্বারা, এভাবে যে, রাত দ্রুতগতিতে দিনের পশ্চাদ্ধাবন করে চলে আসে[১]। এবং (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি, যেগুলো তাঁর হুকুমের অনুগত[২]। জেনে রাখ, সৃষ্টি করা ও হুকুম দেওয়া তাঁরই এখতিয়ারে। আল্লাহ

এবং পূর্ণ শাসনাদির ক্ষমতা ও অধিকার তাঁর রয়েছে। যেমন, অন্যত্র (সাজদাহ : ৫) ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ - এর পর يُدَبِّرُ الْاَمْرَ (তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন।) ইত্যাদি শব্দ এবং এখানে يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ দ্বারা এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অবশ্য اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ এর জাহেরী রূপ কী, এ সম্পর্কে সেই বিশ্বাসই রাখতে হবে, যা আমরা 'سميع ও بصير' ইত্যাদি গুণ সম্পর্কে লিখেছি। অর্থাৎ এর এমন কোন অবস্থা হতে পারে না, যার মধ্যে সৃষ্টির গুণ ও ক্ষণস্থায়ীত্ব বা কালের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়। তবে তা কেমন? এর উত্তর কবির কথায় এভাবে দেওয়া যেতে পারে :

اے برتراز خیالے وقیاس وگمان ووہم ÷ وزہرچہ گفتہ اند شنیدیم وخواندہ ایم

دفتر تمام گشت وبپایاں رسید عمر ÷ ماہمچناں دراول وصف توماندہ ایم

অর্থ : 'তিনি আমাদের সকল ধারণা, যুক্তি ও ভাবনা-কল্পনার উর্ধ্বে, এবং যা কিছু লোকে বলেছে, যা কিছু শুনেছি ও পড়েছি, তারও উর্ধ্বে তাঁর সত্তা ও গুণ। রেজিষ্টার (দফতর) সমাপ্তে পৌঁছেছে এবং শেষান্তে এসেছে জীবন; কিন্তু আমরা তোমার সেই প্রথম গুনের (অনুধাবনের) প্রথম স্তরেই এখনো রয়ে গেছি। অর্থাৎ পুরা জীবন গবেষণা ও অধ্যয়ন করা হলেও আল্লাহ তাআলার একটি গুণের মহত্ত্বও যথাযথভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

তাঁর সত্তা ও গুণ সম্পর্কে শেষ কথা এটিই যে– لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ (তাঁর মত কিছুই নেই)।

১. অর্থাৎ রাতের অন্ধকারকে দিনের আলো দ্বারা অথবা দিনের আলোকে রাতের অন্ধকার দ্বারা ঢেকে দেন, এভাবে যে, একে অন্যের পশ্চাদ্ধাবন করে দ্রুতগতিতে চলে আসে। এদিকে রাত শেষ হল, ওদিকে দিন এসে উপস্থিত হল, অথবা দিন খতম হল, আর রাত তৎক্ষণাৎ এসে পড়ল। মধ্যভাগে এক মিনিটেরও বিরতি হয় না।

এতে সম্ভবত এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, এমনিভাবে কুফর ও গোমরাহী এবং জুলুম ও অত্যাচারের অন্ধকার রাত যখন জগতকে আচ্ছাদিত করে ফেলে, তখন আল্লাহ তাআলা ঈমান ও মারেফতের সূর্য দ্বারা চতুর্দিকে আলো বিস্তার করেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াকে আলোদানকারী সূর্যের আবির্ভাব না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নবুওয়াতের চন্দ্র-তারকা রাতের অন্ধকারে আলো ও হেদায়েত দান করতে থাকে।

২. আকাশে পরিভ্রমণকারী কোন নক্ষত্রই তাঁর হুকুম ছাড়া চলতে পারে না।

বড় বরকতময়, যিনি বিশ্বজগতের রব[১]।

৫৫. তোমরা আপন রবকে ডাক কাকুতি-মিনতি করে ও চুপে-চুপে[২]। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না[৩]।

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬. আর তোমরা পৃথিবীর সংশোধনের পর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। এবং তাঁকে ডাক* ভয় ও আশা নিয়ে[৪]। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

---

১. সৃষ্টি করাকে 'خلق' বলে এবং সৃষ্টি করার পর সৃষ্টিসংক্রান্ত বা শরী'য়তসম্পর্কিত বিধান দান করাকে أمر বলে। আর উভয়টি তাঁরই কব্জা ও ক্ষমতায় রয়েছে। অতএব তিনিই সকল কল্যাণ ও বরকতের উৎস।

২. যেহেতু আল্লাহর মহান সত্তাই সৃষ্টি ও হুকুমের মালিক এবং সমস্ত বরকতরাশির উৎস, সুতরাং নিজেদের ইহ ও পরকালীন প্রয়োজনে তাঁকেই ডাকা উচিত– কাকুতি-মিনতি, এখলাস ও একাগ্রতা সহকারে, লোক দেখানো ছাড়া, আস্তে আস্তে।

এ থেকে জানা গেল, দো'য়ার আসল নিয়ম হচ্ছে গোপনীয়তা এবং এ-ই ছিল সালাফের রীতি। হাঁ, কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িক কারণে তা প্রকাশ্যে ও উচ্চস্বরেও হতে পারে। 'রূহুল মাআনী' ইত্যাদি তাফসীরে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

৩. অর্থাৎ দো'য়ার মধ্যে আদবের সীমা অতিক্রম করবে না। যেমন: যেসব জিনিস স্বভাবত অসম্ভব তা প্রার্থনা করা, অথবা গোনাহর বিষয় বা বেহুদা বিষয় চাওয়া, অথবা এমন সওয়াল করা যা তার (প্রার্থনাকারীর) শান ও অবস্থার পক্ষে মুনাসিব নয়। এ সবই দো'য়ার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তাঁর ইবাদত কর।'

৪. পূর্বের আয়াতে সকল প্রয়োজনে আল্লাহকে ডাকার কথা বলা হয়েছিল। বর্তমান আয়াতে সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়ের হকসমূহ আদায় করতে শেখানো হয়েছে। বলা হচ্ছে– দুনিয়াতে কোন বিষয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। আর ভয় ও আশার সাথে খোদার ইবাদতে রত থাক। তাঁর রহমত থেকেও নিরাশ হবে না এবং তাঁর আযাব থেকেও নিশ্চিন্ত হয়ে গোনাহর কাজকর্মে লিপ্ত হবে না।

আমার নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত এটাই যে, এ আয়াতে وادعوه এর অর্থ হচ্ছে– তার ইবাদত কর, যেমন তাহাজ্জুদের নামায সম্বন্ধে ইরশাদ হয়েছে– تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خوفا وطمعا (তাদের পার্শ্বদেশ আপন শয্যা থেকে পৃথক থাকে; তারা তাদের রবের ইবাদত করে ভয় ও আশা নিয়ে– –সাজ্‌দাহ, আয়াত ১৬)

وَهُوَالَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۚ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রহমতের (অর্থাৎ বৃষ্টির) পূর্বে বায়ুমণ্ডলীকে সুসংবাদবাহীরূপে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর যখন সেই বায়ু ভারী মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি মেঘকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাই কোন মৃত ভূমির দিকে, তারপর সেই ভূমিতে পানি বর্ষণ করি। অতঃপর তার দ্বারা উৎপন্ন করি সব রকমের ফলমূল। এভাবেই আমি মৃতদের (কবর থেকে) বের করব। (আমি এরূপ করি), যাতে তোমরা চিন্তা কর☆।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِىْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ۚ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আর যে ভূমি উৎকৃষ্ট, তার ফসল স্বীয় রবের হুকুমে (প্রচুর পরিমাণে) উৎপন্ন হয়। আর যে ভূমি মন্দ, তাতে কেবল অসম্পূর্ণ ফসলই উৎপন্ন হয়☆☆। এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিবিধ আঙ্গিকে বর্ণনা করি সেই লোকদের জন্য যারা শোকর করে[১]।

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'উপদেশ গ্রহণ কর'।

☆☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'খারাপ ফসলই উৎপন্ন হয়'।

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

পূর্বের আয়াতগুলিতে استواء على العرش এর আলোচনা এবং উর্ধ্বজগতে (চন্দ্র, সূর্য ইত্যদিতে) আল্লাহ তাআলার যে ব্যাপক কর্তৃত্ব রয়েছে তার বিবরণ ছিল। মাঝে বান্দাদেরকে কিছু প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা দান করা হয়েছে। এখন নিম্নজগতে ও বায়ুমণ্ডলে আল্লাহর যে কর্তৃত্ব ও অনুশাসন রয়েছে তার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, যাতে লোকেরা জেনে নেয় যে, আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সমগ্র রাজত্ব একমাত্র বিশ্বপ্রভুরই নিয়ন্ত্রনাধীন রয়েছে।

আয়াতের অর্থ-মর্ম

বাতাস পরিচালনা করা, বৃষ্টি বর্ষণ করা, নানা প্রকার ফলমূল পয়দা করা, প্রত্যেক মাটির যোগ্যতা অনুসারে তাতে ফসল ও উদ্ভিদ উৎপাদন করা– এসব তাঁরই মহাশক্তি ও পরম হেকমতের নিদর্শন। প্রসঙ্গত মৃত্যুর পর মৃতদের জীবিত হওয়া ও কবর থেকে বের হওয়ার বিষয়টিও এস্থলে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) বলেন, মৃতদের পুনর্জীবন এক তো হবে কিয়ামতে, আর এক হচ্ছে দুনিয়াতে। তা এভাবে যে, আল্লাহ জাহেল ও নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে, (যারা জাহালত ও নিকৃষ্টতার মৃত্যুবরণ করেছিল), এক মহা মর্যাদাশালী নবী পাঠালেন এবং

[রুকূ - ৮]

৫৯. নিশ্চয়ই আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। অতএব তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। আমি তো তোমাদের ব্যাপারে এক মহাদিবসের আযাবের ভয় করছি'।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

৬০. তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, 'নিশ্চয় আমরা তো তোমাকে প্রকাশ্য গোমরাহীর

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

তাদের ইলম দান করে দুনিয়ার নেতৃত্ব দান করলেন। অতঃপর উত্তম যোগ্যতাবিশিষ্ট লোকেরা পূর্ণতা লাভ করল এবং যাদের যোগ্যতা ত্রুটিপূর্ণ ছিল তাদেরও কিছু না কিছু কল্যাণ সাধিত হল।'

যা হোক, বর্তমান রুকূতে বলা হয়েছে যে, যেখানে আল্লাহ স্বীয় দয়া ও মমতায় রাতের আঁধারে তারকা ও চাঁদ-সূর্য দ্বারা আলো দান করেন এবং গ্রীষ্মকালে মাটিকে সুফলা ও শস্যশ্যামলা করা এবং মানুষ ও পশুপক্ষীর জীবিকা তৈরি করার জন্য উপর থেকে বৃষ্টি বর্ষন করে থাকেন– সেখানে এটা কী করে হতে পারে যে, এমন মেহেরবান আল্লাহ নিজের সৃষ্টিকে মূর্খতা ও জুলুমের অন্ধকার থেকে বের করার জন্য কোন চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করবেন না এবং আদম-সন্তানদের রূহানী খাদ্য তৈরি করা ও অন্তররাজ্যকে সুজলা-সুফলা করার জন্য রহমবৃষ্টি বর্ষণ করবেন না? –নিঃসন্দেহে তিনি প্রত্যেক যুগের প্রয়োজন ও নিজ হেকমত অনুযায়ী পয়গম্বরদের পাঠিয়েছেন, যাঁদের জ্যোতির্ময় অন্তরসমূহ থেকে দুনিয়ার বুকে আধ্যাত্মিক আলো বিকীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহর ওহীর অবারিত বৃষ্টিধারা অবতীর্ণ হয়েছে। সম্মুখবর্তী কয়েক রুকূতে এ পয়গম্বরদেরই প্রেরিত হওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে।

আর বৃষ্টি ও মাটির দৃষ্টান্তে যেমন এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিভিন্ন ভূখণ্ড নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী বৃষ্টির ক্রিয়া গ্রহণ করে থাকে, তেমনি বুঝে নিন যে, নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) যে খায়র ও বরকতসহ আগমন করেন সেগুলি দ্বারা উপকৃত হওয়াও উত্তম যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। যারা তা থেকে উপকার হাসিল করে না অথবা পূর্ণ উপকার নেয় না, তাদের স্বীয় নিকৃষ্ট যোগ্যতার জন্য কাঁদা উচিত। কবির ভাষায়–

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست ÷ در باغ لالہ روید و در شورہ بوم خس

"বৃষ্টির প্রকৃতিতে কোনো পার্থক্য নেই বটে, কিন্তু তার বর্ষণে বাগানে রক্তজবা ফোটে আর লোনা মাটিতে জন্মে অজাত বৃক্ষ।"

মধ্যে দেখছি[১]।

৬১. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি মোটেই গোমরাহ নই, বরং আমি বিশ্বজগতের রবের পক্ষ থেকে রাসূল।

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦١﴾

৬২. 'আমি তোমাদের নিকট আমার রবের বাণীসমূহ পৌঁছাই এবং তোমাদের উপদেশ দেই*, আর আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾

১. এ সূরার শুরুতে আদম আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাঁর পর নূহ আলাইহিস সালামই প্রথম দৃঢ়সংকল্প ও বিখ্যাত নবী, যিনি মুশরিকদের মোকাবিলা করার জন্য প্রেরিত হন। যদিও তাঁর আবির্ভাব বিশেষ করে তাঁরই জাতির প্রতি হয়েছিল, তবুও সমগ্র নবীগণের শিক্ষার মধ্যে যেসব মৌলিক বিষয় অভিন্ন, তার হিসাবে বলা যায় যে, সকল মানুষ প্রত্যেক নবীর সম্বোধন-পাত্র; যেমন: তাওহীদ ও পরকালের প্রতি ঈমানের শিক্ষা সব নবীগণ দিয়েছেন। অতএব এমন বিষয়াদিকে মিথ্যা বলার অর্থ প্রকৃতপ্রস্তাবে সকল নবীকেই মিথ্যা বলা। যা হোক, নূহ আলাইহিস সালাম তাওহীদ ইত্যাদির প্রতি সকল মানুষকে দাওয়াত দিলেন। বলা হয়, আদম আলাইহিস সালামের পর দশটি যুগ (قرن) এমন অতিবাহিত হয়, যখন সকল আদম-সন্তান কালিমায়ে তাওহীদের উপর কায়েম ছিল। অতঃপর মূর্তিপূজার সূচনা হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী, এভাবে হয়েছিল যে, ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নাসর নামে কয়েকজন নেককার ব্যক্তি ছিলেন। সূরা নূহে (আয়াত ২৩) তাঁদের উল্লেখ আছে। তাঁদের মৃত্যুর পর লোকেরা তাদের ছবি বানিয়ে নিল, যাতে তাঁদের অবস্থা, ইবাদত ইত্যাদির স্মৃতি তাজা থাকে। কিছুকাল পরে সেসব ছবি অনুযায়ী মূর্তি তৈরি করল। এমনকি, কিছুদিন পর এদের পূজা শুরু হয়ে গেল। আর মূর্তিগুলো সেই বুযুর্গ ব্যক্তিদেরই নামে আখ্যায়িত হল।

মূর্তিপূজার এ সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়লে আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ (আ)কে প্রেরণ করলেন। তিনি স্বজাতিকে মহা প্লাবনের পূর্বে সাড়ে নয়শত বছর ধরে তাওহীদ ও তাক্ওয়ার প্রতি ডাকলেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের আযাব সম্পর্কে সতর্ক করলেন। কিন্তু লোকেরা তাঁকে ভ্রান্ত ও মূর্খ আখ্যায়িত করল এবং তাঁর কোন কথাই শুনল না। শেষ পর্যন্ত প্লাবনের আযাব এসে সকলকে ঘিরে ধরল এবং নূহ (আ) এর দো'য়া لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا (আপনি পৃথিবীর বুকে কাফেরদের একটা গৃহবাসীকেও ছাড়বেন না –নূহ, আয়াত ২৬) অনুযায়ী পৃথিবীর বুকে কোন কাফেরই আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পেল না।

دائرة المعارف গ্রন্থে লেখক বুসতানী এই ঐতিহাসিক প্লাবন ও প্লাবনের ব্যাপকতা সম্পর্কে ইউরোপীয় মনীষীদের গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ধৃত করেছেন।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তোমাদের কল্যাণ কামনা করি'।

এমনসব বিষয় জানি, যা তোমরা জান না[১]।

৬৩. 'তোমরা কি এতে বিস্মিত হয়েছ যে, তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে তোমাদেরই মধ্যকার এক ব্যক্তির মাধ্যমে? যাতে তিনি তোমাদের সতর্ক করেন এবং যাতে তোমরা সংযত হও ও তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়[২]।'

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا۟ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

৬৪. এর পরও ওরা তাঁকে অস্বীকার করল। অতএব আমি তাঁকে ও তাঁর সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল তাদের রক্ষা করলাম এবং তাদের ডুবিয়ে দিলাম যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল। নিশ্চয় ওরা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়[৩]।

فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَٰهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا عَمِينَ ۝

---

১. অর্থাৎ আমি তো কিছুমাত্র পথভ্রষ্ট হইনি। হাঁ, তোমরা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে লিপ্ত। কারণ, তোমরা আল্লাহর পয়গম্বরকে চেন না, যিনি অত্যন্ত স্পষ্টতার সাথে আল্লাহর পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছাচ্ছেন, তোমাদের মঙ্গল চাচ্ছেন, তোমাদের উত্তম নসীহত করছেন এবং যিনি আল্লাহর নিকট থেকে এমন ইলম ও হেদায়েত নিয়ে এসেছেন, যা সম্বন্ধে তোমরা অজ্ঞ।

২. অর্থাৎ এতে আশ্চর্যের কী আছে যে, তোমাদেরই মধ্য থেকে একজনকে আল্লাহ নিজ পয়গাম পাঠানোর জন্য বেছে নিয়েছেন? তিনি যখন খেলাফতের দায়িত্বের জন্য সমগ্র সৃষ্টির মধ্য থেকে আদম আলাইহিস সালামকে –কোন বিশেষ যোগ্যতার কারণে– মনোনীত করতে পারলেন, তখন নবুওয়াত ও রেসালাতের দায়িত্বের জন্য আদম-সন্তানদের মধ্য থেকে পূর্ণ যোগ্যতাবিশিষ্ট লোকদের মনোনীত করতে বাধা কিসের? তাঁরা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে ফয়েয লাভ করে অন্য লোকদেরকে তাদের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করবেন এবং লোকেরা তা অবগত হয়ে দুষ্কর্ম থেকে আত্মরক্ষা করবে। এভাবে তারা আল্লাহর রহমত ও কৃপা লাভের যোগ্য হবে।

৩. অর্থাৎ ওরা হক-বাতিল এবং লাভ-লোকসান কিছুই বুঝল না, অন্ধ হয়ে আগাগোড়া অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের উপর কায়েম রইল এবং মূর্তিপূজা ও অন্যান্য দুষ্কর্ম থেকে বিরত হল না। ফলে আল্লাহ অল্পসংখ্যক মুমিন ছাড়া, যারা নূহ আলাইহিস সালামের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করেছিল, অবশিষ্ট সকল কাফেরকে ডুবিয়ে দিলেন। এখন পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, তারা সবাই সেই নৌকারোহী বরং শুধু হযরত নূহ আলাইহিস সালামেরই বংশধর।

৬৫. এবং আ'দ জাতির নিকট ওদের ভাই হূদকে (পাঠিয়েছিলাম)[১]। তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। অতএব তোমরা কি ভয় করবে না[২]?'

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬. তাঁর সম্প্রদায়ের কাফের প্রধানরা বলল, 'আমরা তো তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় পতিত দেখছি এবং নিশ্চয় আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি'[৩]।

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَٰذِبِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি মোটেই নির্বোধ নই, বরং আমি বিশ্ব জগতের রবের পক্ষ থেকে রাসূল।'

قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِى سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮. 'আমি তোমাদের নিকট আমার রবের বাণীসমূহ পৌছাই এবং আমি তোমাদের বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী[৪]।

أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّى وَأَنَا۠ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾

---

১. 'আদ' হচ্ছে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পৌত্র ইরামের বংশধর। তাদের বসবাস ছিল 'আহকাফে' (ইয়ামান)। হযরত হূদ আলাইহিস সালাম এই সম্প্রদায়ের একজন। এ হিসাবে তিনি তাদের জাতীয় ও দেশীয় ভাই হলেন।

২. এই লোকদের মধ্যে মূর্তিপূজা প্রসার লাভ করেছিল। জীবিকা দান করা, বৃষ্টি বর্ষন করা, আরোগ্য করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ও প্রয়োজনে ওরা পৃথক দেব-দেবী বানিয়ে রেখেছিল। এ সবেরই পূজা হত। হূদ আলাইহিস সালাম এতে বাধা দান করলেন এবং মহাপাপের শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ক করলেন।

৩. অর্থাৎ তুমি নির্বোধ– বাপদাদাদের পথ ছেড়ে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক হচ্ছ। আর তুমি মিথ্যাবাদীও– নিজের সব কথাকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে অযথা শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ।

৪. অর্থাৎ আমার কোন কথাই নির্বুদ্ধিতার নয়। হাঁ, আল্লাহর তরফ থেকে রেসালাতের যে দায়িত্ব আমার উপর সোপর্দ করা হয়েছে, আমি তার হক আদায় করছি। এটা বরং তোমাদের নির্বুদ্ধিতা যে, তোমরা নিজেদের সেই হিতাকাঙ্ক্ষীকে যার বিশ্বস্ততা ও সততা পূর্ব থেকে প্রমাণিত, নির্বোধ বলে নিজেদেরই ক্ষতি করছ।

৬৯. 'তোমরা কি এতে বিস্মিত হয়েছ যে, তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে তোমাদেরই মধ্যকার একজন মানুষের মাধ্যমে, যাতে তিনি তোমাদের সতর্ক করেন? আর তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নূহের সম্প্রদায়ের পর তোমাদেরকে (তাদের) স্থলাভিষিক্ত করে দিলেন[১] এবং দৈহিক গঠনে তোমাদের দান করলেন সমৃদ্ধি[২]। অতএব তোমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ কর[৩]।'

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০. ওরা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এ জন্য এসেছ, যাতে আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত তাদের বর্জন করি? তা, তুমি আমাদের যে জিনিসের ভয় দেখাও, তা আমাদের কাছে নিয়ে আস– যদি তুমি সত্যবাদী হও[৪]।'

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭১. তিনি বললেন, 'তোমাদের উপর তোমাদের রবের পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ তো অবতীর্ণ

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ

---

১. অর্থাৎ নূহ (আ) এর জাতির পর দুনিয়াতে (তোমাদের রব) তোমাদের হুকুমত কায়েম করেছেন এবং তাদের স্থানে তোমাদের প্রতিষ্ঠা দান করেছেন।

সম্ভবত এই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে এ বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, মূর্তিপূজা এবং রাসূলকে অস্বীকার করার ফলে নূহ-জাতির যে পরিণতি হয়েছিল, তোমাদেরও তাই হতে পারে।

২. দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য ও আকার-আকৃতির দিক থেকে এ জাতি বিখ্যাত ছিল।

৩. অর্থাৎ যেসব এহসান-অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হল তা এবং এ ছাড়া আল্লাহর আরো যেসব নেয়ামত রয়েছে, তার কথা স্মরণ করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ও তাঁর আজ্ঞাবহ হওয়া উচিত, কোনক্রমেই এমন প্রকৃত অনুগ্রহকারীর অবাধ্যতা করো না।

৪. অর্থাৎ যে আযাবের ধমক আমাদের দিচ্ছ, তুমি সত্যবাদী হলে তা নিয়ে আস।

হয়েই গেছে[১]। তোমরা কি আমার সঙ্গে এমন কিছু 'নাম' সম্বন্ধে বিবাদ করছ, যে নাম রেখেছ তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা, (আর) সেসবের কোন সনদ আল্লাহ নাযিল করেননি? অতএব তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি'[২]।

وَّغَضَبٌ ۗ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۗ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝

৭২. অতঃপর আমি স্বীয় রহমতে তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের রক্ষা করলাম এবং যারা আমার আয়াতগুলি অস্বীকার করেছিল ও মুমিন ছিল না, তাদের নির্মূল করে দিলাম[৩]।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝

[রুকূ - ১০]

৭৩. এবং ছামূদ জাতির নিকট (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই সালেহকে। তিনি বললেন, 'হে

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ

১. অর্থাৎ যখন তোমাদের অবাধ্যতা ও ধৃষ্টতা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তখন বুঝে নাও যে, আল্লাহর আযাব ও গযব তোমাদের উপর নাযিল হয়েই গেছে। তার আগমনে এখন মোটেই দেরি নেই।

২. অর্থাৎ বিভিন্ন মূর্তির নাম নিয়ে ওরা যে বলত, অমুকে রিযিকদাতা, অমুকে বৃষ্টি-বর্ষণকারী ও অমুকে পুত্র-দানকারী ইত্যাদি– এসব শুধু নামই নাম, যার পিছনে কোন বাস্তবতা ও সত্যতা নেই। পাথরসমূহের মধ্যে এসব খোদায়ী গুণাবলি কোথা থেকে আসবে? এসব নামসর্বস্ব উপাস্যদের পিছনে পড়ে তোমরা তাওহীদ সম্পর্কে আমার সঙ্গে ঝগড়া-কলহ ও তর্ক-বিতর্ক করছ? অথচ এদের উপাস্য হওয়ার কোনো বৌদ্ধিক ও ধর্মীয় সনদ তো নেই-ই, বরং সমগ্র বৌদ্ধিক ও ধর্মীয় প্রমাণ এদের খণ্ডন করে।

যখন তোমাদের মূর্খতা, দুষ্কৃতি ও বিরোধিতার পাল্লা এই পরিমাণ ভারি হয়ে গেছে, তখন আল্লাহই আমাদের ও তোমাদের কলহের মীমাংসা করে দিন। তোমরা এরই অপেক্ষা কর, আমিও এ মীমাংসারই অপেক্ষায় আছি।

৩. অর্থাৎ ওদের উপর সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত অবিরাম ঘূর্ণিঝড় হতে থাকে, যাতে সমস্ত কাফের আছড়ে-পিছড়ে, দুমড়ে-মুচড়ে ধ্বংস হয়।

এ তো হল عاد أولى (প্রথম আদ) এর পরিণতি। আর এই জাতিরই দ্বিতীয় শাখা (ছামূদ)– যাকে عاد ثانية (দ্বিতীয় আদ) বলা হয়, তার আলোচনা সম্মুখে আসছে।

اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۝

আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে[১]— এই যে আল্লাহর উটনী, যা তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব একে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও, যাতে আল্লাহর যমীনে (স্বাধীনভাবে) খেতে পারে এবং একে মন্দভাবে স্পর্শ করো না, তা হলে তোমাদের পাকড়াও করবে যাতনাদায়ক আযাব[২]।

وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِي الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ۝

৭৪. আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ আ'দ জাতির পর তোমাদেরকে (তাদের) স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং তোমাদের পৃথিবীতে এভাবে বসবাস করিয়েছেন যে, তোমরা নরম (ও সমতল) ভূমিতে অট্টালিকা বানাচ্ছ এবং পাহাড় কেটে নির্মাণ করছ ঘর। অতএব আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না[৩]।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ

৭৫. তাঁর সম্প্রদায়ের অহংকারী প্রধানরা দুর্বল লোকদের অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা ঈমান

---

১. অর্থাৎ যে প্রমাণ তোমরা চাচ্ছিলে, তা পৌছে গেছে।

সালেহ আলাইহিস সালামের জাতি তাঁর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল যে, আপনি যদি শক্ত পাথর থেকে একটি গর্ভবতী উটনী আবির্ভাব করে দিতে পারেন, তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। আল্লাহ হযরত সালেহ (আ) এর দো'য়ার বরকতে তেমনি করে দিলেন। –এখন ওদের বলা হচ্ছে, তোমাদের ফরমায়েশী মুজেযা তো আল্লাহ দেখিয়ে দিলেন। এখন ঈমান আনতে কিসের অপেক্ষা?

২. অর্থাৎ এই উটনী খোদার কুদরত ও আমার সত্যতার নিদর্শন, যা আমার দো'য়ার ফলে অলৌকিকভাবে খোদা সৃষ্টি করেছেন। এর অধিকার বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমনঃ আল্লাহর জমিতে মুবাহ (হালাল) ঘাস খেতে এবং পালাক্রমে তাকে তার পানি পান করতে বাধা দেবে না। মোটকথা, আল্লাহর যে নিদর্শন তোমরা চেয়ে নিয়েছ, তার সাথে অসমীচীন ব্যবহার করো না, অন্যথায় তোমাদের অমঙ্গল হবে।

৩. অর্থাৎ পৃথিবীতে অকৃতজ্ঞতা, কুফর ও শিরক বিস্তার করো না।

أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِۦ مُؤْمِنُونَ

এনেছিল তাদের বলল, 'তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালেহ তাঁর রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত?' তারা বলল, 'তাঁকে যা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, নিশ্চয় আমরা তাতে বিশ্বাসী।'।

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا بِالَّذِىٓ ءَامَنتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ

৭৬. অহংকারী লোকেরা বলল, 'তোমরা যার প্রতি ঈমান এনেছ, আমরা তা অস্বীকার করি[১]।'

فَعَقَرُوا۟ النَّاقَةَ وَعَتَوْا۟ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا۟ يَٰصَٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

৭৭. অতঃপর ওরা সেই উটনী হত্যা করে ফেলল ও সীমালঙ্ঘন করত আপন রবের হুকুম অমান্য করল[২] এবং বলল, 'হে সালেহ! তুমি যার ভয় আমাদের দেখাচ্ছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে আস– যদি তুমি রাসূল হয়ে থাক'[৩]।

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ

৭৮. অতএব ওদের পাকড়াও করল ভূমিকম্প। ফলে ওরা নিজেদের ঘরে অধোমুখে পড়ে রইল[৪]।

---

১. কওমের মধ্যে যারা উদ্ধত, হঠকারী ও বড় বড় সর্দার ছিল, তারা গরীব ও দুর্বল মুমিনদের বিদ্রূপ করে বলত, 'বড় লোকেরা আজ পর্যন্ত যা বুঝল না, তোমরা কি তা জেনে ফেললে, অর্থাৎ সালেহ আল্লাহর রাসূল?' উত্তরে মুমিনরা বলল, 'জানার কী অর্থ? জান তো তোমরাও। হাঁ, আমরা অন্তর দ্বারা কবূল করে তাঁর প্রতি ঈমানও এনেছি। অহংকারীরা এই দার্শনিক উত্তরে হাক্কাবাক্কা খেয়ে বলল, যে জিনিস তোমরা মেনে নিয়েছ, আমরা এখনো তা মানি না। বল দেখি, তোমাদের মত দীনহীন কতক মানুষের ঈমান আনায় কী আসে যায়?

২. কথিত আছে, সেই উটনী এত বিরাট দেহধারী ছিল যে, যে মাঠে সে চরত, সেখান থেকে অন্যান্য জীবজন্তু ভয়ে ভেগে যেত। আর তার পালার দিনে যে কূপ থেকে পানি পান করত তা শূন্য করে দিত। আসলে তার সৃষ্টি যেমন অসাধারণ উপায়ে হয়েছিল, তেমনই অসাধারণ ছিল তার জীবন-যাপনের চাহিদা ও ধরন-ধারণ।

শেষ পর্যন্ত লোকেরা আক্রোশে এসে তাকে কতল করতে একমত হল এবং 'কুদার' নামক এক হতভাগা তার পায়ের রগ কেটে ফেলল। অতঃপর ওরা স্বয়ং হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকেও কতল করার প্রস্তুতি নিতে লাগল। মোটকথা, 'সালেহ ও উটনী' সম্পর্কে যে সকল বিধান দেওয়া হয়েছিল, ওরা তা অমান্য করল।

৩. এ ধরণের কথা মানুষের মুখ থেকে তখনি বের হয়, যখন তারা আল্লাহর কহর ও গযব থেকে সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়ে যায়। عاد اُولى (প্রথম আদ) এর মত ছামূদ জাতিও এ পর্যায়ে পৌছে খোদায়ী আযাবের উপযুক্ত হয়ে গেল। সম্মুখে এর বর্ণনা আসছে।

৪. অন্য আয়াতে বিকট চিৎকারের দ্বারা এদের ধ্বংস হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সম্ভবত নীচ থেকে ভূমিকম্প এবং উপর থেকে ভয়ঙ্কর শব্দ এসেছিল।

৭৯. অতঃপর সালেহ ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে (চলে গেলেন) এবং (যেতে যেতে) বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে আমার রবের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদের পছন্দ কর না[১]।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ۝

৮০. এবং লূতকে (পাঠিয়েছিলাম), যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, 'তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ কর, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি[২]?

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ۝

---

১. কথিত আছে, স্বজাতির ধ্বংসের পর হযরত সালেহ (আ) মক্কা শরীফ বা শামদেশের দিকে চলে যান এবং যাওয়ার সময় ওদের লাশের স্তূপ দেখে এ রকম কথা বলেন, যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে নিহত কাফেরদের সম্বোধন করে বলেছিলেন। অথবা এই সম্বোধন ছিল দুঃখভারাক্রান্ত মনে কল্পনার জগতে; যেমন, কবিরা বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি, ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদির প্রতি সম্বোধন করে থাকে। আবার কেউ বলেছেন, এ কথা ছিল ধ্বংসের পূর্বের। তা হলে বলা হবে, বর্ণনায় ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতা বিবেচ্য না।

যা হোক, এই কথার উদ্দেশ্য ছিল অন্যদের শোনানো যে, নিজেদের বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষীর কথা মানা উচিত। যখন কোন ব্যক্তি হিতাকাঙ্ক্ষীদের কদর না করে, তখন এমন কঠিন পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়।

২. লূত আলাইহিস সালাম হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর ভাতিজা, যিনি তাঁর সঙ্গে ইরাক থেকে হিজরত করে শামদেশে আগমন করেন এবং খোদার তরফ থেকে সাদূম (নামক স্থান) ও তার আশেপাশের লোকালয়ের প্রতি প্রেরিত হন, যাতে ওদের সংশোধন করেন এবং সেসব কদর্য, অস্বাভাবিক ও নির্লজ্জ কর্ম থেকে বিরত রাখেন যা ওরা করত। শুধু করতই না, বরং এই নির্লজ্জ কর্মের আবিষ্কার ওরাই করেছিল। ওদের পূর্বে এই ব্যাধি সম্বন্ধে বিশ্বের কেউ-ই অবগত ছিল না। শয়তান এই অভিশপ্ত কর্ম সর্বাগ্রে সামূদবাসীদের শেখায় এবং সেখান থেকে অন্যান্য স্থানে বিস্তার লাভ করে। হযরত লূত আলাইহিস সালাম এই অভিশপ্ত কুকর্মের পরিণাম সম্পর্কে ওদের সতর্ক করেন এবং দুনিয়া থকে এই কদর্য কর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

বর্তমান বাইবেলের সংকলকদের নির্লজ্জ ধৃষ্টতার জন্য বিলাপ করতে হয়, যারা এমন পবিত্র ও নিষ্পাপ পয়গম্বরের প্রতি, যিনি দুনিয়াকে নির্লজ্জতা ও কদর্যতা থেকে পাক করতে এসেছিলেন, এহেন নাপাক কাজ করার অপবাদ আরোপ করেছে, যা শুনে লজ্জাশীল ভদ্র মানুষ শিউরে ওঠে— كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُوْلُوْنَ إِلَّا كَذِبًا (কী সাংঘাতিক কথা, যা ওদের মুখ থেকে বের হয়! ওরা আর কিছু নয়, কেবল মিথ্যাই বলছে।)

ইন্নাকুম লাতা'তূনার রিজালা শাহওয়াতাম মিন দূনিন নিসা-ই বাল আনতুম কাওমুম মুসরিফূন।

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

৮১. 'তোমরা তো কামতাড়নার জন্য মেয়েদের ছেড়ে পুরুষের কাছে যাও, বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়[১]।'

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾

৮২. তখন তাঁর সম্প্রদায়ের এ ছাড়া আর কোন উত্তর ছিল না যে, ওরা বলল, 'তোমাদের শহর থেকে এদের বের করে দাও। এরা এমন লোক, যারা খুব বেশি পবিত্র থাকতে চায়'।

فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٨٣﴾

৮৩. অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করলাম— তাঁর স্ত্রী ছাড়া। সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্যে রয়ে গেল[২]।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

৮৪. এবং আমি ওদের উপর বর্ষণ করলাম (পাথর-)বৃষ্টি[৩]। অতএব দেখ, অপরাধীদের

---

১. অর্থাৎ শুধু এ-ই নয় যে, তোমরা একটি গোনাহ করছ মাত্র, বরং মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ কর্ম করাটাই প্রমাণ করে যে, তোমরা মনুষ্যত্বের সীমার বাইরে চলে গেছ।

২. অর্থাৎ শেষ কথা ওরা এই বলল যে, যখন আমাদের সকলকে তিনি কদর্য মনে করেন, আর তিনি নিজে পবিত্র থাকতে চাচ্ছেন, তাহলে অপবিত্রদের সাথে পবিত্রদের কী সম্পর্ক? তাঁকে আমাদের লোকালয় থেকেই বের করে দেওয়া উচিত, যাতে আমাদের পথে কোনই বাধা না থাকে।

যা হোক, সেই অভিশপ্তরা তাঁকে কী বের করবে, বরং আল্লাহ তাআলা লূত আলাইহিস সালাম ও তাঁর সঙ্গীসাথীদেরকে সসম্মানে ও নিরাপদে সেই লোকালয় থেকে বের করে আনেন এবং উক্ত লোকালয়ের উপর আযাব চড়িয়ে দেন। সম্মুখে এর আলোচনা আসছে।

লূত আলাইহিস সালামের সম্পর্কধারীদের মধ্যে শুধু তাঁর স্ত্রী তাঁর থেকে আলাদা থাকে এবং শাস্তিপ্রাপ্তদের সঙ্গে ধ্বংস হয়। কেননা, এই শাস্তি-প্রাপ্ত লোকদের সাথে ওর যোগসাজশ ছিল। লূত আলাইহিস সালামের কাছে যেসব মেহমান আসত তাদের সংবাদ সে-ই জানিয়ে দিত এবং ওদেরকে কুকর্মের উৎসাহ দিত। অথবা যেমন কেউ কেউ লিখেছেন, পুরুষদের মত মেয়েদের মধ্যেও مساحقة (সমকামিতা) এর অভ্যাস শুরু হয়েছিল– এ মহিলা তাতে লিপ্ত ছিল।

যা হোক, যারা এ ধ্বংসাত্মক ব্যাধিতে লিপ্ত ছিল এবং অত্যন্ত নির্লজ্জতার সাথে জোরেশোরে নবীর বিরোধিতা করছিল এবং যারা কুফরী ও নির্লজ্জ কাজের প্রচলনে ওদের সহযোগী ও সাহায্যকারী ছিল –সকলের প্রতি আযাব এল।

৩. অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, লোকালয় উলটিয়ে দেওয়া হয় এবং পাথর-বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

পরিণাম কেমন হয়েছিল[১]!

[রুকূ - ১১]

৮৫. এবং মাদয়ান (বাসীদের) নিকট তাদের ভাই শুআয়বকে (পাঠিয়েছিলাম)[২]। তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে[৩]। অতএব মাপ ও ওজন পূর্ণ করে দাও এবং লোকদেরকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না, আর পৃথিবীর সংশোধনের পর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। এটাই তোমাদের জন্য

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن

কোন কোন ইমামের নিকট আজো সমকামীর শাস্তি হল, কোন পাহাড় ইত্যাদি উঁচু স্থান থেকে ওকে ফেলে দেওয়া, উপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করা এবং দুর্গন্ধময় কদর্য স্থানে বন্দী করে রাখা।

১. অর্থাৎ গোনাহ করার সময় তার অশুভ পরিণতি মনে থাকে না। কামভাবের তাড়নায় এমন কাজ করে বসে, যা বুদ্ধি ও মনুষ্যত্বের পরিপন্থী। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত অন্যদের ঘটনা শুনে শিক্ষা লাভ করা এবং দুষ্কর্মের পরিণতি সর্বদা স্মরণ রাখা।

২. কুরআনের অন্যত্র (শুআরা : ১৭৬-১৭৭) উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত শু'আয়ব আলাইহিস সালাম 'আয়কা'বাসীদের প্রতি প্রেরিত হন। মাদয়ানবাসী ও আয়কাবাসী একই জাতি হয়ে থাকলে তো কথাই নেই। আর তারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি হলে বলা হবে, তিনি উভয়ের প্রতি প্রেরিত হয়ে থাকবেন এবং উভয় জাতির মধ্যে মাপে-ওজনে কম দেওয়ার ব্যাধি থেকে থাকবে।

যা হোক, হযরত শু'আয়ব আলাইহিস সালাম তাওহীদ ইত্যাদির সাধারণ দাওয়াত ছাড়াও বিশেষ করে সামাজিক লেন-দেনের সংশোধন ও বান্দাদের হক রক্ষার প্রতি অতি জোরদারভাবে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন, যেমন সামনের আয়াতগুলিতে এর বর্ণনা রয়েছে। হযরত শু'আয়ব আলাইহিস সালামকে ভাষার সৌন্দর্য-মাধুর্য ও বলিষ্ঠতার জন্য خطيب الأنبياء (অর্থাৎ নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী) বলা হয়।

৩. অর্থাৎ আমার সত্যতার প্রমাণ প্রকাশ পেয়েছে। এখন তোমাদের যে নসীহতের কথা বলব তা গ্রহণ কর এবং যেসব ভয়ঙ্কর পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করব তা থেকে সাবধান হয়ে যাও।

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

উত্তম, যদি তোমরা ঈমানদার হও[১]।

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ

৮৬. আর তোমরা পথে-ঘাটে এই উদ্দেশ্যে বসে থেকো না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তাকে ভয় দেখাবে, আল্লাহর পথে বাধা দেবে এবং তাতে ক্রটি অন্বেষণ করবে[২]। এবং স্মরণ কর, যখন তোমরা (ধনে-জনে) কম ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের বৃদ্ধি করে দিলেন এবং তোমরা দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে[৩]।

وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا

৮৭. যা দিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, তার প্রতি যদি তোমাদের একদল ঈমান আনে আর একদল ঈমান না আনে, তবে তোমরা

---

১. বান্দাদের হকসমূহের প্রতি ও পারস্পরিক লেন-দেনের সংশোধনের প্রতি আমাদের যমানার পরহেযগারদেরও লক্ষ্য খুবই কম, কিন্তু খোদার নিকট তা এতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, একে একজন মহামর্যাদাশালী পয়গম্বরের বিশেষ ওযীফা (বা সর্বদার কর্তব্য) সাব্যস্ত করা হয়েছিল, যার বিরোধিতার ফলে একটি জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

এ আয়াতগুলিতে হযরত শু'আয়ব (আ)এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের সামান্যতম আর্থিক ক্ষতি করা এবং যমীনে সংশোধনের অবস্থা কায়েম হয়ে যাওয়ার পর তাতে বিপর্যয় ও ফাসাদ বিস্তার করা– চাই কুফর ও শিরক দ্বারা হোক বা অন্যায় খুন-খারাবী লুটতরাজ ইত্যাদি দ্বারা, এ কোন ঈমানদারের কাজ হতে পারে না।

২. দুই কারণে ওরা রাস্তার উপর বসত। এক, যাতে ভয় দেখিয়ে পথিকদের থেকে জোরপূর্বক ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করতে পারে। দুই, মুমিনদের যাতে শু'আয়ব আলাইহিস সালামের নিকট যেতে ও খোদার দীন অবলম্বন করতে বাধা দিতে পারে এবং খোদায়ী ধর্মের দোষান্বেষণ ও খুঁত বের করার ফিকিরে থাকতে পারে।

৩. অর্থাৎ জনসংখ্যা ও সম্পদ উভয় দিক দিয়ে তোমরা কম ছিলে, আল্লাহ তাআলা দুদিকেই তোমাদের সমৃদ্ধি দান করেছেন। জনসংখ্যাও বেড়ে গেছে, সম্পদশালীও হয়ে গেছ। আল্লাহর এসব অনুগ্রহের শোকর আদায় কর।

আর তা তখনই হতে পারে, যখন আল্লাহর ও বান্দাদের হকসমূহের পরিচয় লাভ করবে ও নিজেদের সংশোধনে লেগে থাকবে, আর সেসব নে'য়ামতের কারণে অহংকার-অহমিকায় লিপ্ত না হয়ে বরং অতীতে ফিতনা-ফাসাদকারীদের যে পরিণাম হয়েছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে ও আল্লাহর আযাবকে ভয় করতে থাকবে।

فَاصۡبِرُوۡا حَتّٰی یَحۡکُمَ اللّٰهُ بَیۡنَنَا ۚ وَهُوَ خَیۡرُ الۡحٰکِمِیۡنَ ۝

ধৈর্য ধারণ কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিচ্ছেন। আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী[১]।'

পারা - ৯

قَالَ الۡمَلَاُ الَّذِیۡنَ اسۡتَکۡبَرُوۡا مِنۡ قَوۡمِهٖ لَنُخۡرِجَنَّکَ یٰشُعَیۡبُ وَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَکَ مِنۡ قَرۡیَتِنَاۤ اَوۡ لَتَعُوۡدُنَّ فِیۡ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَلَوۡ کُنَّا کٰرِهِیۡنَ ۝

৮৮. তাঁর সম্প্রদায়ের অহংকারী প্রধানরা বলল, 'হে শু'আয়ব! আমরা অবশ্যই তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব, অথবা তোমাদের অবশ্যই আমাদের ধর্মে ফিরে আসতে হবে[২]।' তিনি বললেন, 'আমরা যদি অপছন্দ করি তবুও[৩]?

---

১. অর্থাৎ যে বার্তা আমি নিয়ে এসেছি, তা যদি তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে গ্রহণ না কর, বরং মতবিরোধের পথ অবলম্বন কর, তবে একটু ধৈর্যধারণ কর– যে পর্যন্ত না আসমান থেকেই আমার ও তোমাদের মতবিরোধগুলির ফয়সালা হয়ে যায়।

২. (لتعودنّ)– عود এর অর্থ কোন জিনিস থেকে বের হয়ে পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়া। হযরত শু'আয়ব (আ)এর সঙ্গীদর ব্যাপারে তো এ শব্দের প্রয়োগ ঠিক আছে। কেননা, তাঁরা কুফর থেকে বের হয়ে ইসলামে দাখিল হয়েছিলেন (অতএব এখন কাফেরদের ধর্ম গ্রহণ করলে তাতে 'ফিরে যাওয়া' হবে)। কিন্তু হযরত শুআয়ব আলাইহিস সালাম তো কাফেরদের ধর্মে অবশ্যই দাখিল ছিলেন না। সুতরাং তাঁর ব্যাপারে এ শব্দের প্রয়োগ কীভাবে করা যেতে পারে?

এর উত্তর হচ্ছে– তাদের সংখ্যাধিক্যের দিকে লক্ষ করে সকলের জন্যই এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ মুমিনদের জন্য যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের সংখ্যাধিক্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে হযরত শুআয়বের জন্য পৃথক শব্দ অবলম্বন করা হয়নি।

অথবা উক্ত শব্দ তাঁর ক্ষেত্রে কাফেরদের ধারণা অনুযায়ী বলা হয়েছে। কারণ, নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে মাদয়ানবাসীদের কুফরী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাঁর নীরবতা দেখে ওরা এমন ভেবে থাকবে যে, তিনিও আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আমাদের মতাদর্শে সন্তুষ্ট আছেন।

এমনও হতে পারে যে, عود শব্দটিকে রূপক অর্থে مطلق صيرورت অর্থাৎ 'হয়ে যওয়া'-এর অর্থে নেওয়া হয়েছে– যেমন, কোন কোন মুফাসসির বলেছেন। (সে হিসেবে لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا- এর অর্থ হবে– 'তোমাদেরকে অবশ্যই আমাদের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে'।)

৩. অর্থাৎ দলীল-প্রমাণাদির আলোকে তোমাদের কুফরী কার্যাবলিকে আমরা যতই অপছন্দ করি না কেন, তবুও কি তোমরা আমাদের জোরপূর্বক এ বিষ খাওয়াতে চাও?

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿۸۹﴾

৮৯. 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই[১] –তা থেকে আল্লাহ আমাদের নাজাত দেওয়ার পর[২]। আর আমাদের পক্ষে তাতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, তবে আমাদের রব আল্লাহই ইচ্ছা করলে (ভিন্ন কথা)। আমাদের রব তাঁর জ্ঞানের দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছেন। আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করে দিন। আর আপনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী[৩]।'

---

১. বাতিল ও মিথ্যা ধর্মকে সত্য বলাই আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা। এ অবস্থায় একজন মহা মর্যাদাশালী পয়গম্বর ও তাঁর খাঁটি অনুসারীদের দ্বারা কী করে সম্ভব যে, তাঁরা সত্য থেকে বের হয়ে মিথ্যার দিকে চলে যাবেন এবং এই মিথ্যাকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবেন?

২. কাউকে প্রথম থেকেই নাজাত দিয়েছেন অর্থাৎ কুফরে দাখিলই হতে দেননি– যেমন, শু'আয়ব আলাইহিস সালাম। আর কাউকে কাউকে কুফরে দাখিল হওয়ার পর তা থেকে বের করেছেন– যেমন, সাধারণ মুমিনদের।

৩. অর্থাৎ স্বীয় ইচ্ছায় বা তোমাদের জোর-জবরদস্তিতে আমরা কুফরের দিকে ফিরে যাব– এ কক্ষনো হতে পারে না। হাঁ, ধরে নাও, যদি আমাদের মধ্যে কারো সম্পর্কে খোদারই এরূপ ইচ্ছা হয়, তবে তাঁর ইচ্ছাকে কে রুখতে পারে? যদি তাঁর হেকমতের দাবি এটাই হয়, তবে কারো অন্যথা করার সাধ্য নেই। কারণ, তাঁরই ইলম সমস্ত কল্যাণ ও হেকমতকে ঘিরে আছে।

যা হোক, তোমাদের ধমকে আমাদের কোন ভয় নেই। কেননা, আমাদের সকল ভরসা ও আস্থা একমাত্র আল্লাহর উপর– কারো চাওয়াতে কিছু হয় না, যা হবে তাঁরই ইচ্ছা ও সর্বব্যাপী ইলমের অধীনে হবে। তাই আমরা নিজেদের ও তোমাদের ফয়সালার জন্যও তাঁরই নিকট দো'য়া করি। কারণ, এমন শক্তিশালী, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান সত্তার চেয়ে আর কারো ফয়সালা উত্তম হতে পারে না।

নবীদের দিলের বিস্ময়কর অবস্থা

হযরত শু'আয়ব আলাইহিস সালামের এই ভাষা থেকে আন্দাজ করা যায় যে, নবীদের অন্তর আল্লাহ তাআলার আজমত ও মহাশক্তি এবং নিজ দাসত্ব ও অক্ষমতার কী গভীর অনুভূতিতে পরিপূর্ণ থাকে এবং কীভাবে প্রতি মুহূর্তে ও প্রত্যেক অবস্থায় তাঁদের আস্থা ও ভরসা সকল

৯০. তাঁর সম্প্রদায়ের কাফের প্রধানরা (মু'মিনদের) বলল, 'তোমরা যদি শু'আয়বকে অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে[১]।'

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ۝٩٠

৯১. অতঃপর ওদের পাকড়াও করল ভূমিকম্প, ফলে ওরা নিজেদের ঘরে অধোমুখে পড়ে রইল[২]।

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۝٩١

৯২. যারা শু'আয়বকে অস্বীকার করেছিল, (তাদের এই অবস্থা হল যে), তারা যেন কখনো ঐ ঘরগুলিতে বসবাসই করেনি। যারা শু'আয়বকে অস্বীকার করেছিল, তারাই হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত[৩]।

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ۝٩٢

৯৩. অতঃপর তিনি ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন, আর (যাওয়ার সময়) বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার রবের পয়গামসমূহ তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। এখন আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কীভাবে আক্ষেপ করি?[৪]'

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝٩٣

উপায়-উপকরণ থেকে মুক্ত হয়ে এক লা-শরীক আল্লাহর উপর পাহাড়ের চেয়েও বেশি মজবুত ও অটল থাকে।

১. অর্থাৎ শু'আয়বের কথা মেনে বাপদাদার ধর্ম ছাড়লে ধর্মীয় ক্ষতি হবে। আর ব্যবসা-বাণিজ্যে মাপ-ওজন ঠিক রাখলে পার্থিব ক্ষতি হবে।

২. বিভিন্ন আয়াত একত্র করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ওদের উপর ظلة, صيحة, رجفة (মেঘ, প্রচণ্ড শব্দ ও ভূমিকম্প) –এ তিন ধরনের আযাব এসেছিল। অর্থাৎ প্রথমে মেঘ এসে ছেয়ে ফেলল, যার মধ্যে ছিল অগ্নিশিখা ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, তারপর আকাশ থেকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও বিকট শব্দ আসে এবং নীচ থেকে ভূমিকম্প হয়। (তাফসীরে ইবনে কাছীর)

৩. ওরা শু'আয়ব আলাইহিস সালাম ও তাঁর সঙ্গীদের লোকালয় থেকে বের করে দেওয়ার ভয় দেখিয়েছিল, কিন্তু ওরাই থাকতে পারেনি, ওদের লোকালয়ও থাকেনি। আর ওরা বলত, শু'আয়বের অনুসারীরা ধ্বংস হবে, কিন্তু ওরা নিজেরাই ধ্বংস, অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হল।

৪. অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর এমন জাতির জন্য আফসোস করে কী লাভ, যাদের সর্বরকমে বোঝানো হয়েছিল, আকর্ষণীয় পন্থায় নসীহত করা হয়েছিল এবং ভবিষ্যত-পরিণতি ও

[রুকূ - ১২]

وَمَآ اَرۡسَلۡنَا فِیۡ قَرۡیَۃٍ مِّنۡ نَّبِیٍّ اِلَّاۤ اَخَذۡنَاۤ اَهۡلَهَا بِالۡبَاۡسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمۡ یَضَّرَّعُوۡنَ ﴿۹۴﴾

৯৪. আমি যে জনপদেই কোন নবী পাঠিয়েছি, তার অধিবাসীদের অভাব-অনটনে ও দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে।

ثُمَّ بَدَّلۡنَا مَکَانَ السَّیِّئَۃِ الۡحَسَنَۃَ حَتّٰی عَفَوۡا وَّقَالُوۡا قَدۡ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذۡنٰهُمۡ بَغۡتَۃً وَّهُمۡ لَا یَشۡعُرُوۡنَ ﴿۹۵﴾

৯৫. অতঃপর আমি মন্দ অবস্থা পরিবর্তন করে ভাল অবস্থা দিয়েছি; অবশেষে ওদের খুব সমৃদ্ধি হয় এবং ওরা বলতে শুরু করে, 'আমাদের বাপ-দাদাদেরও কষ্ট ও আনন্দ স্পর্শ করেছে।' অতঃপর আমি ওদের সহসা পাকড়াও করেছি আর ওরা ছিল বেখবর[১]।

ফলাফল সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়েছিল? কিন্তু ওরা কারো কথা শোনেনি, বরং মুখলিস হিতাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে শুধু লড়াই করেছে।

১. পয়গম্বরদের পাঠানোর পর যখন লোকেরা তাঁদের অস্বীকার ও বিরোধিতা করে, তখন আল্লাহর তরফ থেকে প্রাথমিক সতর্কতাস্বরূপ ওদের উপর রোগ, দুর্ভিক্ষ, অভাব-অনটন ও বিভিন্ন রকমের দুঃখ-কষ্ট আরোপ করা হয়, যাতে অস্বীকারকারীরা চাবুক খেয়ে দুষ্কৃতি থেকে বিরত হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে অবনত হয়।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ওরা যখন সতর্ক হয় না, তখন অভাব-অনটন ও বালা-মুসীবত হটিয়ে ওদের জন্য প্রাচুর্য, সচ্ছলতা ইত্যাদির দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, যাতে– হয় ওরা এসব অনুগ্রহের ফলে কিছুটা অনুতপ্ত হয় এবং আপন প্রতিপালকের প্রতি মনোযোগী হয়, অথবা বিলাস ও প্রাচুর্যের নেশায় মত্ত হয়ে একেবারে উদাসীন ও মাতাল হয়ে যায়। এমন কি, পূর্ববর্তী দুঃখ-কষ্ট এই বলে ভুলে যায় যে, কখনো সুখ, কখনো দুখ –এই ধারা তো প্রথম থেকেই চলে এসেছে। এতে আমাদের কুফর ও অস্বীকৃতির কোনই ভূমিকা নেই। নতুবা এখন কেন সুখ-সচ্ছলতা হাসিল হল? এসব নিতান্তই কালের ঘটনাচক্র, যা আমাদের পূর্বপুরুষদেরও ভাগ্যে ঘটেছে।

এতদূর যখন পৌঁছে যায়, তখন হঠাৎ খোদার আযাব এসে ওদের পাকড়াও করে; অথচ আরাম-আয়েশে মত্ত হয়ে তার ভয়ও ওদের থাকেনি।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) কী চমৎকার লিখেছেন, 'বান্দার যদি দুনিয়াতে পাপের শাস্তি হতে থাকে তবে আশা আছে যে, সে তওবা করবে। আর যখন গোনাহর পথ অনুকূল হয়ে গেল, তখন একে আল্লাহর (তরফ থেকে) ঢিল দেওয়া (বুঝতে হবে)। এমন হলে ধ্বংস হওয়ার ভয়। যেমন কেউ বিষ খেয়ে বমি করে দিলে (বাঁচার) আশা আছে। আর যদি হজম হয়ে যায় তবে কাজ সাবাড়।'

৯৬. যদি সেসব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত ও পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য অবশ্যই উন্মুক্ত করে দিতাম আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ। কিন্তু ওরা অস্বীকার করেছিল। অতএব আমি ওদের কৃতকর্মের কারণে ওদের পাকড়াও করেছি[১]।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۝

৯৭. তবে কি (এসব) জনপদের অধিবাসীরা এ থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, ওদের উপর রাতের বেলায় আমার শাস্তি আপতিত হতে পারে, যখন ওরা নিদ্রামগ্ন থাকে?

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآىِٕمُوْنَ۝

৯৮. অথবা জনপদগুলির অধিবাসীরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, ওদের উপর পূর্বাহ্নে আমার শাস্তি আপতিত হতে পারে, যখন ওরা থাকে খেলায় মত্ত[২]?

اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ۝

---

১. অর্থাৎ বান্দাদর সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই; যারা খোদায়ী শাস্তিতে গ্রেফতার হয়, আপন কৃতকর্মের ফলেই হয়। ওরা যদি আমার পয়গম্বরদের মেনে সত্যের কাছে মাথা নত করত এবং কুফর ও অস্বীকৃতি ইত্যাদি থেকে বিরত থেকে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করত, তবে আমি আসমানী ও যমীনী বরকতসমূহ দিয়ে ওদের ধন্য করতাম।

بركات - এর ব্যাখ্যা

ইমাম রাযী (র) বলেছেন, بركت শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়– কখনো স্থায়ী ও শাশ্বত কল্যাণের অর্থে, আর কখনো ফায়দার আধিক্য বোঝাতে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে, ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করার ফলে এমনসব আসমানী ও যমীনী নেয়ামতের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয়, যা শাশ্বত ও অবিচ্ছিন্ন হয়, অথবা যে সবের ফায়দা অত্যধিক হয়। এমন স্বাচ্ছন্দ্য নয়, যা অবিশ্বাসীরা সাময়িক অবকাশ ও সুবিধাস্বরূপ লাভ করে এবং যা পরিণামে দুনিয়ায়, নতুবা আখেরাতে তো অবশ্যই শাস্তির রূপ লাভ করে থাকে।

২. অর্থাৎ ওরা যখন আরাম-আয়েশে বিভোর হয়ে নিদ্রায় পড়ে থাকে অথবা দুনিয়ার কায়-কারবার ও খেলাধুলায় মেতে থাকে, তখন সহসা আল্লাহর আযাব এসে ওদের ঘিরে ধরতে পারে– এ থেকে কীভাবে ওরা নির্ভয় হয়ে আছে? অথচ যেসব কারণে পূর্বের জাতিসমূহের উপর আযাব এসেছিল, সেসব কারণ এদের মধ্যেও বর্তমান, যথা : কুফর, অবিশ্বাস ও নবীকুল শিরোমণি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা।

৯৯. তবে কি ওরা আল্লাহর গোপন কৌশল সম্পর্কে নির্ভয় হয়ে গেছে? বস্তুত আল্লাহর গোপন কৌশল থেকে চরম ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরাই নির্ভয় হয়[১]।

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

[রুকূ - ১৩]

১০০. যারা (এখন) যমীনের উত্তরাধিকারী হয়েছে এর (পূর্ববর্তী) অধিবাসীদের ধ্বংস হওয়ার পর- তাদের নিকট কি এ বিষয় স্পষ্ট হয়নি যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাকড়াও করতে পারি তাদের পাপের দরুন[২]? বস্তুত আমি ওদের অন্তর মোহর করে রেখেছি, অতএব ওরা শোনে না।

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১. সেই সব জনপদের কিছু হাল-অবস্থা আমি আপনাকে শোনাচ্ছি। আর নিশ্চয়ই ওদের নিকট ওদের রাসূলগণ নিদর্শনাবলি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ওরা কখনই সেই বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার ছিল না, যে বিষয়কে ইতিপূর্বে অস্বীকার করেছিল। এভাবেই আল্লাহ কাফেরদের অন্তর মোহর করে দেন[৩]।

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾

---

১. পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকাবস্থায় আল্লাহ যে অতর্কিত পাকড়াও করেন, তাকেই مكر الله (আল্লাহর কৌশল) বলা হয়েছে। এই পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত থাকে, অপকর্মের অভিশাপ যাদের ধোঁকায় ফেলেছে। মুমিনের শান এই যে, সে কোন অবস্থাতেই আল্লাহকে ভোলে না। কবির ভাষায়-

ظفر اسکو آدمی نہ جانیے گا ÷ گو ہو کیسا ہی صاحب فہم وذکا
جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی ÷ جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

'জফর! তুমি তাকে মানুষ মনে করো না, যদিও সে হোক মহা জ্ঞানী ও মেধাবী- আনন্দ-বিলাসে যার আল্লাহর স্মরণ থাকেনি, ক্রোধে যার আল্লাহর ভয় রয়নি।'

২. অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের যেমন পাকড়াও করেছিলাম, বর্তমান অধিবাসীদেরও পাকড়াও করতে পারি।

৩. অর্থাৎ ওরা যে জিনিস একবার অস্বীকার করে বসল, তার পর যতই নিদর্শন দেখুক, দুনিয়া এদিক-সেদিক হয়ে যাক, তবু তা মেনে নেওয়া ওদের পক্ষে আর সম্ভব হল না। যখন

১০২. আর আমি ওদের অধিকাংশের মধ্যে প্রতিশ্রুতি (রক্ষার গুণ) পাইনি, বরং ওদের অধিকাংশকে নাফরমানই পেয়েছি[১]।

وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَّاِنْ وَّجَدْنَاۤ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ۝

১০৩. অনন্তর, আমি তাঁদের পরে[২] মূসা (আ)-কে আমার নিদর্শনাদি দিয়ে ফেরাওন ও তার

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ

আল্লাহ তাআলার বিরোধিতায় কোন জাতির ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতা এ পর্যায়ে পৌছে যায়, তখন স্বভাবতই সংশোধন ও সত্যকে গ্রহণের সম্ভাবনা বাকী থাকে না।

অন্তরে মোহর লেগে যাওয়া বলতে এ অবস্থাই উদ্দেশ্য।

বি. দ্র. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ (তাদের নিকট তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে এসেছিলেন) — এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, কওমে নূহ (আ), আদ, ছামূদ, কওমে লূত (আ) ও মাদয়ানবাসীদের প্রতি যে সকল নবী প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই بينات (সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি) সহ প্রেরিত হয়েছিলেন। অতএব হূদ আলাইহিস সালামের কওমের উক্তি يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ (হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোনো নিদর্শন আননি) নিতান্তই জিদ ও শত্রুতাবশত ছিল।

১. আয়াতে عهد দ্বারা সম্ভবত সাধারণ ওয়াদা-অঙ্গীকার উদ্দেশ্য; অথবা বিশেষভাবে عهدِ اَلَسْتُ উদ্দেশ্য। অথবা সেই অঙ্গীকার উদ্দেশ্য, যা বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের সময় করত, অর্থাৎ অমুক কষ্ট তুলে নেওয়া হলে আমরা অবশ্যই ঈমান আনব। যেমন ফেরাওন সম্প্রদায় বলেছিল : (আয়াত : ১৩৪-১৩৫)

لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ.

(আপনি যদি আমাদের থেকে এই আযাব দূর করে দেন, তবে অবশ্যই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব এবং আপনার সঙ্গে বনী ইসরাঈলকে যেতে দেব'। অতঃপর আমি যখন ওদের উপর থেকে আযাব তুলে নিতাম এক নির্দিষ্টকালের জন্য, যে পর্যন্ত ওদের পৌঁছা অবধারিত ছিল– তখনই ওরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলত।)

২. অর্থাৎ যে নবীদের আলোচনা পূর্বে হয়েছে (নূহ, হূদ, সালেহ, লূত, শু'আয়ব আলাইহিমুস সালাম) –তাঁদের সকলের পরে মূসা আলাইহিস সালাম তশরীফ এনেছিলেন।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

সে সকল পয়গম্বরের ঘটনা উল্লেখ করার পর মাঝে একটি سنة الله (আল্লাহর নীতি) বর্ণনা করা হয়েছে, যা অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে জারী রয়েছে, এবং যার মাধ্যমে বর্তমান কাফের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। মাঝের এই বিষয়ের আলোচনা শেষে বর্তমান আয়াত থেকে এক মহা মর্যাদাশালী নবীর আলোচনা শুরু করা হয়েছে।

পারিষদবর্গের নিকট পাঠালাম, কিন্তু ওরা সেগুলি অস্বীকার করল। অতএব লক্ষ কর, ফাসাদকারী-দের পরিণাম কেমন হয়েছিল[১]!

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝

১০৪. আর মূসা বললেন, 'হে ফেরাওন! আমি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রাসূল।

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

১০৫. আমি এ বিষয়ে অটল-অবিচল যে, আমি আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া অন্য কিছু আরোপ করব না[২]। নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের নিদর্শন নিয়ে এসেছি। অতএব তুমি আমার সঙ্গে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও[৩]।

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝

---

১. ওর চেয়ে বড় ফাসাদকারী আর কে হবে, যে আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বরদের ও আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর সৃষ্টি দ্বারা নিজের পূজা করায়? (অর্থাৎ ফেরাওন)— সম্মুখে জরুরী ঘটনাসমূহ বর্ণনা করার পর ওর পরিনামের বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২. অধিকাংশ মুফাসসির حقيق এর অর্থ جدير (যোগ্য, উপযুক্ত) করেছেন। তাই على অব্যয়কে باء এর অর্থে নিতে হবে, অর্থাৎ আমার পক্ষে এ-ই উপযুক্ত যে, আল্লাহর তরফ থেকে আমি কোন অসত্য ও ভ্রান্ত কথা না বলি।

কেউ কেউ حقيق এর অর্থ حريص (আকাঙ্ক্ষী) করেছেন। কিন্তু হযরত মুতারজিম (র) حقيق কে قائم ও ثابت (অটল ও অনড়) অর্থে নিয়েছেন, যার অর্থ হবে, আমি কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়া সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে এ বিষয়ে অটল আছি যে, সত্য ছাড়া কোন কিছু মুখ দিয়ে বের করব না, খোদার পয়গাম হুবহু তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেব এবং তোমাদের অস্বীকার ও ভীতিপ্রদর্শনে মোটেই বিচলিত হব না।

৩. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাওনকে অনেক বিষয়ে নসীহত করেছেন, যেমন অন্যান্য আয়াতে উল্লেখিত আছে। তবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই ছিল যে, তিনি বনী ইসরাঈলকে যারা ছিল নবীদের বংশধর এবং যাদেরকে ফেরাওনীরা লাঞ্ছিত জীব-জন্তুর মত গোলাম বানিয়ে রেখেছিল– ফেরাওনীদের জুলুম-অত্যাচার থেকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করেন।

এস্থলে ফেরাওনকে সম্বোধন করে উক্ত বিষয়েই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে তোমার দাসত্ব ও বেগার থেকে মুক্তি দাও, যাতে তারা স্বাধীনভাবে স্বীয় রবের ইবাদতে মশগুল হতে পারে এবং আমার সঙ্গে স্বদেশে (শামদেশে) চলে যেতে পারে।

১০৬. ফেরাওন বলল, 'তুমি যদি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক, তবে তা পেশ কর যদি তুমি সত্যবাদী হও'।

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ۝

১০৭. তখন তিনি নিজের লাঠি নিক্ষেপ করলেন, আর তৎক্ষণাৎ তা স্পষ্ট অজগর হয়ে গেল[১]।

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ۝

১০৮. এবং তিনি নিজের হাত (বগল থেকে) বের করলেন, অমনি তা দর্শকদের কাছে শুভ্র (ও উজ্জ্বল) প্রতিভাত হল[২]।

وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ۝

[রুকূ - ১৪]

১০৯. (তখন) ফেরাওন সম্প্রদায়ের প্রধানেরা বলল, 'এ তো এক সুদক্ষ যাদুকর[৩]–

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ۝

তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ইরাক থেকে হিজরত করে শামদেশেই অবস্থান করেছিলেন। পরবর্তীতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কারণে বনী ইসরাঈল মিসরে বসবাস শুরু করে। এখন যেহেতু তথায় (মিসরে) ফেরাওনের জাতি কিবৃতীরা তাদের উপর নানা প্রকার জুলুম-অত্যাচার করে আসছিল, সুতরাং কিবৃতীদের অপমানকর দাসত্ব থেকে মুক্ত করে বনী ইসরাঈলকে পৈত্রিক দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো জরুরী ছিল।

১. 'স্পষ্ট অজগর'– অর্থাৎ তা যে অজগর এ ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিধা-সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

কথিত আছে, উক্ত অজগর হা করে ফেরাওনের দিকে অগ্রসর হল। সে বিচলিত হয়ে মূসা আলাইহিস সালামকে তা ধরতে অনুরোধ করল। মূসা (আ) এর স্পর্শ পাওয়া মাত্র তা পুনরায় লাঠি হয়ে গেল।

২. অর্থাৎ হাত জামার গলা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে বগলের নীচে চেপে ধরলেন। অতঃপর সেখান থেকে বের করা মাত্র লোকেরা খোলা চোখে দেখতে পেল যে, তা অলৌকিকভাবে সাদা ও সমুজ্জ্বল। এই শুভ্রতা ধবল, কুষ্ঠ ইত্যাদি কোন রোগবিশেষের কারণে ছিল না, বরং মনে হচ্ছিল– যেন নূরানী কলবের আলো অলৌকিকভাবে হাতের ভিতর অনুপ্রবেশ করছে (এবং তা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে)।

৩. বোঝা যায় যে, ফেরাওন মূসা আলাইহিস সালামের মুজেযাসমূহ দেখে আতঙ্কিত হয়ে জনসভা করল এবং প্রথমে সে নিজে (যেমন সূরা শুআরা, আয়াত ৩৪-৩৫-এ আছে),

১১০. 'যে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদের বের করে দিতে চায়। এখন তোমাদের পরামর্শ কী[১]?

يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ۝١١٠

১১১. ওরা বলল, 'আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দিন এবং শহরে-নগরে সংগ্রাহকদের পাঠান,

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۝١١١

১১২. যারা সকল সুদক্ষ যাদুকরকে আপনার কাছে নিয়ে আসবে'[২]।

يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ۝١١٢

১১৩. আর যাদুকররা ফেরাওনের কাছে এল, ওরা বলল, 'আমরা কোন (বড়) পারিশ্রমিক* অবশ্যই পাব তো, যদি আমরাই বিজয়ী হই[৩]?'

وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ۝١١٣

তারপর ওর পক্ষ থেকে বড় নেতারা রায় দিল যে, মনে হয় মূসা (আলাইহিস সালাম) একজন নিপুন যাদুকর।

(ওদের এই অভিযোগের) কারণ এই যে, যেসব অলৌকিকতা মূসা আলাইহিস সালামের দ্বারা প্রকাশ পেয়েছিল, ওদের সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী তার ব্যাপারে যাদুর চেয়ে আর কোন ভাল ব্যাখ্যা সম্ভব ছিল না।

১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিস্ময়কর যাদু-টোনা দেখিয়ে মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে নিতে চায়, পরিশেষে দেশের মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি সৃষ্টি করে এবং বনী ইসরাঈলের সহায়তা ও স্বাধীনতার নামে এ ভূখণ্ডের আসল নাগরিক কিবতী জাতিকে তাদের ঘর-বাড়ী ও দেশ (মিসর) থেকে উৎখাত করে দিতে চায়– তোমরা পরামর্শ দাও, তার ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

২. পরস্পর পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হল, ফেরাওনকে অনুরোধ করা হোক– তিনি যেন এ দুজনের (মূসা ও হারূনের) ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করেন। এদের সর্বোত্তম প্রতিরোধ ও কার্যকর জওয়াব এই হতে পারে যে, সমগ্র দেশে পেয়াদা পাঠিয়ে এদের চেয়েও পারদশী যাদুবিদদের সমবেত করে তাদের দ্বারা এদের মোকাবেলা করা হোক। অতঃপর তাই করা হল।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা– 'পুরস্কার'**

৩. ফেরাওনের যাদুকররা প্রথম প্রশ্নই করল– إن لنا لأجرا (আমাদের জন্য কোনো পারিশ্রমিক থাকবে কি, যদি আমরা বিজয়ী হই?) অপরদিকে নবীগণের প্রথম উক্তিই হয়ে থাকে– مَآأَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ (আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন

১১৪. সে বলল, 'হাঁ, এবং নিশ্চয় তোমরা (আমার) ঘনিষ্ঠ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে[১]।'	قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝
১১৫. তারা বলল, 'হে মূসা! হয় আপনি (প্রথমে) নিক্ষেপ করুন, নয় আমরাই নিক্ষেপ করি[২]'।	قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ۝
১১৬. তিনি বললেন,'তোমরাই নিক্ষেপ কর[৩]।' অতঃপর যখন ওরা (দড়ি ও লাঠি) নিক্ষেপ করল, তখন লোকদের চোখে যাদু করল (দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাল), তাদের আতঙ্কিত করে ফেলল এবং পেশ করল এক বিরাট যাদু[৪]।	قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ۝

পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহরই নিকট।) এভাবে যাদুকরদের প্রথম প্রশ্নের দ্বারাই ফুটে উঠল যে, ওদের আর নবীগণের মাঝে পার্থক্য কী?

১. অর্থাৎ পারিশ্রমিক তেমন আর কী বিষয়, তা তো পাবেই। তদুপরি তোমাদেরকে আমার দরবারে নৈকট্যপ্রাপ্ত ও বিশেষ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে।

২. ইতিপূর্বে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাওনের সামনে লাঠি ফেলে দিয়ে আল্লাহর হুকুমে অজগর বানিয়েছিলেন। এটা সম্ভবত ওরা জানতে পেরেছিল। তারই ভিত্তিতে ওরা এ কথা বলল।

৩. অর্থাৎ তোমাদের যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই উদ্দেশ্য এবং তোমাদের কাছে এরই উপর চূড়ান্ত মীমাংসা নির্ভরশীল, সুতরাং তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর এবং পূর্ণ শক্তি পরীক্ষা করে নাও। কেননা, বাতিলের পূর্ণ প্রদর্শনীর পর সত্যের যে বিজয় প্রতিভাত হবে, আশা করা যায় যে, তা অধিকতর কার্যকর হবে এবং মানুষের অন্তরে বেশি রেখাপাত করবে।

সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে মূসা আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য যাদুর সাথে মুজেযার মোকাবেলা (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) করার অনুমতি প্রদান ছিল না, বরং তিনি দুটি উপায়ের মধ্য থেকে এমন একটি উপায় অবলম্বন করলেন, যা বাতিলকে পরাভূত ও সত্যকে জয়যুক্ত ও প্রজ্বলিত করার অতি কার্যকর উপায় ছিল।

৪. অর্থাৎ তারা যাদু বলে নজরবন্দি করে সমবেত লোকদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করল এবং তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল।

অন্য আয়াতে (–ত্বহা, ৬৬) আছে, তারা নিজেদের দড়ি ও লাঠিগুলো মাটির উপর নিক্ষেপ করল। ফলে মাটির উপর সাপ আর সাপই দৌড়াচ্ছে বলে মনে হতে লাগল–

১১৭. আর আমি ওহী মারফত মূসাকে আদেশ করলাম, 'তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর'। আর তৎক্ষণাৎ তাঁর লাঠি (অজগর হয়ে) ওদের অলীক সৃষ্টিগুলো গ্রাস করতে লাগল*।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۝

১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং ওরা যা কিছু করেছিল তা বাতিল সাব্যস্ত হল।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১১৯. এভাবে ওরা (ফেরাওন ও তার দল) সেখানে পরাজিত হল এবং লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেল।

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ۝

১২০. আর যাদুকররা সেজদায় লুটিয়ে পড়ল[১]।

وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۝

يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى (ওদের যাদুর প্রভাবে তাঁর মনে হল যে, দড়ি ও লাঠিগুলো ছোটাছুটি করছে!)

এসব আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ফেরাওনের যাদুকররা তখন যে ভেলকিবাজি দেখিয়েছিল, তাতে সত্যিকারভাবে (দড়ি ও লাঠির) প্রকৃতি বদলে যায়নি, বরং তা কেবল নজরবাজি ও চোখের ভেলকি ছিল।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ওরা যা-কিছু মিথ্যা রচনা করেছিল, তা গ্রাস করতে লাগল'।

১. অর্থাৎ মূসা (আ) এর লাঠি সাপ হয়ে ওদের সকল লাঠি ও দড়ি গিলে ফেলল এবং সমস্ত কৃত্রিম তামাশা খতম করে দিল। এতে যাদুকররা উপলব্ধি করল যে, এটি যাদু অপেক্ষা ঊর্ধ্বের কোন বিষয়। –অবশেষে ফেরাওনের লোকেরা ভরা সমাবেশে হেরে ও অপমানিত হয়ে ময়দান থেকে প্রত্যাবর্তন করল। আর যাদুকররা খোদায়ী নিদর্শন দেখে অগত্যা সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। কথিত আছে, হযরত মূসা ও হারুন সত্যের বিজয়ে শোকরানা সেজদা করলে যাদুকররাও সেজদাবনত হয়ে পড়ল।

তবে এতে এ কথা বলা যায় না যে, সমস্ত যাদু এতেই সীমিত। সম্ভবত ওরা ভেবেছিল, এতটুকু ভেলকি দ্বারাই আমরা মূসা-কে পরাজিত করে ফেলব। যদি আরো সুযোগ আসত, তবে হয়ত তারা এ থেকে বড় কোন যাদু দেখাত। কিন্তু প্রথম পর্যায়েই তারা এমনভাবে পরাজিত হল যে, আর মোকাবেলা জারি রাখার অবকাশ রইল না।

القى السحرة –এই শব্দাবলি প্রকাশ করে যে, এমন একটি শক্তিশালী অবস্থা তাদের আচ্ছন্ন করল, যার পর আত্মসমর্পণ ছাড়া কোনো উপায় রইল না। আল্লাহর কী অশেষ রহমত! এই মাত্র যারা আল্লাহর পয়গম্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল, মুহূর্তের ব্যবধানে তারা আল্লাহর খাঁটি ওলি ও কামেল আরেফ (عارف) হয়ে গেল।

১২১. তারা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম সমগ্র বিশ্বের রবের প্রতি—

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১২২. 'যিনি মূসা ও হারূনের রব'[১]।

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝

১২৩. ফেরাওন বলল, কী! তোমরা তার প্রতি ঈমান এনে ফেললে আমি তোমাদের অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই? এটা তো এক চক্রান্ত, তোমরা (সবাই মিলে) শহরে এ চক্রান্ত করেছ, যাতে এ শহর থেকে এর বাসিন্দাদের বের করে দিতে পার। অতএব শীঘ্রই তোমরা (এর পরিণাম) জানতে পারবে[২]।

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

১২৪. 'আমি অবশ্যই তোমাদের এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা কেটে দেব, তার পর তোমাদের সকলকে অবশ্যই শূলে চড়াব।'

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

---

১. ফেরাওনও নিজের ব্যাপারে أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ (আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক) এর দাবি করত! সম্ভবত এ কারণেই رب العالمين এর সাথে رَبِّ مُوْسَى وَهَارُوْنَ বিশেষণটি যোগ করতে হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিতও আছে যে, বিশ্বজগতের প্রতিপালক তিনিই হতে পারেন, যিনি বাহ্যিক উপায়-উপকরণ ছাড়া শুধু নিজের বিশেষ ক্ষমতাবলে সর্বসমক্ষে মূসা ও হারূনকে দুনিয়ার অহংকারীদের উপর বিজয়মাল্যে ভূষিত করে দেখিয়ে দিলেন।

২. অর্থাৎ এটা তোমাদের সকল যাদুকরের ষড়যন্ত্র। খুব সম্ভব মূসা তোমাদের বড় উস্তাদ, তাকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছ, পরে সকলে তার সামনে পরাজয় স্বীকার করেছ, যাতে সাধারণ লোকেরা প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

এই গভীর ষড়যন্ত্রের দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য এই যে, এ দেশের আসল অধিবাসীদের বহিষ্কার করে দিয়ে তোমরা নিজেরা মিসরের রাজত্ব দখল করে নেবে।

ফেরাওন তার প্রকাশ্য পরাজয়কে ঢাকার জন্য এবং জনসাধারণকে বোকা বানানোর জন্য এসব কথা বলেছিল– فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوْهُ (মোটকথা, সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল, সুতরাং তারা ওর কথা মেনে নিল। –যুখরুফ, আয়াত ৫৪); –কিন্তু যে জিনিসকে (অর্থাৎ মিসরের রাজত্ব হাতছাড়া হওয়া) ফেরাওন ও তার দলবলেরা ভয় করছিল, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কুদরতে তারই সম্মুখীন হল- وَنُرِيَ فِرعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَاكَانُوْا يَحْذَرُوْنَ (আর ফেরাওন, হামান ও ওদের বাহিনীকে বনী ইসরাঈলের হাতে ঐ জিনিস দেখিয়ে দেওয়া হল, যার আশঙ্কা ওরা করত। – কাসাস, আয়াত ৬)

১২৫. তারা বলল, 'আমরা তো আপন রবের কাছেই ফিরে যাব[১]।

قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ

১২৬. 'আর তুমি আমাদের প্রতি কেবল এ কারণেই বিদ্বেষ পোষণ করছ যে, আমরা আপন রবের নিদর্শনাবলির প্রতি ঈমান এনেছি*, যখন তা আমাদের কাছে পৌছেছে। (অতঃপর তারা দো'য়া করলেন)– হে আমাদের রব! আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দিন এবং আমাদের মৃত্যু দান করুন মুসলমান অবস্থায়[২]।'

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ

[রুকূ - ১৫]

১২৭. ফেরাওন-সম্প্রদায়ের প্রধানেরা বলল, 'আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে মুক্ত-

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ

---

১. যাদুকররা তাওহীদের সুরা পান করেছিল এবং আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য অস্থির হয়ে গিয়েছিল। জান্নাত ও দোযখ যেন তাদের চোখের সামনে ছিল। এ অবস্থায় তারা এসব ধমকের কী পরোয়া করবে!

তারা পরিষ্কার বলে দিল, কোনই ক্ষতি নেই, যা করার করে ফেলুন। আমাদের তো আল্লাহর সন্নিধানে যেতেই হবে– আপনার ক্রোধের শিকার হয়েই হোক। সেখানকার শাস্তি থেকে এখানকার কষ্ট আসান। এবং তাঁর রহমত ও সন্তুষ্টির পথে দুনিয়ার যত বড় কষ্ট ও বালা-মুসীবতই হোক, তা সহ্য করে নেওয়া খোদা-প্রেমিকদের জন্য সহজ। কবি বলেন :

هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم ÷ وللعاشق المسكين مايتجرع

(নেয়ামতওয়ালাদের জন্য তাদের নেয়ামত তৃপ্তিকর হোক, আর নিঃস্ব প্রেমিকের জন্য স্বল্প সুরাই হোক তৃপ্তিকর।)

* দ্বিতীয় তরজমা– 'তুমি আমাদের মধ্যে এ ছাড়া আর কী দোষ পেয়েছ যে, আমরা ঈমান এনেছি ..'

২. অর্থাৎ যে রবের নিদর্শন মেনে নেওয়ার কারণে আমরা আপনার দৃষ্টিতে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছি, সেই রবেরই দরবারে আমাদের প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন আমাদেরকে আপনার জুলুম-অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্টের মুখে 'সবরে জামীল' (উৎকৃষ্ট ধৈর্যধারণ)-এর তাওফীক দান করেন এবং মৃত্যু-মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের উপর দৃঢ় রাখেন। এমন যেন না হয় যে, আমরা ঘাবড়ে গিয়ে তাঁর সন্তুষ্টির পরিপন্থী কোন কথা বলে বসি।

مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ۝

স্বাধীন ছেড়ে রাখবেন, যাতে তারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে[১] এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদের বর্জন করে চলে[২]?' সে বলল, 'এখন আমরা তাদের পুত্রদের মেরে ফেলব আর তাদের নারীদের জীবিত রাখব। আমরা তো তাদের উপর পরাক্রান্ত'[৩]।

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ

১২৮. মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, 'তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং

---

১. সত্যের নিদর্শন দেখে যখন যাদুকররা সেজদায় পতিত হল এবং বনী ইসরাঈল মূসা আলাইহিস সালামের সহযোগী হতে লাগল বরং কতক কিবতীও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করল, তখন ফেরাওনী নেতৃবর্গ আতঙ্কিত হয়ে ফেরাওনকে কঠোরতা করতে উৎসাহিত করতে লাগল এবং বলল, মূসা ও তার সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে আর সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। তা হলে তারা দেশের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করে বেড়াবে এবং জনসাধারণকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা বুলন্দ করবে এবং ভবিষ্যতে দেশ থেকে আপনার ও আপনার প্রতিষ্ঠিত মা'বূদদের উপাসনা বিলুপ্ত করে দেবে।

২. ফেরাওন নিজেকে 'رب اعلى' তথা সবচেয়ে বড় রব বলত। সম্ভবত এই رب اعلى -এর স্বার্থেই কিছু ছোট ছোট 'রব'ও সাব্যস্ত করেছিল। এখানে সেই সবকেই آلهتك বলা হয়েছে।

কারো মতে তা গাভী ইত্যাদির প্রতিকৃতি ছিল। আবার কারো মতে آلهتك দ্বারা সূর্য ও তারকারাজি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, স্বয়ং ফেরাওন নিজের প্রতিকৃতি বানিয়ে পূজার জন্য লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিল।

যা হোক, সে নিজেকেই বড় মা'বূদ বলত এবং ما علمت لكم من إله غيري বলে আল্লাহর অস্তিত্বই অস্বীকার করত। (আল্লাহর পানাহ!)

৩. মূসা আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বেও ফেরাওন বনী ইসরাঈলের উপর নির্যাতন করে চলছিল। সে তাদের ছেলেসন্তানকে এই ভয়ে কতল করে ফেলত যে, না জানি এ সেই ইসরাঈলী কি না, যার হাতে তার রাজত্বের পতনের সংবাদ গণকরা দিয়েছিল। আর খেদমত ইত্যাদির জন্য মেয়েদের জীবিত থাকতে দিত। এখন মূসা আলাইহিস সালামের প্রভাব লক্ষ করে তার আশঙ্কা হল, না জানি তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ও সহোযোগিতায় বনী ইসরাঈল শক্তিশালী হয়ে যায় কি না। এ জন্য তাদের ভীত ও পরাভূত করার উদ্দেশ্যে সেই পুরাতন স্কীম অনুসারে কাজ করার সংকল্প করল। বনী ইসরাঈল এই সংকল্পের কথা শুনে স্বভাবতই পেরেশান হয়ে থাকবে। সামনের আয়াতে মূসা আ. এরই প্রতিকারের কথা বলেছেন।

وَاصۡبِرُوۡا ۚ اِنَّ الۡاَرۡضَ لِلّٰهِ ۟ۙ یُوۡرِثُهَا مَنۡ یَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٖ ؕ وَالۡعَاقِبَۃُ لِلۡمُتَّقِیۡنَ ﴿۱۲۸﴾

ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় পৃথিবী তো আল্লাহর– তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর (শুভ) পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য'[১]।

قَالُوۡۤا اُوۡذِیۡنَا مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ تَاۡتِیَنَا وَمِنۡۢ بَعۡدِ مَا جِئۡتَنَا ؕ قَالَ عَسٰی رَبُّکُمۡ اَنۡ یُّهۡلِکَ عَدُوَّکُمۡ وَیَسۡتَخۡلِفَکُمۡ فِی الۡاَرۡضِ فَیَنۡظُرَ کَیۡفَ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۲۹﴾

১২৯. তারা বলল, 'আমরা নির্যাতিত হয়েছি– আমাদের নিকট আপনার আগমনের পূর্বেও ও আপনার আগমনের পরেও[২]।' তিনি বললেন, 'শীঘ্রই তোমদের রব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন এবং এ দেশে তোমাদেরকে (তাদের) স্থলাভিষিক্ত করে দেবেন। অতঃপর তিনি দেখবেন, তোমরা কেমন আমল কর[৩]।'

[রুকূ - ১৬]

وَلَقَدۡ اَخَذۡنَاۤ اٰلَ فِرۡعَوۡنَ بِالسِّنِیۡنَ

১৩০. নিশ্চয় আমি ফেরাওনওয়ালাদের অবিরাম

---

১. অর্থাৎ ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই। আল্লাহর মোকাবেলায় কারো শক্তি চলবে না। রাজত্ব তাঁরই, তিনি যাকে উপযুক্ত মনে করবেন তাকেই দান করবেন। অতএব জালেমের বিরুদ্ধে তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, তাঁরই প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, তাঁকেই ভয় কর, সবর ও তাক্ওয়ার পথ অবলম্বন কর এবং বিশ্বাস রাখ যে, চূড়ান্ত সফলতা মুত্তাকীদেরই জন্য।

২. অর্থাৎ আমরা তো সর্বদা মুসীবতেই রয়েছি– আপনার আগমনের পূর্বে আমাদের অপমানকরভাবে বেগার খাটানো হত এবং আমাদের ছেলেদের হত্যা করা হত। আর আপনার আগমনের পরে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট দেওয়া হচ্ছে এবং ছেলেদের হত্যার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কবে আমাদের বিপদ-আপদের সমাপ্তি ঘটবে?

৩. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বেশি ঘাবড়িয়ো না, আল্লাহর মদদ নিকটে এসে গেছে। অচিরেই তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করা হবে এবং ওদের ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তির মালিক তোমাদের বানিয়ে দেওয়া হবে। আজ নির্যাতন ও দাসত্বে পতিত করে তোমাদের পরীক্ষা হচ্ছে, তখন স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা দান করে পরীক্ষা করা হবে যে, তাঁর নে'য়ামতসমূহের কদর ও শোকর কতটুকু আদায় কর।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, হযরত মূসা ও তাঁর সম্প্রদায়ের এই কথোপকথন মুসলমানদের শোনাবার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়, তখন মুসলিমগণও এরূপ নির্যাতিত হচ্ছিল। گفتہ آید در حدیث دیگراں (অন্যদের কাহিনীর মাধ্যমে তাঁদের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।)

وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ۝

দুর্ভিক্ষে ও ফলমূলের ক্ষতিতে আক্রান্ত করেছিলাম, যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে।

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ۗ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۝

১৩১. যখন ওদের কল্যাণ লাভ হত, ওরা বলতে শুরু করত, 'আমাদের প্রাপ্য তো এটা।' আর যদি ওদের উপর কোন অকল্যাণ আপতিত হত, তবে মূসা ও তাঁর সাথীদের অলক্ষুণে সাব্যস্ত করত। শুনে রাখ, ওদের অকল্যাণের কারণ আল্লাহর ইলমে আছে (তা হচ্ছে ওদের মন্দ কর্ম)। কিন্তু ওদের অধিকাংশ জানে না[১]।

---

১. পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলের শত্রুদের ধ্বংস করবেন। এখান থেকে উক্ত প্রতিশ্রুত ধ্বংসেরই বিশদ বর্ণনা আরম্ভ হয়েছে।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা স্বীয় চিরাচরিত নিয়ম وَمَا أَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ الخ (আমি যে জনপদেই কোন নবী পাঠিয়েছি, তার অধিবাসীদের অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পাকড়াও করেছি)— অনুসারে প্রাথমিক সতর্ক করণার্থে ফেরাওনের অনুসারীদের দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি মামুলি দুর্ভোগ-দুর্যোগে পতিত করলেন, যাতে ওরা উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয় এবং মূসা আলাইহিস সালামের নসীহত গ্রহণ করে। কিন্তু ওরা কি এমন ছিল? ওরা এসব সতর্কীকরণের কোনই পরোয়া করেনি।

ফলে ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ (অতঃপর আমি মন্দ অবস্থা পরিবর্তন করে ভাল অবস্থা দিয়েছি) –এই নিয়মানুসারে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দূরীভূত হয়ে যখন স্বাচ্ছন্দ্য ও সুদিন আসত, তখন বলত– এসব অবস্থাই তো আমাদের উপযুক্ত। এরপর যদি ওরা আবারো কোন মন্দ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়ত, তখন বলত, মূসা ও তার সাথীদের অমঙ্গলহেতুই এ অবস্থা।

আল্লাহ তাআলা এরই উত্তরে বলেন- أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ الخ অর্থাৎ নিজেদের দুর্ভাগ্য ও অমঙ্গলের কারণ মকবূল বান্দাদের সাব্যস্ত করছ কেন, তোমাদের এই অমঙ্গলের প্রকৃত কারণ তো আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে। আর তা হচ্ছে তোমাদের জুলুম, অত্যাচার, নাফরমানি ও দুষ্কৃতি। এ কারণেই আল্লাহর নিকট থেকে শাস্তির কিছু অংশ সাময়িক সতর্কতাস্বরূপ তোমাদের উপর আসছে। বাকী তোমাদের জুলুম ও কুফরের আসল দুর্ভোগ ও অমঙ্গল অর্থাৎ পরিপূর্ণ শাস্তি তো এখনো আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত রয়েছে, যা দুনিয়াতে বা আখেরাতে যথাসময়ে তোমাদের উপর পতিত হবেই হবে, যদিও এ খবর অধিকাংশ লোকেরই জানা নেই।

১৩২. ওরা বলল, 'আপনি আমাদের কাছে যত নিদর্শনই আনেন না কেন, যাতে তার দ্বারা আমাদের যাদু করেন– আমরা কিছুতেই আপনার প্রতি ঈমান আনব না'[১]।	وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۳۲﴾
১৩৩. অতঃপর আমি ওদের উপর পাঠালাম তুফান[২], পঙ্গপাল, আটালি[৩], ব্যাঙ, রক্ত– যেগুলো ছিল পৃথক পৃথক নিদর্শন। তবুও ওরা অহংকার করতে থাকল। আর ওরা ছিলই অপরাধী লোক[৪]।	فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ۟ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿۱۳۳﴾

১. ওরা মূসা আলাইহিস সালামের মুজেযাসমূহ দেখে বলত, তুমি আমাদের উপর যতই যাদু কর না কেন এবং যতই নিদর্শন দেখাও না কেন, আমরা কোন মতেই তোমার কথা মানব না।

যখন ওরা এই চূড়ান্ত ফয়সালা শুনিয়ে দিল এবং সত্যকে গ্রহণের সকল দ্বার নিজেদের জন্য বন্ধ করে দিল, তখন আল্লাহ ওদের উপর একের পর এক বিভিন্ন মহাবিপদ আপতিত করলেন। সামনের আয়াতে এর বিশদ বর্ণনা আসছে।

২. অর্থাৎ বৃষ্টি ও বন্যা, অথবা মহমারীর কারণে গণহারে মৃত্যু।

৩. قُمَّل এর অর্থ আটালি (রক্তখেকো কীট, যা গরু, ছাগল ইত্যাদির গায়ে লেগে থাকে)। অথবা উকুন, বা গম ইত্যাদি শস্য দানায় যে পোকা লেগে যাওয়ায় শস্য নষ্ট হয়। অর্থাৎ ওদের শরীর ও কাপড়ে আঁটুলি ও উকুন ধরে গেল, অথবা শস্যদানায় ঘুন লাগল।

৪. অর্থাৎ অল্প অল্প বিরতি দিয়ে এসব শাস্তি দেওয়া হল, কিন্তু ওরা এমনই অহংকারী, পাপে অভ্যস্ত ও কট্টর অপরাধী ছিল যে, কোন অবস্থাতেই আনুগত্য গ্রহণ করল না।

হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত আছে– ফেরাওন মূসা (আ.)-এর দাবি না মানলে আল্লাহ তাআলা বৃষ্টির বিপদ পাঠালেন, যার কারণে ফসল ইত্যাদি ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হল। পরিশেষে ঘাবড়ে গিয়ে হযরত মূসার নিকট দরখাস্ত করল, তুমি তোমার আল্লাহকে বলে এ বিপদ দূর করে দিলে আমরা বনী ইসরাঈলকে তোমার সঙ্গে যেতে দেব। মূসা আলাইহিস সালামের দো'য়ায় বৃষ্টি বন্ধ হল এবং ক্ষতির পরিবর্তে উৎপাদন অনেক বেশি হল।

কিন্তু ফেরাওনের অনুসারীরা আযাব থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে এবারও স্বীয় অঙ্গীকারের উপর কায়েম থাকল না। তখন আল্লাহ তাআলা তৈরী ফসলের উপর পঙ্গপাল পাঠিয়ে দিলেন, যা দেখে ওরা পুনরায় ঘাবড়ে গেল যে, এ নতুন আপদ কোথা থেকে এসে পড়ল? আবার ওরা মূসা আলাইহিস সালামের নিকট দো'য়ার দরখাস্ত করল এবং পাক্কা অঙ্গীকার করল, এ আযাব চলে গেলে আমরা অবশ্যই বনী ইসরাঈলকে স্বাধীন করে দেব। যখন এই আযাবও তুলে নেওয়া হল, তখন ওরা পুনরায় নিশ্চিন্ত হয়ে গেল এবং সব ওয়াদা ভুলে গেল।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿۱۳۴﴾

১৩৪. আর যখন ওদের উপর কোন আযাব পতিত হত, তখন ওরা বলত, 'হে মূসা! আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট দো'য়া করুন, যেরূপ আপনার রব আপনাকে শিখিয়েছেন[১]। আপনি যদি আমাদের থেকে এই আযাব দূর করে দেন, তবে অবশ্যই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব এবং আপনার সঙ্গে বনী ইসরাঈলকে যেতে দেব'।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿۱۳۵﴾

১৩৫. অতঃপর যখন আমি ওদের উপর থেকে আযাব তুলে নিতাম এক নির্দিষ্টকালের জন্য, যে পর্যন্ত ওদের পৌছা অবধারিত ছিল[২]– তখনই ওরা অঙ্গীকার ভেঙ্গে ফেলত।

তারপর যখন ফসল তুলে ঘরবাড়ী ভরল, তখন আল্লাহর হুকুমে শস্যে ঘুন লেগে গেল। আবার ওরা মূসা আলাইহিস সালামের দ্বারা দো'য়া করাল এবং আরো বেশি জোরদার ওয়াদা-অঙ্গীকার করল; কিন্তু ঐ অবস্থার সমাপ্তি হলে, ওরা পূর্বের মতই অবাধ্যতা ও ওয়াদাভঙ্গ করতে শুরু করল। তখন আল্লাহ তাআলা ওদের খাদ্য ও পানীয়কে বিস্বাদ করে দিলেন। ব্যাঙ এত বিপুল পরিমাণে সৃষ্টি করে দিলেন যে, প্রত্যেক খাদ্যে ও পাত্রে ব্যাঙ দেখা যেত, যখন কথা বলতে বা আহার করতে মুখ খুলত, ব্যাঙ লাফ দিয়ে মুখে গিয়ে উঠত। মোটকথা, এ প্রাণীর আধিক্য জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলল। অন্যদিকে পানের উদ্দেশ্যে যে পানি নিত, আল্লাহর হুকুমে তা-ই পাত্রে বা মুখে গিয়ে রক্ত হয়ে যেত। এভাবে ওরা পানাহার পর্যন্ত করতে পারছিল না, এ সত্ত্বেও দম্ভ ও গর্ব পূর্বের মতই ছিল। (তাফসীরে তবারী ১০/৩৮৬-৩৮৭; তাফসীরে ইবনে কাছীর ২/২৫১-২৫২)

১. অর্থাৎ তিনি দো'য়ার যে ফলপ্রসু পন্থা আপনাকে শিখিয়েছেন, সেভাবেই দো'য়া করে দিন। অথবা بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ এর অর্থ এই যে, আল্লাহর নবী হিসাবে দো'য়া করে দিন। অর্থাৎ عَهْد এর প্রয়োগ نبوّت এর উপর করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ ও নবীর মধ্যে এক রকম অঙ্গীকার হয়ে থাকে। তা এই যে, আল্লাহ নবীকে সম্মানিত ও সাহায্য করবেন এবং নবী তাঁর পয়গাম পৌঁছাতে কোন ত্রুটি করবেন না।

আর এরও সম্ভাবনা আছে যে, بما عهد-এর দ্বারা সেই عهد উদ্দেশ্য, যা নবীগণের মাধ্যমে উম্মতিদের সঙ্গে করা হয়ে থাকে যে, যদি তোমরা কুফর ও অবিশ্বাস থেকে ফিরে আস এবং ঈমান আন, তবে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাবে। والله أعلم

২. এই 'নির্দিষ্টকাল' দ্বারা হয় পানিতে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করার সময় উদ্দেশ্য। অথবা এমনও হতে পারে যে, এক বিপদের পর দ্বিতীয় বিপদ আসা পর্যন্ত সময় উদ্দেশ্য।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ۝

১৩৬. ফলে আমি ওদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং (অবশেষে) ওদের সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম, কেননা ওরা আমার আয়াতগুলি অস্বীকার করেছিল এবং তা থেকে গাফেল ছিল[১]।

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ

১৩৭. আর যে লোকদের দুর্বল মনে করা হত[২], আমি তাদের সেই যমীনের পূর্ব-পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করে দিলাম যে যমীনে আমি বরকত রেখেছি[৩]। এবং বনী ইসরাঈলের

---

১. (كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ) –কোন কোন মুফাসসিরের মতে رجز দ্বারা طاعون (মহামারী) উদ্দেশ্য। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসির এ আয়াতগুলিকে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহেরই ব্যাখ্যা মনে করেন।

'মূযেহুল কুরআন'-এ আছে, 'এসব বিপদ এক এক সপ্তাহের ব্যবধানে ওদের উপর পতিত হল। প্রথমেই হযরত মূসা ফেরাওনকে সতর্ক করে দিতেন যে, আল্লাহ তোমাদের উপর অমুক বিপদ পাঠাবেন। সেই বিপদই আসত। তখন অস্থির হয়ে ওরা হযরত মূসাকে তোষামোদ করত। তাঁর দো'য়ায় তা দূর হত। অতঃপর আবার অমান্যকারী হয়ে যেত। অবশেষে মহামারী দেখা দিল, অর্ধেক রাতে সারা শহরে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রথম ছেলে মরে গেল। ওরা যখন এই শোকে মুহ্যমান, তখন হযরত মূসা স্বজাতিকে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে গেলেন। অতঃপর কয়েক দিন পরে ফেরাওন পিছু ধাওয়া করল এবং লোহিত সাগরের পাড়ে পৌঁছে গেল। বনী ইসরাঈল নিরাপদে সাগর পার হয়ে গেল আর ফেরাওন সমস্ত সৈন্যসহ ডুবে মরল।

২. অর্থাৎ বনী ইসরাঈল।

৩. অধিকাংশ মুফাসসিরের নিকট এই যমীন দ্বারা উদ্দেশ্য শামদেশ, যার মধ্যে আল্লাহ তাআলা বহু জাহেরী ও বাতেনী বরকত নিহিত রেখেছেন। জাহেরী বরকত এই যে, তা অত্যন্ত সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা ও মনোমুগ্ধকর দেশ। আর বাতেনী বরকত এই যে, এ দেশকে বহুসংখ্যক নবীগণের বাসস্থান ও সমাধিস্থল বানানো হয়েছে। বনী ইসরাঈল মিসর থেকে বের হয়ে একটা সময় পর্যন্ত 'তীহ' ময়দানে পেরেশান অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়– যেমন, পূর্বে এর আলোচনা হয়েছে। অতঃপর হযরত ইউশার সঙ্গে মিলে 'আমালেকা' (জাতির) বিরুদ্ধে জেহাদ করে এবং নিজেদের পৈত্রিক ভূমি শামদেশের উত্তরাধিকারী হয়।

কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ যমীন দ্বারা মিসর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ফেরাওনের অনুসারীদের ডুবিয়ে মেরে আমি বনী ইসরাঈলকে মিসরের ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী করলাম, যাতে স্বাধীনভাবে তা ভোগ করতে পারে। যেমনঃ আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

إِسْرَآءِيلَ ۚ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾

ক্ষেত্রে আপনার রবের শুভ ওয়াদা পূর্ণ হয়ে গেল– তাদের ধৈর্য ধারণের ফলে। আর ফেরাওন ও তার সম্প্রদায় যা-কিছু নির্মাণ করেছিল এবং যে সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ তৈরি করেছিল, আমি সব ধ্বংস করে দিলাম[১]।

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ - وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ - وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ - كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ

(ওরা রেখে গিয়েছিল অনেক উদ্যান ও ঝরনা, ক্ষেত-খামার ও উত্তম ঘর-বাড়ি এবং আরাম-আয়েশের অনেক উপকরণ, যার মধ্যে ওরা খোশগল্পে মেতে থাকত। এমনই হয়েছিল। আর আমি সেসব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম অন্য এক সম্প্রদায়কে। –সূরা দুখান, আয়াত ২৫-২৮)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ - وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ .

(আর আমি চাচ্ছি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, যাদের দেশের মধ্যে দুর্বল করে রাখা হয়েছে এবং তাদের নেতা বানিয়ে দিতে ও তাদের উত্তরাধিকারী করে দিতে এবং দেশের মধ্যে তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে, আর ফেরাওন, হামান ও ওদের (উভয়ের)-বাহিনীকে তাদের হাতে ঐ জিনিস দেখিয়ে দিতে যার আশঙ্কা ওরা করত। –সূরা কাছাছ, আয়াত ৫-৬)

এ তাফসীর অনুযায়ী এস্থলে 'মিসর' উদ্দেশ্য। আর মিসরের জাহেরী বরকতসমূহ তো সুস্পষ্ট। আর বাতেনী বরকত এই যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সেখানেই সমাধিস্থ হন। হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালাম সেখানে তশরীফ নিয়ে যান এবং সর্বশেষে মূসা আলাইহিস সালাম শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত দীর্ঘকাল সে দেশেই অতিবাহিত করেন।

ইমাম বাগাবী (র) মুফাসসিরদের উভয় উক্তির সমন্বয় করে মিসর ও শাম দুই দেশকেই উদ্দেশ্য করেছেন।

১. অর্থাৎ বনী ইসরাঈল যখন ফেরাওনের অনুসারীদের অত্যধিক নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করল, মূসা আলাইহিস সালামের হেদায়েত অনুসারে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল এবং আল্লাহর পয়গম্বরের সহযোগী হল– তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সঙ্গে যে নেক ওয়াদা করেছিলেন- عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ (শীঘ্রই তোমাদের রব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন।) এবং – نُرِيْدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا الخ (আর আমি চাচ্ছি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, যাদের দেশের মধ্যে দুর্বল করে রাখা হয়েছে...)— তা পূর্ণ করে

১৩৮. আর আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম। তার পর তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে পৌছল, যারা নিজেদের মূর্তিসমূহের (পূজায়) মগ্ন থাকত*[১]। (তখন) বনী ইসরাঈল বলতে লাগল, 'হে মূসা! আমাদের জন্যও একটি মূর্তি বানিয়ে দিন, যেমন তাদের মূর্তি আছে।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয় তোমরা মূর্খ লোক'[২]!

وَجٰوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿۱۳۸﴾

১৩৯. 'এরা যার মধ্যে লিপ্ত, নিশ্চয় তা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এরা যা করছে, তা ভ্রান্ত[৩]।'

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۹﴾

দেখালেন। ফেরাওন ও ওর জাতি স্বীয় গৌরব ও অহমিকা প্রকাশার্থে যা কিছু রং ঢং বানিয়ে রেখেছিল, তা সব ধ্বংস হয়ে গেল। আর ওদের উঁচু-উঁচু প্রাসাদগুলি বিধ্বস্ত করে দেওয়া হল।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'মূর্তিসমূহের কাছে স্থির বসে থাকত'।

১. কেউ কেউ বলেছেন, এরা 'লুখাম' গোত্রের লোক ছিল। কেউ কেউ বলেন, এরা ছিল কেনআনী 'আমালেকা' গোত্রের।

কথিত আছে, ওদের মূর্তিগুলো ছিল গাভীর আকৃতির। والله أعلم

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মহিমান্বিত মর্যাদা ও পাক-পবিত্রতা সম্পর্কে তোমাদের একেবারে জাহেল মনে হয়।

আসল কথা এই যে, দীর্ঘকাল মিসরীয় মূর্তিপূজকদের সংস্পর্শে থাকার ফলে বনী ইসরাঈলের মন-মানসিকতা বারবার এ ধরনের ক্রিয়াকাণ্ড ও শিরেকী রীতি-নীতির প্রতি আকৃষ্ট হত। এ অজ্ঞতাপূর্ণ দরখাস্তও মিসরের আবহাওয়া ও সেখানকার মূর্তিপূজকদের সংস্পর্শের প্রভাবই প্রকাশ করে।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, জাহেল মানুষ সামনে আকৃতি ছাড়া শুধু নিরাকার মা'বূদের উপাসনা করে শান্তি পায় না। গাভীর প্রতিকৃতির পূজা দেখে এদেরও সাধ জাগল। অবশেষে ওরা সোনা দিয়ে বাছুর বানিয়ে পূজা করল।

৩. অর্থাৎ এদের মূর্তিপূজার ধর্ম ভবিষ্যতে আমার ও সত্যপন্থীদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এরা এখন পর্যন্ত যেসব রং-তামাশা করে আসছে, সেসব নিতান্তই বাতিল, ভ্রান্ত, অসার ও ভিত্তিহীন।

قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

১৪০. তিনি (আরও) বললেন, 'আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ অন্বেষণ করব, অথচ তিনিই তোমাদের সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন[১]?

وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ

১৪১. (স্মরণ কর), যখন আমি তোমাদের ফেরাওনের লোকদের থেকে নাজাত দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের কঠোর শাস্তি দিত– তোমাদের পুত্রসন্তানদের হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদের জীবিত রাখত। আর এতে (অর্থাৎ নাজাত দানে) ছিল তোমাদের রবের বিরাট অনুগ্রহ*[২]।

[রুকূ - ১৭]

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ

১৪২. আর আমি মূসার সঙ্গে ত্রিশ রাতের ওয়াদা করেছিলাম এবং আরো দশ রাতের দ্বারা তা পূর্ণ করেছিলাম। এভাবে আপনার রবের মেয়াদ চল্লিশ রাতে পূর্ণ হল[৩]। আর মূসা

---

১. অর্থাৎ আল্লাহর মহান নে'য়ামতরাশির কৃতজ্ঞতা ও শোকরের দাবি কি এই যে, গাইরুল্লাহর পূজা করে আল্লাহর বিরোধিতা করা হবে? তদুপরি অত্যন্ত লজ্জার কথা এই যে, যে সৃষ্টিকে আল্লাহ তাআলা সমগ্র জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, সে নিজ হাতে গড়া মূর্তির সম্মুখে মাথা নত করবে? নিকৃষ্ট কখনো উৎকৃষ্ট সৃষ্টির উপাস্য হতে পারে কি?

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'এতে (অর্থাৎ ফেরাওনওয়ালাদের জুলুম-নির্যাতনে) ছিল তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মহাপরীক্ষা'।

২. এর তাফসীরের জন্য সূরা বাকারা : আয়াত ৪৯ দ্রষ্টব্য। এখানে বলা উদ্দেশ্যে যে– যে আল্লাহ তোমাদের উপর ইতিপূর্বে এ রকম বিরাট অনুগ্রহ করলেন, তাঁকে ছেড়ে কি তোমরা কাঠ ও পাথরের সামনে নত হতে চাচ্ছ?

৩. বনী ইসরাঈল নানাবিধ পেরেশানী থেকে নিরাপদ হওয়ার পর মূসা আলাইহিস সালামকে অনুরোধ করে বলল, এখন আমাদের জন্য কোন আসমানী শরী'য়ত আনুন, যে মত আমরা স্থিরচিত্তে আমল করতে পারব। মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে তাদের আবেদন

وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ

তাঁর ভাই হারূনকে বললেন, 'তুমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, (তাদের) সংশোধন করতে থাকবে এবং ফাসাদকারীদের পথের অনুসরণ করবে না[১]।'

পেশ করলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সঙ্গে কমপক্ষে ত্রিশ দিন এবং বেশির পক্ষে চল্লিশ দিনের ওয়াদা করলেন যে, তুমি এই পরিমাণ সময় একাধারে রোযা রাখলে এবং তূর পাহাড়ে এতেকাফ অবস্থায় থাকলে তোমাকে তাওরাত শরীফ দান করা হবে।

দুটি মেয়াদের রহস্য ও তাৎপর্য

দুটি মেয়াদ [৩০ দিন ও ৪০ দিন] নির্ধারণ করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই ছিল যে, যদি রিয়াযত-মুজাহাদা কালে ওজীফাসমূহ আদায়ে ও ইবাদত পালনে কোন প্রকার ত্রুটি না হয়, তবে কম মেয়াদ ত্রিশ দিনই যথেষ্ট হবে; নতুবা উভয় মেয়াদের মধ্যে চল্লিশ দিনেরটি পূর্ণ করতে হবে। অথবা এমনও হতে পারে যে, ত্রিশ দিন জরুরী ও অপরিহার্য মেয়াদ হিসাবে, আর চল্লিশ দিন আসল মেয়াদের পূর্ণতা ও পরিশিষ্ট হিসাবে ইচ্ছাধীন ও মুস্তাহাবরূপে ধার্য হয়েছিল। যেমন: শু'আয়ব আলাইহিস সালাম মূসা আলাইহিস সালামের নিকট মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সময় বলেছিলেন- عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ('আমি তোমার নিকট তাকে বিয়ে দিতে চাই এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে। আর যদি দশ বছর পূর্ণ কর, তবে তা হবে তোমার পক্ষ থেকে। আর আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না।' –কাসাস, আয়াত ২৭)]

আর আমাদের কালের কোন কোন লেখক বলেছেন, আসলে মেয়াদ চল্লিশ দিনেরই ছিল, যেমন সূরা বাকারায় (আয়াত ৫১) উল্লেখ করা হয়েছে। আর এখানেও فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖ এর মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে চল্লিশ দিনের বর্ণনা এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ আমি ত্রিশ দিনের ওয়াদা করেছিলাম, যার পরিশিষ্ট ছিল আরো দশ দিন।— এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, একটি সম্পূর্ণ মাস (জিল্‌কদ) পূর্ণ করে দ্বিতীয় মাস (জিলহজ) থেকে আরো দশ দিন বাড়ানো হয়েছে। এভাবে অধিকাংশ সালাফের মতে ১ম জিল্‌কদ থেকে শুরু করে ১০ম জিলহজে গিয়ে চিল্লা পূর্ণ হয়।

মূজেহুল কুরআনে আছে– আল্লাহ মূসার সঙ্গে ওয়াদা করলেন, পাহাড়ে ৩০ রাত কাটালে তোমার জাতিকে তাওরাত দেওয়া হবে। এই মেয়াদে তিনি একদিন মিসওয়াক করেন। ফলে তাঁর মুখের যে ঘ্রাণে ফেরেশতাদের আনন্দ হচ্ছিল তা চলে যায়। এর বদলে আরো দশ রাত বাড়ানো হল।

১. অর্থাৎ আমার অনুপস্থিতিতে আমার অংশের কাজ তুমিই করবে। এক কথায় যেসব এখতিয়ার ও দায়িত্ব মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, তা হারূন আলাইহিস সালামকে অর্পণ করলেন। আর যেহেতু বনী ইসরাঈলের অস্থিরচিত্ততা ও বিশ্বাসের দুর্বলতা

১৪৩. আর যখন মূসা আমার নির্ধারণকৃত সময়ে উপনীত হলেন এবং তাঁর রব তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখব[১]।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে মোটেই দেখতে পাবে না[২]।

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ

সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল, সে জন্য অত্যন্ত তাকীদের সাথে হারূন আলাইহিস সালামকে সতর্ক করে দিলেন যে, আমার অনুপস্থিতিতে এরা যদি কোন বিশৃঙ্খলা করে, তবে তুমি সংশোধন করবে এবং আমার কর্মপন্থা অনুসারে কাজ করবে, বিপর্যয়কারীদের পথ অনুসরণ করবে না।

আল্লাহর ইচ্ছা, এই ওসিয়ত করে মূসা আলাইহিস সালাম তূর পর্বতে গেলেন। এদিকে বনী ইসরাঈল বাছুরপূজা শুরু করে দিল। কিন্তু হযরত হারূন আলাইহিস সালাম يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِي وَأَطِيْعُوْا أَمْرِي {হে আমার কওম! তোমরা এই বাছুর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছ, তোমাদের রব তো দয়াময় (আল্লাহ)। অতএব তোমরা আমার পথে চল এবং আমার কথা মান্য কর।'}— বলে বলে ওদের কর্ম-কাণ্ডের প্রতি নিজের অসন্তুষ্টি সাফ সাফ ঘোষণা করলেন এবং মূসা (আ)এর ওসিয়ত অনুসারে অবস্থা সংশোধনের সম্ভাব্য চেষ্টা করেন।

১. চল্লিশ দিনের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামকে কোন বিশেষ পদ্ধতিতে নিজের সাথে কথোপকথনের সৌভাগ্য দান করলেন। তখন হযরত মূসা (আ) সরাসরি আল্লাহর কালাম শোনার অনন্ত স্বাদ উপভোগ করায় পরম উৎসাহে বক্তার দীদারের কামনা করতে লাগলেন এবং স্বতস্ফূর্তভাবে প্রার্থনা করে বসলেন— رَبِّ أَرِنِيْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ আয় প্রতিপালক! আমার ও আপনার মাঝের পর্দা ও বাধাসমূহ অপসারিত করুন এবং (আপনার) অনন্ত নূরের চেহারা আমার সামনে উন্মুক্ত করে দিন, যাতে আমি এক নজর আপনাকে দেখতে পারি।

২. অর্থাৎ দুনিয়াতে কোন সৃষ্টজীব তার নশ্বর শক্তিসমূহের দ্বারা মহামহিম, অনাদি ও অবিনশ্বর আল্লাহর দীদার লাভে সক্ষম হবে না।

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, দুনিয়াতে মৃত্যুর পূর্বে কারো পক্ষে আল্লাহর দীদার লাভ হবে না, যদিও যুক্তি-বুদ্ধির দিক থেকে তা সম্ভব। বিবেক-বুদ্ধির আলোকে সম্ভব বলেই মূসা (আ.) তার জন্য দরখাস্ত করেছেন। আদতেই অসম্ভব হলে তিনি তার দরখাস্ত করতেন না।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মাযহাব এটাই যে, দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার দীদার জ্ঞানগতভাবে সম্ভব, তবে শরীয়তের 'নুসূস'-এর দ্বারা আমরা জানতে পেরেছি যে, তা এই দুনিয়াতে কখনই ঘটবে না। আর আখেরাতে যে দীদার ঘটবে, তা তো কুরআন-হাদীস

فَاِنِ اسۡتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوۡفَ تَرٰىنِیۡ فَلَمَّا تَجَلّٰی رَبُّهٗ لِلۡجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوۡسٰی صَعِقًا ۚ فَلَمَّاۤ اَفَاقَ قَالَ

তুমি বরং পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাক, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে, তবে তুমি আমাকে দেখতে পাবে[১]।' অতঃপর যখন তাঁর রব পাহাড়ে তাজাল্লী ফরমালেন, তখন তা (তাজাল্লী) পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল এবং মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন[২]। অতঃপর তিনি যখন হুঁশে

দ্বারা প্রমাণিত। বাকী শবে মেরাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে দীদার লাভ হয়েছে কি না, তা মতভেদপূর্ণ বিষয়। সূরা নাজমে ইনশাআল্লাহ এর আলোচনা আসবে।

১. অর্থাৎ তুমি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাক, আমি আমার বরকতময় সৌন্দর্যের (جمال) একটুখানি ঝলক তার উপর ফেলছি। যদি পাহাড়ের মত কঠিন ও শক্ত বস্তু তা সইতে পারে, তাহলে তোমারও তা সইয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা আছে। নতুবা বুঝতে হবে যে, পাহাড়ের পক্ষে যে জিনিসের গুরুভার বহন করা সম্ভব হল না, মানুষের নগণ্য দৈহিক চোখ কী করে তা সইতে পারে?

আধ্যাত্মিক শক্তিতে মানুষ শ্রেষ্ঠ হলেও জড়শক্তিতে সে দুর্বল

এ কথা ঠিক যে, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির দিক দিয়ে মানুষ আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড় ইত্যাদি সব কিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এ জন্যই মূসা আলাইহিস সালাম যে আসমানী ওহীর বাহক ছিলেন, বরং অন্যান্য মানুষও যে মহাআমানতের বাহক, তার গুরুভার পাহাড় ইত্যাদিও বহন করতে সমর্থ নয়। সূরা আহযাবের ৭২নং আয়াতে আছে- فَاَبَيۡنَ اَنۡ يَّحۡمِلۡنَهَا وَاَشۡفَقۡنَ منها وحملها الإنسان (আমি এই আমানত আসমান, যমীন ও পর্বতমালার সামনে পেশ করেছিলাম, তখন তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হল। আর মানুষ তা বহন করে নিল)— এবং সূরা হাশরের ২১নং আয়াতে রয়েছে- لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله (আমি যদি এই কুরআন কোন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে আপনি দেখতেন যে, আল্লাহর ভয়ে সেটি বিনীত, বিদীর্ণ হয়ে গেছে।)— কিন্তু যে জিনিসের সম্পর্ক বাহ্যিক চোখ বা দেহের জড়শক্তির সাথে, তাতে মানুষ অপরাপর বিরাট দেহবিশিষ্ট বস্তুর চেয়ে খুবই দুর্বল। সূরা মুমিনের ৫৭নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- لخلق السموت والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون (নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করার চেয়ে কঠিন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না।) এবং সূরা নিসার ২৮নং আয়াতে বলা হয়েছে- وخلق الإنسان ضعيفا (মানুষকে দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে।)

এস্থলে মূলত মানব সত্তার এই দুর্বলতার প্রতিই মূসা আলাইহিস সালামের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

২. আল্লাহ তাআলার তাজাল্লী অনেক রকমের। কোন্ বস্তুর উপর কীভাবে তাজাল্লী ফরমাবেন, তা তাঁরই ইচ্ছাধীন। পাহাড়ের উপর যে তাজাল্লী হল, তা তৎক্ষণাৎ পাহাড়ের এক অংশকে

আসলেন, বললেন, 'আপনি পবিত্র, আমি আপনার কাছে তওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী'[১]।

سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ۝

১৪৪. আল্লাহ বললেন, 'হে মূসা! আমি আমার রিসালাত ও আমার সঙ্গে কথা বলার দ্বারা তোমাকে সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি*। সুতরাং আমি তোমাকে যা দিয়েছি তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও (অর্থাৎ শোকর কর)'[২]।

قَالَ يٰمُوْسٰى اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِيْ وَبِكَلَامِيْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ۝

১৪৫. আর আমি তার জন্য ফলকগুলিতে লিখে দিলাম সব রকমের উপদেশ ও প্রত্যেক

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল এবং মূসা আলাইহিস সালাম তাজাল্লীস্থলের নিকটবর্তী হওয়ায় এবং পাহাড়ের ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখার প্রভাবে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন।

সংগতিপূর্ণ না হলেও কিঞ্চিত ধারণা লাভের জন্য এ উদাহরণ সামনে রাখা যেতে পারে যে, যে বস্তুর উপর বজ্রপাত হয়, মুহূর্তের মধ্যে তাকে জ্বালিয়ে ভষ্ম করে দেয় এবং যারা সেই স্থানের কাছে থাকে, তাদেরও অনেক সময় কমবেশি আঘাত লেগে থাকে।

১. سبحانك – অর্থাৎ আপনি কোনো সৃষ্টির সদৃশ হবেন এবং এ নশ্বর চোখ আপনার দীদার সহ্য করতে পারবে– এ থেকে আপনি পবিত্র। আর আপনার পবিত্রতা ও মহিমার দাবি এই যে, আপনার অনুমতি ছাড়া আপনার কাছে কোন জিনিসের আবদার করা হবে না। আমি আগ্রহের আতিশয্যে অনুমতি ছাড়াই একটি অন্যায় আবদার করে ফেলেছি বলে তওবা করছি। আমি বর্তমান কালের সকল মানুষের আগে আপনার মহিমা ও মর্যাদায় বিশ্বাস রাখি এবং আমি সেই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে যে, দুনিয়াতে এ চর্মচোখে মহামহিম আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ হতে পারে না।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আমি তোমাকে আমার বার্তাসমূহ ও আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য সকল মানুষের মোকাবেলায় নির্বাচন করেছি'।

২. অর্থাৎ দীদার হতে পারল না, তাতে কী? এ সৌভাগ্য ও স্বাতন্ত্র্য কি কম যে, আমি তোমাকে পয়গম্বর বানিয়েছি ও তাওরাত প্রদান করেছি এবং সরাসরি (তোমার সাথে) কালাম করেছি? অতএব আমার তরফ থেকে যা কিছু অনুগ্রহ হল, তা-ই আঁকড়ে ধর এবং সেই বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত থাক, যাদের আল্লাহ شاكرين (কৃতজ্ঞগণ) উপাধি দ্বারা ভূষিত করেছেন।

مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ

বিষয়ের বিশদ বিবরণ[১]। অতএব এগুলি দৃঢ়ভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে আদেশ কর, তারা যেন উত্তম বিষয়গুলি গ্রহণ করে। শীঘ্রই আমি তোমাদের দেখাব নাফরমানদের নিবাস[২]।

سَأَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا وَإِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ

১৪৬. নিশ্চয় আমি আমার আয়াতসমূহ থেকে তাদের বিমুখ করে দেব, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায়। ওরা যদি সকল নিদর্শনও দেখে নেয়, তবু

---

১. কেউ কেউ বলেন, এ কাষ্ঠফলকগুলির উপরই তাওরাত শরীফ লিখিত ছিল। আর কোন কোন আলেমের ধারণা এই যে, ফলকগুলি তাওরাত থেকে ভিন্ন ছিল, যেগুলি তাওরাত অবতরণের পূর্বে দান করা হয়েছিল।

যা হোক, দীদার সম্ভব না হওয়ায় মূসা আলাইহিস সালামের যে মনোকষ্ট হয়েছিল, তা উপশম করতে এবং দীদারের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিতির ক্ষতিপূরণ হিসাবে ألواح দান করা হল। এগুলির মধ্যে হর রকম নসীহত এবং সমস্ত জরুরী বিধানের বিস্তারিত আলোচনা ছিল। (ইবনে কাছীর)

২. অর্থাৎ নিজেও এই ফলকগুলিকে দৃঢ়তা ও সতর্কতার সাথে ধরে রাখ, যেন হাত থেকে ছুটে না যায়। আর নিজের কওমকে বোঝাও, তারাও যেন এ ফলকগুলির উত্তম হেদায়েতসমূহ অনুযায়ী দৃঢ়ভাবে আমল করতে থাকে এবং এমন ভাল জিনিস হাতছাড়া না করে।

বি. দ্র. احسنها শব্দ দ্বারা এ কথা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, ফলকগুলির মধ্যে যা কিছু আছে সবই উত্তম। তাতে উত্তম ছাড়া অন্য কিছু নেই। অথবা অর্থ এই যে, তাতে প্রদত্ত আহকাম নিজ নিজ স্থানে সবই ভাল, তবে কতক কতক থেকে উত্তম হয়ে থাকে। যেমন, জালেম থেকে প্রতিশোধ নেওয়া জায়েয ও ভাল, কিন্তু সবর করা ও মাফ করে দেওয়া বেশি ভাল ও উত্তম। তো, أحسنها বলে বনী ইসরাঈলকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করা উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা যেন আযীমত (অর্থাৎ সর্বোচ্চ মানের কাজকর্ম) ও মুস্তাহাবগুলিতে সচেষ্ট হয় এবং আল্লাহর কামেল আজ্ঞাবহ বান্দা হয়।

(তা না করে) নাফরমানী করলে তাদেরকে নাফরমানদের আবাস দেখিয়ে দেওয়া হবে– অর্থাৎ আখেরাতে দোযখ ও দুনিয়াতে ধ্বংস ও লাঞ্ছনা। –(ইবনে কাছীর, বাগাবী)। –আর কেউ কেউ 'নাফরমানদের নিবাস' দ্বারা শাম ও মিসর অর্থ নিয়েছেন। এগুলি যথাক্রমে আমালেকা ও ফেরাওনীদের দেশ ছিল। এ অর্থে আয়াতটি বনী ইসরাঈলের জন্য সুসংবাদস্বরূপ হবে যে, তোমরা পূর্ণরূপে আনুগত্য করলে অবাধ্যদের দেশ তোমাদের দিয়ে দেওয়া হবে।

الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ۝

সেগুলির প্রতি ঈমান আনবে না। আর যদি হেদায়েতের পথ দেখে, তবু তাকে পথ বানাবে না। কিন্তু যদি গোমরাহীর পথ দেখে, তবে তাকে (নিজেদের) পথ বানাবে। এটা এজন্য যে, ওরা আমার আয়াতগুলি অস্বীকার করেছে এবং ওরা ছিল তা থেকে গাফেল[১]।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۗ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۝

১৪৭. যারা আমার আয়াতসমূহ ও আখেরাতের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে, তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। তাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে যা তারা করত[২]।

[রুকূ - ১৮]

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ۗ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ

১৪৮. মূসার সম্প্রদায় তাঁর (চলে যাওয়ার) পরে নিজেদের অলংকার দ্বারা তৈরি করল বাছুর[৩]– একটা দেহ, যার মধ্যে ছিল গরুর আওয়াজ (অর্থাৎ 'হাম্বা' রব)। ওরা কি দেখল না যে, তা ওদের সাথে কথাও বলে না এবং ওদের

---

১. যারা আল্লাহ ও পয়গম্বরদের মোকাবেলায় অন্যায় গর্ব করে এবং অহমিকা ওদেরকে আল্লাহর আহকাম কবূল করতে দেয় না, আমিও ওদের অন্তরকে আমার আয়াতগুলির দিক থেকে ফিরিয়ে দেব। ফলে ভবিষ্যতে এগুলির দ্বারা ওরা উপকৃত হতে পারবে না। এমন লোকদের অবস্থা এ-ই হয় যে, ওরা যতই নিদর্শন দেখুক এবং যতই আয়াত শুনুক, ওরা কিছুতেই টলে না। হেদায়াতের রাস্তা যতই পরিষ্কার ও প্রশস্ত হোক, তার উপর ওরা চলে না। হাঁ, নফসের অনুসরণে গোমরাহীর পথে দ্রুত অগ্রসর হয়।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধান অনুসরণের তাওফীক ওদের হবে না। আর যা কিছু কাজকর্ম নিজেদের বুদ্ধিতে করবে, সেগুলো আল্লাহর কাছে কবূল হবে না। যেমন করবে, তেমন প্রতিফলই ভোগ করবে। আর ওদের নিষ্প্রাণ ও মৃত নেক কাজের প্রতিফল যা পাওয়ার, তা দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে।

৩. যে অলঙ্কার গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে ওরা বাছুর বানাল, আসলে তা ছিল ফেরাওনের জাতি কিবৃতীদের। ওদের কাছ থেকে বনী ইসরাঈলের কব্জায় আসে। যেমন সূরা তা-হা (আয়াত ৮৭) তে আছে- حملنا أوزارًا من زينة القوم

سَبِيۡلًا ۘ اِتَّخَذُوۡهُ وَكَانُوۡا ظٰلِمِيۡنَ۝

পথও দেখায় না? ওরা তাকে (উপাস্য) বানিয়ে নিল, আর ওরা ছিল জালেম[১]।

وَلَمَّا سُقِطَ فِيۡۤ اَيۡدِيۡهِمۡ وَرَاَوۡا اَنَّهُمۡ قَدۡ ضَلُّوۡا ۙ قَالُوۡا لَئِنۡ لَّمۡ يَرۡحَمۡنَا رَبُّنَا وَيَغۡفِرۡ لَنَا لَنَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡخٰسِرِيۡنَ۝

১৪৯. অতঃপর যখন ওরা লজ্জিত-অনুতপ্ত হল এবং উপলব্ধি করল যে, ওরা নিশ্চয়ই গোমরাহ হয়ে গেছে, তখন বলতে লাগল, 'আমাদের রব যদি আমাদের দয়া না করেন এবং আমাদের ক্ষমা না করেন, তবে নিশ্চয় আমরা চরম ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব'[২]।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوۡسٰۤى اِلٰى قَوۡمِهٖ غَضۡبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئۡسَمَا خَلَفۡتُمُوۡنِيۡ مِنۡۢ

১৫০. আর মূসা যখন ভীষণ রাগান্বিত হয়ে আফসোস করতে করতে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসলেন[৩], তখন তিনি বললেন,

---

১. সূরা 'তা-হা'তে এ বাছুরের বিস্তারিত বর্ণনা আসবে।

এখানে ওদের বোকামী ও মূর্খতা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে, একটি স্বনির্মিত প্রতিমা থেকে গাভীর আওয়াজ শুনে ওরা মোহিত হয়ে গেল এবং বাছুরকে খোদা মনে করে বসল! অথচ তার অর্থহীন আওয়াজে না ছিল কোন কথা ও সম্বোধন, না হচ্ছিল তার দ্বারা দীনী বা পার্থিব পথপ্রদর্শন। এ ধরনের শব্দমাত্র কোন জিনিসকে মহাস্রষ্টার মর্যাদায় আসীন করবে দূরের কথা, তা মানব-প্রকৃতির স্তর পর্যন্তও পৌঁছাতে পারে না। এক মামুলি জন্তুর আকৃতিকে আল্লাহ বলা কত বড় অন্যায় ও অসংগত কথা!!

আসল কথা কী, এমন অসংগত কথাবার্তা বলার অভ্যাস পূর্ব থেকেই এ জাতির ছিল। যেমন, ইতিপূর্বে এরা মূসা আলাইহিস সালামের নিকট দরখাস্ত করেছিল। اجعل لنا إلها كما لهم آلهة (আমাদের জন্যও একটি মূর্তি বানিয়ে দিন, যেমন তাদের মূর্তি আছে।)

২. নিজেদের দুর্বুদ্ধি ও অন্তরের বক্রতার কারণে ওরা এমন কুৎসিত কাজ করেছিল যে, মূসা আলাইহিস সালামের সতর্কীকরণের পর যখন বুদ্ধি ও হুঁশ কিছুটা ফিরে এল, তখন নিজেরাও এহেন আচরণের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হল। এবং ভয় ও আতঙ্কের কারণে দারুণভাবে ঘাবড়ে গেল। ঘাবড়ে গিয়ে ওরা বলতে লাগল, 'এখন কী উপায়! যদি আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি দয়া করে তওবা ও মাগফেরাতের কোন উপায় বের না করে দেন, তবে আমরা নিশ্চয় সীমাহীন ক্ষতি ও চিরস্থায়ী ধ্বংসে পতিত হব।'

৩. আল্লাহ তাআলা তাঁকে তূর পাহাড়ে থাকতেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, সামেরী তোমার কওমকে গোমরাহ করে ফেলেছে। এ কথা শুনে মূসা আলাইহিস সালাম অত্যন্ত মর্মাহত ও রাগান্বিত হলেন।

بَعۡدِیۡ ۚ اَعَجِلۡتُمۡ اَمۡرَ رَبِّكُمۡ ۚ وَاَلۡقَی الۡاَلۡوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاۡسِ اَخِیۡهِ یَجُرُّهٗۤ اِلَیۡهِ ؕ قَالَ ابۡنَ اُمَّ اِنَّ الۡقَوۡمَ

'তোমরা আমার (প্রস্থানের) পরে আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ[১]! তোমরা স্বীয় রবের বিধান আসার পূর্বেই তাড়াহুড়া করলে[২]? আর তিনি ফলকগুলি ফেলে দিলেন এবং নিজের ভাইয়ের মাথা ধরে তাঁকে নিজের দিকে টানতে লাগলেন[৩]। তাঁর ভাই

---

১. এ সম্বোধন বাছুরপূজারীদের প্রতি ছিল, অর্থাৎ 'তোমরা আমার পরে কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ! যে বিষয়ে আমি সব চেয়ে বেশি জোর দিতাম (অর্থাৎ আল্লাহর তাওহীদ ও একত্ববাদ), তার স্থলে তোমরা বাছুরপূজাকে গ্রহণ করলে।

আর এমনও হতে পারে যে, অন্যদের সাথে হারূন আলাইহিস সালামের প্রতিও সম্বোধন করা হয়েছে যে, 'তুমি আমার প্রতিনিধিত্বের হক সঠিকভাবে আদায় করনি, যা আমি তোমাকে সোপর্দ করেছিলাম। তোমার উচিত ছিল— ওদের বাধা প্রদান করা এবং শক্তভাব এ ফেতনার মোকাবেলা করা।'

২. অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের জন্য বিধানই তো আনতে গিয়েছিলাম এবং চল্লিশ দিনের মেয়াদ আল্লাহ তাআলাই নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। তোমরা এই মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার এবং তাঁর বিধান নিয়ে আসারও অপেক্ষা করলে না! একটা দীর্ঘকাল তো আর অতিবাহিত হয়ে যায়নি, যা সওয়া তোমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। أفطال عليكم العهد أم اردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي (তবে কি তোমাদের জন্য মেয়াদটা দীর্ঘ হয়ে গেল, না কি তোমরা চেয়েছ, তোমাদের উপর তোমাদের রবের ক্রোধ পতিত হোক, এ জন্য তোমরা আমার সঙ্গে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে? –ত্বহা, আয়াত ৮৬)

৩. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম উক্ত শিরকী কর্মকাণ্ড দেখে এবং হারূন আলাইহিস সালাম নম্রতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করেছেন- এমন ধারণা করে দীনী ক্রোধ ও গায়রতের জোশে এই পরিমাণ উত্তেজিত হলেন যে, তিনি হারূন আলাইহিস সালামের প্রতি সবেগে ধাবিত হলেন এবং তাঁর দাড়ি ও মাথার চুল ধরে ফেললেন।

মূসা (আ.)-এর এই আচরণের রহস্য

মাআযাল্লাহ, হযরত হারূনকে অপমানিত করা উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ, তিনি নিজে স্বতন্ত্র নবী ও বয়সে হযরত মূসার চেয়ে তিন বছরের বড় ছিলেন। সুতরাং একজন মহান নবীর পক্ষে অন্য নবীর, যিনি তাঁর বড় ভাইও ছিলেন, বিন্দুমাত্র অপমানের ইচ্ছা করা কী করে সম্ভব হতে পারে? না, না; এমন ইচ্ছা আদৌ ছিল না। বরং মূসা আলাইহিস সালামের তরফ থেকে এ আচরণ তখন হয়েছিল, যখন তিনি কওমের জঘন্য কুকর্মের কারণে লিল্লাহ-ফিল্লাহ ক্রোধ ও রাগে আয়ত্তবহির্ভূত হয়ে পড়েছিলেন এবং হযরত হারূন সম্পর্কে ধারণা হচ্ছিল যে, সম্ভবত তিনি অবস্থা সংশোধনের পূর্ণ চেষ্টা করেননি।

হযরত হারূন যদিও নবী ও বয়সে বড় ছিলেন, কিন্তু মর্যাদায় হযরত মূসা (আ) তাঁর চেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন এবং প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে হযরত হারূনকে তাঁর উযীর ও

اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ۝

বললেন, 'হে আমার মায়ের (গর্ভজাত) সন্তান! লোকেরা আমাকে দুর্বল ভেবেছিল এবং আমাকে মেরেই ফেলার উপক্রম করেছিল। অতএব তুমি শত্রুদের আমার উপর হাসার সুযোগ দিয়ো না এবং আমাকে জালেমদের অন্তর্ভুক্ত করো না'[১]।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ اَرْحَمُ

১৫১. মূসা বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের দাখিল করুন আপনার রহমতের মধ্যে। আর

অধীনস্থ বানানো হয়েছিল। এস্থলে মূসা আলাইহিস সালামের প্রশাসনিক মর্যাদার বিকাশ ঘটেছে। তাঁর পক্ষ থেকে যে ধর-পাকড় ও কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, তা হযরত হারূনের ধারণাকৃত ত্রুটির প্রতি এক প্রকার কর্মগত ভর্ৎসনা ছিল, যার দ্বারা কওমকেও পূর্ণ সতর্ক করে দেওয়া হল যে, তাওহীদের বিষয়ে পয়গম্বর সম্পূর্ণ আপোষহীন হয়ে থাকেন এবং শিরক ও কুফরের কারণে তিনি চরম অসন্তুষ্ট হন। এজন্যই তিনি এ ব্যাপারে সামান্য অবহেলা বা মৌনতাকেও সহ্য করতে পারেন না।

যা হোক, মূসা (আ) এ ঘটনায় শরী'য়তসম্মতভাবেই মা'যূর ছিলেন। এদিকে ক্রোধের আতিশয্যে ও ধরপাকড়ের ঝামেলায় পড়ে আল্লাহ প্রদত্ত সেই ফলকগুলি তাঁর হাত থেকে খসে পড়ল– একেই শক্ত ভাষায় إلقاء (ফেলে দেওয়া) শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ, خذها بقوة (তা দৃঢ়ভাবে ধর) এর যে নির্দেশ ছিল, বাহ্যত তা পালন করতে পারেননি।

কোন কোন মুফাসসিরের মতে হারূন (আ)এর প্রতি ধাবিত হওয়ার সময় হাত খালি করার জন্য খুব দ্রুতগতির সাথে ফলকগুলি একদিকে রেখে দিলেন। একেই বলা হয়েছে– وألقى الألواح— কিন্তু যেহেতু হারূন (আ) বা ফলকগুলি সম্পর্কে কৃত আচরণের বাহ্যিক রূপটা পছন্দনীয় ছিল না, সে জন্য ربّ اغفرلي বলে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমার দরখাস্ত করলেন। (والله سبحانه وتعالى أعلم)

১. যদিও হারূন (আ) হযরত মূসার আপন ভাই, কিন্তু মায়ের সম্পর্ক উল্লেখ করে নম্রতা ও মায়া-মমতার দিকে আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল।

এ আয়াতে হযরত হারূনের ওজরের কথা বর্ণিত হয়েছে। সারকথা এই যে, আমি সাধ্য অনুযায়ী ওদের বুঝিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা আমার কথার কোন মূল্যই দেয় নাই, উলটা আমাকে কতল করতে উদ্যত হচ্ছিল। এখন তুমি এমন ব্যবহার করে আমার প্রতি ওদের হাসার সুযোগ দিয়ো না এবং ভর্ৎসনা ও রাগ করতে গিয়ে আমাকে জালেমদের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলো না।

الرَّحِيْمِيْنَ۠

আপনি সর্বাধিক দয়ালু[১]।

[রুকূ - ১৯]

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ۝

১৫২. যারা বাছুরকে (উপাস্য) বানিয়েছে, নিশ্চয় দুনিয়ার জীবনেই ওদের উপর ওদের রবের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হবে[২]। আমি মিথ্যা রচনাকারীদের এমনই শাস্তি দিয়ে থাকি।

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ۫ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۝

১৫৩. আর যারা মন্দ কাজ করে এবং সেসব কাজের পর তওবা করে নেয় ও ঈমান আনে, তো নিশ্চয় আপনার রব তওবার পরে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৩]।

---

১. অর্থাৎ ক্রোধের আতিশয্যে আমার দ্বারা যে বাড়াবাড়ি বা ইজতেহাদগত ভুল হয়েছে, আপনি তা মাফ করে দিন এবং কওমের সংশোধনে আমার ভাই হারূনের দ্বারা –তাঁর মর্যাদা দৃষ্টে– যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে, তাও ক্ষমা করে দিন।

২. এস্থলে 'ক্রোধ' দ্বারা তা-ই উদ্দেশ্য, যার আলোচনা সূরা বাকারায় ৫৪ নং আয়াতে গত হয়েছে। অর্থাৎ বাছুরপূজারীদেরকে তারা হত্যা করবে, যারা এ কাজ করেনি এবং অন্যদের বাধাও দেয়নি। এ থেকে বোঝা গেল, দুনিয়াতে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)-এর শাস্তি হচ্ছে কতল।

৩. অর্থাৎ মন্দ কাজ, এমন কি শিরক ও কুফর করে যদি ফের তওবা করে এবং ঈমান আনে, তবে আল্লাহ 'গাফূরুর রাহীম' এর নিকট রহমত ও ক্ষমার কোন অভাব নেই।

এ ক্ষমা পরকালের সঙ্গে সম্পর্কিত। এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাছুরপূজারীদের যে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হল, তা তাদের তওবা কবুল হওয়ার জন্য শর্তস্বরূপ ছিল। ইরশাদ হচ্ছে- تُوْبُوْا إِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ (এখন তোমরা নিজেদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা কর এবং নিজেদের হত্যা কর।) যেহেতু মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির বদৌলতে তাদের তওবা কবুল হয়ে গেছে, তাই এখন আর তাদের ক্ষেত্রে পরকালীন ধরপাকড় রইল না।

এস্থলে পার্থিব শাস্তির আলোচনার পর পরকালীন অবস্থার বর্ণনা যে দেওয়া হল, এর নজির হল মায়েদার ৩৮ নং আয়াত। তাতে চোরের পার্থিব শাস্তি বয়ানের পর বলা হয়েছে- فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَأَصْلَحَ....

১৫৪. যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হল, তিনি ফলকগুলি তুলে নিলেন। আর সেগুলিতে যা লেখা ছিল, তাতে হেদায়েত ও রহমত ছিল– তাদের জন্য যারা নিজেদের রবকে ভয় করে।

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۖ وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ۝

১৫৫. আর মূসা তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সত্তরজন লোককে আমার স্থিরীকৃত সময়ে (উপস্থিত করার) জন্য বেছে নিলেন। অতঃপর যখন তাদের ভূমিকম্প পাকড়াও করল, তখন তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আপনি ইচ্ছা করলে পূর্বেই তাদের ও আমাকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। আপনি কি আমাদের সকলকে ঐ কর্মের দরুন ধ্বংস করে দেবেন যা আমাদের মধ্যকার নির্বোধ লোকেরা করেছে? এসব কেবলই আপনার পরীক্ষা, যার দ্বারা আপনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। আপনিই আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আমাদের ক্ষমা করুন ও আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই সর্বোত্তম ক্ষমাকারী[১]।

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ۭ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ۭ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ۭ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ۝

---

১. এ কথাই অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয় যে, বর্তমান আয়াতে উল্লিখিত 'মীকাত' (স্থিরীকৃত সময়) ঐ 'মীকাত' থেকে ভিন্ন, যা মূসা আলাইহিস সালামকে তাওরাত দান করার জন্য নির্ধারিত হয়েছিল (এবং যার উল্লেখ ইতিপূর্বে ১৪২ নং আয়াতে গত হয়েছে)। তাছাড়া, বর্তমান আয়াতগুলির পর্যায়ক্রম থেকে বাহ্যত মনে হয়, এ আয়াতের ঘটনা বাছুরপূজার পর ঘটে। কিন্তু সূরা নিসার (১৫১) আয়াত– فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ الخ থেকে অধিকতর স্পষ্টতার সঙ্গে বোঝা যায় যে, এ ঘটনা আগে ঘটে, বাছুরপূজা এই ঘটনার পরে ঘটে। والله أعلم

এই ঘটনার সারাংশ সূরা বাকারায় ৫৫-৫৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ)কে বলেছিল, তোমার কথা তখনই বিশ্বাস করতে পারি যখন আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে আমরা সরাসরি শুনতে পাব। হযরত মূসা ওদের মধ্য থেকে নেতৃস্থানীয় সত্তরজন মানুষ বেছে নিয়ে তূর পাহাড়ে গেলেন। অবশেষে ওরা আল্লাহ তাআলার কালাম শুনতে পেল। এর পর বলতে লাগল, যাবৎ না আমরা আল্লাহকে নিজেদের চোখে স্পষ্ট

১৫৬. 'আর আমাদের জন্য কল্যাণ লিখে দিন–এই দুনিয়াতে ও আখেরাতে। আমরা আপনারই অভিমুখী হয়েছি।' আল্লাহ বললেন, 'আমার আযাব আমি যার উপর ইচ্ছা আপতিত করি, আর আমার রহমত সবকিছুতে ব্যাপ্ত। অতএব আমি তা তাদের জন্য লিখে দেব, যারা (স্বীয় রবকে) ভয় করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে[১]—

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ۗ قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۗ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۚ

দেখতে পাব, আমাদের বিশ্বাস হতে পারে না। এই ধৃষ্টতার কারণে নিম্নদেশ থেকে ভূমিকম্প ও উপর থেকে বজ্রপাত হল। ফলে, ওরা কাঁপতে কাঁপতে মরে গেল অথবা ওদের অবস্থা মৃতদের মত হয়ে গেল।

তখন হযরত মূসা (আ) অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে দো'য়া করলেন। দো'য়ার মর্ম এই ছিল যে, প্রভু হে! যদি আপনি ধ্বংসই করতে চাইতেন, তবে এদের সকলকে এখানে ডাকার ও আপনার কালাম শোনানোর পূর্বেই ধ্বংস করে দিতে পারতেন বরং এদের সঙ্গে আমাকেও। কারণ, আমিই তো এদের এখানে নিয়ে এসেছি। আপনার ইচ্ছায় বাধা দেওয়ার মত শক্তি-সাহস কার ছিল? যখন আপনি এমনটি ইচ্ছা করেননি, বরং আমাকে নিয়ে আসার অনুমতি এবং ওদের আপনার কালাম শোনার জন্য এখানে আসার অনুমতি দিয়েছেন, তখন এ ধারণা করা যায় না যে, নিজে এখানে ডেকে শুধু কতক নির্বোধ লোকের বোকামীর কারণে আমাদের সকলকে আপনি ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেছেন। নিঃসন্দেহে এই رجفة ও صاعقة সবই আপনার তরফ থেকে আমাদের জন পরীক্ষাস্বরূপ। আর এমন কঠিন পরীক্ষায় দৃঢ় রাখা বা না রাখাও আপনারই ইচ্ছাধীন। এ রকম কঠিন পরিস্থিতিতে আপনিই আমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী, এবং আপনারই (পবিত্র) সত্তা থেকে এই আশা করা যায় যে, আমাদের সকলের অতীত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন এবং নিজ রহমতে ভবিষ্যতে আমাদের এমন ধরনের অন্যায় ও ভ্রান্তির শিকার হতে দেবেন না।

হযরত মূসার উক্ত দো'য়ার ফলে সেই লোকেরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহ তাআলা ওদের নতুন জীবন দান করেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে : ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (অতএব আমি তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদের পুনর্জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। –বাকারা, আয়াত ৫৬)

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) বলেন, হযরত মূসা যে নিজ উম্মতের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল প্রার্থনা করলেন, সম্ভবত এর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে সকল উম্মতের চেয়ে অগ্রবর্তী ও মর্যাদাবান থাকে।

এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমার আযাব ও রহমত কোন সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট নয়। অতএব আযাব তো তারই হবে যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন। আর সাধারণ

১৫৭. '(এবং) যারা সেই রাসূলের অনুসরণ করে, যিনি উম্মী নবী[১], যাঁর বর্ণনা তারা নিজেদের নিকট তাওরাত ও ইনজীলে লিপিবদ্ধ পায়[২]– যিনি তাদের নেক কাজের নির্দেশ দেন ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করেন এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তুরাজি হালাল করেন ও অপবিত্র বস্তুগুলি হারাম করেন এবং তাদের উপর থেকে নামিয়ে দেন তাদের বোঝা ও শৃঙ্খল, যা তাদের উপরে ছিল[৩]। অতএব যারা তাঁর প্রতি

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ

রহমত সকল সৃষ্টিকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু যেই বিশেষ রহমত তোমরা চাচ্ছ, তা আল্লাহ তাআলা তাদের ভাগ্যে লিখেছেন যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং সম্পদের যাকাত আদায় করে এবং খোদার সকল বাণীতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। আর এরা হল আখেরী উম্মত, কারণ তারাই সকল কিতাবের উপর ঈমান আনবে। সুতরাং হযরত মূসার উম্মতের মধ্য থেকে যারা সর্বশেষ কিতাবে বিশ্বাস করেছে, তারা উক্ত নে'য়ামত লাভ করেছে এবং হযরত মূসার দো'য়া তাদের ভাগ্যে জুটেছে।

১. أُمِي শব্দটি হয় أُم (অর্থাৎ মাতা) এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। শিশু মায়ের পেট থেকে যখন পয়দা হয় তখন সে যেমন কারো শিষ্য থাকে না, তেমনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন কোন সৃষ্টির শিষ্যত্ব বরণ করেননি। এতদসত্ত্বেও তাঁর কৃতিত্ব এই যে, তিনি যে উলূম ও মাআরেফ এবং যে হাকায়েক (তত্ত্ব ও তথ্য) ও আসরার (ভেদ ও রহস্যের বিষয়) দ্বারা মানবকুলকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন, সে সবের এক শতাংশও কোন সৃষ্টির পক্ষে পেশ করা সম্ভব নয়। সুতরাং এ হিসাবে نبي أُمي (উম্মী নবী) উপাধিটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মহা গৌরবের কারণ।

আর এমনও হতে পারে যে, أُمي শব্দটি أُم القرى এর সঙ্গে সম্পর্কিত, যা মক্কা শরীফ এর উপাধি এবং যা ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মস্থান।

২. অর্থাৎ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ এবং তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে। এমন কি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত সাড়ে তেরশ বছরের কাটছাঁটের পরও বর্তমান বাইবেলে তাঁর সম্পর্কে বহু সুসংবাদ ও ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা প্রত্যেক যুগের আলেমগণ উদ্ধৃতিসহ মানুষের সম্মুখে প্রকাশ করে চলেছেন। ولله الحمد على ذلك

৩. অর্থাৎ ইহুদীদের জিম্মায় যেসব কঠিন হুকুম ছিল এবং ওদের দুষ্কৃতির কারণে খাওয়ার দ্রব্যাদিতে যে সংকীর্ণতা ছিল, যেমন ইরশাদ হয়েছে– فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم (ইহুদীদের পাপের কারণে আমি ওদের জন্য এমন অনেক পবিত্র বস্তু

وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۝

ঈমান এনেছে, তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে* এবং সেই নূরের অনুগত হয়েছে যা তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ করা হয়েছে[১]– তারাই সফলকাম।

[রুকূ - ২০]

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ۨ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ۝

১৫৮. আপনি বলুন, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহর রাসূল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র যাঁর, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। অতএব তোমরা ঈমান আন– আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি, যিনি উম্মী নবী, যিনি আল্লাহর প্রতি ও তাঁর সকল বাণীর প্রতি ঈমান রাখেন এবং তাঁর অনুসরণ কর, যাতে তোমরা সুপথ পাও'[২]।

হারাম করেছিলাম, যা ওদের জন্য পূর্বে হালাল ছিল। –নিসা, আয়াত ১৬০)— তা সবই এ দীনে সহজ করে দেওয়া হয়েছে এবং শূকরের গোশতের মত নাপাক দ্রব্য ও সুদখোরী ইত্যাদির মত মন্দ বিষয়, যা ওরা হালাল করে রেখেছিল– এসবের অবৈধতা এই পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ করে দিয়েছেন। মোটকথা, ওদের উপর থেকে অনেক বোঝা হালকা করে দেওয়া হয়েছে এবং বহু বন্ধন তুলে নেওয়া হয়েছে। যেমন, হাদীসে ইরশাদ হয়েছে : بعثت بالحنيفية السمحة (আমি একনিষ্ঠ সহজ দীন-ধর্মসহ প্রেরিত হয়েছি।) (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২২৯১, ২১০৭, ২৪৮৫৫; ফাতহুল বারী : ১/১১৭)

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'তাঁকে (যথাযথ) সম্মান করেছে ও সাহায্য করেছে ...'

১. 'নূর' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ওহী, চাই তা متلو হোক বা غير متلو -অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস।

২. অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত সমগ্র মানবের জন্য ব্যাপক। আরবের নিরক্ষর লোক বা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে সীমিত নয়। আল্লাহ তাআলা যেমন একক-একচ্ছত্র মহা রাজাধিরাজ, তেমনি তিনি (নবীজী) হচ্ছেন তাঁর বিশ্বনবী। তিনি যে পরিপূর্ণ ও সার্বজনীন সত্য নিয়ে আগমন করেছেন, তার অনুসরণ ছাড়া এখন হেদায়েত ও কামিয়াবীর আর কোন উপায় নেই। তিনিই হচ্ছেন সেই পয়গম্বর, যাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করলে সকল নবী-রাসূল ও সমস্ত আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান আনা হয়ে যায়।

১৫৯. মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা (মানুষকে) সত্যের পথ দেখায় এবং নিজেরা সে অনুযায়ীই ফয়সালা (ও আমল) করে[১]।

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ۝

১৬০. আর আমি বনী ইসরাঈলকে– যারা ছিল বারটি বংশ– ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিলাম[২]। এবং যখন মূসার সম্প্রদায় তাঁর নিকট পানি চাইল, তখন তাঁর প্রতি ওহী পাঠালাম যে, 'তোমার লাঠির দ্বারা এই পাথরে আঘাত কর।' (তিনি আঘাত করলেন), ফলে তা থেকে বারটি ঝরনা উৎসারিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনে নিল। আর আমি তাদের উপর মেঘের ছায়া বিস্তার করলাম এবং তাদের উপর মান্ ও সালওয়া অবতীর্ণ করলাম (এবং বললাম,) 'তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ খাও, যা আমি তোমাদের দান করেছি।' আর ওরা আমার কোনই ক্ষতি করতে পারেনি, কিন্তু নিজেদেরই ক্ষতি করেছে।

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗۤ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ۝

১৬১. (স্মরণ কর), যখন তাদের বলা হল, 'তোমরা এই শহরে বাস কর[৩] এবং তাতে

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ

---

১. যদিও অধিকাংশ ইহুদী অবাধ্যতা ও বেইনসাফীর পথ অবলম্বন করেছে, তবুও কিছু সংখ্যক পবিত্রাত্মা এমন রয়েছেন, যারা অন্য লোকদের সত্যের দিকে দাওয়াত দেন এবং নিজেরা সত্য ও ন্যায়ের পথে চলেন, যেমন আবদুল্লাহ বিন সালাম প্রমুখ।

২. অর্থাৎ শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থাপনার জন্য তাদের বারটি জামাতকে, যারা বার দাদার সন্তান-সন্ততি ছিল, আলাদা আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল। এবং প্রত্যেক দলের জন্য একজন করে দলপতি সাব্যস্ত করে দেওয়া হয়, যাতে দলের লোকদের নেগরানী ও তাদের প্রতি খেয়াল রাখা হয়- وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا (এবং তাদের থেকে আমি বারজন নেতা নির্ধারণ করেছিলাম। –মায়েদা, ১২)

৩. অধিকাংশের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য 'আরীহা' নামক শহর।

যেখান থেকে ইচ্ছা খাও এবং বল, 'আমাদের ক্ষমা করে দিন'। আর (শহরের) দ্বারে প্রবেশ কর সেজদা করে করে, তাহলে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেব। অবশ্যই আমি নেককারদের অধিক দেব[১]।

وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে জালেমরা, ওদের যা বলতে বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য শব্দ বলল। ফলে আমি ওদের উপর আসমান থেকে আযাব নাযিল করলাম, কারণ, ওরা অন্যায় করত[২]।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾

[রুকূ - ২১]

১৬৩. আপনি তাদের সেই জনপদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন, যা ছিল সাগরের তীরে অবস্থিত[৩], যখন তার অধিবাসীরা শনিবারের (বিধানের) ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করতে থাকে– যখন মাছগুলি শনিবার দিন পানির উপর ভেসে ওদের কাছে চলে আসত। আর যেদিন ওদের শনিবার হত না, সেদিন ওদের কাছে আসত না। এভাবেই আমি

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ إِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَأْتِيْهِمْ

১. অর্থাৎ এখন একটি শহর জয় হল, ভবিষ্যতে সারা দেশ আয়ত্তে আসবে। 'মূযেহুল কুরআন'-এ এমনই বলা হয়েছে। আর অন্যান্য তাফসীরগ্রন্থ অনুসারে এর অর্থ হচ্ছে, অপরাধ ক্ষমা করে নেককারদের অধিক ছওয়াব দান করা হবে।

২. এসব ঘটনা 'তীহ' উপত্যকায় সংঘটিত হয়। সূরা বাকারায় (আয়াত ৫৭-৬০) এই ঘটনাগুলির আলোচনা রয়েছে। বিশদ ব্যাখ্যা সেখানে দ্রষ্টব্য।

৩. অর্থাৎ সতর্ক ও ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যে বর্তমান কালের ইহুদীদের সেই ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, যা দাউদ আলাইহিস সালামের আমলে ইহুদীদের এক লোকালয়ে সংঘটিত হয়। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এই লোকালয় দ্বারা 'আইলা' শহর উদ্দেশ্য, যা লোহিত সাগরের তীরে মাদয়ান ও তূর পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। সাগর কাছে থাকায় সেখানকার লোকেরা মাছ শিকারে অভ্যস্ত ছিল।

كَذٰلِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ⑯

ওদের পরীক্ষায় ফেলেছিলাম, কেননা ওরা নাফরমানী করত[১]।

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ⑰

১৬৪. আর (স্মরণ কর), যখন তাদের একদল (অপর দলকে) বলল, 'তোমরা এমন লোকদের কেন নসীহত কর যাদের আল্লাহ ধ্বংস করে দেবেন বা কঠোর শাস্তি দেবেন[২]?' তারা বলল, 'তোমাদের রবের নিকট দায়-মুক্তির উদ্দেশ্যে এবং এ আশায় যে, সম্ভবত ওরা ভয় করবে[৩]।'

---

১. আল্লাহ তাআলা ইহুদীদের জন্য শনিবারে শিকার করা হারাম করেছিলেন। 'আইলা'র অধিবাসীরা অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে লিপ্ত ছিল। আল্লাহর তরফ থেকে কঠিন পরীক্ষাস্বরূপ শনিবারে সমুদ্রে মাছের খুবই প্রাচুর্য দেখা যেত, কিন্তু অন্যান্য দিন মাছ দেখা যেত না। এই লোকদের দ্বারা ধৈর্য ধরা সম্ভব হল না, ওরা আল্লাহর পরিষ্কার নির্দেশের বিরুদ্ধে চালাকি করতে চাইল। ওরা সাগরের পানি খাল কেটে ভিতরে আনল। শনিবারে যখন মাছগুলি ওদের নির্মিত হাউজে এসে জমা হত, তখন বের হওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিত এবং পরদিন রবিবারে গিয়ে ধরে আনত, যাতে শনিবারে শিকার করার অভিযোগে অভিযুক্ত না হয়। বলতে গেলে, এই আচরণের দ্বারা (معاذ الله) খোদাকে ধোঁকা দিতে চাইল।

অবশেষে দুনিয়াতেই তার শাস্তি ভোগ করতে হল। ওদের বিকৃত করে বানর বানিয়ে দেওয়া হল। বোঝা গেল, খোদার সামনে চাতুরী ও প্রতারণা চলে না।

২. যখন আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে চাতুরী শুরু হল, তখন 'আইলা'বাসীরা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল। **এক**, যারা উক্ত কৌশলের আশ্রয় নিয়ে আল্লাহ তাআলার পরিষ্কার বিধানের নাফরমানী করতে লাগল। **দুই**, সেই নসীহতকারীরা, যারা শেষ পর্যন্ত উপদেশ ও ন্যায়ের আদেশ দানে মশগুল থাকল। **তিন**, যারা এক আধবার নসীহত করে নিরাশ হয়ে নসীহত করা ছেড়ে দিল। **চার**, যারা উক্ত কুকর্মে শরীকও হয়নি এবং সীমালংঘনকারীদের বাধাও দেয়নি।

শেষোক্ত দুই জামাত ২য় দলকে বলে থাকবে যে, এই অবাধ্যদের জন্য কেন মাথা খারাপ করছ? এদের দিক থেকে সত্য গ্রহণের কোনই আশা নেই। এদের ক্ষেত্রে মনে হয় দুয়ের একটি ঘটবেই– হয় আল্লাহ এদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেবেন, না হয় কোন কঠোর শাস্তিতে পতিত করবেন। কেননা, এরা কোনো নসীহতে কান দেওয়ার নয়।

৩. অর্থাৎ হয়তো বোঝাতে থাকলে কিছুটা ভীত হয়ে নিজেদের মন্দকর্ম থেকে বিরত হয়ে যাবে, নতুবা কমপক্ষে আমরা পরওয়ারদেগারের সম্মুখে ওযর তো করতে পারব যে, আল্লাহ গো! আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নসীহত ও উপদেশ দানে ত্রুটি করিনি। এরা না মানলে আমাদের কী দোষ। –বস্তুত, এই নসীহতকারীরা একদিকে একেবারে নিরাশ

فَلَمَّا نَسُوۡا مَا ذُكِّرُوۡا بِهٖۤ اَنۡجَیۡنَا الَّذِیۡنَ یَنۡهَوۡنَ عَنِ السُّوۡٓءِ وَاَخَذۡنَا الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡا بِعَذَابٍۭ بَىِٕیۡسٍۭ بِمَا كَانُوۡا یَفۡسُقُوۡنَ ﴿۱۶۵﴾

১৬৫. অতঃপর যখন ওরা (অর্থাৎ শনিবারের বিধান লঙ্ঘনকারীরা), ওদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তা ভুলে থাকল, তখন আমি তাদের মুক্তি দিলাম যারা মন্দ কাজে নিষেধ করত। আর যারা জুলুম করেছিল ওদের কঠিন আযাবে পাকড়াও করলাম ওদের নাফরমানীর কারণে[১]।

فَلَمَّا عَتَوۡا عَنۡ مَّا نُهُوۡا عَنۡهُ قُلۡنَا لَهُمۡ كُوۡنُوۡا قِرَدَةً خٰسِـِٕیۡنَ ﴿۱۶۶﴾

১৬৬. ওদের যে কাজ করতে বারণ করা হয়েছিল, ওরা যখন তাতে সীমালঙ্ঘন করল (অর্থাৎ ঔদ্ধত্য দেখিয়ে তা করে চলল), তখন আমি ওদের হুকুম করলাম, 'তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও'[২]।

ছিলেন না, দ্বিতীয়ত তাঁরা عزيمت এর উপর আমল করছিলেন, অর্থাৎ নৈরাশ্য সত্ত্বেও নসীহত করা থেকে পিছপা হচ্ছিলেন না।

১. অর্থাৎ যখন নালায়েকরা সকল উপদেশ একেবারে ভুলে গেল, তখন আমি উপদেশ দানকারীদের বাঁচিয়ে জালেমদের কঠোর শাস্তিতে পাকড়াও করলাম।

الذين ينهون عن السوء (যারা মন্দকাজে নিষেধ করত) এ শব্দাবলির ব্যাপকতা থেকে বোঝা যায় যে, যারা উপদেশ দানে ক্লান্ত হয়ে এক সময় তা ছেড়ে দিল এবং যারা শেষ পর্যন্ত ওয়াজ-নসীহতের ধারা চালু রেখেছিল –এই উভয় দল নাজাত পেল, শুধু জালেমরা ধৃত হল। হযরত ইকরিমা (র) থেকে এমনই বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)ও তাঁর এ উপলব্ধির প্রশংসা করেছেন। আর যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একেবারে নীরব রইল, আল্লাহও তাদের আলোচনা থেকে নীরব থেকেছেন। ইবনে কাছীর খুবই সুন্দর বলেছেন-

فنصّ على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين، لأن الجزاء من جنس العمل فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا، ولا يرتكبوا عظيما فيذموا

২. সম্ভবত প্রথমে অন্য কোন আযাব এসেছে। অতঃপর যখন একেবারে সীমা অতিক্রম করে গেল তখন ইতর বানর বানিয়ে দেওয়া হল।

অথবা فلما عتوا الخ আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াত فلما نسوا ما ذكروا به الخ এর ব্যাখ্যা ধরা হবে। অর্থাৎ বানর বানিয়ে দেওয়াই সেই عذاب بئيس (কঠিন আযাব) ছিল, যার উল্লেখ পূর্বের আয়াতে রয়েছে।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) বলেন, 'বারণকারীরা মাছ শিকারীদের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দিল এবং মধ্যস্থলে দেয়াল ওঠাল। একদিন ভোরে উঠে ওদের

১৬৭. আর (সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন), যখন আপনার রব জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি অবশ্যই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ইহুদীদের বিরুদ্ধে এমন লোক পাঠাতে থাকবেন, যারা ওদের কঠিন শাস্তি দেবে[১]। নিশ্চয় আপনার রব দ্রুত শাস্তি প্রদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۭ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ښ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৬৮. আর আমি যমীনের বুকে তাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছি[৩]– তাদের মধ্যে

وَقَطَّعْنٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ

আওয়াজ না শোনায় দেয়ালের উপর থেকে দেখতে পেল যে, প্রত্যেক ঘরে বানর রয়েছে। ওরা মানুষ চিনতে পেরে স্ব স্ব আত্মীয়-স্বজনের পায়ের উপর মাথা কুটে কাঁদতে লাগল। অবশেষে খুব হীন অবস্থায় তিন দিনের মধ্যে মরে গেল। (তাফসীরে তবারী ২/৬০-৬১)

১. অর্থাৎ ইহুদীরা যদি তাওরাতের আহকাম অনুসারে আমল না করে, তবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত মাঝে-মধ্যে ওদের উপর এমন লোকদের চড়াও করতে থাকবেন, যারা ওদের নিকৃষ্ট আযাবে পতিত রাখবে।

নিকৃষ্ট আযাব বলতে এখানে অধীনতাপূর্ণ জীবনকে বোঝানো হয়েছে। ইহুদী জাতি কখনো গ্রীক ও কালদানী বাদশাহদের অধীন রয়েছে; কখনো 'বুখতে নাস্‌সার' প্রভৃতি লোকদের কঠিন শাস্তির পাত্র হয়েছে। পরিশেষে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় কাল পর্যন্ত অগ্নিপূজকদের প্রজা হিসাবে জীবন যাপন করে। এরপর ওদেরকে মুসলমান শাসকদের শাসনাধীন করে দেওয়া হয়। ওরা যেখানেই থেকেছে প্রায়ই রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের তরফ থেকে দারুণ লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি ভোগ করেছে। ওদের ধন-সম্পদ ইত্যাদি কোন-কিছু উক্ত গোলামী ও পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে পারেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পারবে না।

সর্বশেষ যখন ওরা দাজ্জালের সাহায্যকারী হয়ে বের হবে, তখন হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের মুসলমান সঙ্গীদের হাতে নিহত হবে। হাদীসে এ রকমই উল্লেখ করা রয়েছে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৫৩৫৩))

২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি নাফরমানী থেকে নিবৃত্ত হয় না, আল্লাহ তাআলা কতক সময় ওর উপর দুনিয়াতেই আযাব পাঠাতে শুরু করেন। আর যত বড় অপরাধীই হোক, সে যদি তওবা করে নেয় এবং অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর প্রতি 'রুজু' করে, তবে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়াও অফুরন্ত, অসীম– মাফ করতে মোটেই বিলম্ব হয় না।

৩. অর্থাৎ ইহুদীরা পরস্পর মতবিরোধ করে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, (ফলে) ওদের কোন ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও প্রতিপত্তি রইল না এবং ওদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মমতের সৃষ্টি হল। এসব অবস্থা এ উম্মতকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য শোনানো হচ্ছে।

الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۝

কতক নেককার, আর কতক অন্য রকমের। এবং তাদের পরীক্ষা করেছি ভাল ও মন্দ অবস্থাদির মাধ্যমে, যাতে তারা (অবাধ্যতা থেকে) ফিরে আসে[১]।

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۝

১৬৯. অনন্তর, তাদের পরে এমন অযোগ্য স্থলাভিষিক্তরা এসে কিতাবের উত্তরাধি-কারী হয়েছে, যারা এই তুচ্ছ জীবনের সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, 'নিশ্চয় আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে'। আর যদি ওদের সামনে পুনরায় অনুরূপ সামগ্রী আসে, তবে তাও গ্রহণ করবে[২]। ওদের থেকে কি কিতাবে এ অঙ্গীকার নেওয়া হয়নি যে, ওরা আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলবে না? আর ওরা তো তাতে (অর্থাৎ কিতাবে) যা কিছু আছে, তা পড়েছে। বস্তুত আখেরাতের নিবাসই অধিক উত্তম তাদের জন্য, যারা (আল্লাহকে) ভয় করে। তোমরা কি বোঝ না[৩]?

---

১. অর্থাৎ তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক নেকও ছিল, কিন্তু অধিকাংশই ছিল কাফের ও ফাসেক। আর এদের জন্যও আল্লাহ তাআলা প্রত্যাবর্তন ও তওবা করার এবং আল্লাহ-মুখী হওয়ার সুযোগ তৈরি করতে থেকেছেন। কখনো ওদের ভোগ-বিলাসে রেখেছেন, কখনো দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করেছেন, যাতে অনুগ্রহ দেখে বা বিপদাপদে ভীত হয়ে তওবা করে ও আল্লাহমুখী হয়।

২. অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের মধ্যে তো কিছু সংখ্যক নেক বান্দাও ছিলেন, পরবর্তীরা এমনি অযোগ্য ছিল যে, যে তাওরাত কিতাবের উত্তরাধিকারী ওরা হয়েছিল, দুনিয়ার তুচ্ছ সামগ্রী গ্রহণ করে তার আয়াতগুলির মধ্যে বিকৃতি শুরু করে এবং ঘুষ নিয়ে তাওরাতের আহকামের বিরোধী ফয়সালা দিতে শুরু করে।

মজার ব্যাপার এই যে, এহেন অশোভন ও দুষ্ট আচরণ করেও ওরা বিশ্বাস ও দাবি করে যে, এসব করেও আমাদের ক্ষতির কোন আশঙ্কা নেই, আমরা তো খোদার সন্তান-সন্ততি ও তাঁর প্রিয়জন। যাই কিছু করি না কেন, তিনি আমাদের সকল অন্যায় অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন। এ বিশ্বাসের কারণেই ওরা ভবিষ্যতেও সুযোগ হলে ঘুষ নিয়ে আবার এ ধরনেরই বেঈমানী করতে প্রস্তুত থাকে। অথচ ওদের উচিত ছিল বিগত অন্যায় আচরণের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ না করার দৃঢ় সংকল্প নেওয়া।

৩. অর্থাৎ তাওরাতে ওদের থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল যে, আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কোন মিথ্যা আরোপ করবে না। কিন্তু ওরা তাঁর কিতাবে ও আহকামে কাটছাঁট ও বিকৃতি

১৭০. আর যারা দৃঢ়ভাবে কিতাব ধারণ করে এবং নামায কায়েম করে, তো নিশ্চয় আমি সৎকর্মশীলদের ছওয়াব বিনষ্ট করি না[১]।

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ۝

১৭১. (স্মরণ কর), যখন আমি পর্বতকে ওদের উপরে এমনভাবে তুলে ধরলাম, যেন তা একটি শামিয়ানা এবং ওরা আশঙ্কা করল যে, তা ওদের উপর পতিত হবে। (আমি বললাম), 'আমি তোমাদের যা দিয়েছি, তা দৃঢ়ভাবে ধর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা পরহেযগার হও[২]।'

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْۤا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

শুরু করে দিল। অথচ এই লোকগুলো আল্লাহর কিতাব (তাওরাত) পড়ে ও পড়িয়ে থাকে। সুতরাং এর বিষয়বস্তু ওদের জানা নেই বা মনে নেই– এ কেমন করে বলা যায়?

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, দুনিয়ার নশ্বর বিষয়াদির বিনিময়ে ওরা দীন ও ঈমান বিক্রি করে দিয়েছে এবং আখেরাতের সুখ ও দুঃখের প্রতি চক্ষু বন্ধ করে ফেলেছে। ওরা এতটুকু বুঝল না যে, যারা খোদাকে ভয় করে ও তাক্ওয়ার পথ অবলম্বন করে, তাদের জন্য আখেরাতের নিবাস ও সেখানকার ভোগ-বিলাস দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে অনেক উত্তম ও উন্নত। আফসোস, এখনো যদি ওরা বুঝত!

১. অর্থাৎ তওবা ও সংশোধনের দ্বার এখনো খোলা আছে। যারা তাওরাতের আসল উপদেশাবলি আঁকড়ে থেকেছে এবং তারই হেদায়েত ও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এখন কুরআন করীমের পথ দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর (অর্থাৎ নামায ইত্যাদির) হক সঠিকভাবে আদায় করবে, আর নিজেদের ও অন্যদের সংশোধনের প্রতি মনোযোগী হবে, আল্লাহ তাদের মেহনত বিনষ্ট করবেন না। তারা নিঃসন্দেহে স্বীয় মেহনতের সুফল আস্বাদন করবে।

২. অর্থাৎ উল্লিখিত ميثاق الكتاب (অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তি) এমন গুরুত্বের সাথে নেওয়া হয়েছিল যে, পাহাড় উত্তোলন করে ওদের মাথার উপর ঝুলিয়ে দেওয়া হল। এবং বলা হল, যা কিছু তোমাদের দান করা হচ্ছে (অর্থাৎ তাওরাত ইত্যাদি), তা দৃঢ়ভাবে ধর এবং তাতে যেসব নসীহত করা হয়েছে তা সর্বদা মনে রাখ। নতুবা মনে রেখো, আল্লাহ এ পাহাড় পতিত করে তোমাদের ধ্বংস করতে পারেন।

এরূপ গুরুত্ব ও তাকীদের সাথে যে ওয়াদা-অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, আফসোসের বিষয় যে ওরা তা একেবারে ভুলে গেল।

এ ঘটনা সূরা বাক্বারায় (আয়াত ৬২) বর্ণিত হয়েছে। তার তাফসীর দ্রষ্টব্য।

[রুকূ - ২২]

১৭২. (স্মরণ করুন), যখন আপনার রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদের বের করলেন এবং তাদরেকে তাদের নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষী বানালেন। (তিনি বললেন), 'আমি কি তোমাদের রব নই?' তারা বলল, 'হাঁ অবশ্যই, আমরা (এর) সাক্ষ্য দিচ্ছি'। (এ স্বীকারোক্তি এ জন্য নিয়েছি), যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন বলতে না পার যে, 'আমরা তো এ সম্বন্ধে বেখবর ছিলাম',

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۚ قَالُوْا بَلٰى ۚ شَهِدْنَا ۚ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۙ

১৭৩. 'অথবা বলতে না পার যে, শির্‌ক তো আমাদের পূর্বে আমাদের বাপদাদারা করেছিল, আর আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি আপনি আমাদের ধ্বংস করছেন ঐ কাজের কারণে, যা পথভ্রষ্টরা করেছিল[১]?'

اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ

১. সম্প্রদায় বিশেষের অঙ্গীকারের আলোচনার পর এখানে সার্বজনীন অঙ্গীকারের আলোচনা করা হচ্ছে।

আল্লাহর সার্বজনীন রুবুবিয়ত এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

সকল সত্য আকীদা ও আসমানী ধর্মের ভিত্তি এই যে, মানুষ আল্লাহর অস্তিত্ব ও সার্বজনীন রুবুবিয়তে (তথা আল্লাহই সকলের ও সবকিছুর রব –এ কথায়) বিশ্বাস রাখবে। দীনের গোটা প্রাসাদ এই ভিত্তির উপরই দণ্ডায়মান। এই বিশ্বাস অর্জন না হওয়া পর্যন্ত ধর্মীয় ময়দানে বুদ্ধি ও চিন্তার দিকনির্দেশনা এবং নবী-রাসূলের হেদায়েত কোনো কাজে আসতে পারে না। গভীর চিন্তা-ভাবনার পর বোঝা যায় যে, আসমানী ধর্মের সমগ্র মৌলিক ও শাখা বিষয়াদির গোড়া হচ্ছে আল্লাহর সার্বজনীন রুবুবিয়তের এই বিশ্বাস।

অতএব হেদায়াতের এ বীজটি— যা সকল আসমানী শিক্ষার সূচনা ও সমাপ্তি এবং সমগ্র খোদায়ী হেদায়াতের সারাংশ –পূর্ণ উদারতার সাথে মানবগোষ্ঠীর সকল সদস্যের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল, যাতে প্রত্যেক মানুষ বুদ্ধি-বিবেক ও ওহী-এলহামের পানিসিঞ্চন দ্বারা উক্ত বীজকে ঈমান ও তাওহীদ-বৃক্ষের পর্যায় পর্যন্ত পৌছাতে পারে। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদম-সন্তানদের অন্তরে শুরুতেই এ বীজ বপন করা না হত এবং সব

চেয়ে বুনিয়াদি ও অমূল্য এ বিষয়টির সমাধান বুদ্ধি ও চিন্তার হস্তে সমর্পন করে দেওয়া হত, তবে নিশ্চিতরূপে এই ব্যাপারটিও যুক্তি-তর্কের বেড়াজালে ফেঁসে একটি কাল্পনিক বিষয়ের রূপ ধারণ করত, যার বিষয়ে সকল মানুষ তো দূরের কথা, তাদের অধিকাংশও একমত হতে পারত না।

এজন্য আল্লাহ তাআলা যেখানে চিন্তা ও বুদ্ধির শক্তি এবং ওহী ও এলহামের আলো গ্রহণ করার যোগ্যতা বনী-আদমের মধ্যে রেখেছেন, সেখানে উক্ত বুনিয়াদী বিশ্বাসের শিক্ষা তাদেরকে সৃষ্টিগতভাবেই দিয়েছেন। আর এরই সার্বিকতার মধ্যে সমগ্র আসমানী হেদায়াতের তফসীল জড়িত ও অঙ্কিত ছিল এবং এ ছাড়া ধর্মের ইমারতের কোন স্তম্ভ খাড়া থাকতে পারত না।

এই আদি ও খোদায়ী তালীমেরই ফল এই যে, প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক স্থানে আদম সন্তানেরা আল্লাহ তাআলার 'সর্বব্যাপী রুবুবিয়ত' এর আকীদার ব্যাপারে কোনো না কোনো পর্যায় পর্যন্ত একমত রয়েছে। আর মুষ্টিমেয় যেসব লোক কোন চিন্তাগত ও আত্মিক ব্যাধির কারণে উক্ত সার্বজনীন, স্বাভাবিক বোধ-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে, তারা পরিণামে দুনিয়াবাসীর সামনে, বরং তাদের নিজেদের দৃষ্টিতেও সেরূপ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে, যেরূপ একজন জ্বরের বা অন্য কোন রোগী মিষ্টি ও সুস্বাদু খাদ্যসমূহকে তিক্ত ও স্বাদহীন বলে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়।

যা হোক, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহার মহান রুবুবিয়ত সম্বন্ধে সাধারণ ঐক্য ও ইজমা এরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, আকল-বুদ্ধি ও চিন্তা-ফিকিরের দাপাদাপির পূর্বেই প্রকৃত স্রষ্টার পক্ষ থেকে আদম সন্তানদের সরাসরি উক্ত আকীদা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। নতুবা চিন্তা-গবেষণা ও বুদ্ধিগত প্রমাণের সাহায্যে এমন ঐক্য হয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। এ কুরআনে করীমের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যে, বর্তমান আয়াতগুলির মধ্যে আকীদাগত এই সাধারণ ঐক্যের আসল রহস্য উন্মোচিত করা হয়েছে।

একটি সংশয়ের নিরসন

আমাদের অবশ্য এ কথা মনে নেই যে, এই বুনিয়াদী আকীদার তালীম কখন ও কোথায় এবং কোন পরিবেশে দেওয়া হয়েছিল? তবুও একজন বক্তা ও লেখক যেমন বিশ্বাস করে যে, জীবনের প্রথম দিকে নিশ্চয় তাকে কেউ শব্দাবলি বলতে শিখিয়েছে, যার ফলে সে উন্নতি করে আজ এই পর্যন্ত পৌছেছে। যদিও প্রথম শব্দের শিক্ষক এবং শিক্ষার সময়, স্থান ও অপরাপর স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, বরং খোদ শিক্ষার কথাও তার স্মরণে নেই, তবুও তার বর্তমান ফলাফলের দ্বারা বিশ্বাস রয়েছে যে, এমনটি অবশ্যই ঘটেছে— অনুরূপ, আল্লাহর রুবুবিয়তের আকীদার বিষয়ে জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর ঐক্যমত হওয়াই এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, সৃষ্টির শুরুতে কোন শিক্ষকের মাধ্যমে এ জিনিস তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

১৭৪. এভাবেই আমি আয়াতসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি, (যাতে তারা জানতে পারে) এবং যাতে তারা (কুফর-শিরক থেকে) ফিরে আসে[১]।	وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۝
১৭৫. আপনি তাদের সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনান, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দান করেছিলাম। কিন্তু সে তা ছেড়ে বেরিয়ে গেল, আর শয়তান তার পিছনে লাগল। ফলে সে হয়ে গেল পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত।	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ۝
১৭৬. আর আমি ইচ্ছা করলে ঐ আয়াতগুলির বদৌলতে তাকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করতে পারতাম। কিন্তু সে তো দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ল এবং নিজ প্রবৃত্তির	وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ

উক্ত আদি ও স্বাভাবিক তালীম, যার সুস্পষ্ট প্রভাব আজ পর্যন্ত মানব-স্বভাবের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তা প্রত্যেক মানুষকে খোদার হুজ্জতের (দলীল-প্রমাণের) সামনে নিরুত্তর করে দেয়। যে ব্যক্তি নিজ পথভ্রষ্টতা ও শিরককে সঠিক সাব্যস্ত করার জন্য উদাসীনতা, অজ্ঞতা অথবা বাপদাদার অন্ধ অনুসরণের ওযর পেশ করে থাকে, তার মোকাবেলায় আল্লাহর এই অকাট্য হুজ্জতকেই মীমাংসাকারী জওয়াব হিসাবে পেশ করা যেতে পারে।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) বলেন, 'হযরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সন্তানদের এবং তাদের থেকে তাদের সন্তানদের বের করে (আল্লাহ তাআলা) সকলের দ্বারা নিজ খোদায়ীর স্বীকৃতি আদায় করলেন। এর পর আবার তাদেরকে পৃষ্ঠে প্রবেশ করালেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর সার্বিক রুবুবিয়তকে স্বীকার করতে প্রত্যেকে নিজেই যথেষ্ট– বাপের অনুকরণ অনাবশ্যক। পিতা শিরক করলে (পুত্রকেও শিরক করতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই; বরং) পুত্রের উচিত ঈমান আনয়ন করা। –কারো যদি সন্দেহ হয় যে, এই অঙ্গীকার তো মনে রয়নি, সুতরাং এর আলোচনা করে কী লাভ? তবে তার উত্তর এই যে, এর চিহ্ন প্রত্যেকের অন্তরে রয়েছে এবং এর বদৌলতে প্রত্যেকের মুখে এ স্বীকারোক্তি আছে যে, আল্লাহই সকলের স্রষ্টা। সমগ্র বিশ্ব এর স্বীকৃতি দিচ্ছে। পক্ষান্তরে, যে কেউ অস্বীকৃতি জানায় বা শিরক করে, সে নিজ বুদ্ধির দোষে তা করে, অবশেষে নিজেই মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়।'

১. তাফসীরে 'মূযেহুল কুরআনে' আছে, 'এস্থলে ইহুদীদের শোনানো উদ্দেশ্য। কারণ, মুশরিকদের মত ওরাও অঙ্গীকার থেকে ফিরে গেছে'।

الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

অনুসরণ করল। অতএব তার অবস্থা হল কুকুরের ন্যায়– ওর উপর তুমি ভার চাপালেও সে হাঁপাবে, আর ওকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিলেও হাঁপাবে। এটা সেই লোকদের দৃষ্টান্ত, যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে। অতএব আপনি এসব অবস্থা বর্ণনা করুন, যাতে তারা গভীরভাবে চিন্তা করে[১]।

---

১. অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এই আয়াতগুলি (بلعم بن باعوراء) 'বালআম ইবনে বাউরা' সম্পর্কে নাযিল হয়। সে একজন আলেম ও কারামতওয়ালা দরবেশ ছিল। পরে সে আল্লাহর আয়াত ও হেদায়েত পরিত্যাগ করে স্ত্রীর ধোঁকা ও ধনের লোভে পড়ে হযরত মূসার মোকাবেলায় নিজ আত্মিক শক্তি প্রয়োগ করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। পরিশেষে মূসা আলাইহিস সালামের তো কিছুই করতে পারেনি, নিজেই চিরঅভিশপ্ত হল।

আল্লাহর আয়াতসমূহের যে জ্ঞান বালআমকে দেওয়া হয়েছিল, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তার দ্বারা ওকে অনেক উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে দিতেন। আর এটা তখনই হতে পারত, যখন নিজ জ্ঞান অনুযায়ী চলার এবং আল্লাহর আয়াত অনুসরণ করার তাওফীক তার হত। কিন্তু এমনটি হয়নি। কেননা, সে নিজে আসমানী বরকত ও আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে পার্থিব লোভ-লালসা ও ভোগ-বিলাসের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। সে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণ করছিল, আর শয়তান তার পশ্চাদ্ধাবন করে যাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত সে পাক্কা বিপথগামী ও গোমরাহদের কাতারে গিয়ে প্রবেশ করল।

তখন তার অবস্থা কুকুরের ন্যায় হয়ে গেল– যার জিহ্বা বাইরে লটকে আছে ও সর্বদা হাঁপাচ্ছে। মনে করুন, যদি তার উপর বোঝা চাপানো হয় কিংবা কিছু না করে ছেড়ে দেওয়া হয়, সর্বাবস্থায় সে হাঁপাতে থাকবে ও জিহ্বা লটকিয়ে রাখবে। কেননা, সৃষ্টিগতভাবেই হৃদযন্ত্রের দুর্বলতার কারণে কুকুর সহজে উত্তপ্ত বায়ু বাইরে ফেলতে এবং ঠাণ্ডা ও নির্মল বায়ু ভিতরে টানতে পারে না। অনুরূপ, বালআমের অবস্থাও নিম্নজগতের মলখাদক কুকুরের মত হয়ে গেল। কেননা, তার চারিত্রিক দুর্বলতাহেতু তাকে আল্লাহর আয়াতগুলি দেওয়া না দেওয়া অথবা সতর্ক করা না করা– উভয় হালত তার পক্ষে সমান হয়ে গেল— سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (আপনি ওদের সতর্ক করুন বা না করুন, ওদের পক্ষে সমান, ওরা ঈমান আনবে না।) আর পার্থিব লোভের কারণে তার জিহ্বা বাইরে এসে পড়ল।

হতে পারে, বালআমের বাতেনী ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রকাশের নিমিত্ত اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ– এ বিষয়টিকে কেবল একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার

১৭৭. বড়ই নিকৃষ্ট সেসব লোকের উদাহরণ*, যারা আমার আয়াতগুলি অস্বীকার করে এবং (এভাবে) নিজেদেরই ক্ষতি করতে থাকে[১]।

سَآءَ مَثَلًا اِلْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ۝

১৭৮. আল্লাহ যাকে পথ দেখান সে-ই পথ-প্রাপ্ত হয়, আর তিনি যাদের বিপথগামী করেন ওরাই ক্ষতিগ্রস্ত[২]।

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ۝

এমনও হতে পারে যে, তার জন্য দুনিয়া বা আখেরাতে এ শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, বাহ্যিকভাবেই কুকুরের ন্যায় তার জিহ্বা বাইরে লটকে থাকবে এবং সর্বদা পেরেশান, দিশাহারা ও ভীত-বিহ্বল মানুষের মত হাঁপাতে থাকবে।

বর্তমান আয়াতগুলির শানে-নুযূল যাই হোক, এখানে এমন সব প্রবৃত্তিপূজারীর পরিণামের কথা বলা হয়েছে, যারা সত্যকে গ্রহণ অথবা সম্পূর্ণ রূপে বুঝে নেওয়ার পরও শুধু পার্থিব লোভ ও হীন কামনা-বাসনার অনুসরণে আল্লাহর হুকুম-আহকাম বর্জন করে শয়তানের ইশারা-ইঙ্গিতে চলতে শুরু করে এবং খোদার ওয়াদা-অঙ্গীকারের কোনই পরোয়া করে না।

বলা বাহুল্য, এতে ইহুদীদের সতর্ক করা হল যে, শুধু কিতাবের ইলম বিন্দুমাত্র যথেষ্ট হতে পারে না, যাবৎ না সত্যিকারভাবে তার অনুসরণ করা হয়। مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا (যাদের তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর ওরা তা বহন করেনি, ওদের অবস্থা গাধার মত, যে অনেক কিতাব বহন করে চলেছে। –জুমুআ, আয়াত ৫)

চিন্তা করে দেখলে, এই আয়াতগুলির মধ্যে 'উলামায়ে সূ'দের (অসৎ আলেমদের) জন্য অতি বড় সবক রয়েছে।

✯ দ্বিতীয় তরজমা– 'অবস্থা'

১. মুশরিক ও অন্যান্যদের খণ্ডনে কুরআন মাকড়সা, মশা, মাছি ইত্যাদির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছে; কিন্তু এই লোকদের দৃষ্টান্ত (যা পূর্বের আয়াতে বর্ণিত হল) এতই মন্দ যে, কোন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষই পারতপক্ষে তা নিজের উপর প্রযোজ্য হতে দিবে না। আর যে নির্লজ্জরা (আল্লাহর আয়াতের অস্বীকৃতির দ্বারা) নিজেদের অবস্থার উপর তা প্রযোজ্য হতে দেয়, তারা শুধু নিজেদেরই ক্ষতি করে থাকে।

২. জ্ঞান-বিদ্যা মানুষের তখনই কাজে লাগে, যখন আল্লাহর হেদায়েত ও সাহায্যে তা অনুযায়ী চলার তাওফীক হয়। তিনি যাকে সোজা পথে চলার তাওফীক না দেন, সে যত বড় জ্ঞান-গরিমা ও যোগ্যতার অধিকারীই হোক না কেন, ক্ষতি ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই তার ভাগ্যে জোটে না। অতএব স্বীয় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দরুন অহংকারী না হয়ে বরং সর্বদা আল্লাহর নিকট থেকে হেদায়েত ও তাওফীক চাওয়া উচিত।

১৭৯. নিশ্চয়ই আমি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি[১]। ওদের অন্তর আছে যার দ্বারা ওরা অনুধাবন করে না, ওদের চোখ আছে যার দ্বারা ওরা দেখে না এবং ওদের কান আছে যার দ্বারা ওরা শোনে না। ওরা চতুষ্পদ পশুর মত, বরং (তার চেয়েও) বেশি বিপথগামী। ওরাই গাফেল[২]।

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۭ اُولٰۗىِٕكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝

১. এ আয়াতটি বাহ্যত وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ (আমি জিন ও মানুষকে এ জন্যই সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আমার ইবাদত করে। –যারিয়াত, আয়াত ৫৬) এর পরিপন্থী মনে হয়। এ কারণে কোন কোন মুফাসসির ঐ আয়াতে ليعبدون শব্দের لام কে উদ্দেশ্যের অর্থে এবং বর্তমান আয়াতে لجهنم শব্দের لام কে পরিণামের অর্থে নিয়েছেন– অর্থাৎ সকলকে সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য তো ইবাদত । কিন্তু বহু সংখ্যক জিন ও মানুষ যেহেতু এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করবে না এবং পরিণামে দোযখে প্রেরিত হবে, সেহেতু এই পরিণামের দিক থেকে বলা যায় যে, ওরা যেন দোযখেরই জন্য পয়দা হয়েছে। যেমন, এ আয়াতেও فَالْتَقَطَه اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّ حَزَنًا– এর لام পরিণামের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে– ليكون (অতঃপর ফেরাওনের পরিবারের লোকজন তঁকে উঠিয়ে নিল, যাতে সে ওদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়। –কাসাস, আয়াত ৮);

কিন্তু বিজ্ঞ তাফসীরকারদের মতে এ تكلف বা কষ্টসাপেক্ষ অর্থের প্রয়োজন নেই। তাঁরা উভয় আয়াতে لام কে উদ্দেশ্যের অর্থেই মনে করেন। তবে ليعبدون এর মধ্যে উদ্দেশ্য বিধানগত (تشريعي) এবং এখানে لجهنم এর মধ্যে উদ্দেশ্যটি সৃষ্টিগত (تكويني)।

২. অর্থাৎ অন্তর, কান, চোখ সব কিছু বিদ্যমান। কিন্তু ওরা অন্তরের দ্বারা আল্লাহর আয়াত সম্বন্ধে চিন্তা করে না, আল্লাহর নিদর্শনকে গভীর দৃষ্টিসহ অধ্যয়ন করে না এবং খোদার বাণীও গ্রহণ করার (মত) কান দিয়ে শোনে না। চতুষ্পদ জন্তুর সমস্ত বোধশক্তি যেমন শুধু পানাহার ও জৈবিক চাহিদার মধ্যে সীমিত থাকে, তদ্রূপ ওদের অবস্থাও এই যে, মন-মস্তিষ্ক, হাত-পা, চোখ-কান– মোটকথা খোদাপ্রদত্ত সকল শক্তি কেবল পার্থিব ভোগবিলাস ও জৈবিক কামনা-বাসনা পূরণেই ব্যস্ত ও নিবেদিত। মানবীয় গুণাবলি ও ফেরেশতাসুলভ স্বভাব-চরিত্র অর্জনের সঙ্গে এসবের কোনই সম্পর্ক নেই।

বরং চিন্তা করলে বোঝা যায়, ওদের অবস্থা চতুষ্পদ পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। পশু তো মালিকের ডাকে সাড়া দেয়, ধমক দিলে থেমে যায়– কিন্তু এরা কখনো প্রকৃত মালিকের ডাকে কান দেয় না। অধিকন্তু পশু-পাখি সৃষ্টিগত শক্তিসমূহ দ্বারা সেই সব কাজই করে, যা স্রষ্টা ওদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন– অধিক কিছু করার যোগ্যতাই ওদের মধ্যে নেই। কিন্তু এ লোকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও রূহানী উন্নতি লাভের নিমিত্ত যে সৃষ্টিগত শক্তি ও যোগ্যতা নিহিত রাখা হয়েছিল, তা সর্বনাশা উদাসীনতা ও ভ্রান্তপথ অবলম্বনহেতু নিজেরাই নিজেদের হাতে বিনষ্ট করে দিয়েছে।

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْۤ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৮০. আল্লাহরই জন্য সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামে ডাক। আর যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বক্র পথে চলে, তাদের বর্জন কর। ওদেরকে শীঘ্রই স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে[১]।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَاۤ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ۝

১৮১. আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন এক দলও রয়েছে, যারা (মানুষকে) সত্যের পথ দেখায় এবং নিজেরা সে অনুযায়ীই ফয়সালা (ও আমল) করে[২]।

[রুকূ - ২৩]

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

১৮২. আর যারা আমার আয়াতগুলি অস্বীকার করে, নিশ্চয় আমি ওদের ধীরে ধীরে এমনভাবে পাকড়াও করব* যে, ওরা জানবেও না।

---

১. গাফেলদের অবস্থা বর্ণনার পর মুমিনদের সতর্ক করে বলা হচ্ছে যে, তোমরা গাফলত অবলম্বন করো না। গাফলত দূর করার উপায় হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ। সুতরাং তোমরা সর্বদা তাঁকে ভাল ভাল নামে ডাক এবং ভাল ভাল গুণে স্মরণ কর। আর যারা তাঁর নাম ও গুণাবলির ব্যাপারে বক্র পথ অবলম্বন করে, তাদের বর্জন কর। ওরা যেমন করবে, তেমনি ফল পাবে।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে বক্র পথ হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি এমন নাম বা গুণ প্রয়োগ করা, যার অনুমতি শরী'য়ত দেয়নি এবং যা আল্লাহ তাআলার মর্যাদা ও সম্মানের উপযুক্ত নয়। অথবা গাইরুল্লাহর প্রতি এমন নাম ও গুণের প্রয়োগ করা, যা আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। অথবা আসমাউল্লাহ-এর অর্থ বর্ণনায় নীতি-বহির্ভূত তাবীল করা অথবা সেসবকে গোনাহ (যেমন যাদু ইত্যাদি)র জন্য ব্যবহার করা। এ সবই বক্র পথ।

২. এ দল হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মদী– এ উম্মতের রাসূলের উপর দরূদ ও সালাম এবং তাঁর এই উম্মতের উপর রহমত বর্ষিত হোক। এই উম্মত সর্বপ্রকার ইফরাত ও তাফরীত (বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা) এবং বক্রতা বর্জন করে সত্যের এবং ইনসাফ ও ভারসাম্যের পথ অবলম্বন করেছে এবং এরই প্রতি অন্যদের দাওয়াত দিচ্ছে।

সামনে এই উম্মতের বিরোধীদের এবং সত্যকে যারা মিথ্যা বলে তাদের আলোচনা রয়েছে।

* **দ্বিতীয় তরজমা– '(জাহান্নামের দিকে) নিয়ে যাব ...'**

১৮৩. আর আমি ওদের অবকাশ দেব। নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত পরিপক্ক[১]।

وَاُمۡلِیۡ لَهُمۡ ؕ اِنَّ كَیۡدِیۡ مَتِیۡنٌ ﴿۱۸۳﴾

১৮৪. ওরা কি চিন্তা করে দেখেনি যে, ওদের সহচর (অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মধ্যে কোনই পাগলামী নেই? তিনি তো স্পষ্ট সতর্ককারীমাত্র।

اَوَلَمۡ یَتَفَكَّرُوۡا ٜ مَا بِصَاحِبِهِمۡ مِّنۡ جِنَّةٍ ؕ اِنۡ هُوَ اِلَّا نَذِیۡرٌ مُّبِیۡنٌ ﴿۱۸۴﴾

১৮৫. ওরা কি ভেবে দেখেনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম রাজত্ব সম্বন্ধে এবং আল্লাহ যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে এবং এ বিষয়ে যে, সম্ভবত ওদের নির্ধারিত সময় নিকটে এসে গেছে[২]? অতএব ওরা এর

اَوَلَمۡ یَنۡظُرُوۡا فِیۡ مَلَكُوۡتِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنۡ شَیۡءٍ ۙ وَّاَنۡ عَسٰۤی اَنۡ یَّكُوۡنَ قَدِ اقۡتَرَبَ اَجَلُهُمۡ ۚ

---

১. যারা অস্বীকার করার অপরাধে লিপ্ত, ওদের কোন কোন সময় তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদান করা হয় না; বরং ওদের জন্য পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাসের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। এমনকি, ওরা আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গোনাহ করতে অধিকতর দুঃসাহসী হয়ে পড়ে। এভাবে ওরা ক্রমান্বয়ে নিজেদের চরম শাস্তির যোগ্য করে তোলে। এ-ই হচ্ছে আল্লাহর ঢিল ও অবকাশ প্রদান। ওরা কিন্তু বোকামী ও নির্লজ্জতাহেতু মনে করে যে, আমাদের উপর মেহেরবানী হচ্ছে। অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে ওদের চরম শাস্তির জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।

كَيدِي –আল্লাহর কৌশল বা গুপ্ত তদ্‌বীর হচ্ছে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা, যার বাহ্যিক দিকটা রহমতস্বরূপ, আর ভিতরটা কহর ও আযাবে পরিপূর্ণ। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কৌশল অতিশয় দৃঢ় ও পরিপক্ক, যার প্রতিরোধ কোন হীলা-তদবীরেই সম্ভব নয়।

২. অর্থাৎ আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করার এবং এর মন্দ পরিণতি থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়ার কারণটা কী? এসব আয়াতের বাহক তো কোন নির্বোধ ও পাগল নয়। তিনি আজীবন তোমাদের মধ্যে রয়েছেন, তাঁর ছোট-বড় সকল অবস্থা সম্পর্কে তোমরা অবহিত, তাঁর বুদ্ধি ও জ্ঞান এবং বিশ্বস্ততা ও সততা প্রথম থেকেই প্রসিদ্ধ ও সর্বস্বীকৃত।

আর যাঁর নিকট থেকে (উক্ত আয়াতগুলি) এনেছেন, তিনি সমগ্র বিশ্বের মালিক, একচ্ছত্র রাজাধিরাজ ও সকলের স্রষ্টা। তাঁর বিশাল রাজ্যের অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত ব্যবস্থাপনা, বরং তাঁর সৃষ্ট ছোট-বড় যে কোনো জিনিস সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করলে স্পষ্ট হয় যে, তাঁর সৃষ্টিসম্পর্কিত নিদর্শনগুলিই (آيات تكوينية) তাঁর অবতারিত আয়াতগুলির সত্যতা প্রমাণ করে। এর পরও আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করার কী কারণ থাকতে পারে? ওদের বোঝা উচিত যে, সম্ভবত ওদের মৃত্যু ও ধ্বংসের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। অতএব মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য শীঘ্র প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন।

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ۝

পর আর কোন্ কথার প্রতি ঈমান আনবে[১]?

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ۙ وَيَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ۝

১৮৬. আল্লাহ যাদের বিপথগামী করেন, ওদের কোন পথপ্রদর্শক নেই এবং আল্লাহ ওদের স্বীয় অবাধ্যতার মধ্যে ছেড়ে দেন- উদ্ভ্রান্ত অবস্থায়[২]।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ۖ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ۘ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا

১৮৭. ওরা আপনাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে, তা কখন সংঘটিত হবে? আপনি বলুন, 'তার জ্ঞান তো আমার রবের নিকট আছে, তিনিই তা (অর্থাৎ কিয়ামত) প্রকাশ করবেন তার (নির্ধারিত) সময়ে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তা একটি গুরুভার বিষয়। তা তোমাদের উপর সহসাই এসে পড়বে[৩]।' ওরা আপনাকে এমনভাবে

---

১. অর্থাৎ ওরা যদি কুরআনের আয়াতের প্রতি ঈমান না আনে, তবে দুনিয়াতে আর কোন্ কালাম আছে যার প্রতি ওরা ঈমান আনবে বলে আশা করা যেতে পারে? আসল কথা হচ্ছে, এ হতভাগাদের জন্য ঈমানের দৌলত লেখাই হয়নি।

২. হেদায়েত ও গোমরাহী একমাত্র আল্লাহর মুঠিতে। তিনি ইচ্ছা না করলে হেদায়াতের সব উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও মানুষ কিছুতেই উপকৃত হতে পারে না। তবে আল্লাহর সাধারণ নিয়ম এই যে, বান্দা যখন নিজ চেষ্টা ও ইচ্ছায় এ পথে চলতে চায়, তখন তিনি হেদায়াতের তাওফীক দিয়ে দেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি জেনেশুনে পাপ ও দুষ্কৃতির পথ অবলম্বন করে, আল্লাহও ওকে সেই পথেই ছেড়ে দেন।

৩. عَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ আয়াতে শুধু মুশরিকদের أجل (মৃত্যু) এর উল্লেখ ছিল যে, তা কখন যে এসে পড়ে ওদের তা জানা নেই। বর্তমান আয়াতে সমগ্র বিশ্বের 'আজাল' অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে যে, যখন কেউ নিজ মৃত্যুর সময়ের কথাই জানে না, তখন সারা দুনিয়ার মৃত্যুর কথা কে বলতে পারে যে, তা কোন্ তারিখে এবং কোন্ সনে আসবে? একমাত্র আলেমুল গায়ব আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে এর নির্ধারিত সময়ের জ্ঞান নেই। আর তিনিই নির্ধারিত সময়ে তা ঘটিয়ে এটা প্রকাশ করে দেবেন যে, আল্লাহর জ্ঞানে এরও সময় নির্ধারিত ছিল। আকাশ ও পৃথিবীর উপর তা অতীব গুরুতর ঘটনা হবে এবং এর ইলমও অত্যন্ত গুরুভার বিষয়, যা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নেই।

এ ঘটনার বহু নিদর্শন যদিও নবীগণ (আ) বিশেষত আমাদের আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করেছেন, তবু এসব আলামত প্রকাশ পাওয়ার পরও যখন

قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

জিজ্ঞাসা করে, যেন আপনি তার বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন*। আপনি বলে দিন, 'তার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকট আছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না[১]।'

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

১৮৮. আপনি বলে দিন, 'আমি আমার নিজের ভাল-মন্দেরও মালিক নই, কিন্তু আল্লাহ যা চান (তা-ই হয়)। আর যদি আমি অদৃশ্যের কথা জানতাম, তবে নিশ্চয় বহু কল্যাণ অর্জন করে নিতাম এবং আমাকে অকল্যাণ স্পর্শ করত না[২]। আমি তো শুধু সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা– ঈমানদার লোকদের জন্য।

কিয়ামত সংঘটিত হবে, তা একেবারে বিনা নোটিসে হঠাৎ ও আকস্মিকভাবে ঘটবে, যেমন বুখারী ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'যেন আপনি তার বিষয়ে সম্যক অবহিত'।

১. এই লোকদের প্রশ্নের ঢং থেকে মনে হয়, ওরা যেন আপনার সম্পর্কে এমন মনে করে যে, আপনিও এ বিষয়ের গবেষণা এবং খোঁজ-খবরে ব্যস্ত রয়েছেন এবং খোঁজ নিয়ে এর ইলম অর্জন করতে পেরেছেন। অথচ এর ইলম একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছে। আর নবীগণ এমন বিষয়ের পিছনে পড়েন না, যা থেকে আল্লাহ কোনো কল্যাণহেতু তাঁদের বিরত করে দিয়েছেন। তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর তরফ থেকে যে বেশুমার উলূম ও কামালাত তাঁদের দান করা হয়, তা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করতে থাকা। কিন্তু এসব বিষয় সাধারণ লোকেরা কী বুঝবে?

২. বর্তমান আয়াতের সারমর্ম এই যে, কোন বান্দা যত বড়ই হোক না কেন, সে নিজে স্বতন্ত্র এখতিয়ারও রাখে না, সর্বব্যাপী ইলমেরও অধিকারী হয় না। যিনি নবীকুলের সর্দার, যাঁকে পূর্বাপর সকল মানুষের উলূমের বাহক ও পার্থিব ভাণ্ডারসমূহের কুঞ্জিধারী বানানো হয়েছে অর্থাৎ রাসূলে কারীম স., তাঁকে এ কথা ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি অন্যদের তো দূরের কথা নিজেরই কোন মঙ্গল সাধন করতে পারি না এবং কোন অমঙ্গল থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে পারি না। তবে আল্লাহর ইচ্ছা যতটুকু, ততটুকুর উপরই আমার এখতিয়ার রয়েছে।

আল্লাহ ছাড়া কারো (علم محيط) 'সর্বব্যাপী ইলম' নেই

আর আমি যদি গায়বের সব কথা জানতে পারতাম, তবে সেই সকল কল্যাণ ও কামিয়াবীও অর্জন করে নিতাম, যা গায়বের ইলম না থাকার কারণে কোন সময় হাতছাড়া হয়ে যায়। তদ্রূপ, আমাকে কখনো কোন অসুখকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হত না।

[রুকূ - ২৪]

هُوَالَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا لِيَسۡكُنَ اِلَيۡهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتۡ حَمۡلًا خَفِيۡفًا فَمَرَّتۡ بِهٖ ۚ

১৮৯. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনী, যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন পুরুষ স্ত্রীকে আবৃত করল (অর্থাৎ সহবাস করল), তখন স্ত্রী লঘু গর্ভ ধারণ করল এবং তা নিয়ে (অনায়াসে) চলাফেরা করতে

উদাহরণস্বরূপঃ إفك অর্থাৎ মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার প্রতি অপবাদের ঘটনায় অনেক দিন পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী না আসার কারণে তাঁর ছিল দারুণ অস্থিরতা ও মনোকষ্ট। তদ্রূপ বিদায় হজে তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন- لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى (আমি যদি পূর্ব থেকে তা জানতাম, যা পরে ঘটেছে তবে কুরবানীর জন্তু সঙ্গে আনতাম না।) [সহীহ বুখারী, হাদীস ১৬৫১] এ ধরনের অনেক কষ্টের ঘটনা আছে, যা সর্বব্যাপী ইলম (علم محيط) থাকলে সহজেই বন্ধ করা যেত।

এসব থেকে আরো স্পষ্ট ঘটনা এই যে, 'হাদীসে জিবরাঈল' এর কোন কোন বর্ণনায় তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে, এই প্রথম আমি জিবরাঈলকে ফিরে যাওয়ার সময় পর্যন্ত চিনিনি। (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ১৭৩) যখন তিনি উঠে চলে গেলেন তখন জানতে পারলাম যে, তিনি জিবরাঈল ছিলেন। মুহাদ্দিছগণের ব্যাখ্যানুযায়ী এই ঘটনা তাঁর একেবারে শেষ জীবনের। এতে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- ما المسئول عنها بأعلم من السائل (এ বিষয়ে যাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তিনি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশি জানেন না।)।

বোঝা গেল, আল্লাহ ছাড়া আর কারো 'সর্বব্যাপী ইলম' নেই। আর 'ইলমে গায়ব' তো দূরের কথা, দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয়ের পূর্ণ জ্ঞানও আল্লাহর দেওয়া ছাড়া হাসিল হয় না। তিনি কখনো না চাইলে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসামগ্রীও উপলব্ধি করতে পারি না।

যা হোক, এ আয়াতে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে, স্বতন্ত্র এখতিয়ার বা সর্বব্যাপী জ্ঞান নবুওয়াতের জন্য জরুরী নয়, যেমন কোন কোন জাহেল মনে করে থাকে। হাঁ, নবীগণের দায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত শরঈ বিষয়াদির জ্ঞান তাঁদের পূর্ণরূপে প্রদান করা হয়, আর সৃষ্টিসম্পর্কিত বিষয়াদির জ্ঞান আল্লাহ তাআলা যাকে যতটুকু সংগত মনে করেন, দিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বাপর সকলের উর্ধ্বে। তাঁকে আল্লাহ তাআলা এতই বিপুল পরিমাণ উলূম ও মাআরেফ দান করেছেন, যা আয়ত্ত করা কোন সৃষ্টির সাধ্যে নেই।

فَلَمَّآ اَثۡقَلَتۡ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنۡ اٰتَیۡتَنَا صَالِحًا لَّنَکُوۡنَنَّ مِنَ الشّٰکِرِیۡنَ﴿۱۸۹﴾

থাকল। তারপর যখন সে ভারী হয়ে গেল, তখন স্বামী-স্ত্রী আপন রব আল্লাহকে ডেকে বলল, 'আপনি যদি আমাদের সুস্থ-সবল সন্তান দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব'।

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَکَآءَ فِیۡمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَی اللّٰهُ عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ﴿۱۹۰﴾

১৯০. অতঃপর আল্লাহ যখন তাদের সুস্থ-সবল সন্তান দান করলেন, তখন তারা- তিনি তাদের যা দান করেছেন তার মধ্যে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করল। কিন্তু আল্লাহ তাদের শিরক থেকে বহু উর্ধ্বে১।

---

১. আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে আদম (আ) থেকে পয়দা করেছেন। আদম (আ) যাতে প্রীতি-ভালবাসা ও শান্তি হাসিল করতে পারেন, সেজন্য তাঁরই মধ্য থেকে তাঁর জোড়া (বিবি হাওয়াকে) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর উভয় থেকে বংশধারা জারী হল।

স্বামী স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পর স্ত্রী গর্ভধারিণী হল। গর্ভের প্রাথমিক অবস্থায় কোন কষ্ট ছিল না বলে স্ত্রী অনায়াসে চলাফেরা ও ওঠাবসা করতে থাকে। যখন গর্ভ ভারী হল, তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করল যে, আপনি যদি নিজ মেহেরবানীতে আমাদের সুস্থ বাচ্চা দান করেন, তবে আমরা উভয়ে (বরং আমাদের বংশধরও) আপনার শুকরিয়া আদায় করতে থাকবে।

আল্লাহ যখন তাদের এ কামনা পূর্ণ করে দিলেন, তখন তারা আল্লাহ প্রদত্ত জিনিসের মধ্যে অন্যদের অংশ সাব্যস্ত করতে শুরু করল। যেমন: কেউ বিশ্বাস করে বসল যে, অমুক জীবিত বা মৃত সৃষ্টি আমাদের এ সন্তান দান করেছে। কেউ তার নামে মানত শুরু করে দিল অথবা বাচ্চাকে দিয়ে তাকে সেজদা করাল। অথবা বাচ্চার নাম এমন রাখল, যাতে শিরকের প্রকাশ ঘটে। যেমন: আবদুল 'উয্যা' বা আবদুশ শাম্‌স ইত্যাদি। মোটকথা, যে হক প্রকৃতদাতার ছিল, তা বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত বা মুখে অন্যদের দেওয়া হল। অথচ খুব ভালভাবে বোঝার বিষয় এই যে, আল্লাহ তাআলা শিরকের সকল শ্রেণী ও স্তর থেকে বহু উর্ধ্বে।

আয়াতে কাদের কথা বলা হয়েছে?

হযরত হাসান বসরী (র) প্রমুখের মতে বর্তমান আয়াতগুলিতে হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়া (আ) এর নয়, বরং সাধারণ মানুষের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। শুরুতে অর্থাৎ هُوَ الَّذِیۡ خَلَقَکُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَۃٍ وَّ جَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا এ আয়াতাংশে ভূমিকাস্বরূপ আদম (আ) ও হাওয়া (আ) এর আলোচনা ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর আলোচনা এসে গেছে। আর এমনটি কুরআনের বহু স্থানে হয়ে থাকে

যে, ব্যক্তি থেকে আলোচনার মোড় শ্রেণীর দিকে ঘুরে যায়। যেমন এ আয়াত- وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَ جَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ - এতে যেসব গ্রহ-নক্ষত্রকে مصابيح বলা হয়েছে, সেগুলোই رجوماللشياطين নয়। তবে এস্থলে আয়াতের মোড় বিশেষ مصابيح থেকে যে কোন مصابيح এর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
এ তাফসীর অনুযায়ী جعلا له شركاء আয়াতাংশে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না।

কিন্তু অনেক সালাফ থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতগুলিতে আদম ও হাওয়ারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বলা হয় যে, ইবলীস এক নেক মানুষের বেশ ধারণ করে হাওয়ার নিকট এল এবং ধোঁকা দিয়ে তাঁর থেকে প্রতিশ্রুতি নিল যে, ছেলে পয়দা হলে তার নাম আবদুল হারেছ রাখবে। বিবি হাওয়া আদমকেও রাযী করে নিলেন। বাচ্চা জন্ম নিলে উভয়ে তার নাম রাখলেন আবদুল হারেছ। ('হারেছ' ইবলীসের নাম ছিল– ফেরেশতাদের মধ্যে সে এই নামে অভিহিত হত)।

আদম-হাওয়া (আ.) শিরক করেননি

বলা বাহুল্য, اسماء বা নামের ক্ষেত্রে আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য হয় না, আর হলেও حارث এর দিকে عبد এর إضافت দ্বারা 'হারেছ' কে (মাআযাল্লাহ) মা'বূদ সাব্যস্ত করা জরুরী হয়ে পড়ে না। একজন অতিথিপরায়ণ মানুষকে আরবগণ عبد الضيف (মেহমানের গোলাম) বলে ফেলে। এর অর্থ এ নয় যে, সেই মেযবান মেহমানের ইবাদত করে। সুতরাং 'আবদুল হারেছ' নাম রাখার এ ঘটনা সত্য হলেও এ কথা বলা যাবে না যে, (আল্লাহর পানাহ!) আদম আলাইহিস সালাম শিরক করেছিলেন। কেননা, এটা নবীদের শানে 'ইসমত' তথা নিষ্পাপতার পরিপন্থী। হাঁ, বাচ্চার এমন নাম রাখা যা থেকে বাহ্যত শিরকের গন্ধ আসে, একজন মা'সুম নবীর উচ্চ মর্যাদা ও তাওহীদের মহান চেতনার পক্ষে মুনাসিব ছিল না।

কুরআনে করীমের একটি নীতি এই যে, নৈকট্যপ্রাপ্ত নবীগণের ছোট ত্রুটি ও সামান্যতম পদচ্যুতিকেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা হয়। যেমন, ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনায় বলা হয়েছে- فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ (তিনি ভাবলেন, আমি তাঁকে ধরতে পারব না। –আম্বিয়া, আয়াত ৮৭) অনুরূপ, এখানেও আদম আলাইহিস সালামের মর্যাদার প্রতি লক্ষ করে শিরকের সন্দেহ উদ্রেককারী উক্ত নামকরণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপনার্থে এই কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে : جَعَلا له شركاء فِيْما اتهما (আল্লাহর দেওয়া জিনিসে অংশীদার বানাতে লাগলেন)। অর্থাৎ এমন নাম রাখা তাঁদের শান-উপযোগী হয়নি, যা থেকে শিরকের গন্ধ আসে, যদিও প্রকৃতপক্ষে এটা শিরক নয়। সম্ভবত এ কারণেই فقد اشركا– এর পরিবর্তে দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে— جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا

বি. দ্র. প্রখ্যাত মুফাসসির হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (র) বলেছেন, 'আবদুল হারেছ' নামকরণ সম্বন্ধে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত মারফূ হাদীসটি (৩০৭৭) তিন কারণে معلول (আপত্তিকর)। আর এ সম্পর্কে যেসব آثار (সাহাবী বা তাবেঈনদের উক্তি) রয়েছে, তা সম্ভবত আহলে কিতাবের (ইসরাঈলী) রেওয়ায়াতসমূহ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১৯১. ওরা কি এমন সব বস্তুকে শরীক করে, যারা কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারাই সৃষ্ট[১]?

أَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿١٩١﴾

১৯২. আর তারা ওদেরও (শিরককারীদের) কোন সাহায্য করতে পারে না এবং নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না।

وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٢﴾

১৯৩. আর যদি তোমরা তাদেরকে পথের দিকে ডাক*, তবে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না। তোমরা তাদের ডাক বা চুপ করে থাক, তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান।

وَإِنْ تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوْهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ﴿١٩٣﴾

১৯৪. তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাক, নিশ্চয় তারা তোমাদেরই মত বান্দা! আচ্ছা, তোমরা তাদের ডাক তো, অতঃপর তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٩٤﴾

১৯৫. তাদের কি পা আছে যার দ্বারা তারা চলে? তাদের কি হাত আছে যা দিয়ে তারা ধরে? তাদের কি চোখ আছে যা দিয়ে তারা দেখে? অথবা তাদের কি কান আছে যা দিয়ে তারা শোনে? আপনি বলে দিন, 'তোমরা তোমাদের শরীকদের ডাক, তারপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না'[২]।

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿١٩٥﴾

---

১. ইতিপূর্বে এক ধরনের শিরকের উল্লেখ হয়েছে। প্রসঙ্গত বর্তমান আয়াতগুলিতে মূর্তিপূজার খণ্ডন করা হচ্ছে। অর্থাৎ যে মূর্তি কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, বরং নিজেই তোমাদের হাতের তৈরি, তা কেমন করে তোমাদের খোদা বা মাবূদ হতে পারে?

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আর যদি তোমরা হেদায়েত লাভের জন্য তাদের ডাক (অর্থাৎ এ উদ্দেশ্যে ডাক যে, তারা তোমাদেরকে হেদায়েত দান করবে), তবে ...'

২. অর্থাৎ যেসব মূর্তিকে তোমরা মা'বূদ সাব্যস্ত করেছ এবং খোদায়ী দায়িত্ব প্রদান করেছ, তারা তোমাদের কাজে আসা তো দূরের কথা, নিজেদের হেফাজত করতেও সমর্থ নয় এবং তারা সেই সব গুণ থেকেও বঞ্চিত, যা দ্বারা কোন সৃষ্টি অন্য সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পারে। –আর যদিও তোমরা তাদের বাহ্যিক হাত-পা, চোখ-কান সবই বানিয়ে থাক, কিন্তু এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সেসব শক্তি নেই, যাতে এগুলিকে অঙ্গ-প্রতঙ্গ

১৯৬. 'আমার সাহায্যকারী তো আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এবং তিনি নেককারদের সাহায্য করেন[১]।'

اِنَّ وَلِیِّ اللّٰهُ الَّذِیْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ یَتَوَلَّى الصّٰلِحِیْنَ۝

১৯৭. আর তোমরা তিনি ছাড়া যাদের ডাক, তারা তোমাদেরও সাহায্য করতে পারে না এবং নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না।

وَالَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَاۤ اَنْفُسَهُمْ یَنْصُرُوْنَ۝

১৯৮. আর যদি তোমরা তাদেরকে পথের দিকে ডাক*, তবে তারা শুনবে না। আর আপনি তাদের দেখবেন যে, আপনার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা (কিছুই) দেখে না[২]।

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا یَسْمَعُوْا ؕ وَتَرٰىهُمْ یَنْظُرُوْنَ اِلَیْكَ وَهُمْ لَا یُبْصِرُوْنَ۝

বলা যেতে পারে। তোমাদের ডাকে তারা কৃত্রিম পা দ্বারা চলে আসতে পারে না, হাতের দ্বারা কোন জিনিস ধরতেও পারে না, চোখের দ্বারা দেখতে পারে না, কানের দ্বারা কোন কথা শুনতেও পারে না। তোমরা গলা ফাটিয়ে ফেললেও তারা তোমাদের আওয়াজ শোনার এবং তাতে সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য রাখে না। তোমরা তাদের সামনে চিল্লাও বা চুপ থাক, উভয় অবস্থাই সমান– এতে তাদের উপকারও নেই, কোন লাভও নেই।

আশ্চর্য এই যে, যেসব জিনিস তোমাদেরই মত অক্ষম ও অসহায়, বরং অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের গুণাবলিতে তোমাদের চেয়েও নিকৃষ্ট, তাদের খোদা বানানো হচ্ছে। আর যে ব্যক্তি এসবের বিরোধিতা করে, তাকে ক্ষতি হওয়ার ধমক শোনানো হচ্ছে।

মক্কার মুশরিকরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলত, আপনি আমাদের দেব-দেবীর সঙ্গে বেয়াদবী করা থেকে বিরত হোন। নতুবা বলা যায় না, কোন বিপদ আপনার উপর এসে পড়ে! وَ یُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِیْنَ مِنْ دُوْنِهٖ (ওরা আপনাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের ভয় দেখায়। –যুমার, আয়াত ৩৬)— এরই উত্তর قل ادعوشركائكم الخ আয়াতে প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা নিজেদের সকল শরীকদের ডাক এবং আমার বিরুদ্ধে নিজেদের সকল কৌশল ও ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ কর। অতঃপর আমাকে এক মিনিটেরও অবকাশ দিয়ো না। দেখা যাক, তোমরা আমার কী অনিষ্ট করতে পার।

১. অর্থাৎ যিনি আমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন এবং আমাকে রিসালাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, তিনিই সারা দুনিয়ার মোকাবিলায় আমার সহায়তা ও হেফাজত করবেন। কেননা, তিনিই স্বীয় নেক বান্দাদের সাহায্য ও হেফাজত করে থাকেন।

* **দ্বিতীয় তরজমা**– 'হেদায়েত লাভের জন্য তাদের ডাক ...'

২. অর্থাৎ বাহ্যত চোখ তৈরী করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলিতে দর্শন-ক্ষমতা কোথায়?

১৯৯. আপনি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকাজের আদেশ করুন এবং অজ্ঞ লোকদের এড়িয়ে চলুন।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ۝١٩٩

২০০. আর যদি শয়তানের প্ররোচনা আপনাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[১]।

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۗ إِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝٢٠٠

২০১. যারা (আল্লাহকে) ভয় করে, তাদের যখনই শয়তানের কোন কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে, তারা (আল্লাহকে) স্মরণ করে। ফলে তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ۝٢٠١

২০২. আর যারা শয়তানদের ভাই, শয়তানরা গোমরাহীতে তাদের সহযোগিতা করতে থাকে এবং (এ বিষয়ে) কোন ত্রুটি করে না[২]।

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ۝٢٠٢

---

১. خذ العفو এর একাধিক অর্থ করা হয়েছে। সারমর্ম এই যে, কঠোরতা ও উগ্রতা পরিহার করা কাম্য। একেই বিজ্ঞ মুতারজিম (র) বলেছেন, 'ক্ষমার অভ্যাস করুন'।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

বিগত আয়াতগুলিতে মূর্তিপূজকদের যে বোকামী ও অজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে, তাতে জাহেল মুশরিকরা অসন্তুষ্ট হয়ে কোন অশুভ আচরণ অথবা খারাপ উক্তি করার প্রবল সম্ভাবনা ছিল। এ জন্য উপদেশ দান করা হয়েছে যে, সংগত কথা বলতে থাকুন এবং জাহেলদের থেকে পৃথক থাকুন। অর্থাৎ ওদের জাহেলী আচার-ব্যবহারে বিবাদে জড়ানোর প্রয়োজন নেই। যখন সময় আসবে, মুহূর্তের মধ্যেই ওদের সকল হিসাব-কিতাব নিয়ে নেওয়া হবে।

واما ينزغنك.. আর যদি কখনো মানুষ হিসাবে আপনি ওদের অভদ্র আচরণে রাগান্বিত হয়ে পড়েন এবং অভিশপ্ত শয়তান দূর থেকে উস্কানী দিয়ে আপনাকে এমন আচরণ করতে উত্তেজিত করে ফেলে, যা কল্যাণের পরিপন্থী অথবা যা আপনার মহান চরিত্র (خلق عظيم) এবং সহনশীলতা ও গাম্ভীর্যের উপযোগী নয়, তবে আপনি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন। আপনার নিষ্পাপতা ও মর্যাদার সামনে ওর কোন কৌশল চলতে পারবে না। কেননা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা– যিনি প্রত্যেক আশ্রয়প্রার্থীর কথা শুনেন এবং প্রত্যেক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত– তিনিই আপনার হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন।

২. ইতিপূর্বে শুধু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছিল, এখন সাধারণ মুত্তাকীদের (অর্থাৎ পরহেজগারদের) অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে। অর্থাৎ, সাধারণ মুত্তাকীদের

وَاِذَا لَمۡ تَاۡتِهِمۡ بِاٰیَۃٍ قَالُوۡا لَوۡ لَا اجۡتَبَیۡتَهَا ؕ قُلۡ اِنَّمَاۤ اَتَّبِعُ مَا یُوۡحٰۤی اِلَیَّ مِنۡ رَّبِّیۡ ۚ هٰذَا بَصَآئِرُ مِنۡ رَّبِّکُمۡ وَهُدًی وَّرَحۡمَۃٌ لِّقَوۡمٍ یُّؤۡمِنُوۡنَ ۝

২০৩. আপনি যখন ওদের কাছে (ওদের দাবি করা) কোন নিদর্শন উপস্থিত না করেন, তখন বলে, 'আপনি কেন নিজে বাছাই করে অমুক নিদর্শন উপস্থিত করেন না?' আপনি বলে দিন, 'আমি তো তারই অনুসরণ করি, যা আমার রবের পক্ষ থেকে ওহীরূপে আমার নিকট পাঠানো হয়। এ (কুরআন) তোমাদের রবের পক্ষ থেকে প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষামালা এবং ঈমানদার লোকদের জন্য হেদায়েত ও রহমত[১];'

প্রতি শয়তানের ধাবিত হওয়া এবং তাদের উপর আক্রমণ করে বসাটা অসম্ভব নয়। তবে শয়তানের প্ররোচনার ফলে দীর্ঘ সময় গাফলতে পড়ে থাকা মুত্তাকীদের শান নয়। বরং সামান্য গাফলত হল, আর অমনি খোদাকে স্মরণ করত সচেতন হয়ে উঠল, হোঁচট খেল আর সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিল। সামলে ওঠামাত্র চোখ খুলে গেল, নেকী ও বদীর পরিণাম চোখের সামনে ভাসতে লাগল এবং অতি সত্বর অসমীচীন কর্ম থেকে বিরত হয়ে গেল –এটাই তাদের শান।

পক্ষান্তরে, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই এবং যাদেরকে শয়তানের ভাই-বেরাদার বলা উচিত তাদের অবস্থা এই যে, একদিকে শয়তানরা ওদের অবিরাম গোমরাহীর মধ্যে টেনে নিতে থাকে এবং এ ব্যাপারে সামান্য পিছপাও হয় না। অন্যদিকে এই লোকেরা শয়তানদের অনুকরণ ও অনুসরণে ত্রুটি করে না।

যা হোক, মুত্তাকীর শান এই যে, শয়তান তাকে প্ররোচিত করামাত্র আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে- দেরি করবে না। নতুবা গাফলতের মধ্যে দীর্ঘ সময় পড়ে থাকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগও হবে না।

১. যখনই ওহী আসতে দেরি হত, কাফেররা ঠাট্টা করে বলত– এখন কোন আয়াত বানিয়ে নিয়ে আসেন না কেন? বস্তুত সমস্ত কুরআন আপনিই রচনা করেছেন। (আল্লাহর পানাহ!) –আবার কখনও তাঁকে বিব্রত করার মানসে এমন নিদর্শন তলব করত, যা দেখানো খোদায়ী হেকমতের পরিপন্থী ছিল। যখন তিনি দেখাতে অস্বীকার করতেন, তখন বলত– لو لا اجتبيتها অর্থাৎ আপনার খোদাকে বলে আমাদের ফরমায়েশী নিদর্শন কেন নিয়ে আসেন না?

উভয় কথার জওয়াবে বলা হয়েছে– قل إنما اتبع مايوحى إليّ من ربي অর্থাৎ ওদের বলে দিন যে, লোকদের কথায় আল্লাহর কাছে সেই জিনিস চাওয়া, যা প্রদান করা তাঁর হেকমতের পরিপন্থী বা যা চাওয়ার অনুমতি নেই– এ নবীর কাজ নয়। তাঁর দায়িত্ব তো হচ্ছে, খোদা যা কিছু ওহী প্রেরণ করেন তা কবূল করা, সে অনুসারে আমল করা এবং অন্যদের আমল করার জন্য দাওয়াত দেওয়া।

২০৪. আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনযোগ দিয়ে তা শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়[১]।

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝٢٠٤

২০৫. আর তুমি স্বীয় রবকে কাকুতি-মিনতি ও ভয়ের সাথে সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ কর– আপন মনে এবং চিৎকার অপেক্ষা নীচু আওয়াজে[২] এবং গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ۝٢٠٥

অবশ্য তোমরা যে কোন আয়াত অবতীর্ণ করার অথবা কোন বিশেষ নিদর্শন প্রকাশ করার দাবী করছ– তো কথা এই যে, যে কুরআন সমগ্র জগতের জন্য প্রজ্ঞাপূর্ণ কথামালা ও উপদেশসমূহের ভাণ্ডার এবং মু'মিনদের জন্য বিশেষ ধরনের হেদায়েত ও রহমতের সমাহার, সেই কুরআন থেকে শ্রেষ্ঠ আয়াত আর কী হবে এবং তা থেকে বেশি মর্যাদাশালী মুজিযা (বা অলৌকিক বিষয়) আর কী হতে পারে? সুতরাং তোমরা এমন কুরআনকে কেন গ্রহণ করছ না?

১. কুরআন যখন এমন অফুরন্ত সম্পদ এবং ইলম ও হেদায়াতের ভাণ্ডার, অতএব শ্রোতাদের উপর এর তেলাওয়াতের হক এই যে, তারা কুরআনের দিকে পূর্ণ ফিকির ও মনোযোগের সাথে কান লাগাবে, তার বাণী গ্রহণ করার মানসিকতা নিয়ে শুনবে এবং সব রকমের কথাবার্তা, শোরগোল ও চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আদবের সাথে চুপ করে থাকবে- যাতে আল্লাহর রহমত ও মেহেরবানীর অধিকারী হতে পারে। যদি কাফেরও এভাবে কুরআন শোনে, তবে আল্লাহর রহমতে ঈমান লাভে ধন্য হয়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। আর পূর্ব থেকে মুসলমান থাকলে ওলী হয়ে যেতে পারে অথবা এ আমলের নির্ধারিত আজর ও ছওয়াব তো অবশ্যই লাভ করবে।

এই আয়াত থেকে অনেক আলেম এই মাসলাও বের করেছেন যে, নামাযে ইমাম কেরাত পড়ার সময় মুক্তাদিকে শুনতে ও চুপ থাকতে হবে। যেমন, আবু মূসা (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : وإذا قرأ فانصتوا (যখন নামাযে ইমাম কেরাত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে। সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৪০৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ৯২২; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৬৪০) সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে আমি এর উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছি।

২. শ্রেষ্ঠ যিকির তো কুরআন কারীমই। এর আদব ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এখন সাধারণ যিক্রুল্লাহর কিছু আদব-কায়দা বর্ণিত হচ্ছে।

যিক্রুল্লাহর আসল রূহ এই যে, যা মুখে বলবে তার প্রতি অন্তর দ্বারা ধ্যান রাখবে– যাতে যিকিরের পূর্ণ ফায়দা প্রকাশ পায় এবং মুখ ও অন্তর উভয় অঙ্গই আল্লাহর স্মরণে মশগুল

২০৬. যারা তোমার রবের সান্নিধ্যে রয়েছে, নিশ্চয় তারা তাঁর ইবাদত করতে অহংকার করে না এবং তারা তাঁর তাসবীহ পাঠ করে ও তাঁকেই সেজদা করে[১]।

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۩

হয়। যিকির করার সময় অন্তরে নম্রতা থাকা উচিত। সত্যিকার আকর্ষণ ও ভয়-ভীতির সাথে আল্লাহকে ডাকবে, যেমন কোন তোষামোদকারী, ভীতবিহবল মানুষ কাউকে ডেকে থাকে। যিকিরকারীর কণ্ঠস্বরে, আওয়াজে বিনয় ও ভয়ের ভাবও প্রতিফলিত হওয়া উচিত। যিকির ও যার যিকির করা হয় অর্থাৎ আল্লাহর আজমত ও মাহাত্মের কারণে আওয়াজ অনুচ্চ হওয়াই স্বাভাবিক। وَ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (রহমানের ভয়ে ক্ষীণ হয়ে যাবে সকল আওয়াজ, ফলে তুমি মৃদু পদধ্বনী ছাড়া কিছু শুনবে না। -ত্বহা, আয়াত ১০৮); সে জন্যই বেশি চিল্লাতে নিষেধ করা হয়েছে। মৃদু আওয়াজে অনুচ্চ বা কিছুটা উচ্চস্বরে আল্লাহর যিক্‌র করলে আল্লাহ তার যিকিরকারীকে স্মরণ করবেন। আশেক তথা খোদাপ্রেমিকের জন্য এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কী হতে পারে?

১. অর্থাৎ রাতদিন বিশেষ করে ভোর ও সন্ধ্যার সময়ে তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল থেকো না। যেখানে তাঁর বন্দেগী করতে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণেরই কোন সংকোচ নেই, বরং সদাসর্বদা তাঁরই স্মরণে লেগে থাকে, তাঁকেই সেজ্‌দা করে থাকে, সেখানে মানুষের পক্ষে তাঁর যিকির এবং ইবাদত ও সেজদা থেকে গাফেল না থাকা আরো বেশি প্রয়োজন। সে মত এ আয়াত পাঠ করেও সেজদা করা উচিত।

সূরা আনফাল[১]

سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ৮ । ৭৫ আয়াত । ১০ রুকূ । মাদানী

آیاتها ۷۵، رکوعاتها ۱۰

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. **বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্ট কিছু ঘটনা**

এ সূরা মাদানী, বদরের যুদ্ধের পর অবতীর্ণ হয়েছে।

মক্কার তের বছরের জীবনে মুষ্টিমেয় মুসলমানদের উপর মুশরিকরা যে মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক জুলুম-নির্যাতন চালু রেখেছিল এবং নিপীড়িত মুসলমানগণ যে অপরিসীম সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে এই ভয়ঙ্কর বিপদ, কষ্ট ও যাতনা সহ্য করেছিলেন– তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক নজীরবিহীন ঘটনা। কুরায়শ ও ওদের সহযোগীরা অত্যাচার ও নির্যাতনের কোন দিকই বাকী রাখেনি। তা সত্ত্বেও মুসলমানদের আল্লাহ তাআলা অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে হাত তোলার অনুমতি দেননি। সব্র ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষার সর্বশেষ ধাপ এই ছিল যে, মুসলমানগণ পবিত্র মাতৃভূমি, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ সবকিছুই বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য ঘর-বাড়ী থেকে বের হয়ে পড়লেন।

যখন মুশরিকদের জুলুম ও ঔদ্ধত্য এবং মুসলমানদের দুঃখকষ্ট ও অসহায়ত্ব সীমা অতিক্রম করে গেল, অন্যদিকে ঈমানদারদের অন্তর দেশ ও জাতি, স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ, মোটকথা আল্লাহ ছাড়া সবকিছুর বন্ধন থেকে নির্লিপ্ত ও পবিত্র হয়ে একমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত এবং তাওহীদ ও এখলাসের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেল, এবং তাতে গাইরুল্লাহর কোন স্থান থাকল না– তখন এই নির্যাতিত লোকগুলিকে (যারা বিগত ১৩ বছর ধরে লাগাতার জুলুম-নির্যাতন সয়ে আসছিল এবং হিজরত করেও নিরাপত্তা লাভ করতে পারছিল না) জালেমদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ করার ও প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি প্রদান করা হল :

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ. الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ (الحج :٣٩-٤٠)

[যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদের, যাদের সঙ্গে কাফেররা যুদ্ধ করে, কারণ তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আর আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম, যাদের অন্যায়ভাবে স্বীয় ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ'।]

কিন্তু মুসলিমগণ আগে বেড়ে মক্কা শরীফের উপর চড়াও হবে, এতে পবিত্র মক্কার মর্যাদা অন্তরায় ছিল। এ জন্য হিজরতের পর প্রায় দেড় বছর পর্যন্ত মুসলমানদের কর্মপদ্ধতি ছিল– শাম, ইয়ামান ইত্যাদি দেশের সাথে মক্কার মুশরিকদের যে বাণিজ্য সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল, তা ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত করে জালেমদের আর্থিক অবস্থা দুর্বল করা এবং নিজেদের আর্থিক

অবস্থা মজবুত করা। এ উদ্দেশ্যেই হিজরতের প্রথম বছর 'আবওয়া', 'বুওয়াত', 'উশায়রা' ইত্যাদি ছোট ছোট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হাদীস ও সীরাতগ্রন্থে এগুলির বর্ণনা রয়েছে।

হিজরী দ্বিতীয় সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এক বিরাট বাণিজ্যদল শামদেশের দিকে যাত্রা করেছে। যখন কুরায়শের এই বাণিজ্য কাফেলা এক হাজার উট ও পঞ্চাশ হাজার দিনারের সম্পদসহ শাম থেকে প্রত্যাবর্তন করছিল, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অবগত হলেন। এবং (মুসলিম শরীফের এক হাদীস [১৭৭৯] মতে) তিনি সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, এদের আক্রমণ করা উচিত। তবারীর বর্ণনা (১১/৪৩-৪৪) অনুযায়ী তখন অনেকেই অভিযানে বের হতে গড়িমসি করলেন। কারণ, তাদের এমন কোন বিরাট যুদ্ধের আশঙ্কা ছিল না, যার জন্য বিশেষ বাহিনী প্রয়োজন হতে পারে। দ্বিতীয়ত, আনসারদের সম্বন্ধে এমন ধারণা করা হত যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তখনই সাহায্য ও সহযোগিতার ওয়াদা করেছেন, যখন কোন জাতি মদীনার উপর চড়াও হবে অথবা তাঁর উপর আক্রমণে সচেষ্ট হবে। নিজেরা অগ্রসর হয়ে হামলা চালানোর কথা তাঁদের ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

এ অবস্থা লক্ষ্য করে হযরত আবু বকর, হযরত উমর ও আনসার-সর্দার সাআদ ইবনে উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহুম উৎসাহব্যঞ্জক ভাষন দিলেন। শেষ পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন শতের কিছু বেশি সাহাবার জামাত নিয়ে কুরায়শের ঐ কাফেলার দিকে রওনা করলেন। অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত কোন বড় সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা ছিল না বলে লোকসংখ্যা, আসবাবপত্র, অস্ত্রসস্ত্র ইত্যাদির প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অল্প সময়ের মধ্যে যারা সমবেত হয়ে গেলেন, তারাই মোটামুটি আয়োজনসহ যাত্রা করলেন। এজন্যই বুখারীর হাদীসে (৪৪১৮) হযরত কা'ব বিন মালেক রা. বলেন, যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদের দোষারোপ করা হয়নি। কারণ, হুযূর সা. শুধু বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে বের হযেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা রীতিমত যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করে দিলেন।

আবু সুফয়ান হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ মক্কায় লোক পাঠাল। সেখান থেকে কুরায়শ সর্দাররা প্রায় এক হাজার লোকের বাহিনী ও পূর্ণ সাজসরঞ্জাম নিয়ে মদীনাপানে যাত্রা করল।

হুযূর যখন 'সাফরা' নামক স্থান থেকে জানতে পারলেন যে, আবু জাহলসহ বড় বড় কাফের সর্দারদের নেতৃত্বে মুশরিক বাহিনী ধেয়ে আসছে, তখন এই অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন, তোমাদের সামনে দুটি দল রয়েছে– বাণিজ্য-কাফেলা ও সামরিক বাহিনী। আল্লাহর ওয়াদা এই যে, দুটির যে কোন একটির উপর তোমাদের জয়ী করবেন। তোমরা বল, কোন দলের দিকে অগ্রসর হতে চাও? যেহেতু তাঁরা সামরিক বাহিনীর মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে আসেননি, সেহেতু নিজেদের সংখ্যা, সামান ইত্যাদির স্বল্পতা লক্ষ করে কিছু লোক অভিমত দিল যে, বাণিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণ করাই শ্রেয় ও সহজতর। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রায়ে

খুশী ছিলেন না। তখন হযরত আবু বকর, উমর ও মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ বীরোচিত জওয়াব দিলেন এবং পরিশেষে হযরত সা'দ ইবনে মুআযের ভাষনের পর সাব্যস্ত হল যে, সামরিক বাহিনীরই মোকাবেলা করা হোক।

সে মতে বদরপ্রান্তরে উভয় বাহিনীর মোকাবেলা হয়। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের বিরাট সাফল্য দান করলেন। কাফেরদের সত্তরজন বড় বড় সর্দার নিহত হয় এবং সত্তরজন বন্দী হয়। এভাবে কুফরের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। –এই সূরায় এই ঘটনারই খণ্ড খণ্ড চিত্র ও আনুষঙ্গিক বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

সংশয় নিরসণ

যে সকল লোকের ধারণা এই যে, এই সফরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরু থেকেই সেই সৈন্য বাহিনীর মোকাবেলায় বের হয়েছিলেন, যারা নিজেরাই মদীনা আক্রমনে অগ্রসর হচ্ছিল, বাণিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণ করার নিয়ত তিনি আগাগোড়া কখনই করেননি– তারা প্রকৃতপ্রস্তাবে নিজেদেরই মনগড়া একটি মতবাদের জন্য সমগ্র হাদীস ও সীরাত ভাণ্ডার এবং কুরআনের ইঙ্গিতসমূহকে বিসর্জন দিতে চায়। আমরা এই কথা বুঝতে অক্ষম যে, যেই কাফের যুদ্ধবাজদের কবল থেকে মুসলমানদের জান, মাল কোন কিছুই নিরাপদ ছিল না, তাদের জান ও দেহের ক্ষতি করা তো জায়েয হবে, কিন্তু তাদের বাণিজ্যিক ও আর্থিক ক্ষতি সাধন হবে সভ্যতা ও মানবতার পরিপন্থী। অর্থাৎ ওদের প্রাণ তো জুলুম ও দুষ্কৃতি, কুফর ও নাফরমানীর কারণে রক্ষা পাবে না, কিন্তু ধন-সম্পদ নিরাপদ থাকবে– যেন, জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলে হোক, কিন্তু জীবনের উপকরণ থেকে যেন বঞ্চিত না হয়!!

রইল তাদের এ দাবি যে, যারা নিজেরা অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করেনি, তাদের উপর মুসলমানদের জন্য আক্রমণ করা জায়েয নয়। কারণ, তা وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ (যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। –বাকারা : ১৯০) এই হুকুমের খেলাফ হবে। –এহেন দাবি সঠিক নয়। কারণ, আয়াতটি হিজরতের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল, অপরদিকে এর পর সেসব আয়াত নাযিল হয়, যাতে সব রকমের জেহাদের হুকুম দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মক্কার কাফেররা মুসলমানদের উপর সর্বপ্রকার নির্যাতন ও আক্রমণ করেছিল এবং ভবিষ্যতের জন্যও হুমকি-ধমকি দিয়ে যাচ্ছিল। অতএব এহেন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উল্লিখিত আয়াতেরও পরিপন্থী নয়।

তদুপরি এও চিন্তা করা দরকার যে, 'তোমরা আক্রমনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর' শুধু এতটুকু কথায় এটা জরুরি হয়ে পড়ে না যে, কোন অবস্থাতেই আক্রমন করা ছাড়া কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না।

উল্লেখ্য যে, আমার প্রিয় মওলবী মুহাম্মদ ইয়াহ্য়া, তাঁর লিখিত الجهاد الكبير পুস্তিকায় বিস্তারিতভাবে এই মাসলার আলোচনা করেছে। আর আমিও الشهاب নামক রেসালায় কিছুটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি এবং এখানেও কিছু কিছু বিষয় লেখা হবে ইনশাআল্লাহ।

১. তারা আপনাকে গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, 'গনীমতের মাল আল্লাহ ও রাসূলের। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের পরস্পরের সম্পর্ক সংশোধন কর। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।'

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۝

২. ঈমানদার তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত ও কম্পিত হয় এবং যাদের সম্মুখে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয় এবং যারা আপন রবেরই উপর নির্ভর করে—

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ۝

৩. যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিযিক দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۝

৪. এমন লোকেরাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে বহু মর্যাদা এবং ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক[১]।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ۝

---

১. বদর যুদ্ধে গনীমতের যে মাল হস্তগত হয় তার ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছিল। যে সকল যুবক সম্মুখ সারি থেকে যুদ্ধ করেছিলেন, তারা সমস্ত গনীমতের মালকে তাদের অধিকার মনে করতেন। আর যে সকল প্রবীন লোক যুবকদের সহযোগিতায় ছিলেন, তাঁদের কথা ছিল, আমাদের সাহায্যের কারণেই বিজয় লাভ হয়েছে। সুতরাং গনীমত আমাদের প্রাপ্য হওয়া উচিত। আর একটি জামাত, যারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাহারায় ছিলেন, তারা নিজেদের উক্ত মালের অধিকারী মনে করতেন।

বর্তমান আয়াতগুলিতে বলে দেওয়া হয়েছে, বিজয় একমাত্র আল্লাহর সাহায্যে হয়ে থাকে। অন্য কারো শক্তিতে নয়। সুতরাং মালের আসল মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহ স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে যেমন হুকুম দেবেন, সেই অনুসারে গনীমতের মাল বণ্টিত হবে। (এই হুকুমের বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে আসবে)।

প্রকৃত মুসলমানদের কাজ এই যে, তারা প্রত্যেক ব্যাপারে খোদাকে ভয় করবে, পরস্পরে ঐক্য ও বন্ধুত্বের সাথে বাস করবে, সামান্য সামান্য বিষয়ে বিবাদ করবে না, নিজেদের মতামত ও আবেগ-উচ্ছ্বাসকে উপেক্ষা করে একমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মানবে, যখন খোদার নাম এসে পড়বে তখন ভয়-ভীতিতে কেঁপে উঠবে। আল্লাহর আয়াত ও আহকাম

كَمَآ اَخۡرَجَكَ رَبُّكَ مِنۡۢ بَيۡتِكَ بِالۡحَقِّ ۪ وَاِنَّ فَرِيۡقًا مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ لَكٰرِهُوۡنَ ۝

৫. যেমন আপনার রব আপনাকে আপনার ঘর থেকে যথাযথ কারণে বের করেছিলেন, অথচ ঈমানদারদের একদল (তাতে) অসন্তুষ্ট ছিল;

يُجَادِلُوۡنَكَ فِي الۡحَقِّ بَعۡدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوۡنَ اِلَى الۡمَوۡتِ وَهُمۡ يَنۡظُرُوۡنَ ۝

৬. তারা আপনার সঙ্গে সত্য বিষয়ে বিতর্ক করছিল– তা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও। (মনে হচ্ছিল), তাদের যেন মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর তারা নিজ চোখে (তা) দেখছে[১]।

শ্রবণে তাদের ঈমান ও বিশ্বাস অধিক মজবুত হতে থাকবে। এমন মজবুত ও শক্তিশালী হয়ে যাবে যে, প্রত্যেক ব্যাপারে তাদের আসল ভরসা ও আস্থা খোদা ছাড়া আর কারো উপর থাকবে না, তাঁরই সম্মুখে দাসত্বের মাথা নত করে দেবে। তাঁরই নামে ধন-সম্পদ খরচ করবে। মোটকথা, আকীদা, চরিত্র, আমল ও সম্পদ– সব কিছুর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করার চেষ্টায় থাকবে।

এমন লোকদেরই সাচ্চা ও পাক্কা ঈমানদার বলা যেতে পারে এবং এরাই খোদার নিকট নিজ নিজ মর্যাদানুসারে বড় বড় মাকাম ও মর্তবায় ভূষিত হবে। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করে তাদেরকে সম্মানজনক জীবিকা লাভে ধন্য করা হবে। رزقنا الله بفضله ومنه

১. অর্থাৎ চিন্তা করে দেখ, এই (বদরের) যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে আল্লাহ তাআলার সমর্থন, সাহায্য ও তাওফীক মুসলমানদের পক্ষে কার্যকর থেকেছে। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই দীন ইসলামের সাহায্যার্থে স্বীয় নবীকে একটি ন্যায়সংগত বিষয় অর্থাৎ কাফেরদের সাথে জেহাদ করানোর জন্য মদীনার বাইরে বদর-প্রান্তরে নিয়ে আসলেন, আর তখন মুসলমানদের একটি দল কুরায়শ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে রাযী ছিল না। তারা এমন একটি সত্য ও নির্ধারিত বিষয়ে মতবিরোধ করছিল, যে সম্পর্কে পয়গম্বর মারফত তাদের জানা হয়ে গিয়েছিল যে, তা আল্লাহর বলা একটি অটল বিষয় (অর্থাৎ জেহাদের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের বিজয়ী হওয়া)। আবু জাহলের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করা তাদের নিকট এমনই কঠিন ও কষ্টকর ছিল, যেমন কোন ব্যক্তির পক্ষে জেনেশুনে মৃত্যুর মুখে যাওয়া কষ্টকর হয়ে থাকে। এ সত্ত্বেও খোদা নিজ তাওফীকে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গেলেন এবং স্বীয় সাহায্যে বিজয়বেশে ফিরিয়ে আনলেন।

সুতরাং যেমনিভাবে খোদারই সাহায্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ যুদ্ধে মহাবিজয় লাভ হল, তদ্রূপ গনীমতের মালকেও তাঁরই মনে করা উচিত। তিনি স্বীয় পয়গম্বর মারফত যেখানে বলেন, সেখানে তা খরচ কর।

বি. দ্র. كَمَا أَخْرَجَكَ الخ এর كاف (অব্যয়)কে আমি শুধু সাদৃশ্যের অর্থে গ্রহণ করিনি, বরং (মুফাসসির) আবু হাইয়্যান এর তাহকীক অনুযায়ী تعليل (কারণ বর্ণনার) অর্থেও নিয়েছি। আর أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ الخ –এ আয়াতকে আমি الأنفال لله والرسول এর একটি কারণ

৭. স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে দুই দলের যে কোন একটির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন যে, তা তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে, আর তোমরা মনে-প্রাণে চাচ্ছিলে, যেটি নিষ্কণ্টক তা তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক। কিন্তু আল্লাহ চাচ্ছিলেন, তিনি তাঁর বাণীসমূহের* দ্বারা সত্যকে সত্যে পরিণত করবেন এবং কাফেরদের নির্মূল করে ফেলবেন,

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৮. যাতে তিনি সত্যকে সত্যে পরিণত করেন এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধীরা অপছন্দ করে[১]।

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

সাব্যস্ত করেছি (সুতরাং এ আয়াতগুলোর সারকথা এই যে, যেহেতু আল্লাহ তাআলাই আপনাকে ঘর থেকে বের করে যুদ্ধে অবতীর্ণ করিয়েছেন এবং তিনিই বিজয় দান করেছেন– সেহেতু গনীমতের মালও তাঁরই, তাঁর হুকুম অনুসারেই তা বণ্টন করা উচিত)।

তাছাড়া বিখ্যাত তাফসীর 'রূহুল মাআনী'র ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমি আয়াতের তাফসীরে ইশারা করে দিয়েছি যে, أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ এর মধ্যে শুধু ঘর থেকে বের হওয়ার মুহূর্তটি উদ্দেশ্য নয়, বরং ঘর থেকে বের হওয়া থেকে জেহাদে প্রবেশ করা পর্যন্ত পুরো সময় উদ্দেশ্য, যে সময়ের মধ্যে– وان فَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ ইত্যাদি অবস্থাও ঘটেছিল। আয়াতে উল্লিখিত এই দলের অসন্তুষ্টি তো ঠিক মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় প্রকাশ পেয়েছিল, যা আমরা এ সূরার শুরুতে বয়ান করেছি। আর বিতর্কের ঘটনা খুবসম্ভব সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মুশরিক সৈন্যবাহিনীর খবর জানার পর 'সাফরা' নামক স্থানে ঘটে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা– 'বিধানাবলির'**

১. মুসলিমগণ বাণিজ্য-কাফেলার উপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল, যাতে কাঁটাও না বিঁধে, সেই সঙ্গে বহু ধন-সম্পদও হস্তগত হয়। কিন্তু খোদার অভিপ্রায় ছিল, এ মুষ্টিমেয় সম্বলহীন জামাতকে বিপুল জনবলে বলীয়ান সমরবাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা করিয়ে স্বীয় বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য প্রতিপন্ন করা এবং মক্কার কাফেরদের নির্মূল করা, যাতে তাঁর ওয়াদাসমূহের সত্যতা বিস্ময়কররূপে প্রকাশিত হয়ে যায় এবং কাফেরদের নাকের ডগায় সত্য সত্যরূপে এবং মিথ্যা মিথ্যারূপে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে যায়।

বস্তুত তাই হল। বদরের যুদ্ধে কুরায়শদের সত্তরজন সরদার নিহত হয়। ওদের অন্যতম ছিল আবু জাহল। আর ওদের সত্তরজন বন্দী হয়। এভাবে কুফরের কোমর ভেঙ্গে যায় এবং মক্কার মুশরিকদের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়ে।

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝٩

৯. (স্মরণ কর), যখন তোমরা আপন রবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, ফলে তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে (সুসংবাদ দিলেন) যে, 'আমি পর-পর আগমনকারী এক হাজার ফেরেশতার দ্বারা তোমাদের সাহায্য করব।'

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝١٠

১০. আর আল্লাহ তা (অর্থাৎ ফেরেশতা দিয়ে সাহায্যের ব্যবস্থা) করেছেন– শুধু সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এবং যাতে এর দ্বারা তোমাদের অন্তর শান্ত হয়ে যায়। আর সাহায্য তো শুধু আল্লাহরই পক্ষ থেকে আসে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[১]।

[রুকূ - ২]

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝١١

১১. (স্মরণ কর) , যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে স্বস্তি দানের জন্য তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করলেন এবং তোমাদের উপর আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলেন, যাতে এর দ্বারা তোমাদের পবিত্র করে দেন, তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করে দেন, তোমাদের অন্তর মজবুত করে দেন এবং তার দ্বারা (তোমাদের) পা স্থির করে দেন[২]–

---

১. এ ধরনের আয়াত সূরা আলে-ইমরানে (আয়াত ১২৫) অতিবাহিত হয়েছে। সেখানকার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

অবশ্য সেখানে ফেরেশতার সংখ্যা তিন থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছিল। যদি ঘটনা একই হয়ে থাকে, তবে বলা হবে যে, প্রথমে এক হাজারের বাহিনী এসে থাকবে, এর পর দ্বিতীয় বাহিনী এসেছিল, যাদের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছিল। সম্ভবত مردفين শব্দে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে।

২. বদরের যুদ্ধ বস্তুত মুসলমানদের জন্য খুবই কঠিন ও বিরাট পরীক্ষা ছিল। তাঁরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলেন, নিঃস্ব ছিলেন, কোন সৈন্যবাহিনীর সাথে মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে বের হননি। অপর পক্ষে ছিল তাঁদের তিনগুণ সৈন্য, যারা পূর্ণ সাজসরঞ্জামসহ বের হয়েছিল। অপরদিকে কাফেররা প্রথম থেকেই ভাল স্থান ও পানি ইত্যাদি দখল করে নিয়েছিল। মুসলমানগণ নিম্নভূমিতে ছিলেন, বালু বেশি থাকায় সেখানে চলাফেরা করাও কঠিন ছিল। পানির অভাবে একদিকে ওযু-গোসলের কষ্ট, অন্যদিকে পিপাসায় কাতর।

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ اٰمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۞

১২. যখন আপনার রব ফেরেশতাদের প্রতি হুকুম পাঠালেন যে, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, অতএব তোমরা মুমিনদের (অন্তর) স্থির রাখ। আমি এখনই কাফেরদের অন্তরে আতঙ্ক ঢেলে দেব। অতএব তোমরা (ওদের) ঘাড়ের উপর আঘাত কর এবং আঘাত কর ওদের আঙ্গুলের গিরায় গিরায়।'

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُولَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُولَهٗ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞

১৩. তা এজন্য যে, ওরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত হবে, তো নিশ্চয় আল্লাহ অতি কঠোর শাস্তিদাতা।

এসব লক্ষ করে মুসলমানগণ ভীত হয়ে পড়লেন। কেননা, বাহ্যত (এসব) পরাজয়ের আলামত ছিল। শয়তান অন্তরে ওয়াসওয়াসা দিল যে, সত্যিই যদি তোমরা আল্লাহর মকবুল বান্দা হতে, তবে নিশ্চয় খোদায়ী সাহায্য তোমাদের পক্ষে হত এবং এ রকম নৈরাশ্যকর অবস্থা সৃষ্টি হত না। –সেই সময় আল্লাহ তাআলা মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন, যার ফলে মাঠের বালু জমে গেল, ওযু-গোসল ও পান করার জন্য পানির সুব্যবস্থা হল এবং ধুলাবালি থেকে নিষ্কৃতি লাভ হল। আর কাফের বাহিনী যেখানে ছিল, তা কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হয়ে যাওয়ার কারণে সেখানে চলাফেরা করাই কঠিন হয়ে পড়ল। তাছাড়া বাহ্যিক পেরেশানী দূর হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের একরকম তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিলেন। চোখ খোললে পর অন্তরের সমস্ত ভয়-ভীতি চলে গেল। (সীরাতে ইবনে হিশাম ২/১৯৬; তাফসীরে ইবনে কাসীর, বর্তমান আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রা) রাতভর তাঁবুতে দো'য়ায় মশগুল থাকেন। অবশেষে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাল্‌কা ধরনের তন্দ্রায় আচ্ছাদিত হলেন। তা থেকে চৈতন্য হওয়ার পর বললেন, 'তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, জিবরাঈল তোমাদের সাহায্যে আসছেন।' যখন তাঁবু থেকে বাইরে তশরীফ আনলেন, তখন পবিত্র মুখে– سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ (এই দল শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পিঠ দেখিয়ে পলায়ন করবে।) আয়াত জারী ছিল। (সহীহ বুখারী, হাদীস ২৯১৫; সীরাতে ইবনে হিশাম ২/২৬৯)

যা হোক, উক্ত রহমত-বৃষ্টি শরীরকে অপবিত্রতা থেকে এবং অন্তরকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে পাক করে দিল। এদিকে বালু জমে যাওয়ায় বাহ্যিকভাবে পা স্থির হয়ে গেল এবং ভিতর থেকে ভয় দূরীভূত হওয়ায় অন্তরও মজবুত হয়ে গেল।

১৪. তোমরা এ (শাস্তি) আস্বাদন করে নাও এবং (জেনে রাখ) যে, কাফেরদের জন্য (আখেরাতে) রয়েছে দোযখের আযাব[১]।

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ⑭

১. বদরের যুদ্ধের গুরুত্ব এ দ্বারা বোঝা যায় যে, এই যুদ্ধের সময় অভিশপ্ত ইবলীস কেনানা গোত্রের বড় সর্দার সুরাকার আকৃতি ধারণ করে আবু জাহলের নিকট এল এবং এই বলে মুশরিকদের উৎসাহিত করল যে, 'আজ তোমাদের উপর কেউই বিজয়ী হতে পারবে না। আমি ও আমার সমস্ত গোত্র তোমাদের সাথে রয়েছি। ইবলীসের পতাকাতলে শয়তানদের বিরাট বাহিনী ছিল। সামনে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আসবে। (তাফসীরে তবারী ১১/২২১)

এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য জিবরাঈল ও মিকাঈলের নেতৃত্বে এই বলে ফেরেশতাদের বাহিনী পাঠালেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি শয়তানরা মানুষের আকৃতি ধারণ করে কাফেরদের মনোবল বৃদ্ধি করে এবং মুসলমানদের অন্তরে ওয়াসওয়াসা ঢেলে তাদের ভীত করে, তবে তোমরা মজলুম ও দুর্বল মুসলমানদের অন্তরকে মজবুত কর। একদিকে তোমরা তাদের মনোবল বৃদ্ধি করবে, অন্যদিকে আমি কাফেরদের অন্তরে আতঙ্ক ও ভয় ঢেলে দেব। তোমরা মুলমানদের সঙ্গী হয়ে ঐ জালেমদের গর্দানে আঘাত কর এবং আঙ্গুলের গিরাগুলো টুকরো টুকরো করে ফেল।

আজ কাফেরদের সম্মিলিত শক্তি আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতায় মাঠে নেমেছে। সুতরাং ওরা জেনে নিক যে, খোদাদ্রোহীদের কী রকম কঠোর শাস্তি হয়ে থাকে। আখেরাতে ওরা যে শাস্তি পাবে, তাই তো আসল। কিন্তু দুনিয়াতেও তার কিছুটা নমুনা দেখে নিক এবং খোদায়ী শাস্তির কিছুটা স্বাদ দুনিয়াতেই ভোগ করে নিক।

এক বর্ণনায় এসেছে, বদরের যুদ্ধে লোকেরা ফেরেশতাদের দেখতে পেয়েছিল এবং ফেরেশতাদের দ্বারা নিহত কাফেরদেরকে মানুষের হাতে নিহত কাফেরদের থেকে ভিন্নভাবে চিনতে পারছিল। (দালাইলুন্ নবুওয়াহ্ ৩/৫৬)

ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করার তাৎপর্য

আল্লাহ তাআলা দেখিয়ে দিলেন যে, যদি কখনো জিন ও মানুষ শয়তানরা এমন অস্বাভাবিকরূপে সত্যের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে যায়, তা হলে তিনিও সত্যের অনুসারী ও মকবূল বান্দাদের এমন অস্বাভাবিক পন্থায় ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য পৌছাতে পারেন।

এমনিতে তো বিজয় ও সাফল্য, বরং প্রত্যেক ছোট বড় কাজ খোদারই ইচ্ছা ও কুদরতে সম্পাদিত হয়ে থাকে, তাঁর ফেরেশতারও প্রয়োজন নেই, মানুষেরও না। আর ফেরেশতাদের দ্বারাই কোন কাজ নিতে হলে তাঁদের তিনি এমন শক্তি দিয়ে রেখেছেন যে, এক ফেরেশতা একাই বড় বড় লোকালয়কে উপরে তুলে আছড়িয়ে ফেলতে পারেন। কিন্তু দুনিয়া যেহেতু কার্যকারণ ও আসবাব-উপকরণের জগত, তাই এস্থলে ফেরেশতাদলের মাধ্যমে সাহায্য পৌঁছিয়েছেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ۝

১৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের সম্মুখীন হও, তখন ওদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না[১]।

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

১৬. যে কেউ সেদিন ওদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে- যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন অথবা (আপন) সৈন্যদলে গিয়ে মিলিত হওয়ার প্রয়োজন ছাড়া- সে আল্লাহর গযব নিয়ে ফিরবে এবং তার বাসস্থান জাহান্নাম। আর (তা) অতি মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল[২]।

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

১৭. বস্তুত তোমরা ওদের হত্যা করনি, বরং আল্লাহ ওদের হত্যা করেছেন এবং আপনি (মাটি) নিক্ষেপ করেননি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন, বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন, (যাতে কাফেরদের ধ্বংস করেন) এবং যাতে তাঁর পক্ষ থেকে ঈমানদারদের উত্তম পুরস্কার দান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[৩]।

---

১. জেহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং যুদ্ধে কাফেরদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা খুবই শক্ত গোনাহ, কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে একটি। কাফেররা সংখ্যায় মুসলমানদের দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত ফক্বীহগণের মতে পিঠ প্রদর্শনের অনুমতি নেই।

২. অর্থাৎ কোন সামরিক কৌশলের কারণে পিছপা হলে, যেমন পিছনে হটে হামলা করা যদি অধিকতর ফলপ্রসূ হয়; অথবা একটি সৈন্যদল যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য পিছনে হটে কেন্দ্রের সাথে মিলিত হতে চায়, তবে এমন ক্ষেত্রে পিছপা হওয়া কোন অন্যায় নয়। গোনাহ হয় তখন, যখন লড়াই থেকে জান বাঁচিয়ে পলায়ন করার নিয়তেই পিছপা হয়।

৩. যুদ্ধের অবস্থা যখন চরমে, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুঠি কঙ্কর কাফের সৈন্যদের প্রতি নিক্ষেপ করেন এবং তিনবার شاهت الوجوه (চেহারাগুলো কদর্য হোক) পড়েন। আল্লাহর কুদরতে কঙ্করকণা প্রত্যেক কাফেরের চোখে গিয়ে পড়ে। আর ওরা সকলে চোখ মলতে শুরু করে। এদিকে মুসলিমগণ তৎক্ষণাৎ আক্রমণ চালিয়ে দেন। ফলে বহু সংখ্যক কাফের নিহত হয়। (মুজামে কাবীর, তবারানী, বর্ণনা ৩১২৮)

একেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, যদিও বাহ্যত কঙ্কর আপনি স্বহস্তে নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু এ কোন মানুষের কাজ হতে পারে না যে, এক মুঠি কঙ্কর প্রত্যেক সৈন্যের চোখে পড়ে

ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۸﴾

১৮. এ তো (গেল)। আর (জেনে রাখ) যে, আল্লাহ কাফেরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেবেন[১]।

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۹﴾

১৯. যদি তোমরা ফয়সালা চাও, তবে তোমাদের কাছে ফয়সালা এসে গেছে। এখন যদি তোমরা (স্বীয় কার্যকলাপ থেকে) নিবৃত্ত হও, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি পুনরায় (যুদ্ধ) কর, তবে আমিও পুনরায় (মুমিনদের সাহায্য) করব এবং তোমাদের দল তোমাদের কোন কাজে আসবে না, যদিও সংখ্যায় অধিক হোক। আর (জেনে রাখ) যে, আল্লাহ ঈমানদারদের সঙ্গে আছেন[২]।

অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত একটি সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ের কারণ হয়ে যাবে। এর পিছনে একমাত্র খোদায়ী হাতই ছিল, যা একমুঠি কঙ্কর দ্বারা শত্রু বাহিনীকে পিছপা করে দিল। তোমরা ছিলে সম্বলহীন, স্বল্প সংখ্যক। তোমাদের এমন শক্তি কোথায় ছিল যে, শুধু তোমাদের বাহুবলে বড় বড় কাফের সরদাররা নিহত হত? এ একমাত্র আল্লাহরই কুদরতের লীলাখেলা যে, তিনি এমন অহংকারী অবাধ্যদের মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছিয়ে দিলেন। অবশ্য কাজ বাহ্যত তোমাদের দ্বারাই নেওয়া হয়েছে এবং তোমাদের মধ্যে এমন শক্তি পয়দা করে দেওয়া হয়েছে যা তোমরা নিজ ক্ষমতায় অর্জন করতে পারতে না।

وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ..

এটা এজন্য করা হয়েছে, যাতে আল্লাহর কুদরত প্রকাশ পায় এবং মুসলমানদের প্রতি পূর্ণ মেহেরবানী করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুমিনদের দো'য়া ও ফরিয়াদ শোনেন এবং তাদের হাল-অবস্থা ভালভাবে জানেন। আর এও জানেন যে, তাঁর মকবূল বান্দাদের প্রতি কখন কীভাবে অনুগ্রহ করা মুনাসিব।

১. অর্থাৎ এ যুদ্ধে আল্লাহ কাফেরদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও ওদের চেষ্টা-তদবীর দুর্বল করে দেবেন।

২. এ আয়াতে মক্কার কাফেরদের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে।

হিজরতের পূর্বে ওরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলত- متى هذا الفتح إن كنتم صادقين {কবে হবে এই ফয়সালা? বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।} অর্থাৎ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এ ফয়সালা কবে হবে?— বস্তুত পরিপূর্ণ ফয়সালা তো কিয়ামতের দিনেই হবে। তবে একরকম ফয়সালা তোমরা আজ বদরের ময়দানেও দেখে নিয়েছ যে, কেমন অস্বাভাবিকভাবে তোমরা দুর্বল মুসলমানদের হাতে শাস্তিপ্রাপ্ত হলে। এখন যদি নবী

[রুকূ - ৩]

২০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চল এবং তা শোনার পরও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না[১]।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ۝

২১. আর তাদের মত হয়ো না, যারা বলে, 'আমরা শুনলাম' অথচ ওরা শোনে না[২]।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝

আলাইহিস সালামের বিরোধিতা এবং কুফর ও শিরক থেকে ফিরে আস, তবে তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল রয়েছে। নতুবা পুনরায় লড়াই করলে আমিও পুনরায় মুসলমানদের সাহায্য করব, এবং পরিণামে তোমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। যেহেতু আল্লাহর সাহায্য মুসলমানদের সঙ্গে রয়েছে, সুতরাং তোমাদের দলবল সংখ্যায় যতই হোক, তা কোন কাজে আসবে না।

কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, আবু জাহল প্রমুখ মক্কা থেকে রওনা হওয়ার সময় কাবা ঘরের গিলাফ ধরে দো'য়া করেছিল, 'আয় আল্লাহ! উভয় দলের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ ও সম্মানী, তাদের বিজয় দান করো এবং বিপর্যয়কারীদের পরাজিত করো।' (তাফসীরে তবারী ১১/৯২) – فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ আয়াতাংশে এ দোয়ারও জওয়াব রয়েছে যে, যারা প্রকৃতই শ্রেষ্ঠ ও সম্মানী ছিল, তারা জয় লাভ করেছে। পক্ষান্তরে, প্রকৃত বিপর্যয়কারীরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে।

১. পূর্বা-পর সম্পর্ক

পূর্বে আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন যে, 'আল্লাহ ঈমানদারদের সঙ্গে আছেন।' এখন তিনি ঈমানদারদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে, আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে তাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত, যাতে তারা আল্লাহর সাহায্য-সহায়তার যোগ্য হতে পারে।

সুতরাং ইরশাদ হয়েছে যে, একজন সত্যবাদী মুমিনের কাজ এই যে, সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ ও রাসূলের ফরমাবরদার হবে। প্রতিকূল অবস্থা ও আপদ-বিপদ যতই তাকে বিচলিত করতে থাকুক না কেন, সে যখন আল্লাহর বাণী শুনেছে ও বুঝেছে এবং তার প্রতি ঈমান এনেছে, সুতরাং সে কথায় ও কাজে কোন অবস্থাতেই তা থেকে মুখ ফেরাবে না।

২. অর্থাৎ মুখে বলে, আমরা শুনে নিলাম; অথচ কেউ সোজা কথাটা শুনে বুঝল না অথবা বুঝেও কবুল করল না, এই শোনার কী অর্থ?

২২. নিশ্চয় আল্লাহর নিকট প্রাণীকুলের মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে তারা, যারা বধির ও বোবা, যারা বোঝে না[১]।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩. আল্লাহ যদি ওদের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে বলে জানতেন, তবে অবশ্যই তিনি ওদের শুনিয়ে দিতেন (অর্থাৎ শোনার তাওফীক দিতেন)। আর যদি (বর্তমান অবস্থায়) ওদের শুনিয়েও দেন, তবে অবশ্যই ওরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পালাবে*[২]।

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾

পূর্বে ইহুদীরা মূসা আলাইহিস সালামকে বলেছিল– سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (আমরা শুনে নিলাম, কিন্তু মানলাম না)। মক্কার মুশরিকদের কথা সামনে আসছে- قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا অর্থাৎ 'যে কুরআন আপনি শোনাচ্ছেন তা যথেষ্ট হয়েছে, আমরা শুনে নিলাম। আমরা ইচ্ছা করলে এরই ন্যায় কালাম (কথা) বানিয়ে আনতে পারি।' আর মদীনার মুনাফিকদের চাল এই ছিল যে, ওরা পয়গম্বর আলাইহিস সালাম ও মুসলমানদের সামনে মৌখিক স্বীকার করে নিত, কিন্তু অন্তরে স্বীকার করত না (এরা সবাই اَلَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ–এর অন্তর্ভুক্ত)।

যা হোক, প্রকৃত মুমিনের শান উক্ত ইহুদী এবং মুশরিক ও মুনাফিকদের ন্যায় হওয়া উচিত নয়। তার শান বরং এই যে, সকল ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে আল্লাহর হুকুম ও নবীর নির্দেশের উপর আমল করতে থাকবে এবং প্রয়োজনে এর জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকবে।

১. আল্লাহ তাআলা বলার জন্য যাদের জিহ্বা-মুখ, শোনার জন্য কান এবং বোঝার জন্য দিল ও দেমাগ দিয়েছিলেন, অতঃপর তারা এসব শক্তিকে এমন বেকার করে ফেলল যে, জিহ্বার দ্বারা সত্য বলার ও সত্য প্রকাশ করার তাওফীক হল না, কানের দ্বারা সত্যের আওয়াজ শুনল না, দিল ও দেমাগের দ্বারা সত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করল না, মোটকথা, যারা আল্লাহপ্রদত্ত শক্তিগুলি সেই কাজে নিয়োজিত করল না, যার জন্য উক্ত শক্তিসমূহ দেওয়া হয়েছিল– নিঃসন্দেহে এমন লোকেরা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট।

✯ দ্বিতীয় তরজমা– 'মুখ ফিরিয়ে নেবে, আর ওরা মুখ ফিরিয়ে নিতেই অভ্যস্ত'।

২. অর্থাৎ আসল ব্যাপার এই যে, এ লোকদের মধ্যে খায়র ও কল্যাণের ভিত্তিমূলটাই নেই। কেননা, প্রকৃত কল্যাণ মানুষ তখনি লাভ করে, যখন তার অন্তরে সত্য জানার ব্যাকুলতা থাকে এবং এর ফলে হেদায়াতের আলো গ্রহণের যোগ্যতা তার মাঝে থাকে। যে জাতি সত্য-সন্ধানের রূহ থেকে একেবারে শূন্য হয়ে গেছে এবং এভাবে খোদাপ্রদত্ত শক্তিগুলি স্বহস্তে ধ্বংস করে দিয়েছে, সেই জাতির মধ্যে সত্যকে গ্রহণের শক্তি ও যোগ্যতা থাকে না।

এদিকেই ইঙ্গিত করে এস্থলে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ ওদের অন্তরে কল্যাণ তথা হেদায়েত গ্রহণ করার যোগ্যতাই দেখেননি। যদি ওদের মধ্যে কিছুমাত্র যোগ্যতা দেখতেন, তবে আপন

২৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তিনি (রাসূল) তোমাদের এমন বিষয়ের দিকে ডাকেন, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন[১]। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান, এবং এও (জেনে রাখ) যে, তোমাদের তাঁরই নিকট সমবেত করা হবে[২]।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

নীতি অনুযায়ী অবশ্যই ওদেরকে নিজ আয়াতগুলি শুনিয়ে ও বুঝিয়ে দিতেন (অর্থাৎ তা শোনার, বোঝার ও গ্রহণের তাওফীক দিতেন। যেহেতু যোগ্যতাই নেই, তাই ওরা এ তাওফীক লাভ করেনি)। তবে বর্তমান অবস্থায় ওদের আয়াতগুলি বাহ্যত শুনিয়ে ও বুঝিয়ে দেওয়া হলেও এই অবাধ্য লোকেরা তা গ্রহণ করবে না।

১. অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূল তোমাদের যে কাজের দিকে আহ্বান করেন (যেমন জেহাদ ইত্যাদি), তাতে আগাগোড়া তোমাদের কল্যাণ নিহিত আছে। আল্লাহ-রাসূলের দাওয়াতী পয়গাম তোমাদের জন্য দুনিয়াতে ইজ্জত ও শান্তির জীবন এবং আখেরাতে শ্বাশত জীবনেরই পয়গাম। অতএব মুমিনদের শান এই যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে তৎক্ষণাৎ 'লাব্বাইক' (আপনার দরবারে হাযির) বলবে। যখন যেদিকে তাঁরা (আল্লাহ ও রাসূল) আহ্বান করবেন, সব ব্যস্ততা ছেড়ে সে দিকেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

২. অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম পালন করতে দেরি করো না; হয়ত কিছুক্ষণ পর দিলের অবস্থা এরূপ থাকবে না। নিজ অন্তরের উপর মানুষের দখল নেই, বরং অন্তর খোদার হাতে, যেদিকে ইচ্ছা ফিরিয়ে দেবেন। তবে তিনি কারো দিলকে প্রথমেই বাধাগ্রস্ত করেন না। তাতে মোহরও লাগান না। হাঁ, যখন বান্দা হুকুম-আহকাম পালনে শিথিলতা ও অবহেলা করতে থাকে, তখন এর পরিণামে তার অন্তরকে বাধাগ্রস্ত করে দেন। আর সে সত্যের অনুসরণ ত্যাগ করে অবাধ্যতাকে নীতি বানিয়ে নিলে অন্তর মোহর করে দেন (মুযেহুল কুরআন)।

কোন কোন মুফাসসির يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ আয়াতাংশকে নৈকট্য বোঝানোর অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বান্দার এত নিকটবর্তী যে, তার দিলও তার এত নিকটবর্তী নয়। যেমন, অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (আর আমি ঘাড়ের রগের চেয়েও তার বেশি নিকটবর্তী –ক্বাফ, ১৬)। সুতরাং খাঁটি অন্তরে আল্লাহর হুকুম পালন কর। আল্লাহ তোমাদের দিলের হাল-অবস্থা ও গুপ্ত বিষয়াদি সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞাত, তাঁর সম্মুখে খেয়ানত চলতে পারে না।

আর তাঁরই নিকট সকলকে সমবেত হতে হবে, তথায় সমস্ত লুক্কায়িত ও গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করে দেওয়া হবে।

২৫. আর তোমরা সেই গোনাহ থেকে বেঁচে থাক, যা (-র শাস্তি)* তোমাদের মধ্য থেকে বিশেষ করে শুধু জালেমদের উপরেই পতিত হবে না। এবং জেনে রাখ,আল্লাহ অতি কঠোর শাস্তিদাতা[১]।

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاۤصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

২৬. স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে সংখ্যায় অল্প, (নিজেদের) দেশে দুর্বল হিসাবে পরিগণিত। তোমরা আশঙ্কা করতে যে, লোকে তোমাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি তোমাদের আশ্রয় দিলেন, নিজ সাহায্যের দ্বারা তোমাদের শক্তিশালী করলেন এবং তোমাদের পরিচ্ছন্ন বস্তুসমূহ দান করলেন, যাতে তোমরা শোকর কর[২]।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'ঐ আযাবকে ভয় কর, যা তোমাদের...'

১. অর্থাৎ মনে করুন, একটি জাতির অধিকাংশ লোক জুলুম ও পাপের পথ অবলম্বন করে নিয়েছে। কিছু লোক তাদের থেকে ভিন্ন বটে, কিন্তু তারা শিথিলতা করে নসীহতও করেনি, ঘৃণাও প্রকাশ করেনি। নিঃসন্দেহে এটা ফেতনার বিষয়, যে ফেতনার আওতার মধ্যে সেই জালেম এবং এই নীরব, শিথিল লোকেরা সকলেই পতিত হবে। যখন আযাব আসবে, তখন পর্যায়ক্রমে সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত হবে, কেউ-ই বাঁচতে পারবে না।

এ তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের সারনির্যাস এই হবে যে, আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ পালনের জন্য নিজেও প্রস্তুত থাক এবং নাফরমানদের নসীহত ও উপদেশ দাও, আর না মানলে কমপক্ষে ঘৃণা প্রকাশ কর।

অবশ্য হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) আয়াতের এ অর্থ নিয়েছেন যে, মুসলমানদের এমন ফাসাদ (গোনাহ) থেকে বিশেষভাবে বেঁচে থাকা উচিত, যার মন্দ প্রভাব পাপীদের অতিক্রম করে অন্যদেরও পর্যন্ত পৌঁছে।

প্রথমে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মানতে সামান্য দেরি ও শিথিলতা করতে নেই, না জানি দেরি করার কারণে দিল হটে যায়। এখন সতর্ক করছেন যে, নেক লোকেরা যদি (ভাল কাজে) অবহেলা করে, তবে সাধারণ লোকেরা একেবারে ছেড়ে দেবে। ফলে মন্দ রীতিনীতি প্রসার লাভ করবে। এর শাস্তি সকলের উপরই পতিত হবে। যেমন, জেহাদে সাহসীরা শিথিলতা করলে কাপুরুষেরা অবশ্যই পলায়ন করবে। ফলে পরাজয় যখন আসবে, তখন সাহসীরাও তা প্রতিহত করতে পারবে না।

২. অর্থাৎ নিজেদের স্বল্পতা ও দুর্বলতা লক্ষ্য করে (জেহাদ সম্পর্কে) আল্লাহর হুকুম মানতে শিথিলতা করো না। (চিন্তা করে) দেখ, হিজরতের পূর্বে, বরং এর পরও তোমাদের সংখ্যা

২৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে খেয়ানত করো না এবং নিজেদের আমানতের মধ্যেও খেয়ানত করো না জ্ঞাতসারে[১]।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

খুবই স্বল্প ছিল, সরঞ্জাম কম ছিল। তোমাদের দুর্বলতা দেখে লোকদের লোভ হচ্ছিল যে, তোমাদের হজম করে ফেলে। সর্বদা তোমাদের আশঙ্কা ছিল, ইসলামের শত্রুরা তোমাদের লুটপাট করে নিয়ে যায় কিনা। কিন্তু খোদা তোমাদের মদীনায় আশ্রয় দিলেন। আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে অতুলনীয় ভ্রাতৃত্ব কায়েম করে দিলেন। অতঃপর বদর যুদ্ধে কত সুস্পষ্ট গায়েবী সাহায্য করলেন, কাফেরদের মূলোচ্ছেদ করে দিলেন। তোমাদের একদিকে বিজয় দান করলেন, তাছাড়া গনীমতের মাল এবং বন্দীদের মুক্তিপণ পাইয়ে দিলেন। মোটকথা– হালাল, পবিত্র, পরিচ্ছন্ন বস্তুসামগ্রী এবং নানা রকম নে'য়ামত দান করলেন, যাতে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাক।

১. আল্লাহ ও রাসূলের খেয়ানত হচ্ছে তাঁদের হুকুম-আহকামের অবাধ্যতা করা– অর্থাৎ মুখে নিজেকে মুসলমান বলা, কিন্তু কাফেরদের মত কাজ করা। অথবা আল্লাহ ও রাসূল যে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে প্রতারণা-প্রবঞ্চনা করা, অথবা গনীমতের মাল চুরি করা, প্রভৃতি। যা হোক, আল্লাহ ও রাসূল বা বান্দাদের তরফ থেকে যেসব আমানত তোমাদের হাতে সোপর্দ করা হয়, সেসবের মধ্যে খেয়ানত করা থেকে বেঁচে থাক। এতে আল্লাহর ও মানুষের সব রকমের হক এসে গেছে।

একটি ঘটনা

হাদীসে আছে, বনী কুরাইজা গোত্রের ইহুদীরা যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সন্ধির দরখাস্ত করল এবং বনু নযীর গোত্রের ইহুদীদের সাথে যে রকম আচরণ করা হয়েছিল সেরূপ আচরণ কামনা করল, তখন নবীজী ইরশাদ করলেন, "না, আমি তোমাদের এতটুকু অধিকার দিচ্ছি যে, তোমরা সাদ ইবনে মুআযকে বিচারক বানিয়ে নাও; তিনি তোমাদের সম্বন্ধে যে ফয়সালা করবেন তা মানতে হবে।" তখন তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি নিয়ে হযরত আবু লুবাবাকে নিজেদের কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এ ব্যাপারে আপনার রায় কী? আমরা কি সা'দ ইবনে মুআযকে বিচারক হিসাবে গ্রহণ করব, না করব না? বনী কুরাইজা গোত্রের নিকট আবু লুবাবার ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজন ছিল বলে তিনি তাদের প্রতি দুর্বল ছিলেন। তিনি নিজ গলার দিকে হাতে ইশারা করলেন। অর্থাৎ সা'দ ইবনে মুআযকে বিচারক বানালে তোমাদের গর্দান কাটা যাবে।

আবু লুবাবা এরূপ করলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সতর্ক হয়ে গেলেন এবং ভাবলেন, আমি তো আল্লাহ ও রাসূলের খেয়ানত করে ফেলেছি। তিনি ফিরে এসে নিজেকে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, কিছু খাবও না, পানও করব না যতক্ষণ না মৃত্যু আসে অথবা আল্লাহ তাআলা আমার তওবা কবুল করে নেন। সাত-আট দিন এভাবেই বাঁধা থেকে থেকে ক্ষুধায় বেহুঁশ হয়ে গেলেন। অবশেষে সুসংবাদ আসল যে, আল্লাহ তাআলা তোমার

২৮. আর জেনে রাখ যে, নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তানসন্ততি (তোমাদের জন্য) এক পরীক্ষা এবং এও (জেনে রাখ) যে, আল্লাহর কাছেই রয়েছে মহা প্রতিদান[১]।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

[রুকূ - ৪]

২৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে তিনি তোমাদের জন্য ফয়সালা করে দেবেন*[২], তোমাদের থেকে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ

তওবা কবুল করেছেন। তিনি তখন বললেন, আল্লাহর কসম, আমি নিজেকে খুলব না যতক্ষণ না স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মুবারক হাতে আমার রশি খুলে দেন। তিনি তশরীফ আনলেন এবং স্বহস্তে তাকে মুক্ত করলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম ৩/১৮৬-১৮৯)

(তবে ইবনে আবদুল বার্ এর দাবি এই যে, এই ঘটনা ঘটেছিল তাবুক যুদ্ধে যোগদান না করার কারণে। আল্লাহই ভাল জানেন)

১. মানুষ সাধারণতঃ ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির কারণে আল্লাহর ও বান্দাদের হক নষ্ট করে থাকে। এ জন্য সতর্ক করা হচ্ছে যে, আল্লাহর নিকট আমানতদারীর মূল্য দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সন্তানাদি প্রভৃতি সকল জিনিসের চেয়ে অনেক বেশি।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'তোমাদের দান করবেন (সত্য-মিথ্যার মধ্যে) পার্থক্যকারী বস্তু'।

২. অর্থাৎ যদি আল্লাহকে ভয় কর, তাক্ওয়ার পথ অবলম্বন কর, তবে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ও তোমাদের শত্রুদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন– দুনিয়াতেও, আখেরাতেও। দুনিয়াতে এভাবে যে, তোমাদের ইজ্জত দান করবেন এবং ওদের লাঞ্ছিত বা ধ্বংস করবেন, যেমন বদর যুদ্ধে করেছেন। আর আখেরাতে এভাবে যে, তোমরা চিরস্থায়ী নে'য়ামতসমূহের মধ্যে থাকবে আর কাফেরদের ঠিকানা হবে দোযখ।

দ্বিতীয় কথা এই যে, তাক্ওয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা তোমাদের দিলের মধ্যে একটি নূর ঢেলে দেবেন, যার দ্বারা তোমরা আত্মিকভাবে হক ও বাতিল এবং নেক ও বদের মাঝে ফয়সালা ও পার্থক্য করতে পারবে।

এ ছাড়া হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) আরো একটি কথা লিখেছেন যে, হয়ত বদরের বিজয়ে মুসলমানদের ধারণা হয়ে থাকবে যে, এ বিজয় ঘটনাক্রমিক। (অতএব) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অগোচরে কাফেরদের প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করে থাকবে, যাতে ওরা মক্কায় তাদের বাড়ীঘর ও পরিবার-পরিজনের প্রতি অত্যাচার না করে। সুতরাং প্রথম আয়াতে খেয়ানত করতে নিষেধ করলেন আর বর্তমান আয়াতে সান্ত্বনা

سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

তোমাদের গোনাহ দূর করে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ۗ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۝

৩০. (স্মরণ করুন), যখন আপনার বিরুদ্ধে কাফেররা ষড়যন্ত্র করছিল- আপনাকে বন্দী করার বা হত্যা করার কিংবা নির্বাসিত করার জন্য। ওরা ষড়যন্ত্র করছিল, আর আল্লাহও কৌশল করছিলেন। আর আল্লাহ সর্বোত্তম কৌশলী[১]।

দিলেন যে, ভবিষ্যতে ফয়সালা হয়ে যাবে; তোমাদের বাড়ীঘর ও আত্মীয়-স্বজন কাফেরদের কবলে থাকবে না।

১. হিজরতের পূর্বে মক্কার কাফেররা দারুন্-নদ্ওয়ায় (ওদের পরামর্শশালায়) মিলিত হয়ে পরামর্শ করল যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে কী করা যায়? তিনি সমগ্র জাতিকে পেরেশান করে তুলেছেন এবং বাইরের কিছু লোক তাঁর ফাঁদে ফেঁসে যাচ্ছে। না জানি ক্রমান্বয়ে এমন বিরাট শক্তি অর্জন করে ফেলেন, যার মোকাবেলা করা দুষ্কর হয়ে পড়বে।

তখন বিভিন্ন মতামত দেওয়া হল। কেউ বলল যে, তাঁকে বন্দী করে খুব প্রহার করা হোক। কারো মত ছিল যে, তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হোক, যাতে আমরা পেরেশানী থেকে চিরমুক্তি লাভ করতে পারি। পরিশেষে আবু জাহলের রায় অনুসারে সাব্যস্ত হল যে, আরবের সকল গোত্র থেকে এক একজন যুবক নির্বাচিত করা হোক এবং ওরা সমবেতভাবে তলোয়ারের দ্বারা আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করবে। যাতে (তার স্বগোত্র) বনু হাশিম সমগ্র আরবের সঙ্গে লড়াই না করতে পারে এবং যদি দিয়ত (রক্তপণ) দিতে হয় তবে তা সকল গোত্রের উপর ভাগ হয়ে যাবে।

এক দিকে তো উক্ত পাপিষ্ঠরা এসব তদবীর করছিল, অন্যদিকে তা ব্যর্থ করতে আল্লাহর সূক্ষ্ম ও সর্বোত্তম কৌশল চলছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরেশতা কর্তৃক জ্ঞাত হয়ে নিজ বিছানায় হযরত আলী (كَرَّمَ اللهُ وجهه) কে শুইয়ে দিলেন এবং তাঁর জীবননাশের উদ্দেশ্যে আগত লোকদেরই চোখে মাটি নিক্ষেপ করতে করতে বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। (তাফসীরে তবারী ১১/১৩৪-১৩৫; মুসান্নাফে আ. রায্যাক, বর্ণনা ৯৭৪৩) তাঁর ও হযরত আলী (রা) এর কিছুই হয়নি। অথচ দুশমনরা নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হল। অপরদিকে যারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতল করার পরামর্শ দিয়েছিল, তারাই বদরের জেহাদে নিহত হল।

এর মাধ্যমে এদিকেও ইশারা করা হল যে, যখন আল্লাহ সঙ্গী থাকেন তখন কেউই কিছু করতে পারে না এবং যেভাবে তিনি নিজ পয়গম্বরকে রক্ষা করলেন, তদ্রূপ তোমাদের

৩১. যখন ওদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, ওরা বলে, 'আমরা শুনেছি তো, আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে আমরাও এরূপ (কালাম) বলতে পারি। এ তো পূর্ববর্তীদের কিস্সা-কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়'[১]।

وَاِذَا تُتۡلٰی عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتُنَا قَالُوۡا قَدۡ سَمِعۡنَا لَوۡ نَشَآءُ لَقُلۡنَا مِثۡلَ هٰذَاۤ ۙ اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِیۡرُ الۡاَوَّلِیۡنَ ﴿۳۱﴾

৩২. (স্মরণ কর), যখন ওরা বলতে লাগল, 'আয় আল্লাহ! যদি এ (ধর্মই) তোমার পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ) সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর অথবা আমাদের উপর (অন্য) কোন যাতনাদায়ক শাস্তি আপতিত কর'[২]।

وَاِذۡ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنۡ کَانَ هٰذَا هُوَ الۡحَقَّ مِنۡ عِنۡدِکَ فَاَمۡطِرۡ عَلَیۡنَا حِجَارَۃً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائۡتِنَا بِعَذَابٍ اَلِیۡمٍ ﴿۳۲﴾

মক্কাস্থিত ঘরবাড়ী ও পরিবার-পরিজনেরও হেফাজত করতে পারেন। কারণ, 'শত্রু যদি শক্তিশালী হয়, তবে নেগাহবান তো মহাশক্তিশালী'।

১. নযর ইবনে হারেছ বলত, 'আমরা ইচ্ছা করলে কুরআনের ন্যায় কালাম রচনা করে আনতে পারি, এতে কিচ্ছা-কাহিনী ছাড়া আছেই বা কী।' –অথচ কুরআন তো সকল বিবাদের মীমাংসা এরই উপর ছেড়ে দিয়েছিল। ওরা যদি তা করতেই পারে, তাহলে ওরা ইচ্ছা করল না কেন? কেউ বলেছিল, 'আমার ঘোড়া যদি চলে তবে একদিনে লন্ডনে পৌঁছতে পারে, তবে চলে না আর কি।'

যা হোক, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনা শুনে ওরা বলত, 'সবই কিচ্ছা-কাহিনী'। এখন বদরে দেখে নিয়েছে যে, এ শুধু গল্প-কাহিনী ছিল না। বরং শাস্তির ওয়াদা তাদের ক্ষেত্রেও পূর্ণ হয়েছে, যেরূপ পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে হয়েছিল।

২. এ আয়াতে মক্কার মুশরিকদের চরম মূর্খতা, দুর্ভাগ্য ও অবাধ্যতার প্রকাশ রয়েছে। অর্থাৎ ওরা বলত, খোদাগো! যদি আসলেই এটা সত্য ধর্ম হয়, যাকে আমরা এতদিন যাবৎ এবং এত জোরে-শোরে মিথ্যা বলে আসছি, তবে আর দেরি কেন? পূর্ববর্তী জাতিগুলির ন্যায় আমাদের উপরও পাথরবৃষ্টি কেন বর্ষণ করা হচ্ছে না অথবা অনুরূপ অন্য কোন আযাবে পতিত করে আমাদের কেন ধ্বংস করা হচ্ছে না?

বলা হয় যে, আবু জাহল মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় কাবাঘরের সামনে এই প্রার্থনা করেছিল। ফলে, যা কিছু সে প্রার্থনা করেছিল, বদরের যুদ্ধে তার একটু নমুনা দেখে নিল। সে নিজে ৬৯ জন সর্দারসহ দুর্বল ও সম্বলহীন মুসলমানদের হাতে নিহত হল এবং সত্তরজন সর্দার বন্দী হল। এভাবে আল্লাহ তাআলা ওদের গোড়া কেটে দিলেন। অবশ্যই লূৎ (আ) এর জাতির মত ওদের উপর আকাশ থেকে পাথরবৃষ্টি হয়নি; কিন্তু একমুঠো কঙ্করকণা, যা আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত দিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন,

৩৩. আল্লাহ এমন নন যে, আপনি ওদের মধ্যে থাকাবস্থায় তিনি ওদের শাস্তি দেন[১]। এবং আল্লাহ ওদের এ অবস্থায়ও শাস্তি দেওয়ার নন যে, ওরা এসতেগফারে রত[২]।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝

৩৪. আর ওদের মধ্যে এমন কী বিষয় আছে যে, আল্লাহ ওদের কোনই শাস্তি দেবেন না, অথচ

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ

তা আসমানী পাথরবৃষ্টিরই সামান্য নমুনা ছিল— فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

১. আল্লাহ তাআলার নীতি (سنة الله) এই যে, নবীগণকে মিথ্যা বলার কারণে যখন আল্লাহ কোন জাতির উপর শাস্তি নাযিল করেন, তখন স্বীয় পয়গম্বরকে ওদের থেকে পৃথক করে নেন। (সে মত) আল্লাহ যখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা থেকে আলাদা করে নিলেন, তখন মক্কাবাসীরা বদরের শাস্তিতে ধৃত হল।

২. দুটি জিনিসের কারণে ওদের উপর আযাব নাযিল হয় না। **এক**, ওদের মাঝে নবীর বর্তমান থাকা; **দুই**, এসতেগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করা। মক্কাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থানের কারণে আযাব আটকে ছিল। তিনি মদীনায় চলে যাওয়ার পর ওদের উপর আযাব এসেছে। অনুরূপ, যে পর্যন্ত পাপী অনুতপ্ত থাকে এবং তওবা করতে থাকে, সে ধৃত হয় না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গোনাহগারদের আশ্রয় দুটি জিনিস। একটি, আমার অস্তিত্ব; দ্বিতীয়টি, এসতেগফার (মুযেহুল কুরআন) (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩০৩৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ১৯৮৮; তিরমিযীর হাদীসটির সনদ দুর্বল)।

বি. দ্র. বিজ্ঞ মুতারজিম (র) বর্তমান আয়াতে لِيُعَذِّبَهُمْ এর অর্থ সাধারণ আযাব করেছেন। কোন কোন মুফাসসিরের মত এমনই। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরের নিকট আয়াতের মর্ম হচ্ছে– মুশরিকরা যে ধরনের অস্বাভাবিক আযাব তলব করছিল, যা সমস্ত জাতিকে নিমেষে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়, এমন আযাব নাযিল করাতে দুটি বাধা ছিল। এক, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্তিত্ব। কারণ, এর বরকতে এই উম্মতের উপর, চাই দাওয়াতী উম্মতই হোক না কেন (অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনেনি)– এরূপ ব্যাপক ধ্বংসকারী আযাব আসে না। অবশ্য কোন সময় বিশেষ কিছু ব্যক্তিবর্গের উপর নাযিল হলে তা এর পরিপন্থী নয়। দ্বিতীয় বাধা হচ্ছে, এসতেগফারকারীদের বর্তমান থাকা– মুসলমান হোক বা অমুসলমান। যেমন বর্ণিত আছে যে, মক্কার মুশরিকরাও 'তালবিয়া' তওয়াফ, ইত্যাদিতে غفرانك غفرانك (আপনার ক্ষমা চাই, আপনার ক্ষমা চাই) বলত।

তবে স্বাভাবিক আযাব (যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি) পয়গম্বর অথবা ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের বর্তমানেও আসতে পারে। সম্মুখে এমন সাধারণ আযাবের কথাই বলা হয়েছে।

ওরা (মানুষকে) মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয়, যদিও ওরা তার তত্ত্বাবধায়ক নয়। তার তত্ত্বাবধায়ক কেবল পরহেযগাররা। কিন্তু ওদের অধিকাংশই জানে না[১]।	يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ۚ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. কা'বার নিকট ওদের নামায শিস দেওয়া ও তালি বাজানো ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর, কেননা তোমরা কুফর করতে[২]।	وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ۚ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

১. অর্থাৎ উল্লিখিত দুটি কারণে ব্যাপক আযাব আসে না, নতুবা তোমাদের দুষ্কৃতি, জুলুম ও পাষণ্ডতা তো এমনি বিষয় যে, সঙ্গে সঙ্গে আযাব এসে পড়া উচিত। একত্ববাদীদের হরম শরীফে আসতে বা ইবাদত করতে বাধা দেওয়া, এমন কি তাদের দেশ (মক্কা শরীফ) থেকে তাদের বের করে সর্বদা এ চেষ্টা করা যে, আল্লাহর এই পাক-পবিত্র ও ইবাদতকারী বান্দারা যেন কিছুতেই এখানে না আসতে পারে –এর চেয়ে অধিক জুলুম আর কী হতে পারে?

মজার ব্যাপার এই যে, ওরা এসব জুলুমের বৈধতার পক্ষে সনদ পেশ করে বলে যে, আমরা হরম শরীফের ক্ষমতাবান মুতাওয়াল্লী– যাকে ইচ্ছা আসতে দেব, যাকে ইচ্ছা বাধা দেব। এ আমাদের অধিকার। অথচ প্রথমত– মসজিদে লোকদের নামায ও ইবাদতে বাধা দেওয়ার অধিকার মুতাওয়াল্লীরও নেই। দ্বিতীয়ত– তাদের মুতাওয়াল্লী হওয়ার অধিকারও নেই। হরম শরীফের মুতাওয়াল্লী একমাত্র মুত্তাকী ও পরহেযগার বান্দারাই হতে পারে, মুশরিক ও বদমাশরা এর অধিকারী হতে পারে না। কিন্তু ওদের অধিকাংশ লোক নিজেদের অজ্ঞতাহেতু মনে করছে যে, আমরা ইবরাহীমের বংশধর এবং অমুক গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। অতএব কাবার মুতাওয়াল্লী হওয়ার অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদেরই, যার জন্য বিশেষ কোন শর্তের প্রয়োজন নেই।

সুতরাং এ আয়াতে ওদের বলে দেওয়া হয়েছে, ইবরাহীমের বংশধরদের মধ্যে যারা পরহেযগার, তাদেরই উক্ত অধিকার। এ অধিকার এমন বেইনসাফদের জন্য নয়, যাদের হঠকারী নীতি হল– কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তাকে কাবায় আসতে না দেওয়া।

২. অর্থাৎ ওরা প্রকৃত নামাযীদের মসজিদে আসতে বাধা দেয়, আর নিজেদের নামাযের অবস্থা কী? তা হচ্ছে উলঙ্গ হয়ে কাবার তওয়াফ করা এবং যিকরুল্লাহর স্থলে শিস দেওয়া ও তালি বাজানো। যেমন আজো অনেক জাতি ঘণ্টা ও শঙ্খ বাজানোকে ইবাদত মনে করে। মোটকথা, ওরা নিজেরাও আল্লাহর প্রকৃত ইবাদত করে না, অন্যদেরও করতে দেয় না। আর এসব নিরর্থক ও বেহুদা বিষয়কে ইবাদত সাব্যস্ত করে নিয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, মুসলমানদের ইবাদতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ওরা সিটি ও তালি বাজাত, অথবা বিদ্রূপ ও হাসিঠাট্টারূপে এমন করত। (আল্লাহই ভাল জানেন।)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. যারা কাফের, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ এ জন্য ব্যয় করে, যাতে (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিতে পারে[১]। সুতরাং ওরা তা ব্যয় করতে থাকবে, তার পর তা হবে ওদের জন্য আফসোস (এর কারণ) এবং অবশেষে ওরা পরাজিত হবে[২]। আর যারা কাফের, তাদের জাহান্নামের কাছে সমবেত করা হবে—

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. যাতে আল্লাহ অপবিত্র ব্যক্তিকে পবিত্র থেকে পৃথক করে দেন এবং অপবিত্র (ব্যক্তিদের) একেকজনকে অপরের উপরে রেখে ওদের সকলকে স্তূপীকৃত করেন। তারপর ঐ স্তূপকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন[৩]। এমন ব্যক্তিরাই ক্ষতিগ্রস্ত[৪]।

---

১. বদরের যুদ্ধে কাফেরদের বার জন সর্দারের প্রত্যেকে এক একদিন করে সৈন্যদের খাওয়ানোর দায়িত্ব নিয়েছিল। সে মত প্রতিদিন একজনের তরফ থেকে দশটি করে উট যবেহ করা হত। অতঃপর যখন ওদের পরাজয় হল, তখন পরাজিত বাহিনী মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে আবু সুফিয়ান প্রভৃতির নিকট বলল, বাণিজ্য কাফেলা যে ধন-সম্পদ এনেছে তা সবই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রতিশোধ নিতে খরচ করা হোক। এ প্রস্তাবে সকলেই রাজী হল। –এধরনের সম্পদ-ব্যয়ের কথাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. ওরা যখন দুনিয়াতে পরাজিত ও পরাভূত এবং আখেরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, তখন আফসোস ও অনুতাপ করে হাতের আঙ্গুল কামড়াবে (এবং বলবে), ধন-সম্পদও গেল, সফলতাও লাভ হল না। বস্তুত এমনই ঘটল– প্রথমে বদরে, অতঃপর উহুদ প্রভৃতি যুদ্ধে আর্থিক ও দৈহিক সমস্ত শক্তি ব্যয় করেও কিছুই করতে পারল না। পরিশেষে ধ্বংস বা লাঞ্ছিত হয়েছে। অথবা অনুতপ্ত হয়ে কুফর থেকে তওবা করেছে।

৩. 'মূযেহুল কুরআনে' আছে, ক্রমান্বয়ে আল্লাহ তাআলা ইসলামকে বিজয় দান করবেন। ইতিমধ্যে কাফেররা নিজেদের জান-মাল জোরদারভাবে খরচ করে ফেলবে। ফলে নেক ও বদ পৃথক হয়ে যাবে। অর্থাৎ যাদের ভাগ্যে ইসলাম লেখা আছে, তারা মুসলমান হয়ে যাবে। আর যারা কুফরের উপর মরার, তারা একীভূত হয়ে দোযখে যাবে।

৪. কারণ, পার্থিব ও পরকালীন উভয় প্রকার ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হল।

[রুকূ - ৫]

৩৮. আপনি কাফেরদের বলে দিন, 'যদি ওরা নিবৃত্ত হয়, তবে পূর্বে যা কিছু হয়েছে তা ওদের মাফ করে দেওয়া হবে[১]। আর যদি পুনরায় (তা-ই) করে, তবে তো গত হয়েছে পূর্ববর্তীদের (ক্ষেত্রে আল্লাহর) নিয়ম[২]।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

৩৯. তোমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যে পর্যন্ত না ফাসাদ নিঃশেষ হয়[৩] এবং আনুগত্য পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়[৪]। আর

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا

১. অর্থাৎ এখনো যদি ওরা কুফর ও নাফরমানী এবং ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা পরিত্যাগ করে এবং পয়গম্বর আলাইহিস সালামের আনুগত্য অবলম্বন করে, তবে পূর্বে কুফরী অবস্থায় যে সকল গোনাহ করেছে, তা সবই ক্ষমা করে দেওয়া হবে– الإسلام يهدم ما كان قبله (ইসলাম পূর্ববর্তী সব কিছু দূরীভূত করে দেয়)। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১)

২. অর্থাৎ পূর্ববর্তীরা যেরূপ পয়গম্বরদের অস্বীকার করা ও শত্রুতার কারণে ধ্বংস হয়েছে, এদের উপরও ধ্বংস নেমে আসবে। অথবা অর্থ এই যে, বদরের যুদ্ধে যেমন এদের দলের অনেককে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে এদেরও শাস্তি দেওয়া হবে।

৩. অর্থাৎ যাতে কাফেরদের শক্তি না থাকে, ফলে ঈমানের পথে কোন প্রকার বাধা দিতে না পারে এবং সত্য দীনের বিরুদ্ধে কোন হুমকি সৃষ্টি করতে না পারে। ইতিহাস সাক্ষী, যখনই কাফেরদের বিজয় হয়েছে, মুসলমানদের ঈমান ও ধর্ম হুমকির মুখে পড়েছে। দুনিয়াবাসীর সম্মুখে স্পেনের উদাহরণ বিদ্যমান— শক্তি ও সুযোগ পাওয়ায় ওদের হাতে কীভাবে মুসলমানরা ধ্বংস বা ধর্মান্তরিত হয়েছিল।

যা হোক, জেহাদ ও যুদ্ধের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানগণ যাতে নিরাপদ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে এবং ঈমান ও তাওহীদ-রত্ন কাফেরদের হাত থেকে রক্ষা পায়। (হাদীসের কিতাবসমূহে ইবনে ওমর প্রমুখ সাহাবা (রা.) থেকে 'ফেতনা'র এ তাফসীরই বর্ণিত রয়েছে।)

৪. এ হচ্ছে জেহাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য যে, কুফরের কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি অবশিষ্ট না থাকে, হুকুম একমাত্র আল্লাহরই চলে। সত্য ধর্ম সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হয়ে যায়— لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ– (যাতে তিনি তাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন।) এটা চাই অন্যান্য বাতিল ধর্মের বর্তমানে হোক, যেমন খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যদের আমলে হয়েছিল; অথবা সব বাতিল ধর্মকে খতম করে হোক, যেমন মাসীহ ঈসা (আ) এর অবতরণের সময় হবে।

যদি ওরা নিবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহ তো ওরা যা কিছু করে তা সবই দেখেন[১]।	فَإِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝
৪০. আর যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে নাও, আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক (তিনি) এবং কত উত্তম সাহায্যকারী[২]!	وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

পারা-১০

৪১. জেনে নাও যে, তোমরা গনীমতরূপে যা কিছু লাভ কর, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, (তাঁর) আত্মীয় স্বজনের এবং	وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي

বর্তমান আয়াত এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, উক্ত উদ্দেশ্য দুটি হাসিল না হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য আক্রমনাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক –উভয় প্রকার জেহাদ শরীয়তসম্মত ও বৈধ। এ জন্যই হাদীসে এসেছে- الجهاد ماض إلى يوم القيامة (জেহাদ কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে)। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৫২৪; মুজামে আওসাত, হাদীস ৪৭৭২– আবু দাউদের لفظ হল–(الجهاد ماضٍ منذ بعثني الله الى ان يقاتل آخر امتي الدجال

১. অর্থাৎ যারা নিজেদের দুষ্কৃতি ও কুফর থেকে নিবৃত্ত হবে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ নেই। আর তাদের দিলের হাল ও ভবিষ্যতের অবস্থা আল্লাহর সোপর্দ থাকবে– যেরূপ কাজই ওরা করবে, তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে করতে পারবে না। তবে মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ, তারা কেবল বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ী আচরণ করবে। হাদীসে রয়েছে-

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل.

(আমি মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যাবৎ না তারা বলে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই'। যখন তারা তা বলবে, তখন তারা আমার পক্ষ থেকে তাদের জানমালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে ফেলবে। কিন্তু সেই জানমালের কারণেই যদি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, তবে ভিন্ন কথা। আর মহান আল্লাহ তাদের আভ্যন্তরীন অবস্থার হিসাব নেবেন।) (সুনানে ইবনে মাজাহ্, হাদীস ৩৯২৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২১)

২. অর্থাৎ মুসলমানদের উচিত খোদার সাহায্য ও সহায়তার উপর ভরসা করে জেহাদ করা, কাফেরদের সংখ্যাধিক্য ও সাজ-সরঞ্জাম দৃষ্টে ভীত না হওয়া। লক্ষ্য কর, বদর যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের কেমন সাহায্য-সহায়তাই না করেছেন।

এতীম, অভাবী, ও মুসাফিরদের[১], যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি ও সেই বিষয়ের প্রতি, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম মীমাংসার দিন[২],

الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ

১. সূরা 'আনফাল'–এর শুরুর দিকে (আল্লাহ তাআলা) বলেছেন– قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُوْلِ, বর্তমান আয়াতে এর কিছুটা তফসীল বয়ান করে ইরশাদ করেছেন– কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে গনীমতের যে ধনসম্পদ তোমাদের হস্তগত হয়, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর প্রাপ্য, যা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে পয়গম্বর আলাইহিস সালাম উসুল করত পাঁচটি ক্ষেত্রে ব্যয় করতে পারবেন–

(১) নিজ সত্তার জন্য, (২) তাঁর সেই আত্মীয়স্বজন (বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব) এর জন্য, যাঁরা শুরু থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য-সহায়তা করেছেন এবং ইসলামের খাতিরে বা শুধু আত্মীয়তার কারণে তাঁকে সহযোগিতা করেছেন এবং যাদের জন্য যাকাত ইত্যাদির অংশ নেওয়া হারাম, (৩) এতীমদের জন্য, (৪) অভাবী মুসলমানদের জন্য ও (৫) মুসাফিরদের জন্য।

অতঃপর গনীমতের অবশিষ্ট চার অংশ সৈন্যদের মধ্যে এভাবে বণ্টন করে দেওয়া হবে যে, আরোহীরা পাবে দ্বিগুণ, পদাতিকরা এক গুণ।

রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর خمس الخمس – এর হুকুম

হানাফী মাযহাব মতে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর গনীমতের পঞ্চমাংশের উল্লিখিত পাঁচটি খাতের মধ্যে তিনটি অবশিষ্ট রয়েছে। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর তাঁর পবিত্র সত্তার অংশ এবং আত্মীয়বর্গের সেই অংশ অবশিষ্ট থাকেনি, যা তাঁরা নবীজীকে পূর্বের সাহায্য-সহযোগিতার কারণে পেয়ে থাকতেন। অবশ্য দরিদ্র ও অভাবীদের যে অংশ আছে, তাতে এমন দরিদ্র ও অভাবীদের অগ্রগণ্য রাখা উচিত, যারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয় (কারণ, অভাবীদের অংশ থেকে তাদেরও দেওয়া যায়)।

কোন কোন আলেমের মতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর উক্ত এক পঞ্চমাংশ (পাঁচ ভাগের এক ভাগ خمس الخمس) আমীরুল মুমিনীনকে নিজ খরচাদির জন্য দেওয়া উচিত। والله اعلم

কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, গনীমতের মাল থেকে যখন (আল্লাহর নামের) পঞ্চমাংশ আলাদা করা হত, তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তা থেকে কিছু অংশ বাইতুল্লাহ শরীফের জন্য বরাদ্দ করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা, হাদীস : ৩৩৯৭৩) –কোন কোন ফেকাহবিদ লিখেছেন যে, যে এলাকা থেকে কাবা অনেক দূরে, সেখানে মসজিদসমূহের জন্য তা খরচ করা উচিত।

২. 'মীমাংসার দিন' বলতে বদরের যুদ্ধের দিন উদ্দেশ্য, যেদিন হক ও বাতিলের মাঝে চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল। সেদিন আল্লাহ তাআলা নিজের সর্বোত্তম বান্দার (সা.) উপর বিজয়

যেদিন দুই বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল —আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান[১]—

الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৪২. যখন তোমরা ছিলে এদিকের প্রান্তে এবং ওরা সেদিকের প্রান্তে*[২], আর (বাণিজ্য) কাফেলাটি ছিল তোমাদের চেয়ে নীচে (অর্থাৎ নিম্নভূমিতে)[৩]। আর যদি তোমরা পরস্পর সময় নির্ধারণ করতে চাইতে, তবে নির্ধারিত সময় নিয়ে তোমাদের মধ্যে দ্বিমত হত।[৪] কিন্তু (পূর্ব ওয়াদা ও আলোচনা ছাড়াই আল্লাহ তোমাদের মুখোমুখি করে দিয়েছেন), যাতে আল্লাহ সেই কাজ সম্পাদন করে ফেলেন, যা হওয়া সুনির্ধারিত ছিল– যাতে, যে ধ্বংস হওয়ার সে প্রমাণ (স্পষ্ট হওয়ার) পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকার সে প্রমাণ (স্পষ্ট

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ۗ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِى الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ ۗ

ও সাহায্য অবতীর্ণ করেন, ফেরেশতাদের সাহায্যকারী (রিজার্ভ ফৌজ বা) বাহিনী পাঠান এবং শান্তি ও স্বস্তির অবস্থা নাযিল করেন। সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর গায়বী সাহায্যের প্রতি ঈমান রাখে, তাঁদের পক্ষে গনীমতের মাল থেকে আল্লাহর নামের পঞ্চমাংশ আলাদা করা কঠিন হতে পারে না।

১. তিনি যেমন সেদিন তোমাদের বিজয়ী ও সাহায্য করেছিলেন, ভবিষ্যতেও তিনি তোমাদের বিজয় ও প্রাধান্য দান করতে সক্ষম।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তোমরা ছিলে নিকটবর্তী প্রান্তে এবং ওরা দূরবর্তী প্রান্তে'।

২. 'এদিকের প্রান্ত' দ্বারা উদ্দেশ্য যুদ্ধক্ষেত্রের সেই দিক, যা পবিত্র মদীনার নিকটবর্তী। অদ্রূপ, 'সেদিকের প্রান্ত' হবে তা, যা মদীনা থেকে দূরবর্তী।

৩. অর্থাৎ আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা নীচের দিকে সরে সমুদ্রের ধার দিয়ে যাচ্ছিল।

৪. অর্থাৎ উভয় পক্ষ যদি পূর্ব থেকে যুদ্ধের কোন সময় নির্ধারণ করে অগ্রসর হতে চাইত, তবে তাতে মতভেদ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, অথবা নির্ধারিত সময়ে কোনো পক্ষ পৌছতে ইতস্তত করতে পারত। কেননা, এদিকে মুসলমানগণ কাফেরদের সংখ্যা ও সাজসরঞ্জাম দেখে ভীত ছিল, সেদিকে কাফেররা মুসলমানদের সত্যতা, খোদাভক্তি ও বীরত্বের কারণে ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। সুতরাং উভয় পক্ষেরই যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে বা যুদ্ধে যোগদান করতে দ্বিধা ও অনীহা হতে পারত।

وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۙ

হওয়ার) পর জীবিত থাকে[১]। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[২]।

اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا ؕ وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৪৩. (স্মরণ করুন), যখন আল্লাহ আপনাকে আপনার সপ্নে কাফেরদেরকে (সংখ্যায়) অল্প দেখালেন।* আর যদি তিনি আপনাকে ওদের অধিক দেখাতেন, তবে তোমরা (হে মুসলমানগণ) সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং (যুদ্ধের) বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ (তোমাদের এ থেকে) রক্ষা করেছেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরসমূহে যা আছে সে সম্বন্ধে সম্যক অবগত[৩]।

---

১. অর্থাৎ কুরায়শরা নিজেদের বাণিজ্য কাফেলার সাহায্যার্থে এসেছিল আর তোমরা উক্ত কাফেলার উপর আক্রমণ করতে এসেছিলে। কাফেলা তো তোমাদের হামলা থেকে বেঁচে গেল, কিন্তু দুটি সৈন্যবাহিনী এক ময়দানের দুই প্রান্তে এসে উপস্থিত হল। –এ ছিল আল্লাহ তাআলার কৌশল। যদি তোমরা স্বেচ্ছায় বের হতে, তবে এ রকম সময়মত পৌঁছতে না।

আর বদরের বিজয়ে হুযূর (সা.)-এর সত্যতা কাফেরদের নিকট প্রকাশ পেয়ে গেল। সুতরাং যে মরল সেও নিশ্চিতরূপে জেনে মরল, আর যে বেঁচে রইল সেও সত্যকে চিনে বাঁচল, যাতে আল্লাহ তাআলার হুজ্জত (দলীদ-প্রমাণ) পূর্ণ হয় (মূযেহুল কুরআন)।

আর মরা ও বাঁচা দ্বারা কুফর ও ঈমানও উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ এখন যে ঈমান আনবে এবং যে কুফরের উপর অটল থাকবে, উভয়ের ঈমান ও কুফর হবে সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা দুর্বল মজলুমদের ফরিয়াদ শোনেন এবং তিনি জানেন, কীভাবে তাদের মদদ করতে হয়। দেখ, বদরে মুসলমানদের ফরিয়াদ তিনি কীভাবে শুনলেন এবং কীরূপ মদদ করলেন।

✯ (মূল উর্দূ তাফসীরে এখানে নাসেখ (লিপিকার) কর্তৃক একটি ভ্রম হয়েছে। ৪০ নং আয়াতের উপর যে টীকা লেখা হয়েছে, তিনি তা এখানে পুনর্বার লিখে দিয়েছেন। –সা. গি.)

৩. অর্থাৎ সংখ্যায় কাফেরদের অধিক দেখালে মুসলমানদের কেউ লড়াই করতে সাহস করত, কেউ করত না। এভাবে মতভেদ হয়ে কাজে ঝামেলা হত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা পয়গম্বর আলাইহিস সালামকে স্বপ্নে ওদের সংখ্যা স্বল্প দেখিয়ে এ ভীরুতা ও পরস্পরের মতভেদ থেকে তোমাদের রক্ষা করলেন।

আর তিনি উত্তমরূপে জানেন, কিসে অন্তরে সাহস ও বীরত্ব পয়দা হয় এবং কিসে ভীরুতা ও কাপুরুষতা সৃষ্টি হয়।

وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٤٤﴾

৪৪. এবং (স্মরণ কর), তোমরা যখন পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিলে তখন আল্লাহ তোমাদের দৃষ্টিতে ওদের অল্প দেখিয়েছিলেন এবং ওদের দৃষ্টিতে তোমাদেরও অল্প দেখিয়েছিলেন[১]–, যাতে আল্লাহ ঐ কাজ সম্পন্ন করে ফেলেন, যা হওয়া সুনির্ধারিত ছিল। আর আল্লাহরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে সকল বিষয়।

[রুকূ - ৬]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন সৈন্যদলের সম্মুখীন হবে, তখন দৃঢ়পদ থাকবে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে[২], যাতে তোমরা সফলকাম হও।

---

১. স্বপ্নে পয়গম্বর (আলাইহিস সালাম) এর নিকট কাফেররা খুব স্বল্প দেখা গেল এবং যুদ্ধের সময় মুসলমানদের নিকট কাফেররা কম দেখা গেল, যাতে তারা (মুসলমানগণ) সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন।

পয়গম্বরের স্বপ্ন মিথ্যা হয় না। তিনি যে স্বপ্নে ওদের কম দেখলেন, এর তাৎপর্য এই যে, চিরকাল কাফের থাকবে এমন লোকের সংখ্যা ওদের মধ্যে আসলেই কম ছিল। কারণ, ওদের অধিকাংশই পরে মুসলমান হয়েছিল।

আর এ স্বপ্নের তাবীর (বা ব্যাখ্যা) এও হতে পারে যে, স্বল্প সংখ্যক দেখানোর দ্বারা ওদের পরাজিত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য।

অবশ্য কাফেরদের দৃষ্টিতে যে মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখা গেল, তা বাস্তবই ছিল। উল্লেখ্য যে, এটা তখনকার ঘটনা, যখন উভয় বাহিনী প্রথমে পরস্পর সম্মুখীন হয়। অতঃপর যখন মুসলিমগণ বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ করেন এবং ফেরেশতা-বাহিনী তাঁদের সাহায্যে উপস্থিত হন, তখন কাফেরদের নিকট মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখা যাচ্ছিল। যেমন: সূরা 'আলে-ইমরানে' (আয়াত ১৩) ইরশাদ হয়েছে : وَّاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ (এবং দ্বিতীয় বাহিনী ছিল কাফেরদের, এরা খোলা চোখে মুসলমানদেরকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখছিল।)

২. আল্লাহ তাআলার স্মরণের মধ্যে নামায, দো'য়া, তাকবীর ও অন্যান্য যিকরুল্লাহ শামিল রয়েছে। 'যিকরুল্লাহ'র শুফল এই যে, 'যাকের' এর অন্তর দৃঢ় ও শান্ত থাকে। জেহাদে এরই প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি। এই 'যিকরুল্লাহ'ই ছিল সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র। ইরশাদ হয়েছে : اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ، اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ . (سورة الرعد، الآية ٢٨)

৪৬. আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান্য করবে এবং পরস্পর বিবাদ করবে না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রতাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে[১]; আর ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন[২]।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ۝

১. অর্থাৎ তোমরা প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন হয়ে গেলে তোমাদের উত্থান-অগ্রগতি ও ভয়মিশ্রিত শান-শৌকত এবং তোমাদের প্রতি শত্রুদের ভয়-ভীতি কমে যাবে। তাহলে পরবর্তীতে তোমরা কী করে বিজয় ও সফলতা অর্জন করবে?

২. জেহাদের সময় যে দুঃখ-কষ্ট ও কঠোরতার সম্মুখীন হতে হয়, তা ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে সহ্য কর– হিম্মত হারিয়ো না। প্রবাদ আছে, হিম্মতের সহায় আল্লাহ তাআলা।

এ আয়াতে মুসলমানদের সাফল্যের চাবিকাঠি কী, তা বাতলানো হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা গেল, শুধু সেনাবাহিনী, অস্ত্রসস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের দ্বারা বিজয় ও সাফল্য লাভ হয় না, বরং তা হাসিল হয় অবিচলতা, ধৈর্য ও অটলতা, অন্তরের স্বস্তি ও বল, আল্লাহ তাআলার স্মরণ, আল্লাহ ও রাসূল এবং রাসূলের স্থলাভিষিক্ত নেতাদের আনুগত্য ও ফরমাবরদারী এবং পরস্পরের ঐক্য ও একাত্মতার বলে।

এস্থলে খুব মনে চাচ্ছে, সাহাবীদের সম্পর্কে মুফাসসির ইবনে কাছীরের কয়েকটি কথা উল্লেখ করি, যা ঈমান ও এখলাসের গভীরতম তলদেশ থেকে উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বলেন :

وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بما أمرهم الله ورسوله به وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم ولايكون لأحد ممن بعدهم، فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وإطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربًا في المدّة اليسيرة مع قلّة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والجيوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم قهروا الجميع حتى علت كلمةُ الله وظهر دينُه على سائر الأديان وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقلّ من ثلاثين سنة فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم إنه كريم تواب -

সাহাবায়ে কিরাম (রা) বীরত্বে, আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ পালনে এবং তাঁদের হেদায়াতের অনুসরণের ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, যার নজীর তাঁদের পূর্ববর্তী কোনো যুগে ও উম্মতে নেই এবং তাঁদের পরে কারো মধ্যে হবে না। তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে ও তাঁর নির্দেশ অনুসরণের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের দেশসমূহ ও দেশবাসীদের অন্তর জয় করে ফেলেন, যদিও তাঁদের ধন ও জনবল ছিল অতি

৪৭. আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে বের হয়েছিল দম্ভভরে ও লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে। আর ওরা যা কিছু করে, আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন[১]।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝

স্বল্প। অন্য দিকে ছিল রোম, পারস্য, তুর্ক, মঙ্গোল, বারবার, সুদানের বিভিন্ন জাতি, কিবতি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিশাল সৈন্যবাহিনী ও বিপুল ধন-সম্পদ। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুষ্টিমেয় সাহাবীদের সামনে ওরা সবাই পরাজিত হয়। অবশেষে আল্লাহর কলেমা বুলন্দ হল এবং তাঁর দীন অন্য সব দীনের উপর বিজয় লাভ করল। ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত প্রসার লাভ করল– ত্রিশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে।

আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁদের সকলকে সন্তুষ্ট করুন। আর তাঁদেরই দলে আমাদের হাশর করুন। নিশ্চয় তিনি দয়ালু, তওবা কবুলকারী।

১. আবু জাহল সেনাবাহিনী নিয়ে খুব ধুমধাম ও গানবাদ্যসহ বের হয়েছিল, যাতে মুসলিমগণ ভীত হয়ে পড়েন এবং আরবের অন্য গোত্রগুলোর উপর মক্কার মুশরিকদের প্রভাব পড়ে। পথে সে আবু সুফিয়ানের পাঠানো সংবাদ পেল যে, বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণের হাত থেকে বেঁচে গেছে। সুতরাং তোমরা মক্কায় প্রত্যাবর্তন কর।

(কিন্তু) আবু জাহল অত্যন্ত গর্বভরে বলল, 'আমরা তখনি প্রত্যাবর্তন করতে পারি, যখন বদরের ময়দানে পৌঁছে আনন্দ-উৎসব করে নেব। গায়িকা-মেয়েরা আনন্দ ও সাফল্যের গীত গাবে, আমরা মদ পান করব, মজা লুটব এবং তিনদিন পর্যন্ত উট যবেহ করে আরব গোত্রগুলির মেহমানীর বন্দোবস্ত করব, যাতে এ দিনটা আরবের মধ্যে চিরকালের জন্য আমাদের স্মৃতিরক্ষাকারী হয়ে থাকে। এবং ভবিষ্যতের জন্য এই মুসলমানদের দিল এমন ভাঙ্গা ভাঙ্গে যে, আর কখনো আমাদের মোকাবেলার দুঃসাহস না করে।

অথচ ওর এ খবর ছিল না যে, সে যেসব অভিসন্ধি করছে এবং সংকল্প আঁটছে, তা সবই আল্লাহর মুঠিতে রয়েছে। এসবকে কার্যকরী হতে দেওয়া- না দেওয়া তাঁরই ইচ্ছাধীন, বরং ইচ্ছা করলে তিনি সব কিছু উলটিয়ে দিতে পারেন। –বস্তুত তাই হল। বদরের পানি ও মদের সুরাহির স্থলে ওদের মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হল। আনন্দ-উল্লাসের অনুষ্ঠান তো করতে পারেনি, তবে বিলাপ ও আর্তনাদের ধারা বদর থেকে মক্কা পর্যন্ত প্রবাহিত হল। যে ধন-সম্পদ গর্বপ্রকাশ ও প্রদর্শনীতে ব্যয় করতে চেয়েছিল, তা মুসলমানদের জন্য গনীমতের মালে পরিণত হল। বদরের ময়দানে ঈমান ও তাওহীদের চিরস্থায়ী বিজয়ের ভিত্তি স্থাপিত হল। এ ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে আল্লাহ তাআলা গোটা পৃথিবীর সকল ধর্ম-জাতির ভাগ্যের মীমাংসা করে দিলেন।

৪৮. (সে সময়টি স্মরণযোগ্য), যখন শয়তান ওদের দৃষ্টিতে ওদের কার্যকলাপ শোভন করে তুলেছিল এবং বলেছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপরে বিজয়ী হতে পারবে না এবং আমি তোমাদের সাহায্যকারী।' অতঃপর যখন উভয় সৈন্যদল মুখোমুখি হল, সে উলটা দিকে পলায়ন করল এবং বলল, 'আমি তোমাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক*, নিশ্চয় আমি তা দেখছি যা তোমরা দেখ না। আমি তো আল্লাহকে ভয় করি। আর আল্লাহ অতি কঠোর শাস্তিদাতা' [১]।

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۟

যা হোক, এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের এ কথা শিক্ষা দিয়েছেন যে, শুধু হানাহানি ও রক্তারক্তির নাম জেহাদ নয়, বরং জেহাদ হচ্ছে মহামর্যাদাশালী ইবাদত। অহংকার করা বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে তা কবুল হয় না। অতএব তোমরা গর্ব ও অহংকার, লোক দেখানো ও প্রদর্শনী করে কাফেরদের পথ অবলম্বন করো না।

* **দ্বিতীয় তরজমা**– 'তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই'।

১. কুরায়শদের নিজেদের শক্তি ও ঐক্যের ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা ও গর্ব ছিল। কিন্তু বনী কেনানা গোত্রের সাথে কুরায়শদের বিবাদ ছিল বলে আশঙ্কা হল, যুদ্ধ জয়ের পথে বনী কেনানা বাধা হয়ে দাঁড়ায় কি না। তাই শয়তান ওদের উৎসাহ প্রদান ও মনোবল বৃদ্ধির জন্য কেনানা গোত্রের প্রধান সুরাকা ইবনে মালেকের আকৃতি ধারণপূর্বক আপন সৈন্যদল নিয়ে হাজির হল এবং আবু জাহল প্রমুখকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আমরা সকলে তোমাদের সাথেই রয়েছি। কেনানা গোত্রের দিক থেকে নিশ্চিন্ত থাক, আমরা তোমাদের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

যখন বদরে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং জিবরাঈল ও অন্যান্য ফেরেশতা শয়তানের দৃষ্টিগোচর হলেন, তখন সে আবু জাহলের সঙ্গ ছেড়ে উলটা দিকে পলায়ন করল। আবু জাহল বলল, সুরাকা! প্রয়োজনের সময় ধোঁকা দিয়ে কোথায় যাচ্ছ? শয়তান বলতে লাগল, 'আমি তোমাদের সাথে থাকতে পারি না। কারণ, আমার নজরে এমন সব জিনিস আসছে যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ)। আল্লাহর (সৈন্যদলের) ভয়ে আমার অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত, এখন আর এখানে থাকার সাহস নেই, পাছে কঠিন শাস্তি ও বিপদে পড়ে যাই।' (তাফসীরে তবারী ১১/২২১)

হযরত কাতাদাহ বলেন, অভিশপ্ত শয়তান মিথ্যা বলেছে। ওর দিলে আল্লাহর ভয় ছিল না। তবে সে বুঝে নিয়েছিল যে, এখন কুরায়শ বাহিনী ধ্বংসের কবলে পতিত হয়েছে, কোন শক্তিই ওদের রক্ষা করতে পারবে না। (তাফসীরে তবারী ১১/২২৩)

[রুকূ - ৭]

৪৯. (সে সময়টিও স্মরণযোগ্য), যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা বলেছিল, 'এ লোকগুলোকে তাদের দীন দাম্ভিক বানিয়ে দিয়েছে* ।' যে কেউ আল্লাহর

إِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ۗ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

শয়তানের চিরন্তন চরিত্র হচ্ছে, সে স্বীয় অনুসারীদের ধোঁকা দিয়ে এবং ধ্বংসের মুখে ফেলে আসল সময়ে কেটে পড়ে। এস্থলেও উক্ত নীতিরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে- يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوْرًا (نساء : ١٢٠) (সে ওদের প্রতিশ্রুতি এবং আশা-ভরসা দেয়। আর শয়তান ওদের যা কিছু প্রতিশ্রুতি দেয় তা সবই প্রবঞ্চনা।)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانِ اكْفُرْ، فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (الحشر : ١٦)

(এদের অবস্থা শয়তানের মত, যখন সে মানুষকে বলল, 'তুমি কাফের হও', পরে যখন সে কাফের হল, তখন শয়তান বলল, 'তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি আল্লাহকে ভয় করি, যিনি সমগ্র জগতের রব।')

আরো ইরশাদ হয়েছে :

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. (إبراهيم : ٢٢)

(যখন সব বিষয়ের মীমাংসা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন, আর আমিও তোমাদের ওয়াদা দিয়েছিলাম, অতঃপর আমি তোমাদের সাথে ওয়াদার খেলাফ করেছি। আর তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না, তবে এতটুকু যে, আমি তোমাদের আহ্বান করেছিলাম, আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং আমাকে দোষ দিয়ো না, বরং নিজেদেরকেই দোষ দাও। আমিও তোমাদের সাহায্য করতে পারব না, তোমরাও আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। তোমরা যে ইতিপূর্বে আমাকে শরীক বানিয়েছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালেম, তাদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক আযাব।)

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ধোঁকায় ফেলেছে'

উপর নির্ভর করবে, তো নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[১]।

فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

৫০. আপনি (বড় করুণ দৃশ্য দেখবেন,) যদি (কাফেরদের) তখন দেখেন, যখন ফেরেশতারা কাফেরদের জান এ অবস্থায় কব্‌জ করে যে, তাঁরা ওদের মুখে ও পিঠে আঘাত করতে থাকে এবং (বলতে থাকে) 'তোমরা জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন কর'[২]।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

৫১. তা (শাস্তি) সেসব কর্মের কারণে, যা তোমরা নিজ হাতে অগ্রে পাঠিয়েছ এবং এজন্য যে, আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন[৩]।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

---

১. একদিকে মুসলমানদের সংখ্যার স্বল্পতা ও সাজসরঞ্জামের অভাব, অপরদিকে তাদের এরূপ বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে মুনাফিক ও দুর্বল-মনা মুসলমানরা বলতে শুরু করেছিল, এই মুসলমানরা আপন দীন ও নিজেদের সত্যতা নিয়ে অহমিকায় লিপ্ত। এজন্যই এমন অসম যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে, আর এভাবে নিজেদের মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করছে।

এর জওয়াবে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'এটা অহমিকা নয়, বরং তাওয়াক্কুল (আল্লাহ-নির্ভরতা)।' আল্লাহর মহাশক্তির উপর যার আস্থা থাকে এবং যে এ বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু ঘটবে তা সম্পূর্ণ সঠিক ও হেকমতপূর্ণ হবে– সে সত্য দীনের জন্য এমনি নির্ভীক ও বাহাদুর হয়ে যায়।

২. অর্থাৎ আঘাত হেনে হেনে ফেরেশতাগণ বলেন, 'এখন তো এই শাস্তি গ্রহণ কর, আর ভবিষ্যতে জাহান্নামের শাস্তি আস্বাদন করবে।'

অনেক মুফাসসির একেও বদরের যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট ধরেছেন, অর্থাৎ এ যুদ্ধে যেসব কাফের নিহত হয়েছিল, তাদের সাথে ফেরেশতাদের উক্ত আচরণ ছিল। –তবে আয়াতের শব্দাবলীর ব্যাপকতা সকল কাফেরকেই অন্তর্ভুক্ত করে, তাই অগ্রগণ্য মতানুযায়ী এই ঘটনা আলমে বরযখের। এক্ষেত্রে বদরের ঘটনাবলির সাথে আয়াতের সামঞ্জস্য এই যে, দুনিয়াতে উক্ত কাফেরদের এমন দুর্গতি হল, আর বরযখে হবে এই অবস্থা। তাহলে আখেরাতের শাস্তির অবস্থা কত ভয়াবহ, তা সহজেই অনুমেয়!

৩. অর্থাৎ এসব তোমাদেরই কার্যকলাপের শাস্তি। নতুবা আল্লাহর দরবারে জুলুমের প্রশ্নই আসে না। যদি আল্লাহর দিক থেকে তিল পরিমাণ জুলুমের সম্ভাবনা থাকত, তবে তো তাঁর মহামর্যাদার বিবেচনায় তিনি জালেম নন, বরং চরম জালেম (ظلام) সাব্যস্ত হতেন। কেননা, কামেল সত্তার প্রত্যেকটি গুণও কামেল বা পরিপূর্ণই হয়ে থাকে (যা হোক, 'তিনি ظلام –চরম জুলুমকারী –নন' বলে এ কথাই ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য যে, তাঁর দিক থেকে সামান্য জুলুমও হতে পারে না)।

৫২. (ওদের অবস্থা এমন) যেমন ফেরাওনের লোকজন ও তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা যে, ওরা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল। সুতরাং আল্লাহ ওদের গোনাহর কারণে ওদের পাকড়াও করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, কঠোর শাস্তিদাতা[১]।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

৫৩. তা (অর্থাৎ বিনা অপরাধে শাস্তি না দেওয়া, বরং অপরাধ করার পরই শাস্তি প্রদানের নীতি) এ কারণে যে, আল্লাহ এমন কোন নেয়ামতকে যা তিনি কোন সম্প্রদায়কে দান করেছেন– পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অন্তরের বিষয়কে পরিবর্তন করে ফেলে*; এবং এ কারণে যে, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[২]।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

৫৪. (এই কাফেরদের অবস্থা এমন) যেমন ফেরাওনের লোকদের ও তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা যে, ওরা স্বীয় রবের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল। ফলে আমি ওদের গোনাহর কারণে ওদের ধ্বংস করে দিয়েছি

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ

---

১. অর্থাৎ পূর্ব থেকে এই রীতিই চলে এসেছে যে, যখন লোকেরা আল্লাহ তাআলার বাণীকে অস্বীকার করেছে অথবা নবীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দাঁড়িয়ে গেছে, তখন আল্লাহ তাআলা ওদের কোন না কোন আযাবে পাকড়াও করেছেন।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যে পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলে'।

২. অর্থাৎ যখন মানুষ নিজ বেইনসাফী ও দুষ্কৃতির মাধ্যমে সৎকর্মের স্বাভাবিক শক্তি ও যোগ্যতা নষ্ট করে ফেলে এবং খোদাপ্রদত্ত আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক নে'য়ামতগুলি তাঁর বাতলানো পথে ব্যয় না করে, বরং উলটা তাঁর বিরোধিতায় ব্যয় করতে শুরু করে– তখন আল্লাহ তাআলা স্বীয় নে'য়ামত ওদের থেকে ছিনিয়ে নেন এবং অনুগ্রহ প্রদানকে প্রতিশোধ গ্রহণের দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। অতএব তিনি যার সঙ্গে যে আচরণ করেন, তা যথার্থ ও যথাযথই হয়ে থাকে।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যে পর্যন্ত নিয়ত ও বিশ্বাসে পরিবর্তন না হয়, আল্লাহপ্রদত্ত নে'য়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয় না।' অর্থাৎ তিনি ما بأنفسهم দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ত ও বিশ্বাস উদ্দেশ্য করেছেন, যেমনটি আয়াতের তরজমা থেকেও বোঝা যাচ্ছে।

فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ

এবং ফেরাওনের লোকদের ডুবিয়ে দিয়েছি। আর ওরা সবাই ছিল জালেম[১]।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

৫৫. নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সৃষ্টিকুলের মধ্যে সব চেয়ে নিকৃষ্ট তারা, যারা কাফের হয়েছে, সুতরাং ওরা ঈমান আনে না—

اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ

৫৬. যাদের সাথে আপনি চুক্তি করেছেন। তার পরও ওরা প্রত্যেকবার নিজ চুক্তি ভঙ্গ করে এবং ওরা ভয় করে না[২]।

---

১. আল্লাহ তাআলা ফেরাওনীদের ও তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে অন্যায়-অপরাধের শাস্তিতে ধ্বংস করেছেন এবং বিশেষভাবে ফেরাওনীদের ডুবিয়ে মেরেছেন। এসব তখনি হয়েছে, যখন ওরা খোদাদ্রোহিতা ও দুষ্কৃতি করে নিজেরা নিজেদের জানের উপর জুলুম করেছে। নতুবা কোন সৃষ্টির সাথেই খোদার ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই।

২. যারা সর্বদার জন্য কুফর ও বেঈমানী করতে সচেষ্ট, পরিণাম সম্পর্কে নির্ভয়, এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তিভঙ্গে অভ্যস্ত, তারা আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম পশু। চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতায় ফেরাওনীদের অবস্থা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ - فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ . (أعراف : ١٣٤ - ١٣٥)

(আর যখন ওদের উপর কোন আযাব পতিত হত, তখন ওরা বলত, 'হে মূসা! আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট দো'য়া করুন, যেরূপ আপনার রব আপনাকে শিখিয়েছেন। আপনি যদি আমাদের থেকে এই আযাব দূর করে দেন, তবে অবশ্যই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব এবং আপনার সঙ্গে বনী ইসরাঈলকে যেতে দেব।' অতঃপর আমি যখন ওদের উপর থেকে আযাব তুলে নিতাম এক নির্দিষ্টকালের জন্য, যে পর্যন্ত ওদের পৌঁছা অবধারিত ছিল– তখনই ওরা অঙ্গীকার ভেঙ্গে ফেলত।)

আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় বনী কুরায়জা প্রভৃতি ইহুদী গোত্রগুলোরও এ চরিত্রই ছিল। তাঁর সঙ্গে ওরা এই অঙ্গীকার করত, 'আমরা মক্কার মুশরিকদের সাহায্য করব না।' কিন্তু ওদের সাহায্য করত এবং বলত, অঙ্গীকারের কথা আমাদের স্মরণ ছিল না। বারবার এরূপই করত। এমন বিশ্বাসঘাতকদের সাথে কী রকম আচরণ হওয়া উচিত, তা আল্লাহ তাআলা সামনে বলেছেন।

৫৭. অতএব আপনি যদি ওদেরকে যুদ্ধে পেয়ে যান, তবে ওদের মাধ্যমে ওদের পশ্চাতে যারা (অর্থাৎ যে কাফেররা) আছে, তাদের বিক্ষিপ্ত করে দিন (অর্থাৎ ওদের উপর এমন আক্রমণ চালান, যা দেখে পশ্চাদ্বর্তীরা পালিয়ে যায়), যাতে এই পশ্চাদ্বর্তীরা শিক্ষা লাভ করে।

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۝

৫৮. আর যদি আপনি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাস-ভঙ্গের আশঙ্কা করেন, তবে (ওদের চুক্তি) ওদের দিকে এমনভাবে নিক্ষেপ করুন, যাতে ওরা ও আপনি সমান হয়ে যান*। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না[১]।

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۝

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যথাযথ নিয়মে (ওদের চুক্তি) ওদের দিকে ফিরিয়ে দিন (অর্থাৎ ওদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিন যে, তোমাদের সঙ্গে কৃত চুক্তি আমরা বাতিল করছি)'

১. অর্থাৎ যদি এই বিশ্বাসঘাতকরা প্রকাশ্যভাবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আপনার মোকাবেলায় যুদ্ধে অবতরণ করে, তবে ওদের এমন শাস্তি দিন যা দেখে ওদের পশ্চাদ্বর্তীরা বা ওদের পরবর্তী বংশধররাও শিক্ষা গ্রহণ করে এবং কখনো চুক্তিভঙ্গের দুঃসাহস করতে না পারে।

আর যদি কোন সম্প্রদায় প্রকাশ্যভাবে প্রতারণা করল না বটে, কিন্তু আকার-ইঙ্গিতে মনে হচ্ছে যে, চুক্তিভঙ্গে প্রস্তুত হচ্ছে, তবে ওদেরকে চুক্তি বাতিল করার কথা জানিয়ে দিয়ে সংগত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি আপনার রয়েছে। তা জানিয়ে দেওয়া এজন্য জরুরী, যাতে উভয় পক্ষ পূর্বের ওয়াদা-অঙ্গীকার সম্পর্কে দ্বিধা-সন্দেহে না থাকে, উভয়ে সমানভাবে অবগত ও সচেতন হয়ে নিজ নিজ প্রস্তুতি ও হেফাজতে মশগুল হতে পারে। আপনার দিক থেকে কোন রকম প্রতারণা ও খেয়ানত যেন না হয়, সকল ব্যাপার পরিষ্কার থাকবে। আল্লাহ তাআলা খেয়ানতের আচরণ পছন্দ করেন না– চাই তা কাফেরদের সাথে হোক।

একটি ঘটনা

'সুনান' এর কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে, হযরত মুআবিয়া (রা) ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে নির্ধারিত সময়ের জন্য চুক্তি হয়েছিল। সেই নির্ধারিত সময়ের ভিতর হযরত মুআবিয়া স্বীয় সৈন্যদলকে রোমসীমান্তের দিকে অগ্রসর করা শুরু করেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, রোমীয়দের সীমান্ত এলাকার নিকটবর্তী হয়ে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকবেন, যাতে চুক্তিকাল অতিবাহিত হওয়ামাত্রই আক্রমণ করতে পারেন। যখন এসব কার্যক্রম চলছিল, তখন জনৈক বৃদ্ধ আরোহী এ কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসলেন : الله أكبر الله أكبر وفاءٌ لا غدر 'আল্লাহু

[রুকূ - ৮]

৫৯. কাফেররা যেন কিছুতেই এমন মনে না করে যে, ওরা আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। নিশ্চয় ওরা (আমাকে) অক্ষম করতে পারবে না[১]।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ۚ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ۝

৬০. আর (হে মুসলমানগণ), তোমরা কাফেরদের (মোকাবেলা করার) জন্য তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি ও পালিত ঘোড়ার দল প্রস্তুত রাখ[২], যার দ্বারা তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّاللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ

আকবার, আল্লাহু আকবার; অঙ্গীকার পূরণ কর,' চুক্তি ভঙ্গ করো না। (সেই বৃদ্ধ আরো বললেন)– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোন জাতির সঙ্গে চুক্তি করা হলে কোন গ্রন্থি খুলতেও নেই, বাঁধতেও নেই, যে পর্যন্ত না চুক্তিকাল শেষ হয়ে যায় অথবা দ্বিতীয় পক্ষকে অঙ্গীকার থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। মুআবিয়া (রা) এই সংবাদ পাওয়ামাত্র প্রত্যাবর্তন করলেন। অতঃপর দেখলেন যে, সে বৃদ্ধ ব্যক্তি হচ্ছেন (সাহাবী) হযরত আমর ইবনে আম্বাসা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৭৫৩; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৬৭১)

১. চুক্তি প্রত্যাহার করার যে বিধান ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যাহারের কথা কাফেরদের জানাতে হবে, এ বিধানের কথা জেনে কাফেরদের আনন্দিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কেননা, ওরা ভাবতে পারে যে, প্রত্যাহারের বিষয়ে অবগত হওয়ার পর আমরা নিজেদের নিরাপত্তার এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নেওয়ার পূর্ণ সুযোগ পাব।

এর উত্তরে বলা হচ্ছে যে, তোমরা যতই প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ কর না কেন, আল্লাহ যখন মুসলমানদের হাতে তোমাদের পরাজিত ও লাঞ্ছিত করতে এবং দুনিয়া বা আখেরাতে শাস্তি দিতে চাইবেন– তখন তোমরা কোন উপায়েই তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবে না। তাঁর কুদরত ও আধিপত্যের সীমা থেকে বের হয়ে পালাতেও পারবে না। অর্থাৎ এস্থলে মুসলমানদের সান্ত্বনা দেওয়া হল যে, তারা আল্লাহর উপর ভরসা করলে এবং তাঁর হুকুম-আহকাম পালন করলে সকলের উপর জয় লাভ করবে, কেউ তাদের পরাজিত করতে পারবে না।

২. অর্থাৎ খোদার উপর নির্ভর করার অর্থ এই নয় যে, শরী'য়তসম্মত জরুরী উপায়-উপকরণ বর্জন করতে হবে। তা নয়, বরং যথাসাধ্য জেহাদের সাজসরঞ্জাম জমা করা মুসলমানদের উপর ফরয। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঘোড়ায় আরোহন, তরবারি চালনা, তীর-ধনুক ব্যবহার ইত্যাদির প্রশিক্ষণ জেহাদেরই সরঞ্জাম ছিল। বর্তমানকালে বন্দুক, তোপ, উড়োজাহজ, সাবমেরিন, সামুদ্রিক যুদ্ধজাহাজ, সামরিক পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি তৈরি করা ও ব্যবহার করা এবং যুদ্ধাস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, বরং ব্যায়াম (বা সামরিক কুচকাওয়াজ) ইত্যাদি করা সবই জেহাদের সরঞ্জাম। অনুরূপ, ভবিষ্যতেও যেসব হাতিয়ার ও যুদ্ধাস্ত্র তৈরি হবে, তাও ইনশাআল্লাহ আয়াতের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

দُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝

রাখবে আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের এবং এরা ছাড়াও অন্য (কাফের)দের, যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ তাদের জানেন[১]। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তার (প্রতিদান) তোমাদের পুরাপুরি দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না[২]।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৬১. আর ওরা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও তার দিকে ঝুঁকুন এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করুন। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[৩]।

আর ঘোড়া সম্পর্কে তো স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য আল্লাহ তার কপালে কল্যাণ রেখে দিয়েছেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ২৮৫০) –অন্য হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি জেহাদের নিয়তে ঘোড়া পালে, সে তার খাওয়া, পান করা, এমনকি (তার) প্রত্যেক পদক্ষেপে প্রতিদান পায় (সহীহ বুখারী, হাদীস : ২৮৬০)। আর তার খাদ্য প্রভৃতি পর্যন্ত কিয়ামতের দিন পাল্লায় ওজন করা হবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ২৮৫৩)

১. অর্থাৎ এসব সাজসরঞ্জাম ও প্রস্তুতি শত্রুদের মনে ভীতির সঞ্চার ও প্রভাব প্রতিষ্ঠার একটা বাহ্যিক উপকরণ। নতুবা বিজয় ও সফলতার আসল উপকরণ তো আল্লাহর সাহায্য, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আর 'যাদের তোমরা জান না' বলতে মুনাফিকরা উদ্দেশ্য, যারা মুসলমানের ছদ্মাবরণে থাকত। অথবা 'বনী কুরাইজা' গোত্রের ইহুদী, অথবা রোমান ও পারসিক প্রভৃতি জাতি উদ্দেশ্য, যাদের সঙ্গে পরবর্তীকালে (মুসলমানদের) মোকাবেলা হওয়ার ছিল।

২. এতে আর্থিক জেহাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ জেহাদের জন্য তোমরা যে পরিমাণ ধন-সম্পদ খরচ করবে, তার প্রতিদান পুরাপুরি পাবে। এক দেরহামের পরিবর্তে সাতশ' দেরহাম। وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন)। আর অনেক সময় দুনিয়াতেও অনেক বেশি প্রতিদান লাভ হয়ে যায়।

৩. মুসলমানদের রণপ্রস্তুতি ও জেহাদী জযবায় ভরপুর কুরবানী লক্ষ্য করে কাফেরদের ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ার এবং সন্ধি ও বন্ধুত্বের আকাঙ্ক্ষী হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল, তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইরশাদ হচ্ছে যে, কল্যাণদর্শিতা সাপেক্ষে আপনিও সন্ধির হাত সম্প্রসারিত করে দিন। কারণ, জেহাদের উদ্দেশ্য রক্তারক্তি নয়, বরং আল্লাহ তাআলার কালেমা বুলন্দ করা এবং ফেতনা দূর করা। যদি রক্তারক্তি ছাড়াই এ উদ্দেশ্য

৬২. আর যদি ওরা আপনাকে ধোঁকা দিতে চায়, তবে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই আপনাকে তাঁর সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন[১]।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَالَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۶۲﴾

৬৩. এবং তিনি তাদের (অর্থাৎ মুমিনদের) অন্তরে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। আপনি যদি পৃথিবীর সবকিছু ব্যয় করে ফেলতেন, তবুও তাদের অন্তরে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ-ই তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[২]।

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۶۳﴾

হাসিল হয়ে যায়, তবে আর অযথা রক্ত প্রবাহিত করার প্রয়োজন কী? আর যদি এ আশঙ্কা হয় যে, হয়ত সন্ধির অন্তরালে কাফেররা আমাদের ধোঁকা দিতে চায়, তবে এমন আশঙ্কার পরোয়া করবেন না, আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করবেন। তিনি ওদের নিয়ত জানেন এবং ওদের গোপন পয়পরামর্শ শোনেন। তাঁর সহায়তার মোকাবেলায় ওদের বদ উদ্দেশ্য কার্যকরী হতে পারবে না।

১. যদি সন্ধি করার পর ওরা দাগাবাজি ও চুক্তিভঙ্গের এরাদা করে নেয়, তবে চিন্তা করবেন না। আপনার সাহায্যের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ওদের সব ধোঁকা ও প্রতারণা ব্যর্থ করে দেবেন। তিনিই তো বদরের যুদ্ধে আপনাকে গায়বী সাহায্য করেছিলেন এবং বাহ্যিকভাবে নিবেদিতপ্রাণ ও আত্মত্যাগী মুসলমানদের দ্বারা আপনার সহযোগিতা করেছিলেন।

২. ইসলামপূর্ব যুগে আরবে ঝগড়া-বিবাদ, হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ ও রক্তারক্তির বাজার গরম ছিল। সামান্য সামান্য বিষয়ে বিভিন্ন গোত্র পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হত। দু'দলে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে যুগযুগ ধরে তার আগুন জ্বলতে থাকত। মদীনার 'আউস' ও 'খাযরাজ' নামে দুটি গোত্রের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ এবং পুরানো শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের ধারা কোনক্রমেই খতম হচ্ছিল না।

এ অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদ ও মারেফত এবং ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বিশ্বজনীন পয়গাম নিয়ে আবির্ভূত হলেন। তখন লোকেরা তাঁকেই শত্রুপক্ষ সাব্যস্ত করে নিল এবং সকলে মিলে বিরোধিতা ও শত্রুতার তীর সেদিকে ঘুরিয়ে দিল। পুরনো হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছেড়ে দিয়ে সব রকমের দুশমনীর জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিল। ওরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়েত ও নসীহতকে উপেক্ষা করত। দুনিয়ায় এমন কোনো শক্তি ছিল না, যা এই হিংস্র প্রাণী ও চতুষ্পদ পশুপালের মাঝে আল্লাহ তাআলার মারেফত ও নবীর

৬৪. হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহ এবং আপনার সঙ্গে যে মুমিনরা আছে তারাই যথেষ্ট[১]।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۝

[রুকূ - ৯]

৬৫. হে নবী! মুমিনদের যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করুন। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে (ওদের) দু'শজনের উপর জয়ী হবে, আর তোমাদের মধ্যে যদি একশজন (দৃঢ়পদ) ব্যক্তি থাকে, তবে এক হাজার কাফেরের উপর জয়ী হবে, কারণ ওরা এমন সম্প্রদায়, যারা বোঝে না[২]।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ۝

মহব্বতের রূহ ফুঁকে দিয়ে এবং তাওহীদের সুরা পান করিয়ে সকলকে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির শৃঙ্খলে বেঁধে দিতে পারে এবং ওই পবিত্র সত্তার গোলাম ও নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিকে পরিণত করতে পারে, যাঁর চেয়ে বেশি ঘৃণ্য ওদের নিকট ইতিপূর্বে কেউ ছিল না।

নিঃসন্দেহে পৃথিবীপৃষ্ঠের সমস্ত সম্পদ ব্যয় করেও যে উদ্দেশ্য হাসিল করা যেত না, তা আল্লাহ তাআলার রহমত ও সাহায্যে অতি সহজে হাসিল হল। আল্লাহ তাদের একের প্রতি অন্যের অন্তরে আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি প্রীতি-মহব্বত ঢেলে দিলেন। তারপর বরকতরাশির উৎস অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তাকে সকলের প্রীতি-মহব্বতের মিলনকেন্দ্র বানিয়ে দিলেন।

আকস্মিকভাবে অন্তরসমূহের মধ্যে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা আল্লাহরই অসীম কুদরতের নিদর্শন এবং এমন তীব্র প্রয়োজনের সময় সকলকে মহব্বত ও সম্প্রীতির একই কেন্দ্রবিন্দুতে সমবেত করে দেওয়া তাঁর পরম হেকমতের দলীল।

১. এ আয়াতের দুই অর্থ হতে পারে। (১) অধিকাংশ সালাফের নিকট অর্থ এই যে, হে নবী! আপনার ও আপনার সঙ্গী মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। অর্থাৎ সংখ্যার স্বল্পতা, সাজসরঞ্জামহীনতা ইত্যাদি কারণে ঘাবড়াতে নেই। (২) আর কোন কোন আলেমের মতে অর্থ এই যে, হে নবী! আপনার জন্য আসলে তো এক খোদাই যথেষ্ট, আর জাহেরী উপায়-উপকরণের বিবেচনায় খাঁটি মুসলমানদের জামাত যথেষ্ট, চাই যত ছোটই হোক না কেন। এ হিসাবে এ যেন– اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ -এর সারমর্ম।

২. আয়াতে মুসলমানদের এ বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে যে, তারা যেন সংখ্যায় স্বল্প হলেও হিম্মতহারা না হয়। আল্লাহর রহমতে তারা দশগুণ শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। কেননা, মুসলমানের লড়াই একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। সে আল্লাহকে চিনে, তাঁর সন্তুষ্টিকে বুঝে

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ۚ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা হাল্‌কা করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনেছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যদি একশ দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে (ওদের) দু'শজনের উপর জয়ী হবে, আর তোমাদের মধ্যে যদি এক হাজার (দৃঢ়পদ) ব্যক্তি থাকে, তবে (ওদের) দুহাজারের উপর জয়ী হবে- আল্লাহর হুকুমে। আর আল্লাহ রয়েছেন দৃঢ়পদ ব্যক্তিদের সঙ্গে[১]।

এবং এ অনুভূতি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয় যে, আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করাই আসল জীবন। তার বিশ্বাস রয়েছে যে, আমার সমস্ত ত্যাগের সুফল আখেরাতে অবশ্যই লাভ হবে, আমি জয়ী হই বা পরাজিত হই। আর আল্লাহ তাআলার কলেমা বুলন্দ করার জন্য যে দুঃখকষ্ট আমি সহ্য করি, তার বদৌলতে আমি সার্বক্ষণিক খুশি ও চিরকালীন আনন্দের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হব।

মুসলমান যখন এ চেতনা নিয়ে জেহাদ করে, তখন খোদায়ী সমর্থন তার সাহায্যকারী হয় এবং মৃত্যুর ভয় আর তার থাকে না। এ জন্যই পূর্ণ বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে সে যুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে, কাফের যেহেতু এই তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারে না, তাই সে শুধু নিকৃষ্ট ও নশ্বর স্বার্থ লাভের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মত লড়াই করে এবং মনোবল ও গায়বী মদদ থেকে মাহরূম থাকে। –এ কারণেই সুসংবাদ দেওয়ার ঢংয়ে মূলত হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, মুমিনদেরকে তাদের চেয়ে দশগুণ শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে লড়তে হবে। তারা বিশজন হলে দু'শ কাফেরের মোকাবেলায় এবং একশ হলে এক হাজারের মোকাবেলায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না।

বি. দ্র. বিশ ও একশ– এ দুই সংখ্যা সম্ভবত এজন্য বলা হয়েছে যে, সে সময় মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্প ছিল। ফলে سرية –অর্থাৎ ছোট সৈন্যদল কমপক্ষে ২০ জনের আর جيش –তথা বড় দল ১০০ জনের হত। আর পরবর্তী অর্থাৎ ৬৬নং আয়াত অনেক দিন পর অবতীর্ণ হয়। তখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং 'সারিয়্যা'তে কমপক্ষে একশ' সৈন্য ও 'জায়শ'-এ এক হাজার সৈন্য থাকত।

যাহোক, প্রথম আয়াতে ২০ ও ১০০ আর দ্বিতীয় আয়াতে ১০০ ও ১০০০ সংখ্যার এ পার্থক্য প্রকাশ করে যে, দ্বিতীয় আয়াতের অবতরণকালে মুসলমানদের জনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল।

১. **শানে নুযূল**

বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, দশগুণ কাফেরের মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকার নির্দেশ যখন মুসলমানদের কাছে ভারী মনে হল, তখন এ আয়াত নাযিল হয়-

৬৭. কোন নবীর জন্য সংগত নয় যে, তাঁর হাতে কয়েদী থাকবে (অর্থাৎ তাঁর কয়েদীদের জীবিত রাখা হবে)- যতক্ষণ না তিনি পৃথিবীর বুকে (খোদাদ্রোহীদের) সম্পূর্ণ পর্যদুস্ত করে দেন। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ চাও, আর আল্লাহ চান আখেরাত। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[১]।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ۗ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ الخ অর্থাৎ খোদা তোমাদের মধ্যে একরকম দুর্বলতা লক্ষ্য করে পূর্বের হুকুম রহিত করে দিলেন। এখন নিজেদের তুলনায় শুধু দ্বিগুণ শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকা জরুরী এবং পলায়ন করা হারাম। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৬৫৩)

পূর্বের হুকুম রহিত করার কারণ

যে দুর্বলতার জন্য হুকুম সহজ করা হল, তা কয়েক কারণে হতে পারে। **প্রথমত ঃ** হিজরতের সূচনাকালে এমন কিছু লোক মুমিন ছিলেন, যাদের শক্তি ও দাপট এবং সাহস ও বীরত্ব সুপ্রসিদ্ধ ছিল। কিছুকাল পর তাদের মধ্যে অনেকে বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েন, আর যে নতুন প্রজন্ম এল তাদের মধ্যে সেই পুরনো মুহাজের ও আনসারদের মত অন্তর্দৃষ্টি, অটলতা ও আল্লাহনির্ভরতা ছিল না। **দ্বিতীয়ত ঃ** সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এক পর্যায়ে নিজেদের সংখ্যাধিক্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ও আল্লাহনির্ভরতায় কিছুটা ভাটা পড়ে থাকবে।

তদুপরি মানুষের মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন একটি কঠিন কাজ স্বল্প মানুষের দায়িত্বে পড়লে তাদের মধ্যে কর্মোদ্যম বেশি থাকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ সাধ্যের অতিরিক্ত সাহস করে। কিন্তু একই কাজ বিরাট দলের উপর ন্যস্ত হলে প্রত্যেকে অন্যের অপেক্ষায় থাকে এবং মনে করে যে, আমি তো আর একলা যিম্মাদার নই। ফলে আনুপাতিকভাবে জোশ, তেজস্বিতা ও সাহসিকতা হ্রাস পেয়ে যায়।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) বলেন, "প্রথম দিকের মুসলিমগণ বিশ্বাসে কামেল ছিলেন, তাঁদের প্রতি নির্দেশ এসেছিল- তাঁদের অপেক্ষা দশগুণ কাফেরদের সাথে জেহাদ করতে। পরবর্তী মুসলমানগণ (সাহস, বীরত্ব, তাওয়াক্কুল ইত্যাদিতে) এক কদম পিছনে ছিলেন, তখন হুকুম হল দ্বিগুণ কাফেরের সাথে জেহাদ করতে। এ হুকুম এখন পর্যন্ত বলবৎ আছে। কিন্তু দ্বিগুণের বেশির উপর হামলা করলে অধিকতর সওয়াব হবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এক হাজার মুসলমান আশি হাজারের সঙ্গে লড়েছেন।"

মুতার জেহাদে তিন হাজার মুসলমান দুই লক্ষ কাফেরের বিরুদ্ধে অটল থাকেন। আল্লাহ তাআলার শোকর, এ ধরনের ঘটনায় ইসলামের ইতিহাস ভরপুর।

১. **আয়াত অবতরণের প্রেক্ষাপট**

বদরের যুদ্ধে সত্তর জন কাফের মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। আল্লাহ তাআলা ওদের সম্পর্কে মুসলমানদের সামনে দুটি পথ পেশ করেন- (১) কতল করে দেওয়া (২) অথবা

মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। তবে শর্তব্য যে, এক্ষেত্রে আগামী বছর মুসলমানদের মধ্য থেকে এই পরিমাণ নিহত হবে।

তাদের সম্মুখে দুই অবস্থা পেশ করাটা বস্তুত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ ছিল যে, দেখি– মুসলিমগণ নিজেদের মত ও রুচি অনুযায়ী কোনটি অবলম্বন করে। যেমন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের দুটি পথের একটি অবলম্বন করার এখতিয়ার দিয়ে আয়াত নাযিল হয়েছিল- إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ الخ (الأحزاب : ২৮) (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৭৮৫)

তদ্রূপ মেরাজের সফরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দুধ ও শরাবের দুটি পাত্র পেশ করা হয়েছিল, তিনি দুধ গ্রহণ করেছিলেন। জিবরাঈল (আ) বললেন, যদি আপনি (ধরা যাক) শরাব অবলম্বন করতেন তবে আপনার উম্মত বিভ্রান্ত হয়ে যেত। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৪৩৭)

যা হোক, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে সাহাবীদের মতামত চাইলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সকল বন্দী আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন ও ভাই-বেরাদর। মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। এই নম্র ব্যবহার ও অনুগ্রহ দেখে হয়ত কিছু লোক মুসলমান হয়ে যাবে এবং তারা নিজেরা এবং তাদের সন্তানসন্ততি ও অনুসারীরা আমাদের সহযোগী হবে। তাছাড়া এখন যে ধন-সম্পদ আমাদের হস্তগত হবে, তদ্বারা জেহাদ প্রভৃতি দীনী কাজে সাহায্য হবে। বাকী আগামী বছর আমাদের সত্তরজন শহীদ হয়ে গেলে ক্ষতি কী, তারা শাহাদাতের মর্যাদা হাসিল করবে।'

স্বভাবগত দয়া-মায়া এবং আত্মীয়তার খাতিরে হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনের গতিও এই মতের অনুকূলে ছিল। বরং ব্যাপকভাবে সাহাবীদের মতও তাই ছিল– অনেকে তো হযরত আবু বকর বর্ণিত কারণসমূহের ভিত্তিতে, আর কেউ কেউ শুধু আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে উক্ত মতের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। (تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا থেকে এমনই বোঝা যায়, যেমন হাফেজ ইবনে হাজার ও ইবনে কাইয়িম বলেছেন)।

হযরত উমর (রা) ও হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রা) এর মতামত ভিন্ন ছিল। হযরত উমর বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বন্দিরা হচ্ছে কুফরের নেতা ও মুশরিকদের সর্দার। (এদের খতম করে দিলে কুফর ও শিরকের মাথা ভেঙ্গে যাবে, সমগ্র মুশরিকের উপর ত্রাস নেমে আসবে। ভবিষ্যতে মুসলমানদের অত্যাচার করা ও আল্লাহর রাস্তায় বাধা দেওয়ার হিম্মত ওদের থাকবে না)। তাছাড়া এর দ্বারা আল্লাহর সামনে মুশরিকদের প্রতি আমাদের চরম ঘৃণা, বিদ্বেষ ও পূর্ণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ পাবে এবং এও স্পষ্ট হবে যে, আমরা আল্লাহর দীনের বিষয়ে নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও আর্থিক লাভের কোনই পরোয়া করিনি। এ জন্য বন্দীদের মধ্যে যে আমাদের মধ্যকার যার আত্মীয় ও স্বজন, সে ওকে নিজের হাতে কতল করে দেবে– এটাই সংগত।

যা হোক, আলোচনা-পর্যালোচনার পর আবু বকর (রা)-এর মতানুসারে আমল করা হল। কেননা, অধিকাংশের মত এটাই ছিল এবং স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও স্বভাবসুলভ দয়া ও মায়ার কারণে এ দিকেই আকৃষ্ট ছিলেন। তাছাড়া নৈতিক বিবেচনায় ও সাধারণ অবস্থায় এ মতই অধিকতর সঠিক মনে হয়।

কিন্তু ইসলাম তখন যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, তার প্রতি লক্ষ্য করে কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণই ছিল সময়ের দাবি। সুদীর্ঘ তের বছরের অত্যাচারী শয়তানপূজারীদের সামনে এ কথা প্রমাণ করে দেওয়ার প্রথম সুযোগ এসেছিল যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক, ধন-সম্পদ, দলবল, শক্তি-সামর্থ্য কোন কিছুই এখন আল্লাহর তলোয়ার থেকে তোমাদেরকে আশ্রয় দিতে পারে না। প্রথমে একবার অত্যাচারী মুশরিকদের উপর ভয়-ভীতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করার পর ভবিষ্যতে নম্রতা ও আত্মীয়তা রক্ষাকারী সদাচার প্রকাশের অনেক সুযোগ পাওয়া যেত। অপর দিকে আগামী বছর সত্তরজন মুসলমানের কতলের ব্যাপারে রাযী হয়ে যাওয়া মামুলি বিষয় ছিল না।

এসব কারণে উক্ত মত গ্রহণ করা আল্লাহ তাআলার পছন্দ হল না- مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ আয়াতাংশে মূলত এ অসন্তুষ্টিরই প্রতি ইশারা রয়েছে। সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের পক্ষে এই মত গ্রহণ করাকে অত্যন্ত বিপদসংকুল একটি এজতেহাদী ভুল বিবেচনা করা হয়; আর যারা আর্থিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে এ মতে একাত্ম হয়েছিলেন, তাদের লক্ষ করে পরিষ্কারভাবে বলা হল– تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا, অর্থাৎ তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সামগ্রীর প্রতি নজর দিচ্ছ, অথচ মুমিনের দৃষ্টি পরিণামের দিকে থাকা উচিত। আল্লাহ চাইলে তিনি তোমাদের কাজ নিজ মহাশক্তি দ্বারা বাহ্যিক সরঞ্জাম ছাড়াই সাধন করতে পারেন। –যা হোক, মুক্তিপণ নিয়ে (বন্দীদের) ছেড়ে দেওয়াকে তখনকার পরিস্থিতি দৃষ্টে অতি বড় ভুল সাব্যস্ত করা হল।

বি. দ্র. স্মরণ রাখা উচিত যে, হাদীসের বর্ণনা থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে শুধু এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, কেবল আত্মীয়তা রক্ষার তাগিদে ও দয়ার্দ্রচিত্ততার কারণে ঐ মতের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। অবশ্য সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু আর্থিক লাভের প্রতি লক্ষ্য করে আর অধিকাংশ সাহাবী অন্যান্য দীনী কল্যাণ ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাথে আর্থিক প্রয়োজনকেও উদ্দেশ্য করে উক্ত মত প্রকাশ করেছিলেন। সারকথা, সাহাবীদের পরামর্শের মধ্যে সার্বিক বা আংশিকভাবে আর্থিক দিকটার প্রভাব অবশ্যই ছিল। অথচ আর্থিক লাভালাভের কারণে بغض في الله (আল্লাহর খাতিরে দুশমনী) -এর মধ্যে ত্রুটি করা এবং আসল কাজ জেহাদের প্রতি গাফেল হওয়া এবং সত্তর জন মুসলমানের নিহত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে স্বেচ্ছায় রাযী হয়ে যাওয়া– এসবকে সাহাবীদের মত নৈকট্যপ্রাপ্তদের উচ্চশান ও মহামর্যাদার পরিপন্থী মনে করা হয়েছে। তাই বর্তমান আয়াতগুলিতে শক্ত তিরস্কারপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

হাদীসে আছে, কোন যুদ্ধে এক সাহাবীর মাথা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আর তার (ফরয) গোসলের প্রয়োজন হয়, কিন্তু মাথায় পানি ব্যবহার করা মারাত্মক ক্ষতিকর ছিল। সঙ্গীদের মাসলা

لَوْ لَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَاۤ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ⑯

৬৮. যদি আল্লাহর একটি বিধান না থাকত যা পূর্বেই (লওহে মাহফূজে) লেখা হয়েছে*, তবে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার কারণে অবশ্যই তোমাদের উপর বিরাট শাস্তি আপতিত হত[১]।

জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন, পানি বর্তমান থাকতে আমরা তোমার জন্য বিকল্প কিছু দেখি না। সে মতে তিনি গোসল করলেন এবং মারা গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনা জানতে পেরে বললেন- قتلوه قتلهم الله (তারা তাঁকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন)। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৩০৫৬; আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৭) এ থেকে জানা গেল, এজতেহাদী ভুলও সুস্পষ্ট হলে ও বিপদের কারণ হলে তজ্জন্য তিরস্কার হতে পারে। কারণ, এক্ষেত্রে বোঝা যায় যে, এজতেহাদকারী এজতেহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করতে ত্রুটি করেছেন।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যদি আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত একটি বিধান না থাকত'।

১. অর্থাৎ উক্ত ভুল আসলে তো এমন মারাত্মক ছিল যে, যারা পার্থিব সম্পদের কথা খেয়াল করে এমন পরামর্শ দিলেন তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শাস্তিদানে সেই জিনিস প্রতিবন্ধক, যা আল্লাহ তাআলা পূর্বেই লিখে রেখেছিলেন। সেই জিনিসটি কী? তা নিম্নের কোন একটি বিষয় হতে পারে–

(১) এজতেহাদী ভুলে মুজতাহিদের শাস্তি হবে না; (২) যে পর্যন্ত আল্লাহ কোন আদেশ বা নিষেধের ব্যাপারে পরিষ্কার হুকুম বয়ান না করেন, তিনি অন্যায়কারীকে শাস্তি দেন না; (৩) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের গোনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিয়েছেন; (৪) ভুলবশত যে মত অবলম্বন করা হয়েছিল অর্থাৎ ফিদ্য়া নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া, তার ব্যাপারে আল্লাহর ইলমে সাব্যস্ত ছিল যে, ভবিষ্যতে এর অনুমতি হয়ে যাবে। فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاء (এর পর হয় অনুগ্রহ না হয় মুক্তিপণ); (৫) যে পর্যন্ত তাদের মধ্যে পয়গম্বর আলাইহিস সালাম বর্তমান আছেন অথবা লোকেরা খাঁটি মনে এসতেগফার করতে থাকবে, ততদিন আযাব আসবে না; (৬) এ বন্দীদের মধ্যে অনেকের ভাগ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা লেখা ছিল।

মোটকথা, এ ধরনের কোন বাধা না থাকলে উক্ত ভুল এমন গুরুতর ছিল যে, এতে কঠোর আযাব নাযিল হওয়াই উচিত ছিল।

এক হাদীসে আছে, উল্লিখিত ভয়ঙ্কর ভুলের জন্য যে শাস্তি আসার ছিল, তা উক্ত সতর্ক বাণী শোনানোর পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে অতি নিকটবর্তী করে পেশ করা হয়েছিল। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৭৬৩) এ যেন উক্ত সতর্কবাণীকে অধিকতর ক্রিয়াশীল ও জোরদার করার একটি পন্থা ছিল। তিনি এ দৃশ্য দেখে কাঁদতে শুরু করলেন। হযরত উমর (রা) কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'আমার সামনে আযাব পেশ করা হয়েছে, যা তাদের উপর আসত যদি না বাধার উল্লিখিত কারণগুলি থাকত।

৬৯. অতএব তোমরা যে হালাল, পরিচ্ছন্ন গনীমত লাভ করেছ– তা থেকে খাও এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

[রুকূ - ১০]

৭০. হে নবী! আপনাদের হাতে যে বন্দীরা আছে তাদের বলে দিন, 'আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে ভাল কিছু আছে বলে জানেন, তবে তোমাদের থেকে (মুক্তিপণরূপে) যা নেওয়া হয়েছে তা থেকে উত্তম বস্তু তিনি তোমাদের দান করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৭১. আর যদি ওরা আপনার সঙ্গে খেয়ানত করতে চায়, তবে ওরা তো এর পূর্বেও আল্লাহর সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। অতঃপর তিনি (আপনাকে) ওদের উপর পরাক্রান্ত করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান[২]।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

স্মরণ রাখা উচিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উক্ত শাস্তি উপস্থিত করার ব্যাপারটা এ রকম ছিল, যেমন কুসূফের (সূর্যগ্রহণের) নামায আদায় করার সময় তাঁর সামনে বেহেশত ও দোযখকে কাবা শরীফের প্রাচীরে দৃশ্যমান করে দেওয়া হয়েছিল।

১. পূর্ববর্তী তিরস্কার ও ধমকে মুসলিমগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন। তারা ভাবলেন, বন্দীদের মুক্তিপণমিশ্রিত গনীমতের মাল আর স্পর্শ করা উচিত নয়। তাই বর্তমান আয়াতে সান্ত্বনা দেওয়া হল যে, তা তো আল্লাহর দান, খুশীচিত্তে খাও। হাঁ, জেহাদের ক্ষেত্রে গনীমতের মাল ইত্যাদিকে লক্ষ্যবস্তু বানানো বা তাকে এমন গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়, যদ্দরুণ উচ্চ উদ্দেশ্যাবলি ও সার্বিক কল্যাণের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ পায়। সাময়িক কল্যাণ বিবেচনায় তোমরা একটি ভুল কর্মপন্থা অবলম্বন করলে বটে, কিন্তু স্বয়ং মালের মধ্যে কোন খারাবী নেই। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকলে তিনি স্বীয় রহমতে তোমাদের ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দেবেন।

২. কোন কোন বন্দী (যেমন, হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ) ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিলেন। তাদের বলা হল যে, 'আল্লাহ তাআলা দেখবেন, সত্যিই যদি তোমাদের অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস থাকে, তবে মুক্তিপণ বাবদ তোমাদের থেকে যা কিছু অর্থ নেওয়া

৭২. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে; আর যারা (এদের) আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে– তারা (উভয় দল) একে অন্যের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের সাথে তোমাদের কোন বন্ধুত্ব নেই– যে পর্যন্ত না তারা হিজরত করছে। আর যদি তারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট সাহায্য চায়, তবে তোমাদের কর্তব্য সাহায্য করা। তবে এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, যাদের ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা সবই দেখেন[১]।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

হয়েছে তা থেকে হয়ত অধিক, অথবা উত্তম কিছু তোমাদের তিনি দান করবেন এবং পূর্বের গোনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন।

পক্ষান্তরে, যদি এর দ্বারা হুযূর (সা.)-এর সঙ্গে কেবল প্রতারণা করা বা দাগাবাজি করা উদ্দেশ্য হয়, তবে ইতিপূর্বে তারা তো আল্লাহর সঙ্গে দাগাবাজি করেছিল– অর্থাৎ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى –আল্লাহকে 'রব' বলে স্বীকার করে নেওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে এসে তার সাথে কুফর ও শিরক অবলম্বন করেছে। অথবা আবু তালিবের আমলে বনী হাশিমের কতক লোক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহায়তা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এখন তারা কাফেরদের সঙ্গী হয়ে বদরে এল। এর পরিণতি তারা নিজ চোখে দেখতে পেয়েছে যে, আজ কীভাবে তারা মুসলমানদের হাতে বন্দী ও পরাস্ত হয়েছে। ভবিষ্যতেও দাগাবাজি করলে এমনি শাস্তি পেতে পারে। আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে তারা নিজেদের অন্তর ও নিয়ত গোপন করতে পারবে না এবং তাঁর হেকমতপূর্ণ ব্যবস্থাও ব্যহত করতে পারবে না।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হল। তাদের মধ্যে যারা মুসলমান হল, তাদের আল্লাহ তাআলা অগণিত ধন-দৌলত দান করলেন এবং যারা মুসলমান হল না তারা ধ্বংস হয়ে গেল।'

১. বন্দীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন ছিল, যারা অন্তর থেকে মুসলমান ছিল, কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মক্কা থেকে হিজরত করতে পারেনি এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাফেরদের সঙ্গী হয়ে তাদের বদরে আসতে হয়েছে। বর্তমান আয়াতগুলিতে এরূপ মুসলমানদের হুকুম কী, তা বাতলানো হচ্ছে।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ দুই শ্রেণীর ছিলেন, 'মুহাজির' ও 'আনসার'। মুহাজিরগণ আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-

৭৩. আর যারা কাফের, তারা একে অন্যের বন্ধু। যদি তোমরা তা না কর, তবে পৃথিবীতে ফেতনা ও মহাবিপর্যয় ঘটবে[১]।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۗ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ۞

৭৪. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে; আর যারা (তাদের) আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে– তারাই (এ উভয় দল) প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা[২]।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۞

পরিজন ও বাড়ীঘর ছেড়ে আসেন, আর আনসারগণ তাদের আশ্রয় দেন ও সাহায্য করেন। এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন কায়েম করেছিলেন। আয়াতের সারমর্ম এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যত মুসলমান উপস্থিত আছেন, তাঁদের সকলের সন্ধি ও যুদ্ধ এক, একের মিত্র সকলের মিত্র, একের শত্রু সকলের শত্রু। এমনকি, হিজরতের প্রথম দিকে ভ্রাতৃত্ববন্ধন হিসাবে একে অন্যের ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিসও হতেন।

আর যে মুসলমানগণ স্বদেশে থেকে যান, যেখানে কাফেরদের ক্ষমতা ও প্রভাব ছিল, অর্থাৎ দারুল হরব থেকে হিজরত করেননি, তাদের সন্ধি ও যুদ্ধে দারুল ইসলামে বসবাসকারী মুসলমান (মুহাজির ও আনসারগণ) শরীক নন। যদি দারুল হরবের মুসলমানগণ কোন কাফের সম্প্রদায়ের সঙ্গে সন্ধি ও চুক্তি করে ফেলে, তবে দারুল ইসলামের স্বাধীন মুসলমানগণ এই চুক্তি মানতে বাধ্য নন, বরং তাদের সঙ্গে প্রয়োজনবোধে যুদ্ধ করতে পারেন। তবে দারুল হরবের মুসলমানগণ যখন দীনী ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী অবশ্যই সাহায্য করতে হবে, কিন্তু যে সম্প্রদায়ের সঙ্গে দারুল ইসলামের মুসলমানদের চুক্তি হয়ে গেছে, তাদের বিরুদ্ধে চুক্তির সময়সীমা পর্যন্ত দারুল হরবের মুসলমানদের সাহায্য করা যাবে না।

অনুরূপ, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যে পারস্পরিক উত্তরাধিকার সূত্র কায়েম করা হয়েছিল, তাতেও দারুল হরবের মুসলমানগণ শামিল ছিলেন না।

১. অর্থাৎ কাফের ও মুসলমানের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বও নেই এবং একে অন্যের ওয়ারিসও হতে পারে না। হাঁ, কাফের কাফেরের বন্ধু, বরং তোমাদের শত্রুতায় সকল কাফের পরস্পর অভিন্ন, সুযোগ পেলেই ওরা দুর্বল মুসলমানদেরকে কষ্ট দেবে। এর মোকাবেলায় মুসলমানরা যদি একে অপরের বন্ধু ও সাহায্যকারী না হয়, অথবা দুর্বল মুসলমানরা হিজরত করে স্বাধীন মুসলমানদের কাছে এসে না যায়, তবে মহা বিপর্যয় ও ফেতনার সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ দুর্বল মুসলমানগণ নিরাপদ থাকতে পারবে না, তাদের ঈমান-ইসলাম পর্যন্ত শঙ্কায় পতিত হবে।

২. অর্থাৎ দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও।

৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও তোমাদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করেছে, তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর আত্মীয়স্বজন আল্লাহর বিধানে একে অন্যের বেশি ঘনিষ্ঠ[১]। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সম্যক অবহিত[২]।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۷۵﴾

আয়াতের মর্ম এই যে, হিজরত না করে স্বদেশে রয়ে যাওয়া মুসলমানদের চেয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী মুসলিমগণ শ্রেয়। আখেরাতে তাদের জন্য বিরাট মার্জনা এবং দুনিয়াতে সম্মানের জীবিকা অর্থাৎ গনীমতের ধন-সম্পদ ও অন্যান্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে।

১. অর্থাৎ পরে যত লোক মুহাজিরদের মধ্যে শামিল হতে থাকবে, তারা সকলেই বিধানগত দিক থেকে পূর্ববর্তী মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত। হিজরত আগে ও পরে হওয়ার কারণে সন্ধি ও যুদ্ধ বা মীরাছ প্রভৃতির বিধানে কোন পার্থক্য হয় না। হাঁ, যদি পূর্ববর্তী মুহাজিরদের কোন আত্মীয় পরে মুসলমান হন অথবা পরে হিজরত করে আসেন, তবে তিনি এই পূর্ববর্তী মুহাজিরের মীরাছের বেশি হকদার।

২. অর্থাৎ তিনিই জানেন, কার কতটা অধিকার হওয়া উচিত। সুতরাং তাঁর বিধান সম্পূর্ণরূপে ইলম ও হেকমতের উপর নির্ভরশীল।

সূরা তাওবা

سُوْرَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ৯ । ১২৯ আয়াত । ১৬ রুকূ । মাদানী

اٰيَاتُهَا ١٢٩ ، رُكُوْعَاتُهَا ١٦

১. (এ) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে চুক্তি বাতিলের স্পষ্ট ঘোষণা সেই মুশরিকদের প্রতি, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে[১]।

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

১. সূরা 'আনফাল' হিজরতের প্রথম দিকে এবং এ সূরা শেষ দিকে নাযিল হয়।

সূরার শুরুতে بسم الله না লেখার কারণ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল, যখন কুরআনের যে আয়াত নাযিল হত, তিনি বলে দিতেন, 'এ আয়াত অমুক সূরায় অমুক স্থানে রাখ।' সূরা 'তাওবা' বা 'বারাআত' এর আয়াতগুলি কোন্ সূরায় সন্নিবেশিত করতে হবে, এ সম্পর্কে তিনি এমন কিছু বলেননি। এতে প্রকাশ পায় যে, এ একটি স্বতন্ত্র সূরা, অন্য কোন সূরার অংশ নয়। কিন্তু সাধারণ নিয়ম ছিল, নতুন সূরা নাযিল হলে পূর্ববর্তী সূরা থেকে পৃথক করার জন্য শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ নাযিল হত। কিন্তু সূরা তাওবার শুরতে بسم الله নাযিল হয়নি। যার অর্থ দাড়ায়, এটা পৃথক সূরা নয়। মোট কথা, এক হিসাবে একে স্বতন্ত্র সূরা মনে হয়, অপর বিবেচনায় মনে হয়, পৃথক সূরা নয়!

এসব কিছু লক্ষ্য করে হযরত উছমান (রা) এর তত্ত্বাবধানে লিখিত কুরআনের মুসহাফসমূহে এ সূরার শুরুতে بسم الله الرحمن الرحيم লেখা হয়নি। কিন্তু এ সূরাকে সূরা 'আনফাল' থেকে পৃথক রাখা হয়েছে, যাতে এ সূরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সূরা হিসাবেও প্রকাশ না পায় এবং অন্য সূরার অংশও মনে না হয়। —তবে 'আনফালে'র পরে একে রাখার কারণ এই যে, 'আনফাল' আগে নাযিল হয়েছে, আর উভয় সূরার বিষয়বস্তু এতই সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, 'বারাআত'কে যেন 'আনফালে'র পরিশিষ্ট বা সম্পূরক বলা যায়। তাই 'আনফাল'কে পূর্বে রেখে তার পরেই 'তাওবা'কে রাখা হয়েছে।

বর্তমান সূরার সাথে সূরা 'আনফাল' এর সম্পর্কের অন্যান্য দিক এবং এই সূরার মূল পয়গাম ও বক্তব্য

সূরা 'আনফাল' বদরযুদ্ধ ও এর আনুষঙ্গিক বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ। বদর দিবসকে কুরআন يوم الفرقان নামে আখ্যায়িত করেছে। কেননা, দিনটি হক ও বাতিল, ইসলাম ও কুফর এবং তাওহীদবাদী ও মুশরিকদের অবস্থানকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেখিয়ে দিয়েছে। বদরের যুদ্ধ বস্তুত বিশ্বজনীন ও শক্তিশালী ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তি এবং হুকুমতে এলাহী (বা ইসলামী হুকুমত)-এর বুনিয়াদী ভূমিকা ছিল। وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (যারা কাফের, তারা একে অন্যের বন্ধু) এর মোকাবেলায় সূরা 'আনফালে'র সমাপ্তিতে

إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ (তোমরা যদি তা না কর, তবে দেশে ফেতনা ও মহাবিপর্যয় হবে) আয়াতাংশে যে খাঁটি ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তার দাবি এই যে, দুনিয়ায় এই বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের কোন শক্তিশালী কেন্দ্র স্থাপিত হোক। বলা বাহুল্য, তা জাযিরাতুল আরব (অর্থাৎ আরবদেশ) ছাড়া আর কোথাও হতে পারে না, যার কেন্দ্রস্থল মক্কা শরীফ।

সূরা 'আনফালে'র শেষের দিকে এও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, মক্কা প্রভৃতি স্থান থেকে যে সকল মুসলমান হিজরত করেনি এবং তারা কাফেরদের আশ্রয়ে জীবন-যাপন করছে, দারুল ইসলামের মুসলমানদের উপর তাদের অভিভাবকত্ব ও বন্ধুত্বের কোন দায় নেই- مَالَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا; তবে তাদের যথাসাধ্য দীনী সাহায্য করা উচিত।

এখান থেকে এ ফলাফল বের হয় যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বকে মজবুত করা এবং তার অংশগুলিকে অটুট বন্ধনে বাঁধার জন্য দুটি বিষয়ের একটি অবশ্যই হওয়া উচিত– (১) হয় সমগ্র আরবের মুসলমানগণ স্ব স্ব ভূমি ত্যাগ করে মদীনায় এসে যাবেন এবং বাধাহীনভাবে ইসলামী ভ্রাতৃত্বে যোগ দেবেন, (২) না হয় স্বাধীন মুসলমানগণ জেহাদী কুরবানীর দ্বারা কুফরী শক্তিকে ভেঙ্গে ফেলে জাযিরাতুল আরবের পৃষ্ঠকে ইসলামের এমন অনুকূল করে তুলবেন, যাতে কোন মুসলমানের হিজরত করার প্রয়োজন না থাকে। অর্থাৎ সমগ্র আরবভূমি খাঁটি ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এমন নিরাপদ কেন্দ্র ও নির্ভেজাল আবাসস্থল হয়ে যাবে, যার সঙ্গে বিশ্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভবিষ্যৎ সম্পৃক্ত থাকবে।

এই দ্বিতীয় পথটিই এমন ছিল, যার দ্বারা অনিঃশেষ ফেতনা-ফাসাদের মূলোৎপাটন হতে পারত এবং ইসলামের কেন্দ্র কাফেরদের ফেতনাসমূহ থেকে সম্পূর্ণ পাক-সাফ এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও জুলুম-অত্যাচার থেকে পূর্ণ নিরাপদ ও শান্ত হয়ে সমগ্র দুনিয়াকে নিজ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মধ্যে দাখিল হওয়ার দাওয়াত দিতে পারত। এ উচ্চ ও পবিত্র উদ্দেশ্যে মুসলমানগণ হিজরী দ্বিতীয় সনে বদরের যুদ্ধের মাধ্যমে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ৮ম হিজরীতে মহান মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে।

ইসলামের প্রচার-প্রসার বা রক্ষণাবেক্ষণের পথে যেসব ফেতনা বাঁধার সৃষ্টি করছিল, মক্কা বিজয় সেসবের মূলে কুঠারাঘাত করল। কিন্তু وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ (আর তোমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত না ফাসাদ নিঃশেষ হয়। –সূরা আনফাল, আয়াত: ৩৯)— এ আদেশ পালনার্থে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের কেন্দ্র ও ইসলামী হুকুমতের আবাসভূমি (জাযিরাতুল আরব)কে ফেতনার জীবাণু থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যাতে সেখান থেকে সমগ্র দুনিয়াকে ইসলামী সংস্কৃতি ও প্রকৃত সভ্যতার দাওয়াত পূর্ণ একতা ও ঐক্যমতের সাথে দেওয়া যায় এবং কোন আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা বা বিশৃঙ্খলা বাইরের বাধা-বিপত্তির সাথে মিলে এ পবিত্র মিশনের ক্ষতি সাধন করতে না পারে। সুতরাং জাযিরাতুল আরবকে সর্বপ্রকার দুর্বলতা ও ফেতনা থেকে পবিত্র করা এবং একে বিশ্বজনীন ইসলামী দাওয়াতের উচ্চতম স্থানে পরিণত করার জন্য এটা অপরিহার্য হয়ে পড়ল যে,

২. অতএব (হে মুশরিকরা!) তোমরা এই ভূখণ্ডে চার মাস (স্বাধীনভাবে) বিচরণ করে নাও এবং জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না এবং এও যে, আল্লাহ কাফেরদের লাঞ্ছিত করবেন[১]।	فَسِيۡحُوۡا فِى الۡاَرۡضِ اَرۡبَعَةَ اَشۡهُرٍ وَّاعۡلَمُوۡۤا اَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخۡزِى الۡكٰفِرِيۡنَ ۝

ইসলামী দাওয়াতের মার্কায (কেন্দ্র) যেন খাঁটি ইসলামী ভাবধারার রঙে রঙিন হয়, তার হৃদয়-মন থেকে যেন সত্যের আওয়াজ ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ বিশ্ববাসীর কানে না পৌঁছে, সমগ্র আরবভূমি যেন বিশ্বজগতের শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক হয় এবং চিরদিনের জন্য এখান থেকে ঈমান ও কুফরের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-কলহের পরিসমাপ্তি হয়ে যায়। বর্তমান সূরাতে আলোচ্য বিষয়গুলির সারসংক্ষেপ এ-ই।

বলা বাহুল্য, কিছু দিনের মধ্যেই আল্লাহর রহমতে ইসলামের কেন্দ্র কুফর ও শিরকের সব রকমের ফেতনা-ফাসাদ থেকে পবিত্র হয়ে গেল এবং সমস্ত আরব ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমগ্র জগতে হেদায়াতের আলো ও বিশ্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে উঠিয়ে নিল। فلله الحمد على ذلك

মোটকথা, সূরা আনফালে যে বিষয়ের সূচনা ছিল, সূরা তাওবা (বা বারাআত) এর মধ্যে তারই সমাপ্তি রয়েছে। এ জন্যই (اول باخر نسبتے دارد) সমাপ্তির সাথে সূচনার সংযোগ থাকে– এ নিয়ম অনুযায়ী 'বারাআত'কে 'আনফাল'এর সঙ্গে পরিশিষ্ট হিসাবে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

এ দুই সূরার মাঝে এ ছাড়া আরো অনেক সামঞ্জস্য রয়েছে, যেগুলি আলেমগণ তাফসীর গ্রন্থসমূহে বয়ান করেছেন।

. হিজরী ছয় সনে 'হুদায়বিয়া' নামক স্থানে যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরায়শদের মধ্যে সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হল, তখন বনু খুযাআ মুসলমানদের এবং বনু বকর কুরায়শদের বন্ধু হল। পরবর্তীতে বনু বকর চুক্তির পরোয়া না করে বনু খুযাআর উপর আক্রমণ করল এবং (ওদের বন্ধু) কুরায়শরা অস্ত্রসস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে আক্রমণকারীদের সাহায্য করল। এভাবে কুরায়শ ও ওদের বন্ধু উভয়ই হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করল। এর জওয়াবে হিজরী ৮ম সনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ আক্রমণ করে অতি সহজে মক্কা মুআজ্জমা জয় করে নিলেন।

উল্লিখিত গোত্রগুলো ছাড়াও আরবের অন্যান্য গোত্রের সঙ্গেও মুসলমানদের নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট কালের জন্য চুক্তি ছিল। তন্মধ্যে কতক গোত্র নিজেদের চুক্তিতে কায়েম থাকে। আর অনেকগুলো গোত্র এমনও ছিল, যাদের সঙ্গে কোন রকম চুক্তিই হয়নি। এ সূরার বিভিন্ন আয়াত উক্ত বিভিন্ন গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

প্রাথমিক আয়াতগুলি সম্ভবত সে সকল মুশরিকের ব্যাপারে প্রযোজ্য, যাদের সাথে চুক্তি ছিল, কিন্তু নির্ধারিত সময়ের জন্য ছিল না। ওদের জানিয়ে দেওয়া হল যে, আমরা ভবিষ্যতে চুক্তি

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِیْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ۬ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِی اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ

৩. এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে বড় হজের দিনে[১] (সকল) মানুষের প্রতি ঘোষণা যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুশরিকদের থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হয়ে গেলেন। অতএব তোমরা যদি তওবা কর, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর আপনি কাফেরদের যাতনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন[২]।

বহাল রাখতে চাই না। অতএব তোমাদের চার মাসের অবকাশ দেওয়া হচ্ছে। এ সময়ের মধ্যে হয় মুসলমান হয়ে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, না হয় দেশ ছেড়ে ঈমান ও তাওহীদের কেন্দ্রকে নিজেদের অস্তিত্ব থেকে পাক করে দাও, অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু ভাল করে বুঝে নাও যে, খোদার ইচ্ছাকে তোমরা ব্যাহত করতে পারবে না। যদি ইসলাম গ্রহণ না কর, তবে তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের লাঞ্ছিত করবেনই। তোমরা নিজেদের চেষ্টা-তদবীর ও কূটকৌশল দ্বারা তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবে না।

আর যেসব গোত্রের সঙ্গে আদৌ কোন চুক্তিই ছিল না, হতে পারে তাদেরও চার মাসের অবকাশ দেওয়া হয়েছিল।

হিজরী নবম সনে হজের সময়ে সমস্ত আরব গোত্রের সামনে হযরত আলী (রা) এ আয়াত ও পরবর্তী আয়াতগুলি পড়ে শোনান, যাতে রয়েছে কাফেরদের উদ্দেশ্যে চুক্তি-বাতিলসহ বিবিধ বিষয়ের ঘোষণা ।

১. হজকে أكبر (বড়) এজন্য বলা হয়েছে যে, 'উমরা' হচ্ছে ছোট হজ। আর يوم الحج الأكبر দ্বারা যিলহজ মাসের দশ তারিখ ঈদুল আযহার দিন অথবা নয় তারিখ আরাফার দিন উদ্দেশ্য।

২. এ ঘোষণা খুব সম্ভব সেসব গোত্রের জন্য ছিল, যারা নির্দিষ্ট মেয়াদে চুক্তি করার পর নিজেরাই তা ভঙ্গ করেছে, (যেমন, বনু বকর ও কুরায়শ প্রমুখ)। অর্থাৎ —এমন লোকদের সাথে কোন চুক্তিই আর অবশিষ্ট রয়নি। এখন যদি এসব লোক শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয়, তবে তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই দুরুস্ত হয়ে যাবে। নতুবা আল্লাহর যা ইচ্ছা (অর্থাৎ জাযিরাতুল আরবকে পবিত্র করা), তা পূর্ণ হবেই। কোন শক্তি ও তদবীর তাঁকে পরাস্ত করতে পারবে না। আর কাফেররা কুফর ও বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি অবশ্যই পাবে।

বি. দ্র. যদিও উক্ত গোত্রগুলোর বিশ্বাসঘাতকতা ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঘটেছিল এবং তারই জওয়াবে মক্কা জয় করা হয়েছিল, তবুও হিজরী নয় সনে হজের সময়ে তাদের সাথে কৃত চুক্তি বাতিল ঘোষণা করা হয়, যাতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ ধরনের যত লোক আছে তাদের সাথে কোন রকমের চুক্তিই অবশিষ্ট নেই।

৪. তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে, অতঃপর ওরা তোমাদের সঙ্গে কোন ক্রটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি— ওদের সাথে ওদের মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ সাবধানতা অবলম্বনকারীদের পছন্দ করেন*[১]।

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

৫. অতঃপর যখন সম্মানিত মাসগুলি অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করবে, ওদের পাকড়াও করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ওঁৎ পাতার স্থানে ওদের অপেক্ষায় বসে থাকবে। তবে যদি ওরা তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে, তবে ওদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যারা (চুক্তি ভঙ্গ করা থেকে) বেঁচে থাকে, আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন'।

১. এ বিধান সেইসব গোত্রের জন্য, যাদের চুক্তি নির্দিষ্টমেয়াদী ছিল। আর ওরা তা সর্বদা রক্ষা করেছে, ওয়াদা পুরা করতে কোন ক্রটি করেনি। নিজেরাও চুক্তিবিরোধী কোন কার্যক্রম করেনি এবং অন্যান্য চুক্তি লঙ্ঘনকারীকেও সাহায্য করেনি (যেমন, বনী যামরা ও বনী মুদলিজ)। এদের সম্পর্কে ঘোষণা করে দেওয়া হল যে, চুক্তির মেয়াদ পুরা হওয়া পর্যন্ত মুসলিমগণ চুক্তির সম্মান করবে। মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কোন নতুন চুক্তি হবে না। তখন ওদের জন্যও সেই একই পথ, যা অন্যদের জন্য ছিল।

২. যারা চুক্তিরক্ষাকারী ছিল তাদের কথা বলার পর এখন চুক্তিভঙ্গকারীদের হুকুম বয়ান করা হচ্ছে। অর্থাৎ ওয়াদা ভঙ্গকারীদের সাথে যদিও এখন আর কোনো চুক্তি রয়নি এবং এ কারণে এখনি ওদের সাথে যুদ্ধ করা যেতে পারে, তবুও সম্মানিত মাসগুলির বিবেচনায় ওদের উপর তাৎক্ষণিক আক্রমণ করা যায় না। –এর কারণ হয় এই যে, তখন পর্যন্ত সম্মানিত মাসগুলিতে প্রথমে আক্রমন করা নিষিদ্ধ হয়ে থাকবে। না হয় কারণ এই যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টি হতে দেওয়ার প্রয়োজন কী? কেননা, এ মাসগুলিতে যুদ্ধবিগ্রহ করার নিষিদ্ধতা ওদের নিকট পূর্ব থেকে স্বীকৃত ছিল।

যা হোক, সম্মানিত মাসগুলি শেষ হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে ইচ্ছামত নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে অবকাশ দেওয়া হল। তা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর আরবভূমি পবিত্র করণার্থে যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর নেই। যুদ্ধে যা কিছু হয়ে থাকে (হত্যা করা, পাকড়াও করা, ঘেরাও করা, ওঁত পেতে থাকা) এ সবই ঘটবে। অবশ্য কুফর থেকে তওবা করে ইসলামী ভ্রাতৃত্বে দাখিল হয়ে

৬. আর যদি মুশরিকদের কেউ আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দিন, যেন সে আল্লাহর বাণী শুনে নেয়। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছিয়ে দিন। এ বিধানের কারণ এই যে, ওরা এমন সম্প্রদায় যারা (কিছুই) জানে না[১]।

وَاِنۡ اَحَدٌ مِّنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ اسۡتَجَارَكَ فَاَجِرۡهُ حَتّٰى يَسۡمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبۡلِغۡهُ مَاۡمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ قَوۡمٌ لَّا يَعۡلَمُوۡنَ ۟

গেলে— যার বড় আলামত হচ্ছে নামায আদায় করা ও যাকাত প্রদান করা— মুসলমানদের জন্য ওদের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করা ও ওদের পথ বন্ধ করার অনুমতি নেই। রইল ওদের অন্তরের ব্যাপার, তা আল্লাহর নিকট সোপর্দ থাকবে।

এ আয়াত থেকে জানা গেল, কোন ব্যক্তি ইসলামের কলেমা পড়ে নামায না পড়লে বা যাকাত না দিলে মুসলমানগণ তার পথ আটকাতে পারে। ইমাম আহমদ (র), ইমাম শাফেয়ী (র), ও ইমাম মালেক (র) এর নিকট ইসলামী সরকারের জন্য নামায তরককারী তওবা না করলে তাকে কতল করা ফরয। (ইমাম আহমদ (র) -এর নিকট এ মৃত্যুদণ্ড মুরতাদ হওয়ার কারণে এবং মালেক (র) ও শাফেয়ী (র) -এর নিকট শরী'য়তসম্মত শাস্তিস্বরূপ)। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, তাকে খুব মারপিট করবে এবং বন্দী করে রাখবে- যাবৎ না সে মরে যায় বা তওবা করে মুক্তি পায়।

মোটকথা, কোন ইমামেরই মতে তার পথ ছেড়ে দেওয়ার অবকাশ নেই। আর যারা যাকাত না দেবে, সরকার জোরপূর্বক তাদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত উসূল করবে। পক্ষান্তরে, এমন লোকেরা সম্মিলিতভাবে সরকারের সঙ্গে যুদ্ধের উদ্যোগ নিলে তাদের সৎপথে আনার জন্য যুদ্ধ করতে হবে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যে জেহাদ করেছিলেন, তা হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহের অতি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ঘটনা।

১. পূর্বে আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন, যদি তারা নিজেদের কুফরী থেকে তওবা করে ইসলামে দাখিল হয়ে যায়, তবে তারা নিরাপদ। এমনো হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত নয়, তাই সেগুলির তাহকীক করা এবং সেসব সম্পর্কে দ্বিধা-সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্যে সে মুসলমানদের কাছে আসতে চায়। তার সম্পর্কে আয়াতে বলে দেওয়া হল যে, তাকে নিজ হেফাজতে এনে খোদার কালাম ও ইসলামের বিধি-বিধান, শিক্ষা-দীক্ষা শোনাও। অতঃপর কবূল না করলে তাকে কতল করবে না, বরং কোথাও নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে, যেখানে পৌছে সে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হয়ে যাবে। অতঃপর সে অন্য সব কাফেরের মত গণ্য হবে।

নিরাপত্তা দানের হুকুম এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামী রীতিনীতি ও মৌলিক বিষয়াদি সম্বন্ধে ওরা অবগত নয়। অতএব ওদের সামনে সত্যকে উত্তমরূপে প্রকাশ করে দেওয়া উচিত। এরপরও যদি অবাধ্যতা করে, তবে قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ -এর পর দীনের মধ্যে জবরদস্তি নেই। (অর্থাৎ জোর খাটিয়ে মুসলমান বানানো হবে না।)

[রুকূ - ২]

৭. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট মুশরিকদের জন্য চুক্তি কী করে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল হারামের নিকটে চুক্তি করেছিলে (তাদের কথা ভিন্ন)। অতএব যে পর্যন্ত ওরা তোমাদের সঙ্গে সোজা থাকে, তোমরাও ওদের সাথে সোজা থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ সাবধানতা অবলম্বনকারীদের পছন্দ করেন।

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

৮. কী করে (ওদের চুক্তি বলবৎ থাকবে)? অথচ ওরা যদি তোমাদের উপর শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তবে তোমাদের ক্ষেত্রে আত্মীয়তারও পরোয়া করে না এবং অঙ্গীকারেরও না। ওরা নিজেদের মুখের (কথা) দ্বারা তোমাদের সন্তুষ্ট করতে চায়, অথচ ওদের অন্তর (তা) অস্বীকার করে। আর ওদের অধিকাংশই অবাধ্য (তথা অঙ্গীকার ভঙ্গকারী)[১]।

كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

---

১. পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে সম্পর্কচ্ছেদের যে পরিষ্কার ঘোষণা করা হয়েছিল, এখানে তার হেকমত বয়ান করা হচ্ছে। অর্থাৎ আরবের এমন মুশরিকদের সাথে কি চুক্তি বজায় থাকতে পারে এবং ভবিষ্যতে সন্ধি হতে পারে, যাদের অবস্থা মুসলমানদের সঙ্গে এই যে, কোন সময় তোমাদের একটু বাগে পেয়ে গেলে ওরা তোমাদের কষ্ট দিতে ও ক্ষতি করতে কোন ত্রুটি করবে না এবং তোমাদের আত্মীয়তার ও ওয়াদা-অঙ্গীকারের মোটেই পরোয়া করবে না? এখন যেহেতু তোমাদের উপর ওদের প্রাবল্য ও প্রভাব নেই, সে জন্য শুধু মৌখিক ওয়াদা-অঙ্গীকার করে তোমাদের সন্তুষ্ট রাখতে চায়। নতুবা ওদের অন্তর এক মিনিটের জন্যও এ অঙ্গীকারের প্রতি সন্তুষ্ট নয়– সর্বদা ওয়াদাভঙ্গের সুযোগ তালাশ করতে থাকে। আর ওদের অধিকাংশই বিশ্বাসঘাতক ও ওয়াদাভঙ্গকারী, তাই কদাচিৎ দু একজন ওয়াদা রক্ষার চিন্তা করলেও সংখ্যাধিক্যের মোকাবেলায় এর কোনই মূল্য নেই। মোটকথা, এমন প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক সম্প্রদায়ের সাথে আল্লাহ ও রাসূলের চুক্তি কী করে বলবৎ থাকতে পারে?

অবশ্য যেসব গোত্রের সাথে তোমরা মসজিদে হারামের নিকট চুক্তি সম্পন্ন করেছ, তোমরা আগে ভাগে সে চুক্তি ভঙ্গ করো না। তারা যতক্ষণ বিশ্বস্ততা রক্ষায় সোজা থাকবে, তোমরাও তাদের সাথে সোজা থেকো। এবং খুব সাবধান থেকো, যেন তোমাদের হস্ত প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কালিমায় কলঙ্কিত না হয়। খোদার নিকট তারাই প্রিয়, যারা পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করে।

৯. ওরা আল্লাহর বিধি-বিধানের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর পথে (লোকদের) বাধা দিয়েছে। ওরা যা কিছু করছে, তা অতি নিকৃষ্ট[১]।

اِشۡتَرَوۡا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِیۡلًا فَصَدُّوۡا عَنۡ سَبِیۡلِهٖ ؕ اِنَّهُمۡ سَآءَ مَا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ ۝

১০. ওরা কোন মুসলমানের ব্যাপারে আত্মীয়তারও পরোয়া করে না এবং অঙ্গীকারেরও না। এবং ওরাই সীমালঙ্ঘনকারী[২]।

لَا یَرۡقُبُوۡنَ فِیۡ مُؤۡمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الۡمُعۡتَدُوۡنَ ۝

১১. আর যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে, তবে তারা শরী'য়তের বিধানে তোমাদের ভাই হয়ে যাবে*। আর আমি সবিস্তারে বিধানসমূহ বর্ণনা করি– জ্ঞানী লোকদের জন্য[৩]।

فَاِنۡ تَابُوۡا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّکٰوةَ فَاِخۡوَانُکُمۡ فِی الدِّیۡنِ ؕ وَنُفَصِّلُ الۡاٰیٰتِ لِقَوۡمٍ یَّعۡلَمُوۡنَ ۝

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বনু কেনানা প্রমুখ গোত্র মুসলমানদের সঙ্গে ওয়াদাভঙ্গ না করায় মুসলমানগণও অত্যন্ত দীনদারী ও সাবধানতার সাথে নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ করে। 'বারাআত' (বা সম্পর্কচ্ছেদের) ঘোষণার সময় এদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে নয় মাস বাকী ছিল, এ সময়ের মধ্যে চুক্তি পূর্ণরূপে রক্ষা করা হয়।

১. অর্থাৎ এ সকল মুশরিক হচ্ছে এমন লোক, যারা দুনিয়ার সামান্য লোভে এবং নিজেদের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির খাতিরে আল্লাহর বিধান ও আয়াতগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে। এরা নিজেরাও আল্লাহর পথে চলেনি এবং অন্যদেরও চলতে বাধা দিয়েছে। সুতরাং যারা এহেন নিকৃষ্ট ও জঘন্য কাজকর্মে লিপ্ত এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে না, ওরা ওয়াদাভঙ্গের শাস্তিকে ভয় করবে এবং নিজেদের ওয়াদা-অঙ্গীকার রক্ষা করবে –এমন আশা মোটেই করা যায় না।

২. অর্থাৎ শুধু যে তোমাদের সঙ্গে, তাই নয়, বরং মুসলিম নামের সাথেই ওদের শত্রুতা। যে কোন মুসলমান হোক, সুযোগ পেলেই তার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আত্মীয়তার সকল সম্পর্ক ও ওয়াদা-অঙ্গীকার থেকে হাত মুছে ফেলে। এ বিষয়ে ওদের জুলুম ও বাড়াবাড়ি সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** ' তোমাদের দীনী ভাই (হয়ে যাবে)'।

৩. অর্থাৎ এখনো যদি কুফর থেকে তওবা করে দীনী বিধানসমূহ (নামায, যাকাত ইত্যাদি) পালনে যত্নবান হয়, তবে তারা যে ভবিষ্যতে শুধু নিরাপত্তা ও শান্তি লাভ করবে তাই নয়, বরং ইসলামী ভ্রাতৃত্বে শামিল হয়ে সেই সব অধিকারও লাভ করবে, যা অন্যান্য মুসলমান লাভ করেছে। আর যা কিছু দুষ্কৃতি পূর্বে করেছে, তা সবই মাফ করে দেওয়া হবে।

১২. আর যদি অঙ্গীকার করার পর ওরা নিজেদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীনের নিন্দা করে, তবে তোমরা কুফরের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করবে —(এ অবস্থায়) ওদের শপথ অবশিষ্ট থাকল না— যাতে ওরা নিবৃত্ত হয়[১]।

وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ﴿١٢﴾

১৩. তোমরা কি এমন লোকদের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে (মক্কা থেকে) বহিষ্কার করার ফিকির করেছে, আর ওরাই প্রথমে তোমাদের (উস্কানী) দিয়েছে? তোমরা কি ওদের ভয় করবে? অথচ আল্লাহই এর বেশী উপযুক্ত যে, তোমরা তাঁকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও[২]।

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾

শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, এই যে বলা হয়েছে, 'শরী'য়তের বিধানে ওরা তোমাদের ভাই' এ থেকে বোঝা যায় যে, আলামত দ্বারা যে ব্যক্তি বাহ্যত মুসলমান বলে মনে হয় কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস রাখে না, তাকে বাহ্যিক বিধানে মুসলমানই গণ্য করবে, কিন্তু বিশ্বস্ত ও বন্ধু বানাবে না।

১. অর্থাৎ ওরা যদি ওয়াদা-অঙ্গীকার ভেঙ্গে ফেলে (যেমন বনী বকর গোত্র চুক্তির বিরুদ্ধে বনী খুযাআর উপর আক্রমণ করল এবং কুরায়শরা আক্রমণকারীদের সাহায্য করল), এবং কুফর থেকে নিবৃত্ত না হয়, বরং সত্য ধর্মের সমালোচনা ও তাতে দোষান্বেষণ করতে থাকে— তবে জেনে রাখ যে, এ ধরনের লোকেরা হচ্ছে أئمة الكفر (অর্থাৎ কুফরের সর্দার ও নেতা।) কেননা, এদের কর্মকাণ্ড দেখে এবং কথাবার্তা শুনে অনেক বক্রপন্থী ও নির্বোধরা এদের অনুসারী হয়ে যায়। অতএব এমন দলপতিদের সাথে পুরাদমে যুদ্ধ কর। কারণ, ওদের কোন কথা-কসম এবং ওয়াদা-অঙ্গীকার অবশিষ্ট রয়নি। এবং সম্ভাবনা আছে, তোমাদের হাতে কিছুটা শাস্তি পেয়ে ওরা নিজেদের দুষ্কর্ম ও অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসবে।

২. কুরায়শরা শপথ ও অঙ্গীকার ভেঙ্গে ফেলেছিল। কারণ, ওরা অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে বনী খুযাআর মোকাবেলায় বনু বকরকে সাহায্য করে এবং হিজরতের পূর্বে পয়গম্বর আলাইহিস সালামকে পবিত্র মক্কা মুআজ্জমা থেকে বের করে দেওয়ার পরিকল্পনা আঁটে এবং শেষপর্যন্ত ওরাই (তাঁর) দেশত্যাগের কারণ হয়। তাছাড়া মক্কা শরীফের নিরপরাধ মুসলমানদের উপর অযথা জুলুম-অত্যাচারের সূচনা করে। আর যখন আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা রক্ষা পেয়ে গেল, তখন ঔদ্ধত্যভরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪. তোমরা ওদের সাথে যুদ্ধ কর; আল্লাহ তোমাদের হাতে ওদের শাস্তি দেবেন, ওদের লাঞ্ছিত করবেন, ওদের উপর তোমাদের বিজয়ী করবেন, মুমিনদের অন্তর প্রশান্ত করবেন,

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٥﴾

১৫. এবং তাদের অন্তরের জ্বালা দূর করবেন। আর আল্লাহ (কাফেরদের মধ্যে) যাকে ইচ্ছা তওবা নসীব করবেন[১]। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান[১]।

বদরের ময়দানে গমন করে এবং 'হুদায়বিয়ার সন্ধি'র পরও নিজেদের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সূচনা করে, কেননা মুসলমানদের মিত্র খুযাআর মোবেলায় বনু বকরকে সহায়তা করে এবং অস্ত্র দ্বারা সাহাজ্য করে।— শেষ পর্যন্ত মুসলমানগণ ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং মক্কা মুআজ্জমাকে মুশরিকদের দখল থেকে মুক্ত ও পবিত্র করেন।

বর্তমান আয়াত– الا تقاتلون قوما الخ দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, যে কোন সম্প্রদায় এ ধরনের হবে, ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মুসলমানদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা করা উচিত নয়। যদি ওদের শক্তি, ঐক্য ও সাজসরঞ্জাম দেখে ভয় হয়, তবে মুমিনদের সব চেয়ে বেশি আল্লাহর ভয় হওয়া উচিত। আল্লাহর ভয় যখন দিলের মধ্যে এসে যায়, তখন আর সকল ভয় দূর হয়ে যায়। ঈমানের দাবি হচ্ছে, বান্দা আল্লাহর নাফরমানীকে ভয় করবে এবং তাঁর কহর ও গযব সম্বন্ধে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। কেননা, লাভ ও ক্ষতি সবই তাঁর হাতে, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোন সৃষ্টিজীবই সামান্য লাভ বা ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম নয়।

১. আয়াতে জেহাদের আসল হেকমত ও তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন করীমে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের যেসব কাহিনী বয়ান করা হয়েছে, তা থেকে প্রকাশ পায় যে, যখন কোনো জাতি কুফর ও দুষ্কর্মে এবং নবীগণের বিরোধীতা ও শত্রুতায় সীমা ছাড়িয়ে যেত, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ধ্বংসাত্মক আসমানী আযাব নাযিল করা হত, যার ফলে ওদের সকল জুলুম-অত্যাচার ও কুফরী কর্মকাণ্ডের তাৎক্ষণিক পরিসমাপ্তি হয়ে যেত– যেমন, সূরা আনকাবূতে (আয়াত: ৪০) আছে-

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

আয়াতে বর্ণিত এসব শাস্তি ধ্বংসাত্মক এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য শিক্ষামূলক ছিল বটে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা দুনিয়াতে থেকে নিজেদের অপমান ও লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করত না এবং ভবিষ্যতে তওবা করা ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের কোন সুযোগ থাকত না।

১৬. তোমরা কি মনে করেছ, তোমাদের (এ অবস্থায়ই) ছেড়ে দেওয়া হবে (এবং তোমাদের পরীক্ষা করা হবে না)? অথচ আল্লাহ এখনো তোমাদের মধ্য থেকে তাদের জেনে নেননি, যারা জেহাদ করে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানায় না। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ পূর্ণ অবহিত[২]।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

শরী'য়তে জেহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে, কাফের-মুশরিক ও নাফরমানদেরকে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নিজে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে তাঁর খাঁটি বান্দাদের হাতে শাস্তি প্রদান করা। শাস্তিদানের এই পদ্ধতিতে পাপীদের লাঞ্ছনা ও খাঁটিদের মর্যাদা বেশি প্রকাশিত হয়। মুমিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তাদের অন্তর এই ভেবে শীতল হয় যে, যারা কাল পর্যন্ত তাদের হীন ও অক্ষম মনে করত এবং তাদেরকে জুলুম-অত্যাচার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বানিয়ে রেখেছিল, আজ খোদার সাহায্য ও রহমতে তারা ওদের উপর প্রাবল্য লাভ করেছে। কুফর ও বাতিলের প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে যে সত্যপন্থীরা মনঃক্ষুণ্ন হচ্ছিল, অথবা যে মজলুম মুসলমানগণ কাফেরদের জুলুম-অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে না পারায় অন্তরের জ্বালা অন্তরেই রেখে দিয়েছিল, আল্লাহর পথে জেহাদের মাধ্যমে তাদের অন্তর শান্তি লাভ করে।

ويتوب الله

আর শেষ কথা এই যে, শাস্তিদানের এই পদ্ধতি স্বয়ং পাপীদের পক্ষেও অধিক ফলদায়ক। এতে শাস্তিপ্রাপ্তির পরও আল্লাহমুখিতা ও তওবার দরজা খোলা থাকে। আশা থাকে যে, আল্লাহর শাস্তি থেকে শিক্ষা হাসিল করে অনেক পাপীর পক্ষে তওবার সৌভাগ্য হবে। যেমন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এমনটিই হয়েছিল যে, স্বল্পকালের মধ্যেই সমগ্র আরবজাতি খাঁটি অন্তরে তওবা করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

১. অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকের অবস্থা জেনে হেকমতের আচরণ করেন এবং প্রত্যেক যমানায় তার উপযোগী বিধিবিধান প্রেরণ করেন।

২. এখানে জেহাদের আরেকটি হেকমত বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, ঈমান ও বন্দেগীর মৌখিক দাবি তো অনেকেরই আছে, কিন্তু পরীক্ষার তুলাদণ্ডে যতক্ষণ মাপা না হয় ততক্ষণ খাঁটি-ভেজাল প্রকাশ পায় না। জেহাদের মাধ্যমে আল্লাহ পৃথক করতে চান সেসব মুসলমানদের, যারা তাঁর পথে জান ও মাল বিসর্জন দিতে প্রস্তুত রয়েছে এবং যারা আল্লাহ ও রাসূল এবং মুসলমানদের ছাড়া কাউকেই নিজেদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে না– চাই সে যতই নিকট আত্মীয় হোক না কেন। জেহাদ হচ্ছে সেই কষ্টিপাথর, যার মাধ্যমে মুমিনদের ঈমান পরীক্ষা করা হয়। (والله خبير) আর আমল যা কিছু করা হয়, তার খবর আল্লাহ তাআলার রয়েছে। আমল

[রুকূ - ৩]

১৭. মুশরিকদের কাজ নয় আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করা, যখন ওরা নিজেরা নিজেদের ব্যাপারে কুফরের কথা স্বীকার করছে*। ওদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং ওরা চিরকাল আগুনে থাকবে।

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۖۚ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۱۷﴾

১৮. আল্লাহর মসজিদসমূহ তারাই আবাদ করবে, যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, নামায কায়েম করেছে, যাকাত প্রদান করেছে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করেনি; তো এমন ব্যক্তিরা আশাবাদী যে, তারা (পূর্ণ) হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে*[১]।

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿۱۸﴾

সততা ও এখলাসের সাথে করেছে না রিয়ার জন্য করেছে, তা তিনি জানেন। যেমন আমল হবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তদ্রূপ ফলই লাভ হবে।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'মুশরিকদের এ যোগ্যতাই নেই যে, ওরা আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে– যখন ওরা নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে কুফরের সাক্ষ্যপ্রদানকারী'।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** '(জান্নাতে) যারা পৌঁছবে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, পরীক্ষা ছাড়া মুসলমানদের এমনি ছেড়ে দেওয়া যায় না, বরং বড় বড় দৃঢ়তাপূর্ণ আমল (যেমন জেহাদ ইত্যাদি)-তে তাদের অবিচলতা দেখা হবে, আরো দেখা হবে– তারা আল্লাহ ও রাসূলের দিককে সকল পার্থিব সম্পর্কের ঊর্ধ্বে স্থান দেয় কি না। এই রুকূতে বলা হচ্ছে যে, খোদার মসজিদগুলি বস্তুত এমনি দৃঢ়চেতা মুসলমানদের দ্বারাই আবাদ থাকতে পারে। কেননা মসজিদসমূহের প্রকৃত আবাদকরণ হচ্ছে, সেগুলিতে এক আল্লাহর ইবাদত হওয়া, বাধাহীনভাবে আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য সেখানে অধিক সংখ্যায় আল্লাহর যিকিরকারী উপস্থিত থাকা, বেহুদা ক্রিয়াকলাপ থেকে মসজিদের হেফাজত করা। কাফের ও মুশরিকদের দ্বারা কী করে এসব উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে?

লক্ষণীয় যে, মক্কার মুশরিকরা নিজেদের মসজিদুল হারামের মুতাওয়াল্লী ও খাদেম বলত। কিন্তু ওদের বড় খেদমতগিরী এ-ই ছিল যে, শত শত পাথরের মূর্তি কাবাগৃহে রেখে দিয়েছিল। ওরা সেগুলোর নামে নজরানা দিত ও মানত মানত। অনেকে উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করত। যিক্‌রুল্লাহর স্থলে ওরা শিস মারত ও তালি বাজাত এবং এক আল্লাহর প্রকৃত ইবাদতকারীদের সেখানে যেতে অনুমতি দিত না।

১৯. তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো ও মসজিদুল-হারামের মেরামত করাকে সে ব্যক্তির (কর্মের) সমতুল্য বানিয়ে ফেলেছ, যে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে? এরা আল্লাহর নিকট সমান নয়। আর আল্লাহ জালেম লোকদের পথ দেখান না[১]।

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑲

ওদের বড় ইবাদত একমাত্র এ-ই ছিল যে, হাজীদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দিত, হরম শরীফে বাতি জ্বালিয়ে দিত, কাবাগৃহের উপর গিলাফ চড়িয়ে দিত অথবা কখনো প্রয়োজন হলে ভাঙাচুরা স্থান মেরামত করে দিত। কিন্তু ওদের এসব আমল একেবারে নিষ্প্রাণ ও রূহহীন ছিল। কেননা, আল্লাহর সহীহ মারেফত অর্জিত না থাকায় কোন আমলের মধ্যেই মুশরিকের লক্ষ্যবস্তু ও প্রেরণার উৎস 'খোদায়ে ওয়াহ্দাহু লা-শরীকা লাহু'র পবিত্র সত্তা হতে পারে না। এ জন্যই কাফেরের কোন আমল আল্লাহর নিকট জীবন্ত আমল নয়। (একেই বলা হয়েছে- حبطت أعمالهم)। মোটকথা, যে কাফের ও মুশরিকরা নিজেদের অবস্থা ও কথার দ্বারা সর্বদা স্বীয় কুফর ও শিরকের সাক্ষ্য দিচ্ছে, ওদের দ্বারা আল্লাহর মসজিদসমূহ, বিশেষ করে মসজিদুল হারামের আবাদকরণ হতে পারে না।

এ কাজ একমাত্র তাঁদের, যারা খাঁটি অন্তরে এক আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে, যারা নামায প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত থাকে, ধন-সম্পদ থেকে রীতিমত যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকেই ভয় করে না। এ কারণেই মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও পবিত্রতা সাধনে তারা জেহাদের জন্য প্রস্তুত থাকে। এমন মুমিনগণেরই পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে মসজিদগুলি আবাদ রাখা এবং মুশরিকদের সেখান থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া, চাই ওরা আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন। কারণ, ওদের উপস্থিতি দ্বারা আল্লাহর মসজিদসমূহের আবাদী নয়, বরং বরবাদীই হয়ে থাকে।

শানে নুযূল

মক্কার মুশরিকরা গর্ব করে বলত, আমরা হাজীদের খেদমত করি, তাদের পানি পান করাই, খাদ্য ও বস্ত্র দেই এবং মসজিদুল হারামের মেরামত, কাবাগৃহে গিলাফ পরানো ও তেল-বাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে থাকি। মুসলমানদের যদি নিজেদের জেহাদ, হিজরত প্রভৃতি নিয়ে গর্ব থাকে, তবে আমাদের নিকটও ইবাদতের এ ভাণ্ডার রয়েছে! একবার হযরত আব্বাস রা., হযরত আলী রা. এর সাথে এ ধরনের বিতর্কই করেছিলেন।

বরং সহীহ মুসলিমে আছে যে, একদা কিছু সংখ্যক মুসলমান পরস্পর বিতর্ক করছিলেন। কেউ বলছিলেন, আমার নিকট ইসলাম গ্রহণের পর হাজীদের পানি পান করানোর চেয়ে উত্তম ইবাদত আর নেই। অপর জন বললেন, আমার মতে ইসলামের পর সর্বোত্তম আমল হচ্ছে মসজিদুল হারামের খেদমত করা (যেমন ঝাড়ু দেওয়া বা বাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা)। তৃতীয় জন বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা সকল ইবাদত ও আমলের মধ্যে

২০. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়ে জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি মর্যাদাবান। আর তারাই সফলকাম।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১. তাদের রব তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় রহমত ও সন্তুষ্টির এবং এমন জান্নাতসমূহের, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি;

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ﴿٢١﴾

২২. সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা প্রতিদান[১]।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٢﴾

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের ধমক দিয়ে বললেন, তোমরা 'জুমার' সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরের কাছে বসে এ ধরনের বিতর্ক করছ? একটু সবর কর। তিনি জুমা থেকে অবসর হলে তাঁর নিকট এ বিষয় জিজ্ঞাসা করে নেওয়া হবে। সে মতে জুমা বাদ হুযূরকে জিজ্ঞাসা করা হলে এই আয়াতগুলি নাযিল হয়- اجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام الخ (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৮৭৯) অর্থাৎ হাজীদের পানি পান করানো ও মসজিদুল হারামের মেরামত করা– আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর রাস্তায় জেহাদ করার সমান হতে পারে না (শ্রেষ্ঠ হওয়া তো দূরের কথা)।

জিহাদের পূর্বে ঈমান-বিল্লাহ এর উল্লেখ কেন?

এখানে জেহাদের সাথে আল্লাহর উপর ঈমানের উল্লেখ হয়ত এজন্য করা হয়েছে,যাতে মুশরিকদের গর্ব ও অহংকারের উত্তরও হয়ে যায় যে, সমস্ত ইবাদতের রূহ (বা প্রাণ) হচ্ছে ঈমান-বিল্লাহ। এই রূহ ছাড়া পানি পান করানো বা মসজিদে-হারামের খেদমত করা নিতান্তই মৃত আমল। সুতরাং এই মৃত ও প্রাণহীন আমল একটি চিরজীবন্ত আমলের সমতুল্য কী করে হতে পারে? অথবা এস্থলে ঈমান-বিল্লাহকে উল্লেখ করা হয়েছে জেহাদের ভূমিকাস্বরূপ। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে জেহাদ প্রভৃতি দৃঢ়তাপূর্ণ আমলগুলির শ্রেষ্ঠত্ব বয়ান করা। ঈমানের উল্লেখ করে সতর্ক করা হল যে, আল্লাহর পথে জেহাদ হোক বা অন্য কোন আমলই হোক, ঈমান ছাড়া তা প্রাণহীন ও মৃত। জেহাদ, হিজরত ইত্যাদি দৃঢ়তাপূর্ণ আমলও ঈমান-বিল্লাহ দ্বারাই জীবন্ত হয়ে থাকে। —তবে এ তাৎপর্য তারাই বুঝতে পারে, যারা সুস্থ চিন্তা-বুদ্ধির অধিকারী। বেঈমান-জালেমরা এসব তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম।

১. অর্থাৎ তার নিকট ছওয়াব ও মর্যাদার অভাব নেই, যাকে যত ইচ্ছা দান করবেন।

২০ নং আয়াতে তিনটি জিনিসের উল্লেখ ছিল– ঈমান, জেহাদ, হিজরত। ২১ নং আয়াতে এ তিনটি বিষয়ের জন্য সুসংবাদও তিনটি বস্তুর দিয়েছেন– রহমত, রিযওয়ান (সন্তুষ্টি), ও

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের পিতা ও ভাইদের বন্ধু বানিয়ো না যদি তারা ঈমানের মোকাবেলায় কুফরকে পছন্দ করে। আর তোমাদের মধ্যে যারা ওদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারাই অপরাধী[১]।

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

২৪. আপনি বলে দিন, 'যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই, স্ত্রী, গোষ্ঠী, ধন-সম্পদ যা তোমরা উপার্জন করেছ, ব্যবসা যার মন্দার আশঙ্কা তোমরা কর এবং ঘর-বাড়ী যা তোমরা ভালবাস– তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জেহাদ করা থেকে বেশি প্রিয় হয়, তবে তোমরা অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাঁর নির্দেশ পাঠান। আর আল্লাহ নাফরমান লোকদের পথ দেখান না[২]।

জান্নাতে শাশ্বত অবস্থান। ইমাম আবু হাইয়্যান (র) লিখেছেন, 'রহমত' হচ্ছে ঈমানের সুফল, ঈমান না হলে আখেরাতে আল্লাহর রহমত ও মেহেরবানীর কিছুমাত্র পাওয়া সম্ভব নয়। আর 'রিযওয়ান' (যা অতি উচ্চ মাকাম) হচ্ছে আল্লাহর পথে জেহাদের প্রতিদান। একজন মুজাহিদ নিজের সকল সুখ ও সম্পর্ক বর্জন করে আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল বিসর্জন দেয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চরম কুরবানী পেশ করে। সুতরাং তার প্রতিদানও পরম হওয়া উচিত এবং তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পরম সন্তুষ্টি। আর 'হিজরত' হচ্ছে আল্লাহর জন্য প্রিয় জন্মভূমি ও ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করার নাম। এ জন্য মুহাজিরকে সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে যে, তোমার দেশের চেয়ে উত্তম দেশ এবং তোমার ঘরবাড়ির চেয়ে উত্তম ঘরবাড়ি তুমি পাবে, যেখানে সর্বোচ্চ সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশের সাথে অনন্তকাল বসবাস করার সৌভাগ্য তোমার হবে এবং যেখান থেকে আর কখনো হিজরত করার প্রয়োজন হবে না।

১. পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে, জেহাদ ও হিজরত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম আমল। অনেক সময় এ দুটি আমলের ব্যাপারে আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতিগোষ্ঠী প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য এখানে বলা হল যে, যাদের নিকট ঈমান থেকে কুফর বেশি প্রিয়, একজন মুমিন তাদের কী করে ভালবাসতে পারে? তাদের সাথে যে বন্ধুত্ব মুমিনকে জেহাদ ও হিজরত করতে বাধা দেয়, এমন বন্ধুত্ব রাখা মুমিনদের মর্যাদার পরিপন্থী।

২. অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ পালন এবং হিজরত বা জেহাদ করার পথে যদি এই খেয়াল বাধার কারণ হয় যে, বংশীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছুটে যাবে, ধন-সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত

[রুকূ - ৪]

২৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন বহু (যুদ্ধ)ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের (যুদ্ধের) দিন, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি, বরং যমীন তার প্রশস্ততা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۝

২৬. অতঃপর আল্লাহ আপন রাসূল ও ঈমানদারদের উপর তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং এমনসব সৈন্যদল নাযিল করলেন, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফেরদের শাস্তি দিলেন। আর এ হচ্ছে কাফেরদের (পার্থিব) শাস্তি[১]।

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝

হবে, ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা হবে বা বন্ধ হয়ে যাবে, সুখের বাসস্থানগুলি থেকে বের হয়ে কষ্টে পড়তে হবে— তা হলে আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তির অপেক্ষা কর, যা এই আরাম-প্রিয়তা ও দুনিয়া-কামনার কারণে অবশ্যই আসবে। যারা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব বা পার্থিব কামনা-বাসনার মধ্যে জড়িয়ে আল্লহার আহকাম পালন করে না, তারা প্রকৃত কামিয়াবীর পথ পেতে পারে না।

হাদীসে আছে, যখন তোমরা গরু-বলদের লেজ ধরে হালচাষে মত্ত হয়ে পড়বে এবং 'জেহাদ' ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দেবেন যা থেকে কখনো বের হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না পুনরায় নিজেদের দীন (তথা আল্লাহর পথে জেহাদ) এর দিকে ফিরে আসবে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৩৪৫৬; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৪৮২৫, ৫০০৭)

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

পূর্বের আয়াতে সতর্ক করা হয়েছিল যে, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ, জমিজমা ইত্যাদি বস্তুর মুহাব্বত মুসলমানদের জন্য জেহাদের পথে বাধা না হওয়া উচিত। আর এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, মুজাহিদদের নিজেদের সমর-সমাবেশ ও সংখ্যাধিক্যের উপর গর্ব করা উচিত নয়। বিজয় ও সাফল্য একমাত্র খোদার সাহায্যে হয়ে থাকে। এর অভিজ্ঞতা তোমরা ইতিপূর্বে বহু রণক্ষেত্রে লাভ করেছ– বদর, হুদায়বিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে এবং বনু কুরাইজা ও বনু নযীর গোত্রদ্বয়ের সাথে যুদ্ধে যে ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে, তা নিতান্তই

আল্লাহর মদদ ও গায়বী সাহায্যের বিস্ময়কর উদাহরণ ছিল। আর সর্বশেষ হুনায়ন যুদ্ধের ঘটনা তো আসমানী সাহায্য ও মদদের এমন সুস্পষ্ট নিদর্শন, যা চরম শত্রুরা পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

হুনায়ন যুদ্ধ

মক্কা বিজয়ের পর পরই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেলেন, 'হাওয়াযিন' ও 'ছাকীফ' প্রভৃতি অনেক আরব গোত্র বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে বিপুল সাজসরঞ্জামসহ মুসলমানদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। এ সংবাদ পাওয়া মাত্রই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ হাজার মুহাজির ও আনসারদের বিরাট বাহিনী নিয়ে তায়েফের দিকে রওয়ানা হলেন। এই সাহাবীগণ মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মদীনা থেকে আগমন করেছিলেন। তাছাড়া মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত দু'হাজার নতুন মুসলমানও ছিলেন। জেহাদের ময়দানে বার হাজারের এই বিরাট সমাবেশ মুসলমানদের জন্য প্রথম ঘটনা ছিল। এহেন দৃশ্য দেখে কতিপয় সাহাবী আবেগ সামলাতে না পেরে বলেই ফেললেন, (যখন আমরা অতি স্বল্প ছিলাম, তখনো সর্বদা বিজয়ী হয়েছি, সুতরাং) আজ আমাদের এত বিরাট সংখ্যা কারো কাছে পরাজিত হতে পারে না। একত্ববাদে বিশ্বাসী বীরপুরুষদের এই বাক্যটি লা-শরীক আল্লাহর দরবারে অপছন্দ হল।

মক্কা থেকে কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পরই উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল। শত্রু দলের সংখ্যা ছিল চার হাজার। ওরা জীবন বাজি রেখে এবং নিজেদের সকল মেয়ে ও শিশুদের সাথে নিয়ে একটি মীমাংসাকর যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতিসহ বের হয়েছিল। উট, ঘোড়া, চতুষ্পদজন্তু ও বাড়িঘরের যাবতীয় সম্পদ সবই নিজেদের সাথে নিয়ে এসেছিল। ওদের মধ্যে হওয়াযিন গোত্র তীর নিক্ষেপে সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধ ছিল। ওদের দক্ষ তীরন্দাজরা হুনায়ন উপত্যকার পাহাড়গুলিতে ওঁৎ পেতে বসেছিল।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে, প্রথমদিকে কাফেরদের পরাজয় ঘটে এবং ওরা অনেক ধন-সম্পদ রেখে পিছপা হয়ে যায়। এ অবস্থা দেখে মুসলমান সৈন্যরা গনীমতের মালের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তখন হাওয়াযিন গোত্রের তীরন্দাজরা গোপন স্থান থেকে বের হয়ে অতর্কিত আক্রমণ করে বসে। একই মুহূর্তে চারদিক থেকে ওরা এত পরিমাণ তীর নিক্ষেপ করল যে, মুসলমানদের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন হয়ে গেল। প্রথমে নবীন মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, শেষ পর্যন্ত সকলের পা টলে গেল। পৃথিবী প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তা এমন সংকীর্ণ হয়ে গেল যে, কোথাও আশ্রয়ের জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাথীসহ শত্রুদের ঘেরাও এর মধ্যে ছিলেন। হযরত আবু বকর, উমর, আব্বাস, আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. প্রমুখ সাহাবাসহ প্রায় একশত বা আশি জন সাহাবী, বরং কোন কোন সীরাত গ্রন্থকারের বর্ণনা অনুযায়ী কেবল দশজন পবিত্রাত্মা (عشرة كاملة) যুদ্ধক্ষেত্রে অবশিষ্ট রইলেন, যাঁদেরকে পাহাড়ের চেয়ে বেশি অটল দেখা যাচ্ছিল।

এহেন মুহূর্তে, একজন নবীর সততা, আল্লাহ-নির্ভরতা ও অলৌকিক বীরত্ব কেমন হয়, পৃথিবী চর্মচোখে তার বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা খচ্চরের উপর আরোহী, আর হযরত আব্বাস এক রেকাব ও আবু সুফিয়ান ইবনে হারেছ দ্বিতীয় রেকাব ধরে আছেন। চার হাজারের সশস্ত্র বাহিনী প্রতিশোধের উন্মত্ততায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে, চার দিক থেকে মুষলধারে তীরবৃষ্টি হচ্ছে, সঙ্গী-সাথীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ সাথী তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। ঐশ্বরিক সাহায্য ও আসমানী প্রশান্তির অদৃশ্য বৃষ্টি তাঁর ও তদীয় মুষ্টিমেয় সাথীদের উপর হচ্ছে, যার প্রভাব শেষ পর্যন্ত পলায়নকারীদের পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্রদ্বয়ের স্রোত যেদিক থেকে অগ্রসর হচ্ছে, সেই সময়ও তাঁর সওয়ারীর মুখ সে দিকেই রয়েছে এবং সেদিকেই অগ্রসর হওয়ার জন্য খচ্চরকে তাড়া করছেন তিনি। আল্লাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ রয়েছেন এবং নির্ভিকতা ও নিশ্চিন্ততার সাথে পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে

انا النبي لاكذب ÷ انا ابن عبد المطلب.

অর্থাৎ আমি সত্য নবী, মিথ্যুক নই এবং আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।

সেই অবস্থাতেই তিনি সাহাবীদের ডেকে বললেন, إِلَيَّ عباد الله أنا رسول الله আল্লাহর বান্দারা! এদিকে আস, আমার কাছে আস, আমি যে আল্লাহর রাসূল!

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হযরত আব্বাস 'আসহাবে সামুরা'কে অর্থাৎ যাঁরা (হুদায়বিয়ার ময়দানে) বাবুল গাছের নীচে হুযূরের হাতে জেহাদের বায়'আত করেছিলেন, তাঁদের ডাক দিলেন। আওয়াজ শোনামাত্র পলায়নকারীরা সম্বিত ফিরে পেলেন। তাঁরা সওয়ারীর গতি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ফিরিয়ে দিলেন। যার উট ঘুরতে দেরি করল, তিনি উটের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লেন এবং বাহন ছেড়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ধাবিত হলেন। এ সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু মাটি ও কঙ্কর উঠিয়ে কাফের বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করলেন। খোদার কুদরতে তা প্রত্যেক কাফেরের চোখে-মুখে পতিত হল। অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে দলে দলে ফেরেশতা পাঠালেন, যাঁদের অবতরণ অদৃশ্যভাবে মুসলমানদের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি এবং কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চারের কারণ হল।

তার পর আর কী! কাফেররা কঙ্করের কারণে চোখ মলতে লাগল। নিকটবর্তী মুসলমানরা ঘুসে এসে আক্রমণ করলেন। দেখতে দেখতে অন্ধকার কেটে গেল। পালিয়ে যাওয়া বহু মুসলমান ফিরে এসে হুযূরের খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। হাজার হাজার বন্দী বাঁধা অবস্থায় তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং গনীমতের মাল স্তূপীকৃত— فسبحان من بيده ملكوت كل شئ (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৩১৭, ৪৩৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০৫৯, ১৭৭৫-১৭৭৬; দালাইলুন নবুওয়াহ্ বাইহাকী : ৫/১৪২; মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালেসী, হাদীস : ১৪৬৮; তাফসীরে ইবনে কাসীর, বর্তমান আয়াতের তাফসীর)

২৭. তার পর আল্লাহ (কাফেরদের মধ্যে) যাকে ইচ্ছা তওবা নসীব করবেন। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٧﴾

২৮. হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। অতএব এ বছরের পর ওরা যেন মসজিদুল-হারামের নিকটেও না আসতে পারে[২]। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের ভয় কর, তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে ভবিষ্যতে নিজ কৃপায় তোমাদের স্বচ্ছলতা দান করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান[৩]।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٨﴾

---

১. সে মত পরবর্তীতে হাওয়াযিন প্রভৃতি গোত্র তওবার সৌভাগ্য লাভ করল এবং তাদের অধিকাংশই মুসলমান হয়ে গেল।

২. যখন আল্লাহ তাআলার রহমতে মুসলমানরা শিরকের শক্তি পর্যদুস্ত করে জাযিরাতুল আরবের কেন্দ্রস্থল (মক্কা শরীফ)কে বিজয় করে এবং আরবের গোত্রগুলো দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করতে শুরু করল, তখন হিজরী নয় সনে এ ঘোষণা দেওয়া হল যে, ভবিষ্যতে যেন কোন মুশরিক (বা কাফের) মসজিদুল হারামে প্রবেশ না করে, বরং এর নিকটে অর্থাৎ হরমের সীমার মধ্যেও যেন না আসে। কেননা, ওদের অন্তর শিরক ও কুফরের অপবিত্রতায় এমন নাপাক ও গান্দা যে, ওরা এই সর্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান এবং তাওহীদ ও ঈমানের কেন্দ্রে দাখিল হওয়ার যোগ্যই নয়। —অধিকন্তু সহীহ হাদীসে রয়েছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাযিরাতুল আরব থেকে মুশরিক এবং ইহুদী ও খ্রিস্টান সকলকেই বহিষ্কারের নির্দেশ দেন। তাই হুযূরের শেষ ওসীয়ত অনুযায়ী হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আমলে এই নির্দেশ কার্যকর করা হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ২৩৩৮, ৩০৫৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৭৬৭)

অতঃপর আর কখনো প্রভাব-প্রতিপত্তিসহ বা বাসিন্দারূপে সেখানে কাফেররা থাকতে পারে না, বরং জাযিরাতুল আরবকে যথাসাধ্য পবিত্র রাখা মুসলমানদের দায়িত্ব! তবে হানাফী মাযহাব মতে কোন কাফের মুসাফির হিসাবে সাময়িকভাবে ইমামের (শাসকের) অনুমতিক্রমে সেখানে যেতে পারে। শর্ত এই যে, ইমাম এতটুকু অনুমতি দানকে যদি অমঙ্গল মনে না করেন। কিন্তু হজ ও উমরার উদ্দেশ্যে কোন কাফেরেরই প্রবেশের অনুমতি নেই, যেমন হাদীসে এসেছে- ألا لا يحجّ بعد العام مشرك (জেনে রাখ! এ বছরের পর কোনো মুশরিকই আর হজ করতে পারবে না)। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৬৫৭)

৩. হরম শরীফে মুশরিকদের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়ার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ওরা যেসব পণ্যদ্রব্য আমদানী করত তা আসবে না বলে মুসলমানগণ আশঙ্কা করলেন।

২৯. যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু হারাম করেছেন তাকে হারাম মনে করে না এবং সত্য দীন গ্রহণ করে না– তোমরা তাদের সাথে জেহাদ করে যাও, যে পর্যন্ত না অপমানিত হয়ে স্বহস্তে জিয়্য়া প্রদান করে[১]।

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۟

এ জন্য সান্ত্বনা দেওয়া হল যে, এতে ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই, তোমাদের ঐশ্বর্য ও স্বচ্ছলতা দান করা নিতান্তই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে তাতে মোটেই দেরি হবে না।

বস্তুত তাই হল। আল্লাহ তাআলা সারা দেশকে মুসলমান বানিয়ে দিলেন। বিভিন্ন শহর ও বন্দর থেকে দ্রব্যাদি আসতে লাগল। প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় উৎপন্নশীল দ্রব্য বেড়ে গেল। (বিভিন্ন এলাকা বিজয়ের ফলে) ধন-সম্পদ ও গনীমতের মাল আসতে লাগল। আহলে কিতাব প্রভৃতি থেকে জিয়্য়ার টাকা-পয়সা উসূল হতে লাগল। মোটকথা, বিভিন্ন উপায়ে আল্লাহ তাআলা ঐশ্বর্যের উপায়-উপকরণ জমা করে দিলেন। নিশ্চয় আল্লাহর কোন হুকুম হেকমতশূন্য নয়।

১. যখন মুশরিকদের কাহিনী সমাপ্ত হল এবং দেশের পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল হল, তখন আহলে কিতাবের (অর্থাৎ ইহুদী ও নাসারাদের) শক্তি ও প্রভাব চূর্ণ করে দেওয়ার হুকুম হল। মুশরিকদের গোটা অস্তিত্ব থেকেই আরবভূমি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করে ফেলা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ইহুদী ও নাসারাদের সম্পর্কে তখন শুধু এতটুকুই লক্ষ্য ছিল যে, ওরা যেন ইসলামের মোকাবেলায় শক্তি সঞ্চয় করতে না পারে এবং এর প্রচার-প্রসার ও উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক না হতে পারে। এ জন্য অনুমতি দেওয়া হল যে, যদি ওরা অধীনস্থ প্রজা হয়ে জিয়্য়া দিতে সম্মত হয় তবে তা গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। অতঃপর ইসলামী সরকারের দায়িত্ব হবে ওদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা।

জিয়্য়া দিতে সম্মত না হলে ওদের প্রতিকারও মুশরিকদের অনুরূপ (অর্থাৎ ওদের বিরুদ্ধে লড়াই) হবে। কেননা, ওরাও আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি যথাযথ ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও রাসূলের আহকামেরও কোন পরোয়া করে না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো কথাই নেই, নিজেদের স্বীকৃত নবী হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের খাঁটি আনুগত্যও করে না, শুধু কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব করে থাকে। যে সত্য ধর্ম পূর্বে অর্থাৎ হযরত মাসীহ প্রমুখ নবীর কালে এসেছিল এবং যা এখন শেষ কালের নবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন, ওরা কোনটাই মানে না, বরং ওরা আল্লাহর জ্বালানো প্রদীপকে নিজেদের ফুঁয়ে নিবিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় লেগে থাকে। এহেন দূরাত্মা নালায়েকদের এমনিই ছেড়ে দেওয়া হলে দেশে ফেতনা ও ফাসাদ এবং কুফর ও অবাধ্যতার অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হতে থাকবে।

[রুকূ - ৫]

৩০. ইহুদীরা বলে, 'উযাইর আল্লাহর পুত্র' এবং খ্রিস্টানরা বলে, 'মাসীহ আল্লাহর পুত্র[১]।' এসব ওদের মুখের কথা। ওরা পূর্ববর্তী কাফেরদের কথার অনুকরণ করছে[২]। আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন। ওরা (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে[৩]?

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ۨابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝

৩১. ওরা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের ধর্মযাজক ও সংসারবিরাগীদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে[৪], এবং

اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا

---

১. বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, সে সময় কতক ইহুদীর বিশ্বাস ছিল, হযরত উযাইর খোদার পুত্র। তবে এ বিশ্বাস সকল ইহুদীর ছিল না। আর পরবর্তী কালের কোন কোন আলেম লিখেছেন যে, এখন আর কোন ইহুদী এ আকীদা পোষণ করে না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে ইহুদীদের কোন ফের্কাই এই আকীদাপোষণকারী না হলে ইহুদীরা তখন কুরআনের এই বর্ণনাকে অবশ্যই ভুল বলত, যেমন اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ (আয়াতখানি) শুনে আদী ইবনে হাতিম রা. অভিযোগ করেছিলেন যে, আহবার ও রুহবানকে তো কেউ রব মানে না। এর উত্তর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ পরে আসছে।

অতএব উযাইর (আ) আল্লাহ-পুত্র– এ আকীদাকে ইহুদীদের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং ওদের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ না হওয়াই প্রমাণ করে যে, তখন এই বিশ্বাসের লোক অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। হাঁ, কালের গতিতে অনেক ধর্মমত ও ফের্কা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ন্যায় এই মতবাদও বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য আমাদের নিকট একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী বুযুর্গ ব্যক্তি (হাজী আমীর শাহ মরহুম) বয়ান করেছেন যে, ফিলিস্তীন প্রভৃতি দেশ সফরকালে উক্ত আকীদাবিশিষ্ট কতিপয় ইহুদীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, এবং এই আকীদা পোষণ করার কারণে তাদের 'উযাইরী' বলা হয়ে থাকে। والله اعلم

২. অর্থাৎ মাসীহ প্রমুখ নবীগণের খোদাপুত্র বা ঈশ্বর হওয়ার আকীদা হচ্ছে পুরাতন মুশরিকদের আকীদার মতই, বরং ওদেরই অনুকরণে এরা এ বিশ্বাস অবলম্বন করেছে। সূরা মায়েদার (আয়াত :৭২-৭৩) তাফসীরে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন, তাওহীদের সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল আলো পৌছার পর ওরা কোন্ দিকে অন্ধকারের মধ্যে চলে যাচ্ছে?

৪. ওদের ধর্মযাজকরা নিজেদের তরফ থেকে যা কিছু মাসলা বানিয়ে দিত, চাই হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল বলে দিক, ওকেই সনদ মনে করত এবং ভাবত যে, ব্যস,

مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَالۡمَسِيۡحَ ابۡنَ مَرۡيَمَ ۚ وَمَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِيَعۡبُدُوۡۤا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبۡحٰنَهٗ عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ ﴿۳۱﴾

মাসীহ ইবনে মারয়ামকেও। অথচ ওদের এ আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, ওরা এক মা'বূদের ইবাদত করবে, যিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি ওদের শিরক থেকে পবিত্র।

يُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ يُّطۡفِـُٔوۡا نُوۡرَ اللّٰهِ بِاَفۡوَاهِهِمۡ وَيَاۡبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنۡ يُّتِمَّ نُوۡرَهٗ وَلَوۡ كَرِهَ الۡكٰفِرُوۡنَ ﴿۳۲﴾

৩২. ওরা আল্লাহর আলোকে নিজেদের মুখের (ফুৎকার) দ্বারা নিবিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণতায় পৌছানো ছাড়া আর কিছুতে রাজি নন, যদিও কাফেররা (তা) অপছন্দ করে[১]।

هُوَ الَّذِيۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰى وَدِيۡنِ الۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهٗ عَلَى الدِّيۡنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوۡ

৩৩. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি স্বীয় রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি

আল্লাহর নিকট আমাদের রেহাই হয়ে গেছে। আসমানী কিতাবের কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট ওরা রাখেনি, কেবল 'আহবার' ও 'রুহবান' এর বিধান অনুসারেই চলত। আর এদের অবস্থা এই ছিল যে, খানিক ধন-সম্পদ বা মান-সম্মানের বিষয় দেখলেই শরী'য়তের হুকুম পালটে দিত, যেমন দুই তিন আয়াত পর এর উল্লেখ রয়েছে।

সুতরাং যে অধিকার আল্লাহ তাআলার ছিল (অর্থাৎ হালাল ও হারাম সম্পর্কে বিধান দেওয়া), তা ধর্মযাজকদের দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ হিসাবে বলা হয়েছে যে, ওরা যাজক ও দরবেশদের রব সাব্যস্ত করে নিয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদী ইবনে হাতেমের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এ ধরনেরই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আর হযরত হুযায়ফা (রা) থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে। (জামে তিরমিযী, হাদীস ৩০৯৫; তাফসীরে তবারী ১১/৪১৮)

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, আলেমের কথা সাধারন্যের জন্য দলীল, যতক্ষণ তিনি শরী'য়তের আলোকে বলেন। যখন জানা যায়, তিনি নিজের তরফ থেকে বললেন অথবা লোভ ইত্যাদির স্বার্থে বললেন, তখন আর তাঁর কথা দলীল নয়।

১. অর্থাৎ খাঁটি তাওহীদ ও ইসলামের সূর্য যখন সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তখন আর এসব অন্তঃসারশূন্য কথা ও শিরকী দাবি কী করে মাথা উঁচু করতে পারে? অসার ও অর্থহীন কথা বানিয়ে এবং অনর্থক তর্কবিতর্ক করে সত্যের নূর নেবানোর চেষ্টা করা তেমন, যেমন কোন বেকুব চন্দ্র ও সূর্যের আলোকে মুখের ফুঁয়ে নিবিয়ে দিতে বা নিষ্প্রভ করতে চায়। স্মরণ রেখো, এরা যতই জ্বলে-পুড়ে মরুক না কেন, আল্লাহ তাআলা ইসলামের নূরকে পূর্ণরূপে বিস্তার করেই ছাড়বেন।

كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

একে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা (তা) অপছন্দ করে[১]।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

৩৪. হে ঈমানদারগণ! (কিতাবীদের) বহু আলেম ও সংসারবিরাগী অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ গ্রাস করে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয়[২]। আর যারা সোনা-রূপা সঞ্চিত করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না, আপনি তাদের যাতনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন[৩]।

---

১. দলীল-প্রমাণের দিক থেকে সকল ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় তো প্রত্যেক কালেই সুস্পষ্ট রয়েছে। আর হুকুমত ও রাজত্বের দিক থেকে তা তখনি হাসিল হয়েছে এবং হবে, যখন মুসলমানগণ ইসলামের মূলনীতির পরিপূর্ণ অনুসারী, ঈমান ও তাক্ওয়ার পথে দৃঢ় এবং আল্লাহর পথে জেহাদে অটল ছিল অথবা ভবিষ্যতে থাকবে। আর ইসলাম ধর্মের এমন বিজয়, যা বাতিল ধর্মগুলোকে পরাজিত করে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, তা মাসীহ আলাইহিস সালামের অবতরণের পর কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে।

২. অর্থাৎ ওরা টাকা-পয়সা গ্রহণ করে শরী'য়তের বিধান ও আল্লাহর বাণীকে পরিবর্তন করে ফেলে। অন্যদিকে সাধারণ লোকেরা ওদেরকে আল্লাহর মর্যাদা দিয়ে রেখেছে, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। এরা যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি বলে দেয়, তাই ওদের নিকট হুজ্জত (দলীলরূপে গৃহীত)। এভাবে এ পণ্ডিত ও গুরুজনেরা নজরানা ওসূল করা, ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করা এবং নিজেদের সর্দারী কায়েম রাখার জন্য জনসাধারণকে ফাঁকি ও প্রতারণার বেড়াজালে আটকিয়ে রাখে এবং সত্য পথ থেকে বাধা দিয়ে রাখে। কারণ, সাধারণ মানুষ যদি ওদের বেড়াজাল থেকে বের হয়ে যায় এবং সত্য দীন অবলম্বন করে ফেলে, তবে ওদের সব আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে।

এ অবস্থা মুসলমানদের এজন্য শোনানো হল, যাতে তারা এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায় যে, বিভিন্ন উম্মত ও জাতির ধ্বংসের মূল কারণ হচ্ছে তিনটি দলের খারাপ ও বিপথগামী হওয়া এবং নিজেদের কর্তব্য ছেড়ে দেওয়া। তারা হচ্ছে– উলামা-মাশায়েখ, ধনী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা। এ তিন দলের দুটির উল্লেখ তো হয়েছে। সামনে তৃতীয় দল– নেতৃস্থানীয়দের কথা উল্লেখ করা হবে। ইবনুল মুবারক কত সুন্দরই না বলেছেন- وَهَلْ أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانُها (রাজা-বাদশাহ, উলামায়ে সূ' ও বদ দরবেশরাই দীন-ধর্ম নষ্ট করে)। (তারীখে দিমাশ্ক ৩২/৩৬৯)

৩. যারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে, চাই হালাল উপায়েই হোক, কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না (যেমন, যাকাত দেয় না এবং ওয়াজিব হকসমূহ আদায় করে না)– তাদের জন্য এ শাস্তি।

৩৫. (শাস্তি হবে সেদিন), যেদিন ঐ ধন-সম্পদ দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দ্বারা ওদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশ দাগানো হবে (আর বলা হবে)– এ হচ্ছে তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চিত করে রেখেছিলে। এখন তোমরা সঞ্চয় করার (শাস্তি) আস্বাদন কর*১।

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝

৩৬. নিশ্চয় আল্লাহর নিকট আল্লাহর বিধানে মাসসমূহের সংখ্যা বার– যেদিন তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকেই। তন্মধ্যে চারটি মাস মর্যাদাপূর্ণ। এ-ই সরল দীন*২। সুতরাং তোমরা এ

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَاۤ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ

অতএব এ থেকেই সেই 'আহবার' ও 'রুহবানের' পরিণাম বুঝে নাও, যারা সত্যকে গোপন করে বা পরিবর্তন করে টাকা-পয়সা পুঞ্জীভূত করে এবং সর্দারী কায়েম রাখার লোভে জনসাধারণকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিয়ে রাখে। যা হোক, সম্পদ তা-ই ভাল, যা আখেরাতে শাস্তির কারণ না হয়।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যা সঞ্চয় করতে, তার (শাস্তি) আস্বাদন কর'।

১. কৃপণ ধনী ব্যক্তিকে খোদার রাস্তায় খরচ করতে বলা হলে সে তার কপাল কুঞ্চিত করে। বেশি বলা হলে এদিক থেকে সেদিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করে। এতেও রক্ষা না পেলে পিঠ ঘুরিয়ে হাঁটা দেয়। এ জন্য সোনা-চান্দি উত্তপ্ত করে এই তিন স্থানেই (কপাল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে) দাগ দেওয়া হবে, যাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত করার মজা উপভোগ করে নেয়।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'এ-ই সঠিক বিধান'।

২. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

আমার মতে পূর্বের আয়াতসমূহের সাথে বর্তমান আয়াতের যোগসূত্র এই যে– পূর্ববর্তী রুকূতে (আয়াত :২৯) মুশরিকদের আলোচনার পর আহলে কিতাব (ইহুদী ও খ্রিস্টান)দের সাথে জেহাদ করার হুকুম দেওয়া হয়। অতঃপর বর্তমান রুকূর শুরুতে (আয়াত : ৩০-৩১) বলা হয় যে, এদের আকীদা-বিশ্বাস ও রীতি-নীতিও মুশরিকদের মত। এদের পক্ষে উযায়র ও মাসীহকে খোদার পুত্র বলা তেমনি, যেমন মুশরিকরা ফেরেশতাদের খোদার মেয়ে বলে, বরং মাসীহর খোদার পুত্র হওয়ার আকীদা খৃস্টানদের মধ্যে মুশরিকদের অনুকরণেই প্রচলিত হয়েছে। মুশরিকরা দেব-দেবীকে খোদার মর্যাদা দেয়। আর খৃষ্টানরা মাসীহ রূহুল কুদ্সকে খোদা মনে করে। তাছাড়া আসমানী কিতাবের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও এরা আহবার ও রুহবানের আহকামকে আল্লাহর শরী'য়তের স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত করেছে, অর্থাৎ আহবার ও

রুহবান ঘুষ নিয়ে এবং হারাম মাল খেয়ে যেসব বিষয়কে হালাল বা হারাম বলে দিত, কিতাবীরা সেই সবকেই আসমানী আহকামের মত কবূল করে নিত। এদের এ রীতিও মুশরিকদের রীতির অনুরূপ। কারণ, মুশরিকদের সরদাররাও যে জিনিসকে ইচ্ছা হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করে খোদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দিত। সূরা 'আনআমে'র মধ্যে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আর এখানেও এর একটি দৃষ্টান্ত বয়ান করা হচ্ছে :

نسئ-এর ব্যাখ্যা

আরবে প্রাচীন কাল থেকে একটি রীতি চলে আসছিল যে, বছরের বার মাসের মধ্যে চারটি মাস হচ্ছে 'আশহুরে হুরুম' (অর্থাৎ বিশেষ আদব ও সম্মানের মাস)– যিলকদ, যিলহজ, মুহররম ও রজব। এ মাসগুলিতে রক্তপাত ও যুদ্ধবিগ্রহ একদম বন্ধ করে দেওয়া হত। হজ ও উমরা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মানুষ এ সময়ে নিরাপদে স্বাধীনভাবে সফর করতে পারত। এ দিনগুলির মধ্যে কোন ব্যক্তি তার পিতার খুনীকেও ধরপাকড় করতে পারত না। এমনকি, কোন কোন আলেম লিখেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দীনেও উক্ত চারটি মাসকে 'আশহুরে হুরুম' সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

ইসলামের আগমনের কিছু কাল পূর্বে যখন আরবের মূর্খতা ও বর্বরতা সীমা ছাড়িয়ে গেল এবং কোন কোন গোত্রের হিংস্রতা ও জিঘাংসা আসমানী বা পার্থিব কোন আইনেরই তোয়াক্কা করল না, তখন ওরা 'নাসী' এর রসম বের করল, অর্থাৎ— যখন কোন শক্তিধর গোত্র মুহররম মাসে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করত, তখন এক সর্দার উঠে ঘোষনা করে দিত যে, এ বছর আমরা মুহররমকে 'আশহুরে হুরুম' থেকে বাদ দিয়ে সেস্থলে সফর মাসকে হারাম করলাম। অতঃপর পরের বছর বলে দিত যে, এবার পূর্ব নিয়মানুসারে মুহররম হারাম ও সফর হালাল থাকবে। এভাবে বছরে চার মাসকে 'হারাম মাস' হিসাবে গণ্য করত বটে, কিন্তু মাসগুলির নির্ধারণে খেয়াল-খুশী মত রদবদল করতে থাকত।

ইবনে কাছীর (র) এর তাহকীক অনুযায়ী نسئ -এর রীতি শুধু মুহররম ও সফরে হয়ে থাকত। ইমামে 'মাগাযী' মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক লিখেছেন, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এ রসম জারি করেছিল সে হল 'কালমুস' কেনানী। তারপর বংশপরম্পরায় এই রীতি চলে আসতে থাকে। পরিশেষে তারই বংশের 'আবু ছুমামা জুনাদা ইবনে আউফ' প্রত্যেক বছর হজের মৌসুমে ঘোষণা করে দিত যে, এ বছর মুহররম মাস 'আশহুরে হুরুম'এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে, বা সফর। এভাবে মুহররম ও সফরের মধ্য থেকে কোন এক মাস কখনো হালাল আর কখনো হারাম করা হত। সাধারণ লোকেরা একেই কবূল করে নিত।

বলতে গেলে, জাহেলী যুগে কাফেরদের বহুবিধ কুফর ও গোমরাহীর মধ্যে একটি এও ছিল যে, আল্লাহর হালাল বা হারামকৃত মাসকে পরিবর্তন করে ফেলার অধিকার কেনানা গোত্রের এক সর্দারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইহুদী ও নাসারাদের অবস্থাও ঠিক এরূপ ছিল। ওরা হালাল বা হারামকরণের অধিকার ক্ষমতালোভী ও স্বার্থান্বেষী আহবার ও রুহবানের হাতে দিয়ে দিয়েছিল।

ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

মাসগুলিতে নিজেদের প্রতি জুলুম করো না। আর তোমরা সকল মুশরিকের সাথে (সর্বাবস্থায়) যুদ্ধ কর, যেরূপ ওরা তোমাদের সকলের সঙ্গে (সর্বাবস্থায়) যুদ্ধ করে। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন যারা (তাঁকে) ভয় করে চলে[১]।

اِنَّمَا النَّسِیْٓءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ؕ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৩৭. এই যে মাসকে পিছিয়ে দেওয়া, এটা কুফরের যুগে বর্ধিত করা (অর্থাৎ নব আবিষ্কৃত) বিষয়।* এর দ্বারা কাফেরদের গোমরাহ করা হয়। এক বছর ওরা তা (অর্থাৎ হারাম মাস) হালাল করে নেয় এবং অন্য বছর তা হারাম রাখে, যাতে আল্লাহর হারাম করা মাসগুলির শুধু সংখ্যা পূর্ণ করে নিতে পারে। এভাবে ওরা আল্লাহর হারাম করা মাস হালাল করে নেয়। ওদের মন্দ কাজগুলোকে ওদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ কাফের লোকদের পথ দেখান না[২]।

মুশরিক ও কিতাবী সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য প্রকাশের জন্য এখানে 'নাসী' এর কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ الخ আয়াতটি এর ভূমিকা হিসাবে আনা হয়েছে। অর্থাৎ- আজ থেকে নয়, বরং আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টির সময় থেকে আল্লাহর নিকট (শরী'য়তের বিবিধ হুকুম জারী করার জন্য) বছরে বারটি মাস রাখা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে চারটি হচ্ছে 'আশহুরে হুরুম' (আদবের মাস), যেগুলির মধ্যে গোনাহ ও জুলুম থেকে বেঁচে থাকার বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। এটাই (ইবরাহীম আলাইহিস সালামের) সরল দীন।

১. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এ আয়াত থেকে বুঝে আসে যে, কাফেরদের সাথে সর্বদা যুদ্ধ করা জায়েয। (সে মত তাবূকের জেহাদ রজব মাসে সংঘটিত হয়েছিল, যার বিবরণ সামনে আসছে।) আর অন্যায়-অবিচার করা সর্বদাই গোনাহ, এ মাসগুলিতে বেশি গোনাহ। অধিকাংশ আলেমের মত এমনই। কিন্তু যদি কোন কাফের এ মাসগুলির আদব রক্ষা করে, তবে মুসলমানদের পক্ষেও ওদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু না করাই উত্তম।'

★ দ্বিতীয় তরজমা- '(হারাম মাসকে হালাল করার উদ্দেশ্যে) পিছিয়ে দেওয়া কুফরে বৃদ্ধি ঘটানো ছাড়া আর কিছু নয়'।

২. অর্থাৎ ওরা মন্দ কাজকে ভাল মনে করছে। আর যখন চিন্তা-বুদ্ধির বিকৃতি ঘটে যায় তখন কল্যাণের পথ কী করে লাভ হবে?

[রুকূ - ৬]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝

৩৮. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হল যে, তোমাদের যখন বলা হয়, 'আল্লাহর পথে জেহাদের জন্য বেরিয়ে পড়, তখন তোমরা মাটির দিকে ঝুঁকে পড় (অর্থাৎ বাড়ী-ঘর ছেড়ে বের হতে চাও না)? তোমরা কি আখেরাত ছেড়ে দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছ? তো, আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার জীবনের সম্ভোগ কিছুই নয়, অতি সামান্য[১]।

এই আয়াতে যে "নাসী' রসমের উল্লেখ রয়েছে, পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যায় তার বিশদ আলোচনা হয়েছে।

বি. দ্র. কোন কোন সম্প্রদায় নিজেদের মাসের হিসাব ঠিক রাখার জন্য প্রতি তিন বছর পর পর সৌর বছরের হিসাবে একটি মাস বৃদ্ধি করে নিত, যাকে 'লওন্দ' (لوند) এর মাস বলে। এটা 'নাসী'-রীতির অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষী 'নাসী' এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, আরবরা ইসলাম-পূর্ব যুগে বছরের মাসগুলির সংখ্যা পরিবর্তন করে ফেলত– যেমন, বার এর স্থলে চৌদ্দ মাস বানিয়ে নিত; অথবা হিসাবে এমন গোলমাল করত যে, যা যিলক্বদ ছিল তা যিলহজ হয়ে যেত। এমনকি হিজরী নবম সনে আবু বকর রা. এর হজও ওদের হিসাবে জিলকদে অনুষ্ঠিত হয়। এবং হাদীস... ان الزمان قد استدار - (সহহি বুখারী, হাদীস : ৪৬৬২) এর ব্যাখ্যাও এ অনুযায়ী করা হয়েছে। কিন্তু 'নাসী' এর এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। হাফেয ইবনে কাছীর এসবের খণ্ডন করেছেন। যার ইচ্ছা তা দেখে নেবেন। এখানে বিস্তারিত লেখার অবকাশ নেই।

যদি এরাদা অনুযায়ী কুরআনের সুবিস্তারিত তাফসীর লেখার তাওফীক হয়, তবে সেখানে এ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করা হবে।

(কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা, সেই সুযোগ আর হযরতের হয়নি। তাঁর পরবর্তী জীবন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দীনী কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা হযরতকে উক্ত নেক নিয়তের জন্য জাযায়ে খায়ের দান করুন। –অনুবাদক।)

১. এখান থেকে তাবূকের জেহাদের জন্য মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

পূর্বের রুকূর আগের রুকূতে (আয়াত :২৯) আহলে কিতাবের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করা হয়েছিল। অতঃপর মাঝখানে যেসব প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়, স্থানে স্থানে সে সবের যোগসূত্র বর্ণিত হয়েছে। বলতে গেলে, তা সবই বর্তমান রুকূর ভূমিকা ছিল। আর বর্তমান রুকূ হচ্ছে তাবূক যুদ্ধের আলোচনার ভূমিকা।

তাবূক যুদ্ধ: ঘটনার সারসংক্ষেপ

মক্কা বিজয় ও হুনায়নের জেহাদের পর হিজরী নয় সনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন যে, শামদেশের খ্রিস্টান রাজা (গাস্‌সান) রোমসম্রাটের সাহায্যে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শামের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে সমুচিত জওয়াব দেওয়া মুনাসিব মনে করলেন। সে মত তিনি সকল মুসলমানকে জেহাদের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

প্রচণ্ড গরম ও দুর্ভিক্ষের সময় ছিল। খেজুর-ফসল পাকছিল, ছায়ায় থাকাই ছিল আরামদায়ক। ফের এত দূরের পথ অতিক্রম করা এবং শুধু গাস্‌সান রাজাই নয়, বরং রোমসম্রাটের সুসজ্জিত বিশাল সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলা করা কোন সহজ ব্যাপার ছিল না। এমন সংকটময় অবস্থায় এমন দুঃসাহসিক ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে বের হওয়া মুখলিস মুমিনগণ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং মুনাফেকরা মিথ্যা হিলা-বাহানা করে পলায়ন শুরু করল। কিছু সংখ্যক মুসলমানও এমন কঠিন সময়ে এত দীর্ঘ ও কষ্টকর সফর থেকে পিছপা হওয়ার উপক্রম করছিলেন, তবে তাদের মধ্যে অনেকেই শেষ পর্যন্ত সফরসঙ্গী হলেন, আর মুষ্টিমেয় লোক রয়েই গেল– বস্তুত অলসতা ও আরামপ্রিয়তা তাদের এই বিরাট সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রাখল।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় ত্রিশ হাজার নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ বাহিনীসহ শামের সীমান্তের দিকে রওনা হয়ে গেলেন এবং তাবূক নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। অপরদিকে রোমসম্রাটের নামে পত্র লিখে তাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা তার অন্তরে বসে গেল, কিন্তু তার জাতি সহযোগিতা না করায় ইসলাম গ্রহণ থেকে সে মাহরূম থাকে। এদিকে শামবাসীরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিপ্রায় জানতে পেরে তা রোমসম্রাটকে জানাল। কিন্তু সে তাদের সাহায্য করল না। (অতঃপর) তারা আত্মসমর্পন করল, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করল না। এর কিছু দিন পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে যায় এবং ফারূকে আজমের খেলাফত কালে সমগ্র শামদেশ বিজিত হয়।

যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূক থেকে বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং আল্লাহ তাআলা বড় বড় সাম্রাজ্যের উপর ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে দিলেন, তখন মদীনার মুনাফেকরা খুবই অপদস্থ হল। আর যে কয়েকজন খাঁটি মুসলমান কেবল অলসতাহেতু সফরে যাননি, তাঁরা অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন।

এ রুকূর শুরু থেকে অনেক দূর পর্যন্ত এসব ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে। তবে মুনাফেকদের কর্মকাণ্ডই বেশি বর্ণিত হয়েছে। কোথাও কোথাও মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

আয়াতের মর্ম

বর্তমান আয়াতে মুসলমানদের অতি জোরালোভাবে জেহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সামান্য আরাম-আয়েশে মত্ত হয়ে জেহাদ বর্জন করা উঁচু থেকে নীচে পতিত

৩৯. যদি তোমরা বের না হও, তবে তিনি তোমাদের যাতনাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের ভিন্ন অন্য জাতিকে আনয়ন করবেন এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান[১]।

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৪০. তোমরা যদি রাসূলকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তো তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেররা তাঁকে এ অবস্থায় বহিষ্কার করেছিল যে, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তাঁরা দু'জন ছিলেন গুহার মধ্যে, যখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলছিলেন, 'তুমি চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন'। অতঃপর আল্লাহ তাঁর উপর স্বীয় প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাঁকে এমনসব বাহিনীর দ্বারা সাহায্য করলেন, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফেরদের কথা নীচু করে দিলেন। আর আল্লাহর কথাই সবচেয়ে উঁচু। এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[২]।

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

হওয়ার নামান্তর। খাঁটি মুমিনের দৃষ্টিতে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ পরকালের মোকাবেলায় গুরুত্ব রাখে না। হাদীসে আছে, আল্লাহর নিকট যদি দুনিয়ার মূল্য একটি মশার ডানার সমান হত, তবে তিনি কোন কাফেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৪৭৩)

১. অর্থাৎ আল্লাহর কাজ তোমাদের উপর নির্ভরশীল নয়। তোমরা অলসতা করলে তিনি তাঁর অপার কুদরতে অন্য কোন জাতিকে সত্য ধর্মের খেদমতের জন্য দাঁড় করিয়ে দেবেন। তোমরা এ সৌভাগ্য থেকে মাহরূম থাকবে, যা তোমাদেরই ক্ষতির কারণ হবে। কবির ভাষায়-

منت منہ کہ خدمت سلطاں ہمی کنی ÷ منت شناس ازو کہ بخدمت گذاشت

(বাদশাহর খেদমত করছ বলে মনে করো না, তাঁর প্রতি তুমি অনুগ্রহ করছ। বরং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার কর যে, তিনি তোমাকে খেদমত করার সুযোগ দিয়েছেন।)

২. অর্থাৎ তোমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য না করলে না-ই করলে। তাঁর বিজয় ও সফলতা লাভ কিছুমাত্র তোমাদের উপর নির্ভর করে না। পূর্বে এমন

সময় এসেছিল, যখন পর্বতগুহায় এক বন্ধু ছাড়া তাঁর সঙ্গে তোমরা কেউ ছিলে না। মুসলমানরা মক্কাবাসীদের জুলুম-অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশেষে তাঁর প্রতিও হিজরতের নির্দেশ আসে। মুশরিকদের চূড়ান্ত পরামর্শ ছিল, প্রত্যেক গোত্রের এক একজন যুবক মনোনীত করা হোক এবং তারা সমবেতভাবে একই সময় তাঁর উপর তলোয়ারের আঘাত হানবে, যাতে রক্তপণ দিতে হলে সকল গোত্রের মধ্যে তা বণ্টিত হয়ে যায় এবং বনী হাশিম রক্তের প্রতিশোধ নিতে সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সাহস না করে। —যে রাতে উক্ত নাপাক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা ছিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বিছানায় হযরত আলীকে শয়ন করালেন, যাতে তাঁর চলে যাওয়ার পর হযরত আলী (রা.) মানুষের রাখা আমানতগুলি সযত্নে মালিকদের হাতে সোপর্দ করে দেন। সেইসাথে হযরত আলীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমার কিছুই হবে না। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে জালেমদের ঘেরাও থেকে شاهت الوجوه (চেহারাগুলো কুৎসিত হোক) বলতে বলতে এবং ওদের চোখে মাটি নিক্ষেপ করত: দিব্যি বের হয়ে গেলেন।

হযরত আবু বকর (রা) কে সঙ্গে নিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কয়েক মাইল দূরে গিয়ে 'গারে ছওরে' আশ্রয় নিলেন। এ গুহাটি পাহাড়ের চূড়ায় একটি বিরাট পাথরের পেটের ভিতর ছিল, তাতে প্রবেশের একটি মাত্র পথ ছিল, তাও এত সংকীর্ণ যে, মানুষ খাড়া হয়ে বা বসে ওতে ঢুকতে পারত না। শুধু শুয়ে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল। প্রথমে হযরত আবু বকর ভিতরে গিয়ে তা সাফ করেন এবং সব ছিদ্র কাপড় দ্বারা বন্ধ করলেন, যাতে সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি দংশন করতে না পারে। একটি ছিদ্র অবশিষ্ট থাকায় নিজ পায়ের দ্বারা তা বন্ধ করে রাখেন। সব ব্যবস্থা করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভিতরে তশরীফ আনতে বললেন। তিনি আবু বকর সিদ্দীকের উরুর উপর মাথা মোবারক রেখে আরাম করছিলেন। এমন সময় সাপ হযরত আবু বকরের পায়ে দংশন করল। কিন্তু হুযূরের আরামে ব্যাঘাত হবে ভেবে সিদ্দীকে আকবর (রা) পা নাড়েননি। হুযূর চোখ খোলার পর যখন ঘটনা জানতে পারলেন, তখন তিনি স্বীয় বরকতময় থুথু সিদ্দীকের পায়ে লাগিয়ে দিলেন। ফলে সঙ্গে সঙ্গে আরোগ্য লাভ হল।

অন্য দিকে কাফেররা পদচিহ্নবিশারদ এক ব্যক্তিসহ হুযূরের তালাশে বের হয়ে পড়ল। সে ব্যক্তি ছওর গুহা পর্যন্ত পদচিহ্ন অনুসরণ করে গুহা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। কিন্তু খোদার কুদরত! গুহার মুখে এক মাকড়সা জাল বুনে রাখল এবং একটি জংলী কবুতর ডিম পেড়ে রাখল। এসব দেখে সকলে পদচিহ্নে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে বলতে লাগল, মাকড়সার এ জাল তো মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) জন্মেরও পূর্বের মনে হয়। কেউ ভিতরে প্রবেশ করলে এ জাল ও ডিম কী করে অক্ষত থাকতে পারে?

ভিতর থেকে আবু বকর সিদ্দীক কাফেরদের পা দেখছিলেন। তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল, প্রাণের চেয়ে প্রিয় যাঁর জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁকে যেন শত্রুরা না দেখে ফেলে। তাই ঘাবড়ে গিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ লোকেরা যদি একটু ঝুঁকে নিজেদের পায়ের দিকে নজর দেয়, তবে আমাদের দেখে ফেলবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

৪১. তোমরা বের হয়ে পড় হালকা অবস্থায় এবং ভারী অবস্থায়[১] এবং আল্লাহর পথে জেহাদ কর নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে। এ-ই তোমাদের জন্য উত্তম[২], যদি তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকে।

اِنۡفِرُوۡا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوۡا بِاَمۡوَالِكُمۡ وَاَنۡفُسِكُمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّـكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ۝

৪২. যদি সম্পদ হত সহজলভ্য ও সফর হত সংক্ষিপ্ত*, তবে ওরা অবশ্যই আপনার সহগামী হত। কিন্তু (যাত্রাপথের) দূরত্ব ওদের নিকট সুদীর্ঘ মনে হল[৩]। আর এখন

لَوۡ كَانَ عَرَضًا قَرِيۡبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوۡكَ وَلٰـكِنۡۢ بَعُدَتۡ عَلَيۡهِمُ

ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আবু বকর! আপনার কী ধারণা সেই দুজন সম্বন্ধে, যাদের তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ?' অর্থাৎ যখন আল্লাহ আমাদের সঙ্গী, তখন আর কার ভয়?

সে সময় আল্লাহ তাআলা এক বিশেষ রকম প্রশান্তি ও স্বস্তির ভাব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর মোবারকে ও তাঁর বরকতে আবু বকর (রা)এর পবিত্র অন্তরে অবতীর্ণ করলেন এবং ফেরেশতাদের বাহিনী দ্বারা হেফাজত ও সাহায্য করলেন। এ আল্লাহর গায়বী মদদেরই কারিশমা যে, (কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী) যে মাকড়সার জাল أوهن البيوت (দুর্বলতম ঘর), তা-ই বড় বড় সুরক্ষিত কিল্লার চেয়ে বেশি হেফাজতের মাধ্যম হয়ে গেল। এভাবে আল্লাহ কাফেরদের কথা নিচু ও কলাকৌশল ব্যর্থ করে দিলেন। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন গুহায় অবস্থান করে সম্পূর্ণ নিরাপদে পবিত্র মদীনায় গিয়ে পৌঁছলেন। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২৭৬২; তবাকাতে ইবনে সা'দ ১/১১০)

বি. দ্র. কেউ কেউ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوۡدٍ لَّمۡ تَرَوۡهَا দ্বারা বদর, হুনায়ন প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে যে ফেরেশতাদের অবতরণ হয়েছিল, তা উদ্দেশ্য করেছেন। কিন্তু আয়াতের পূর্বাপর থেকে বাহ্যত তা-ই মনে হয়, যা আমরা বয়ান করেছি যে, হিজরতের ঘটনাতেও আল্লাহ ফেরেশতাদের দ্বারা তাঁর প্রিয় হাবীব (স.) কে সাহায্য করেছেন। والله أعلم

১. অর্থাৎ পদাতিক বা আরোহী, গরীব বা ধনী, যুবক বা বৃদ্ধ– যে অবস্থায়ই হোক, বের হয়ে পড়তে হবে। সার্বজনীন অভিযানের সময় কোন ওযর-আপত্তি পেশ করা যাবে না।

২. অর্থাৎ ইহকালীন ও পরকালীন উভয় দিক থেকে।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** '(যার জন্য বের হতে বলা হয়েছে–) তা যদি হত সহজলভ্য সম্পদ ও সংক্ষিপ্ত সফর,...

৩. এখানে মুনাফেকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, যদি সফর হাল্কা হত এবং অনায়াসে গনীমতের মাল হস্তগত হওয়ার সম্ভাবনা থাকত, তবে ওরা অবশ্যই সঙ্গে যেত। কিন্তু এমন কঠিন ঘাঁটিসমূহ অতিক্রম করা ওদের পক্ষে কী করে সম্ভব?

الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٤٢﴾

ওরা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে (বলবে), 'যদি আমাদের সামর্থ্য থাকত, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে বের হতাম।' ওরা নিজেরা নিজেদের ধ্বংস করে। আর আল্লাহ জানেন, ওরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী[১]।

[রুকূ - ৭]

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন*। আপনি ওদের (যুদ্ধে না যাওয়ার) অনুমতি কেন দিলেন– যাবৎ না আপনার নিকট সত্যবাদীরা স্পষ্ট হয়ে যেত এবং আপনি মিথ্যাবাদীদের জেনে নিতেন[২]?

---

১. অর্থাৎ আপনি বের হওয়ার পূর্বে ওরা কসম খেয়ে নানা রকম হিলা-বাহানা করবে, যাতে আপনি ওদের মদীনায় রয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেন। অথবা উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রত্যাবর্তনের পর মিথ্যা কসম খেয়ে কথা বানাবে, যাতে নিজেদের মুনাফেকী ঢেকে রাখতে পারে। অথচ আল্লাহর নিকট ওদের মিথ্যা ও মুনাফেকী গোপন থাকতে পারে না। এই মুনাফেকী, ধোঁকাবাজী ও মিথ্যা কসমগুলো পরিণামে ওদেরই জন্য জানের বিপদ হবে।

* **দ্বিতীয় তরজমা**– 'ক্ষমা করে দিয়েছেন'।

২. মুনাফেকরা যখন মিথ্যা ওযর-আপত্তি করে মদীনায় থেকে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করত, তখন হুযূর সা. ওদের নেফাক ও প্রতারণা উপেক্ষা করতেন এবং ওদের সঙ্গে নিলে ফাসাদ ছাড়া কোন কল্যাণ হবে না মনে করে জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিতেন। এ জন্য বলা হয়েছে যে, আপনি থেকে যাওয়ার অনুমতি না দিলে বেশি ভাল হত। কারণ, তখন প্রকাশ পেয়ে যেত যে, ওদের না যাওয়া মোটেই আপনার অনুমতির উপর নির্ভর করে না। এভাবে ওদের ডাহা মিথ্যা ও মুনাফেকী প্রকাশ পেয়ে যেত। তাই অনুমতি প্রদানে কোন গোনাহ না হলেও উপস্থিত মঙ্গলামঙ্গলের দিক থেকে অনুমতি না দেওয়াই অধিক সমীচীন হত।

عفا الله عنك

তো, সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবস্থাটি ছেড়ে দেওয়ায় عفا الله عنك দ্বারা কথা শুরু করা হয়েছে। عفو শব্দের ব্যবহার একমাত্র গোনাহর মোকাবেলায় হয়, তা নয়। কোন কোন বিজ্ঞ মুফাসসির عفا الله عنك বাক্যটিকে শুধু দো'য়া ও তাজীম হিসাবে ধরেছেন। আরবী বাকরীতিতে এর প্রচলন ছিল।—তবে পূর্ববর্তী মুফাসসিরদের অভিমত তা-ই, যা আমরা প্রথমে বর্ণনা করেছি। আর لِمَ أَذِنْتَ لهم (কেন ওদের অনুমতি দিলেন?) শব্দাবলিতে এরই সমর্থন পাওয়া যায়। والله اعلم

৪৪. যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তারা আপনার কাছে নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ না করার অনুমতি চায় না। আর আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫. আপনার নিকট (জিহাদে না যাওয়ার) অনুমতি তারাই চায়, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না এবং যাদের অন্তর সন্দেহে পতিত, ফলে ওরা নিজেদের সন্দেহের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে[১]।

اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬. ওরা যদি বের হওয়ার ইচ্ছা রাখত, তবে অবশ্যই এর জন্য কিছু না কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করত, কিন্তু আল্লাহ ওদের উঠে দাঁড়ানো* পছন্দ করেননি। ফলে তিনি ওদের বিরত রাখলেন এবং আদেশ করা হল যে, যারা বসে আছে তাদের সাথে তোমরাও বসে থাক[২]।

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٤٦﴾

---

১. অর্থাৎ যাদের অন্তরে ঈমান ও তাক্ওয়ার নূর রয়েছে, জেহাদ থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে এভাবে অনুমতি চাওয়া তাদের চরিত্র নয়। তাদের অবস্থা তো তা, যা এ পারার শেষের দিকে (আয়াত : ৯২) এভাবে বর্ণিত হয়েছে- تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ 'সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির অভাবহেতু 'আল্লাহর পথে জেহাদ' এর সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে তাদের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়।'

নির্লজ্জ হয়ে জেহাদ থেকে বিরত থাকার অনুমতি নেওয়া একমাত্র তাদেরই চরিত্র, যারা আল্লাহর ওয়াদাসমূহেও বিশ্বাস রাখে না, আখেরাতের জীবনকেও বোঝে না। আর আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে বিজয়ী ও সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়ার যেসব সংবাদ দিয়েছেন, তারা সেসব সম্বন্ধে সর্বদা দ্বিধা ও সন্দেহে পতিত থাকে।

☆ **দ্বিতীয় তরজামা–** 'বের হওয়া...'

২. ঘর থেকে বের হওয়ার ইচ্ছাই ওদের নেই। নতুবা ওরা কিছু প্রস্তুতি তো নিত। জেহাদের হুকুম শোনামাত্রই মিথ্যা ওযর-আপত্তি নিয়ে উপস্থিত হত না।—আসল কথা এই যে, আল্লাহ ওদের যোগদানকে পছন্দই করেননি। কারণ ওরা অভিযানে গেলে সেখানে ফেতনা সৃষ্টি করত। এ জন্যই আল্লাহ মুজাহিদদের কাতারে শামিল হওয়া থেকে ওদের বিরত রেখেছেন। ওদের যেন 'তাকবীনিভাবে' বলে দেওয়া হল, 'মহিলা, শিশু ও পঙ্গুদের সাথে ঘরে ঢুকে বসে থাক।'

৪৭. ওরা যদি তোমাদের সঙ্গে বের হত, তবে তোমাদের কেবল অনিষ্ট বৃদ্ধি করত এবং তোমাদের মধ্যে ফেতনা (বিপর্যয়) সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের অভ্যন্তরে ছোটাছুটি করে বেড়াত[১]। আর তোমাদের মধ্যে ওদের কিছু গুপ্তচর আছে। তবে আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত[২]।

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاۡاَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

৪৮. পূর্বেও ওরা ফেতনা করতে চেয়েছে এবং আপনার (ক্ষতি করার) জন্য বহু ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে, অবশেষে সত্য এসে গেছে এবং আল্লাহর আদেশ জয়ী হয়েছে;* যদিও ওরা অপছন্দ করছিল[৩]।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ۝

আর পয়গম্বর আলাইহিস সালাম যে ওদেরকে ঘরে বসে থাকার অনুমতি দিয়ে দিলেন, এও বস্তুত খোদারই নির্দেশ অনুসারে দিয়েছেন। এজন্য "তাক্‌বীনিভাবে" –এ শব্দটি বলারও প্রয়োজন নেই।

১. অর্থাৎ তোমাদের সাথে বের হলে নিজেদের ভীরুতা ও কাপুরুষতার কারণে অন্যদের সাহসও খর্ব করে দিত এবং মুসলমানদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির চেষ্টা করত, আর মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে শত্রুদের ব্যাপারে তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে চাইত। মোটকথা, ওদের উপস্থিতির ফলে কোন কল্যাণ হওয়া দূরে থাক, উল্টো অকল্যাণ বেড়ে যেত এবং ফেতনা-ফাসাদ জোরদার হত। এসব কারণেই আল্লাহ ওদের যাওয়ার তাওফীক দেননি।

২. অর্থাৎ এখনো তোমাদের মধ্যে ওদের গুপ্তচর বা এমন কিছু সরলমনা-নির্বোধ ব্যক্তি বর্তমান আছে, যারা ওদের কথা শোনে এবং তা দ্বারা কিছু না কিছু প্রভাবিত হয় (ইবনে কাছীর)। তবে এরা তেমন ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতে পারে না, যেমন পারে স্বয়ং ঐ দুষ্কৃতিকারীরা। আর এমন গুপ্তচরদের তোমাদের সহগামী হওয়ায় এক হিসাবে লাভ আছে। তা এই যে, তারা নিজেদের চোখে মুসলমানদের সাহসিকতা, বীরত্ব ইত্যাদি দেখে সেই মুনাফেকদের নিকট বর্ণনা করবে, ফলে ওদের অন্তরে মুসলমানদের প্রতি ভয়-ভীতির সৃষ্টি হবে (এজন্যই এই গুপ্তচরদের জিহাদে মুসলামানদের সাথে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।)

* **দ্বিতীয় তরজামা–** 'আল্লাহর দীন জয়ী হয়েছে'।

৩. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করলে ইহুদী ও মদীনার মুনাফেকরা তাঁর বিরুদ্ধে নানা প্রকার ফেতনাবাজি করতে থাকে। ওরা ইসলামের ক্রমবর্ধমান উন্নতির প্রাসাদকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা-তদবির করেছিল। কিন্তু বদরের যুদ্ধে কুফর ও শিরকের বড় বড় স্তম্ভ (কাফের সর্দার) ধ্বসে গেলে এবং বিস্ময়করভাবে ইসলামের

৪৯. আর মুনাফেকদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যে বলে, 'আমাকে (যুদ্ধে না যাওয়ার) অনুমতি দিন এবং আমাকে ফেতনায় ফেলবেন না।' শুনে রাখ, ওরা তো ফেতনাতেই পড়েছে। আর নিশ্চয় জাহান্নাম কাফেরদের বেষ্টন করে নিচ্ছে[১]।

وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ یَّقُوۡلُ ائۡذَنۡ لِّیۡ وَلَا تَفۡتِنِّیۡ ؕ اَلَا فِی الۡفِتۡنَۃِ سَقَطُوۡا ؕ وَاِنَّ جَہَنَّمَ لَمُحِیۡطَۃٌۢ بِالۡکٰفِرِیۡنَ ﴿۴۹﴾

৫০. আপনার কোন কল্যাণ লাভ হলে তা ওদের পীড়া দেয়, আর যদি আপনার উপর কোন বিপদ আসে তবে ওরা বলে, 'আমরা তো পূর্বেই নিজেদের সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম'; আর (এ কথা বলে) ওরা খুশিমনে ফিরে যায়[২]।

اِنۡ تُصِبۡکَ حَسَنَۃٌ تَسُؤۡہُمۡ ۚ وَاِنۡ تُصِبۡکَ مُصِیۡبَۃٌ یَّقُوۡلُوۡا قَدۡ اَخَذۡنَاۤ اَمۡرَنَا مِنۡ قَبۡلُ وَیَتَوَلَّوۡا وَّہُمۡ فَرِحُوۡنَ ﴿۵۰﴾

বিজয় লাভ হলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও ওর সাঙ্গপাঙ্গরা বলল, ইসলামকে আর ঠেকানো যাবে বলে মনে হয় না। ফলে ওদের অনেকে ভীত হয়ে শুধু মুখে কলেমা পড়তে শুরু করে। কিন্তু অন্তরে কুফর থাকায় ইসলাম ও মুসলমানদের সফলতা ও প্রাবল্য দেখে দেখে অন্তরে জ্বলতে ও ক্রোধান্বিত হতে থাকে।

মোটকথা, ওদের ফেতনাবাজি ও প্রতারণা কোন নতুন বস্তু নয়। প্রথম থেকেই ওদের এ নীতি চলে এসেছে। উহুদের যুদ্ধে এ লোকেরা নিজেদের দল নিয়ে মাঝপথ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিল। কিন্তু ওরা দেখে নিয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত সত্য কিরূপে জয়ী হয়ে থাকে এবং বাতিল কীভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে থাকে।

১. এক বড় মুনাফেক জুদ্দ্ ইবনে কাইস বলল, 'হযরত! আমাকে এখানেই থাকতে দিন, রোমের মেয়েরা খুব সুন্দরী, আমি তাদের দেখে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব না। সুতরাং আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে গোমরাহীতে ফেলবেন না।' (তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম, বর্ণনা ৯৬০০) (উত্তরে) আল্লাহ তাআলা বলছেন, এ উক্তি করে এবং নিজ ভীরুতা ও কুফরীর উপর মিথ্যা পর্দা ফেলার অপচেষ্টা করে এই ব্যক্তি গোমরাহীর গর্তেই পতিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কুফর ও নেফাকের কারণে দোযখের গর্তে পতিত হবে।

কোন কোন মুফাসসির আয়াতটিকে সকল মুনাফেকদের সাথে সম্পর্কিত মনে করেন এবং لاتفتني এর এই অর্থ করেছেন যে, আপনার সঙ্গে (সফরে) নিয়ে গিয়ে আমাদেরকে ধন-সম্পদ ইত্যাদির ক্ষতিতে ফেলবেন না। ألا في الفتنة سقطوا দ্বারা এ কথারই জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

২. মুনাফেকদের অভ্যাস ছিল, মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য লাভ হলে (অন্তরে) জ্বলত ও ক্রোধান্বিত হত। পক্ষান্তরে যদি কখনো কোন বিপদ আসত, যেমন কিছু মুসলমান শহীদ বা আহত হয়ে গেলেন, তখন গর্ব করে বলত, আমরা দূরদর্শিতার ফলে পূর্বেই নিজেদের

৫১. আপনি বলে দিন, 'আমাদের উপর তাই আপতিত হবে, যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহক। আর আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।'

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২. আপনি (আরো) বলুন, 'তোমরা তো আমাদের জন্য দুটি মঙ্গলের কোন একটির প্রতীক্ষা করছ, আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে এ প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাতে তোমাদেরকে কোন আযাবে আক্রান্ত করবেন। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক, আমরাও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি'[১]।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۚ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾

নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, এ পরিণতিই হবে। তাই তাদের সঙ্গে মোটেই যাইনি। মোটকথা, ডঙ্কা মারতে মারতে এবং বগল বাজিয়ে আনন্দ করতে করতে নিজেদের মজলিস থেকে তারা বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে।

১. অর্থাৎ আমাদের জন্য সুখ বা দুঃখ যা কিছু নির্ধারিত আছে, তা তো টলতে পারে না। দুনিয়াতে তা থেকে নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু আমরা যেহেতু আল্লাহকে নিজেদের প্রকৃত মালিক ও প্রতিপালক জ্ঞান করি, অতএব আমরা তাঁর ফয়সালা ও হুকুমের সামনে অবনত। কোন বিপদই তাঁর আনুগত্য থেকে আমাদের বিরত রাখে না। আর তাঁরই উপর আমাদের ভরসা যে, তিনি সাময়িক বিপদ-আপদকে আখেরাতে তো অবশ্যই, অনেক সময় দুনিয়াতেও সুখ ও আনন্দে পরিবর্তিত করে দেবেন। এ অবস্থায় তোমরা আমাদের সম্বন্ধে দুটি কল্যাণের কোন একটির অবশ্যই আশা করতে পার– আল্লাহর রাস্তায় মারা গেলে শাহাদাত ও জান্নাত, আর ফিরে আসলে প্রতিদান ও গনীমতের মাল লাভ হবে। যেমন, সহীহ হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদের ব্যাপারে এসব দায়িত্ব নিয়েছেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩১২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮৭৬)

পক্ষান্তরে, তোমাদের সম্বন্ধে আমরা অপেক্ষায় আছি যে, তোমরা দুটি অমঙ্গলের একটির শিকার অবশ্যই হবে। হয় নেফাক ও দুষ্কৃতির কারণে সরাসরি খোদার তরফ থেকে তোমাদের উপর কোন আযাব নাজিল হবে, অথবা আমাদের হাতে আল্লাহ তোমাদের এমন কঠোর শাস্তি দেবেন যা তোমাদের নেফাকের পর্দা ফাঁস করে দেবে।

যা হোক, তোমাদের ও আমাদের উভয় পক্ষকে একে অন্যের পরিণাম দেখার জন্য অপেক্ষা করা উচিত। আমাদের উভয়ের মধ্যে কে অধিকতর বিচক্ষণ ও পরিণামদর্শী, তা শেষপর্যন্ত অবশ্যই জানা যাবে।

৫৩. আপনি বলে দিন, 'তোমরা খুশিমনে (সম্পদ) ব্যয় কর বা অসন্তুষ্টির সাথে, তোমাদের থেকে তা কখনো কবূল করা হবে না। নিশ্চয়ই তোমরা নাফরমান সম্প্রদায়[১]।

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۭ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝

৫৪. আর ওদের পক্ষ থেকে ওদের দান-খয়রাত কবূল করার ক্ষেত্রে বাধা কেবল এ বিষয়টি যে, ওরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং ওরা নামাযে আসে অলসতার সাথে এবং ব্যয় করে অসন্তুষ্টির সাথে[২]।

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ۝

৫৫. অতএব আপনাকে যেন ওদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি বিস্মিত না করে। আল্লাহ এ-ই চান যে, এসবের মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে ওদের আযাবের মধ্যে রাখবেন এবং কাফের থাকা অবস্থায়ই ওদের জান বের হোক[৩]।

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ۭ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

---

১. জুদ্দ্ ইবনে কাইস রোমীয় মহিলাদের ফেতনার বাহানা করে এও বলেছিল, 'হযরত! আমি নিজে যেতে পারব না বটে, তবে আর্থিক সাহায্য করতে পারি।' এর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে, 'বে-ঈমানের ধন কবূল নয়– চাই খুশীচিত্তে ব্যয় করুক বা নাখোশ হয়ে।' অর্থাৎ ওদের পক্ষে খুশীচিত্তে খোদার রাস্তায় ব্যয় করার আশা কোথায়? আচ্ছা ধরে নেওয়া যাক, ওরা খুশীচিত্তে ব্যয় করল, তবু আল্লাহ তা কবূল করবেন না। —এর কারণ সামনের আয়াতে বলা হয়েছে।

২. কবূল না হওয়ার আসল কারণ হচ্ছে ওদের কুফর, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থানে ইঙ্গিত করেছি যে, কাফেরের প্রত্যেক আমল মৃত ও প্রাণহীন। আর নামাযে অবসন্ন মনে আসা বা বিরক্ত মনে খরচ করা– এগুলো কুফরের বাহ্যিক লক্ষণ।

৩. প্রশ্ন হতে পারে, ওরা যখন এতই অভিশপ্ত, তখন ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি ইত্যাদি নে'য়ামত ওদের কেন দান করা হল? এরই জওয়াবে বলা হচ্ছে, এসব নে'য়ামত ওদের জন্য বিরাট আযাব। সুস্বাদু ও রুচিকর খাদ্য যেমন নিরোগ মানুষের স্বাস্থ্য ও শক্তি বৃদ্ধি করে, কিন্তু কোন কোন রোগীর জন্য তা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়, তদ্রূপ (ধন-সম্পদ, সন্তানসন্ততি ইত্যাদি) পার্থিব নে'য়ামতসমূহের অবস্থা বুঝে নাও। একটা কাফেরের পক্ষে ওর অসুস্থ রুচি-মেযাজের কারণে এসব জিনিস মারাত্মক বিষতুল্য। যেহেতু কাফেররা দুনিয়ার লোভ ও লালসায় মত্ত থাকে, সেজন্য প্রথমত এসব কামাই করতে অশেষ কষ্ট সহ্য করে। অতঃপর একটু ক্ষতি বা বিপদ এসে পড়লে এসব বস্তুর সাথে যে পরিমাণ ভালবাসা রয়েছে, সেই পরিমাণ দুশ্চিন্তা এসে সওয়ার হয় এবং কোন সময়ই এর ফিকির, বিভিন্ন শঙ্কা ও চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত হতে

৫৬. ওরা আল্লাহর নামে কসম করে (বলে) যে, নিশ্চয়ই ওরা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। অথচ ওরা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু ওরা এমন সম্প্রদায়, যারা (তোমাদের) ভয় করে।

وَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ۖ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭. ওরা যদি কোন আশ্রয়স্থল বা গিরি-গুহা বা মাথা গোঁজার কোন ঠাঁই পায়, তবে মুখ ঘুরিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে সে দিকেই পালাবে[১]।

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ﴿٥٧﴾

পারে না। অবশেষে যখন মৃত্যু এসে এসব প্রিয় জিনিস থেকে ওদের চিরতরে আলাদা করে, তখনকার দুঃখ-কষ্ট ও আফসোসের অবস্থা আন্দাজ করাও কঠিন।

মোটকথা, দুনিয়াপ্রেমিক ও লোভীর পক্ষে কখনো প্রকৃত শান্তি লাভ হয় না। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বড় বড় ধনী লোকের উক্তি এ বিষয়ের জ্বলন্ত সাক্ষী। পক্ষান্তরে, মুমিনদের অন্তরে দুনিয়ার মহব্বতের রোগ থাকে না বলে তারা ধন-দৌলত ও সন্তানাদিকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করে না, ফলে এসব জিনিসই তাদের পক্ষে নে'য়ামত ও তাদের দীনের জন্য সহায়ক হয়। অধিকন্তু কাফেরদের অধিকাংশই ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির আধিক্যের কারণে কুফর ও অবাধ্যতায় আরো বেশি অগ্রসর হয়ে যায়, যা ওদের জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাফের রয়ে যাওয়ার কারণ হয়।

তাছাড়া মদীনার যে মুনাফেকদের সম্বন্ধে এই আয়াতগুলি নাযিল হয়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওরা জেহাদ প্রভৃতিতে নেফাকহেতু মাল খরচ করত, আর ওদের সন্তানসন্ততির মধ্যে কেউ কেউ খাঁটি মুসলমান হয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জেহাদে শরীক হত। এ উভয় বিষয়ই মুনাফেকদের অন্তরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। এভাবে ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি ওদের জন্য দুনিয়াতে আযাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ এতে আশ্চর্য হয়ো না যে, বেদীনকে আল্লাহ তাআলা কেন নে'য়ামত দিলেন? বেদীনের পক্ষে সন্তানাদি ও সম্পদ শাস্তি স্বরূপ। কারণ, এ সবের পিছনে দিল পেরেশান থাকায় এবং এ সবের ফিকির থেকে আজীবন নিষ্কৃতি না পাওয়ায় তওবা করার বা নেকী করার তাওফীক হয় না।'

১. অর্থাৎ কুফর প্রকাশ করলে ওদের সাথেও কাফেরদের ন্যায় আচরণ শুরু হয়ে যাবে— শুধু এই ভয়ে ওরা কসম খেয়ে বলে যে, আমরা তো আপনাদেরই (মুসলমান) দলের। অথচ এ একেবারে মিথ্যা। যদি আজ ওরা কোন আশ্রয়স্থল পেয়ে বসে বা কোন পর্বত গুহায় গোপনভাবে জীবন-যাপন করতে পারে বা কমপক্ষে মাথা গোঁজার স্থান পেয়ে বসে, অর্থাৎ ইসলামী হুকুমতের ভয় না থাকে, তবে সব দাবি ছেড়ে দিয়ে অন্ধের মত সে দিকেই পালাতে শুরু করবে। যেহেতু ইসলামী হুকুমতের মোকাবেলা করারও শক্তি নেই, আবার কোন আশ্রয়স্থলও পাওয়া যায় না, এ জন্য কসম করে করে মিথ্যা কথা বানাতে থাকে।

৫৮. ওদের মধ্যে কতক এমন, যারা সদকা-খয়রাত (বন্টনের) ব্যাপারে আপনাকে দোষারোপ করে। যদি তা থেকে ওদের দেওয়া হয় (মন মত), তবে সন্তুষ্ট হয়। আর যদি ওদেরকে (মন মত) না দেওয়া হয়, অমনি অসন্তুষ্ট হয়ে যায়[১]।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَاۤ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ۝

৫৯. কত ভাল হত যদি ওরা তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে যেত যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ওদের দিয়েছেন এবং বলত, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ভবিষ্যতে নিজ কৃপায় আমাদের (আরো) দেবেন এবং তাঁর রাসূলও। আমরা তো আল্লাহরই প্রতি অনুরক্ত[২]।

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ۝

[রুকূ - ৮]

৬০. সদকা-খয়রাত (যাকাত ইত্যাদি) তো ফকীর (নিঃস্ব), মিসকীন (অভাবী), যাকাতের কাজে নিয়োজিত কর্মচারী ও যাদের মনোরঞ্জন করা উদ্দেশ্য– তাদের জন্য। এবং দাস মুক্তকরণ,

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

---

১. কতক মুনাফেক ও কিছু বেদুঈন সদকা-খয়রাত ও গনীমতের সম্পদ বণ্টনের সময় পার্থিব লোভ ও স্বার্থপরতার কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমালোচনা করে বলত, গনীমত বণ্টনে ইনসাফের দিক লক্ষ রাখা হয়নি। কিন্তু এই সমালোচনা ততক্ষণ পর্যন্তই, যতক্ষণ ওদের খাহেশ মত সদকা-খয়রাত ইত্যাদি থেকে অংশ না দেওয়া হয়। যদি ওদেরকে নিজ কামনা অনুযায়ী দেওয়া হত, তখন খুশী হয়ে যেত এবং কোন প্রতিবাদ করত না। অর্থাৎ ধন-দৌলতকেই ওরা আপন কেবলা ও লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে রেখেছে। সামনে বলা হচ্ছে যে, একজন ঈমানদার ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ হওয়া উচিত নয়।

২. অর্থাৎ সর্বোত্তম তরীকা এই যে, খোদা যা কিছু পয়গম্বরের মাধ্যমে দান করেন তাতেই মানুষ রাযী ও সন্তুষ্ট থাকবে এবং একমাত্র খোদার উপর ভরসা করবে এবং এ কথা মনে রাখবে যে, তিনি চাইলে ভবিষ্যতে নিজ দয়ায় অনেক কিছু দান করবেন।

মোটকথা, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বস্তুসামগ্রীকে আসল লক্ষ্যবস্তু বানাবে না, (বরং) একমাত্র মহামহিম আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষী হবে এবং জাহেরী ও বাতেনী দৌলত যা আল্লাহ ও রাসূলের তরফ থেকে পাওয়া যায়, তাতেই সন্তুষ্ট ও আনন্দিত থাকবে।

وَابْنِ السَّبِيْلِ ۭ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

ঋণগ্রস্তদের দায়মুক্তি, আল্লাহর রাস্তা ও মুসাফিরের সাহায্যের জন্য। (এ বিধান) ফরয করা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান[১]।

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ۭ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۭ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ

৬১. ওদের (অর্থাৎ মুনাফেকদের) মধ্যে কতক এমন, যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, 'এ ব্যক্তি তো আপাদমস্তক কান'। আপনি বলুন, 'তিনি বড় উত্তম কান তোমাদের জন্য। তিনি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেন ও মুমিনদের কথায় বিশ্বাস করেন। এবং তিনি তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানের দাবীদার তাদের জন্য রহমত। আর যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের

---

১. যেহেতু সদকা-খয়রাতের বন্টণের ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমালোচনা করা হয়েছিল, এজন্য সতর্ক করা হচ্ছে যে, সদ্‌কা-খয়রাতের বণ্টন ব্যবস্থা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। তিনি সদকা ইত্যাদির খাতসমূহ নির্ধারণ করে তার তালিকা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি সে অনুসারেই বণ্টন করেন এবং করবেন । হাদীসে আছে, আল্লাহ সদ্‌কা-খয়রাত (অর্থাৎ যাকাত) এর বণ্টন-নীতি নবী বা গায়র-নবী কারো মর্যির উপর ছাড়েননি, বরং তিনি নিজে তার খাতসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৬৩০– وفی اسناده ضعف)

যাকাতের খাতসমূহ

তা হচ্ছে আটটি। **এক-** فقراء (যাদের কাছে কিছুই নেই); **দুই-** مساكين (যাদের নিকট প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ নেই); **তিন-** عاملين (যারা ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে সদকা-খয়রাত ইত্যাদি ওসূল করার কাজে নিয়োজিত); **চার-** مؤلفة قلوبهم (যাদের ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায়, অথবা যারা ইসলামে দুর্বল, ইত্যাদি।—অধিকাংশ আলেমের মতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের পর এ খাতটি রহিত হয়ে গেছে)। **পাঁচ-** رقاب (অর্থাৎ-'বদলে কিতাবত' আদায় করে দাস-দাসীর মুক্তির ব্যবস্থা করা অথবা তাদের ক্রয় করে মুক্ত করা, অথবা মুক্তিপণ দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করা); **ছয়-** غارمين (যাদের উপর কোন বিপদ পতিত হওয়ায় ঋণী হয়ে গিয়েছে, অথবা কারো যামানত ইত্যাদির ভারে অসহায় হয়ে গিয়েছে; **সাত-** سبيل الله (জেহাদ ইত্যাদিতে যোগদানকারীদের সাহায্য করা); **আট-** ابن السبيل (যে মুসাফির সফর অবস্থায় নেসাবের মালিক থাকেনি, যদিও বাড়ীতে সে সম্পদের অধিকারী)।

হানাফী মাযহাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই تمليك অর্থাৎ মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরী এবং দারিদ্র্য শর্ত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ফেকাহ্‌র কিতাব দ্রষ্টব্য।

عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ⑪

জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি[১]।

يَحۡلِفُوۡنَ بِاللّٰهِ لَكُمۡ لِيُرۡضُوۡكُمۡ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوۡلُهٗۤ اَحَقُّ اَنۡ يُّرۡضُوۡهُ اِنۡ كَانُوۡا مُؤۡمِنِيۡنَ ⑫

৬২. তোমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য ওরা তোমাদের সামনে আল্লাহর নামে শপথ করে, অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এর বেশি হকদার যে, তাদের সন্তুষ্ট করা হবে যদি ওরা ঈমানদার হয়[২]।

---

১. মুনাফেকরা ইসলাম ও ইসলামের নবীর নিন্দা-সমালোচনা করত। যখন ওদেরই কেউ বলত, আমাদের এসব কথা পয়গম্বর আলাইহিস সালাম পর্যন্ত পৌছে যাবে, তখন ওরা বলত, 'কিসের ভয়, তাঁর সামনে আমরা মিথ্যা কথা বলে নিজেদের নির্দোষ প্রমান করব। আরে তিনি তো কান-সর্বস্ব, যা শোনেন তাই মেনে নেন। তাঁকে কথার মারপ্যাঁচ দ্বারা ধোঁকা দেওয়া কোন ব্যাপারই না!

আসল কথা এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন লাজুকতা, গাম্ভীর্য ও উদারতাহেতু মিথ্যাবাদীর মিথ্যা বুঝতে পেরেও তাকে ধরতেন না, মহান চরিত্রের কারণে উপেক্ষা ও অবহেলা করতেন। এতে সেই বেকুবেরা মনে করত, তিনি বুঝতেই পারেননি। আল্লাহ তাআলা ওদের উত্তরে বলছেন যে, তিনি কান-সর্বস্বই যদি হন, তবে তা তোমাদের মঙ্গলের জন্যই; নবীর এই স্বভাব তোমাদের জন্য উত্তম। তা না হলে তোমরাই ধরা পড়বে। তাছাড়া এ সম্ভাবনাও আছে যে, তাঁর উত্তম চরিত্র ও উদারতার প্রভাবে কখনো তোমাদের চক্ষু খুলে যাবে এবং তোমরা হেদায়াতের পথে এসে যাবে।

তোমাদের মিথ্যা কথা শুনে নবী আলাইহিস সালামের চুপ থাকার অর্থ এই নয় যে, সত্যিই তোমাদের তিনি বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস তো তাঁর শুধু আল্লাহর প্রতি ও ঈমানদারদের কথার প্রতি । হাঁ, তোমাদের মধ্যে যারা মুখে ঈমানের দাবি করে, তাদের জন্য তাঁর নীরবতা ও উপেক্ষা এক ধরণের রহমত। কেননা, সাথে সাথে মুখের উপর মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে ওদেরকে অপমানিত করা হয় না।

অবশ্য মুনাফেকদের মনে রাখা উচিত, ওদের কোন দুষ্ট আচরণ আল্লাহর অজানা নয়। রাসূলের অগোচরে যেসব মন্দ কথা ওরা বলে থাকে, যেমন هو أذن বলে তাঁকে কষ্ট দেয়, তার জন্য ওদের কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

২. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'কোন সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের প্রতারণা ধরে ফেললে ওরা মুসলমানদের সামনে কসম খেয়ে বলত, আমাদের দিলে খারাপ নিয়ত ছিল না! এভাবে মুমিনদের সন্তুষ্ট করে নিজেদের পক্ষে নেওয়ার চেষ্টা করে। ওরা বুঝেনি যে, এই প্রতারণা খোদা ও রাসূলের সঙ্গে চলতে পারে না।' ওরা যদি ঈমানের দাবিতে প্রকৃতই সত্য হয়, তবে অন্যদের ছেড়ে আল্লাহ ও রাসূলকে সন্তুষ্ট করার ফিকিরই করা উচিত।

৬৩. ওরা কি জানে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করবে, ওর জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যাতে সে চিরকাল থাকবে? এ-ই হচ্ছে চরম অপমান[১]।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿۶۳﴾

৬৪. মুনাফেকরা ভয় করে যে, না জানি মুসলমানদের প্রতি এমন সূরা নাযিল করা হয়, যা তাদেরকে ওদের (মুনাফেকদের) অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে জানিয়ে দেবে! আপনি বলে দিন, 'তোমরা বিদ্রূপ করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন যা (প্রকাশ হয়ে পড়া) কে তোমরা ভয় করছ'[২]।

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿۶۴﴾

৬৫. আর আপনি যদি ওদের জিজ্ঞাসা করেন, তবে অবশ্যই বলবে, 'আমরা তো খোশগল্প ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম'[৩]। আপনি বলুন,

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ؕ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ

---

১. অর্থাৎ যে অপমান থেকে বাঁচার জন্য ওরা নেফাক অবলম্বন করেছে, এটা তার চেয়ে বড় অপমান।

২. মুনাফেকরা নিজেদের বৈঠকে ইসলাম ও ইসলামের নবীর নিন্দা-সমালোচনা করত, সত্যবাদী মুমিনদের বদনাম করত এবং দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে উপহাস করত। অতঃপর যখন মনে আসত যে, এসব কথা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে পৌঁছতে পারে, তখন বলত, তাতে কী, তিনি তো কান-সর্বস্ব। আমরা তাঁর সামনে যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করব তিনি তাই কবূল করে নেবেন। কিন্তু যেহেতু অনেক সময় আল্লাহর তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমে ওদের নেফাক ও দুষ্ট চরিত্রের মুখোশ খুলে দেওয়া হত, সেজন্য এ ভয় ও আশঙ্কাও হত যে, না জানি কোন সূরা নাযিল হয়ে যায়, যা আমাদের গোপন বিষয়াদি ফাঁস করে দেবে।

আসলে মুনাফেকদের অন্তর কোনো এক দিকে স্থির থাকত না, সর্বদা দোটানায় থাকত। কখনো ওরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদারতা ও ভদ্রতা লক্ষ করে কিছুটা স্বস্তি হাসিল করত, কিন্তু কুরআনী তর্জন-গর্জনে আবার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলছেন, 'বেশ, তোমরা ঠাট্টা করতে থাক, হাসি-বিদ্রূপে লিপ্ত থাক এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে هو اذن বলে আশ্বস্ত থাক। কিন্তু খোদা সে বিষয় (মুনাফেকি) অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন, যে সম্পর্কে তোমরা সতত ভীত আছ। এবং তিনি তোমাদের ধোঁকা ও প্রবঞ্চনার জাল ছিন্নভিন্ন করে ছাড়বেন।

৩. তাবূকের যুদ্ধে যাওয়ার পথে কোন কোন মুনাফেক ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিল, 'দেখ, এই ব্যক্তি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শামদেশের প্রাসাদসমূহ ও রোমের শহরগুলি জয়

'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর বিধানাবলি ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছিলে[১]?

وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

৬৬. 'তোমরা হিলা-বাহানা করো না। তোমরা ঈমানের দাবি করার পর কাফের হয়ে গেছ। আমি যদি তোমাদের এক দলকে মাফ করে দেই, অপর দলকে নিশ্চয় শাস্তি দেব। কেননা, ওরা ছিল অপরাধী[২]।'

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ۚ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۝

[রুকূ - ৯]

৬৭. মুনাফেক পুরুষরা ও মুনাফেক নারীরা পরস্পর অভিন্ন। ওরা মন্দ বিষয় শিক্ষা দেয়

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ

করার স্বপ্ন দেখছে! তারা রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মত মনে করেছে। আমার বিশ্বাস, আগামী কাল আমাদের সকলকে রোমানদের সামনে রশিতে বাঁধা অবস্থায় দণ্ডায়মান হতে হবে। আমাদের এই উদরসর্বস্ব, মিথ্যাবাদী কাপুরুষগণ, (অর্থাৎ সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সুশিক্ষিত রোমান সৈন্যদের সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ করবে? মোটকথা, এরূপ আরো বেহুদা কথাবার্তা বলে রোমানদের ব্যাপারে মুসলমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করেছিল।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসব কথা উল্লেখ করা হলে তিনি ওদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তখন ওরা বলতে লাগল, 'হযরত! আমরা কি সত্যসত্যই এমন বিশ্বাস কখনো রাখতে পারি! আমরা তো খোশগল্প ও ক্রীড়া-কৌতুক করত: কিছু কথা বলেছিলাম, যাতে আলাপচারিতায় সফরের সময় কেটে যায়। (সীরাতে ইবনে হিশাম ৪/১৬৫)

১. অর্থাৎ আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুকের অর্থ কি এটা যে– আল্লাহ, রাসূল ও তাঁদের বিধানের সাথে পর্যন্ত ঠাট্টা করা হবে? আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিদ্রূপ এবং আল্লাহর বিধি-বিধানের সাথে হাসিঠাট্টা তো এমন জিনিস, যা শুধু মুখে উচ্চারণ করাও গুরুতর কুফর, যদিও তা কৌতুকচ্ছলে হোক না কেন। আর যদি তা করা হয় অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, যেমন উক্ত মুনাফেকরা করেছিল— তাহলে তো তার ভয়াবহতা আরো অনেক বেশি।

২. অর্থাৎ মিথ্যা ওযর-আপত্তি এবং হিলা-বাহানা করে কোন লাভ নেই। নেফাক ও হাসি-ঠাট্টার শাস্তি যাদের পাওয়ার, তারা অবশ্যই পাবে। হাঁ, এখনো যারা খাঁটি অন্তরে তওবা করে নিজেদের অন্যায় অপরাধ থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, আল্লাহ তাদের মাফ করে দেবেন। অথবা (এক দলকে মাফ করার দ্বারা) উদ্দেশ্য এই যে, যারা কুফর ও নেফাক সত্ত্বেও এ ধরণের ফেতনাবাজি ও হাসি-বিদ্রূপ থেকে বিরত থেকেছে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপের শাস্তি পাবে না।

يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ۭ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ۭ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٦٧

এবং ভাল বিষয় থেকে বিরত রাখে এবং নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে। ওরা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে তিনিও ওদের ভুলে গিয়েছেন। নিশ্চয় মুনাফেকরাই নাফরমান[১]।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝٦٨

৬৮. আল্লাহ মুনাফেক পুরুষ, মুনাফেক নারী ও কাফেরদের দোযখের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন– যার ভিতর ওরা চিরকাল থাকবে। তা-ই ওদের জন্য যথেষ্ট[২]। আর আল্লাহ ওদের লা'নত করেছেন এবং ওদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি[৩]।

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۭ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ

৬৯. (তোমরা) তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেদের মত– তারা ছিল তোমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও ছিল বেশি। ওরা ওদের অংশ ভোগ করেছে[৪] এবং তোমরাও তোমাদের অংশ ভোগ করেছ যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীরা ওদের অংশ ভোগ করেছে[৫] এবং

---

১. অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বড় নাফরমান হচ্ছে এ মুনাফেকরাই, যাদের নারী-পুরুষ সবাই ইসলামের দাবি সত্ত্বেও রাতদিন এ চেষ্টায় লেগে আছে যে, ছল-চাতুরী ও প্রতারণা করে লোকদের কীভাবে ভাল বিষয়াদি থেকে বিরত ও অসৎ কাজকর্মের দিকে উৎসাহিত করবে। আর ব্যয় করার আসল ক্ষেত্রগুলিতে মুঠ বন্ধ করে রাখে। মোটকথা, মুসলমান হওয়ার দাবি করছে, কিন্তু কারো উপকার মুখেও করে না, আর্থিক সাহায্য দিয়েও না। এরা যেহেতু আল্লাহকে সম্পূর্ণ ছেড়ে বসেছে, সে জন্য আল্লাহও এদের ছেড়ে দিয়েছেন। ছেড়ে দিয়ে ওদের কোথায় নিক্ষেপ করেছেন? তার বর্ণনা সামনের আয়াতে রয়েছে।

২. অর্থাৎ জাহান্নাম এমনই যথেষ্ট শাস্তি, যার পর অন্য শাস্তির প্রয়োজন থাকে না।

৩. এর অর্থ সম্ভবত এই যে, (আখেরাতে তো আছেই) দুনিয়াতেও আল্লাহর অভিসম্পাতের মন্দ প্রভাব সর্বদা ওদের আক্রান্ত করতে থাকবে। অথবা পূর্ববর্তী বাক্যের (... نار جهنم خالدين فيها) তাকীদরূপে এ কথা বলা হয়েছে। والله اعلم

৪. অর্থাৎ পার্থিব আনন্দ ও ভোগবিলাসের যে অংশ ওদের ভাগ্যে ছিল, তা উপভোগ করেছে, কিন্তু শেষ পরিণামের কথা ভাবেনি।

৫. অর্থাৎ তোমরাও ওদের ন্যায় পরিণামের চিন্তা থেকে উদাসীন হয়ে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বস্তুসামগ্রী যতটুকু তোমাদের তকদীরে আছে, সেই অংশ ভোগ করছ এবং সমস্ত আচরণ ওদেরই ন্যায়

وَخُضْتُمْ كَالَّذِىْ خَاضُوْا ۚ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

তোমরাও (অন্যায়-অপকর্মে) লিপ্ত হয়েছ যেমন ওরা লিপ্ত হয়েছিল। ওদের সকল আমল দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল হয়ে গেছে, আর ওরাই ক্ষতিগ্রস্ত[১]।

اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ۚ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

৭০. এই কাফের-মুনাফেকদের নিকট কি পৌছেনি পূর্ববর্তী লোকদের সংবাদ- (অর্থাৎ) নূহ, আদ ও ছামূদের সম্প্রদায়, ইবরাহীমের সম্প্রদায়, মাদয়ানবাসী ও উলটিয়ে দেওয়া জনপদসমূহের সংবাদ[২]? ওদের নিকট ওদের রাসূলগণ স্পষ্ট বিধানাবলি নিয়ে এসেছিলেন। আল্লাহ তো আদৌ ওদের উপর জুলুম করার ছিলেন না, কিন্তু ওরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করত[৩]।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

৭১. ঈমানদার পুরুষগণ ও ঈমানদার নারীগণ একে অপরের সাহায্যকারী। তারা ভাল বিষয়

করছ। সুতরাং মনে রেখো, যে পরিণতি ওদের হয়েছিল তোমাদেরও তাই হতে পারে। ওদের নিকট ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি ও শারীরিক শক্তিসামর্থ্য তোমাদের চেয়ে বেশি ছিল; তবুও আল্লাহর শাস্তি থেকে ওরা বাঁচতে পারেনি। অতএব তোমরা কিসের ভরসায় খোদায়ী শাস্তি থেকে এমন নিশ্চিন্ত রয়েছ?

১. অর্থাৎ কোন পার্থিব ও পরকালীন বরকত ও ইজ্জত ওদের ভাগ্যে জোটেনি। অবশ্য পার্থিব ভোগবিলাসের যে অংশ বাহ্যত ওরা পেয়েছিল, তা বস্তুত ওদের জন্য 'ইস্‌তিদ্‌রাজ' (অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ পাকড়াও না করে অবকাশ প্রদান) ও আযাবস্বরূপ ছিল, যেমন দুই রুকূ পূর্বে فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ الخ আয়াতের (৫৫) ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে।

২. নূহ (আ)এর কওম মহাপ্লাবনে, আদ জাতি ঝঞ্ঝাপূর্ণ বাতাসে ও ছামূদ জাতি বিকট শব্দে ধ্বংস হয়েছিল। আর ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা অলৌকিক পন্থায় সাহায্য করেন, যা দেখে তাঁর কওম অপদস্থ ও অকৃতকার্য হয়। ওদের বাদশাহ নমরূদ অত্যন্ত শোচনীয় মৃত্যু বরণ করে। আর মাদ্‌য়ানের অধিবাসীরা ভয়ঙ্কর শব্দ (صيحة), ভূমিকম্প (رجفة) ইত্যাদিতে ধ্বংস হয়। লূত জাতির বস্তীসমূহ উলটিয়ে দেওয়া হয় এবং উপর থেকে পাথরবৃষ্টি হয়। এসব কওমের কাহিনী (ইবরাহীমের কওম ছাড়া) সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ কাউকে অকারণে ও অন্যায়ভাবে শাস্তি দেন না। মানুষ নিজেই এমন সব অপরাধ করে, যার ফলে আল্লাহর আযাবের আগমন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

শিক্ষা দেয় ও মন্দ বিষয় নিষেধ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান্য করে। তাদের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[১]।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

৭২. আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের এমন জান্নাতরাজির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার নিম্নদেশে নহর প্রবাহিত, যার ভিতর তারা অনন্তকাল থাকবে; এবং (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) অনন্তকাল থাকার জান্নাতসমূহে অবস্থিত উৎকৃষ্ট বাসস্থানের। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস। এ-ই মহা সাফল্য[২]।

---

১. বর্তমান রুকূর শুরুতে মুনাফেকদের বিভিন্ন দোষ বর্ণিত হয়েছিল। এখানে তার মোকাবেলায় মুমিনদের গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে মুনাফেকরা মানুষকে ভাল বিষয়াদি থেকে বাধা দিয়ে মন্দের প্রতি উৎসাহিত করে, সেখানে মুমিনরা মন্দ কাজ ছাড়িয়ে সৎকাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। মুনাফেকদের মুঠি বন্ধ, মুমিনদের হাত খোলা ও প্রসারিত। ওরা কৃপণতার কারণে খরচ করতে জানে না, এরা ধন-সম্পদ থেকে রীতিমত যাকাত ইত্যাদি (حقوق) আদায় করে। ওরা আল্লাহকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে, এরা পাঁচ ওয়াক্তে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং সব ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মেনে চলে। তাই ওরা লা'নতের যোগ্য, পক্ষান্তরে এরা আল্লাহর বিশেষ রহমতের উপযুক্ত সাব্যস্ত হয়েছে।

২. অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত নে'য়ামতরাশির চেয়ে বড় হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। জান্নাতও এ জন্যই কাম্য যে, তা আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থান। আল্লাহ তাআলা জান্নাতে মুমিনদের সব রকম বাহ্যিক ও আত্মিক নে'য়ামত ও আনন্দ-সামগ্রী দান করবেন। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ নে'য়ামত হবে পরম প্রিয়তমের শাশ্বত সন্তুষ্টি।

সহীহ হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদের ডাকবেন, তাঁরা 'লাব্বাইক' বলবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, 'هل رضيتم অর্থাৎ এখন কি তোমরা সন্তুষ্ট হয়েছ? তাঁরা উত্তরে বলবেন, 'পরওয়ারদেগার! সন্তুষ্ট না হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে, যখন আপনি আমাদের অফুরন্ত নে'য়ামত দান করেছেন।' তখন ইরশাদ হবে— هل أعطيكم أفضل من ذلك অর্থাৎ এখন পর্যন্ত যা কিছু প্রদান করা হয়েছে, সে সবের চেয়ে উত্তম একটি জিনিস নিতে চাও কি? জান্নাতীরা জিজ্ঞাসা করবেন, 'হে প্রতিপালক! এর চেয়ে উত্তম আর কী জিনিস হবে? তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন– أُحِلّ عليكُم رضواني فلا اسخط عليكم بعده أبدًا 'আমার শাশ্বত সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করছি, যার পর আর কখনো তোমাদের প্রতি আমার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি হবে না।' رزقنا الله وسائر المؤمنين هذه الكرامة العظيمة الباهرة (সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৭১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৮২৯)

[রুকূ - ১০]

৭৩. হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন এবং ওদের উপর কঠোরতা করুন। ওদের বাসস্থান জাহান্নাম, আর তা অতি নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল[১]।

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ۝

৭৪. ওরা আল্লাহর নামে কসম করে (বলে), 'ওরা বলেনি', অথচ নিশ্চয় ওরা কুফরী কথা বলেছে[২] এবং ইসলাম প্রকাশ করার পর

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ۚ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ

১. 'জেহাদ' এর অর্থ হচ্ছে কোনো মন্দ জিনিস দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। এ চেষ্টা কখনো অস্ত্রের দ্বারা হয়, কখনো মুখের দ্বারা, কখনো কলমের দ্বারা এবং কখনো অন্য কোনো উপায়ে।

যেসব মুনাফেক মুখে ইসলাম প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে মুসলমান নয়; ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উম্মতের অধিকাংশের মতে জায়েয নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এমন ঘটনা ঘটেনি। এ জন্যই বর্তমান আয়াতে জেহাদ শব্দটিকে সাধারণ (অর্থাৎ সামগ্রিক) অর্থে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ তলোয়ার দ্বারা, মুখের দ্বারা, কলমের দ্বারা, যখন যার মোকাবেলায় যেভাবে সংগত হয়, জেহাদ করতে হবে। কোন কোন আলেমের মতে মুনাফেকদের নেফাক সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়ে গেলে ওদের বিরুদ্ধেও অস্ত্রযুদ্ধ করা যেতে পারে।— যা হোক, তাবূকের জেহাদের সময় মুনাফেকদের নেফাক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠায় এ আয়াতে ওদের বিরুদ্ধে কিছুটা কঠোর পন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত কোমলপ্রাণ ছিলেন। সূরা আলে-ইমরানের রুকূ ১৭তে (আয়াত : ১৫৯) আছে- فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ (অতএব এ কেবল আল্লাহরই রহমত যে, আপনি তাদের প্রতি কোমলহৃদয়। আর যদি আপনি রূঢ়, কঠোরহৃদয় হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।) তদুপরি আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে নির্দেশ ছিল, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (এবং যে ঈমানদারগণ আপনার সঙ্গে রয়েছে, তাদের জন্য আপনার ডানা নত করে দিন।) (সূরা শুআরা, আয়াত :২১৫)। যেহেতু মুনাফেকরাও বাহ্যত মুসলমানদের দলভুক্ত ছিল, সেজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের সাথেও ক্ষমাসুন্দর ও কোমল ব্যবহার করতেন। তাবূকের সময় যখন মুনাফেকরা প্রকাশ্য অবাধ্যতা ও শত্রুতার মনোভাব গ্রহণ করল, তখন হুকুম আসল যে, এখন ওদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করুন; এই দুরাত্মারা ভদ্রতায় ও নম্রতায় বশ মানার নয়।

২. মুনাফেকরা অগোচরে বসে নবী আলাইহিস সালামের ও দীনে-ইসলামের অবমাননা করত। যেমন সূরা 'মুনাফিকূন'-এ বর্ণিত হবে। যখন কোন মুসলমান ওদের কথাবার্তা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়ে দিত, তখন ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলত এবং কসম করে বলত যে, আমরা ঐ কথা বলিনি।

وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

কাফের হয়ে গেছে। আর ওরা এমন কাজের ইচ্ছা করেছিল যা করতে সক্ষম হয়নি[১]। ওরা তো এরই প্রতিশোধ নিয়েছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিজ কৃপায় ওদের ধনী বানিয়ে দিয়েছেন*। এখন যদি ওরা তওবা করে নেয়, তবে ওদের জন্য মঙ্গল হবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে ওদের যাতনাদায়ক শাস্তি দেবেন। আর পৃথিবীর বুকে ওদের কোন অভিভাবক ও কোন সাহায্যকারী নেই[২]।

এখানে আল্লাহ তাআলা মুসলমান বর্ণনাকারীদের সমর্থন করে বলছেন যে, নিশ্চয় মুনাফেকরা ঐ সব কথা বলেছে এবং ইসলামের দাবি করার পর ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের নবী সম্পর্কে এমন সব কথা বলেছে, যা কেবল কাফেরদেরই মুখ থেকে বের হতে পারে।

১. তাবূকের জেহাদ থেকে ফেরার পথে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্যদল থেকে পৃথক হয়ে একটি পাহাড়ি রাস্তার দিকে যাচ্ছিলেন। তখন প্রায় বারজন মুনাফেক মুখ ঢেকে রাতের আঁধারে তাঁকে আক্রমণ করে (আল্লাহর পানাহ!) পাহাড় থেকে ফেলে দিতে চাইল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হুযায়ফা ও আম্মার রা ছিলেন। হযরত আম্মারকে ওরা ঘিরে ফেলেছিল, কিন্তু হুযায়ফা রা (ক্ষিপ্রগতিতে) ওদের হামলা প্রতিহত করলেন এবং ওদের উটনীগুলোর মুখ ফিরিয়ে দিলেন। মুখঢাকা ছিল বলে ওদেরকে হযরত হুযায়ফা চিনতে পারেননি। পরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুযায়ফা ও আম্মারকে ওদের প্রত্যেকের নামধাম বলে দিলেন, কিন্তু কারো কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করে দিলেন। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩৭৯২; দালাইলুন নবুওয়াহ্ : ৫/২৫৬, ২৬০)

এই ঘটনার প্রতিই وهموا بمالم ينالوا আয়াতাংশে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, যে দুরভিসন্ধি ওরা করেছিল, খোদার ফযলে তা পূর্ণ হয়নি।

কোন কোন আলেম লিখেছেন, কোনো এক স্থানে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিবাদ হয়েছিল। মুনাফেকরা উস্কানি দিয়ে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। আয়াতে এরই প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সূরা 'মুনাফেকূন'-এ আসবে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মুসলমানদের সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

* **দ্বিতীয় তরজামা–** 'ওরা শুধু এ বিষয়টাকেই অপছন্দ করেছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিজ দয়ায় ওদের ধনী বানিয়ে দিয়েছেন! (অর্থাৎ আল্লাহর এ মেহেরবানী লাভ করে ওদের শোকর করা উচিত ছিল, কিন্তু ওরা তার পরিবর্তে এসব অপকর্ম করে যাচ্ছে)।

২. অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো'য়ার ফলে আল্লাহ ওদের ধনী বানিয়ে দিয়েছিলেন। ঋনের বোঝা থেকে ওরা মুক্ত হয়। মুসলমানদের সঙ্গে থাকার কারণে

৭৫. আর ওদের মধ্যে কতক এমন, যারা আল্লাহর সঙ্গে এই অঙ্গীকার করেছিল যে, 'তিনি যদি আমাদের তাঁর অনুগ্রহ থেকে দান করেন, তবে আমরা অবশ্যই দান-খয়রাত করব এবং আমরা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব'।

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ۝

৭৬. অতঃপর তিনি যখন নিজ অনুগ্রহ থেকে ওদের দান করলেন, তখন তাতে কৃপণতা করল এবং পাশ কাটিয়ে চলে গেল[১]।

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ۝

গনীমতের ধন-সম্পদে অংশ পেতে থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে ফসল ভাল হয়। এসব অনুগ্রহের বদলা ওরা এভাবে দিল যে, আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে দাগাবাজি করতে শুরু করল। এবং সর্বপ্রকারে পয়গম্বর আলাইহিস সালাম ও মুসলমানদের কষ্ট দিতে লাগল।

তবে এখনো যদি তওবা করে দুষ্কৃতি ও অকৃতজ্ঞতাসমূহ থেকে ফিরে আসে, তবে ওদের পক্ষে উত্তম। নতুবা আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এমন শাস্তি দেবেন, যা থেকে রক্ষা করার মত কাউকে পৃথিবীর বুকে পাওয়া যাবে না।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, 'জুলাস' নামে এক ব্যক্তি এই আয়াতগুলি শুনে খাঁটি দিলে তওবা করেন এবং পরবর্তীতে আপন জীবন ইসলামের জন্য কুরবান করে দেন। (মুসান্নাফে আঃ রায্যাক, বর্ণনা ১৮৩০৩)

১. **শানে নুযূল**

ছা'লাবা ইবনে হাতিব আনসারী নামক এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করল, আমার জন্য দো'য়া করুন– যেন আমি ধনী হয়ে যাই। তিনি বললেন, 'ছা'লাবা! যে স্বল্প জিনিসে তুমি আল্লাহর শোকর আদায় করবে, তা সেই বহু জিনিসের চেয়ে ভাল, যার হক তুমি আদায় করতে পারবে না। সে পুনরায় একই দরখাস্ত করল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ছা'লাবা! তুমি কি আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পছন্দ কর না?'– হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত না করতে থাকেন, তার পীড়াপীড়ি ততই বাড়তে থাকে। সে ওয়াদা করল, যদি আল্লাহ আমাকে ধন-সম্পদ দান করেন তবে আমি পূর্ণরূপে হক আদায় করব।

শেষ পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'য়া করলেন। (ফলে) তার ছাগলপালে এতই বরকত হল যে, তার মদীনার বাইরে একটি গ্রামে থাকার প্রয়োজন হল এবং বকরা-বকরির এতই বিস্তৃতি হল যে, তাতে লিপ্ত হয়ে সে ক্রমান্বয়ে জুমা ও জামাতের নামাযও তরক করতে লাগল। কিছুদিন পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে যাকাত উসূলকারী (মুহাস্সিল) পৌঁছলে সে বলতে লাগল, যাকাত তো 'জিয্য়া'র সদৃশ বলে মনে হয়। দু-একবার টালবাহানা করে অবশেষে যাকাত দিতে পরিষ্কার অস্বীকার করে দিল। হুযূর

৭৭. অতএব শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তাঁর সাথে ওদের সাক্ষাৎ-দিবস পর্যন্ত ওদের অন্তরে নেফাক রেখে দিলেন– কেননা ওরা আল্লাহর সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিল তার বরখেলাফ করেছে এবং ওরা মিথ্যা বলত[১]।

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝٧٧

৭৮. ওরা কি জানে না যে, আল্লাহ ওদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শের কথা জানেন এবং (জানে না যে,) আল্লাহ সকল গোপন বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ অবগত[২]?

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝٧٨

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার ويح ثعلبة (ধিক ছা'লাবা!) বললেন এবং বর্তমান আয়াতগুলি নাযিল হল।

কোন আত্মীয় মারফত এ সংবাদ পেয়ে সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাকাত নিয়ে হাযির হল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ আমাকে তোমার যাকাত কবূল করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এ কথা শুনে সে খুব আফসোস করল। কারণ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাকাত কবূল না করা ওর জন্য অত্যন্ত লজ্জা ও দোষের বিষয় ছিল।

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আবু বকর সিদ্দীক (রা)এর খেদমতে যাকাত নিয়ে হাযির হল। তিনিও কবূল করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর হযরত উমর (রা) এবং তাঁর পর হযরত উছমান (রা)এর খেদমতে যাকাত পেশ করল। উভয়েই অস্বীকার করলেন এবং প্রত্যেকেই বললেন, যে জিনিস হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমরা তা গ্রহণ করতে পারি না। শেষ পর্যন্ত নেফাকের এই অবস্থাতে থেকেই সে হযরত উছমান (রা)এর খেলাফতকালে মারা গেল। (তাফসীরে তবারী ১১/৫৭৮-৫৮০; তাখরীজে আহাদীসিল্ কাশ্‌শাফ ১/৪৬৮ وإسناده ضعيف)

১. অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে পরিষ্কার ওয়াদা-খেলাফ করা এবং মিথ্যা বলতে থাকার শাস্তিস্বরূপ সর্বদার জন্য নেফাকের শিকড় ওদের অন্তরে প্রোথিত হয়ে গেল, যা আমৃত্যু বের হওয়ার নয়। বস্তুত আল্লাহর নীতি এটাই যে, যখন কেউ নিজেই ভাল বা মন্দ অভ্যাস অবলম্বন করে নেয়, তখন তা বেশি বেশি করতে থাকার কারণে স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। মন্দ অভ্যাসের এই স্থায়িত্ব ও পরিপক্কতাকেই কখনো কখনো ختم ও طبع (মোহর লাগানো) শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

২. অর্থাৎ ওরা যতই ওয়াদা-অঙ্গীকার করুক, যত কথাই বানাক অথবা বাধ্য হয়ে যত সম্পদই পেশ করুক, আল্লাহ ওদের এরাদা ও নিয়ত ভালভাবেই জানেন এবং ওরা নিজ দলীয় লোকদের সাথে বসে যেসব পরামর্শ করে থাকে, সে সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ অবগত আছেন। তিনি জানেন যে, (৭৫ নং আয়াতে বর্ণিত) তাদের ওয়াদা এবং ঘাবড়ে গিয়ে যাকাত পেশ করা— এসব কেমন নিয়তে করা হয়েছে।

৭৯. (ওরাই এমন লোক), যারা মুমিনগণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান-খয়রাত কারীদের খোঁটা দেয় এবং তাদেরও খোঁটা দেয়, যারা আপন শ্রমলব্ধ (সামান্য) সম্পদ ছাড়া আর কিছু পায় না এবং তাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। আল্লাহও ওদের বিদ্রূপ করেছেন* এবং ওদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক আযাব[১]।

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৮০. আপনি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন (উভয় সমান)। আপনি যদি ওদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ ওদের মোটেই ক্ষমা করবেন না। এটা এজন্য যে, ওরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে। আর আল্লাহ নাফরমান লোকদের পথ দেখান না[২]।

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

✯ **দ্বিতীয় তরজামা–** 'আল্লাহ ওদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের শাস্তি দেবেন'।

১. একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের দান-খয়রাত করার জন্য উৎসাহিত করলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা চার হাজার (দিনার বা দেরহাম) দান করলেন। আসিম ইবনে আদী রা একশত 'ওয়াসাক' খেজুর (যার মূল্য প্রায় চার হাজার দেরহাম) পেশ করলেন। মুনাফেকরা বলতে লাগল, এরা উভয়ে লোক দেখানো ও খ্যাতি অর্জনের জন্য এত পরিমাণ দান করেছেন। আবু আকীল হুবাব নামক এক গরীব সাহাবী কষ্টে-শ্রমে যে স্বল্প কামাই করে এনেছিলেন, তা থেকে এক 'সা' (১১৭ তোলা, মোটামুটি সাড়ে তিন সের) খেজুর দান করলে ওরা ঠাট্টা করে বলল, এই ব্যক্তি তো জোর করে দান-খয়রাত কারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়!! আচ্ছা, তার এক 'সা' খেজুরে কিই বা হবে! (তাফসীরে তবারী: ১১/৫৯৩– সংক্ষেপে মূল ঘটনা সহীহ মুসলিমেও আছে, হাদীস : ১০১৮)

মোটকথা, স্বল্পদানকারী আর বেশি ব্যয়কারী কেউই ওদের যবান থেকে রক্ষা পেত না– কারো সমালোচনা করত, কারো বিদ্রূপ করত। আল্লাহ তাআলা এর উত্তরে বলেছেন- سخر الله منهم (আল্লাহ ওদের বিদ্রূপ করেছেন) অর্থাৎ ওদের দোষারোপ ও বিদ্রূপের প্রতিফল দিবেন। বাহ্যত ওদের কয়েক দিনের জন্য ঠাট্টাবিদ্রূপ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ওদের সুখের দিন শেষ হয়ে আসছে, আর আযাবে-আলীম (অর্থাৎ মর্মান্তিক শাস্তি) ওদের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।

২. অর্থাৎ মুনাফেকদের জন্য আপনি যত বারই ক্ষমা প্রার্থনা করেন না কেন, ওদের পক্ষে সবই নিষ্ফল। খোদা এই হতভাগা কাফের ও নাফরমানদের কখনো ক্ষমা করবেন না।

[রুকূ - ১১]

৮১. যারা পশ্চাতে রয়ে গেছে (যুদ্ধে যায়নি), তারা রাসূলুল্লাহর প্রস্থানের পরে নিজেদের

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

ঘটনা এই যে, মদীনার মুনাফেক-সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওর জানাযার নামায পড়ালেন এবং মাগফেরাতের জন্য দো'য়া করলেন। হযরত উমর (রা) এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেন এবং বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো সেই খবীছ, যে অমুক অমুক সময় এমন এমন গর্হিত আচরণ করেছে, সর্বদা কুফর ও নেফাকের পতাকাবাহী থেকেছে। আল্লাহ তাআলা কি বলেননি ' اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ' —হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'হে উমর! আমাকে ক্ষমা-প্রার্থনা থেকে নিষেধ করা হয়নি, বরং আমাকে ক্ষমাপ্রার্থনা করা বা না করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। বাকি ওদের ক্ষমা না করা, এ তো আল্লাহর কাজ (তবে আমার এ কর্মপদ্ধতি ওদের পক্ষে না হলেও অন্যদের পক্ষে উপকারী হতে পারে। অন্যরা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুশমনের জন্য এ উদার চরিত্র ও অফুরন্ত দয়া-মায়া লক্ষ করে ইসলাম ও ইসলামের পয়গম্বরের প্রেমিক হয়ে যেতে পারে। বস্তুত হয়েছিলও তাই)। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১২৬৯-১২৭০, ৪৬৭১; তারীখুল মাদীনাহ্ : ১/৩৭২)

সহীহ বুখারীর এক রেওয়ায়াতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি আমি জানতে পারতাম যে, সত্তর বারের বেশি ক্ষমাপ্রার্থনা করলে তার ক্ষমা হতে পারে, তবে আমি সত্তর বারের বেশি ক্ষমাপ্রার্থনা করতাম।' (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৩৬৬) এ হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিলেন যে, হযরত উমরের মত তিনিও ক্ষমাপ্রার্থনাকে ওর পক্ষে অনুপকারী চিন্তা করছিলেন। (তবে) পার্থক্য এতটুকু যে, হযরত উমর (রা) এর দৃষ্টি بغض في الله (অর্থাৎ আল্লাহর জন্যই ক্রোধের) উত্তেজনায় শুধু এক দিকেই নিবদ্ধ ছিল, আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতের উপকার হয় কি না হয়, সেই চিন্তা না করে পয়গম্বরসুলভ সার্বজনীন মমতাবোধের প্রকাশ ও জীবিতদের উপকারের চিন্তা করছিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ওহী অবতীর্ণ হল–وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ (ওদের কারো মৃত্যু হলে আপনি কখনো ওর (জানাযার) নামায পড়বেন না এবং ওর কবরের পাশে দাঁড়াবেনও না।) এ আয়াত সুস্পষ্টভাবে মুনাফেকদের জানাযা পড়তে এবং ওদের দাফন-কাফন ইত্যাদি কাজে অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করে দিল। কেননা, এতে মুনাফেকদের সাহস বৃদ্ধি ও মুমিনদের মন ভাঙার সম্ভাবনা ছিল। তখন থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মুনাফেকের জানাযার নামায পড়েননি।

رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ۗ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ۝

বসে থাকাতে আনন্দিত হয়েছে* এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করাকে অপছন্দ করেছে[১]। আর বলেছে, 'গরমের মধ্যে বের হয়ো না'[২]। আপনি বলুন, 'দোযখের আগুন অনেক বেশি গরম'। কত ভাল হত যদি ওরা বুঝত[৩]।

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

৮২. অতএব ওরা (দুনিয়াতে) সামান্য হেসে নিক, অতঃপর (আখেরাতে) কাঁদতে হবে প্রচুর– ওরা যা কিছু করত তার প্রতিফলস্বরূপ[৪]।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যারা পশ্চাতে রয়ে গেছে, তারা রাসূলুল্লাহর বিরোধিতা করে (ঘরে) বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে...'

১. এ আয়াত সেই মুনাফেকদের সম্পর্কে, যারা তাবূকের জেহাদে যোগদান থেকে পিছিয়ে ছিল। অর্থাৎ মুনাফেকদের অবস্থা এই যে, ওরা মন্দ ও দোষের কাজ করে আনন্দিত হয় এবং নেক কাজে পিছপা হয়। আর পূর্বে যেমন বর্ণিত হয়েছে, ওরা সৎকর্মশীলদের দোষারোপ করে এবং তাদের সমালোচনা করে। নবীর ক্ষমাপ্রার্থনায় এহেন সম্প্রদায়ের কী ফায়দা হতে পারে?

এ থেকে গোনাহগার ও অবিশ্বাসীর পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এমন কোন গোনাহ আছে কি, যা নবীর ক্ষমাপ্রার্থনায় মাফ হবে না? (নেই)। সূরা নিসার ৯ রুকূতে (আয়াত : ৬৪) আছে- وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيْمًا (আর যখন ওরা নিজেদের অকল্যাণ করেছিল, তখন যদি ওরা আপনার নিকট আসত, তার পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে অবশ্যই ওরা আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু পেত।) কিন্তু নবীর সত্তর বার ক্ষমাপ্রার্থনাও অবিশ্বাসীর কোন উপকারে আসবে না।

২. এ কথা হয় মুনাফেকরা পরস্পর একে অন্যকে বলত, অথবা কোন কোন মুমিনকেও বলে থাকবে, যাতে তাদের সাহস খর্ব হয়ে যায়।

৩. অর্থাৎ ওদের যদি আকল-বুদ্ধি থাকত তবে চিন্তা করত, এখানকার উত্তাপ থেকে বেঁচে যে উত্তাপের দিকে যাচ্ছে, তা তো প্রচণ্ডতম। এর উদাহরণ তো এমন, যেন রোদ থেকে ভেগে আগুনে আশ্রয় নিল! হাদীসে আছে, জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুন থেকে উনসত্তর গুণ বেশি গরম। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮৪৩)

৪. অর্থাৎ কয়েকদিন নিজেদের কাজকর্মে আনন্দ লাভ করে নাও এবং হাসি-ফুর্তি করে নাও। অতঃপর এসব কর্মকাণ্ডের পরিণামে রয়েছে চিরকালের ক্রন্দন।

৮৩. আল্লাহ যদি আপনাকে ওদের কোন দলের নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যান[১], আর ওরা আপনার নিকট (যুদ্ধে) বের হওয়ার অনুমতি চায়, তবে বলে দেবেন, 'তোমরা আমার সঙ্গে কখনো বের হবে না এবং আমার সঙ্গী হয়ে কোন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না। তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকাকে পছন্দ করেছিলে, সুতরাং (এবারো) পশ্চাদ্‌বর্তীদের সাথে বসেই থাক[২]।

فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ؕ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ۝

৮৪. আর ওদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে আপনি কক্ষনো ওর (জানাযার) নামায পড়বেন না এবং ওর কবরের সামনে দাঁড়াবেনও না[৩]। ওরা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং নাফরমান অবস্থায়ই মারা গেছে[৪]।

وَلَا تُصَلِّ عَلٰۤى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

---

১. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূকে ছিলেন, আর মুনাফেকরা মদীনায়। তাঁর ফিরে আসার পূর্বেই কতক মুনাফেকের মরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই ('ওদের নিকট' না বলে) বলা হয়েছে- إلى طائفة منهم (ওদের কোন দলের নিকট।)

২. অর্থাৎ এখন যদি এই লোকেরা অন্য কোন জেহাদে সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে তবে বলে দেবেন, তোমাদের সাহস ও বীরত্বের অবস্থা জানা হয়ে গেছে এবং তোমাদের অন্তরের অবস্থা ইতিপূর্বে প্রকাশ পেয়ে গেছে; তোমরা কখনো আমাদের সঙ্গে বের হতে পারবে না এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় বীরত্ব দেখাতে পারবে না। সুতরাং তোমাদের এখন কষ্ট করার দরকার নেই– মেয়ে, শিশু, লেংড়া ও দুর্বল-শক্তিহীন বৃদ্ধদের সাথে ঘরে ঢুকে বসে থাক এবং যে জিনিস তোমরা প্রথমবার নিজেদের জন্য পছন্দ করে নিয়েছ, সেই হালতেই তোমাদের মৃত্যুবরণ করা সংগত, যাতে আল্লাহর শাস্তির মজাটা উত্তমরূপে আস্বাদন করতে পার।

৩. অর্থাৎ দো'য়া ও ইসতেগফারের জন্য, বা দাফনের কাজে অংশগ্রহণের জন্য।

৪. এ আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর উক্ত ঘটনার পর নাযিল হয়। কয়েক আয়াত পূর্বেই আমরা তার বিশদ আলোচনা করেছি (৮০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

এ আয়াত অবতরণের পর মুনাফেকদের জানাযা পড়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয়ে গেল। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক (রা) সতর্কতাহেতু এমন ব্যক্তির জানাযা পড়তেন

৮৫. ওদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ তো এ-ই চান যে, তিনি দুনিয়াতে এগুলোর মাধ্যমে ওদের আযাবে রাখবেন এবং কাফের থাকা অবস্থায়ই ওদের প্রাণ বের হোক[১]।

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ۝

৮৬. আর যখন এই মর্মে কোন সূরা নাযিল করা হয় যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ কর, তখন ওদের মধ্যকার সামর্থ্যবানেরাও আপনার নিকট (যুদ্ধে না যাওয়ার) অনুমতি চায় এবং বলে, 'আমাদের ছেড়ে দিন, যারা বসে আছে আমরা তাদের সাথে থেকে যাই।'

وَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ۝

৮৭. ওরা পশ্চাতে রয়ে যাওয়া মেয়ে লোকদের সাথে থেকে যাওয়াকেই পছন্দ করেছে[২], আর

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ

না, যার নামাযে হযরত হুযাইফা (রা) শরীক না থাকতেন। কারণ, তাঁকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু মুনাফেকের নাম-ধাম বলে দিয়েছিলেন এবং এ জন্যই তাঁর উপাধি হয়েছিল- صاحب سرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন তথ্যের ধারক)।

১. চার রুকূ পূর্বে একই বিষয়ের আয়াত (৫৫ নং) অতিবাহিত হয়েছে, তার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২. অর্থাৎ কুরআনের কোন সূরাতে যখন সতর্ক করা হয় যে, সম্পূর্ণ আন্তরিকতা ও পরিপক্কতার সাথে ঈমান আন, যার বড় লক্ষণ হচ্ছে, পয়গম্বর আলাইহিস সালামের সঙ্গী হয়ে খোদার রাস্তায় জেহাদ করা—তখন মুনাফেকরা টালবাহানা শুরু করে দেয় এবং ওদের মধ্যকার সামর্থ্যবান লোকেরাও মিথ্যা ওযর দেখিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করতে আসে যে, হযরত! আমাদের এখানেই মদীনাতে থাকতে দিন।' বলতে গেলে, চরম নির্লজ্জতা ও কাপুরুষতাহেতু যুদ্ধ বা বিপদের নাম শুনলেই ওরা অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদের সাথে ঘরে বসে থাকতে চায়। হাঁ, যখন যুদ্ধ বা বিপদের আশঙ্কা না থাকে এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সময় হয়, তখন কথা বানাতে ও বকবক করতে সবার আগেভাগে থাকে। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ تَدُوْرُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ (الأحزاب: ١٩)

(যখন ভয়ের সময় আসে, তখন ওদের দেখবেন, আপনার দিকে ঘূর্ণায়মান চোখে তাকাচ্ছে, সেই ব্যক্তির মত যে মৃত্যুভয়ে মূর্ছা যাচ্ছে। অতঃপর যখন ভয়ের সময় চলে যায়, তখন ওরা তীক্ষ্ম ভাষায় তোমাদের আক্রমণ করে।)

ওদের অন্তর মোহর করে দেওয়া হয়েছে; সুতরাং ওরা বোঝে না[১]।

عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝

৮৮. কিন্তু রাসূল ও তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে, তারা নিজেদের ধনসম্পদ ও জানপ্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করেছে। তাদেরই জন্য রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই সফলকাম।

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

৮৯. আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এমন জান্নাতরাজি, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। এ-ই মহা সাফল্য[২]।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

[রুকূ - ১২]

৯০. দেহাতিদের মধ্যকার (কিছু) বাহানাকারী এসেছে, যেন ওদের (যুদ্ধে না যাওয়ার) অনুমতি দেওয়া হয়; আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে মিথ্যা বলেছিল, তারা বসে রইল। তাদের মধ্যে যারা কাফের, তাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে যাতনাদায়ক আযাব[৩]।

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

---

১. অর্থাৎ মিথ্যা, নেফাক, জেহাদে অনীহা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দূরে থাকার অভিশাপে ওদের দিলে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন মোটা মোটা দোষও ওদের নিকট দোষ মনে হয় না এবং চরম নির্লজ্জতা ও ভীরুতার জন্য লজ্জা না পেয়ে বরং আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়।

২. এখানে মুনাফিকদের মোকাবেলায় মুখলেস মুমিনদের আলোচনা করা হয়েছে যে, 'দেখ! এরাই হচ্ছে খোদার অনুগত বান্দা, যারা তাঁর রাস্তায় ধন ও প্রাণ কোন কিছু দিতে কুণ্ঠিত হয় না। যতই আশঙ্কাপূর্ণ পরিস্থিতি হোক, তারা ইসলাম ও ইসলামের পয়গম্বরের সহযোগিতার জন্য সব রকম কুরবানী দিতে প্রস্তুত থাকে। এরূপ ব্যক্তিদের জন্য সাফল্য ও কামিয়াবী না হলে আর কার জন্য হবে?

৩. অর্থাৎ শহরবাসীদের মধ্যে যেমন মুনাফেক ও মুখলেস উভয় শ্রেণীর লোক রয়েছে, তেমনি গ্রাম্য লোকদের মধ্যেও সব রকমের লোক পাওয়া যায়। তার মধ্য থেকে এখানে দুই শ্রেণীর উল্লেখ হয়েছে।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ

৯১. দুর্বল লোক, অসুস্থ লোক এবং যারা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করার মত কিছু পায় না, তাদের কোন গোনাহ নেই (যুদ্ধে না যাওয়াতে), যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা পোষণ করে। সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই[১]। আর আল্লাহ

এখানে গ্রামবাসীদের যে দুটি জামাতের উল্লেখ রয়েছে– مُعَذِّرون ও قاعدون (ওযরকারীরা ও উপবেশনকারীরা), তাদের মধ্যে প্রথম জামাত অর্থাৎ (مُعَذِّرون) বলতে কারা উদ্দেশ্য– মিথ্যা বাহানাকারী মুনাফেকরা, না সত্য ওযরওয়ালা মুসলমানরা (যারা জেহাদে যোগদান করতে অপারক ছিলেন)— এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী মুফাসসিরদের মতভেদ রয়েছে। যদি প্রথম সম্ভাবনা ধরা হয়, তবে আয়াতের মধ্যে মুনাফেকদের দুই শ্রেণীর বর্ণনা রয়েছে : ১. معذرون অর্থাৎ সেই মুনাফেক শ্রেণী, যারা ভিতরে নেফাক থাকা সত্ত্বেও বাহ্যত মুসলমান পরিগণিত থাকার জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসত এবং এসে মিথ্যা ওযর-বাহানা পেশ করত। ২. قاعدون অর্থাৎ সেই মুনাফেক শ্রেণী, যারা প্রথমতঃ ঈমানের মিথ্যা দাবি করেছে, অতঃপর বাহ্যত মুসলমান পরিগণিত থাকারও পরোয়া করেনি। জেহাদের নাম শুনে ঘরেই বসে থেকেছে এবং একেবারে নির্ভয় ও নির্লজ্জ হয়ে ওযর করতেও আসেনি। (মোট কথা, উভয় দল মুনাফেকদেরই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, প্রথম দল ওযর করতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে এসেছে, কিন্তু দ্বিতীয় দল তাও করেনি এবং বাহ্যিক ভদ্রতাটুকুও দেখায়নি। এদেরই قاعدون বলা হয়েছে।)

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী معذرون ও قاعدون উভয় জামাতই سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ –এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং অর্থ এই হবে যে, এই উভয় জামাতের মধ্যে যারা নিজেদের কুফরের উপর শেষ পর্যন্ত কায়েম থাকবে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে। আর যাদের তওবার তাওফীক হয়ে যাবে, তারা এই শাস্তির আওতাধীন হবে না।

আর যদি مُعَذِّرُوْنَ দ্বারা (মুনাফেকরা নয়) মুখলেস মুমিনরা উদ্দেশ্য হয়, যারা আসলেই মাজুর ছিলেন, তবে قاعدون দ্বারা মুনাফেকরা উদ্দেশ্য হবে এবং سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم আয়াতাংশ কেবল এদেরই জন্য প্রযোজ্য হবে। আর এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত জামাতের আলোচনা তিরস্কারস্বরূপ হবে না।

১. মিথ্যা ওযরকারীদের পর এখানে প্রকৃত মাযুরদের কথা বলা হয়েছে। সারকথা এই যে, ওযর দুই ধরনের : ১. কিছু ওযর স্থায়ী ও ব্যক্তির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, যেমন বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা, যা স্বভাবত কোনক্রমেই ব্যক্তি থেকে পৃথক হয় না। ২. আর কিছু ওযর সাময়িক। এমন ওযরও দুই প্রকারের : ১. শারীরিক; যেমন অসুস্থতা ইত্যাদি ২. আর্থিক, যেমন দারিদ্র ও সফরের উপকরণের অভাব।

অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১];

৯২. এবং তাদের বিরুদ্ধেও (কোন অভিযোগ) নেই, যারা আপনার নিকট যখন এই আশায় আসল যে, আপনি তাদের বাহন দেবেন (আর) আপনি বললেন, আমি কোন বাহন পাচ্ছি না যা তোমাদেরকে আরোহনের জন্য দেব— তখন তারা এ অবস্থায় ফিরে গেল যে, তাদের চোখ থেকে এই দুঃখে অঝোরে অশ্রু বইছিল যে, ব্যয় করার মত কোন কিছু তারা পাচ্ছে না[২]।

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾

যেহেতু তাবূকের জেহাদে মুজাহিদদের অনেক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে, সেজন্য স্থায়ী ও শারীরিক ওযরের মত যানবাহন না থাকার ওযরও গ্রহণযোগ্য ও সংগত বিবেচিত হয়েছে, যেমন সামনে বলা হবে।

১. অর্থাৎ যারা সত্যিই মাযূর (অক্ষম), যদি তাদের দিল পরিষ্কার থাকে এবং আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে আচরণ ঠিক রাখে (যেমন, নিজেরা যেতে না পারলেও যারা যাচ্ছে তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয় না), বরং নিজের সামর্থ্যানুযায়ী সৎকর্ম করার এবং এখলাস প্রমাণিত করার জন্য সচেষ্ট থাকে— জেহাদে শরীক হতে না পারায় তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। এমন মুখলেসদের দ্বারা মানবীয় দুর্বলতাবশত যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতিও হয়ে যায়, তবে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা নিজ দয়াগুণে তা মাফ করে দেবেন।

২. সুবহানাল্লাহ! নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের দিলের মধ্যে প্রভুপ্রেমের সেই নেশা পয়দা করেছিল, যার দৃষ্টান্ত কোন জাতি ও মিল্লাতের ইতিহাসে নেই। সক্ষম ও সামর্থ্যবান সাহাবীদের দেখুন, তাঁরা ধন ও প্রাণ সব কিছু খোদার পথে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত রয়েছেন এবং কঠিন থেকে কঠিনতর কুরবানীর সময় অত্যন্ত জোশ ও উদ্যমের সঙ্গে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছেন। আর যাঁদের সামর্থ্য নেই, তাঁরা এই দুঃখে কেঁদে কেঁদে জান শেষ করে দিচ্ছেন যে, মাহবূবে-হাকীকীর পথে কুরবান হওয়ার জন্য নিজেদের পেশ করতে পারার সামর্থ্যটুকু আমাদের কেন হল না!

সহীহ হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাবূক যুদ্ধে অশংগ্রহণকারী) মুজাহিদদের সম্বোধন করে বললেন, তোমরা মদীনায় এমন এক সম্প্রদায়কে রেখে এসেছ, যারা প্রতি পদক্ষেপে তোমাদের ছওয়াবে শরীক রয়েছে। তোমরা খোদার পথে যে কদমই রাখ অথবা কোন প্রান্তর অতিক্রম কর, কোন সংকীর্ণ রাস্তায় চল– তারা সর্বদা-সর্বত্র তোমাদের সাথে সাথে আছে। এরা হচ্ছে তারা, যারা সত্যিকার অপারগতা-অক্ষমতার কারণে তোমাদের সঙ্গে জেহাদে বের হতে পারেনি। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৪২৩) — হাসান (বসরী) থেকে বর্ণিত 'মুরসাল' হাদীসে আছে, উক্ত কথা বলার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু

إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৯৩. অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা সম্পদশালী হয়েও আপনার নিকট (যুদ্ধে না যাওয়ার) অনুমতি চায়। ওরা পশ্চাতে রয়ে যাওয়া মেয়ে লোকদের সাথে থেকে যাওয়াকেই পছন্দ করেছে। আর আল্লাহ ওদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন। ফলে ওরা (ভাল-মন্দের কোন) জ্ঞান রাখে না[১]।

পারা- ১১

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ۭ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ۭ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৯৪. ওরা (মুনাফেকরা) তোমাদের নিকট বাহানা পেশ করবে যখন তোমরা ওদের নিকট ফিরে যাবে। আপনি বলুন, 'তোমরা বাহানা তৈরি করো না, আমরা কিছুতেই তোমাদের কথা বিশ্বাস করব না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের হাল-অবস্থা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আর ভবিষ্যতেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য (সকল) বিষয়ের পরিজ্ঞাতা। তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করতে'[২]।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতখানিই তেলাওয়াত করলেন : وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ الخ (ইবনে কাছীর)

১. অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ওরা জেহাদ থেকে বিরত থাকে এবং অত্যন্ত নির্লজ্জতার সাথে মেয়েলোকের ন্যায় ঘরে বসে থাকাকে পছন্দ করে। বস্তুত পাপাচারের কারণে মানুষের অন্তর এমন বিকৃত ও কালো হয়ে যায় যে, ভাল-মন্দ ও দোষ-গুণের পার্থক্য করার যোগ্যতাও তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না। নির্লজ্জতার কাজ করতে করতে যখন কোন ব্যক্তি এমন পাগল হয়ে যায় যে, অনুতপ্ত ও দুঃখিত হওয়ার পরিবর্তে উলটা গর্বিত ও আনন্দিত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, ওর দিলে আল্লাহর মোহর লেগে গেছে। العياذ بالله

২. অর্থাৎ তাবূক যুদ্ধে যাত্রাকালে যেমন মুনাফেকরা নানা ধরনের হিলা-বাহানা তৈরি করেছিল, তেমনি তোমরা যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করবে তখনো ওরা মিথ্যা ওযর-আপত্তি পেশ করে

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۹۵﴾

৯৫. নিশ্চয় ওরা তোমাদের সামনে আল্লাহর নামে কসম করবে যখন তোমরা ওদের নিকট ফিরে যাবে, যাতে তোমরা ওদের এড়িয়ে যাও (এবং কিছু না বল)। অতএব তোমরা ওদের এড়িয়ে যাও। ওরা অপবিত্র এবং ওদের বাসস্থান দোযখ, ওদের কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ[১]।

يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ

৯৬. ওরা তোমাদের সামনে কসম করবে, যাতে তোমরা ওদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তো, তোমরা ওদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেও আল্লাহ (এই) নাফরমান লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট

তোমাদের আশ্বস্ত করতে চাইবে। ওরা কসম খেয়ে খেয়ে বলবে, 'হযরত! আপনার সহযাত্রী হওয়ার একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অমুক অমুক বাধা-বিপত্তির কারণে তা হয়ে উঠেনি।'— আপনি উত্তরে বলে দিন, মিথ্যা বলে কোন লাভ নেই। তোমাদের সব ওযর-আপত্তি অহেতুক ও নিরর্থক। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মিথ্যা ও নেফাক সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করে দিয়েছেন। এর পরও আমরা কী করে তোমাদের কথাবার্তায় বিশ্বাস করতে পারি?

অতএব এখন পুরনো কাহিনী রাখ। ভবিষ্যতে তোমাদের কার্যকলাপে প্রমাণিত হবে, নিজেদের দাবিতে তোমরা কতটুকু বিশ্বস্ত। সব সত্য-মিথ্যা তখন প্রকাশ পেয়ে যাবে। আর বড় কথা এই যে, সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ তাআলা থেকে কোন ভেদ ও কার্য বা নিয়ত গোপন থাকতে পারে না। তাঁর নিকটেই সকলকে যেতে হবে। প্রতিফল দানের সময় তিনি তোমাদের প্রত্যেক ছোট-বড়, জাহেরী ও বাতেনী আমল প্রকাশ করে দেবেন এবং সেই অনুসারেই তোমরা প্রতিফল পাবে।

১. তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুনাফেকরা মিথ্যা কসম খেয়ে যেসব ওযর পেশ করেছিল, তা দ্বারা ওদের উদ্দেশ্য ছিল– নিজেদের কসম ও গিল্টি কথাবার্তা দ্বারা পয়গম্বর আলাইহিস সালাম ও মুসলমানদের আশ্বস্ত করা, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে ওদের প্রতি কোন অভিযোগ, ভর্ৎসনা ও ধর-পাকড় না হয় এবং মুসলমানরা ওদের সাথে কোন বাদ-প্রতিবাদ না করেন।

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলছেন যে, ঠিক আছ, তোমরা ওদের সাথে বাদ-প্রতিবাদ করো না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মুসলিমগণ ওদের প্রতি রাযী-খুশী হয়ে গেছে। এ লোকগুলো এতই দুর্গন্ধময় হয়ে পড়েছে যে, এদের পাকসাফ হওয়ার আর সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এহেন আবর্জনার স্তূপ দূরে নিক্ষেপ করা এবং তা থেকে সরে থাকাই উত্তম। আল্লাহ নিজেই ওদের প্রতিবিধান করবেন।

ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٩٦﴾

হবেন না[১]।

ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا۟ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾

৯৭. দেহাতি (মুনাফেক) লোকেরা কুফর ও মুনাফেকিতে অনেক বেশি কঠোর এবং ওরা সেসব বিধি-বিধান না জানারই বেশি উপযুক্ত, যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন[২]। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান[৩]।

---

১. ধোঁকা, প্রতারণা ও মিথ্যা দ্বারা মুসলমানদের খুশী করতে ওদের আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। ধরুন, মিঠা কথাবার্তায় মানুষ সন্তুষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু তাতে কী লাভ হবে, যখন স্বয়ং আল্লাহ ওদের প্রতি অসন্তুষ্ট? খোদার সামনে তো কোন চালাকী ও দাগাবাজি চলতে পারে না।

এতে যেন অবহিত করা হল, যে সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট নন তাদের প্রতি কোন মুমিন কী করে সন্তুষ্ট হতে পারে? অতএব মিথ্যা কথায় পয়গম্বর ও তাঁর সঙ্গীদের খুশী করে ফেলার পাগলামি চিন্তা দেমাগ থেকে বের করে দেওয়া উচিত। আর ওদের প্রতি যদি অবজ্ঞা ও উপেক্ষার আচরণ করা হয়, তবে এটা ওদের প্রতি মুসলমানদের রাযী-খুশী হওয়ার প্রমাণ নয়।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যে ব্যক্তির ব্যাপারে জানা যায় যে, সে মুনাফেক, তার প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন জায়েয বটে, কিন্তু তার সাথে বন্ধুত্ব, ভালবাসা ও সম্প্রীতি বৈধ নয়।'

২. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

এ পর্যন্ত মদীনার মুনাফেক ও খাঁটি মুমিনদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এখন দেহাতিদের বিষয়ে বলা হচ্ছে যে, তাদের মধ্যেও কয়েক প্রকার লোক রয়েছে: কাফের, মুনাফেক ও খাঁটি মুসলমান।

যেহেতু গ্রাম্য লোকেরা স্বভাবগতভাবে সাধারণত রূঢ় স্বভাব ও শক্ত মেযাজের হয়ে থাকে যেমন হাদীসে আছে- (مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا) (জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৪০৬), এবং ইলম ও হেকমতের মজলিস থেকে দূরে থাকার কারণে সভ্যতা-ভব্যতার প্রভাব এবং ইলম ও মারেফতের আলো কমই গ্রহণ করে থাকে—এ জন্য ওদের কুফর ও নেফাক শহুরে কাফের ও মুনাফেকদের চেয়ে কঠিন হয়। বলা বাহুল্য, ইলম ও মারেফতই মানব-সন্তানকে নম্র ও ভদ্র করে তোলে। সুতরাং যে সব গ্রাম্য লোক এহেন অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছে, তাদের অন্তর শক্ত না হয়ে পারে না। বেদুইনদের রুক্ষ প্রকৃতির উল্লেখ বিভিন্ন হাদীসেও রয়েছে। এক হাদীসে আছে, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করল, 'আপনারা নিজেদের বাচ্চাকে চুমু দিয়ে থাকেন। আল্লাহর কসম, আমি কখনো নিজ বাচ্চাকে চুমু দেইনি।' জওয়াবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার অন্তর থেকে আল্লাহ স্বীয় রহমত উঠিয়ে নিয়ে থাকলে আমি কী করব?' (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৯৯৮)

৩. অর্থাৎ তাঁর ইলম মানবগোষ্ঠীর সকল শ্রেণীকে বেষ্টন করে আছে, আর তিনি স্বীয় হেকমতে প্রত্যেক শ্রেণীর সঙ্গে তার যোগ্যতা ও কার্যক্ষমতা অনুযায়ী আচরণ করে থাকেন।

৯৮. দেহাতিদের মধ্যে কতক এমন, যারা (আল্লাহর পথে) নিজেদের ব্যয় করা অর্থকে জরিমানা গণ্য করে এবং তোমাদের জন্য কালের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করে। ওদের উপরই আসুক অশুভ বিপর্যয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, পরিজ্ঞাতা[১]।

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۹۸﴾

৯৯. আর দেহাতিদের মধ্যে কতক এমনও আছে, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং নিজেদের ব্যয় করা অর্থকে আল্লাহর নৈকট্য ও রাসূলের দো'য়া লাভের উপায় গণ্য করে। শুনে রাখ, তা নিশ্চয় তাদের জন্য নৈকট্য লাভের উপায়। আল্লাহ অবশ্যই তাদের দাখিল করবেন নিজ রহমতের মধ্যে। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۹۹﴾

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'বেদুইন বা গ্রাম্য লোকদের স্বভাবে অন্যায়, অজ্ঞতা ও স্বার্থপরতা খুব বেশি থাকে। আল্লাহ উত্তম হেকমতওয়ালা- তাই তিনি তাদের থেকে কঠিন কাজও চান না এবং তাদের উচ্চ মর্তবাও দান করেন না।

১. অর্থাৎ গ্রাম্য মুনাফেকদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে, ওদের যদি কখনো আল্লাহর রাস্তায় কিছু খরচ করার প্রয়োজন হয়ে যায়, তখন এমন অনিচ্ছার সাথে খরচ করে যেমন কেউ জরিমানা ও দণ্ড আদায় করছে। আর ওরা এই অপেক্ষায় আছে যে, মুসলমানরা কালচক্রে কোন দুর্ঘটনা ও বিপদে ফেঁসে গেলে ওরা খুব আনন্দ-স্ফূর্তি করবে। কিন্তু ওদের খবর নেই যে, ওদেরই ভাগ্যে বিপর্যয় আসছে। ইসলাম তো বিজয়ী ও অগ্রগামী হতে থাকবে, আর এই মুনাফেকরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে।

আর আল্লাহ প্রত্যেকের কথাবার্তা ও প্রার্থনা শুনে থাকেন এবং তিনি এও জানেন, কে সম্মান ও সফলতার উপযুক্ত এবং কারা লাঞ্ছনা ও অপমানের যোগ্য।

২. এস্থলে কুরআন করীমের অলৌকিক প্রভাব ও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার বিস্ময়কর ক্রিয়া দেখানো হচ্ছে। লক্ষ করুন- এই রুক্ষ মেযাজ, কঠোর হৃদয় গ্রাম্য লোকদের মধ্যে কুফর ও নেফাক এবং অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার কারণে এ যোগ্যতাই ছিল না যে, ওরা খোদা-প্রদত্ত আদব-কায়দা (রীতি-নীতি) বুঝতে পারে। কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও কুরআন করীমের অলৌকিক দাওয়াত ওদেরই মধ্যে এমনসব আরেফ ও মুখলেস ব্যক্তি তৈরি করে দিল, যারা আল্লাহ ও পরকাল সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা খোদার রাস্তায় যা কিছু খরচ করে, তা একান্ত আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা ও পয়গম্বর আলাইহিস সালামের দো'য়া লাভের উদ্দেশ্যেই করে থাকে।

[রুকূ - ১৩]

১০০. মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে— আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এমন সব জান্নাত, যার নিম্নদেশে নহর প্রবাহিত, যার মধ্যে তারা অনন্তকাল বাস করবে। এ-ই মহা সাফল্য[১]।

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

আল্লাহ তাআলা তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ সঠিক এবং যে বস্তুর নিয়ত তারা করেছে (অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য), তারা তা পাবেই এবং আল্লাহ অবশ্যই স্বীয় রহমতের মধ্যে তাদের স্থান দেবেন। রইল পয়গম্বর আলাইহিস সালামের দো'য়া- তো তারা নিজেদেরই চোখে দেখেছে, যখন কোন ব্যক্তি সদকা-খয়রাত নিয়ে উপস্থিত হয় তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দো'য়া করে থাকেন। বস্তুত আল্লাহর যে রহমত ও নৈকট্যের ওয়াদা করা হয়েছে, তাও হুযূরের এ দো'য়ারই সুফল।

১. বেদুঈন মুমিনদের উল্লেখের পর এখন নেতৃস্থানীয় ও প্রথম শ্রেণীর খাঁটি মুমিনদের কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। আয়াতের মর্ম এই যে, যে সকল মুহাজের সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রথমে হিজরত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং যে সকল আনসার সর্বাগ্রে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন, অর্থাৎ যাঁরা সত্যগ্রহণে ও ইসলামের খেদমতে আগে বেড়ে অংশ গ্রহণ করেছেন, তার পর যাঁরা সৎনিয়তের সাথে সেই অগ্রবর্তী ইসলামসেবীদের অনুসরণ করতে থেকেছেন—তাঁদের সকলে স্তরভেদে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রকৃত সাফল্য লাভ করে নিয়েছেন। তাঁরা যেমন সম্পূর্ণ প্রসন্নচিত্তে ও উদারমনে আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধান ও তাঁর সকল ফয়সালার সামনে আত্মসমর্পণ করেছেন, তেমনি আল্লাহ তাআলা নিজ সন্তুষ্টির সনদ দান করে তাঁদের সীমাহীন সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

বি. দ্র. السابقون الأوّلون বলে কারা উদ্দেশ্য, এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী মুফাসসিরদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ বলেছেন, সেসব মুহাজির ও আনসার উদ্দেশ্য, যাঁরা হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কারো মতে, যাঁরা উভয় কেবলা (অর্থাৎ কাবা শরীফ ও বাইতুল মুকাদ্দাসের) দিকে নামায পড়েছেন তাঁরা উদ্দেশ্য। আবার কেউ বলেন, বদরের জেহাদের পূর্বে যারা মুসলমান হয়েছিলেন, তাঁরাই سابقين أولين। কেউ হুদায়বিয়ার সময় পর্যন্ত ইসলামগ্রহণকারীদেরকে এর পাত্র সাব্যস্ত করেন। আবার কোন কোন মুফাসসিরের মত এই যে, সকল মুহাজির ও আনসারগণই এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তাঁরা মক্কা-মদীনার আশে-পাশের মুসলমান ও পরবর্তী যুগের মুসলমানগণের তুলনায় سابقين اولين তথা অগ্রগামী।

১০১. তোমাদের আশপাশের দেহাতিদের মধ্যে কিছু লোক মুনাফেক, আর মদীনাবাসী-দেরও কিছু লোক (মুনাফেক); ওরা মুনাফেকিতে অতি পটু। আপনি ওদের জানেন না, আমি ওদের জানি[১]। আমি অবশ্যই ওদের দু'বার শাস্তি দেব, অতঃপর ওদের নিয়ে যাওয়া হবে মহা আযাবের দিকে[২]।	وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛؕ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛؔ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۟ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۰۱﴾

আমাদের মতে এ উক্তিসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, 'অগ্রবর্তী' ও 'প্রথম, হওয়ার বিষয়টি আপেক্ষিক। এক ব্যক্তি বা দল কারো তুলনায় পূর্ববর্তী এবং অন্যের তুলনায় পরবর্তী হতে পারে। যে ব্যক্তি বা দল যতটুকু অগ্রবর্তী ও প্রথম হবে, সে সেই পরিমাণ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রকৃত সাফল্যের অংশ লাভ করবে। কেননা, অগ্রগামী ও প্রথম হওয়ার ন্যায় সন্তুষ্টি ও সাফল্যেরও বহু স্তর হতে পারে।

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

পূর্ব থেকে বেদুঈনদের আলোচনা চলে আসছিল। মাঝখানে বেদুঈন মুমিনদের আলোচনা প্রসঙ্গে মুহাজের ও আনসারদের কথা এসে গিয়েছিল। এখন বর্তমান আয়াতে বিশেষ করে মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী (মুনাফেক) লোকদের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।

আয়াতের মর্ম হচ্ছে, কতক মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী লোক নেফাকে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং তাতেই অটল আছে। ওদের নেফাক এতই শক্ত ও গভীর যে, ওদের অবস্থান নিবটবর্তী হওয়ার পরও এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরম দূরদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টি সত্ত্বেও তিনিও শুধু লক্ষণ ও অবস্থা দ্বারা সুনির্দিষ্ট ও অকাট্যরূপে ওদের নেফাক ধরতে পারেননি। ওদের সঠিক পরিচয় একমাত্র আল্লাহর ইলমে রয়েছে। সাধারণ মুনাফেকদের পরিচয় তো ওদের চেহারা, কথার ভঙ্গি ইত্যাদি দ্বারা বুঝে ফেলা যেত, যেমন ইরশাদ হয়েছে : وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ (আমি চাইলে আপনাকে ওদের দেখিয়ে দিতে পারি, আর আপনি তো অবশ্যই ওদের চিনে ফেলেছেন ওদের চেহারা-লক্ষণ দ্বারা। সূরা মুহাম্মাদ : ৩০) কিন্তু এদের নেফাক ছিল এতই গভীর যে, এ ধরনের জাহেরী আলামত ওদের ভেদ ফাঁস করতে পারত না।

২. 'মহা আযাব' হচ্ছে দোযখের আযাব— إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (নিশ্চয় মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে। –সূরা নিসা : ১৪৫)। এই আযাবের পূর্বে কমপক্ষে দু'বার ওদের আযাব দেওয়া হবে : একটা হচ্ছে কবরের আযাব, দ্বিতীয়টা সে আযাব, যা এ পার্থিব জীবনেই আসবে। যেমন: ইবনে আব্বাস (রা) এর এক বর্ণনা মত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার মিম্বরে দাঁড়িয়ে প্রায় ছত্রিশ ব্যক্তির নাম ধরে ধরে বললেন- اُخْرُجْ فإنّك منافق (অর্থাৎ তুই মুনাফেক, মসজিদ থেকে বের হয়ে যা)। এ অপমান এক ধরনের আযাবই ছিল। (তাফসীরে তবারী ১১/৬৪৪-৬৪৫; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২২৩৪৮– হযরত আবু মাসউদ রা. থেকে)

১০২. আর অন্য কিছু লোক রয়েছে, যারা নিজেদের গোনাহ স্বীকার করেছে– তারা মিশ্রিত করেছে এক সৎকর্মের সাথে অপর মন্দ কর্ম। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

অথবা পূর্বে এ সূরাতেই (আয়াত : ৫৫) বলা হয়েছে, ওদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তানসন্ততিকে আল্লাহ তাআলা ওদের পক্ষে আযাব বানিয়েছেন- فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا الخ – হতে পারে, এ আযাব উদ্দেশ্য। অথবা ওদের কারও কারও দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি পার্থিব ও আসমানী বিপদে পতিত হয়ে অপমানকর মৃত্যুবরণ করা, অথবা ইসলামের উত্থান ও উন্নতি দেখে ওদের কঠিন অন্তরজ্বালা হওয়া —আমার মতে এই সব রকমের আযাবই مَرَّتَيْنِ-এর আওতাভুক্ত।

আর مرتين বলে হয় 'একাধিকবার' বোঝানো হয়েছে, (অর্থাৎ মহা আযাবের পূর্বে ওদের একাধিকবার আযাব দেওয়া হবে)। অথবা দু'বার দ্বারা দুই প্রকারের আযাব উদ্দেশ্য অর্থাৎ 'কবরের আযাব' ও 'মৃত্যুপূর্ব আযাব'।

১. মদীনাবাসীদের মধ্যে একদিকে তো ঐ সকল অবাধ্য মুনাফেক রয়েছে, যারা নেফাকের আবরণে নিজেদের দুষ্কৃতি ও অন্যায় ঢেকে রাখে এবং এ ব্যাপারে ওরা খুব পটু। অন্যদিকে তাদের মধ্যে এমনসব মুসলিমও রয়েছেন, যাদের দ্বারা মানুষ হিসাবে কোনো দোষ-ত্রুটি হয়ে গেলে তাঁরা অনুতপ্ত হন এবং বিনাদ্বিধায় নিজেদের গোনাহ স্বীকার করে থাকেন। তাঁদের ভাল-মন্দ মিশ্রিত হয়ে আছে।

উদাহরণস্বরূপ, মন্দ তো এই যে, তাঁরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বান সত্ত্বেও তাবূকের যুদ্ধে হাযির হননি। অতঃপর এই গর-হাযিরার জন্য তাঁদের আন্তরিকভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া, বাইরে ও ভিতরে তওবা এবং অন্যান্য সৎকর্ম (যথা নামায, রোযা, হজ্জ বা অন্যান্য যুদ্ধে যোগদান প্রভৃতি) করা– এ সবই তাঁদের ভাল কর্মের তালিকাভুক্ত। এ ধরনের ব্যক্তিদের আল্লাহ তাআলা ক্ষমার আশা প্রদান করেছেন।

আয়াতটি কাদের সম্পর্কে

মুফাসসিরগণ লিখেছেন, এ আয়াত হযরত আবু লুবাবা ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী সম্পর্কে নাযিল হয়, যাঁরা নিতান্ত আলস্য ও দৈহিক আরামের জন্য তাবূকে হাযির হননি। কিন্তু যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে অবগত হলেন, তখন ভীষণ অনুতপ্ত হয়ে তাঁরা সকলে মসজিদের স্তম্ভসমূহের সাথে নিজেদের বাঁধলেন এবং শপথ করলেন যে, যাবৎ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই পাপী বন্দীদের ক্ষমা করে নিজ হাতে না খুলবেন, তাবৎ তাঁরা এভাবেই বাঁধাবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থা দেখে বললেন, আল্লাহর কসম, যাবৎ আল্লাহ

১০৩. আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন[১], যার দ্বারা আপনি তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে দেবেন এবং তাদের জন্য দো'য়া করুন। নিশ্চয় আপনার দো'য়া তাদের জন্য প্রশান্তি। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[২]।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

তাদের বাঁধন খোলার আদেশ না দেবেন, তাবৎ আমি খুলতে পারি না। অবশেষে এ আয়াত নাযিল হলে তিনি তাঁদের খুলে দিলেন এবং তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দিলেন। (তাফসীরে তবারী ১১/৬৫১-৬৫২)

কথিত আছে, তাঁরা মুক্ত হওয়ার পর তওবার পূর্ণতা বিধানে আল্লাহর রাস্তায় দান করার জন্য কিছু ধন-সম্পদ নিয়ে নবীজির দরবারে উপস্থিত হন। এতে পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়।

১. বিজ্ঞ মুতারজিম (র) صدقة এর তরজমা করেছেন 'যাকাত'। কিন্তু 'সদকা' শব্দটিকে তার ব্যাপক অর্থে রেখে যাকাত ও নফল সদকা উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করলে উত্তম হত। কেননা, অধিকাংশ রেওয়ায়েত অনুযায়ী এ আয়াত তাঁদেরই ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যাঁরা ক্ষমালাভের পর তওবা পূরণার্থে সদকা (সাধারণ দান) নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেমনটি পূর্ববর্তী ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে। —হাঁ, শাব্দিক ব্যাপকতা দৃষ্টে হুকুমকে শানে নুযূলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন নেই। তাই পূর্ববর্তী মনীষীগণ (রা) এ আয়াতটি যাকাতের বিষয়েও পেশ করেছেন। (মোট কথা, আয়াতে 'সদকা' শব্দটি যাকাত বা নফল সদকা কোন একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়)।

২. তওবা দ্বারা গোনাহ মাফ হয়ে যায়, অর্থাৎ গোনাহর উপর পাকড়াও হওয়ার ব্যাপার থাকে না। তবে গোনাহর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে এক প্রকার রূহানী মলিনতা ও অন্ধকার থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা সাধারণত সৎকর্মসমূহ, বিশেষ করে সদকা দ্বারা দূরীভূত হয়। এ হিসাবে বলা যায়, সদকা (মানুষকে) গোনাহর আছর থেকে পাক-সাফ করে এবং ধন-সম্পদের বরকত বৃদ্ধি করে (যাকাতের আভিধানিক অর্থই হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া)।

এ ছাড়া সদকা করার একটি বড় উপকার এই ছিল যে, সদকাকারীদের জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক দো'য়া করতেন। ফলে দানকারীদের মনে উৎসাহ বৃদ্ধি পেত এবং অন্তরে সান্ত্বনা লাভ হত, বরং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো'য়ার বরকত পর্যায়ক্রমে দাতাদের বংশধর পর্যন্ত গিয়ে পৌছত।

ফেকাহবিদদের মতে, এখনো সদকা নিয়ে আগমনকারী ব্যক্তির জন্য নবীর ওয়ারিস হিসাবে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের দো'য়া করা উচিত। —অবশ্য অধিকাংশ আলিমগণের মতে অন্যদের দো'য়ার জন্য صلوة শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ, এ শব্দ একমাত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্ধারিত।

১০৪. তারা কি জানে না যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের থেকে তওবা কবুল করেন এবং (তাদের) যাকাত-সদকা গ্রহণ করেন; এবং (জানে না) যে, আল্লাহই অত্যধিক তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু[১]?

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۝

১০৫. আপনি বলুন, 'তোমরা আমল করতে থাক, আল্লাহ তো তোমাদের আমল দেখবেন এবং (দেখবেন) তাঁর রাসূল ও অন্য মুমিনরা। আর তোমরা শীঘ্রই তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য (সকল) বিষয় সম্বন্ধে অবগত। তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যা কিছু তোমরা করতে[২]।'

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۝

---

১. অর্থাৎ তওবা ও দান-খয়রাত কবূল করা না করা একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতাধীন। কেননা, তিনিই জানেন, কে খাঁটি অন্তরে এবং কবূল হওয়ার শর্তে তওবা করেছে বা সদ্কা দিয়েছে, আর কে এর বিপরীত। এজন্যই ইতিপূর্বে কতক বক্তিকে (শর্ত না পাওয়া যাওয়ায়) এ শাস্তি দেওয়া হয়েছে যে, তাদের যাকাত কখনো গৃহীত হয়নি (আয়াত ৭৫-৭৬ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। আর মুনাফেকদের দান-খয়রাত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং এদের জন্য দো'য়া-এসতেগফার করাকে নিরর্থক বলা হয়েছে, এমনকি এদের জানাযার নামায পড়তেও নিষেধ করা হয়েছে।

অপরদিকে এ আয়াতে যাদের আলোচনা রয়েছে, (শর্ত পূরণ করায়) তাদের তওবা কবূল হয়েছে এবং তাদের দান-খয়রাত গ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু তাদের জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দো'য়া করতে বলা হয়েছে।

২. অর্থাৎ তওবা প্রভৃতির দ্বারা বিগত গোনাহ মাফ হয়ে গেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে দেখা যাবে, তোমরা সততা ও দৃঢ়তার কার্যকর প্রমাণ কতটা পেশ করতে পার। এ জেহাদে ত্রুটি হয়েছে বটে, ভবিষ্যতেও তো জেহাদ হবে। তখন পয়গম্বর (আলাইহিস সালাম) বা তাঁর খলীফাদের সম্মুখে তোমাদের পরীক্ষা হবে, তোমরা কেমন আমল কর।

তার পর আল্লাহর সমীপে গিয়ে প্রত্যেক কাজেরই পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে। তিনিই সকল প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় এবং জাহেরী আমল ও বাতেনী নিয়ত সম্বন্ধে অবহিত আছেন। তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ীই ব্যবহার করবেন।

(আয়াতের এ তাফসীব হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেবের (র) রুচিমত করা হয়েছে। কারণ, এটি পূর্বাপর বিষয়ের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। والله اعلم)

১০৬. এবং আরো কিছু লোক আছে, যাদের বিষয় মুলতবী রাখা রয়েছে আল্লাহর হুকুমের জন্য; হয় তিনি তাদের শাস্তি দেবেন, না হয় তাদের তওবা কবুল করবেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান[১]।

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

১০৭. (মুনাফেকদের আরেক দল আছে), যারা জিদ ও কুফরের বশবর্তী হয়ে মসজিদ নির্মাণ করেছে, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং সেই ব্যক্তির গোপন ঘাঁটি বানানোর উদ্দেশ্যে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকে যুদ্ধ করছে*।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًۢا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ

---

১. মদীনাবাসীদের আরেকটি ছোট জামাতের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

আসলে, তাবূকে যারা যোগদান করেনি তারা তিন শ্রেণীর ছিল– এক, মুনাফেক দল, যারা নেফাকের কারণে পৃথক থেকেছিল। দুই, কিছু সংখ্যক মুমিন, যারা শুধু অলসতা ও শারীরিক আরামের জন্য জেহাদে অংশ নেননি। —এদের মধ্যে আবার দুই শ্রেণী ছিল। অধিকাংশই ছিলেন এমন, যারা (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের) প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে নিলেন। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে এঁদেরই কথা আলোচিত হয়েছে। অপরদিকে শুধু তিনজন লোকের একটি জামাত ছিল, যারা নিজেদের খুঁটির সাথেও বাঁধেননি এবং কোন ওযরও দেখাননি। বরং প্রকৃত ঘটনা যা ছিল এবং ত্রুটি যা হয়েছিল তা হেরফের না করে সাফ সাফ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করে দিলেন। তাঁদেরই ব্যাপারে বর্তমান আয়াত নাযিল হয়।

আয়াতের অর্থ এই যে, তাদের বিষয়টি বর্তমানে মুলতবী আছে। কিছুদিন আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা কর– চাই তাদের শাস্তি দেন বা ক্ষমা করেন। তাঁর ইলম ও হেকমতের দাবি যা হবে, তা-ই করা হবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বিধান নাযিল না হওয়া পর্যন্ত এ তিনজনের সঙ্গে মুসলমানদের সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। পঞ্চাশ দিন এ অবস্থা থাকার পর ক্ষমা করা হল। এসব ঘটনা এবং তিন জনের বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী রুকূর শেষাংশে (আয়াত :১১৮) আসবে।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে– (মুসলমানদের) ক্ষতিসাধণ করা, কুফর (তথা ইসলামের বিরুদ্ধে সলা-পরার্মশ) করা, মুমিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং ওই ব্যক্তির (থাকার) ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে, যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে এসেছে'।

এবং ওরা অবশ্যই শপথ করে বলবে, 'আমরা তো কেবল কল্যাণেরই ইচ্ছা করেছি।' আর আল্লাহ সাক্ষী যে, ওরা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী[১]।

قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا الْحُسْنٰى ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ۞

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

ইতিপূর্বে তাদের আলোচনা ছিল, যাদের দ্বারা বাহ্যত একটি মন্দ কাজ (জেহাদ থেকে পিছিয়ে থাকা) হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সঠিক আদীকা-বিশ্বাস ও গোনাহর কথা স্বীকারের বদৌলতে তাঁরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে, এখানে এমন একটি জামাতের কথা বলা হচ্ছে, যারা বাহ্যত খুব ভাল কাজ (অর্থাৎ মসজিদ নির্মাণ) করল, কিন্তু আকীদা (ও উদ্দেশ্য) খারাপ হওয়ার কারণে তারা শাস্তিযোগ্য হল।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

ঘটনা এই যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করার পর প্রথমে মদীনার বাইরে 'বনূ আমর ইবনে আওফ' গোত্রের মহল্লায় অবস্থান করেন। কয়েক দিন পর সেখান থেকে মদীনা শহরে তশরীফ নিয়ে যান এবং মসজিদে নববী নির্মাণ করেন। ইতিপূর্বে যে মহল্লায় থেকে তিনি নামায পড়েছিলেন, সেখানকার লোকেরাও মসজিদ তৈরি করল, যা 'কুবা মসজিদ' নামে খ্যাত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই শনিবার দিন সেখানে গিয়ে দু'রাকাত নামায পড়তেন এবং এই মসজিদের বড় ফযীলত বয়ান করতেন। এতে কতক মুনাফেক ষড়যন্ত্র করল, এই মসজিদ নির্মাণকারী মুসলমানদের বিরোধিতায় তারই নিকটে মসজিদের নামে আরেকটি ঘর নির্মাণ করবে, সেখানে নিজেদের জামাতের ব্যবস্থা করবে এবং সরলমনা কোন কোন মুসলমানকে মসজিদে কুবা থেকে হটিয়ে সেদিকে নিয়ে যাবে।

মূল হোতা আবু আমের

মূলত এই নাপাক পরিকল্পনার মূল হোতা ছিল খাযরাজ গোত্রের আবু আমের নামক এক ব্যক্তি। হিজরতের পূর্বে এই লোকটা খ্রিস্টান হয়ে সন্ন্যাস-জীবন অবলম্বন করেছিল। মদীনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেরা, বিশেষত খাযরাজ গোত্র ওর সাধুতা ও দরবেশীর ভক্ত ছিল এবং ওকে খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের ফলে মদীনায় যখন ঈমান ও মারেফতের সূর্যোদয় হল, তখন এ ধরনের সন্ন্যাসীদের মুখোস খুলতে শুরু করল। আচ্ছা, সূর্যের আলোর সামনে নিভু নিভু বাতির কোন মূল্য থাকে কি? এ অবস্থা দেখে আবু আমের ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে বললেন, 'আমি সত্যিকার মিল্লাতে ইবরাহীম নিয়ে এসেছি।' তখন সে বলে কি, 'আমি পূর্ব থেকে এ ধর্মেই আছি, কিন্তু আপনি নিজের পক্ষ থেকে মিল্লাতে ইবরাহীমের মধ্যে এর পরিপন্থী বিষয়াদি ঢুকিয়েছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ়ভাবে এর খণ্ডন করলেন। অবশেষে ওর মুখ থেকে এ কথা বের হল যে, 'আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, খোদা তাকে যেন নিজ

দেশ থেকে দূরে একা, নিঃস ও অসহায় অবস্থায় মৃত্যু দান করেন।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমীন' – খোদা এমনি করুন!'

বদরের জেহাদের পর যখন ইসলামের ভিত্তি মজবুত হল এবং মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতি ঈর্ষাপরায়নদের চোখের শূল হতে লাগল, তখন আবু আমের আর সহ্য করতে পারল না। সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে পালিয়ে মক্কায় চলে গেল। সে নিজেও উহুদের যুদ্ধে কুরায়শদের সাথে যোগদান করল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে সে আগে বেড়ে মদীনাবাসী আনসারদের, যারা জাহেলিয়াতের যুগে ওর খুবই ভক্ত-অনুরক্ত ছিল, সম্বোধন করে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করল। নির্বোধ বুঝতে পারেনি যে, পয়গম্বরের অলৌকিক ক্ষমতার সামনে সেই পুরাতন যাদু কী করে চলতে পারে? যে আনসারগণ ওকে পূর্বে 'রাহেব' বলে ডাকতেন তাঁরাই উত্তরে বললেন, 'ওহে ফাসেক, খোদার দুশমন! আল্লাহ তোর চোখ কখনো ঠাণ্ডা না করুন! আমরা কি আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে তোর সঙ্গী হতে পারি? আনসারদের এই নৈরাশ্যজনক উত্তর শুনে ওর কিছুটা সম্বিত ফিরে এল এবং ক্ষিপ্ত হয়ে বলতে লাগল, 'হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! ভবিষ্যতে যে কোন জাতি তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে আমি সর্বদা তাদের সঙ্গে থাকব।'

সে মত হুনায়নের যুদ্ধ পর্যন্ত সে প্রত্যেক যুদ্ধে কাফেরদের সহগামী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে। উহুদের যুদ্ধে ওরই কারসাজিতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষতিগ্রস্ত হন। উভয় বাহিনীর মধ্যভাগে সে গোপনে কিছু গর্ত খনন করিয়ে রেখেছিল। সেখানেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক আহত ও দান্দান মুবারক শহীদ হওয়ার ঘটনা ঘটে।

'মসজিদে যেরার' নির্মাণ

ঐতিহাসিক হুনায়ন যুদ্ধের পর আবু আমের যখন বুঝতে পারল, আরবের কোন শক্তিই আর ইসলামকে পরাস্ত করতে পারবে না, তখন সে পালিয়ে শামদেশে চলে গেল এবং মদীনার মুনাফেকদের নিকট পত্র লিখল যে, আমি রোমসম্রাটের সঙ্গে মিলিত হয়ে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে আসছি, যারা নিমেষে তার সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিস্যাৎ করে দিবে এবং মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করে ছাড়বে। তোমরা এখন মসজিদের নামে একটি ইমারত নির্মাণ কর। সেখানে নামাযের ছলে একত্র হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে সব রকমের ষড়যন্ত্রমূলক পরামর্শ হতে পারবে। এবং সেখানেই আমার দূত আমার চিঠিপত্র ও সংবাদাদি পৌছাতে থাকবে। আর আমি মাঝে মধ্যে মদীনায় এলে তাতে থাকার ও তোমাদের সাথে মিলিত হওয়ার একটি উপযুক্ত স্থান হবে।

উল্লিখিত অসৎ উদ্দেশ্যেই 'মসজিদে যেরার' নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু মুনাফেকরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, আমাদের কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই, বরং শীত, বৃষ্টি ইত্যাদিতে বিশেষত রুগ্ন, দুর্বল ও জরুরী কাজে ব্যস্ত লোকদের পক্ষে কুবা পর্যন্ত যাওয়া কষ্টকর বলে এই মসজিদটি নির্মাণ করেছি, যাতে নামাযীদের জন্য আসানী হয় এবং কুবার মসজিদে স্থানের স্বল্পতার

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ۝

১০৮. আপনি কখনো তাতে দাঁড়াবেন না। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই পরহেযগারীর উপর স্থাপিত হয়েছে, নিশ্চয় তা-ই এর বেশি উপযুক্ত যে, আপনি তাতে দাঁড়ান। তাতে এমন ব্যক্তিরা আছে, যারা উত্তমরূপে পাক-পবিত্র হওয়াকে ভালবাসে। আর যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন[১]।

অভিযোগ না থাকে। মুনাফিকরা এও বলেছিল, হুযূর সেখানে একবার গিয়ে নামায পড়ে আসলে আমাদের জন্য বরকত ও সৌভাগ্যের কারণ হবে। আসলে মুনাফেকদের মতলব এই ছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখে সরলমনা মুসলিমগণ ভালো ধারনা করবে এবং ওদের সন্দেহ করবে না।

যা হোক, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাবূক পানে যাত্রা করে ফেলেছেন। তাই বললেন, 'ইনশাআল্লাহ ফিরে আসার পর এটা করা যাবে।' যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনার নিকটে পৌছলেন, তখন জিবরাঈল (আ) বর্তমান আয়াতগুলি নিয়ে আগমন করলেন, যার মধ্যে মুনাফেকদের অপবিত্র ও অসৎ উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করে দেওয়া হল এবং 'মসজিদে যেরার' এর গোমর ফাঁক করে দেওয়া হল। হুযূর (সা) মালেক ইবনে দুখশুম ও মাআন ইবনে আদিকে আদেশ দিলেন— সেই ইমারতটাকে (যার নাম প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে মসজিদ রাখা হয়েছিল) গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে। তাঁরা তৎক্ষণাৎ আদেশ বাস্তবায়ন করলেন এবং ঘরটি পুড়িয়ে ভষ্মীভূত করে দিলেন। (তাফসীরে বাগাবী ২/৩২৬– و ينظر في إسناده)

এভাবে আমের 'ফাসেক' ও মুনাফেকদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেল এবং সে নিজের দো'য়া ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'আমীন' অনুযায়ী শামদেশে কিন্নাসরীন নামক এলাকায় নিঃস্ব অবস্থায় অত্যন্ত শোচনীয় মৃত্যু বরণ করল— فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لله رب العالمين (অতঃপর সেই জালেমদের মূলোচ্ছেদ হয়ে গেল। আর সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। –সূরা আনআম, আয়াত ৪৫)

বর্তমান আয়াতে مَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ দ্বারা উক্ত আবু আমের ফাসেকই উদ্দেশ্য।

১. অর্থাৎ যে মসজিদের ভিত্তি শুধু জিদ, কুফর, নেফাক, ইসলামের শত্রুতা ও আল্লাহ-রাসূলের বিরোধিতার উপর স্থাপন করা হয়েছে, আপনি তাতে কখনো নামাযের জন্য দাঁড়াবেন না। আপনার নামাযের জন্য সে মসজিদই উপযুক্ত, যার ভিত্তি প্রথম দিন থেকে তাক্ওয়া ও পরহেজগারীর উপর রাখা হয়েছে (তা মসজিদে নববী হোক, বা মসজিদে কুবা)। তার নামাযীরা গোনাহ, দুষ্কর্ম ও সব রকমের অপবিত্রতা থেকে নিজেদের ভিতর ও বাইর পাক-সাফ রাখায় খুবই যত্নশীল। এ জন্যই আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

১০৯. আচ্ছা, যে ব্যক্তি নিজ ইমারতের ভিত্তি আল্লাহ-ভীতি ও (তাঁর) সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করেছে, সে উত্তম না ঐ ব্যক্তি, যে নিজ ইমারতের ভিত্তি রেখেছে একটি পতনোন্মুখ খাদের কিনারায়, ফলে ইমারত নিয়ে তা ধসে পড়ল জাহান্নামের আগুনে[১]? আর আল্লাহ জালেম লোকদের পথ দেখান না[২]।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ

১১০. ওরা যে ইমারত নির্মাণ করেছে, তার কারণে সর্বদা ওদের অন্তরে সংশয় (তথা নেফাক) থেকে যাবে*। তবে ওদের অন্তরই খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেলে (ভিন্ন কথা)। আর

আয়াতে কোন্ মসজিদ উদ্দেশ্য

হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবাবাসীদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা পাক-পবিত্রতায় বিশেষ কী যত্ন নাও, যে কারণে আল্লাহ তাআলা তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা করলেন? তাঁরা বললেন, 'আমরা ঢেলা ব্যবহারের পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করি।' (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৫৪৮৫; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ৮৩; মুসনাদে বায্যার-কাশফুল আসতার, হাদীস : ২৪৭-; তাফসীরে তবারী : ১১/৬৯২) অর্থাৎ সাধারণ পবিত্রতার পরও তাঁরা এ বিষয়ে অতিরিক্ত যত্ন নেন। এ থেকে বোঝা যায়, আয়াতে কুবা মসজিদের দিকেই ইংগিত রয়েছে, কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়াতে স্পষ্ট আছে যে, لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى দ্বারা মসজিদে-নববী উদ্দেশ্য। (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ১৬০৬)

বিজ্ঞ আলেমগণ এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আমি মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ সম্পর্কে নিজ মতামত পেশ করে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য (تطبيق) স্থাপন করেছি। এস্থলে সে আলোচনার অবকাশ নেই।

১. অর্থাৎ যে কাজের ভিত্তি স্থাপিত হয় তাক্ওয়া, ঈমান, এখলাস ও খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের উপর, তা অতি মজবুত ও স্থায়ী হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, যে কাজের ভিত্তি সংশয়, নেফাক, ধোঁকা ও প্রবঞ্চনার উপর, তা নিজ ক্ষণস্থায়িত্ব, দুর্বলতা ও অশুভ পরিণতির দিক থেকে এমন একটি ইমারতের মত, যা মাটি সরে যাওয়া খাদের কিনারায় স্থাপন করা হয়েছে। ফলে যখন আরেকটু মাটি সরে গেল বা কিনারায় ঢেউয়ের আঘাত লাগল, ব্যস অমনি সমস্ত ইমারতটাই 'ধড়াম' করে নীচে পতিত হল এবং পরিশেষে দোযখের গর্তে গিয়ে পৌছল।

২. অর্থাৎ ওরা বাহ্যত কোন সৎকর্ম (যেমন মসজিদ নির্মাণ) করলেও অন্যায় ও অবিচারের কারণে তা কোনো কাজে আসে না।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তা সর্বদা ওদের মর্মপীড়ার (কারণ) হয়ে থাকবে'।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান[১]।

[রুকূ - ১৪]

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

১১১. নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান-মাল এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর হত্যা করে ও নিহত হয়। তার (অর্থাৎ জেহাদের) ব্যাপারে এ সত্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে– তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে। আর আল্লাহর চেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দিত হও তোমাদের সেই লেনদেনের কারণে, যা তোমরা (তাঁর সাথে) সম্পাদন করেছ। আর এ-ই মহা সাফল্য[২]।

---

১. ريبة শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে شبه (সংশয়), যা দ্বারা নেফাক বোঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ উক্ত দুষ্কর্মের ফল এই হল যে, ওদের অন্তরে সর্বদা নেফাক স্থায়ী হয়ে থাকবে (যাবৎ মৃত্যু ওদের টুকরা টুকরা না করে ফেলবে)। যেমন: এই সূরারই প্রথম দিকে (আয়াত : ৭৭) বলা হয়েছে—

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَا اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ

কোন কোন অনুবাদক ريبة-এর অর্থ করেছেন كهٹکنا (বিদ্ধ হওয়া)। অর্থাৎ যে অসৎ উদ্দেশ্যে ওরা ইমারত তৈরি করেছিল, আল্লাহ তাআলা তা স্বীয় পয়গম্বরকে অবহিত করে ওদের সমস্ত নাপাক উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিলেন। ফলে এর চিন্তা সর্বদা ওদের অন্তরে কাঁটার মত বিঁধতে থাকবে।— ইবনে কাছীর (র) এর বক্তব্যানুযায়ী সালাফের নিকট প্রথম ব্যাখ্যাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

২. এর চেয়ে বেশি লাভজনক ব্যবসা ও বিরাট সাফল্য আর কী হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের তুচ্ছ জান ও অস্থায়ী মালের খরিদদার হলেন! আমাদের জান-মাল প্রকৃতপক্ষে তাঁরই সৃষ্টি ও মালিকানাধীন। তবে সামান্য সংশ্লিষ্টতার কারণে তিনি এ (জান-মালকে) আমাদের সঙ্গে সম্পর্কিত করে 'পণ্য' সাব্যস্ত করেছেন এবং বেহেশতের ন্যায় উচ্চতম জিনিসকে এর 'মূল্য' অভিহিত করেছেন। হাদীসে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেহেশতে এমন সব নে'য়ামতের সমারোহ হবে, যা কোন চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কারো অন্তর সেসবের অবস্থা কল্পনাও করতে পারেনি। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩২৪৪)

এখন লক্ষ করুন, যে জান-মালকে নামেমাত্র আমাদের বলা হয়েছে, তাকে বেহেশতের মূল্য বানাননি এবং এ কথা বলেননি যে, আল্লাহ তাআলা বিক্রেতা আর আমরা ক্রেতা। (বরং বলেছেন, স্বয়ং আল্লাহ ক্রেতা আর মূল্য হচ্ছে বেহেশত! অতএব) এ তাঁর পরম দয়া ও মেহেরবানী যে, এই সামান্য জিনিসের বিনিময়ে (যা বস্তুত তাঁরই জিনিস), বেহেশতের মত অমূল্য ও অবিনশ্বর জিনিসকে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন- যেমন بِالْجَنَّةِ এর স্থলে بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ বলায় এটাই প্রকাশ পায়। কবি বলেন,

نیم جاں بستاند وصد جاں دہد ÷ آنچہ در ہمت نیاید آں دہد

(আধা প্রাণের বিনিময়ে তিনি শত প্রাণ দান করেন। যা চাওয়ার হিম্মত আমাদের নেই, তা তিনি দান করেন।)

অধিকন্তু, আমাদের জান ও মাল ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গেই তা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয় নাই; বরং এতটুকুই কাম্য যে, যখন প্রয়োজন হবে, তখন যেন আমরা আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল পেশ করার জন্য প্রস্তুত থাকি এবং দিতে কৃপণতা না করি। এ জন্যই يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ বলেছেন, উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় বিসর্জন দেওয়ার জন্য জান-মাল সর্বদা প্রস্তুত রাখা। অতঃপর তারা অন্যদের হত্যা করুক বা নিজেরা নিহত হোক– উভয় অবস্থায়ই বেচা-কেনা সম্পাদিত হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে এবং নিশ্চিতরূপে তারা মূল্য পাওয়ার অধিকারী হবে।

وعدًا عليه حقًا

কারো এই সংশয় হতে পারে যে, কারবার তো অবশ্যই খুব লাভজনক ও উপকারী, কিন্তু মূল্য তো নগদ পাওয়া যায় না? এ সন্দেহের উত্তরে বলা হয়েছে- وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ (তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এ মর্মে সত্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।) অর্থাৎ বিনিময়-মূল্য খোয়া যাওয়ার কোন আশঙ্কা নেই। আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত জোরদারভাবে পাকা দলীল লিখে দিয়েছেন, যার অন্যথা অসম্ভব। আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ন ও ওয়াদাপূর্ণকারী আর কেউ হতে পারে কি? মোটেই না। তাঁর বাকীও অন্যদের নগদ থেকে লক্ষ-কোটি গুণে পাকা ও উত্তম।

অতএব মুমিনদের জন্য আনন্দিত হওয়ার এবং নিজেদের কিসমতে গৌরবান্বিত হওয়ার এর চেয়ে উত্তম কারণ আর কী হবে যে, স্বয়ং মহান পরোয়ারদেগার তাদের খরিদদার হলেন এবং খরিদদারও এই মানের! হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সত্যই বলেছেন, 'এ এমনি ক্রয়-বিক্রয়, যা প্রত্যাহার করার কোন সুযোগই আমরা অবশিষ্ট রাখতে চাই না'। (তাফসীরে তবারী ১২/৬-৭)

আল্লাহ তাআলা স্বীয় মেহেরবানীতে আমাদের দুর্বলদেরও এই মুমিনদের দলভুক্ত করে হাশরের মাঠে ওঠান, আমীন!

১১২. (সেই মুমিনরা) তওবাকারী, ইবাদতকারী, শোকরকারী, নিরাসক্ত জীবনযাপনকারী[১], রুকুকারী, সেজদাকারী, সৎ কাজের আদেশ দানকারী, অসৎ কাজে নিষেধকারী[২] এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা (বিধি-বিধান) রক্ষাকারী[৩]। আর আপনি ঈমানদারদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১১৩. নবী ও ঈমানদারদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সংগত নয়— যদিও তারা আত্মীয়-স্বজন হোক— যখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ওরা দোযখী[৪]।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

---

১. কেউ কেউ سائحون–এর অর্থ করেছেন রোযাদার। কারণ, রোযাদার ব্যক্তি সুস্বাদু ও আকর্ষনীয় বস্তুসামগ্রী থেকে বিরত থেকে রূহানী মর্তবা ও আধ্যাত্মিক মাকামসমূহ অর্জন করে থাকে। —কারো নিকট এর দ্বারা 'মুহাজিরগণ' উদ্দেশ্য, যারা বাড়িঘর ত্যাগ করে দারুল ইসলামে এসে বাস করেন। কেউ কেউ 'মুজাহিদীন' অর্থ করেছেন। কেননা, মুজাহিদ নিজ প্রাণ থেকেও সম্পর্কহীন হয়ে আল্লাহর রাস্তায় কুরবান হওয়ার জন্য বের হয়। কারো কারো মতে এই শব্দের পাত্র 'তালিবে ইলম ', যারা বাড়ীঘর, আত্মীয়-স্বজন ও আরাম-আয়েশ সবকিছু ছেড়ে দিয়ে ইলমের অন্বেষণে বের হয়ে পড়ে।

যা হোক, বিজ্ঞ মুতারজিম যে তরজমা করেছেন (بے تعلق رہنے والے), তাতে এই সব অর্থের প্রকাশ রয়েছে। তবে অধিকাংশ সালাফের নিকট প্রথম ব্যাখ্যাই (রোযাদার) বেশি গ্রহণযোগ্য। হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) বলেন, 'সম্পর্কহীন থাকার অর্থ সম্ভবত এই যে, তারা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হন না।'

২. অর্থাৎ নিজেরা সংশোধন হওয়ার পর তারা অন্যদেরও সংশোধন করেন। যেন তাঁদের কাজ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা এবং সৃষ্টির কল্যাণকামী হওয়া।

৩. অর্থাৎ ভাল ও মন্দের যেসব সীমারেখা আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা তারা অতিক্রম করেন না। সারকথা এই যে, শরী'য়তের হুকুম ছাড়া তারা এক কদমও চলেন না।

এসব হল সেই মুমিনদের গুণাবলি, যারা জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর নিকট বিক্রীত হয়ে গেছেন।

৪. মুমিনরা যখন জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর নিকট বিক্রীত হয়ে গিয়েছেন, তখন এটাই জরুরী যে, তাঁরা একমাত্র তাঁরই হয়ে থাকবেন। আর যারা আল্লাহর দুশমন ও জাহান্নামী বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে, ওদের সাথে তাঁরা ভালবাসার সম্পর্ক রাখবেন না; চাই আল্লাহর

১১৪. আর ইবরাহীমের আপন পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ছিল শুধু একটি ওয়াদার কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন ইবরাহীমের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর দুশমন, তখন তিনি তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেলেন। নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন অত্যন্ত কোমলহৃদয়, সহনশীল[১]।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَاۤ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗۤ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۱۴﴾

এই দুশমনরা তাঁদের মাতাপিতা, চাচা-জেঠা ও বিশেষ আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন। সুতরাং যে ব্যক্তি সম্বন্ধে জানা যাবে যে, সে নিশ্চিতরূপে দোযখী, এটা ওহী মারফত জানা যাক বা প্রকাশ্য কুফর ও শিরকের অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার দ্বারা বোঝা যাক– তার জন্য এস্তেগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ।

আয়াতটি কাদের ব্যাপারে?

কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, এ আয়াত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জননী হযরত আমিনা সম্বন্ধে নাযিল হয়। কোন কোন হাদীসে আছে, হুযূরের চাচা আবু তালিব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। কেউ কেউ বলেছেন, মুসলিমগণ তাদের মৃত মুশরিক পিতামাতার জন্য এস্তেগফার করতে চাওয়ায় এ আয়াতে তাদের নিষেধ করা হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৬০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯৮১) —তবে আয়াতের শানে-নুযূল যাই হোক, তার মূল কথা এই যে, যে সকল কাফের ও মুশরিকের মৃত্যু কুফর ও শিরকের অবস্থায় হয়েছে বলে জানা যাবে, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা জায়েয নয়।

বি. দ্র. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতাপিতা সম্বন্ধে ইসলামের বিজ্ঞ মনীষীদের বক্তব্য বিভিন্ন রকম। কেউ কেউ তাঁদের মুমিন ও মুক্তিপ্রাপ্ত প্রমান করার জন্য স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেছেন। আর এ বিষয়ে হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ মুহাদ্দিছসুলভ ও দার্শনিক পর্যালোচনা করেছেন। এ বিষয়ে সতর্কতা ও নিরাপত্তার পথ হচ্ছে মুখ বন্ধ রাখা এবং এমন স্পর্শকাতর বিষয়ের পর্যালোচনা থেকে বিরত থাকা। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই জানেন এবং তিনিই সব বিষয়ের সঠিক মীমাংসাকারী।

১. **শানে নুযূল ও মর্ম**

সূরা মারয়ামে (আয়াত : ৪৭) আছে, যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতা সত্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং জিদ ও শত্রুতাবশত হযরত ইবরাহীমকে হত্যার হুমকি দিতে লাগল, তখন তিনি পিতার সম্মান রক্ষার্থে বললেন- سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ إِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا (তোমার প্রতি সালাম! আমি তোমার জন্য আমার রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি মেহেরবান।) —এ ওয়াদা অনুযায়ী তিনি পিতার জন্য এস্তেগফার করতে থাকেন। যেমন, কুরআনের অন্যত্র (সূরা শুআ'রা : ৮৬) واغفر لأبي (আমার পিতাকে ক্ষমা করুন) বলে ক্ষমা চাওয়ার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই ছিল না যে, শিরকের মধ্যে থাকাকালে একজন মুশরিকের জন্য ইবরাহীম (আ) ক্ষমাপ্রার্থনা

১১৫. আল্লাহ এমন নন যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করার পর আবার পথভ্রষ্ট করে দেবেন, যে পর্যন্ত না তাদের জন্য স্পষ্টরূপে সেসব বিষয় বর্ণনা করে দেন, যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা উচিত। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে সম্যক অবহিত[১]।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

করছিলেন, বরং দো'য়ার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আল্লাহ তাআলা যেন তাকে কুফরের কবল থেকে বের করে ইসলামের ছায়াতলে আসার তাওফীক দেন এবং ইসলাম গ্রহণ যেন তার গোনাহ মার্জনার কারণ হয়। হাদীসে আছে- إن الإسلام يهدم ما كان قبله অর্থাৎ ইসলাম তার পূর্ববর্তী সব গোনাহ বিনাশ করে দেয়।

কুরআন শরীফে মুশরিক পিতার জন্য ইবরাহীম (আ) এর ক্ষমাপ্রার্থনার বিষয় পড়ে কোন কোন সাহাবীর অন্তরে খেয়াল আসল, তা হলে আমরাও নিজেদের পিতামাতার জন্য এস্তেগফার করি। এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলছেন, 'ইবরাহীম ওয়াদার কারণে শুধু সেই সময় পর্যন্ত নিজ পিতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন, যে পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে সুস্পষ্ট হয়নি যে, তার মৃত্যু কুফর ও শিরক এবং আল্লাহর দুশমনীর উপর হবে।' কারণ মৃত্যুর পূর্বে তওবা করে মুসলমান হয়ে যাওয়ার ও ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অতঃপর যখন কুফর ও শিরকের উপর তার মৃত্যু হওয়ায় এ বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে, সে সত্যের দুশমনী থেকে ফেরার ছিল না, তখন ইবরাহীম (আ) তার প্রতি একেবারে অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং দো'য়া ও এস্তেগফার বন্ধ করে দিলেন। কোমলহৃদয় হওয়ার কারণে পূর্বে দোয়া করতেন, যাতে পিতার ইসলাম গ্রহণের সামর্থ্য হয়। যখন এর আশা শেষ হলে গেল, তখন তার শুভাকাঙ্ক্ষা থেকে তিনি বিরত হয়ে গেলেন এবং এক্ষেত্রে পয়গম্বরসুলভ সবর ও সহনশীলতার পরিচয় দিলেন।

হাদীসে আছে, হাশরের ময়দানে ইবরাহীম (আ) আরয করবেন, 'হে খোদা! আপনার ওয়াদা রয়েছে যে, আপনি আমাকে অপমানিত করবেন না। কিন্তু এর চেয়ে অধিক অপমান কী হতে পারে যে, আজ আমার পিতা সকলের সামনে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে?' তখন তাঁর পিতার আকৃতি বিকৃত হয়ে একটা হায়েনার মত হয়ে যাবে, আর ফেরেশতাগণ তাকে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৩৫০)।—এমন সম্ভবত এই জন্য হবে, যাতে লোকেরা তাকে চিনতে না পারে। কারণ, অপমানের ভিত্তি হচ্ছে পরিচয় যখন চেনাই যাবে না যে, দোযখে কী বস্তু ফেলা হচ্ছে, তখন আর পুত্রের অপমানের কোন কারণ থাকবে না।

১. অর্থাৎ দলিল-প্রমাণ পূর্ণ করা ও সত্য প্রকাশ করার পূর্বে আল্লাহ কাউকে গোমরাহ করেন না। আল্লাহ তাআলা নিজ হুকুম-আহকাম পরিষ্কারভাবে বয়ান করে দেওয়ার পর তা পালন না করা গোমরাহী, তার পূর্বে নয়।

১১৬. নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই[১]।

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾

১১৭. নিশ্চয় আল্লাহ সদয় হয়েছেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা সংকট-মুহূর্তে নবীর সঙ্গে থেকেছে[২]– তাদের একদলের অন্তর টলে যাওয়ার উপক্রম হওয়ার পরও। পরে আল্লাহ তাদের প্রতি সদয় হলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান, পরম দয়ালু[৩]।

لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَٰجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

এতে যেন ইঙ্গিত করা হল, যারা নিষেধাজ্ঞার পূর্বে মুশরিকদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিল, তাদের জওয়াবদিহি করতে হবে না। কিন্তু এখন নোটিস পাওয়ার পর তার পুনরাবৃত্তি করাটা গোমরাহী হবে।

১. রাজত্ব যখন তাঁর, অতএব তাঁরই বিধান চলবে। তিনি সর্বব্যাপী ইলম ও সর্বশক্তিসহ যে বিধান জারি করেন, বান্দাদের জন্য তা নিঃশঙ্কচিত্তে ও দ্বিধাহীনভাবে পালন করা উচিত। এতে কারো পছন্দ-অপছন্দের পরোয়া করবে না। কারণ, আল্লাহ ছাড়া কেউ-ই কোন কাজে আসবে না।

২. সংকট-মুহূর্ত বলতে তাবূক যুদ্ধের সময় উদ্দেশ্য। সে সময় কয়েক রকম সংকট একত্র হয়েছিল– প্রচণ্ড গরম, দূর পাল্লার সফর, খেজুর ঘরে তোলার মৌসুম এবং সে কালের বিরাট সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান। তদুপরি বাহ্যিক সম্বলহীনতার এই অবস্থা যে, এক একটি খেজুর দুই দুইজন সৈন্যের মাঝে বণ্টন করা হত। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, কয়েকজন সৈন্য একটি মাত্র খেজুর পরপর চুষে পানি পান করতেন। তারপর পানির অভাবে উটের ভুঁড়ি নিংড়ানো রস পান করার পালা আসল। যানবাহনের এমন সংকট দেখা দিল যে, দশজন সৈন্য পালা করে একটিমাত্র উটে আরোহণ করতেন।—এ ছিল একে-অপরের প্রতি লক্ষ রাখার ও আত্মোৎসর্গের সেই চেতনা, যা মুষ্টিমেয় একটি জামাতকে সারা পৃথিবীর জাতিসমূহের উপর বিজয়ী করে দিল। فلله الحمد والمنة

৩. পয়গম্বর আলাইহিস সালামের প্রতি আল্লাহর মেহেরবানী অগণিত, আর তাঁর বরকতে মুহাজির ও আনসারদের প্রতিও আল্লাহ তাআলার সুদৃষ্টি ও মেহেরবানী হয়েছে। একদিকে আল্লাহ ঈমান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাদের ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন, অন্যদিকে নবীর অনুসরণ, আল্লাহর পথে জেহাদ ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করার হিম্মত ও তাওফীক তাঁদের দান করেছেন। তাছাড়া এই সংকট-মুহূর্তে কতক মুমিনের অন্তরও দুর্বিসহ কষ্টের

১১৮. এবং (আল্লাহ সদয় হয়েছেন) সেই তিন ব্যক্তির প্রতি, যাদের বিষয় মুলতবী রাখা হয়েছিল[১]। অবশেষে পৃথিবী স্বীয় প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তাদের জন্য তাদের প্রাণও সংকীর্ণ হয়ে পড়ল (তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল) এবং তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহর (শাস্তি) থেকে আশ্রয় নেওয়ার কোন স্থান নেই, তবে তাঁরই কাছে! অতঃপর তিনি তাদের প্রতি সদয় হলেন, যাতে তারা (আল্লাহর দিকে) ফিরে আসে। নিশ্চয় আল্লাহই অত্যধিক তওবা কবুলকারী, দয়ালু[২]।

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۟

চাপে বিচলিত হতে লাগল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ত্যাগ করত যুদ্ধ থেকে পিছনে হটে যাওয়ার উপক্রম হল। তখন আল্লাহ তাআলা পুনরায় মেহেরবানী ও সাহায্য করলেন, তিনি এ ধরণের কাজ করা থেকে তাদের রক্ষা করলেন এবং মুমিনদের সাহস ও মনোবল দৃঢ় করে দিলেন। (বর্তমান আয়াতে ' আল্লাহ সদয় হয়েছেন' বলে এসব মেহরবানী ও অনুগ্রহকেই বোঝানো হয়েছে।)

১. এই তিন ব্যক্তি হচ্ছেন কা'ব ইবনে মালেক, হিলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারাহ ইবনে রবী' (রা)। তাঁরা খাঁটি মুমিন হওয়া সত্ত্বেও শুধু অলসতা ও আরামপ্রিয়তার কারণে শরী'য়তসম্মত ওযর ছাড়াই তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁরা মুনাফেকদের ন্যায় মিথ্যা ওযরও পেশ করেননি। আর (আবু লূবাবা প্রমূখ) কতিপয় সাহাবীর ন্যায় নিজেদের মসজিদের খুঁটির সঙ্গে বাঁধেনওনি। আসল ঘটনা যা ছিল তাই তারা সাফ সাফ আরয করলেন এবং নিজেদের দোষত্রুটি প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন।

ফলে তাদের ব্যাপারে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। মুনাফেকদের তো উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং ওদের অন্তরের ব্যাপার আল্লাহর সোপর্দ করা হয়েছিল। আর যাঁরা নিজেদের মসজিদের খুঁটিতে বেঁধেছিলেন, তাঁদের তওবা কবুল করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই তিনজনের ফয়সালা কিছু দিনের জন্য মুলতবী রাখা হল (এবং সকল মুসলিমকে তাদের সাথে মেলামেশা করতে ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দেওয়া হল)। এভাবে পঞ্চাশ দিন গত হল। অতঃপর এঁদের তওবা কবূল করা হল।— 'মুলতবী রাখার' অর্থ এটাই। বুখারী শরীফে স্বয়ং কা'ব ইবনে মালেক থেকে এমনই বর্ণিত আছে। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৪১৮)

২. **উল্লিখিত তিন সাহাবীর (র.) ঘটনার সারসংক্ষেপ**
উক্ত তিনজনের মধ্যে হযরত কা'ব ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজ ঘটনা অতি বিস্তারিতভাবে ও হৃদয়স্পর্শীরূপে বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী (হাদীস : ৪৪১৮) প্রভৃতি হাদীসের কিতাবে তা দ্রষ্টব্য। এস্থলে ঘটনার সারসংক্ষেপ পেশ করা হচ্ছে।

কা'ব ইবনে মালেক বলেন, "তাবূকের অভিযান অত্যন্ত কঠিন ও দুর্গম ছিল বলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সাহাবীদের সকলকে হুকুম দিলেন। সে মত লোকেরা সাধ্যানুযায়ী সফরের সাজসরঞ্জামের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আমি এ কথা ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম যে, যখন ইচ্ছা করব তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে সহযাত্রী হয়ে যাব। কারণ, আল্লাহর ফযলে তখন সবরকমের আয়োজন আমার জন্য সহজ ছিল। একটি নয়, দুটি বাহন আমার নিকট বর্তমান ছিল। কাজেই আমি অলসতার ভেতর দিন কাটাতে থাকলাম। এদিকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশ হাজার মুজাহিদকে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন। তখনো আমার ধারণা ছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হয়ে গেলেই বা কী, সামনের মনযিলে গিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হব। আজ চলি, কাল চলি– এই করতে করতে সময় পার হয়ে গেল।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূক পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলেন-ما فعل كعب بن مالك (কা'ব ইবনে মালেকের কী হল?) বনু সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার আরামপ্রিয়তা ও আত্মগৌরব তাকে বের হতে দেয়নি।' মুআয ইবনে জাবাল (রা) বললেন, 'তুমি মন্দ কথা বললে। আল্লাহর কসম, আমরা তার মধ্যে ভাল ছাড়া অন্য কিছু দেখিনি।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথোপকথন শুনে চুপ থাকলেন।

কা'ব (রা) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূকে তশরীফ নিয়ে যাওয়ার পর আমার খুব বেশি খারাপ লাগছিল। কারণ, সমগ্র মদীনায় পাক্কা মুনাফেক বা মা'যূর (অক্ষম) মুসলমানদের ছাড়া আর কোন পুরুষ মানুষ আমার নজরে পড়ছিল না। যা হোক, (শেষ পর্যন্ত আমার আর তাবূকে যাওয়া হল না।) তখন মনের মধ্যে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা আঁটতে লাগলাম। ভাবছিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যাবর্তনের পর অমুক অজুহাত দেখিয়ে আত্মরক্ষা করব। কিন্তু যখন জানতে পারলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন মন থেকে সমস্ত মিথ্যা ছলনা উধাও হয়ে গেল এবং স্থির সংকল্প করলাম– সত্য ছাড়া কিছু বলব না। কারণ, সত্য ছাড়া অন্য কিছু এ পবিত্র দরবারে রক্ষা করতে পারে না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে সমাসীন ছিলেন, সেই সাথে সাহাবীদের সমাবেশ। মুনাফেকরা মিথ্যা অজুহাত বানিয়ে বাহ্যিক ধরপাকড় থেকে বেঁচে যাচ্ছিল। এমন সময় আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত হয়ে সালাম করলাম। তিনি রাগমিশ্রিত মৃদু হেসে যুদ্ধে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি আরয করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি এখন দুনিয়ার অন্য কারো সামনে থাকতাম, তাহলে আপনি দেখতেন, কীভাবে আমি মুখের জোরে ও মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতাম। কিন্তু এখানে তো ব্যাপার এমন এক পবিত্র সত্তার সঙ্গে, যাঁকে মিথ্যা বলে সাময়িকভাবে রাযী করতে পারলেও একটু পরেই আল্লাহ তাঁকে প্রকৃত বিষয় অবগত করে আমার প্রতি নারায করিয়ে দেবেন। পক্ষান্তরে, সত্য বলায় সাময়িকভাবে আপনার অসন্তুষ্টি সইতে হলেও আশা করি, আল্লাহর পক্ষ থেকে এর পরিণাম উত্তম হবে। আর শেষ পর্যন্ত সত্য বলাই আমাকে আল্লাহ ও রাসূলের অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করবে।

আয় আল্লাহর রাসূল! ঘটনা এই যে, আমার নিকট অনুপস্থিতির কোনই ওযর ছিল না। যে সময় আমি আপনার সহগামী হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হই, সে সময়ের চেয়ে অধিক সামর্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য আমার আর কখনো ছিল না। আমি অপরাধী। আপনার এখতিয়ার, যে কোন শাস্তি আমাকে দিতে পারেন। 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,' 'এ ব্যক্তি সত্য কথা বলেছে। আচ্ছা, যাও এবং আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা কর।'

আমি উঠে গেলাম, এবং খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, হিলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারাহ ইবনে রবী', এ দুই ব্যক্তির অবস্থাও আমারই মত। আমাদের তিন জন সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দান করলে, কেউ যেন আমাদের সঙ্গে কথা না বলে, সবাই যেন দূরে থাকে। সে মত কোন মুসলমানই আমাদের সাথে কথা বলতেন না, সালামের জওয়াব দিতেন না। তাঁরা দুজন তো ঘরেই বসে গেলেন এবং আহাজারি ও কান্নাকাটিতে দিনরাত কাটাতে লাগলেন। আমি একটু শক্ত ও শক্তিশালী থাকায় মসজিদে নামাযের জন্য হাযির হতাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিয়ে লক্ষ্য করতাম, উত্তরে ঠোঁট মুবারক নড়ল কিনা। যখন আমি হুযূরের দিকে তাকাতাম, তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। বিশিষ্ট আত্মীয়-স্বজন ও সবচেয়ে প্রিয়জনেরাও আমার পর হয়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে একদিন এক ব্যক্তি 'গাসসান'-এর বাদশাহর পত্র এনে আমাকে দিল। পত্রে সে আমার দুঃখ-দুর্দশার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করে আমাকে আমন্ত্রণ জানাল যে, আমি তার রাজত্বে চলে গেলে আমাকে বিরাট মর্যাদার সাথে রাখা হবে। পত্র পড়ে বললাম, এও আমার জন্য এক স্বতন্ত্র পরীক্ষা। অবশেষে পত্রটি আগুনে জ্বালিয়ে দিলাম।

চল্লিশ দিন পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে নতুন হুকুম আসল, আমি যেন নিজ স্ত্রী থেকেও পৃথক থাকি। সে মত স্ত্রীকে বললাম বাপের বাড়ি চলে যেতে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকতে।'

আমার সর্বাপেক্ষা বড় চিন্তা এই ছিল যে, যদি এ অবস্থাতেই আমার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জানাযার নামায পড়বেন না, অথবা আল্লাহ না করুন, যদি ইতিমধ্যে হুযূরের ওয়াফাত হয়ে গেল, তবে মুসলমানরা আগামীতে আমার সঙ্গে এ ব্যবহারই চালু রাখবেন। আমার লাশের কাছেও কেউ আসবে না। মোটকথা, পঞ্চাশটি দিন এভাবে কাটল যে, আল্লাহর সুপ্রশস্ত যমীন আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল; বরং গোটা জীবনটাই দুর্বিষহ হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর চেয়ে জীবন কঠিন মনে হচ্ছিল।

অবশেষে এল সুসংবাদ!

এমন অবস্থায় হঠাৎ একদিন সিলা' পাহাড় থেকে শব্দ ভেসে এল- يا كعب بن مالك ابشر (হে কা'ব ইবনে মালেক, সুসংবাদ গ্রহণ কর)। শোনামাত্র আমি সেজদায় পড়ে গেলাম। জানা গেল, শেষ রাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পয়গম্বর আলাইহিস সালামকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আমাদের তওবা কবূল হয়েছে। তিনি ফজরের নামাযের পর সাহাবীদের তা জানিয়েছেন। এক আরোহী আমাকে সংবাদ দিতে ছুটল, কিন্তু অন্য ব্যক্তি

[রুকূ - ১৫]

১১৯. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যপরায়ণদের সঙ্গে থাক[১]।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

১২০. মদীনাবাসী ও তাদের আশপাশের দেহাতিদের জন্য এটা সঙ্গত ছিল না যে, তারা রাসূলুল্লাহ থেকে পিছনে থেকে যাবে এবং তাদের নিজেদের প্রাণকে রাসূলের প্রাণের চেয়ে

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ

পাহাড়ের উপর থেকে সজোরে চিৎকার করে সংবাদ জানাল। তার আওয়াজ আরোহীর পূর্বেই পৌঁছে গেল। আর আমি গায়ের জামা খুলে আওয়াজকারীকে দিয়ে দিলাম। অতঃপর হুযূরের খেদমতে হাযির হলাম। লোকেরা দলে দলে এসে আমাকে মুবারকবাদ দিচ্ছিল। মুহাজিরদের মধ্য থেকে হযরত তালহা (রা) দাঁড়িয়ে মুসাফাহা করলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক চাঁদের মত চমকাচ্ছিল। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমার তওবা কবূল করেছেন। আমি আরয করলাম, এ তওবার পূর্ণতাস্বরূপ আমি আমার সমগ্র ধন-সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় দান করছি।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সব নয়, কিছু নিজের জন্য রাখা উচিত। সে মত আমি খাইবারে (জেহাদের গনীমতস্বরূপ) প্রাপ্ত সম্পদ রেখে অবশিষ্ট সম্পদ দান করে দিলাম।

যেহেতু শুধু সত্য বলার কারণে আমি মুক্তি পেয়েছিলাম, সে জন্য শপথ করলাম, যাই হোক না কেন ভবিষ্যতে কখনো মিথ্যা বলব না। এ অঙ্গীকারের পর বড় বড় অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ সত্য বলা থেকে কখনো পিছপা হইনি এবং ইনশাআল্লাহ যতদিন বেঁচে থাকি, পিছপা হবও না।

وعلى الثلاثة..، ثم تاب عليهم

এই হচ্ছে তিন ব্যক্তির ঘটনা, যার প্রতি বর্তমান আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর প্রথম অনুগ্রহ তো এই ছিল যে, তিনি তাদের ঈমান ও এখলাস দান করেছিলেন, নেফাক থেকে রক্ষা করেছেন। এখন নতুন অনুগ্রহ এই হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁদের খাঁটি তওবার তাওফীক দান করে পুনরায় নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন এবং দোষ-ত্রুটি মার্জনা করে দিয়েছেন।

১. অর্থাৎ সত্যপরায়ণদের সাহচর্য অবলম্বন কর এবং তাদেরই মত কাজ কর। লক্ষ করুন, উক্ত তিন ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠার কারণেই ক্ষমা লাভ করেছেন এবং মকবূল সাব্যস্ত হয়েছেন। পক্ষান্তরে, মুনাফেকরা মিথ্যা বলেছে এবং অন্তর থেকে খোদা-ভীতি বের করে দিয়েছে। ফলে ওরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে পতিত হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۙ

বেশি ভালবাসবে[১]। এর কারণ এই যে, তাদের (অর্থাৎ জেহাদকারীদের) আল্লাহর পথে যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা স্পর্শ করে এবং তারা কাফেরদের ক্রোধ উদ্রেককারী যত পদক্ষেপ গ্রহণ করে* এবং তারা শত্রুদের থেকে যা কিছু কেড়ে নেয়, এসবের প্রত্যেকটির বদলে তাদের জন্য নেক আমল লেখা হয়[২]—নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না—

---

১. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট-যাতনা ভোগ করবেন, আর আমরা আরামে বসে থাকব, এমন হওয়া উচিত নয়। হাদীসে আছে, আবু খাইছামা রাযিয়াল্লাহু আনহুও তাবূক অভিযান থেকে পিছিয়ে ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওনা হয়ে যাওয়ার পর তিনি বাগানে গেলেন। সেখানে মনোরম ছায়া বিদ্যমান ছিল, সামনে ছিল সুন্দরী স্ত্রী। পানি ছিটিয়ে তিনি মাটি খুব ঠাণ্ডা করলেন, তার উপর চাটাই বিছালেন। তাজা খেজুরের ছড়া সামনে রাখলেন এবং ঠাণ্ডা ও মিঠা পানি উপস্থিত করলেন। আরাম-আয়েশের এসব উপকরণ লক্ষ করত হঠাৎ আবু খাইছামার অন্তরে বিদ্যুতের মত কী যেন চমকে উঠল। তিনি বললেন, ধিক এমন জীবনের! আমি তো মনোরম ছায়া, শীতল পানি ও মনোমুগ্ধকর বাগানের স্বাদ উপভোগ করছি আর আল্লাহর প্রিয় পয়গম্বর এমন কঠিন লূ হাওয়া এবং উষ্ণতা ও তৃষ্ণার জগতে পাহাড়-প্রান্তর অতিক্রম করছেন।

এ খেয়াল আসামাত্র তিনি যানবাহন তলব করলেন। তারপর গলায় তলোয়ার লটকিয়ে ও হাতে বল্লম নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। উটনী বায়ুবেগে চলছিল। অবশেষে মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। দূর থেকে এক উটনী-আরোহীকে বালুর স্তূপ অতিক্রম করে আসতে দেখে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, كن أبا خيثمة (এ ব্যক্তি আবু খাইছামা হোক)। একটু পরে সবাই দেখতে পেলেন, আবু খাইছামাই বটে। رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين (দালায়েলুন নবুওয়াহ্ বাইহাকী : ৫/২২২)

★ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'যত কদম ফেলে'

২. লক্ষনীয়, এসব বিষয়ের অধিকাংশ বিষয়ই (যথা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা লাগা বা কষ্টে পতিত হওয়া) এখতিয়ারী কাজ নয়। কিন্তু জেহাদের নিয়তের বরকতে তাদের আমলনামায় এই গায়র-এখতিয়ারী বা অনিচ্ছাকৃত বিষয়গুলির কারণেও নেকী লিখে দেওয়া হবে এবং আল্লাহ তাদেরকে এসবের শুভ প্রতিদান দেবেন।

১২১. এবং তারা ছোট বা বড় যা-ই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তর অতিক্রম করে, তা সবই তাদের জন্য লেখা হয়[১], যাতে আল্লাহ তাদেরকে তারা যে আমল করত তার উৎকৃষ্ট বিনিময় দান করেন[২]।

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢١﴾

১২২. মুমিনদের জন্য সমীচীন নয় যে, তারা সকলেই অভিযানে বের হয়ে পড়বে। অতএব তাদের প্রত্যেক বড় দল থেকে একটি ছোট অংশ বের হয় না কেন? যাতে তারা দীনের 'বুঝ' অর্জন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যেন তারা (মন্দ কাজ থেকে) বেঁচে থাকে[৩]।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

---

১. ব্যয় করা বা ময়দান অতিক্রম করা, সৎকর্ম ও ইচ্ছাকৃত আমল। এ জন্যই এখানে الا كتب لهم বলা হয়েছে, পূর্বের আয়াতের মত الا كتب به عمل صالح বলা হয়নি। প্রখ্যাত মুফাসসির হযরত ইবনে কাছীর (র) এমনই লিখেছেন।

২. অর্থাৎ তিনি উত্তম আমলের উত্তম পারিশ্রমিক দান করবেন।

৩. বিগত রুকূগুলিতে জেহাদে যাওয়ার ফযীলত এবং না যাওয়ার মন্দতা বর্ণিত হয়েছে। এতে কারো ধারণা হতে পারে যে, সর্বদা প্রত্যেক জেহাদে সকল মুসলমানের যোগদান করা ফরযে-আইন। তাই বর্তমান আয়াতে বলা হচ্ছে যে,এমনটি জরুরীও নয়; আর এটা কল্যাণকরও নয় যে, সমস্ত মুসলমান একই সঙ্গে জেহাদে চলে যাবে। বরং সমীচীন এই যে, প্রত্যেক গোত্র ও সম্প্রদায় থেকে এক এক জামাত বের হবে এবং অবশিষ্ট লোকেরা অপরাপর জরুরী কাজে রত থাকবে।

এখন যদি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং জেহাদে তশরীফ নিয়ে যান, তবে প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে যে দলটি তাঁর সহগামী হবে, তারা তাঁর সাহচর্যে থেকে এবং বহুবিধ ঘটনা ও বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করে দীন ও দীনী আহকামের জ্ঞান লাভ করবে এবং ফিরে এসে নিজেদের অবশিষ্ট লোকদের স্বীয় ইলম ও অভিজ্ঞতার আলোকে ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে অবহিত করবে। আর ধরুন, যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে মদীনাতে থেকে যান, তবে যারা জেহাদে যায়নি তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে থেকে দীনের জ্ঞান হাসিল করবে এবং মুজাহিদদের অনুপস্থিতিতে ওহী ও মারেফতের যেসব বিষয় শুনবে, প্রত্যাবর্তনের পর মুজাহিদদের তা অবহিত করবে।

[রুকূ - ১৬]

১২৩. হে ঈমানদারগণ! কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাও[১] এবং ওরা যেন তোমাদের মধ্যে

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ

(অতএব এস্থলে দু' অবস্থা— প্রথম অবস্থায়, যারা জিহাদে বের হয়েছে, তারা দীনের ইলম অর্জন করবে এবং ফিরে এসে তা অন্যদের শেখাবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অবস্থায়, যারা বের হয়নি তারা ইলম শিখবে, এবং মুজাহিদগণ ফিরে আসার পর তাদেরকে তা শেখাবে অর্থাৎ ليتفقهوا ও لينذروا এবং رجعوا ও يحذرون এর فاعل (কর্তা) উভয় দলের যে কোনটি হতে পারে এবং আয়াতের অর্থ দুইভাবে হতে পারে— অনুবাদক)।

আয়াতের শব্দাবলিতে আরবী ব্যাকরণের দিক থেকে এই উভয় অর্থ-ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। যেমন 'রূহুল মা'আনী প্রভৃতি তাফসীরগ্রন্থে বলা হয়েছে।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'প্রত্যেক কওম থেকে উচিত কিছু লোক পয়গম্বরের সুহবতে থাকা, যাতে তারা দীনের জ্ঞান শিখতে পারে এবং পিছনবর্তীদের শেখাতে পারে। এখন পয়গম্বর এই দুনিয়াতে বর্তমান নেই; কিন্তু দীনের ইলম ও উলামা বর্তমান আছেন। ইলম হাসিল করাও ফরযে-কেফায়া, আর জেহাদও ফরযে-কেফায়া। অবশ্য যদি কোন সময় ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে সকলের প্রতি জিহাদে বের হওয়ার ব্যাপক আহ্বান এসে যায়, তখন জিহাদ ফরযে-আইন হয়ে দাঁড়ায়। তাবূকের সময় এমনই হয়েছিল। সে জন্যই যারা পিছনে থেকে যান তাঁদের জওয়াবদিহি করতে হয়েছিল। والله اعلم

মুফাসসির আবু হায়্যান (র) এর মতে এ আয়াত জেহাদের জন্য নয়, বরং তলবে ইলম (ইলম অন্বেষনের গুরুত্ব বোঝানোর) জন্য নাযিল হয়। জেহাদ ও তলবে ইলম সম্বন্ধীয় আয়াতগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহর রাস্তায় বের হতে হয় এবং উভয়ের উদ্দেশ্য দীনের হেফাজত ও সমৃদ্ধিসাধন- একটিতে তরবারীর দ্বারা, অপরটিতে মুখ ইত্যাদি দ্বারা।

১. জেহাদ ফরযে-কেফায়া। স্বাভাবিক ক্রমিকতার দিক থেকে জেহাদ প্রথমে সেই কাফেরদের বিরুদ্ধে হতে হবে, যারা মুসলমানদের সবচেয়ে নিকটবর্তী। তারপর যারা এ কাফেরদের নিকটবর্তী, তাদের বিরুদ্ধে। এরূপে পর্যায়ক্রমে জেহাদের সীমারেখা প্রশস্ত করতে হবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের জেহাদ এই ক্রমানুসারেই হয়েছিল।

دفاعي جهاد ('আত্মরক্ষামূলক জেহাদ')-এর বেলায়ও ফেকাহবিদগণ এই ক্রমিকতারই অনুসরণে বলেন, কোন ইসলামী দেশের উপর কাফেররা আক্রমণ করলে, (প্রথমে) সে দেশের মুসলমানদের উপর প্রতিরোধ করা ওয়াজিব হবে। যদি তারা যথেষ্ট না হয় বা

غِلْظَةً ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝١٢٣

কঠোরতা দেখতে পায়[১]। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ পরহেযগারদের সঙ্গে আছেন[২]।

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝١٢٤

১২৪. যখন কোন সূরা নাযিল করা হয়, তখন মুনাফেকদের কেউ কেউ বলে, 'এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল?' যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা (এতে) আনন্দিত হচ্ছে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝١٢٥

১২৫. আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, এ সূরা ওদের কলুষের সাথে আরো কলুষ বৃদ্ধি করেছে এবং ওরা কাফের অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেছে[৩]।

অলসতা করে, তবে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর ওয়াজিব। যদি তারাও যথেষ্ট না হয় তবে যারা তাদের নিকটে আছে তাদের উপর প্রতিরোধমূলক জেহাদ ওয়াজিব হবে। এভাবে যদি প্রয়োজন হয়, তবে পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত জেহাদ ফরয হতে থাকবে।

১. মুমিনের অবস্থা এই যে, নিজ ভাইয়ের বেলায় নম্র এবং আল্লাহ ও রাসূলের দুশমনের ব্যাপারে কঠোর হবে, যাতে তার নম্রতা ও অলসতা দেখে দুশমন সাহস না পেয়ে বসে। ইরশাদ হচ্ছে : أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ (মুসলমানদের প্রতি কোমলহৃদয়, কাফেরদের প্রতি অতি কঠোর। –সূরা মায়িদা, আয়াত : ৫৪); এবং وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (যারা তাঁর সঙ্গে আছেন, তাঁরা কাফেরদের প্রতি অতি কঠোর, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। –সূরা ফাত্হ, আয়াত :২৯); এবং يٰأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন এবং ওদের প্রতি কঠোরতা করুন। –সূরা তওবা, আয়াত :৭৩)।

আর হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- أنا الضحوك القتّال (আমি খুবই হাসি-খুশী, সেই সাথে প্রচণ্ড লড়াইকারী।) [ইবনে কাছীর ২/৫৭৬]

২. অর্থাৎ খোদাভীরু মুসলমানদের জন্য কাফের জাতিকে ভয় করার এবং ওদের দ্বারা পরাস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। মুসলিমগণ যতদিন এবং যে পরিমাণ আল্লাহকে ভয় করতে থেকেছে, ততদিনই এবং সে পরিমাণই কাফেরদের উপর তাদের বিজয় হাসিল হতে থেকেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরে তাঁর ভয় পয়দা করে দিন।

৩. যখন পবিত্র কুরআনের কোন সূরা নাযিল হত, তখন মুনাফেকরা পরস্পর একে অন্যকে অথবা সরলমনা মুসলমানদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলত, 'কি মিয়া! এই সূরা তোমাদের

১২৬. ওরা কি দেখে না, প্রতি বছর ওদের একবার বা দু'বার পরীক্ষায় ফেলা হয়? এর পরও ওরা তওবা করে না এবং উপদেশও গ্রহণ করে না[১]।

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝

১২৭. আর যখন কোন সূরা নাযিল করা হয়, তখন ওরা একে অন্যের দিকে তাকায়–

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ

মধ্যে কার কার ঈমান বাড়াল? ওদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এই সূরাতে আছেই বা কী? কী তত্ত্ব, তথ্য ও সারগর্ভ অমূল্য উপকরণ এর মধ্যে রয়েছে, যা ঈমান ও বিশ্বাসের উন্নতির কারণ হবে? —এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহর কালাম শুনে মুমিনদের ঈমানের মধ্যে সজীবতা ও উন্নতি লাভ হয় এবং তাদের অন্তর আনন্দিত ও উন্মোচিত হয়। হাঁ, যাদের অন্তরে কুফর ও নেফাকের রোগ ও অপবিত্রতা রয়েছে, ওদের রোগ ও অপবিত্রতা বাড়তেই থাকে, এমন কি ওদের এই রোগ ওদের গোটা জানটাকেই খতম করে ছাড়ে।' কবির ভাষায়-

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست ÷ در باغ لالہ روید ودر شورہ بوم خس

বৃষ্টির কল্যাণ সাধনে কোনো দ্বিমত আছে কি? তা পুষ্পোদ্যানে উৎপাদন করে রক্তজবা আর লোনা মাটিতে আগাছা।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) আয়াতের তাফসীর অন্যভাবে করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর কালাম যে মুসলমানের অনুভব-অনুভূতির মুতাবিক হয়, সে খুশী হয়ে বলে ওঠে, সুবহানাল্লাহ! এ আয়াত আমার ঈমান ও বিশ্বাস আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। অনুরূপ, কোনো আয়াতে যখন মুনাফেকদের গুপ্ত দোষ প্রকাশ করা হয়, তখন ওরাও লজ্জিত হয়ে চুপিসারে বলে, 'সত্যই এ কালাম আমাদের বিশ্বাস ও ঈমানকে বাড়িয়ে দিয়েছে।' কিন্তু এ কথা যেহেতু অন্তর থেকে এবং প্রসন্ন মনে বলত না, বরং শুধু লজ্জা ঢাকার নিমিত্ত বলত, এ জন্য ভবিষ্যতে তওবা করার ও সাচ্চা অন্তরে সত্যের অনুসরণ করার তাওফীক ওদের হত না। বরং ওরা নিজের দোষ (নেফাক) গোপন করার জন্য পূর্বের চেয়ে বেশি চেষ্টা-তদবীর করত। এ-ই হচ্ছে অপবিত্রতার উপর অপবিত্রতা! দোষযুক্ত ব্যক্তির উচিত, নসীহত শুনে নসীহতকারীর কাছে দোষ গোপন না করে বরং নিজের সংশোধন করা।

১. অর্থাৎ প্রত্যেক বছর কমপক্ষে এক-দুবার এই মুনাফেকদের বিপদে ও পরীক্ষায় ফেলা হয়। যথা–দুর্ভিক্ষ, রোগ-শোক ইত্যাদি কোন না কোন জাগতিক ও আসমানী বিপদের শিকার হয়; অথবা পয়গম্বর আলাইহিস সালামের মাধ্যমে ওদের নেফাক প্রকাশ হওয়ায় অপমানিত হয়; অথবা যুদ্ধ–জিহাদের সময় ওদের ভীরুতা ও অভ্যন্তরীণ রোগ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। কিন্তু ওরা এতই বেহায়া-নির্লজ্জ ও নষ্টমতি হয়ে গেছে যে, চাবুক খেয়েও নিজ পথ থেকে একটুও সরে না, বিগত গোনাহ-খাতার জন্য তওবাও করে না, ভবিষ্যতের জন্য উপদেশও গ্রহণ করে না।

بَعْضٍ ۚ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ۚ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٢٧﴾

'তোমাদের কেউ দেখছে কি?' অতঃপর সরে পড়ে[১]। আল্লাহ ওদের অন্তর ফিরিয়ে দিয়েছেন, কারণ ওরা এমন লোক যারা বোধশক্তি রাখে না[২]।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

১২৮. নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল আগমন করেছেন[৩]– যাঁর কাছে তোমাদের কষ্ট অসহনীয়[৪], যিনি তোমাদের (কল্যাণের) জন্য ব্যাকুল[৫], যিনি ঈমানদারদের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ, পরম মেহেরবান[৬]।

---

১. যখন ওহী নাযিল হত এবং মুনাফেকরা মজলিসে উপস্থিত থাকত, তখন আল্লাহর কালাম শোনা ওদের পক্ষে খুবই দুর্বিষহ হত– বিশেষত সেসব আয়াত শোনা, যেগুলিতে ওদের দোষ প্রকাশ করা হত। তখন মুনাফেকরা পরস্পর একে অন্যের প্রতি আড় চোখে ইশারা করত এবং এদিক-সেদিক তাকাত যে, মজলিসে কোন মুসলমান ওদের দেখে ফেলল কি না। তার পর মুসলমানদের অলক্ষ্যে মজলিস থেকে কেটে পড়ত।

২. অর্থাৎ মজলিসে নববী থেকে ফিরে গেল কীভাবে? কারণ, আল্লাহ ওদের অন্তরকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। কেননা, ওরা নিজেদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে ঈমান ও প্রজ্ঞার কথাবার্তা বুঝতে ও গ্রহণ করতে চায় না।

৩. যাঁর বংশ-গোত্র, স্বভাব-চরিত্র ও সততা-আমানতদারী সম্বন্ধে তোমরা উত্তমরূপে অবগত।

৪. যে বিষয় তোমাদের জন্য কষ্টকর, তা তাঁর পক্ষে খুবই দুর্বিষহ। সম্ভাব্য সকল উপায়ে তিনি চান, উম্মতের যেন কষ্ট না হয় বরং আসানী হয় এবং ইহ ও পরকালীন আযাব থেকে তারা যেন হেফাজতে থাকে। এজন্য তিনি যে দীন নিয়ে আগমন করেছেন, তাও সহজ ও সুন্দর। আর তিনি শাসনকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদেরও এই নসীহত করতেন- يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا (মানুষের প্রতি) আসানী কর, কঠোরতা করো না। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৯)

৫. অর্থাৎ তোমাদের মঙ্গল কামনা এবং উপকার করার বিশেষ উৎকণ্ঠা তাঁর অন্তরে রয়েছে। মানুষ দোযখে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আর তিনি তাদের কোমর জড়িয়ে ধরে সেদিক থেকে সরাচ্ছেন। তাঁর একান্ত চেষ্টা ও কামনা এই যে, আল্লাহর বান্দারা প্রকৃত কল্যাণ ও সফলতা লাভে ধন্য হোক। যুদ্ধ-জেহাদের উদ্দেশ্যও রক্তপাত নয়, বরং অগত্যা মেজর অপারেশন দ্বারা মানবগোষ্ঠীর দূষিত ও বিষাক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা এবং শরীরনাশক কীটগুলো ধ্বংস করে দিয়ে উম্মতের সামগ্রিক অবস্থাকে সুস্থতা ও ভারসাম্যে ফিরিয়ে আনা উদ্দেশ্য।

৬. যেখানে বিশ্বমানবের জন্য তিনি এমন হিতাকাঙ্ক্ষী, সেখানে বিশেষ করে ঈমানদারদের প্রতি কেমন স্নেহশীল ও মেহেরবান হবেন, তা সুস্পষ্ট।

فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَقُلۡ حَسۡبِیَ اللّٰهُ ۫ۖ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَیۡهِ تَوَکَّلۡتُ وَ هُوَ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ ﴿۱۲۹﴾

১২৯. এর পরও যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনি বলে দিন, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করেছি এবং তিনিই অধিপতি মহাআরশের'[১]।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

১. যদি মানুষ আপনার অপরিসীম স্নেহ-মমতা, হিতাকাঙ্ক্ষা ও সহানুভূতির কদর (মূল্যায়ন) না করে, তবে কোনই পরোয়া নেই। মনে করুন, সারা দুনিয়াও যদি আপনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে একা আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট, যিনি ছাড়া কারো বন্দেগীও নেই, কারো উপর ভরসাও হতে পারে না। কেননা, পৃথিবী ও আকাশ-রাজ্য এবং মহান আরশের মালিক তিনিই। সকল লাভ ও ক্ষতি, হেদায়েত ও গোমরাহীর চাবিকাঠিও তাঁরই হাতে।

বি. দ্র. আবু দাউদ শরীফে (হাদীস ৫০৮১) আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় সাত বার করে حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত চিন্তাফিকিরের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন।

আর আরশের বিশালতা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হলে তাফসীরে 'রূহুল মাআনী'তে এই আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

تمّ سورة التوبة بفضل الله وحسن توفيقه ، اللّٰهُمَّ تب عليّ واجعل لي براءة من النار إنك أنت التوّاب الرحيم.

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর
আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী



রা
রাহনুমা
প্রকাশনী™

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর
আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী



تفسير عثماني

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™
ইসলামী টাওয়ার, দোকান ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।